

THE HON'BLE MOHARAJAH MANINDRA CHANDRA NANDI BAH

মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বা



প্রথম খণ্ড।

ভারতবর্ষ।

(প্রাচীন ভারতবর্ষ।)

শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী প্রণীত।

প্রকাশক,—

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী।

"পৃথিবীর ইতিহাস" কার্য্যালয়, হাওড়া।

কর্ম্মযোগ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,
৪নং তেলকলঘাট রোড, হাওড়া,
হইতে
শ্রীযুগলকিশোর সিংহ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীশ্রীহরিঃ—শরণং।

উৎসর্গ।

অশেষগুণসম্পন্ন মাননীয়

মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর

সমীপে।

মহারাজ!

বর্ত্তমান বঙ্গে আপনি বঙ্গভাষার ও বঙ্গীয় সাহিত্যসেবিগণের প্রধান আশ্রয়স্থল। আপনার অনুকম্পায় বঙ্গভাষা দিন দিন বহুতর অমূল্য রত্নভূষণে অলঙ্কৃত হইতেছে; আবার, বঙ্গীয় সাহিত্যসেবিগণও সাহিত্যসেবা-ব্রতে আপনার নিকট নানারূপে উৎসাহ পাইতেছেন। আমার এই "পৃথিবীর ইতিহাস" প্রণয়ন উপলক্ষেও আপনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমার পৃষ্ঠপোষণে—এক খণ্ডের মুদ্রণ-ব্যয় প্রদানে—সম্মত হইয়াছেন। আপনার এ অনুগ্রহ কখনই বিস্মৃত হইবার নহে। কৃতজ্ঞতার নিদর্শন-স্বরূপ আমার "পৃথিবীর ইতিহাস" গ্রন্থের এই খণ্ড আপনার চিরস্মরণীয় নামে উৎসর্গীকৃত হইল।

হাওড়া,
৩০এ চৈত্র, ১৩১৬ সাল।

বিনীত
শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী।

প্রাচীন ভারতবর্ষের সমাজ, ধর্ম্ম, আচার, ব্যবহার, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের জ্ঞান-বিশ্বাস-মতে আমরা যাহা বুঝিয়াছি, তাহাই এই গ্রন্থ-পত্রে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। সকলের দৃষ্টিতে উহা যে সর্ব্বথা অভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে, সে স্পর্দ্ধা কখনই করি না; প্রাচীন ভারতের ইতিহাস আলোচনায় সে স্পর্দ্ধা করিবার কাহারও শক্তি আছে বলিয়াও আমাদের মনে হয় না। ভারতের—অনন্তকালের অনন্ত ইতিহাস; আর সে ইতিহাসে অনন্ত তত্ত্ব নিহিত আছে। যিনি যে দৃষ্টিতে যে অংশের প্রতি লক্ষ্য করিবেন, তিনি তদনুরূপ দৃশ্যই দেখিতে পাইবেন। অধিকারী অনুসারে, জ্ঞান-বুদ্ধির তারতম্য-ক্রমে, তাহাতে এক এক জনের প্রাণে এক এক নূতন ভাবের স্ফূর্ত্তি হইতে পারে; এমন কি, সময়ে সময়ে তাহাতে অনুসন্ধিৎসু জনের মনে নানা বিপরীত ভাবের সঞ্চার হওয়াও অসম্ভব নহে। সে দৃষ্টান্ত—এই গ্রন্থের অনেক স্থলেই দেখিতে পাইবেন। সে দৃষ্টান্ত,—ভারতের পুরাবৃত্তে কেহ জাতি-ভেদ-প্রথা—ব্রাহ্মণাদির অস্তিত্ব—দেখিতে পান; কেহ বা তাহার বিপরীত দৃশ্য দর্শন করেন। সে দৃষ্টান্ত,—কেহ অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করেন; কেহ বা নানা দেবদেবীর মাহাত্ম্য-তত্ত্ব বুঝিতে পারেন। এই গ্রন্থে প্রধানতঃ সেই তথ্যই আমরা প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি।

বিষয়ের অনন্তত্ব।

উপসংহারে বক্তব্য, এই গ্রন্থের প্রকাশ-সম্বন্ধে যাঁহারা আমাদের সহায়তা-কল্পে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। তাঁহারা দীর্ঘ-জীবী হউন; তাঁহাদের যশঃ-সৌরভে দিগ্দিগন্ত আমোদিত হউক। তাঁহাদের ভরসা ও উৎসাহ না পাইলে, আমাদের ন্যায় নিঃস্ব ব্যক্তির এই গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার সাধ্য কি ছিল? সুতরাং গ্রন্থ-সূচনায় তাঁহাদের শুভ-কামনা করিতেছি। "পৃথিবীর ইতিহাসে" তাঁহাদের পরিচয় চিরস্মরণীয় করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করিব না। "পৃথিবীর ইতিহাস" প্রণয়নে যে যে গ্রন্থের সাহায্য গৃহীত হইতেছে, প্রসঙ্গতঃ প্রায় সকল গ্রন্থের নামই উল্লেখ করা হইয়াছে। অধিকন্তু, এক এক দেশের ইতিহাস সম্পন্ন হইলে, সেই সেই দেশ-সংক্রান্ত গ্রন্থাবলীর সাহায্য প্রাপ্তির বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচিত হইবে। পরিশেষে বক্তব্য, এই গ্রন্থের সহিত শ্রীমান্ প্রমথনাথ সান্যালের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। এই গ্রন্থ-প্রণয়নে তিনি আমার দক্ষিণ-হস্ত-স্থানীয়। গ্রন্থের অনেক অংশ তাঁহার লিখিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার প্রকাশ-পক্ষে তাঁহার যত্ন ও অধ্যবসায় অতুলনীয় বলিতে কি, তাঁহার উৎসাহ না পাইলে, এ গ্রন্থ লিখিত ও প্রকাশিত হইবারই সম্ভাবনা ছিল না! সুতরাং এই গ্রন্থ-প্রণয়নে শ্রীমান্ প্রমথনাথের নাম চির-সম্বন্ধযুক্ত রহিল। ইতি।

উপসংহার।

হাওড়া। ৩০এ ফাল্গুন, ১৩১৬।

নিবেদক,
শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী।

নির্ঘণ্ট।

[এই নির্ঘণ্টে (Index) যে সকল শব্দের পার্শ্বে * চিহ্ন দৃষ্ট হইবে, সেই সকল নাম সূর্য্য-বংশের বংশলতায় দেখিতে পাওয়া যাইবে ; আর যে সকল শব্দের পার্শ্বে † চিহ্ন দেওয়া হইল, সেই সকল নাম চন্দ্রবংশের বংশলতায় দেখিতে পাইবেন ; এবং যে সকল নামের পূর্ব্বে ⁂ চিহ্ন রহিল, তৎসমুদায় স্বায়ম্ভুব মনুর বংশে দেখিবেন। বাহুল্য-ভয়ে সকল বংশের সকল পর্য্যায়ের পত্রাঙ্ক প্রদত্ত হইল না। সূর্য্যবংশের বংশলতা ২৯২ পৃষ্ঠা হইতে ৩০৩ পৃষ্ঠায়, চন্দ্রবংশের বংশলতা ৩০৫ পৃষ্ঠা হইতে ৩২৯ পৃষ্ঠায় এবং স্বায়ম্ভুব মনুর বংশলতা ৩৩৭-৩৩৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে।]

অ

ধ

প

—

ফ

—

ব

সম্পূর্ণ

সূচনা।

এ পর্য্যন্ত ভারতের কোনও ভাষায় "পৃথিবীর ইতিহাস" প্রকাশিত হয় নাই। আমাদের সঙ্কল্প—আমরা বাঙ্গালা ভাষায় সেই "পৃথিবীর ইতিহাস" প্রকাশ করিব। বহু দিন হইতেই এ কল্পনা আমাদের মনোমধ্যে উদয় হইয়াছিল; বহু দিন হইতেই এতৎ-সম্পর্কে আমরা উদ্যোগ-আয়োজনে ব্রতী হইয়াছিলাম। ভগবৎ-কৃপায় এক্ষণে আমাদের সেই অভীষ্ট-সিদ্ধির সুযোগ উপস্থিত। এই "পৃথিবীর ইতিহাস"—এক বিরাট্ কল্পনা; অন্যূন ত্রিংশ খণ্ডে সম্পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা। সে হিসাবে, এই গ্রন্থ-খণ্ড—ভূমিকা মাত্র। পৃথিবীর সকল দেশের সর্ব্ববিধ জ্ঞাতব্য-তত্ত্ব বাঙ্গালা ভাষার এই "পৃথিবীর ইতিহাসে" সন্নিবিষ্ট করিব,—ইহাই আমাদের অভিলাষ। এ পর্য্যন্ত ইংরাজী প্রভৃতি ভাষায় যে সকল 'পৃথিবীর ইতিহাস' প্রকাশিত হইয়াছে; আমাদের আকাঙ্ক্ষা—আমরা এই ইতিহাসে তদপেক্ষা অধিক বিষয়ের আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব।

সঙ্কল্প।

ভারতবর্ষকেই আমরা সর্ব্ববিষয়ের আদিভূত বলিয়া মনে করি। সুতরাং "পৃথিবীর ইতিহাসে" ভারতবর্ষের প্রসঙ্গই প্রথমে উত্থাপন করিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—এই গ্রন্থ ভূমিকা মাত্র। প্রকারান্তরে ভারতবর্ষের ইতিহাসেরও ইহা ভূমিকা মাত্র। ভারতবর্ষের ইতিহাস বুঝিতে হইলে, প্রথমে শাস্ত্র-তত্ত্ব বুঝিবার আবশ্যক হয়। শাস্ত্র-গ্রন্থের সহিত ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস ওতঃ-প্রোত বিজড়িত। সুতরাং আমরা এই গ্রন্থে প্রথমে সংক্ষেপে বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্র-গ্রন্থের পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছি। তার পর, তাহা হইতে ক্রমে ক্রমে পুরাতত্ত্ব উদ্ধারের প্রয়াস পাইয়াছি। অন্যান্য দেশের ইতিহাসের তুলনায় ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটু বিশেষত্ব আছে। সে বিশেষত্ব—অন্যান্য দেশের ইতিহাসে প্রকাশ, তত্তদ্দেশ অবনত অবস্থা হইতে দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে; কিন্তু ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্ব আলোচনায় আমরা বুঝিতে পারি, ভারতবর্ষ উন্নত ছিল, যুগ বিবর্ত্তনে এখন অবনতির পথে প্রধাবিত হইয়াছে। সে হিসাবে, অন্যান্য দেশে প্রথমে জাতির অভ্যুদয়, পরে সভ্যতার সহিত তাহাদের ইতিহাসের সৃষ্টি; কিন্তু ভারতবর্ষে প্রথমেই সভ্যতা, প্রথমেই সভ্যতার আদিভূত শাস্ত্র-গ্রন্থের অভ্যুদয়। সেজন্যও আমরা প্রথমে শাস্ত্রাদির পরিচয় প্রদান করিয়া পরিশেষে অন্যান্য বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।

প্রথম—ভারতবর্ষ।

ভারতবর্ষ।

সংক্ষিপ্ত সূচীপত্র।

ভারতবর্ষ।

(প্রথম খণ্ড।)

হিন্দু-রাজত্ব।

শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী।

শ্রীশ্রীহরিঃ—শরণং।

নিবেদন।

ভারতবর্ষের এই ইতিবৃত্ত প্রণয়ন সম্বন্ধে প্রধানতঃ আমি তিনটী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছি,—

প্রথম।—ভারতবর্ষ-সম্বন্ধে প্রচলিত সাধারণ মত-পরম্পরার পরিচয় দিবার প্রয়াস পাইয়াছি; অর্থাৎ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মণীষিগণ কোন্ বিষয় কি ভাবে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন,—তাহার আভাস এই গ্রন্থে পাঠকগণ যাহাতে পাইতে পারেন, আমি তৎপক্ষে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি।

দ্বিতীয়।—একই বিষয়ে নানা জনে নানামত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের অনেকেরই মতামত আমি আলোচনার চেষ্টা পাইয়াছি। সেই প্রচলিত মত-সমূহের আলোচনা করিয়া, কোন্ কোন্ বিষয়ে আমার মনে কিরূপ ধারণা হইয়াছে,—তাহাও এই গ্রন্থে বিবৃত করিয়াছি। বলা বাহুল্য, সেই ধারণায় উপনীত হওয়ার কারণ-পরম্পরা নির্দেশ করিতেও আমি ক্রুটি করি নাই। তবে প্রাচীন বিষয়ের আলোচনায়, আমার জ্ঞান-বুদ্ধি-শিক্ষানুসারে, প্রধানতঃ আমি শাস্ত্রমতের অনুসরণ করিতেই চেষ্টা পাইয়াছি।

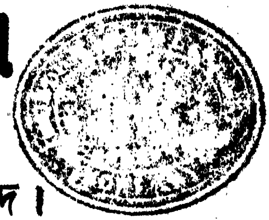
তৃতীয়।—প্রত্যেকেই জ্ঞান-বুদ্ধি-অনুসারে মতামত প্রকাশে বা বিচার-বিতর্কে অধিকারী। সুতরাং আমি যদি কোনও নূতন সিদ্ধান্তে উপনীত হই, পাঠক-মাত্রকেই যে তাহা মানিয়া লইতে হইবে, সেরূপ স্পর্দ্ধা—সেরূপ উদ্দেশ্য আমার আদৌ নাই। যে বিষয় লইয়া কত বড় বড় পণ্ডিতের মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইয়া গিয়াছে, ক্ষুদ্র আমি, আমার সিদ্ধান্তই যে প্রমাদ-পরিশূন্য হইবে—তাহাই বা কিরূপে বলিতে পারি? তবে, যুক্তিযুক্ত প্রমাণ-পরম্পরা দেখিয়া যদি কেহ আমার কোনও সিদ্ধান্তের পোষকতা করেন, তাহাই আমার পরিশ্রমের সাফল্য বলিয়া মনে করিব।

আমার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের অনুবর্ত্তী হইয়া পাঠকগণ এই গ্রন্থ পাঠ করেন, আমার ক্রুটি-বিচ্যুতি উপেক্ষা করেন,—এই গ্রন্থ-প্রচারে ইহাই আমার প্রার্থনা।

বিনীত,

গ্রন্থকার।

ভারতবর্ষ।



প্রথম পরিচ্ছেদ।

ইতিহাসে প্রতিষ্ঠা।

[ইতিহাসে ভারতের শীর্ষস্থান,—সভ্যতায়, প্রাচীনত্বে, প্রাকৃতিক দৃশ্যে, জলবায়ু প্রভৃতিতে শ্রেষ্ঠত্ব ;—ম্যাক্সমুলার, হীরেণ, মারে, টড্, জোর্ণস্-জারণা প্রভৃতির মতে ভারতবর্ষের অলৌকিকত্ব ;—মিশর, গ্রীস্, রোম প্রভৃতির সহিত তুলনা,—বিপ্লবের শত ঝঞ্ঝাবাতেও ভারতীয় প্রতিষ্ঠার ক্রম-পর্য্যায়-রক্ষা,—ব্রাহ্মণ্য-গৌরবের দৃষ্টান্ত ;—প্রাচীনত্বে প্রাধান্য,—মিশরের মেনেস প্রভৃতির তুলনা,—সৃষ্টির অনন্তত্ব,—গণনাকে কোটী কোটী বৎসরের প্রতিষ্ঠা ;—প্রাচীনত্ব বিষয়ে জোর্ণস্-জারণা, ষ্টাইলস্, হ্যালবেড, বেলি, হীরেণ, আবুল ফজেল প্রভৃতির মত,—মেগাস্থেনীস এবং দেবীস্থান-গ্রন্থের বর্ণনা।]

ভারতবর্ষই—আদিভূত।

পৃথিবীর ইতিহাসে ভারতবর্ষ শীর্ষ-স্থান অধিকার করিয়া আছে। ভারতবর্ষ—সভ্যতার, জ্ঞানের, মনুষ্যত্বের, বীরত্বের—সকলেরই আদিভূত। সভ্যতার প্রস্রবণ প্রথমে কোথায় প্রবাহিত হইয়াছিল ?—সে এই ভারতবর্ষে! জ্ঞানালোক প্রথমে কোথায় প্রস্ফুট হইয়াছিল ?—সে এই ভারতবর্ষে! দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতিষ—সভ্য-জগৎ যাহার গৌরবে অধুনা গরীয়ান—ভারতবর্ষই তাহার উৎপত্তি-স্থান নহে কি ? সত্য, সরলতা, দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি গুণগ্রামের উচ্চ আদর্শ ই বা পৃথিবীর কোন্ দেশে প্রথম পরিদৃষ্ট হইয়াছিল ? শৌর্য্য-বীর্য্য, আত্মত্যাগ, স্বদেশানুরাগ—মানব-চরিত্রের যে কিছু উচ্চ সম্পদ—ভারতবর্ষ সকলেরই আদিভূত নহে কি ? ভারতীয় সভ্যতার কণিকামাত্র লাভ করিয়াই পৃথিবীর অন্যান্য দেশ সুসভ্য ও গৌরবান্বিত হইয়াছে। ভারতবর্ষ হইতেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের কিরণ-ছটা দিগ্দিগন্তে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষই সকল গৌরবের আধার-স্থান। প্রকৃতি ভারতবর্ষকে অনুপম সৌন্দর্য্য-সুষমায় বিভূষিত করিয়া রাখিয়াছেন! এখানে সকল সময়েই ষড়ঋতুর অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য! এখানে, ভ্রমর-গুঞ্জনে কুসুম-কানন অহরহ

গুঞ্জরিত ; এখানে, বসন্তের মৃদুমন্দ মলয়ানিলে মনঃপ্রাণ স্নিগ্ধ-পরিপ্লুত ; এখানে, মধুবনে কোকিল-পাপিয়া-শ্যামার সুমধুর সুস্বর-লহরীতে ভারত-কানন প্রতিধ্বনিত। আবার এখানে, গ্রীষ্মের প্রখর মার্ত্তণ্ড-কিরণ, প্রাবৃটের প্রবল বারিবর্ষণ, শীতের প্রচণ্ড হিমানী-সম্পাত!—একাধারে এ বৈচিত্র্য পৃথিবীর আর কোথায় আছে? এখানে, হিমালয়ের উচ্চ-শৃঙ্গে আরোহণ কর, শীতে হিমানীতে শরীর সঙ্কুচিত হইবে ; এখানে, গ্রীষ্মের প্রখর মার্ত্তণ্ড-তাপ যদি অনুভব করিতে চাও, দাক্ষিণাত্যে বিষুব-সান্নিধ্যে সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে ; আর যদি এখানে, সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা মূর্ত্তি দেখিতে চাও, তোমার সম্মুখেই—এই বঙ্গদেশেই—সে নয়নাভিরাম মূর্ত্তি বিরাজমান। কোমলে-কঠোরে, মোহনে-ভীষণে, সৌন্দর্য্যে-গাম্ভীর্য্যে এমন একত্র সমাবেশ—ভারতবর্ষ ভিন্ন বুঝি অন্য কোথায়ও আর নাই! ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠত্ব অবিসম্বাদিত। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পর্ব্বত হিমালয়—সে এই ভারতবর্ষে! পৃথিবীর পবিত্র নদী—পুণ্যপূত ভাগীরথী—সে এই ভারতবর্ষে! পৃথিবীর বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ—সে এই ভারতবর্ষে! পৃথিবীর আদি-বাণী বেদ—সে এই ভারতবর্ষে! পৃথিবীর আদি-ধর্ম্মের উৎপত্তি-স্থান—সে এই ভারতবর্ষে! এখনও—ভারতবর্ষের এতাদৃশ অধঃপতনের দিনেও—পৃথিবীর অধিকাংশ লোক যে ধর্ম্মের অনুসরণকারী—সে ধর্ম্মও এই ভারতবর্ষেরই! প্রকৃতি যেন আপন অনুপম শ্রেষ্ঠ সম্পদে ভারতবর্ষকে সাজাইয়া রাখিয়াছেন। ভারতবর্ষের দৃশ্যাবলী মনঃপ্রাণবিমুগ্ধকারী ; ভারতবর্ষের ন্যায় ভূমির উর্ব্বরা-শক্তিই বা কোথায় আছে? ভারতবর্ষের ন্যায় বিবিধ শস্য-সম্পদ ও বিচিত্র জীবজন্তুর একত্র-সমাবেশই বা কোথায় দেখিতে পাই? ফলতঃ, সমগ্র পৃথিবীর সার-সামগ্রী লইয়াই বিধাতা যেন ভারতবর্ষের সৃষ্টি করিয়াছেন!

আপনার দেশ—আপনার জন্মভূমি বলিয়া, অযথা গৌরব-গরিমা প্রকাশ করিতেছি না। ভারতবর্ষের বিপুল-বৈভবের প্রতি যাঁহারই দৃষ্টি পড়িয়াছে, তিনিই বিস্ময়-বিহ্বল হইয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে ম্যাক্সমুলারের স্থান কত উচ্চে, কে না অবগত আছেন? ভারতবর্ষের প্রসঙ্গ যখনই তিনি উত্থাপন করিয়াছেন, তখনই তিনি বলিয়াছেন,—"সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে যদি এমন দেশ আমায় কখনও সন্ধান করিতে হয়—প্রকৃতি যে দেশ ধনৈশ্বর্য্যে শক্তি-সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন—এমন কি যে দেশ মর্ত্ত্যে অমরপুরী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—আমি মুক্তকণ্ঠে বলিব,—সে দেশ ভারতবর্ষ! যদি কেহ আমায় জিজ্ঞাসা করেন,—কোন্ আকাশের কোন্ প্রদেশে জ্ঞান-স্ফূর্ত্তিতে মানসিক বৃত্তিনিচয় পূর্ণ-পরিস্ফুট হইয়াছিল,—আর কোন্ দেশ জীবন-সমস্যার কঠোর প্রতিজ্ঞার প্রথম সমাধানে সমর্থ হইয়াছিল, এবং সেই সমাধানে প্লেটো ও কাণ্ট প্রমুখ পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের গবেষণাও প্রতিহত হইয়া আছে,—তাহা হইলে, আমি দেখাইয়া দিব—সে দেশ এই ভারতবর্ষ! যদি কেহ আমায় জিজ্ঞাসা করেন,—আমাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবন সুগঠিত করিবার জন্য পৃথিবীর কোন্ দেশের কোন্ ভাষা হইতে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করিতে পারি ;—প্রধানতঃ আমরা গ্রীক, রোমান এবং সেমিটিক-জাতীয় ইহুদীদিগের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলেও,

পাশ্চাত্য-পণ্ডিতের মতামত।

নিঃসঙ্কোচে দেখাইয়া দিব—তাহাও এই ভারতবর্ষেরই! কি ভাষা, কি ধর্ম্ম, কি পুরাতত্ত্ব, কি দর্শনশাস্ত্র, কি বিধি-বিধান, কি আচার-ব্যবহার, কি আদিম শিল্প ও আদিম বিজ্ঞান—মনুষ্য যে বিষয়ই অধ্যয়ন করিতে অভিলাষী হউন না কেন, মানব-জাতির ইতিহাসের সারভূত, শিক্ষাপ্রদ এবং মূল্যবান যাবতীয় সামগ্রীই এই ভারতবর্ষে—একমাত্র এই ভারতবর্ষের অনন্ত-ভাণ্ডারেই সঞ্চিত রহিয়াছে।" * অধ্যাপক হীরেণ বলেন,—"কেবল এসিয়া মহাদেশ বলিয়া নহে, সমগ্র পাশ্চাত্য-ভূখণ্ডের জ্ঞান এবং ধর্ম্মের আধার-স্থান—এই ভারতবর্ষ!" † মিঃ মারে বলেন,—"ভারতবর্ষের মনোহর প্রাকৃতিক দৃশ্যের এবং অপর্য্যাপ্ত বিবিধ উৎপন্ন দ্রব্যের তুলনা পৃথিবীর কোনও দেশের কোথাও নাই!" ‡ কর্ণেল টড্ রাজস্থানের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন,—"গ্রীক দার্শনিকগণ যাঁহাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন; প্লেটো, থেলস্, পীথাগোরাস প্রভৃতি যাঁহাদের শিষ্যস্থানীয় ছিলেন;—সেই আদর্শ-মনীষিগণের আদি-স্থান কোথায়,—বলিতে হইবে কি? যাঁহাদের জ্যোতির্ব্বিদ্যার অলৌকিক প্রভাবে আজিও ইউরোপ-খণ্ড বিচকিত ও বিমুগ্ধ,—সেই জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের আবাস-ভূমিই বা কোথায় ছিল? যাঁহাদের স্থাপত্যে—কারুকার্য্যে আজিও আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়, তাঁহারাই বা কোথায় ছিলেন? সেই সঙ্গীত-শাস্ত্র-বিশারদ্‌গণ—যাঁহাদের সঙ্গীতের সুধাধারায় কখনও বা আনন্দে অবসাদ আনয়ন করিত, আবার কখনও বা অশ্রুধারায় হাস্যস্ফূর্ত্তি-সঞ্চারে সমর্থ হইত, তাঁহারাই বা কোন্ দেশে অবস্থিতি করিতেন?" § সকলেরই আদিভূত এই ভারতবর্ষ নহে কি? কাউণ্ট জোর্ণস্ জার্ণা বলেন,—"ভারতের প্রত্যেক সামগ্রীই অভিনব বৈভব-সম্পন্ন এবং কৌতূহলোদ্দীপক। ·· প্রকৃতি কি যাদুমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াই এখানে বিরাজমান রহিয়াছেন! এক দিকে, মুকুলমুঞ্জর-পরিশোভিত কি সুন্দর শ্যামল প্রান্তর; অন্য দিকে, ভূর্ণদ-প্রবাহ-বিচালিত কি ভীষণ প্রাবৃটের ঘনঘটা! এক দিকে, তুষার-ধবলিত রজত-শুভ্র হিমাচলের কি মহীয়সী মূর্ত্তি; অন্য দিকে, অগ্নিস্রাবী মরু-প্রান্তরের কি শুষ্ক কঠোর ভীষণতা! এক দিকে, হিন্দুস্থানের প্রশান্ত-বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্রের কি কমনীয় কান্তি; অন্য দিকে, উন্নত-শীর্ষ গিরিমালার কি অপরূপ গম্ভীর প্রকৃতি! এক দিকে, অতীত ইতিহাসের অনন্ত জীবন; অন্য দিকে, কবিত্বের পুষ্পপরাগে অতীতের অমল-স্মৃতি!" ‖ এইরূপ কত জনের কত কথা উল্লেখ করিব? যাঁহারাই নিরপেক্ষভাবে ভারতের তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন, ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব-সম্বন্ধে তাঁহারা সকলেই একবাক্যে এই কথারই প্রতিধ্বনি

* "If I were to look over the whole world to find out the country most richly endowed with all the wealth, power, and beauty that nature can bestow—in some parts a very *paradise* on earth—I should point to India. &c., &c."—Maxmuller's *India: What can it teaches us.*

† "India is the source from which not only the rest of Asia but the whole Western World derived their knowledge and their religion."—Prof. Heeren,—*Historical Resarches. Vol II.*

‡ Murray's *History of India.*

§ Colonel Tod's *Rajasthan.*

‖ Count Bjornstjerna—*Theogony of the Hindus.*

করিয়া গিয়াছেন। সার উইলিয়ম জোন্‌স্‌, অধ্যাপক এইচ্‌ এইচ্‌ উইলসন, মিঃ কোলব্রুক, মিঃ পোকক্‌, সার উইলিয়ম হ্যামিল্টন, মিসেস ম্যানিং প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সকলেরই প্রায় এ সম্বন্ধে এক মত।

ভারতবর্ষের সভ্যতা কত কাল অব্যাহত, তাহার ইয়ত্তা হয় না। ভারতীয় সভ্যতার দীর্ঘ-জীবনের বিষয় চিন্তা করিলেও বিস্মিত হইতে হয়। উন্নতির উচ্চ-চূড়ায় আরোহণ করিয়া, ভারতবর্ষ কত জাতির কতরূপ উত্থান-পতন দর্শন করিল;—তাহার চক্ষের সমক্ষে কত নূতন জাতির নূতন সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় ও অবসান হইল;—জলবুদ্‌বুদের ন্যায় কত জাতি কত সাম্রাজ্য উদ্ভূত হইয়াই আবার কালসাগরে বিলীন হইল; কিন্তু ভারতবর্ষের আর্য্য-হিন্দুজাতির কখনই ক্রমভঙ্গ হয় নাই;—তাঁহাদের ধর্ম্ম, সমাজ ও সভ্যতার মৌলিকত্ব চিরদিন অটুট রহিয়াছে। সেই প্রণব-ধ্বনি—আজিও আর্য্য-হিন্দুর প্রাণে প্রাণে প্রতিধ্বনিত! সেই ব্রহ্মণ্য-গর্ব্ব—আজিও এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র পরিদৃষ্ট! সেই সমাজ, সেই ধর্ম্ম, সেই আচার-ব্যবহার, সেই রীতি-নীতি-পদ্ধতি—আজিও অবিচ্ছিন্নভাবে বিরাজমান্‌! সেই শাস্ত্র, সেই বেদবেদাঙ্গ, সেই মন্বত্রিযাজ্ঞবল্ক্য, সেই পিতৃ-পরিচয়—সেই সবই রহিয়াছে! এমন ক্রমপর্য্যায় বুঝি পৃথিবীর আর কোথাও নাই—কোন জাতিরই নাই! দৃষ্টান্ত কি আর দিব? প্রাচীন মিশর, মানিলাম, খৃষ্ট-জন্মের কয়েক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সভ্য-সমুন্নত বলিয়া প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়াছিল! কিন্তু অনন্ত কাল-সাগরে সে কয় দিন মাত্র! এখন,কোথায় সেই জাতি?—কোথায় তাহাদের সেই প্রাচীন ধর্ম্ম?—কোথায় তাহাদের সেই প্রাচীন ভাষা-সাহিত্য? কয়েকটী মাত্র 'পীরামিড' প্রস্তরলিপি প্রভৃতি দেখিয়া এখন তাহাদের অস্তিত্ব নির্ণয় করিতে হইতেছে! প্রাচীন রোম, খৃষ্টজন্মের সাড়ে সাত শত বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহারই বা এখন কি ক্রমপর্য্যায় বিদ্যমান আছে? খৃষ্টজন্মের পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে পুরাবৃত্তে গ্রীস-দেশ উচ্চ-আসন লাভ করে। কিন্তু সেই গ্রীসেরই বা এখন সে পরিচয়-সম্বন্ধ কি আছে? ফিনিসীয়, কার্থেজীয়, বাইজেণ্টাইন এবং মুর প্রভৃতি প্রাচীন জাতি ভূমধ্য-সাগরের উপকূল-ভাগে কয় দিন পূর্ব্বে কি প্রভাবই বিস্তার করিয়াছিল! কিন্তু তাহাদেরই বা কি পরিচয়-চিহ্ন এখন খুঁজিয়া পাই? এইরূপ পৃথিবীর যে জাতির ইতিবৃত্তই অনুসন্ধান করি না কেন, দেখিতে পাই, সকল জাতিরই ক্রম-পর্য্যায় ভঙ্গ হইয়াছে;—কেবল ভারতীয় আর্য্য-হিন্দুগণ আজি পর্য্যন্ত আপনাদের পিতৃপুরুষের পরিচয়-চিহ্ন অব্যাহত রাখিয়া আসিয়াছেন। বিপ্লবের কত প্রবল প্রবাহ ভারতবর্ষের বক্ষের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে; কত বৈদেশিক জাতির কত ভীষণ আক্রমণে ভারতবর্ষ কত সময় বিপর্য্যস্ত হইয়াছে,—তাহার পবিত্র দেবমন্দির কলুষিত, দেবদেবী চূর্ণীকৃত,শাস্ত্রগ্রন্থ ভস্মীভূত,—কত অত্যাচারই তাহার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তথাপি হিন্দুজাতির ক্রমভঙ্গ হয় নাই। সৃষ্টির আদি-কালে যে ব্রাহ্মণ যে প্রণবধ্বনি উচ্চারণ করিয়া আত্ম-পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন, আজিও সেই ব্রাহ্মণ সেই প্রণব-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াই আত্ম-পরিচয় প্রদান করিতে সমর্থ রহিয়াছেন।

ভারতীয় সভ্যতার অবিচ্ছিন্নতা।

তুমি যখনই জিজ্ঞাসা করিবে,—"ব্রাহ্মণ! তুমি কত দিনের?" তাঁহার সেই একই উত্তর অনন্ত কাল হইতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে,—"যাবচ্চন্দ্রসূর্য্য মহীতলে।" এমন পরিচয়, পৃথিবীর কোনও জাতির নাই, থাকিতে পারে না, থাকাও সম্ভবপর নহে। সৃষ্টির আদিকাল হইতে যে ব্রাহ্মণ যেরূপ তেজোগর্ব্বে বিরাজমান ছিলেন, আজিও সেই ব্রাহ্মণ সেইভাবেই আপন প্রতিষ্ঠা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায়, ভারতবর্ষের ইহাই অলৌকিকত্ব!

প্রাচীনত্বে ভারতের শীর্ষস্থান।

আর অলৌকিকত্ব—তাহার প্রাচীনত্বে। অন্য জাতির কল্পনায়ও যাহা আসে না, ভারতবর্ষের প্রাচীনত্ব তত কালের। পৃথিবী-সৃষ্টির ইতিহাসে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের কল্পনা কয়েক সহস্র বৎসর মধ্যেই নিবদ্ধ আছে। বাইবেলোক্ত সৃষ্টি-তত্ত্বের ইতিহাস আলোচনা করিলে, যদিও হিব্রু, সামারিটান, সেপ্টুয়া-জিণ্ট প্রভৃতির মধ্যে মতানৈক্য দৃষ্ট হয়, কিন্তু তথাপি কেহই খৃষ্টজন্মের ছয় সাত সহস্র বৎসরের অধিক পূর্ব্বে পৃথিবী-সৃষ্টির কল্পনা মনোমধ্যে স্থান দিতে পারেন নাই। হিব্রু-মতের অনুবর্ত্তী হইয়া, আয়র্লণ্ডের পাদরী উষার খৃষ্ট-জন্মের ৪০০৪ বৎসর পূর্ব্বে এই পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। ইউরোপের অনেকেই এখনও পর্য্যন্ত উষারের সেই মতই প্রকৃষ্ট বলিয়া মান্য করেন। কোনও কোনও পাশ্চাত্য-পণ্ডিতের মতে—উষারের গণনা অবশ্য প্রমাদ-শূন্য নহে। তাঁহারা বলেন,—"মিশর-দেশই পৃথিবীর সভ্যতার আদিক্ষেত্র। মিশর-দেশে প্রথম যে রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন, তিনি খৃষ্ট-জন্মের ৫৮৬৭ বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। সে রাজার নাম মেনেস। তিনি মেনেথো বা 'টিনাইট থেবাইন' নামক আদিবংশের প্রতিষ্ঠিতা। গিজে পীরামীডের প্রতিষ্ঠাতা মিশরের অন্যতম প্রাচীন রাজা সুফির রাজত্বকালের দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মেনেস আবির্ভূত হইয়াছিলেন।" মেনেসের রাজত্বকাল সম্বন্ধে আরও অবশ্য নানা মত প্রচলিত আছে; বুখের মতে ৫৭০২ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে, বুনসেনের মতে ৩৬৪৩ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে, লেপসিয়সের মতে ৩৮৯২ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে, হেনরীর মতে ৫৩০৫ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে, সার্পের মতে ২০০০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে, নোলানের মতে ২৬৭৩ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে, এবং পুলের মতে ২৭১৭ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে; ইত্যাদি। * ফলতঃ, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতামত ভিত্তি-স্বরূপ গ্রহণ করিলে, খৃষ্ট-জন্মের ছয় সাত সহস্র বৎসরের অধিক কাল পূর্ব্বে পৃথিবী-সৃষ্টির কল্পনা কখনই মনোমধ্যে স্থান দেওয়া যাইতে পারে না;—পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ উহার অধিক পূর্ব্বের কোনও কথাই উল্লেখ করিতে সমর্থ হন নাই। মিশরের পৌরাণিক তত্ত্ব আলোচনা করিলে, মেনেসের পূর্ব্বে মিশর-দেশের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। সেই পুরাতত্ত্বে প্রকাশ,—"মেনেস, মিশরের আদি-রাজা বটে; কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বে চারি হাজার বৎসর কাল 'সেমি-গড্' বা উপদেবতাগণ এবং তৎপূর্ব্বে বিশ্বকর্ম্মা, সূর্য্য, শনি, বায়ু, রাহু, কেতু প্রভৃতি দেবতাগণ তথায় রাজত্ব করিতেন। দেবতাদিগের ১৩ হাজার ৯০০ শত বৎসর রাজত্বের

* জেমস্ উষারের (James Usher) "Annals of the Old and New Testament", "Chamber's Encyclopaedia", এবং "Theogony of the Hindus" প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

পর, উপদেবতাগণ রাজ্যলাভ করেন।" * এই পৌরাণিক সিদ্ধান্ত মান্য করিয়া লইলেও, কোনক্রমেই খৃষ্ট-জন্মের চতুর্বিংশতি সহস্র বৎসর পূর্ব্বের কল্পনা মনোমধ্যে জাগিতে পারে না। কিন্তু ভারতবর্ষের সভ্যতা, ভারতবর্ষের গৌরব-গরিমা, ভারতবর্ষের অতীত-স্মৃতি—কত অনন্তকালের সহিত বিজড়িত রহিয়াছে, তাহা স্মরণ করিলেও চমকিত হইতে হয়। যেদিন হইতে ভারতবর্ষের অধঃপতনের সূত্রপাত হয়,—কুরুক্ষেত্রের রণক্ষেত্রে পাণ্ডব-কৌরবের ঘোর-সমরে ভারতের গৌরব-রবি যেদিন অস্তমিত হন,—সেও আজ কত কালের কথা! বর্ত্তমান বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগের অন্তর্গত যে কলিযুগ, সেই কলিযুগেরই এখন ৫০১০ বৎসর অতীত-প্রায়। * কুরুক্ষেত্র সমর যদি উক্ত চতুর্যুগান্তর্গত ত্রেতা ও কলির সন্ধিস্থলে সংঘটিত হইয়া থাকে, তাহা হইলেও, হিন্দুগৌরবের অবসানের দিন আসিয়াছে,—সেও প্রায় পাঁচ সহস্রাধিক বৎসর অতীত হইতে চলিল। সুতরাং হিন্দু জাতির সভ্যতা যে তাহারও কত পূর্ব্বের,—সহজেই প্রতীত হয় না কি? কাল—অনন্ত; সংসার—অনন্তকাল। গণনাঙ্কের গণ্ডী-বন্ধনে, কে বল, অনন্তকে আয়ত্ত করিতে পারে? পৃথিবীর অন্য জাতি সেই অনন্ত কাল-প্রবাহকে সীমাবদ্ধ করিতে প্রয়াসী হইলেও, আর্য্য-হিন্দুগণের প্রস্ফুট মস্তিষ্ক কিন্তু তাহার স্বরূপ-তত্ত্বই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কাল অনাদি, সৃষ্টি অনাদি, ব্রহ্মাণ্ড অনাদি, প্রাণিপর্য্যায় অনাদি, সৃষ্টিকর্ত্তা অনাদি,—আর্য্য-হিন্দু ব্যতীত কে তাহা নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন? অনাদি ঈশ্বর, অনাদি কাল, ওতঃপ্রোতঃ বিরাজমান আছেন,—ইহসংসার তাঁহারই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা অভিব্যক্তি মাত্র,—এ নিগূঢ় তত্ত্ব যাঁহারা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা কখনই, মৃগমদানুসন্ধিৎসু বিভ্রান্ত মৃগের ন্যায়, পৃথিবীর জন্মদিন অনুসন্ধানের জন্য ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ান নাই। তাঁহারা বুঝিতেন,—পৃথিবী অনন্তকাল বিরাজমান আছে, পৃথিবী অনন্তকাল বিরাজমান থাকিবে; মহাসাগরে জলবুদ্বুদের ন্যায় সৃষ্ট-সামগ্রী—প্রাণিপর্য্যায়—তাহাতেই উৎপন্ন হইয়া তাহাতেই বিলীন হইবে। বলা বাহুল্য, সেই অনন্তত্ব ধারণার দৃঢ়-ভিত্তির উপরই পরবর্ত্তিকালে শাস্ত্রে ও পুরাণেতিহাসে যুগযুগান্তরাদির একটা সীমা-পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে। কিন্তু সে সীমা-পরিমাণও অধুনাতন মনুষ্যের ধারণা-শক্তির অতীত

---

* পাশ্চাত্য জাতিদিগের ভাষায় মিশর দেশের সেই দেবগণের নাম এইরূপ লিখিত হইয়াছে,—Vulcan or Ptah, Helios the Sun or Ra, Saturn or Seb ইত্যাদি।

* প্রত্যেক শুভ অনুষ্ঠানে এবং তীর্থকৃত্যের সময় হিন্দুমাত্রকেই একটী সঙ্কল্প-মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়। সে সঙ্কল্প-মন্ত্র এই,—"ওঁ তৎসৎ শ্রীব্রহ্মণো দ্বিতীয়প্রহরার্দ্ধে বৈবস্বতে মন্বন্তরেঽষ্টাবিংশতিতমে কলিযুগে কলিপ্রথমচরণে আর্য্যাবর্ত্তান্তর্বৈকদেশে অমুক-নগরে অমুক-সংবৎসরায়ণর্ত্তুমাসপক্ষদিননক্ষত্রমুহূর্ত্তেঽত্রেদং কার্য্যং কৃতং ক্রিয়তে বা।" বলা বাহুল্য, কালভেদে, দেশভেদে, মাসভেদে, ঋতুভেদে এই মন্ত্রের বিশেষ বিশেষ শব্দের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। যাহা হউক, এই মন্ত্রানুসারে বুঝিতে পারা যায়,—এখন বৈবস্বত মন্বন্তরের অন্তর্গত অষ্টাবিংশতি কলিযুগ চলিতেছে। অর্থাৎ, পূর্ব্ববর্ত্তী ছয় মন্বন্তরের (৭১×৬) ৪২৬ চতুর্যুগ এবং বর্ত্তমান মন্বন্তরের সপ্তবিংশ চতুর্যুগ অতীত হইয়া অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগেরও সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরান্তে কলিযুগের ৫০১০ বৎসর চলিয়া গিয়াছে।

বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যেহেতু, তদ্দারাও প্রতিপন্ন হয়—ভারতবর্ষের সভ্যতা অন্যূন এক শত সাতানব্বই কোটী বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। *

সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর—অতি-দূর অতীতের কথা—বিস্মৃতির অন্ধতম গর্ভে নিমজ্জিত রাখিয়াও যদি কেহ নিরপেক্ষভাবে ভারতবর্ষের প্রাচীনত্ব-বিষয়ে পর্য্যালোচনা করেন, কি পাশ্চাত্য, কি প্রাচ্য,—যিনিই হউন না কেন, তিনিই বা কি সিদ্ধান্তে উপনীত হন? এতৎপ্রসঙ্গেও কয়েক জন পাশ্চাত্য-পণ্ডিতের গবেষণার ফল প্রদর্শন করিতেছি। জর্ম্মণীর প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ পরিব্রাজক কাউণ্ট জোর্ণস্-জারণা—পাশ্চাত্য-জগতে যাঁহার পাণ্ডিত্য-খ্যাতির অবধি নাই—তিনি পুনঃপুনঃ মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন,—"ভারতবর্ষের ধর্ম্ম ও সভ্যতার প্রাচীনত্বে

প্রাচীনত্বে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ।

* এই বিষয় একটু বিশদভাবে বুঝিবার আবশ্যক হইলে, জানিতে হয়—শাস্ত্রে পৃথিবীর 'কারণ' ও 'লয়' দুই অবস্থার বিষয় কথিত আছে। সেই দুই অবস্থারই নামান্তর 'ব্রহ্মদিন' ও 'ব্রহ্মরাত্রি'। সহস্র চতুর্যুগে (দিব্যযুগে) একটী ব্রহ্মদিন হয়; এবং সেই ব্রহ্মদিনের পরিমাণ—৪৩২ কোটী বৎসর। যথা,—

"শতংতেঽযুতংহায়নান্দ্বেযুগে ত্রিণি চত্বারি কৃন্মঃ।"—অথর্ব্ববেদ।

ব্রহ্মদিন আবার চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে এবং এক এক একটী মন্বন্তর আবার একসপ্ততি চতুর্যুগে বিভক্ত। যথা,—

"যুগানাং সপ্ততি সৈকা মন্বন্তরমিহোচ্যতে।"—সূর্য্যসিদ্ধান্ত।

"যৎপ্রাগ্ দ্বাদশ সহস্রমুদিতং দৈবিকং যুগং।

তদেক সপ্ততি গুণং মন্বন্তরমিহোচ্যতে॥"—মনু।

এক্ষণে বৈবস্বত মন্বন্তর অর্থাৎ সপ্তম মন্বন্তর চলিতেছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—৭১ চতুর্যুগে একটী মন্বন্তর হয়। এক একটী চতুর্যুগে ১২ সহস্র দিব্যবর্ষ বা ৪৩ লক্ষ ২০ সহস্র সাধারণ বর্ষ। দিব্যবর্ষের পরিমাণ-সম্বন্ধে 'সূর্য্যসিদ্ধান্তের' গণনা এই,—

"তদ্দাদশ সহস্রাণি চতুর্যুগমুদাহৃত।
সূর্য্যাব্দসংখ্যয়া দ্বিত্রিসাগরৈরযুতাহতৈঃ॥
সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশসহিতং বিজ্ঞেয়ং তচ্চতুর্যুগং।
যুগস্য দশমো ভাগশ্চতুস্ত্রিদ্ব্যেক সংগুণঃ।
ক্রমাৎ কৃতযুগাদীনাং ষষ্ঠাংশঃ সন্ধ্যয়োঃ স্বকঃ॥"

ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, সত্যযুগে ৪৮০০, ত্রেতাযুগে ৩৬০০, দ্বাপরযুগে ২৪০০ এবং কলিযুগে ১২০০ দিব্য-বর্ষ আছে। মনু বলেন,—৩৬০ সাধারণ বৎসরে এক দিব্যবর্ষ হয়। সে হিসাবে সত্যযুগে ৪৮০০ দিব্যবর্ষ বা ১৭ লক্ষ ২৮ হাজার সাধারণ বর্ষ, ত্রেতাযুগে ৩৬০০ দিব্যবর্ষ বা ১২ লক্ষ ৯৬ হাজার সাধারণ বর্ষ, দ্বাপরযুগে ২৪০০ দিব্যবর্ষ বা ৮ লক্ষ ৬৪ হাজার সাধারণ বর্ষ এবং কলিযুগে ১২০০ দিব্যবর্ষ বা ৪ লক্ষ ৩২ হাজার সাধারণ বর্ষ আছে। তাহা হইলেই বুঝা যায়, এক একটী মন্বন্তরে ৪৩,২০,০০০ × ৭১ = ৩০,৬৭,২০,০০০ বৎসর। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এক্ষণে সপ্তম মন্বন্তর চলিতেছে। সে হিসাবে, ছয় মন্বন্তরের ১,৮৪,০৩,২০,০০০ বৎসর এবং বর্ত্তমান মন্বন্তরের সপ্তবিংশতি চতুর্যুগ (৪৩,২০,০০০ × ২৭ = ১১,৬৬,৪০,০০০ বৎসর) ও অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগের অতীত-কাল (৩৮,৯৩,০১০ বৎসর) অতীত হইয়া গিয়াছে; অর্থাৎ, সর্ব্বসাকুল্যে ১৯৬ কোটী ৮ লক্ষ ৫৩ হাজার বৎসর কাল অতীত হইয়াও এখনও একটী ব্রহ্মদিন পূর্ণ হয় নাই। তবেই বুঝুন, পৃথিবী-সৃষ্টির ইতিহাস কোন্ অনন্ত কাল-সাগরে ভাসমান রহিয়াছে! ইহাতেই প্রতিপন্ন হয় না কি,—পাশ্চাত্য-কল্পনার পৃথিবী-সৃষ্টির কত পূর্ব্বে ভারতবর্ষের সভ্যতালোকে কি দিব্যজ্যোতি প্রকাশ পাইয়াছিল।

পৃথিবীর কোনও জাতিই সমকক্ষতা-লাভে সমর্থ নহে।" * আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ 'ইয়েল কলেজের' প্রেসিডেণ্ট ষ্টাইল্‌স্‌, হিন্দুদিগের রচনাবলীর প্রাচীনত্বের বিষয় আলোচনা করিয়া, বিস্ময়-বিহ্বল হইয়া, সার উইলিয়ম জোন্‌স্‌কে অনুরোধ করিয়াছিলেন,—"আদমের ইতিহাস-মূলক আদি-পুস্তকও বোধ হয়, হিন্দুদিগের নিকট অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যাইতে পারে।"† খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-গ্রন্থের মতে ঈশ্বর মনুষ্য-সৃষ্টির প্রারম্ভেই আদম ও ইভকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কিন্তু ডাক্তার ষ্টাইল্‌স্‌, সেই আদম ও ইভের বৃত্তান্ত-কথা হিন্দু-জাতির নিকট সন্ধান লইবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। তবেই বুঝুন, ভারতীয় হিন্দু-জাতির প্রাচীনত্ব-বিষয়ে তাঁহার মনে কি ধারণাই না উদিত হইয়াছিল! হিন্দুজাতির যুগ-চতুষ্টয়ের বিষয় আলোচনা করিতে করিতে, সসম্মানে মস্তক অবনত করিয়া, মিঃ হাল্‌হেড বলিয়াছেন,—"সে তুলনায় বাইবেলের সৃষ্টি-তত্ত্বকে কল্যকার ঘটনা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।" ‡ প্রসিদ্ধ ফরাসী-জ্যোতির্ব্বিদ মুসে-বেলির মতে—"খৃষ্ট-জন্মের তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষ জ্যামিতি ও জ্যোতির্ব্বিদ্যায় প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়াছিল।" § একটী জাতি কতদূর উন্নত হইলে, এতাদৃশ বিদ্যায় পারদর্শী হইতে পারে,—তাহা স্মরণ করিয়াও, হিন্দু জাতির প্রাচীনত্ব-বিষয়ে অধুনা বহু পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মস্তক বিঘূর্ণিত হইতেছে। 'রাজতরঙ্গিণীর' অনুবাদক আবুল ফজেল ইতিহাসোল্লিখিত কাশ্মীরের রাজগণের রাজত্ব-কালের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়া দেখিয়াছেন, তত্রত্য রাজবংশাবলী ৪১০৯ বৎসর ১১ মাস ৯ দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিবার পদ্ধতি, অনেকাংশে আধুনিক বলিলেও বলা যাইতে পারে। সুতরাং ধারাবাহিক এই ইতিহাস লিখিবার কত পূর্ব্বে এ দেশে সভ্যতা-প্রতিষ্ঠা স্থাপিত হইয়াছিল—সহজেই অনুমান করা যায়। ‖ অধ্যাপক হীরেণ বলেন,—"গ্রীকরাজদূত মেগাস্থিনীস যখন চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় আগমন করেন, তখন তিনি প্রমাণ পাইয়াছিলেন, চন্দ্রগুপ্তের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণ ৬০৪২ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।" মেগাস্থিনীস ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন—খৃষ্ট-জন্মের ৩১৭ বৎসর পূর্ব্বে। সুতরাং খৃষ্ট-জন্মের প্রায় সাড়ে ছয় হাজার বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণের পরিচয়,

---

* "No nation on earth can vie with the Hindus in respect of the antiquity of their civilization and the antiquity of their religion."—*Theogony of the Hindus.*

† Ward's Mythology mentioned in the *Hindu Superiority,*

‡ "To such antiquity the Mosaic creation is but as yesterday."

§ M. Bailly's History of Astronomy—*Histoire de l' Astronomie Ancienne.* ফরাসীরাজ চতুর্দ্দশ লুইর রাজত্বকালে, ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে, শ্যামদেশে দূত-প্রেরণে এবং ভারতবর্ষের কর্ণাট প্রদেশের জ্যোতির্ব্বিদ ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে গণনাঙ্কের যে পদ্ধতি সংগ্রহ করা হইয়াছিল, তাহা আলোচনা করিয়া বেলি বুঝিতে পারেন, ব্রাহ্মণ জ্যোতির্ব্বিদগণ ৪৩৮৩ বৎসরের যে গণনা নির্দ্ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত। বলা বাহুল্য, সেই ব্যাপার দর্শনেই ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব-সম্বন্ধে বেলির মনে দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছিল।

‖ বর্ত্তমান কালে যে প্রণালীতে ইতিহাস লিখিত হয়, প্রাচীন ভারতের ইতিবৃত্তে সে প্রণালী অবলম্বিত হয় নাই—ইহা নিঃসন্দেহ। তবে উচ্চ সভ্যতার পরিচয়-চিহ্ন যে ইতিহাস, ভারতীয় সাহিত্যে সে ইতিহাস বহুকাল হইতেই লিপিবদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। যথাস্থানে সে প্রসঙ্গ উত্থাপনে প্রয়াস পাইব

তাঁহার বর্ণনাতেই পাওয়া যায়। তিনি বিদেশী; অল্পদিন মাত্র এদেশে অবস্থান করিয়াছিলেন; সুতরাং এদেশের পুঙ্খানুপুঙ্খ পূর্ব্ববৃত্তান্ত সংগ্রহ করা তাঁহার পক্ষে কদাচ সম্ভবপর নহে। চন্দ্রগুপ্তের রাজ-দরবার হইতে মোটামুটি তৎকালের যে পরিচয় পাইয়াছিলেন, তাহাই তিনি সংগ্রহ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। অধ্যাপক ম্যাক্স-ডঙ্কার বলেন,—"স্পেতাম্বস বা ডাইও-নিসাস ৬৭১৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।" * এক্ষণে দেখা যাউক, এই 'স্পেতাম্বস' বা 'ডাইওনিসাস' কে ছিলেন! ইঁহারা দুই ব্যক্তি, কি একই ব্যক্তি দুই নামে পরিচিত হইয়াছেন? অধ্যাপক হীরেণ বলেন,—"ডাইওনিসাস হইতে সান্দ্রোকোটাস (চন্দ্রগুপ্ত) রাজার রাজত্ব-কালের ব্যবধান—৬০৪২ বৎসর।" আবার মেগাস্থেনীস বলেন,—"স্পেতাম্বস হইতে সান্দ্রোকোটাস রাজার রাজত্বকালের ব্যবধান—৬০৪২ বৎসর।" অধ্যাপক ম্যাক্সডঙ্কার এবং কাউণ্ট জোর্ণস্-জারণা প্রভৃতির মতেও ঐ দুই রাজার মধ্যে ঐরূপ কাল-ব্যবধান দেখা যায়। 'স্পেতাম্বস' বা 'ডাইওনিসাস' যে একই ব্যক্তি ছিলেন,—ইহাতে তাহাই প্রতিপন্ন হয়। যদি তাহাই হয়, ঐ 'স্পেতাম্বস' বা 'ডাইওনিসাস' কে ছিলেন? সংস্কৃত 'পীতাম্বর' এবং 'দীনেশ' বা 'দানবেশ'—ঐ দুই শব্দের রূপান্তরে পাশ্চাত্য-ভাষায় ঐ 'স্পেতাম্বস' এবং 'ডাইওনিসাস' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। 'চন্দ্রগুপ্ত' নাম যখন 'সান্দ্রোকোটাস' হইতে পারেন, তখন পীতাম্বর এবং দীনেশ (দানবেশ) যথাক্রমে স্পেতাম্বস বা ডাইওনিসাস হওয়া অসম্ভব নহে। বিশেষতঃ, ইংরেজি গ্রন্থেই আমরা দেখিতে পাই,—পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ বলরামকে 'বেলাস' এবং শ্রীকৃষ্ণকে 'ডাইওনিসাস' বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ‡ ইহাই অনেকে যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করেন। বিশেষতঃ, কলিযুগের কাল-পরিমাণ হিসাব করিলেও দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণ ঐ সময়েই বিদ্যমান ছিলেন। ফলতঃ, 'স্পেতাম্বস' এবং 'ডাইওনিসাস' যে শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝাইত, তাঁহার পীতাম্বর ও দানবেশ নাম পাশ্চাত্য-জাতির উচ্চারণে বিকৃত হইয়াই যে ঐ আকার ধারণ করিয়া আছে, তাহাতে কোনই সংশয় থাকিতে পারে না। অধ্যাপক ম্যাক্স-ডঙ্কার যুধিষ্ঠিরের কাল-নির্ণয় প্রসঙ্গে বলেন,—"বিক্রমাদিত্যের রাজত্বের ৩০৪৪ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রায় ৩১০০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে যুধিষ্ঠির বিরাজমান ছিলেন।" যদিও এ সকল সিদ্ধান্ত প্রমাদ-শূন্য নহে, তথাপি কেহই যে ভারতের প্রাচীনত্ব-বিষয়ে দ্বিধা করিতে পারেন নাই,—তাহা দেখাইবার জন্যই এতৎপ্রসঙ্গের অবতারণা করিলাম। 'দেবীস্থান'-গ্রন্থে প্রমাণ পাওয়া যায়,—"প্রায় আট সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে সভ্যতার উজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ হইয়াছিল।" কত দেখাইব? ভারতের প্রাচীনত্ব—সে যে স্বতঃসিদ্ধ!—সে কি আর প্রমাণ করিবার প্রয়োজন হয়? আর তাই বলিতেছিলাম,—পৃথিবীর ইতিহাসে ভারতবর্ষ কি শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াই আছে!

* Max Dunker's *History of Antiquity*. Vol. IV.

† Historical Researches. Vol. II.

‡ মিঃ গ্রাউস (Mr. Growse) মথুরা-জেলার বিবরণী-গ্রন্থে এই কথাই লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্তে প্রতিপন্ন হয়,—বলরাম 'বেলাস' (Belus) এবং শ্রীকৃষ্ণ 'ডাইওনিয়াস' (Dionysius) নাম গ্রহণ করিয়া আছেন।—Mr. Growse's *Memoirs of Mathura District*.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আর্য্য-জাতি।

[আর্য্য-জাতিই পৃথিবীর আদি সভ্য-জাতি,—সকল সভ্য-জাতিই তাঁহাদের বংশসমুদ্ভূত বলিয়া পরিচয় দেওয়ায় তাঁহাদের আদিমত্ব;—আর্য্যগণের আদি-বাস-সম্বন্ধে ভ্রম-ধারণা,—তিনটী প্রধান মত ও তাহার কারণ-পরম্পরা,—মধ্য-এসিয়া, উত্তর-মেরু ও জর্ম্মণী প্রভৃতিতে আদি-বাসের প্রসঙ্গ;—মত-পরম্পরার অযৌক্তিকতা,—ভাষা, বংশ প্রভৃতির নিদর্শনে ভারতেই তাঁহাদের আদি-বাস নির্দ্দিষ্ট,—আধুনিক পাশ্চাত্য-জাতিগণের দৃষ্টান্ত;—আর্য্য-হিন্দুগণের পৃথিবীর সর্ব্বত্র গতিবিধি,—প্রিয়ব্রত কর্তৃক পৃথিবী সপ্তধা বিভক্ত,—কালভেদে দেশাদির নাম-পরিবর্ত্তন,—আমেরিকা, আফ্রিকা, ইউরোপ প্রভৃতিতে আধিপত্য;—আর্য্য-গণের উত্তর-মেরু প্রভৃতির অভিজ্ঞতাই তত্তৎপ্রদেশে আদিবাসের পরিচায়ক নহে;—আর্য্যাবর্ত্তের স্থান-নির্দ্দেশ,—শাস্ত্রের ও ঐতিহাসিকগণের মতালোচনা;—আর্য্য ও অনার্য্য।]

ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠা যেরূপ অনন্ত কালের, ভারতে আর্য্য-জাতির প্রতিষ্ঠাও সেইরূপ অনন্তকালব্যাপী। ভারতবর্ষই আর্য্য-জাতির উদ্ভব-ক্ষেত্র, ভারতবর্ষেই তাহার উন্নতি-পরিপুষ্টি, আর ভারতবর্ষ হইতেই তাহার প্রভাব-প্রতিপত্তি জগৎ-পরিব্যাপ্ত। ভারতীয় আর্য্য-হিন্দুগণ সকল বিষয়েই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দী—মানব-জাতির উন্নতির স্ববর্ণ-যুগ বলিয়া অভিহিত হয়; কিন্তু আর্য্য-হিন্দুগণের উন্নতির তুলনায়, সে উন্নতি এখনও অপূর্ণ অপরিস্ফুট বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অধুনা পৃথিবীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের তাদৃশ স্ফূর্ত্তি কিছুই হয় নাই,—যাহা আর্য্য-হিন্দুগণের জ্ঞান-বুদ্ধির অগোচর ছিল। জড়-জগতে প্রতিষ্ঠা-লাভই অধুনা মানব-জাতির লক্ষ্যস্থান; কিন্তু আর্য্য-হিন্দুগণ বাস্তব সৎ-সামগ্রীর অধিকারী ছিলেন;—তাই তাঁহারা কি বহির্জ্জগৎ কি অন্তর্জ্জগৎ সর্ব্বত্র আপনাদের আধিপত্য-বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন। জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, দর্শনে, সাহিত্যে, গণিতে, কাব্যে, অলঙ্কারে, শৌর্য্যে, বীর্য্যে—সর্ব্ব বিষয়েই তাঁহাদের এতাদৃশ খ্যাতি-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা ছিল যে, আজি পর্য্যন্ত পৃথিবীর সভ্যজাতি মাত্রেই সেই আর্য্যগণের বংশ-সমুদ্ভূত বা তাঁহাদের সহিত কোনও-না-কোনও প্রকারে সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করিয়া থাকেন! সভ্যজাতিমাত্রের এতাদৃশ আত্ম-পরিচয় দান,—আর্য্য-জাতির মৌলিকত্বেরই নিদর্শন নহে কি?

ভারতেই আর্য্য-জাতির প্রতিষ্ঠা।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, আর্য্যদিগের আদি-তত্ত্বে এখনও অনেকের ভ্রম-ধারণা দূরীভূত নহে। অধিক বলিব কি, এ পর্য্যন্ত আর্য্য-জাতি-সম্বন্ধে যিনিই আলোচনা করিয়াছেন, তিনিই আর্য্য-জাতিকে কোনও এক অভিনব দেশের অভিনব আগন্তুক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। এতদ্বিষয়ে প্রধানতঃ তিনটী মত দৃষ্ট হয়। অধিকাংশ প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিকের সিদ্ধান্ত,—আর্য্যগণ প্রথমে মধ্য-এসিয়ার এক অজ্ঞাত-প্রদেশে বসবাস করিতেন, এবং সেই অজ্ঞাত-প্রদেশ

আদি-তত্ত্বে বিভিন্ন মত।

হইতে ক্রমশঃ দক্ষিণে, পশ্চিমে, উত্তরে, পূর্ব্বে—নানা দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মতে,—কাস্পীয়ান-সাগরের উপকূলস্থিত এক ভূ-খণ্ড হইতে আর্য্য-জাতি ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশে হিমালয়ের পাদপ্রান্তে আসিয়া প্রথমে উপনিবেশ স্থাপন করেন, এবং সেখান হইতেই ক্রমশঃ উত্তর-ভারতের অন্যান্য প্রদেশে তাঁহাদের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়া পড়ে।* মধ্য-এসিয়া হইতে আর্য্যদিগের ভারত-আগমন সম্বন্ধে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ কয়েকটী হেতুবাদ প্রদর্শন করেন। প্রথমতঃ, তাঁহারা বলেন,—'আর্য্যগণের আদিগ্রন্থ ঋগ্বেদ-সংহিতায় যে সকল নদ-নদী ও নগর-গ্রামের উল্লেখ আছে, তাহাদের কয়েকটীর অবস্থান-স্থান মধ্য-এসিয়ায় নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে।' † দ্বিতীয়তঃ, তাঁহারা বলেন,—'আর্য্যগণ সুন্দর শ্বেতবর্ণের পুরুষ বলিয়া শাস্ত্রাদিতে বর্ণিত আছেন, এবং তাঁহাদের প্রতিযোগিগণ কৃষ্ণবর্ণ দৈত্য বা অসুর বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। মধ্য-এসিয়া শ্বেতবর্ণ মনুষ্যের উৎপত্তি-স্থান এবং ভারতবর্ষের অধিবাসীরা প্রায়শঃই কৃষ্ণবর্ণ ;—সুতরাং এতদ্দ্বারাও আর্য্য-হিন্দুগণের মধ্য-এসিয়ায় বাস প্রতিপন্ন হয়।' তৃতীয়তঃ, তাঁহারা বলেন,—'আর্য্যগণের উপাস্য দেবদেবীর নামের সহিত এবং ভাষার অনেক শব্দের সহিত প্রাচীন মহাদেশের অনেক প্রাচীন জাতির ভাষার ও উপাস্য দেবতার নামের অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। মধ্য-এসিয়ার একই কেন্দ্রস্থল হইতে ভিন্ন ভিন্ন দেশে গমন করিয়া তত্তৎপ্রদেশে বসবাস করার—ইহাও এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ বলিতে হয়।' ‡ অপর এক শ্রেণীর প্রত্নতত্ত্বানু-

* অধুনা-প্রচলিত প্রায় সকল ইতিহাসেই এই মত দৃষ্ট হয়। যে কোনও বিদ্যালয়-পাঠ্য ইংরেজি বা বাঙ্গালা ইতিহাস বা অভিধান দৃষ্টি করিলেই এই মত দেখিতে পাওয়া যাইবে।

† ঋগ্বেদ-সংহিতায় প্রসঙ্গক্রমে 'রস্কু', 'অজ', 'আর্জীক', 'গন্ধার', 'রুশম', 'শারদী', 'শিগ্র', 'কীকট' প্রভৃতি কয়েকটী দেশের, এবং 'আর্জীকীয়া', 'সীতা' বা 'সীরা', 'সুবাস্তু', 'কুভা', 'যব্যাবতী', 'শ্বেতায়রী' প্রভৃতি কয়েকটী নদীর নাম দৃষ্ট হয়। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ উহার মধ্যে 'রস্কু' দেশকে 'ওক্সস্' (Oxus) বা 'অক্সাস'-নদীর তীরবর্ত্তী দেশ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। 'সীতা' বা 'সীরা' নদীর বর্ত্তমান নাম, তাঁহাদের মতে, 'জক্সর্টেস্' (Jaxartes) বা 'জাগ্‌জার্ত্তেস্'। 'সুবাস্তু'কে তাঁহারা 'সোয়াত' বা 'স্বাত'-প্রদেশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। 'গন্ধার'—বর্ত্তমান কান্দাহার-দেশ ; 'কুভা'—'কোফেস্'-নামক নদী,—কাশ্মীরের উত্তর-পশ্চিমে সু-অস্তিন দেশে প্রবাহিত ছিল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। অন্যান্য নদনদী এবং নগরেরও এইরূপ নানা পরিচয় তাঁহারা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

‡ বেদোক্ত 'বায়ু', 'সোম', 'যম', 'মিত্র', 'অসুর' প্রভৃতি শব্দ পারসীকগণের 'জেন্দ-আভেস্তা'-গ্রন্থে যথাক্রমে 'বয়ু', 'হোম', 'যিম', 'মিথ্র', 'অহুর' প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়াছে। এইরূপ, বেদোক্ত 'অশ্বিবান', 'অরুষা', 'গন্ধর্ব্ব', 'অহনা' প্রভৃতি শব্দ গ্রীকদের গ্রন্থে যথাক্রমে 'ইক্সিওন', 'ঈরস্', 'কেন্টৌরস্', 'ডাফনি' প্রভৃতি নামে উল্লিখিত হইয়াছে। বেদোক্ত ঐ সকল শব্দের সহিত পারসীক ও গ্রীক শব্দ-সমূহের অর্থগত সাদৃশ্যও যথেষ্ট আছে। ভাষার ঐক্য-সম্বন্ধেও দেখা যায়,—সংস্কৃতের 'পিতৃ'—পারসীকের 'পেডার', লাটিনের 'পেটার', সংস্কৃতের 'দ্বি'—পারসীকের 'দো', লাটিনের 'দুয়ো', সংস্কৃতের 'যুগ'—পারসীকের 'যুগ্', লাটিনের 'যুগাম',—ইত্যাদিতে উচ্চারণগত ও অর্থগত সাদৃশ্য কতই বিদ্যমান আছে। এইরূপ আরও দেখা যায়,—সংস্কৃত 'অগ্নি', লিথুনিয়ান ভাষার 'এগ্নি', জেন্দ-ভাষার 'অগ্নি', প্রাচীন স্লাভোনিক ভাষার 'জেগ্নি', লাটিন ভাষার 'সাম' প্রভৃতিতেও কতই সাদৃশ্য! সংস্কৃতের 'অস্তি', লিথুনিয়ানের 'এস্তি', জেন্দ-ভাষার 'অস্তি', প্রাচীন স্লাভোনিকের 'যেস্তো', লাটিনের 'য়েস্ত'—সাদৃশ্য আরও কতই দেখিতে পাওয়া যায়!

সন্ধিৎসুগণের অভিমত,—আর্য্যগণ উত্তর মেরু হইতে ক্রমশঃ দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইয়া, পরিশেষে ভারতে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহাদের এতাদৃশ সিদ্ধান্তের হেতু-বাদ,—'বেদে দীর্ঘকালব্যাপী রাত্রি ও তদনুরূপ দিবাভাগের উক্তি আছে ; শৈত্যাধিক্যের বর্ণনা আছে ; অপিচ, জ্যোতির্গণনা-ক্রমেও উত্তর-মেরু বাসযোগ্য ছিল বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে।* তথায় একাদিক্রমে ছয় মাস রাত্রি ও ছয় মাস দিন, তথায় সূর্য্য দক্ষিণ দিকে উদয় হন, তথায় নক্ষত্রগণের উদয়াস্ত নাই,—বেদের কোনও কোনও মন্ত্রের সহিত এই অবস্থার সাদৃশ্য আছে। অপিচ, শাস্ত্রাদিতে যে ব্রহ্মরাত্রি ও ব্রহ্মদিনের পরিমাণ সাধারণ বর্ষের এক বর্ষ বলিয়া দেখা যায়, উত্তর-মেরু-প্রদেশের ছয় মাস রাত্রি এবং ছয় মাস দিনই সেই ব্রহ্মরাত্রি ও ব্রহ্মদিন হওয়া সম্ভবপর।' আর্য্যগণের উত্তর-মেরু পরিত্যাগের একটী কারণও তাঁহারা নির্দ্দেশ করেন। 'জেন্দ আভেস্তা' গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে,—"আর্য্যদিগের স্বর্গ বা 'এরিয়ানা ভেইজো' উত্তর-মেরু-প্রদেশেই অবস্থিত ছিল ; সেখানে বৎসরে একবার মাত্র সূর্য্যোদয় হইত। পরিশেষে বরফ ও হিমশিলায় সেই প্রদেশ উৎসন্নপ্রাপ্ত হওয়ায়, অসহ্য শৈত্যাধিক্য-নিবন্ধন, আর্য্যগণ সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করেন।" বলা বাহুল্য, আর্য্যগণের উত্তর-মেরু-বাস-সিদ্ধান্তের পরিপোষকগণ, আর্য্যগণের উত্তর-মেরু পরিত্যাগ-সম্বন্ধে 'জেন্দ আভেস্তার' এই উক্তিরই প্রতিধ্বনি করিয়া থাকেন। তৃতীয় আর এক পক্ষ বলেন,—"জর্ম্মণীর অন্তর্গত পোলণ্ড-প্রদেশে (কাহারও মতে স্কাণ্ডেনেভিয়ায়) আর্য্যদিগের আদি-বাসস্থান ছিল। ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় সংস্কৃতাদির সহিত জর্ম্মণ-ভাষার সাদৃশ্যানুভব করিয়াই তাঁহারা এই মত পোষণ করিয়া থাকেন। ফলতঃ, আর্য্যগণ যে কোনও এক অভিনব দেশ হইতে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা প্রমাণের জন্যই এ পর্য্যন্ত বহু পণ্ডিতের মস্তিষ্ক আলোড়িত হইয়াছে, এবং তদ্বিষয়ে কেহই জ্ঞান-গবেষণার পরিচয় দিতে ত্রুটি করেন নাই।

মতামতের অযৌক্তিকতা।

কিন্তু প্রকৃত তত্ত্ব কি ? সত্য সত্যই আর্য্যগণ মধ্য-এসিয়া, উত্তর-মেরু বা জর্ম্মণী-স্কান্দেনেভিয়া প্রভৃতি স্থান হইতেই পৃথিবীর চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন,—কি এই ভারতবর্ষেই তাঁহাদের আদি-বাসস্থান ছিল ? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—সভ্যতার, জ্ঞানের, সকলেরই আদিক্ষেত্র—ভারতবর্ষ। যে বৈদিক মন্ত্র পৃথিবীর আদি-বাণী বলিয়া সকলেই স্বীকার করেন, এবং যে বৈদিক গ্রন্থের পূর্ব্বে পৃথিবীতে অন্য গ্রন্থ প্রচারিত হয় নাই বলিয়া সকলেই মান্য করিয়া আসিতেছেন ;—সেই বৈদিক মন্ত্রের—বৈদিক গ্রন্থের উৎপত্তিস্থান কোথায় ? কৈ, এ পর্য্যন্ত কেহই তো ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য দেশে বেদের উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ

---

* এতদ্দেশীয় প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক এই মতের প্রধান পরিপোষক। পাশ্চাত্য কয়েক জন পণ্ডিতের সহিত এক-মত হইয়া তিনি এই কথাই আপন গ্রন্থপত্রে প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার প্রণীত *Orion, or Researches into the Antiquity of the Vedas*, এবং *The Arctic Home in the Vedas* গ্রন্থদ্বয়ে এই তত্ত্ব প্রমাণের জন্য তিনি বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন।

করিতে সমর্থ হন নাই! কি প্রাচ্য, কি পাশ্চাত্য, সকল পণ্ডিতেরই মতে—বেদ ভারতবর্ষেরই আদি-গ্রন্থ।* তাহাই যখন প্রতিপন্ন হইতেছে, তখন আর্য্য-হিন্দুগণের অবস্থানস্থান-নির্দ্দেশে অন্যত্র যাইবার কি প্রয়োজন? প্রত্যেক প্রাচীন জাতিরই পরিচয়-চিহ্ন—তাঁহাদের ভাষা ও পুরুষ-পারম্পারিক পরিচয়। আর্য্য-হিন্দুজাতির সেই ভাষা ও পুরুষ-পারম্পারিক পরিচয়—ভারত ভিন্ন অন্যত্র আর কোথায় পাওয়া যায়? যাঁহারা বলেন,—মধ্য-এসিয়ায়, উত্তর-মেরু প্রদেশে বা জর্ম্মণীর উত্তর-প্রান্তে আর্য্যগণের আদি-বাস ছিল, তাঁহারা কেহ কি তত্তৎপ্রদেশে আর্য্যগণের তদ্রূপ কোনও অতীত পরিচয়-চিহ্ন—ভাষা প্রভৃতির নিদর্শন—দেখাইতে পারেন? পৃথিবীতে যে কোনও জাতি কখনও উন্নতির উচ্চ-সোপানে আরোহণ করিয়াছে, দিগ্দগন্তে বিস্তৃত হইয়া পড়িলেও, তাহাদের আদি-বাসস্থানের এবং ভাষা-ভাবের কোনও-না-কোনও নিদর্শন আছেই আছে। যাঁহারা মধ্য-এসিয়া প্রভৃতিতে আর্য্যদিগের বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন, আর্য্যগণ-সম্বন্ধে তাঁহারা সে প্রমাণ কিছুই দেখাইতে পারেন না। উন্নতির উচ্চ-সোপানে আরোহণ করিয়া আপনাদের সংখ্যাধিক্য-হেতু যাঁহারা দেশে-বিদেশে উপনিবেশ-স্থাপন করেন এবং তত্তৎদেশে প্রতিষ্ঠাপন্ন হন, স্বদেশে—আপন জন্মভূমিতে তাঁহাদের কোনও-না-কোনও নিদর্শন অবশ্যই বিদ্যমান থাকে। অপিচ, উন্নত জাতি স্বদেশের সংস্রব কখনই ত্যাগ করিতে পারে না। একটা স্থূল দৃষ্টান্তেরই উল্লেখ করি না কেন? ইংরেজ-জাতি অধুনা উন্নতিশীল এবং দিনদিনই তাঁহাদের সংখ্যা-বৃদ্ধি হইতেছে। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী হইতে ইংরেজগণ পৃথিবীর নানা দেশে উপনিবেশ-স্থাপনে প্রবৃত্ত হন। এক্ষণে, আমেরিকায়, অষ্ট্রেলিয়ায়, আফ্রিকায়, এসিয়ায়—সর্ব্বত্র তাঁহাদের বসবাস আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু, তাই বলিয়া, তাঁহাদের স্বদেশের ও স্বজাতির পরিচয়-চিহ্ন কি লোপ পাইয়াছে? বরং বিদেশে উপনিবেশাধিক্য-হেতু তাঁহাদের আদি-স্থানে আদি-জাতির প্রতিষ্ঠাই বৃদ্ধি পাইতেছে। কেবল ইংরেজ বলিয়া নহে; ফরাসী, দিনেমার, ওলন্দাজ, জর্ম্মণ,—পাশ্চাত্য যে জাতির প্রতিই দৃষ্টিপাত করি না কেন, বিদেশে গিয়া উন্নতিলাভ করায়, সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই,—তাঁহাদের স্বদেশের মুখই উজ্জ্বল হইয়াছে। এমন কি, স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে এবং স্বদেশের সহিত সম্বন্ধ-বন্ধন-রক্ষণে তাঁহারা সদাই গৌরব-বোধ করেন। এরূপ ক্ষেত্রে, সুসভ্য আর্য্যহিন্দুগণ, জন্মভূমির স্মৃতি একেবারে বিস্মৃত হইয়া, বিদেশে গিয়া বিদেশের সহিত মিশিয়া যাইবেন,—ইহা কখনই সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। একটী উন্নতিশীল জাতি আপনাদের সংখ্যাধিক্য-হেতু আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই বিদেশে চলিয়া গেল—তাহাদের

---

* বেদ যে পৃথিবীর আদি-গ্রন্থ, পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণকেও তাহা স্বীকার করিতে হয়। বহু দেশের বহু ভাষার আলোচনা করিয়া, অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে,—ঋগ্বেদই সভ্যজগতের আদি-গ্রন্থ। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন,—"One thing is certain : there is nothing more ancient and primitive, not only in India, but in the whole Aryan world, than the hymns of the Rig Veda." —*Origin and Growth of Religion.* কেবল ম্যাক্সমুলার কেন;—যিনিই এ বিষয়ে অনুসন্ধান ও আলোচনা করিবেন, তাঁহাকেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে।

আদি-বাসস্থানে তাহাদের পরিচয়-চিহ্ন-রূপে একটী প্রাণীও বিদ্যমান রহিল না,—পৃথিবীর ইতিহাসে ইহা বড়ই বিচিত্র ও অসম্ভব ব্যাপার। সুতরাং, আর্য্যদিগের আদি-বাসস্থান 'আর্য্যাবর্ত্তের' অস্তিত্ব পরিচয় যখন একমাত্র এই ভারতবর্ষেই পাওয়া যাইতেছে, তাঁহাদের ভাষা ও সাহিত্যের প্রকৃষ্ট নিদর্শন—বেদ-বেদান্ত শাস্ত্র প্রভৃতি—এই ভারতবর্ষেই যখন বিদ্যমান রহিয়াছে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় যখন তাঁহাদেরই বংশধর বলিয়া পুরুষানুক্রমিক পরিচয় দিতে পারিতেছেন;—তখন ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য কোথায় আর তাঁহাদের আদিস্থান নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে?

ভারতবর্ষই আর্য্য-সভ্যতার আদিভূমি। ভারতবর্ষ হইতেই তাঁহারা দিগ্দিগন্তে দেশ-দেশান্তরে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন। পৃথিবীতে যখন বৈদিক ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য ধর্ম্মের অস্তিত্ব ছিল না; পৃথিবীতে যখন আর্য্যদিগের অপেক্ষা পরাক্রান্ত ও প্রবল-শক্তি-সম্পন্ন জাতি কেহই জন্মগ্রহণ করে নাই; সে সময়ে আর্য্য-হিন্দুগণই 'ধরণীর অধীশ্বর' নামে অভিহিত হইতেন। তখন, পৃথিবীর সকল দেশে সকল রাজ্যে তাঁহাদের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। এখন যেমন সমুদ্র-পারে গমন করিলে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের জাতি-পাত হয়; তখন পৃথিবীতে অন্য ধর্ম্মের অভ্যুদয় না হওয়ায়, তাঁহাদের সে আশঙ্কাও ছিল না। সুতরাং তখন অবাধে তাঁহারা পৃথিবীর সর্ব্বত্র গতিবিধি করিতে পারিতেন। আমরা শাস্ত্রাদিতে দেখিতে পাই,—আর্য্য-হিন্দুগণের সেই উন্নতির দিনে, তাঁহারা আমেরিকা-মহাদেশে অধিকার-বিস্তার করিয়াছিলেন, ইউরোপের প্রত্যেক প্রদেশে তাঁহাদের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল, আফ্রিকার দুরধিগম্য ভূ-খণ্ডও তাঁহাদের অবিদিত ছিল না। শাস্ত্রে দেখিতে পাই—স্বয়ম্ভুব মনুর * পুত্র প্রিয়ব্রত পৃথিবীকে সপ্তদ্বীপে বিভক্ত করিয়াছিলেন। জম্বু, প্লক্ষ, পুষ্কর, ক্রৌঞ্চ, শক, শাল্মলী, কুশ—এই সাত নামে সেই সপ্তদ্বীপ অভিহিত হইয়াছিল। এই সপ্তদ্বীপ এক্ষণে পর্য্যায়ক্রমে এসিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা, উত্তর আমেরিকা, আফ্রিকা, ইউরোপ, আণ্টার্কটিকা বা দক্ষিণ-মেরুর সন্নিহিত প্রদেশ ও অষ্ট্রেলিয়া এবং ওশেনিয়া নামে পরিচিত হয়। কোনও কোনও পাশ্চাত্য-পাণ্ডিতের এতদ্বিষয়ে যদিও মতদ্বৈধ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু স্থূলতঃ এই সপ্তদ্বীপে সমগ্র পৃথিবীকেই যে বুঝাইয়াছিল, তাহাতে কেহই সংশয় করিতে পারেন না। কর্ণেল উইলফোর্ড ভারতবর্ষকে জম্বু-দ্বীপ নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে, 'প্লক্ষ'-দ্বীপ অর্থে—এসিয়ার উত্তর ভাগ এবং সমগ্র আমেরিকা মহাদেশ; 'পুষ্কর' অর্থে—আয়র্লণ্ড; 'শক' অর্থে—বৃটিশ দ্বীপ-পুঞ্জ; ক্রৌঞ্চ অর্থে—জর্ম্মণী; 'শাল্মলী' অর্থে—আড্রিয়াটিক এবং বাল্টিক সাগরের সন্নিহিত দেশসমূহ; 'কুশ' অর্থে—ভারতবর্ষের পশ্চিম-সীমান্তস্থিত এবং কাস্পীয়ান সমুদ্র ও পারস্য

আর্য্য-হিন্দুর আধিপত্য-বিস্তার।

* এক এক মনুর নামানুসারে মন্বন্তর সূচনা হয়। শাস্ত্রে চতুর্দ্দশ মনুর উল্লেখ আছে; স্বয়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্ম্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি, ইন্দ্রসাবর্ণি। এই গ্রন্থের ৯ম পৃষ্ঠায় যে মন্বন্তরের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তদনুসারে এক্ষণে সপ্তম বা বৈবস্বত মনুর কাল চলিতেছে।

উপসাগরের সন্নিকটস্থ দেশ-সমূহ। যাহাই হউক, প্রিয়ব্রত কর্তৃক পৃথিবী সপ্তধা বিভক্ত এবং তৎসমুদায় আর্য্য-হিন্দুগণের অধিকারভুক্ত ছিল,—শাস্ত্র মানিতে গেলে, কোনক্রমেই তাহা অস্বীকার করা যায় না। রাজার ও রাজ-ভাষার পরিবর্ত্তনে জনপদাদির সংজ্ঞা ও পরিমাণ প্রভৃতির পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। আমাদের শাস্ত্রে ও পুরাণেতিহাসে যে দেশ যে নামে অভিহিত ছিল, সে দেশের সে নাম ও সে পরিচয় প্রায় লোপ পাইয়াছে। অনেক অনুসন্ধান করিলে, কচিৎ কোথাও কোনও দেশের ও কোনও নামের পূর্ব্ব-পরিচয় পাওয়া যায়। কালধর্ম্মে এরূপ বিলোপ-সাধন অবশ্যম্ভাবী। স্থূল দৃষ্টান্তেই এ তত্ত্ব বোধগম্য হইতে পারে। এ পর্য্যন্ত এই ভারতবর্ষেরই কত-না নাম-পরিবর্ত্তন সাধিত হইল! কখনও 'জম্বু-দ্বীপ', কখনও 'ভারতবর্ষ', কখনও 'হিন্দুস্থান'—শেষ এখন 'ইণ্ডিয়া'! আর্য্য-ঋষিগণের বেদনিনাদে যখন ভারতবর্ষ মুখরিত ছিল, তখন ইহার নাম ছিল—আর্য্যাবর্ত্ত; রাজা ভরতের রাজত্বকালে ইহার নাম হইয়াছিল—ভারতবর্ষ; মুসলমানগণের অধিকার-কালে—হিন্দুস্থান; আর এখন ইংরেজ-শাসনে—ইহার নাম হইয়াছে—'ইণ্ডিয়া'। * ভারতবর্ষের শুভাদৃষ্ট, তাই এত পরিবর্ত্তনের মধ্যেও এখনও তাহার অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু পৃথিবীতে এমন অনেক স্থান ছিল, যাহার পূর্ব্ব-পরিচয় এখন কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; বরং পুরাণাদিতে উল্লিখিত কোনও কোনও প্রাচীন-স্থানের পরিচয় অন্বেষণ করিতে গিয়া এখন নিয়তই অন্ধকারে ঘুরিতে হইতেছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্ব্বে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া পাণ্ডবগণ যে যে দেশ অধিকার করেন, মহাভারতের সভাপর্ব্বে তাহার বর্ণনা আছে। প্রথম যাত্রায়, তাঁহারা ব্রহ্ম, চীন, শ্যাম, তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, তাতার, পারস্য প্রভৃতি জয় করিয়া, হীরাট, কাবুল, কান্দাহার এবং বেলুচিস্থান দিয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাবৃত্ত হন। দ্বিতীয় যাত্রায়, লঙ্কা হইতে আরব, মিশর, জাঞ্জীবার এবং আফ্রিকার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আপনাদের বিজয়-নিশান উড্ডীন করেন। সগর রাজা দেশ-বিজয়ে বহির্গত হইয়া

---

* হিন্দু ও ইণ্ডিয়া শব্দদ্বয়ের উৎপত্তির একটু বিচিত্র ইতিহাস পাওয়া যায়। হিব্রু-ভাষায় "হনুদ্" শব্দের অর্থ,—বিক্রম, তেজ, গৌরব, শক্তি ইত্যাদি। হিব্রু-ভাষার 'এস্তার' গ্রন্থে লিখিত আছে,—"রাজা আহাসুরেশ হনুদ্ হইতে ইথিওপিয়া পর্য্যন্ত রাজত্ব করিতেন।" অর্থাৎ, তাঁহার রাজ্যের এক সীমায় ভারতবর্ষ এবং অপর সীমায় মিশর-দেশ অবস্থিত ছিল। ভারতবর্ষকে তাঁহারা 'হনুদ্' অর্থাৎ গৌরবান্বিত রাজ্য বলিয়া অভিহিত করিতেন। এই "হনুদ্" পারসীকদিগের 'জেন্দ আভেস্তা' গ্রন্থের "হিন্দব" শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। উহাই আবার গ্রীক-ভাষায় "হন্দকোশ" (Handkosh), "ইন্দিকোস" (Indikos) ও "ইণ্ডিওস" (Indios) প্রভৃতি শব্দে পরিণত হয়; আর তাহা হইতেই ইংরেজী ভাষার "ইণ্ডিয়া" (India) শব্দের উৎপত্তি। "পস্তু" ভাষায় "হিনদ্" ও "হনুদ্র" শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপে পারসীকদিগের নিকট হইতে ইহুদীগণ এবং তাঁহাদের নিকট হইতে অন্যান্য জাতি "হিন্দু" ও "ইণ্ডিয়া" শব্দ প্রাপ্ত হইয়াছেন। মূলতঃ, উভয় শব্দেরই অর্থ—পবিত্র গৌরবান্বিত জাতি। এখন, উহা যে অর্থেই ব্যবহৃত হউক, ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরিলে, হিন্দুগণ অতি-প্রাচীনকালে প্রাচীন-জাতিগণের নিকট সম্মানিত ও সমাদৃত ছিলেন,—এতদ্দ্বারা তাহাই বুঝা যায়। পারসীকগণের মতে,—তাঁহাদের 'জেন্দ আভেস্তা' সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ। কিন্তু সেই প্রাচীন গ্রন্থেই ভারতবর্ষ যখন "হনুদ্" বা গৌরবান্বিত রাজ্য বলিয়া অভিহিত, তখন ভারতবর্ষের গৌরব-গরিমা আরও যে কত প্রাচীন কালের,—সহজেই প্রতিপন্ন হয় না কি?

ভারত-মহাসাগরস্থিত ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করিয়াছিলেন—মহাভারতের আদি-পর্ব্বে তাহার উল্লেখ আছে। অর্জ্জুন কর্ত্তৃক পাটল-দেশ জয়, এবং নাগকন্যা উলুপীকে বিবাহ—এতৎপ্রসঙ্গে অর্জ্জুনের আমেরিকা অধিকারের কথাই প্রতিপন্ন হয়। রাম-সীতার পূজা-পদ্ধতি আমেরিকায় এবং ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে সেদিন পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল। অনুসন্ধান করিলে, এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, ভারতবর্ষের সহিত এক সময়ে সকল দেশেরই সংস্রব ছিল। এমন কি, যে উত্তর-মেরুর প্রসঙ্গে আর্য্যদিগকে উত্তর-মেরু-বাসী বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইয়া থাকে, সেই উত্তর-মেরু-প্রদেশও ভারতীয় আর্য্য-হিন্দুগণের অগম্য ছিল না। মহাভারতের বনপর্ব্বে পাণ্ডুরাজা কুন্তীর নিকট উত্তর-কুরুতে স্ত্রীজাতির অবস্থা বর্ণন করিয়াছিলেন। * এতদ্দ্বারাও বুঝা যায়, উত্তর-কুরুর বিষয়ে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা ছিল।

অভিজ্ঞতাই আদি-বাসের পরিচায়ক নহে।

ভারতীয় আর্য্য-হিন্দুগণ পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন;—পৃথিবীর সকল দেশের সর্ব্বত্রই তাঁহাদের গতিবিধি ছিল;—তাঁহাদের জ্ঞান-গরিমায় পাণ্ডিত্য-প্রভায় জগৎ উদ্ভাসিত হইয়াছিল;—ইহা অবিসম্বাদিত সত্য। এ সত্য স্বীকার করিলে, আর্য্য-হিন্দুগণের আদি-বাসস্থান সম্বন্ধে কদাচ কোনও সংশয়-প্রশ্ন উঠিতে পারে না। তাহা হইলে, মধ্য-এসিয়া বা উত্তর-মেরু হইতে তাঁহাদের আগমনের সকল যুক্তিই ফুৎকারে উড়িয়া যায়। ঋগ্বেদোল্লিখিত নদ-নদী বা নগর-জনপদাদির বিষয় তাঁহাদের গোচরীভূত ছিল বলিয়া, তাঁহাদের গ্রন্থে তৎসমুদায় স্থানলাভ করিয়াছে। তাঁহাদের গ্রন্থে কোনও নদনদী বা জনপদের নাম উল্লেখ আছে বলিয়া, সেই সেই নদনদী বা জনপদের মধ্যে তাঁহারা বসবাস করিতেন,—ইহা কিরূপে সিদ্ধান্ত হইতে পারে? উত্তর-মেরু-প্রদেশে ছয় মাস রাত্রি ও ছয় মাস দিন হইয়া থাকে,—এ তথ্য তাঁহারা অবগত ছিলেন। সেই অবগতি-হেতুই তাঁহারা যে সেই দেশের আদিম অধিবাসী হইবেন,—ইহাও কোনক্রমেই হৃদয়ঙ্গম হয় না। জ্ঞান-প্রভাবে, ভূয়োদর্শনে, বিভিন্ন দেশে গতিবিধি-সূত্রে, এবং বিভিন্ন ভূ-খণ্ডে রাজ্যাধিকার-বিস্তারের জন্য, আর্য্য-হিন্দুগণ পৃথিবীর সকল সমাচার অবগত ছিলেন,—এতৎপ্রসঙ্গে তাহাই বরং স্বীকার করিতে হয়। কোনও দেশের সাহিত্যে, ইতিহাসে বা ধর্ম্মগ্রন্থে, কোনও দূর-দেশের অবস্থা-বিবরণ বিবৃত হইলে, প্রথমোক্ত দেশবাসীদিগকে কি শেষোক্ত দেশের আদিম-অধিবাসী বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে? ইংরেজের ইতিহাসে বা ভূগোলে যদি কাম্‌স্‌কাট্‌কার একটী ক্ষুদ্র গ্রামের প্রাচীন কথা লিখিত থাকে, তাহা হইলে কি বলিতে হইবে,—ইংরেজের আদিপুরুষগণ কাম্‌স্‌কাট্‌কায় বসতি করিতেন? পাশ্চাত্য দেশ-সমূহের ভাষা-ভাবের সহিত আর্য্য হিন্দুগণের ভাষা-ভাবের যে কিছু কিছু সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতেই বা আমরা কি মনে করিতে পারি? একটী উন্নতিশীল

* বনপর্ব্বের সেই বর্ণনায় উত্তর-কুরু তখন অসভ্য দেশ ছিল বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। পাণ্ডুরাজা বলিয়াছিলেন,—"সে দেশের স্ত্রীগণ এখনও অনাবৃত আছে।" ইহাতে তদ্দেশের অসভ্যতাই সূচিত হয় না কি?

প্রাচীন জাতি পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে এককালে আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিয়া ছিল;—কালক্রমে তাহাদের সে প্রভাব বিলুপ্ত হইয়া আসিয়াছে;—উভয় জাতির ভাষা-ভাবের সাদৃশ্যে, তাহাই বরং প্রতিপন্ন হয়। কয়েক দিন পূর্ব্বে ইউরোপ-খণ্ডে রোমীয়গণের কি অমিত-প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল! স্পেন. ফ্রান্স, ইংলণ্ড.—তখন কে-না রোমীয়-ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন? কিন্তু এখন—সব গিয়াছে; আছে মাত্র স্মৃতি! ভাষার সহিত কতকগুলি রোমীয় (লাটিন) শব্দ মিশিয়া আছে; আচারে-ব্যবহারে অল্প-অল্প রোমীয় ভাব বিদ্যমান্ রহিয়াছে; আর সমস্তই বিলুপ্ত হইয়াছে। কত নিকটের, কয় দিন পূর্ব্বের, রোমের সম্বন্ধেই যখন এতদূর ব্যত্যয় ঘটিয়াছে; কত অতীতের, কত পুরাতন, ভারতীয় আর্য্য-হিন্দুগণের প্রভাব কতটুকু বিদ্যমান্ থাকিতে পারে,—সহজেই বুঝা যায় না কি? অধিকাংশ প্রাচীন সভ্য জাতির প্রতিষ্ঠা-সম্বন্ধে সেই সেই জাতির গ্রন্থ-পত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা কোনও এক বিশেষ সময়ে কোনও এক বিশেষ স্থান হইতে আসিয়া আপনাদের নূতন বাসস্থান প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষের আর্য্য-হিন্দুগণ যে অন্য দেশ হইতে আসিয়া আর্য্যাবর্ত্তে বসতি-স্থাপন করিয়াছিলেন. তাঁহাদের শাস্ত্রাদিতে সেরূপ উল্লেখ কিছুই নাই। বরং ভারতবর্ষ হইতেই তাঁহারা দিগ্দিগন্তে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন. শাস্ত্রাদিতে তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়। সুন্দর শ্বেত-মনুষ্যরূপে আর্য্যগণের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া, তাঁহারা যে অন্য দেশ হইতে আসিয়াছিলেন,—সে সিদ্ধান্তও সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ সাধারণতঃ সুরূপ-সম্পন্ন। ভারতবর্ষের হিমালয়ে, কাশ্মীর প্রভৃতি দেশে, শ্বেতবর্ণ সুন্দর মনুষ্যের অসদ্ভাব নাই। আর্য্য ঋষি-মহর্ষিগণ হিমালয়ের দুরধিগম্য গিরিগুহায় নিয়ত যোগ-মগ্ন থাকিতেন; কৈলাসে. হৃষীকেশে. বদরিকাশ্রমে—তাঁহাদের সে পুণ্য-স্মৃতি আজিও কতমতে বিদ্যমান্ রহিয়াছে। যদি শ্বেত-সুন্দর মনুষ্যই আর্য্যগণের আদর্শ-স্থান-ভূত হন.—সেই ঋষি-মহর্ষিগণ ভিন্ন তাঁহারা আর কে হইতে পারেন? স্বায়ম্ভুব মন্বাদি হইতেই আর্য্য-হিন্দুগণ আজিও আপনাদের বংশ-পরিচয় নির্ণয় করিয়া থাকেন? সে ক্ষেত্রে, অন্য কোনও স্থান হইতে আর্য্যগণের ভারতবর্ষ আগমনের কোনই সম্ভাবনা দেখা যায় না। শৈত্যাধিক্য-নিবন্ধন উত্তর-মেরু বাসের অযোগ্য হওয়ায়, আর্য্যগণ দক্ষিণাভিমুখে চলিয়া আসেন.—নৈসর্গিক অবস্থার বিষয় আলোচনা করিলেও সে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। পৃথিবীর আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতির বিষয় যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন, মেরু-প্রদেশে কখনই অত্যধিক উত্তাপ-বৃদ্ধি অর্থাৎ সূর্য্যের প্রখর কিরণ-বিস্তার সম্ভবপর নহে। অধুনা বৈজ্ঞানিকগণ পৃথিবীর গতির বিষয় যেরূপভাবে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তাহাতে কখনই যে মেরু-প্রদেশে সূর্য্যরশ্মিসম্পাতে শৈত্যাধিক্যের হ্রাস ঘটিয়াছিল, তাহা উপলব্ধি হয় না। সূর্য্যের প্রখর রশ্মি প্রধানতঃ বিষুব-সান্নিধ্যেই নিপতিত হয়। বিষুব-রেখা হইতে উত্তরে দক্ষিণে যে প্রদেশ যত দূরে অবস্থিত, তত্তৎপ্রদেশে তদনুরূপ সূর্য্যোত্তাপের হ্রাস-বৃদ্ধি ও শৈত্যাধিক্য হওয়া সম্ভবপর। মেরু-প্রদেশে কচিৎ সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করিয়া থাকে। পৃথিবীর গতি পূর্ব্বাপর সমভাবেই বিদ্যমান আছে—যদি মানিয়া

লই ; তাহা হইলে, মেরু-প্রদেশে কখনও যে চির-বসন্ত বিরাজমান ছিল এবং সেখানে কখনও যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জনগণ বসবাস করিতেন ;—তাহা কোনমতেই সপ্রমাণ হয় না। তবে যদি কেহ আপনার মত-প্রতিষ্ঠার জন্য পৃথিবীর গত্যন্তর নির্দ্দেশ করেন ;—অর্থাৎ, পৃথিবীর আবর্ত্তন পূর্ব্ব-পশ্চিমে না হইয়া উত্তর-দক্ষিণে হইত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে সাহসী হন ;—সে এক স্বতন্ত্র কথা! কিন্তু সেরূপ অপূর্ব্ব যুক্তিজাল এ পর্য্যন্ত কেহ কখনও বিস্তার করেন নাই ; কোনও গ্রন্থপত্রেও তাহার উল্লেখ দেখিতে পাই না ; বৈজ্ঞানিকগণের সিদ্ধান্তেও তাহা প্রতিপন্ন হয় না। আরও, বেদাদি গ্রন্থে মেরু-প্রদেশের যে বর্ণনাভাস দৃষ্ট হয় ; এত কাল পরে—এখনও, সে প্রদেশের সেই অবস্থাই দেখিতে পাই। তখনও যাহা ছিল, এখনও যদি তাহাই রহিল, এতকালেও যদি কোনও পরিবর্ত্তন ঘটিল না ; তবে কি প্রমাণে, মেরু-প্রদেশের অন্য অবস্থা ছিল, স্বীকার করিয়া লইতে পারি? বেদে শৈত্যাধিক্যের বর্ণনা আছে—এই কথা বলিয়া যাঁহারা আর্য্যগণের উত্তর-মেরু-বাস সিদ্ধান্তে উপনীত হন, দুইটী প্রসঙ্গের অবতারণায় তাঁহাদের সে সিদ্ধান্ত ভ্রমসঙ্কুল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। প্রথমতঃ, বেদে অত্যধিক শৈত্যের বর্ণনা নাই। দ্বিতীয়তঃ, শৈত্যাদির যেরূপ উল্লেখ আছে, শরৎ ও হেমন্তাদি সম্বন্ধেও সেইরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আরও, শীতের উল্লেখ আছে বলিয়াই যদি উত্তর-মেরু-বাস সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় ; তাহা হইলে, বেদে যে যে ঋতুর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাইবে, সেই সেই ঋতুপ্রধান স্থানেই তো আর্য্য-জাতির আদি-বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে? তাহা হইলে, তাঁহাদের আদি-বাস-স্থানের কোনও মীমাংসা—কখনও হওয়া সম্ভবপর কি? তবে, শীত, হেমন্ত, শরৎ, বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা—এই নানা ঋতুর উল্লেখ * থাকায় আমরা কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি? ইহাতে বুঝা যায় না কি,—তাঁহারা এমন এক দেশে বাস করিতেন—যে দেশে সর্ব্ব-ঋতুই সমভাবে বিদ্যমান ছিল! যদি তাহাই হয়, সে দেশও এই ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য আর কোথায় সম্ভবপর? বিভিন্ন ঋতুর এমন একত্র সমাবেশ,—পৃথিবীর আর কোথায় আছে? ফলতঃ, ঋতু প্রভৃতির বর্ণনার বিষয় আলোচনা করিলেও, ভারতবর্ষই আর্য্য-হিন্দুগণের আদি-বাসস্থান বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। বেদাদি-গ্রন্থে মেরু-প্রদেশের যে বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ শৈত্যাধিক্য এবং ছয় মাস রাত্রি ও ছয় মাস দিন—মেরু-প্রদেশে যখন আজিও বিদ্যমান ; তখন, সম-অবস্থা-সত্ত্বেও, সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া আসিবার তাঁহাদের কি হেতুবাদ ছিল? 'জেন্দ আভেস্তার' উক্তি স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া মানিতে হইলেও, তাহাতে মাত্র প্রতিপন্ন হয়,—পারসীকগণের কোনও আদি-পুরুষ উত্তর-মেরু প্রদেশে বসবাস করিতেন। কিন্তু তাহাতে কখনই এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, আর্য্য-হিন্দুদিগের আদিপুরুষগণ সেই মেরু-প্রদেশ হইতে এদেশে আগমন করেন। এদেশবাসীর মধ্যে যাঁহারা আর্য্যগণের উত্তর-মেরু-বাস সিদ্ধান্তের পরিপোষক, তাঁহাদের প্রধান-স্থানীয় শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলকের মত,—"খৃষ্ট-জন্মের দশ সহস্র হইতে আট

---

* ঋগ্বেদের ৭ম মণ্ডলে শরৎ ঋতুর, ৬ষ্ঠ ও ৫ম মণ্ডলে হেমন্ত ঋতুর, ১০ম মণ্ডলে গ্রীষ্ম ও বসন্ত ঋতুর এবং নানা স্থানে শীত ঋতুর প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়।

সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে শৈত্যাধিক্যে উত্তর-মেরু-বাসের অযোগ্য হইয়াছিল। সেই সময়, আট সহস্র হইতে পাঁচ সহস্র পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের মধ্যে, আর্য্যগণ উত্তর মেরু পরিত্যাগ করিয়া বিভিন্ন স্থানে গমন করেন।" তিলকের মতে,—"বৈদিক মন্ত্র-সমূহ খৃষ্টজন্মের সাড়ে চারি হাজার বৎসরের অধিক পূর্ব্বে বিরচিত হয় নাই।" এই সকল কথা বলিয়া, তিনি প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন,—"বৈদিক মন্ত্রে মেরু-প্রদেশের যে বর্ণনাভাস পাওয়া যায়, তাহা আর্য্যগণের পূর্ব্ব-স্মৃতির নিদর্শন।" বলা বাহুল্য, তিলক আর্য্যগণের মেরু-প্রদেশ পরিত্যাগের যে কাল-পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা প্রধানতঃ মার্কিণের ও ইউরোপের কয়েক জন পাশ্চাত্য-পণ্ডিতের মতের প্রতিধ্বনি মাত্র। * কিন্তু সেই সকল মতকে ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করিয়া, বৈদিক-মন্ত্রের কালনির্দ্দেশ করা এবং আর্য্যগণের উত্তর-মেরু-বাসের সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া,—কতদূর যুক্তিযুক্ত হইয়াছে, সামান্য আলোচনাতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। মেরু-প্রদেশের আভাস বৈদিক গ্রন্থে পাওয়া যায় বলিয়া, তৎসহ আর্য্যগণের মেরু-প্রদেশ-বাসের পূর্ব্ব-স্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে বুঝিতে হইবে,—ইহা বড়ই অদ্ভুত সিদ্ধান্ত! স্বয়ং তিলকের সিদ্ধান্তেই দেখা যায়,—মেরু-প্রদেশ ত্যাগের অন্যূন সাড়ে চারি হাজার বৎসর পরে বৈদিক সূক্ত বিরচিত হইয়াছিল। তাহাই যদি হয়, সাড়ে চারি হাজার বৎসর পরে পূর্ব্ব-স্মৃতি কিরূপে প্রস্ফুটিত হইতে পারে? যাঁহারা উত্তর-মেরু পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহারা কি সাড়ে চারি হাজার বৎসর পরেও জীবিত ছিলেন যে, সেই স্মৃতি হৃদয়ে এতকাল পোষণ করিয়া রাখিয়া পরিশেষে তাহার অভিব্যক্তি করিলেন? উত্তর-মেরু ত্যাগের ও বেদ-রচনার মধ্যবর্ত্তী যে সুদীর্ঘ সাড়ে চারি হাজার বৎসর অতীত হইল, সেই সময়ে তাঁহারা যে নানারূপ কষ্ট সহ্য করিয়া নানাদেশে ঘুরিয়া বেড়াইলেন;—তাহার কোনও নিদর্শন রহিল না; অথচ, যত কিছু নিদর্শন রহিল—তৎপূর্ব্ব কালের! ইহা বিচিত্র নহে কি? সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারেই যদি সকল কথা মানিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে এ সকল সংশয়-প্রশ্নে কখনও উপেক্ষা করা যায় না। এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, দাক্ষিণাত্যের কতকগুলি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আপনাদিগকে ঋগ্বেদীয় ঋষিগণের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা কেহই নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইতে পারেন না—তাঁহাদের পূর্ব্ব-বাস কোথায় ছিল? এই ভারতবর্ষেরই—আর্য্যাবর্ত্তের কোনও এক নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে দাক্ষিণাত্যে গমন করিয়া, কয় দিনের মধ্যেই তাহার পূর্ব্ব-স্মৃতি বিস্মৃত হইয়া গেলেন;—আর সাড়ে চারি হাজার বৎসর পরেও সেই সুদূর উত্তর-মেরু-প্রদেশের পূর্ব্বস্মৃতি স্মরণ রহিল—ইহা বড়ই আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয় না কি? ভারতবর্ষের এক স্থানের সহিত অন্য স্থানের সম্বন্ধ-সংস্রব কখনই বিচ্ছিন্ন হয় নাই; সকল প্রদেশে সকলেরই গতিবিধি সর্ব্বথা অক্ষুণ্ণ আছে। এ অবস্থায়, ভারতবর্ষের অধিবাসী

*আমেরিকার বোষ্টন-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্ট ডাক্তার ওয়ারেণ, উত্তর-মেরু সম্বন্ধে যে গ্রন্থ রচনা করেন, তাহা হইতেই প্রথমে তিলকের মনে ঐ চিন্তার উদয় হয়। তাহার পর মিঃ জিলবার্ট, মিঃ উইস্কেল, অধ্যাপক স্পেন্সার প্রভৃতি মার্কিণ পণ্ডিতগণের এবং অধ্যাপক গিকি, মিঃ মালার্ড রিড (ইংলণ্ডে) মনষ্ট্রার্ট জেরাফ (নরওয়ে) প্রভৃতির মত আলোচনা করিয়াও তিনি ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

ব্রাহ্মণ-সন্তান, ভারতবর্ষেরই এক প্রদেশে গমন করিয়া, অল্প মাত্র ব্যবধানে থাকিয়াও, সে স্মৃতি বিস্মৃত হইলেন; আর, কোন্ দূর অতীত কালে, কোন্ সুদূর উত্তর-মেরু পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া, আর্য্যগণ সেই স্মৃতির পরিচয় দিতে পারিলেন,—ইহার অধিক আশ্চর্য্য আর কি হইতে পারে? জর্ম্মণী, স্কাণ্ডেনেভিয়া বা পোলাণ্ড হইতে আর্য্যগণের দেশে-বিদেশে বিস্তৃতির বিষয় যাঁহারা সিদ্ধান্ত করেন, প্রধানতঃ নানা দেশের ভাষার সহিত ঐ সকল দেশের ভাষার সাদৃশ্য উপলব্ধি করিয়াই তাঁহারা উক্তরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকেন। কিন্তু যেরূপভাবে ভাষার সাদৃশ্য হওয়া উচিত ছিল, ম্যাক্সমুলার প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মতে, সেরূপ সাদৃশ্য দেখা যায় না। স্কাণ্ডেনেভিয়া প্রভৃতি—সমুদ্র-তীরবর্ত্তী দেশ; ঐরূপ সমুদ্র-তীরবর্ত্তী দেশ হইতে কোনও সভ্যজাতি যদি দূর-দূরান্তরে বিস্তৃত হইয়া পড়িত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ঐ সকল দেশের কোনও-না-কোনও সামুদ্রিক শব্দের বা মৎস্যাদির সংজ্ঞার সহিত অন্য দেশের তদ্রূপ শব্দের মিল থাকিত। যাহা বিশেষত্ব, তাহার সহিত কোন্ দেশের কতটুকু সাদৃশ্য বিদ্যমান,—তাহা দেখিয়াই তো মৌলিক-তত্ত্ব নির্ণয় করিতে হইবে! কিন্তু স্কাণ্ডেনেভিয়াদির সহিত অন্যান্য দেশের শব্দের সেরূপ সাদৃশ্য কিছুই দেখা যায় না। সাদৃশ্য—কতকগুলি পশুপক্ষীর ও জীবজন্তুর নামের সহিত। সে সাদৃশ্য—পৃথিবীর অনেক দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তদ্দ্বারা স্কাণ্ডেনেভিয়া প্রভৃতি দেশে কোনক্রমেই আর্য্যদিগের আদি-বাসস্থান নির্ণীত হইতে পারে না। অতএব, যখন অন্য কোনও দেশ হইতে আর্য্য-হিন্দুগণের এ দেশে আগমনের কোনই প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না,—সকলেই যখন কেবল অনুমান-সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়াই আর্য্যদিগের আদি-বাসস্থানের এক এক অভিনব কল্পনায় উপনীত হইয়াছেন; অথচ, যখন দেখিতে পাওয়া যায়,—ভারতবর্ষের 'আর্য্যাবর্ত্তের' সহিত তাঁহাদের কীর্ত্তি-স্মৃতি চির-বিজড়িত রহিয়াছে, এবং ভারতবর্ষ হইতেই তাঁহারা পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উপনিবেশ-স্থাপনে আধিপত্য-প্রতিষ্ঠায় বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন; তখন ভারতবর্ষেই যে তাঁহাদের আদি-বাসস্থান ছিল, তাহা কোনও মতেই অস্বীকার করিতে পারা যায় না।

যখন ভারতবর্ষেই আর্য্যগণের আদিমবাসস্থান নির্ণীত হইল; দেখা যাউক, ভারতবর্ষের কোন্ স্থানে তাঁহারা বসবাস করিতেন। তাঁহাদের আদি-বাসস্থানের পরিচয় পাওয়া যায়—'আর্য্যাবর্ত্ত'। আর্য্যাবর্ত্ত শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরিলেও, —"আর্য্যাঃ শ্রেষ্ঠা আবর্ত্তন্তে পুণ্যভূমিত্বেন বসন্ত্যত্র"—পুণ্যভূমি-হেতু আর্য্যগণ যেখানে বাস করিয়াছিলেন, তাহাকেই আর্য্যাবর্ত্ত বলে।

আর্য্যাবর্ত্ত।

কুল্লুক ভট্ট আর্য্যাবর্ত্ত শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন;—"আর্য্যা অত্রাবর্ত্তন্তে পুনঃ পুনরুদ্ভবন্তীত্যার্য্যাবর্ত্তঃ।" অর্থাৎ, আর্য্যেরা এইস্থানেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করেন, এইজন্য এইস্থান আর্য্যাবর্ত্ত নামে অভিহিত। ফলতঃ, আর্য্যগণের আদিবাসের জন্য যে এই স্থান আর্য্যাবর্ত্ত সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে, নানারূপে তাহা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু সে আর্য্যাবর্ত্ত কোথায়? মহর্ষি মনু আর্য্যাবর্ত্তের এইরূপ সীমা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন;—

"যাহার পূর্ব্বে ও পশ্চিমে সমুদ্র বিদ্যমান, উত্তর ও দক্ষিণে পর্ব্বতমালা বিরাজমান, সেই পুণ্যভূমিই আর্য্যাবর্ত্ত।" * ইহাতে প্রতিপন্ন হয়,—উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল, পূর্ব্বে ও পশ্চিমে ভারত-মহাসাগরের অন্তর্গত বঙ্গোপসাগর ও আরব-সমুদ্র,—এই চতুঃসীমার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশই আর্য্যাবর্ত্ত। রামায়ণের আদিপর্ব্বে সগর রাজার যজ্ঞ বর্ণন উপলক্ষে আভাসে আর্য্যাবর্ত্তের পরিচয় আছে। তাহাতেও বুঝা যায়,—হিমালয় ও বিন্ধ্য-পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী স্থানেই আর্য্যদিগের বাসস্থান ছিল। † অমর-কোষে লিখিত আছে, 'বিন্ধ্য ও হিমালয় পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী দেশ আর্য্যাবর্ত্ত অর্থাৎ আর্য্যদিগের বাসস্থান।' ‡ এই আর্য্যাবর্ত্ত আবার ব্রহ্মাবর্ত্ত, ব্রহ্মর্ষি দেশ, মধ্যদেশ প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত ছিল। স্বরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ—ব্রহ্মাবর্ত্ত ; কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পাঞ্চাল ও সুরসেন প্রভৃতি দেশ—ব্রহ্মর্ষি দেশ ; হিমালয় ও বিন্ধ্যের মধ্যে এবং বিনশনের পূর্ব্বে ও প্রয়াগের পশ্চিমে যে দেশ, তাহাই মধ্যদেশ নামে অভিহিত হইত। § যাহা হউক, এই আর্য্যাবর্ত্তের অবস্থান-স্থান-সম্বন্ধেও নানা-জনের নানা মত দৃষ্ট হয়। তাহাতে এক এক সময়ে ভারতবর্ষের সীমা-পরিমাণ অধিকতর বিস্তৃত ছিল বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। 'বামন-পুরাণে' জম্বু-দ্বীপ বা ভারতবর্ষের যে বর্ণনা আছে, তাহাতে প্রতিপন্ন হয়,—উত্তরে তুরস্ক পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সীমানা বিস্তৃত ছিল। মহর্ষি মনুর নির্দ্দিষ্ট "আর্য্যাবর্ত্তের" সীমার ব্যাখ্যায় কেহ কেহ বলেন,—পূর্ব্বে চীনসমুদ্র এবং পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর পর্য্যন্ত আর্য্যাবর্ত্তের বিস্তৃতির সম্ভাবনা। গ্রীক ঐতিহাসিক 'আরিয়ান' বলেন,—"ভারতবর্ষের সীমানা—উত্তরে তরাস পর্ব্বতমালা। উহা সাইলেসিয়া, লাইসিয়া, পাম্ফেলিয়া প্রভৃতি দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।" তরাস-গিরিশ্রেণী—এসিয়া মহাদেশের তুরস্ক-রাজ্যে অবস্থিত। তরাস হইতে ককেশাস এবং ককেশাস পর্ব্বত হইতে হিমালয় পর্ব্বতের উত্তর পর্য্যন্ত, আরিয়ানের মতে, ভারতবর্ষের সীমানা ছিল। তাহা হইলে, আরব, পারস্য ও তুরস্কের কিয়দংশ এবং মধ্য-এসিয়ার বহুদূর পর্য্যন্ত (আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থান সহ) ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত থাকা সম্ভবপর। চীন, পারসীক, পারদ, দরদ, হূণ প্রভৃতি জাতি ভারতবর্ষের সীমানার সন্নিকটে বাস করিত,—মনুসংহিতায় তাহার উল্লেখ দেখা যায়। আরিয়ান এবং মনুর মত মিলাইয়াই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ভারতবর্ষের তথা আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বোক্তরূপ সীমানা নির্দ্ধারণ করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। গ্রীক ঐতিহাসিক 'টলেমীর' মতে আর্য্যাবর্ত্তের সীমানা মধ্য-এসিয়ার

---

* মনুসংহিতায় আর্য্যাবর্ত্তের সীমা এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—

"আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্বুধাঃ॥"

মেধাতিথি মনুর উক্ত শ্লোকের এইরূপ ভাষ্য করিয়া গিয়াছেন,—"পর্ব্বতয়োর্হিমবদ্বিন্ধ্যয়োর্যদন্তরং মধ্যং সঃ আর্য্যাবর্ত্তো দেশো বুধৈঃ শিষ্টৈরুচ্যতে।"—মনু, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২১শ শ্লোক, মেধাতিথির ভাষ্য।

† আদিপর্ব্ব, ৩৯শ অধ্যায়, ৪-৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

‡ "আর্য্যাবর্ত্তঃ পুণ্যভূমি মধ্যং বিন্ধ্যহিমালয়োঃ।"

§ মনুসংহিতা, দ্বিতীয় অধ্যায়, ১৭-২২ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সে হিসাবে উহার উত্তরে ব্যাক্ট্রিয়া, পশ্চিমে পার্থিয়া বা পারস্য এবং পূর্ব্বে আরাকান ও ব্রহ্মদেশ প্রভৃতির বিদ্যমানতা বুঝিতে পারা যায়। এ বিষয়ে অবশ্য বলিবার কথা যথেষ্ট আছে। উন্নতিশীল আর্য্য-গণ সময়ে সময়ে আপনাদের রাজ্যের সীমা-পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, পারিপার্শ্বিক দেশ-সমূহ জয় করিয়া তৎসমুদায়কে আপনাদের সীমান্তভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন,—ইহা বিচিত্র নহে। কিন্তু তাই বলিয়া, আর্য্যসভ্যতার আদিক্ষেত্র আর্য্যাবর্ত্তই যে অতদূর বিস্তৃত ছিল, তাহা কোনক্রমেই প্রতিপন্ন হয় না। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ প্রাচীন রোম-সাম্রাজ্যের বিষয় উল্লেখ করিতেছি। রোম-সাম্রাজ্য যখন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তখন তাহার সীমা-পরিমাণ কতটুকু ছিল, আর তাহার উন্নতির যুগে সে সীমা-পরিমাণ কতদূর পর্য্যন্ত পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল,—কে না তাহা অবগত আছেন? সম্রাট অগাষ্টাসের সময়, রোম-সাম্রাজ্যের যে সীমানা নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়,—পশ্চিমে আট্লাণ্টিক মহাসাগর;—উত্তরে ইংলিশ চ্যানেল, রাইন নদী, ডানিয়ুব নদী, কৃষ্ণসাগর ও ককেশস পর্ব্বত;—পূর্ব্বে আর্ম্মেণীয় পর্ব্বত, তাইগ্রীস নদী ও আরব মরুভূমি;—দক্ষিণে আফ্রিকার সাহারা মরুভূমি;—এই চতুঃসীমান্তর্গত প্রদেশ রোম-সাম্রাজ্য নামে অভিহিত হইত। কিন্তু, তাহা হইলেও, রোমের উৎপত্তিস্থান বা আদিক্ষেত্র-সম্বন্ধে কখনই মতদ্বৈধ দেখিতে পাওয়া যায় না। সেইরূপ, সময়ে সময়ে, ভারতবর্ষের সীমানা বিস্তৃত হইলেও, তদ্দ্বারা কোনমতেই সপ্রমাণ হয় না—আর্য্য-সভ্যতার আদি স্থান অন্যত্র ছিল! আর্য্য-হিন্দুগণ নানা দিগ্দেশে আধিপত্য-বিস্তার করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহাদের আদি-কেন্দ্রক্ষেত্র কি অন্যত্র সরিয়া পড়া সম্ভবপর? ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছে বলিয়াই কি, ভারতবর্ষ ইংরেজজাতির আদি-বাসভূমি হইতে পারে? ফলতঃ, হিমালয় ও বিন্ধ্যগিরির মধ্যবর্ত্তী প্রদেশেই আর্য্যাবর্ত্তের অবস্থান ছিল, এবং এখনও এই প্রদেশ আর্য্যাবর্ত্ত-নামেই পরিচিত হইয়া থাকে।

আর্য্যাবর্ত্তের আর্য্য-হিন্দুগণই যে পৃথিবীর আদিম সভ্য-জাতি, আরও নানাপ্রকারে তাহা প্রতিপন্ন হয়। পৃথিবীর আদি-গ্রন্থ ঋগ্বেদ-সংহিতায় পুনঃপুনঃ আর্য্য-শব্দের উল্লেখ আছে। আর্য্যগণ যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্রতী রহিয়াছেন, আর্য্যগণ ইন্দ্রাদি দেব-গণের নিকট বরপ্রার্থনা করিতেছেন, আর্য্যগণ আর্য্যেতর জাতির নিধন-সাধনে চেষ্টা পাইতেছেন,—ঋগ্বেদের বহুতর স্তোত্রে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়।* ঋগ্বেদে আর্য্যগণের এইরূপ পরিচয়ে—আর্য্যগণ যে এই আর্য্যাবর্ত্তেরই আর্য্য-হিন্দু, তাহা বিশেষরূপে প্রমাণিত হয় না কি? আর্য্য শব্দের অর্থ—'মহাকুলকুলীনার্য্য-সভ্যসজ্জনসাধবঃ" (ইত্যমরঃ); "আরাজ্জাতাস্তত্ত্বেভ্য ইত্যার্য্যা, আর্য্যামতির্যস্য স আর্য্য-মতি" (ইতি বাচস্পতি মিশ্রঃ); "কর্ত্তব্যমাচরণ কামকর্ত্তব্যমনাচরণ, তিষ্ঠতি প্রকৃতাচারো যঃ স আর্য্য ইতি স্মৃতঃ।" যিনি মহাকুল, কুলীন, সজ্জন, সাধু; যিনি আর্য্যমতি অর্থাৎ বিশুদ্ধ তত্ত্বনিচয়ের নিকটবর্ত্তী শ্রেষ্ঠবুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি; যিনি কর্ত্তব্যপরায়ণ, অকর্ত্তব্য-

আর্য্য ও অনার্য্য।

*ঋগ্বেদের প্রথম, তৃতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ প্রভৃতি মণ্ডলে 'আর্য্য' জাতির উল্লেখ আছে।

বিমুখ, আচারবান, তিনিই আর্য্য-নামে অভিহিত। স্থূলতঃ, যাঁহারা সর্ব্বগুণাধার ছিলেন, তাঁহারাই আর্য্য-নামে অভিহিত হইতেন। অধিক কি,"আর্য্য ঈশ্বরপুত্রঃ"—আর্য্য-শব্দের অর্থ ঈশ্বর-পুত্র,—যাস্ক আপন বেদব্যাখ্যান 'নিরুক্ত'-গ্রন্থে আর্য্যদিগকে এতাদৃশ উচ্চ আসন প্রদান করিয়া গিয়াছেন। আর্য্যদিগকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরপুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিবার কারণও যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবৎ-সন্নিকর্ষ লাভের জন্যই তাঁহারা তন্ময় হইয়া ছিলেন, সাংসারিক সুখদুঃখে তাঁহারা কখনই বিচলিত হইতেন না,—ঈশ্বর-পুত্ররূপে অভিহিত হইবার ইহাই হেতুভূত নহে কি? ভারতীয় আর্য্য-হিন্দুগণ এক সময়ে পৃথিবীর নানা স্থানে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিলেন,—আর্য্য-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থে তাহা প্রতিপন্ন হয়। আর্য্যশব্দ "ঋ" ধাতু (ঋ—ণ্যৎ) হইতে উৎপন্ন। 'ঋ' ধাতুর অর্থ—'গমন', 'ব্যাপ্তি'। সায়নাচার্য্য সেই ধাত্বর্থ-অনুসারে আর্য্য-শব্দের অর্থ করিয়াছেন—অরণীয় বা গন্তব্য। যাঁহারা নানা স্থানে গমন করিয়া আপনাদের কীর্ত্তিকেতন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন,—এই অর্থে আর্য্য-শব্দে তাঁহাদিগকেই বুঝায়। * তবে, এক্ষণে একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে,—'পৃথিবীতে কি কখন আর্য্যজাতি ভিন্ন অন্য জাতির অস্তিত্ব ছিল না?' সেরূপ কথা আমরা বলি না; শাস্ত্রাদিতেও নাই। সুতরাং আর্য্য ভিন্ন অপরাপর জাতিকে প্রধানতঃ আর্য্যেতর বা 'অনার্য্য' সংজ্ঞায় অভিহিত করা যাইতে পারে। বেদে তাহারা কখনও দস্যু, কখনও বা দাস নামে পরিচিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী অন্যান্য শাস্ত্রে তাহাদের নানা নাম দৃষ্ট হয়। সে হিসাবে, পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের অধিবাসিগণ সকলেই অনার্য্য পর্য্যায়ভুক্ত ছিল। মধ্য-এসিয়া বা উত্তর-মেরুর কোনও কেন্দ্র-স্থান হইতে আর্য্যগণ যদি পৃথিবীর চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেন;—তাহা হইলে, 'আর্য্য' ও 'অনার্য্যের' সংজ্ঞা এইরূপ ভাবে কখনই নির্দ্দিষ্ট হইত না; তাহা হইলে, একই বংশ-সমুদ্ভূত ব্যক্তিগণের জ্ঞান-বুদ্ধি আচার-ব্যবহারের এতাধিক তারতম্যও দৃষ্ট হইত না; তাহা হইলে, ভারতে 'ঋগ্বেদাদি' শাস্ত্র-নিচয় প্রবর্ত্তিত হইবার সহস্র সহস্র বৎসর পরে পৃথিবীর অন্য দেশে ভাষা-সাহিত্যের উদ্ভব হইত না; আর তাহা হইলে, একই সময়ে এক দেশ সভ্য-সমুন্নত এবং অপর দেশ অজ্ঞানান্ধকারে সমাবৃত থাকিত না। ইউরোপের সভ্যতা কয় দিন পূর্ব্বে সূচিত হইয়াছে, আর ভারতবর্ষের সভ্যতা কতকাল অব্যাহত আছে, পাশ্চাত্য জাতি-সমূহের সিদ্ধান্ত মানিত হইলেও, আকাশ-পাতাল সময়ের ব্যবধান দৃষ্ট হয়। যদি একই সময়ে একই জাতি ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িত, তাহা হইলে ভারতবর্ষেই বা সর্ব্বাগ্রে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উজ্জ্বল বিভা বিকীর্ণ হইবে কেন, আর অন্যান্য দেশই বা ভারতবর্ষের এত পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে কেন?

---

* ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা কিন্তু আর্য্য শব্দের অন্যরূপ অর্থ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের অর্থানুসারে আর্য্যেরা "কৃষক" পর্য্যায়ভুক্ত। তাঁহারা বলেন—"অর" ধাতু হইতে আর্য্য-শব্দ নিষ্পন্ন এবং "অর" ধাতুর অর্থ 'ভূমিকর্ষণ'; অর্থাৎ ভূমিকর্ষণ বা কৃষিকার্য্য যাঁহাদের জীবিকা ছিল, তাঁহারাই 'আর্য্য' নামে পরিচিত। প্রাচীন লাটীন ও গ্রীক ভাষায় 'অর' (AR) ধাতুর অর্থ—'কর্ষণ'। ইউরোপের অধিকাংশ ভাষায় 'অর্' ধাতু ঐ অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং 'আর্য্য'-শব্দেরও তাঁহারা ঐরূপ অর্থ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ইহা যে কিরূপ ভ্রমসঙ্কুল, সামান্য আলোচনাতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। সংস্কৃতে 'অর' নামে কোনও ধাতু নাই। পরন্তু 'আর্য্য'-শব্দ 'ঋ' ধাতু হইতে উৎপন্ন। এরূপ ক্ষেত্রে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত যে কোনক্রমেই স্বীকার করা যায় না, তাহা বলা বাহুল্য।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বেদ-চতুষ্টয়।

[শাস্ত্রই হিন্দুর ইতিবৃত্ত ;—বেদ অপৌরুষেয়,—বেদের অর্থ,—ঋক, যজু, সাম, বেদের তিনটী অঙ্গ ;—বেদের রচয়িতা সম্বন্ধে আলোচনা ;—বেদ-বিভাগে বেদব্যাস ও অথর্ব্ব ঋষির প্রসঙ্গ ;—বেদের সময়-সম্বন্ধে নানা জনের নানা মত ;—ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্ব্বেদ, অথর্ব্ববেদ ;—বেদোক্ত দেবতা ও ঋষিগণ ;—বেদোক্ত ধর্ম্ম ;—বৈদিককালের আচার-ব্যবহার, সভ্যতা প্রভৃতি ;—বেদে জাতিভেদ ;—বেদ হইতেই অন্যান্য শাস্ত্রের উৎপত্তি ;—বৈদিক ধর্ম্মই সকল দেশের সকল ধর্ম্মের ভিত্তি-স্থানীয়।]

আর্য্য-হিন্দুগণের পরিচয়—তাঁহাদের শাস্ত্রগ্রন্থনিচয়। বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থে তাঁহারা চিরপরিদৃশ্যমান রহিয়াছেন। তাঁহাদের আচার-ব্যবহার, ধর্ম্ম-কর্ম্ম, রীতি-নীতি—সকলেরই নিদর্শন শাস্ত্রাদিতে জাজ্বল্যমান। তাঁহারা কি প্রণালীতে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন ; কি প্রকারে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনায় তাঁহাদের জীবন অতিবাহিত হইত ; কি প্রকারে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল ; আর কি প্রকারেই বা তাঁহারা ইহলৌকিক সকল সুখের অধিকারী হইয়াছিলেন ;—শাস্ত্রাদিতে তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। তাঁহাদের সমাজ-বন্ধন কিরূপ ছিল ; তাঁহারা কি নিয়মে ধর্ম্ম-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন ;—তাঁহাদের মহত্ত্ব, বীরত্ব, মনুষ্যত্ব প্রভৃতির সকল পরিচয়ই শাস্ত্রমধ্যে নিহিত রহিয়াছে। শাস্ত্রই তাঁহাদের পুরাবৃত্ত ; শাস্ত্রই তাঁহাদের ইতিহাস ; শাস্ত্রই তাঁহাদের চরিত্র-চিত্র। শাস্ত্র-তত্ত্ব বুঝিতে পারিলেই তাঁহাদিগকে বুঝিতে পারা যায়।

শাস্ত্রই পরিচয়-চিহ্ন।

শাস্ত্রের আদিভূত—বেদ। ধর্ম্ম ও ব্রহ্ম প্রতিপাদক অপৌরুষের বাক্য—বেদ। ব্রহ্মমুখনিঃসৃত ধর্ম্মার্থজ্ঞাপক শাস্ত্র—বেদ। ফলে, বেদই হিন্দুর সর্ব্বস্ব, বেদই হিন্দুর জনয়িতা, বেদই শাস্ত্রের চূড়ামণি। শব্দগত ধাত্বর্থেও 'বেদ' তাহাই বুঝাইয়া থাকে। বেদ—'বিদ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ; 'বিদ্' ধাতুর অর্থ—ধর্ম্মাধর্ম্ম 'জানা' ; অর্থাৎ, যদ্দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্ম সকল বিষয়ের অভিজ্ঞতা লাভ হয়, তাহাই 'বেদ'। আর যত কিছু শাস্ত্র, সকলই বেদ হইতে উৎপন্ন ; বেদ—কাণ্ড, অন্যান্য শাস্ত্র—তাহার শাখা-প্রশাখা-বিশেষ। ঋক, যজু, সাম—বেদের তিনটী অঙ্গ ; সেই জন্যই বেদের অপর নাম—'ত্রয়ী'। অধুনা-প্রচলিত ভাষায় যেমন পদ্য, গদ্য, গীত—তিন শ্রেণীর তিন অঙ্গ প্রচলিত আছে ; ঋক, যজু, সাম অর্থেও যথাক্রমে তাহাই উপলব্ধি হয়। যজ্ঞকর্ম্মের সুবিধার জন্য বেদকে চারি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল। সেই সময় হইতেই ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ববেদের সৃষ্টি। বলা বাহুল্য, সেই চারি বেদের প্রতি বেদেই আবশ্যকানুসারে তখন ঋক, যজু, সাম (অর্থাৎ পদ্য, গদ্য, গীত) স্থানলাভ করিয়া-

বেদ-পরিচয়।

ছিল। এখনও সেই ভাবেই বেদের অস্তিত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রথমোক্ত তিন বেদে (ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ ও সামবেদে) যজ্ঞবিধির সমাবেশ হওয়ায়, ঐ তিন বেদই পরবর্ত্তি কালে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অথর্ব্ববেদে যজ্ঞবিধির অতিরিক্ত অন্যান্য সূক্তাদি স্থান পাইয়াছিল বলিয়া, উহা তাদৃশ প্রতিষ্ঠাপন্ন হয় নাই। বেদের বিভাগ-কর্ত্তা সম্বন্ধে দুইটী বিভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। কোথায়ও দেখিতে পাওয়া যায়,—মহর্ষি বেদব্যাস, যুগে যুগে ধর্ম্মের পাদক্ষয় ও মনুষ্যদিগের আয়ুঃশক্তির হ্রাস দেখিয়া, বেদের বিভাগ করিয়াছিলেন; বেদবিভাগ-কর্ত্তা বলিয়াই তাঁহার নাম—বেদব্যাস।' আবার কোথায়ও দেখিতে পাওয়া যায়,—'যজ্ঞ-কর্ম্মের সুবিধার জন্য অথর্ব্ব ঋষি বেদ-বিভাগ করিয়াছিলেন। তিনি যজ্ঞ-কর্ম্মের উপযোগী সূক্তগুলিকে তিন বেদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া অন্যান্য সূক্তগুলির স্বাতন্ত্র্য-সাধন করেন।' যাঁহারা প্রথমোক্ত মতের অনুসরণকারী, তাঁহারা বলেন,—'যজ্ঞ-বিধির অনুপযোগী বা অকর্ম্মণ্য অর্থ বুঝাইবার জন্য ঋক যজু সাম—এই তিন বেদের অতিরিক্ত সূক্তগুলি অথর্ব্ববেদ নামে অভিহিত হইয়াছিল।' কিন্তু শেষোক্ত মত-সমর্থনকারিগণের সিদ্ধান্ত,—'অথর্ব্ব ঋষির নামানুসারেই শেষোক্ত বেদ অথর্ব্ববেদ নামে অভিহিত হইয়াছে।' ফলতঃ, সর্ব্ব-প্রকারেই প্রতিপন্ন হয়,—প্রথমে এক বেদ ঋক-যজু-সাম তিন অঙ্গে প্রকটমান ছিল। ক্রমশঃ তাহা চারিটী স্বতন্ত্র ভাগে বিভক্ত হয়। পরিশেষে, তাহার শাখা-উপশাখা-রূপে অন্যান্য শাস্ত্রাদির অভ্যুদয় হইয়াছে।

বেদ রচয়িতা।

বর্ত্তমান কালে যে প্রণালীতে বেদ-সংহিতা সংগৃহীত হইয়াছে, বিশেষতঃ মনুষ্যের বুদ্ধি-বৃত্তি যেরূপ বিপরীত ভাব ধারণ করিয়া আছে, তাহাতে বেদের রচয়িতা-সম্বন্ধে মতদ্বৈধ হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নহে। দৃষ্টান্তস্থলে ঋগ্বেদের কথা উল্লেখ করিতেছি। ঋগ্বেদের স্তোত্রসমূহ দশটী মণ্ডলে বিভক্ত। সেই মণ্ডল-সমূহে বহু রচয়িতা ঋষির নাম দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম ও শেষ মণ্ডলের রচয়িতার সংখ্যা—অনেকগুলি। দ্বিতীয় হইতে নবম পর্য্যন্ত সপ্ত মণ্ডলের রচয়িতা সাত জন ভিন্ন ভিন্ন ঋষির নাম আছে। দ্বিতীয় মণ্ডলের রচয়িতা—গৃৎসমদ; তৃতীয় মণ্ডলের রচয়িতা—বিশ্বামিত্র; চতুর্থ মণ্ডলের রচয়িতা—বামদেব; পঞ্চম মণ্ডলের রচয়িতা—অত্রি; ষষ্ঠ মণ্ডলের রচয়িতা—ভরদ্বাজ; সপ্তম মণ্ডলের রচয়িতা—বশিষ্ঠ; অষ্টম মণ্ডলের রচয়িতা—কণ্ব; নবম মণ্ডলের রচয়িতা—অঙ্গিরা। এত স্পষ্ট করিয়া যখন ভিন্ন ভিন্ন রচয়িতার নাম লিখিত আছে, তখন বেদ-সংহিতা—ঋষিগণের রচনা ভিন্ন লোকে অন্য আর কি মনে করিতে পারে? ইহাই স্বাভাবিক। বরং ইহার অধিক অন্য কিছু বলিতে গেলে, অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হওয়া সম্ভবপর। যদি তাহাই হয়, তবে হিন্দু-শাস্ত্রকারগণ বেদকে অপৌরুষেয় ব্রহ্মবাক্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন কেন? অত স্পষ্ট করিয়া যখন রচয়িতাগণের নাম লিখিত আছে, তখন বেদকে ঋষি-প্রণীত না-বলিবার কারণ কি? সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ বহুদর্শী শাস্ত্রকারগণ, এতাদৃশ প্রমাণ সত্ত্বেও, জানিয়া শুনিয়া এইরূপ পরস্পর-বিরোধী মতের অবতারণা করিবেন—ইহাও কদাচ বিশ্বাস হয় না। তবে কেন এমন হইল? এ বিষয় বুঝিতে হইলে, প্রথমতঃ বুঝিবার আবশ্যক—বেদ কি, বা বেদে কি আছে? পূর্ব্বেই

বলিয়াছি, ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ের অভিজ্ঞতা-লাভই—বেদ। অর্থাৎ, ঈশ্বরের অনুকম্পা বা তাঁহার বিভূতি-প্রাপ্তিই বৈদিক মন্ত্রের উদ্দেশ্য। ঋষি মহর্ষিগণ—নরদেবতাগণ—ভগবৎ-সন্নিকর্ষ লাভের জন্য তন্ময় হইয়া, আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়া, যে ভাষায়, যে ভাবে, তাঁহাকে ডাকিয়াছিলেন, বৈদিকমন্ত্রে স্তোত্রাকারে তাহাই গ্রথিত হইয়া আছে। প্রথমে কোন্ কণ্ঠের কোন্ সুধাস্বরে সে ধ্বনি বিনির্গত হইয়াছিল, তাহা কেহই অনুসন্ধান করিয়া বলিতে পারেন না। ব্রাহ্মণ-সন্তান, ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী জপ করেন; পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ বা অতিবৃদ্ধ-প্রপিতামহের নিকট হইতে তিনি সে মন্ত্র প্রাপ্ত হইতে পারেন। কিন্তু তিনি কখনই অনুসন্ধান করিয়া নির্ণয় করিতে পারেন না,—সেই গায়ত্রী মন্ত্র তাঁহারাই বা কোথা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? যদি ততদূরও অগ্রসর হইতে পারেন, কিন্তু ঐ গায়ত্রী মন্ত্রের আদি কোথায়, কিছুতেই সন্ধান করিয়া পাইবেন না। বৈদিক-মন্ত্রাদি সম্বন্ধেও সেই একই কথা বলিতে পারা যায়। সৃষ্টি যত কালের, ঈশ্বরের আরাধনা-স্তোত্রও তত কালের। পুরুষানুক্রমে সে স্তোত্র সংসারে চলিয়া আসিতেছে। অন্য জাতির স্তোত্রাদির পরিবর্ত্তন হইতে পারে; কিন্তু আর্য্য-হিন্দুর সেই প্রাচীন স্তোত্রাদি কখনই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তবে যে বেদের এক এক মণ্ডলে বা এক এক ভাগে ভিন্ন ভিন্ন ঋষির নাম দেখিতে পাই, তাহার কারণ অন্য প্রকার। এক এক সংসারে এক এক প্রকারের মন্ত্র প্রচলিত থাকা অসম্ভব নহে। সেই সেই সংসারের কর্ত্তা আপন বংশ-পরম্পরায় ব্যবহারের জন্য সেই সকল মন্ত্র যদি সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া যান, তাহা হইলে তাঁহাকে কখনই সেই মন্ত্রের রচয়িতা বলা যাইতে পারে না। বৈদিক মন্ত্রাদি সম্পর্কেও সেই কথাই প্রযোজ্য। পুরুষ-পরম্পরা যে যে মন্ত্র চলিয়া আসিতেছিল; এক এক ঋষি সেই সেই মন্ত্র সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন; পরবর্ত্তি-কালে তদনুসারেই সেই সেই মন্ত্রের রচয়িতা বলিয়া তাঁহারা অভিহিত হইয়াছেন। এক এক মণ্ডলের স্তোত্রাদি এক এক ঋষির রচনা বলিয়া প্রতিপন্ন করার পক্ষে অন্য অন্তরায়ও যথেষ্ট আছে। একই মণ্ডলের সূক্ত-সমূহে নানা-ভাবের নানা স্তোত্রের অবতারণা আছে। বিভিন্ন কালের বিভিন্ন জনের উচ্চারিত মন্ত্রাদি একত্র নিবদ্ধ হওয়ায়, এরূপ ঘটিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস হইতে পারে। ফলতঃ, যাঁহাদের নামে বৈদিক মন্ত্রাদি প্রচলিত, তাঁহারা সেই সেই মন্ত্রের সংগ্রহকর্ত্তা, পরন্তু রচয়িতা নহেন। বেদ যে অনাদি, বেদ যে অপৌরুষের, বেদ যে ব্রহ্মমুখনিঃসৃত,—তাহা বলার তাৎপর্য্যও এই বলিয়া মনে হয়। সে মন্ত্র কোন্ পুরুষ, কোন্ কালে, প্রথম উচ্চারণ করিয়াছিলেন,—সন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না বলিয়াই, বেদ এইরূপ বিশেষণে বিশেষিত হইয়া থাকে। কোথা হইতে আসিল, অথবা কি কারণে সংঘটিত হইল,—মানুষ যখন সন্ধান করিয়া নির্ণয় করিতে পারে না, তখনই তাহা 'দৈব' নামে অভিহিত হয়। 'অদৃষ্ট', 'বিধাতার লিপি'—সর্ব্বথা এই অর্থেই ব্যবহৃত দেখিতে পাই। একথা অবশ্য অস্বীকার করি না যে, একের যাহা অদৃষ্ট, অন্যের পক্ষে তাহা দৃষ্ট হইতে পারে,—জ্ঞান-কর্ম্মের তারতম্যানুসারে একই সামগ্রী পর্য্যায়ক্রমে দৃষ্টাদৃষ্ট-সংজ্ঞা লাভ করিতে পারে; কিন্তু তাহা হইলেও, যাহা নিত্য-সত্য, তদ্বিষয়ে মতানৈক্যের সম্ভাবনা কদাচ দেখিতে পাই না। বিশেষতঃ,

যাঁহারা জগদীশ্বরকে জগন্ময়-রূপে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন ; 'শব্দ ব্রহ্ম' যাঁহাদের শাস্ত্রে পুনঃ-পুনঃ প্রমাণিত হইয়া আছে, তাঁহারা সংসারের আদি-বাণী বেদকে ব্রহ্ম-বাক্য ভিন্ন আর কি বলিতে পারেন? মহর্ষি জৈমিনি আপন 'মীমাংসা-সূত্রের' প্রমাণ-পাদে তাই বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন,—'বৈদিক মন্ত্রাদির সঙ্কেত-কর্ত্তার নির্দ্দেশ হয় না ; সুতরাং উহা যে মনুষ্য-রচিত, তাহা কোনক্রমেই বলা যায় না।' সাঙ্খ্যকার কপিল নানারূপ তর্ক-বিতর্ক উত্থাপন করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন,—'বেদ অনন্তকাল বিদ্যমান আছে। কল্পান্তে ব্রহ্মা উহা প্রকাশ করেন মাত্র। জাগরণের পর সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির পূর্ব্ব-স্মৃতি যেরূপ অব্যাহত থাকে, কল্পান্তে বেদও সেইরূপ প্রকাশমান হয়।' মনু প্রভৃতিও এই মতেরই সমর্থনকারী। যাহা হউক, যখন বেদের রচয়িতাকে মনুষ্য-বুদ্ধির অনুসন্ধানে পাওয়া যায় না, বেদের রচনাকালেরও যখন সময়-নির্দ্দেশ হয় না, বেদ অনাদি অপৌরুষেয় ব্রহ্মবাক্য ভিন্ন উহাকে আর কি বলা যাইতে পারে? ফলতঃ, ভিন্ন ভিন্ন আকারে, অধিকারিভেদে উপাসনার পদ্ধতিরূপে, সৃষ্টির আদিকাল হইতে যে সকল স্তোত্র সংসারে চলিয়া আসিতেছিল, পরবর্ত্তী ঋষিগণ আবশ্যকানুসারে যাহা সংগ্রহ করিয়া সংসারে প্রচলিত রাখিয়াছিলেন ; তাহাই এখন সেই সেই ঋষি-প্রণীত সূক্ত বা মন্ত্র বা সংহিতা নামে অভিহিত,—তাহাই এখন বেদ নামে পরিচিত।

বেদ—অনাদি। বেদ—অনন্তকাল হইতে বিরাজমান। শাস্ত্রানুশাসন-পরিচালিত হিন্দু-মাত্রেরই এই বিশ্বাস। পুরাণাদির বর্ণনায় দেখা যায়,—"প্রজাপতি ব্রহ্মার চতুর্ম্মুখ হইতে বেদ-চতুষ্টয়ের উৎপত্তি হইয়াছিল। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার মুখ-নিঃসৃত বাক্যই বেদ।" * মনু বলেন,—'স্বয়ং ঈশ্বর যজ্ঞকার্য্যের জন্য অগ্নি হইতে ঋগ্বেদ, বায়ু হইতে যজুর্ব্বেদ, এবং সূর্য্য হইতে সামবেদ দোহন করিলেন। এই বেদত্রয় সনাতন।' † এই সকল শাস্ত্রমত মান্য করিলে, বেদের সময় নিরূপণ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। তবে সকলের জ্ঞান-বুদ্ধি-শিক্ষা সমান নহে। সুতরাং তৎসম্বন্ধে মতামত-প্রকাশেও বড় ত্রুটি দেখিতে পাই না। হিন্দুগণ বেদকে সনাতন বলিয়া মান্য করিলেও, পাশ্চাত্য-শিক্ষিত পণ্ডিতগণ কিন্তু তাহা স্বীকার করেন না। সুতরাং বেদের সময়-নিরূপণ জন্য নানা জনের নানারূপ মস্তিষ্ক-চালনা দেখিতে পাই। তবে যিনিই এ সম্বন্ধে যতই মস্তিষ্ক আলোড়ন করুন না কেন, সকলেই যে অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, তাহা বলাই বাহুল্য। অধিক বলিব কি, বেদের সময়-নির্দ্ধারণে এ পর্য্যন্ত কেহই এক মত হইতে পারেন নাই। প্রায় সকলেই বেদকে পৃথিবীর আদি-গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন বটে ; কিন্তু অনেকেই খৃষ্ট-জন্মের দুই সহস্রাধিক বৎসরের অধিক পূর্ব্বে বেদের সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া ধারণা করিতে পারেন নাই। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন,—"২৭৮০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮২০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের মধ্যে বেদগ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছিল এবং ৪৫০০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ হইতে ২৫০০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সময়কে বৈদিক

বেদ কত কালের?

---

* বিষ্ণুপুরাণ এবং অন্যান্য পুরাণ দ্রষ্টব্য।

† মনুসংহিতা, প্রথম অধ্যায়, ২৩শ শ্লোক।

সভ্যতার যুগ বলা যাইতে পারে।" * কিন্তু অপর এক পক্ষের মত,—"পাঁচ হাজার হইতে তিন হাজার পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের মধ্য ভাগকে রাশিচক্রের যুগ বলে; সেই যুগের প্রথম ভাগে কতকগুলি বৈদিক-মন্ত্র রচিত হইয়াছিল।" † ফলতঃ, বেদানুশাসন-পরিচালিত হিন্দু ভিন্ন, এ পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে কেহই কোনও অবিসম্বাদিত মীমাংসা করিতে পারেন নাই, কাহারও করিবার সম্ভাবনাও নাই। কোনও কোনও পাশ্চাত্য-পণ্ডিতের মতে—"ঋগ্বেদই আদি-গ্রন্থ; অন্যান্য বেদ তাহার পরবর্ত্তী কালে রচিত হইয়াছে।" কিন্তু এ মতও সমাচীন বলিয়া মনে হয় না; যেহেতু, ঋগ্বেদ-সংহিতায় তিন বেদের কথাই লিখিত আছে। সুতরাং বেদ-বিভাগ যে একই সময়ের,—তাহাতে কোনই সংশয় থাকিতে পারে না।

ঋগ্বেদ।

বেদ-চতুষ্টয়ের মধ্যে, আধুনিক পণ্ডিতগণের মতে, ঋগ্বেদই আদি-গ্রন্থ। উহা দশটী মণ্ডলে বিভক্ত। সেই দশটি মণ্ডলের মধ্যে পঁচাশিটী অনুবাক আছে। অনুবাক-সমূহে সর্ব্বসাকুল্যে এক হাজার আটাইশটী সূক্ত (স্তোত্র) দেখিতে পাওয়া যায়। অধুনা-প্রচলিত সাধারণ গ্রন্থাদিতে যেরূপ খণ্ড, পরিচ্ছেদ ও বিভিন্ন বিষয়-পরম্পরা দৃষ্ট হয়, মণ্ডল, অনুবাক ও সূক্ত প্রভৃতি তাহারই আদি-রূপ মাত্র। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে চব্বিশটী, দ্বিতীয় মণ্ডলে চারিটী, তৃতীয় ও চতুর্থ মণ্ডলে পাঁচটী করিয়া দশটী, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম মণ্ডলে ছয়টী করিয়া আঠারটী, অষ্টম মণ্ডলে দশটী, নবম মণ্ডলে সাতটী এবং দশম মণ্ডলে বারটী অনুবাক আছে। এক এক মণ্ডলের সূক্ত-সংখ্যার পরিমাণ,—প্রথম মণ্ডলে ১৯১টী, দ্বিতীয়ে ৪৩টী, তৃতীয়ে ৬২টী, চতুর্থে ৫৮টী, পঞ্চমে ৮৭টী, ষষ্ঠে ৭৫টী, সপ্তমে ১০৪টী, অষ্টমে ১০৩টী, নবমে ১১৪টী, দশমে ১৯১টী। মণ্ডল, অনুবাক, সূক্ত প্রভৃতির পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রে ঋগ্বেদের শ্লোক-সংখ্যা, প্রতি শ্লোকের পদ-সংখ্যা এবং শব্দাংশের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট আছে। অধিক বলিব কি, প্রতি সূক্তে অকারান্ত, আকারান্ত, ইকারান্ত, নান্ত, সান্ত প্রভৃতি যে সকল পদ আছে, সেই সকল পদের মোট সংখ্যাই বা কত,—শাস্ত্রকারগণ তাহাও নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ঋগ্বেদের শব্দ-সমষ্টির এতদূর বাঁধাবাঁধি হিসাব থাকায়, পণ্ডিতগণ বলেন,—উহার সহিত প্রক্ষিপ্ত-পদ-সংযোগের সম্ভাবনা অনেক দিন হইতেই অন্তর্হিত হইয়াছে। কিন্তু ক্ষোভের বিষয়, সেরূপ পদসংখ্যা ও শব্দসমষ্টিসম্পন্ন ঋগ্বেদ এখন সন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। যাঁহারা তাহা মিলাইয়া বেদোদ্ধারের চেষ্টা পান, তাঁহারাও যে সকল সময় সফলকাম হইতে পারেন, তাহাও বিশ্বাস হয় না। ঋগ্বেদের কবিতা-সংখ্যা লইয়াই এখন কত মতান্তর দেখা যায়। ঋগ্বেদে কতগুলি কবিতা আছে, তাহা গণনা করিয়া কেহ কেহ দেখিয়াছেন, সেই কবিতাগুলির সংখ্যা—১০ হাজার ৪০২ হইতে ১০ হাজার

* ম্যাক্সমুলার প্রমুখ প্রায় সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরই এই মত। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত "প্রাচীন ভারতের সভ্যতার ইতিহাস" (A History of Civilisation in Ancient India.) গ্রন্থে এই মতই সমর্থন করিয়াছেন।

† শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক, 'বেদে উত্তর-মেরু বাসের কথা' (The Arctic Home in the Vedas) গ্রন্থে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন।

৬২২টী; উহার শব্দ-সংখ্যা—১ লক্ষ ৫৩ হাজার ৮২৬টী; শব্দাংশের সংখ্যা—৪ লক্ষ ৩২ হাজার। কিন্তু অনেকের দৃষ্টিতে ইহার ইতর-বিশেষ লক্ষিত হয়। বিষ্ণুপুরাণ এবং শ্রীমদ্ভাগবৎ প্রভৃতিতে * বর্ণিত আছে,—বেদব্যাস বেদ-বিভাগ করিয়া পৈলকে ঋগ্বেদ-সংহিতা প্রদান করিয়াছিলেন; বৈশম্পায়নকে যজুর্ব্বেদ-সংহিতা, জৈমিনিকে সামবেদ-সংহিতা এবং সুমন্তকে অথর্ব্ববেদ-সংহিতা শিক্ষা দিয়াছিলেন। পৈল আবার ঋক-সংহিতাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া ইন্দ্রপ্রমতি ও বাস্কলি (বাস্কল) নামক আপন শিষ্যদ্বয়কে তাহা প্রদান করেন। বৌধ্য, অগ্নিমাঠার (অগ্নিমিত্র), যাজ্ঞবল্ক্য ও পরাশর নামে বাস্কলির চারিজন শিষ্য ছিলেন। বাস্কলি আপনার অধীত বেদ-সংহিতাকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া, সেই চারি ভাগ আপনার চারি শিষ্যকে শিক্ষা-দান করেন। ইন্দ্রপ্রমতি যে সংহিতা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, আপন পুত্র মাণ্ডুকেয়কে তাহা অধ্যয়ন করান। মাণ্ডুকেয় হইতে ক্রমশঃ তাঁহার পুত্র শাকল্য এবং শিষ্য বেদমিত্র (মতান্তরে দেবমিত্র) ও সৌভরি প্রভৃতির মধ্যে উহা প্রচারিত হয়। শাকল্য আবার পাঁচখানি সংহিতা সঙ্কলন করিয়া, মুদ্গল, গালব, বাৎস্য, শালীয় ও শিশির নামক পাঁচ জন শিষ্যকে তদ্বিষয়ে উপদেশ দেন। এইরূপে ঋগ্বেদ-সংহিতা নানা ভাবে নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়ে। শাখা-অনুসারে মণ্ডল ও অনুবাক প্রভৃতিরও নাম পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়। শৌনক মুনি স্বরচিত 'চরণ-ব্যূহ' গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন,—"ঋগ্বেদের আটটী ভেদ বা স্থান আছে। তাহা যথাক্রমে চর্চ্চা, শ্রাবক চর্চ্চক, শ্রবণীয় পার, ক্রমপার, ক্রমজটা, ক্রমরথ, ক্রমশট, ক্রমদণ্ড নামে অভিহিত হয়। ঐ ভেদ-সমূহ চারিটী পারায়ণে বিভক্ত। ঋগ্বেদের শাখা—পাঁচটী। তাহাদের নাম,—আশ্বলায়িনী, সাঙ্খ্যায়নী, শাকলা, বাস্কলা ও মাণ্ডুকা। উহার অধ্যায়—চৌষট্টিটী; মণ্ডল—দশটী; বর্গ-সংখ্যা—দুই হাজার ছয়টী; সূক্তের পরিমাণ—এক হাজার সতেরটী; পদক্রম—বাশিষ্ঠের ১ লক্ষ ৫২ হাজার ৫১৪টী; অপরের ৫৮টী। ঋকের ১০ হাজার ৫৮০ পদ—পারায়ণ নামে অভিহিত। প্রথম অষ্টকে এক বর্গ ও এক ঋক্, দ্বিতীয় অষ্টকে দুই বর্গ ও দুই ঋক, তৃতীয়ে এক শত ঋক, চতুর্থে এক শত পঁচাত্তর ঋক, পঞ্চমে এক হাজার দুই শত পঁয়ত্রিশ ঋক, ষষ্ঠে তিন শত ঋক, সপ্তমে কুড়ি ঋক, অষ্টমে পঞ্চান্ন ঋক,—পাঁচটী শাখায় সর্ব্বশুদ্ধ দুই হাজার দশটী ঋক।" চরণ-ব্যূহের মতে,—"বেদের অনেক অধ্যায় এখন পাওয়া যায় না। কালক্রমে তৎসমুদায় বিলুপ্ত হইয়াছে। ঋগ্বেদের শাখা-সম্বন্ধেও এইরূপ মতদ্বৈধ দৃষ্ট হয়। প্রধানতঃ পাঁচটী শাখা বলিয়া পরিচয় পাওয়া যায় বটে; কিন্তু কোথাও কোথাও একুশটি শাখারও উল্লেখ আছে। হইতে পারে—সেগুলি উপশাখা! কিন্তু পাঁচ শাখাও এখন যে সন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না, তাহা বলাই বাহুল্য। শাকলের শাখাই এখন প্রচলিত বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন। নির্দ্দিষ্ট আছে,—বাস্কল শাখার কবিতা-সংখ্যা—১০ হাজার ৬২২টী, শাকল শাখার কবিতা-সংখ্যা ১৫ হাজার ৩৮১টী। যাহাই হউক, আমরা নানা গ্রন্থ আলোচনা করিয়া

* বিষ্ণুপুরাণ, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় এবং শ্রীমদ্ভাগবৎ দ্বাদশ স্কন্ধ ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই বিবরণ বিশদভাবে বর্ণিত আছে। অন্যান্য মহাপুরাণেও ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

দেখিয়াছি,—এ গণনায়ও একটীর সহিত অপরটীর প্রায়ই মিল নাই। সুতরাং ঋগ্বেদ-সংহিতা প্রথমে কি আকারে বিদ্যমান ছিল, এবং শেষে কিরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। কতকগুলি মন্ত্র পূর্ব্বাপর অব্যাহত আছে বটে; কিন্তু অপর কতকগুলিতে যে সংযোগ-বিয়োগ অনেক ঘটিয়াছে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। যাগযজ্ঞের নিয়মাবলী এবং ক্রিয়া-প্রণালী বিবৃত করিয়া ঋগ্বেদের দুইখানি শাখা প্রণীত হয়। সেই দুই শাখা দুই খানি 'ব্রাহ্মণ' নামে অভিহিত। তাহার একখানির নাম—ঐতরেয়; অপর খানি—কৌষিতকী বা সাঙ্খ্যায়ন। মহিদাস ঐতরেয় নামক জনৈক ঋষি ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এবং কুষিতক নামক ঋষি কৌষিতকী ব্রাহ্মণের প্রণেতা।

যজু, সাম ও অথর্ব্ববেদ।

ঋগ্বেদের পর, অপর তিনখানি বেদের নাম উল্লিখিত হয়। সেই বেদত্রয়—যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ। যজুর্ব্বেদ দুই অংশে বিভক্ত; কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ এবং শুক্ল যজুর্ব্বেদ। তৈত্তিরীয় এবং বাজসনেয়ী সংহিতা নামেও উহা অভিহিত হইয়া থাকে। যজুর্ব্বেদের দুই খানি ব্রাহ্মণ আছে। শুক্ল যজুর্ব্বেদের ব্রাহ্মণ ভাগের নাম—শতপথ ব্রাহ্মণ, এবং কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের ব্রাহ্মণ ভাগের নাম—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ। যজুর্ব্বেদ তিন শাখায় বিভক্ত। সেই তিন শাখা—তৈত্তিরীয়, মাধ্যন্দিন ও কাণ্ব। সামবেদ-সংহিতার—দুই ভাগ; উত্তর ও পূর্ব্ব। শাখা অনেক ছিল; কিন্তু এখন পাওয়া যায়—দুইটী মাত্র। সেই শাখাদ্বয়ের নাম,—কৌথুমী (কৌথুম) ও রাণ্যায়ন। কৌথুম ঋষি প্রথম শাখার এবং রাণ্যায়ন ঋষি দ্বিতীয় শাখার প্রবর্ত্তক। সামবেদের ব্রাহ্মণ-সংখ্যা—আট খানি। কেহ কেহ বলেন,—'অদ্ভুত ব্রাহ্মণ' নামে সামবেদের আরও এক খানি ব্রাহ্মণ আছে। বঙ্গদেশের অধিকাংশ সামবেদী ব্রাহ্মণ সামবেদের কৌথুমী শাখার অন্তর্ভুক্ত। অথর্ব্ব বেদ প্রধানতঃ নয় ভাগে বিভক্ত। পূর্ব্বে অথর্ব্ব বেদের বহু শাখা বিদ্যমান ছিল।* কিন্তু একমাত্র শৌনক-শাখা ভিন্ন এখন আর অন্য শাখা পাওয়া যায় না। চরণ-ব্যূহের মতে—অথর্ব্ববেদে বার হাজার তিন শত মন্ত্র ছিল; কিন্তু এখন অথর্ব্ববেদের মন্ত্র-সংখ্যা পাঁচ হাজার আট শত ত্রিশটী মাত্র। অথর্ব্ববেদের ব্রাহ্মণ-ভাগের নাম—'গো-পথ' ব্রাহ্মণ। বর্ত্তমান-প্রচলিত অথর্ব্ববেদ বিংশতি কাণ্ডে বিভক্ত। এখন ৬০১৫টীর অধিক শ্লোক অথর্ব্ববেদে পাওয়া যায় না। অথর্ব্ববেদের সঙ্কলয়িতা সম্বন্ধে তিনটী মত প্রচলিত। কাহারও মতে অথর্ব্ব ও অঙ্গিরা ঋষির বংশধরগণ এবং কাহারও মতে ভৃগু-বংশীয়েরা অথর্ব্ববেদ সঙ্কলন করিয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন,—অথর্ব্ব ঋষি যজ্ঞ-ক্রিয়া প্রবর্ত্তনার সময় অথর্ব্ববেদ সঙ্কলন করেন। ঋক্, সাম, যজু, অথর্ব্ব—চারি বেদেই কতকগুলি সাধারণ সূক্ত দৃষ্ট হয়। তদ্দ্বারা বুঝিতে পারা যায়,—এক হইতেই ক্রমে ক্রমে বেদ-চতুষ্টয়ের বিভাগ হইয়াছিল।

---

* বেদের শাখা প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা মত দৃষ্ট হয়। যজুর্ব্বেদের শাখার বিষয় কোথাও দেখিতে পাই—৮৬ শাখা; কোথাও দেখিতে পাই—এক শত শাখা। সামবেদের শাখাও কোথাও কোথাও এক সহস্র বলিয়া উল্লিখিত আছে। সামবেদের সেই সহস্র শাখার মধ্যে কেহ কেহ বলেন, আটটি শাখা এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

বেদ-চতুষ্টয়ে নানা দেবতা ও নানা ঋষির নাম উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদ-সংহিতায়—অগ্নি, অদিতি, ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, মরুৎ, দাব্যা, পৃথিবী, গঙ্গা, বিশ্বকর্ম্মা, প্রজাপতি, সবিতা, বিষ্ণু প্রভৃতি অন্যূন তেত্রিশ হাজার দেবতার নাম দৃষ্ট হয়। ঋষি মহর্ষির সংখ্যা—অগণ্য, অসংখ্য। অগস্ত্য, অদিতি, কশ্যপ, অঙ্গিরস, বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ, নারদ, কণ্ব, যযাতি, মান্ধাতা, প্রস্কন্ন, কুৎস, হিরণ্যগর্ভ ইত্যাদি এক এক নামেই কত কত ঋষির পরিচয় পাওয়া যায়। এক 'আঙ্গিরস' নামে অন্যূন পঁয়তাল্লিশ জন ঋষির উল্লেখ আছে; অযাস্য আঙ্গিরস, পবিত্র আঙ্গিরস, ধ্রুব আঙ্গিরস, কৃষ্ণ আঙ্গিরস, ভিক্ষু আঙ্গিরস, শিশু আঙ্গিরস ইত্যাদি। এইরূপ কাণ্ব নামে অন্যূন পনের জন (আয়ু কাণ্ব, বৎস কাণ্ব, মেধাতিথি কাণ্ব, সৌভরী কাণ্ব ইত্যাদি) এবং কাশ্যপ নামে অন্যূন পাঁচ জন ঋষির (অবৎসার কাশ্যপ, রেভ কাশ্যপ, ভূতাংশ কাশ্যপ ইত্যাদি) উল্লেখ দেখা যায়। পুনঃপুনঃ একই নামের এইরূপ উল্লেখ থাকায়, পরবর্ত্তী প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণ সময়-নিরূপণে নানা ভ্রম-প্রমাদে পতিত হইয়াছেন। ঐ সকল নাম যে তাঁহাদের পরিবারিক পরিচয়-চিহ্ন, তাহা বলাই বাহুল্য। অর্থাৎ, অঙ্গিরস (অঙ্গিরাঃ) ঋষির বংশে যে সকল মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিরস নামে তাঁহারাই অভিহিত হইয়াছেন; কশ্যপ বংশ হইতে বহুতর কাশ্যপ এবং কণ্ব বংশ হইতে বহুতর কাণ্বের উৎপত্তি। এই বিষয়টি বিশদরূপে বোধগম্য না হইলে, কাল-পরিমাণ-নির্দ্দেশে পদে পদে প্রমাদ ঘটিবার সম্ভাবনা। কোন্ ঘটনা কোন্ কাশ্যপের বা কোন্ আঙ্গিরসের সময় সংঘটিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। সুতরাং, সকল বিষয়েরই সময়-নির্দ্দেশে নানা জনের নানা মত দেখিতে পাই। বৈদিক সূক্তে যে পঁয়তাল্লিশ জন বিভিন্ন আঙ্গিরস ঋষির নাম উক্ত হইয়াছে, যদি সেই ঋষিগণই বিশেষ বিশেষ সূক্তের রচয়িতা হন, তাহা হইলে প্রথম যে আঙ্গিরস ঋষি সূক্ত-রচনা করেন,—শেষের রচয়িতা তাঁহার বংশধর আঙ্গিরস হইতে কত অধিক পূর্ব্বে তিনি বিদ্যমান ছিলেন, সহজেই তাহা বুঝা যায় না কি? আর এক কথা, এক এক বংশের প্রসিদ্ধ পুরুষগণের নামই বেদে স্থান পাওয়া সম্ভবপর। তাহা হইলে, কয় পুরুষ পরে এক জন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহাও চিন্তার বিষয় নহে কি? কেবল ঋগ্বেদ বলিয়া নহে,—অন্যান্য বেদ-সম্বন্ধেও এই কথাই বলা যাইতে পারে। চারি বেদেই প্রায় একরূপ দেবতা ও ঋষিগণের নাম দৃষ্ট হয়। বেশীর ভাগ, অথর্ব্ব-বেদে যম, মৃত্যু, কাল, দানব প্রভৃতির কতকগুলি স্তোত্র আছে। বৈদিক-দেবতাগণের উপাসনা-পদ্ধতি—প্রধানতঃ দুই প্রকার। কোনও কোনও দেবতার মহিমা বর্ণনা করিয়া স্তোত্র-পাঠ হইয়া থাকে; কোনও কোনও দেবতার উদ্দেশে ঘৃতাদি আহুতি প্রদান করা হয়। এই হিসাবে, প্রথমোক্ত দেবতাগণ 'যাগাঙ্গ' দেবতা, এবং শেষোক্ত দেবতাগণ 'স্তোত্রাঙ্গ' দেবতা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। জৈমিনির মতে,—"দেবতা কখনও শরীরী জীব হইতে পারেন না।" তিনি বলেন,—"মন্ত্রই দেবতা। দেবতা শরীরী হইলে, স্তুতিকারীর প্রত্যক্ষীভূত হইতেন। তাঁহার অপ্রত্যক্ষ অবস্থান কল্পনা করিলেও,

বেদোক্ত দেবতা ও ঋষি।

একই সময়ে নানা স্থানে তাঁহার উপস্থিতি অসম্ভব। কিন্তু মন্ত্রই যদি দেবতা হন, তাহা হইলে একই সময়ে সর্ব্বত্রই কার্য্যসিদ্ধি সম্ভবপর।" জৈমিনির এই মত যে সর্ব্ববাদিসম্মত, তাহা নহে। দেবতা ও ঋষি—অসংখ্য ও অগণ্য। তাঁহাদের পূজা-পদ্ধতিও তদনুরূপ বিভিন্ন প্রকারের। অন্ততঃ শাস্ত্রানুশাসন-পরিচালিত হিন্দু তাহাই মান্য করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি,—বেদই হিন্দুর ধর্ম্ম, বেদই হিন্দুর কর্ম্ম, বেদই হিন্দুর হিন্দুত্ব। এক কথায়, যিনি বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন,—তিনিই হিন্দু-নামে অভিহিত হন। হিন্দু হইতে হইলে, বেদ মানিয়া চলিতে হয়। বেদ মানিয়া চলার অর্থ—বর্ণাশ্রম মানিতে হয়, অদৃষ্ট মানিতে হয়, মন্ত্রশক্তি মানিতে হয়। বেদ-মানার ইহাই তাৎপর্য্য। যিনি বেদ মানেন, তিনি নিশ্চয়ই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম মানেন; যিনি বেদ মানেন, তিনি নিশ্চয়ই অদৃষ্টে বিশ্বাস করেন; যিনি বেদ মানেন, তিনি নিশ্চয়ই মন্ত্র-শক্তিতে আস্থাবান আছেন। ইহাই হিন্দুর লক্ষণ,—ইহাই হিন্দুর বিশেষত্ব। শাস্ত্রে এমনও দেখা যায়,—কেহ বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই; তিনিও আস্তিক হিন্দুর উচ্চ আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন; আবার, কেহ বেদ মানেন নাই, অথচ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন,—তিনি নাস্তিক অহিন্দু নামে অভিহিত হইয়াছেন। দৃষ্টান্ত-স্থলে, সাংখ্যকার মহর্ষি কপিল এবং বৌদ্ধমত-প্রচারক গৌতম মুনির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। মহর্ষি কপিল, ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়াও, একমাত্র বেদ মানিয়াই হিন্দুর আদর্শ-আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; আর গৌতম মুনি, ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াও, বেদ অমান্য করায়, নাস্তিক-সংজ্ঞা লাভ করিয়াছিলেন। মূলতঃ, বেদ-মানাই হিন্দুর ধর্ম্ম। বেদোক্ত ধর্ম্মই—হিন্দুধর্ম্ম। বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া চলিতেন বলিয়াই হিন্দুগণ আর্য্য-হিন্দু নামে অভিহিত। বর্ণাশ্রম, অদৃষ্ট, মন্ত্রশক্তি,—সকলই বেদানুগত। হিন্দু বিশ্বাস করেন,—জাতি-বর্ণ কখনই মনুষ্যের সৃষ্ট নহে,—উহা ঈশ্বরই সৃষ্টি করিয়াছেন। হিন্দু বিশ্বাস করেন,—জন্মান্তরের কর্ম্মফলই অদৃষ্ট-রূপে প্রতিভাত হয়। মনুষ্য যখন মৃত্তিকা-মধ্যে বীজ-বপন করে, মৃত্তিকা-প্রোথিত বীজ কিছুকাল পর্য্যন্ত দৃষ্টির অগোচরে অ-দৃষ্ট থাকে; ক্রমশঃ, অঙ্কুরাদি উদ্গত হইলে, সেই অ-দৃষ্ট বীজের পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দুর বিশ্বাস—মনুষ্যের কর্ম্মফল মৃত্তিকা-প্রোথিত বীজ-রূপেই অ-দৃষ্ট থাকে, এবং যথা-সময়ে মনুষ্য তাহার ফলভাগী হয়। এইরূপ, মন্ত্রশক্তিও হিন্দুর দৃষ্টিতে অলৌকিক শুভফলপ্রদ। হিন্দুর বিশ্বাস,—বিশুদ্ধ-চিত্তে বিশুদ্ধ-মন্ত্রে অভীষ্ট-দেবতাকে আহ্বান করিলে, নিশ্চয়ই তিনি সদয় হইয়া মনুষ্যের ইহ-পরকালের সকল মঙ্গল বিধান করেন। বেদ হইতে হিন্দু প্রধানতঃ এই শিক্ষাই পাইয়া থাকেন। তাঁহার অন্যান্য যে কিছু শিক্ষা, তাহাও এই শিক্ষারই অঙ্গীভূত। তাঁহার অধিকারিভেদের বীজমন্ত্রও এই বেদেই নিহিত আছে। বৈদিক স্তোত্র-সমূহে দেখিতে পাই,—হিন্দু ইন্দ্রের উপাসনা করিতেছেন, হিন্দু বায়ুর উপাসনা করিতেছেন, হিন্দু অগ্নির উপাসনা করিতেছেন, হিন্দু জলের উপাসনা করিতেছেন,—হিন্দু কত কত দেবতার

বেদোক্ত ধর্ম্ম।

উপাসনা করিতেছেন। আরও দেখিতে পাই,—হিন্দু যাগ-যজ্ঞ করিতেছেন, হিন্দু বলি-প্রদান করিতেছেন, হিন্দু যজ্ঞাহুতি কার্য্যে ব্রতী আছেন। এক দিকে হিন্দুর—এই ভাব! অন্যদিকে আবার দেখিতে পাই,—হিন্দুর ঈশ্বর—অবাঙ্মনসোগোচর; হিন্দুর ঈশ্বর—অনাদি, অনন্ত; হিন্দুর ঈশ্বর—চিন্তার অতীত, জ্ঞানের অতীত, ধারণার অতীত। ফলতঃ, হিন্দু কখনও সাকাররূপে নাম-মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছেন; আবার কখনও বা নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া তন্ময় হইয়া আছেন। হিন্দু কখনও ইহ-সংসারেই তাঁহার স্বরূপ-মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিতেছেন; হিন্দু কখনও অগণ্য অসংখ্য—তেত্রিশ কোটি দেবতার—অগ্নি, বায়ু, বরুণ, ইন্দ্র, শিব, নারায়ণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, লক্ষ্মী, স্বরস্বতী, কালী, দুর্গা প্রভৃতির—উপাসনা করিতেছেন; আবার কখনও বা তিনি 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছেন। এইরূপে নানা-শ্রেণীর জন্য নানা পথ নির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে। বলিতে গেলে, বুঝিতে গেলে, ইহাই অধিকারিভেদ। যাঁহার যেরূপ শক্তি, যাঁহার যেরূপ জ্ঞান, যাঁহার যেরূপ ধ্যান-ধারণা, তিনি তদনুরূপ অনুষ্ঠানের অধিকারী। ইহাই হিন্দুর অধিকারিভেদ। বেদে সকল শ্রেণীর সকল হিন্দুর সকল উপাসনার সার-সামগ্রী নিহিত আছে। পরবর্ত্তি-কালে সংসারে যত কিছু উপাসনা-পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে, সকলই বৈদিক উপসনার অনুকৃতি মাত্র। তাই বেদে দেখিতে পাই,—বৈদিক ঋষিগণ, প্রকৃতির তৃণাদপিতৃণতুচ্ছ সামগ্রী হইতে আরম্ভ করিয়া, মহৎ হইতে মহত্তর মহত্তম পথে আপনাদের লক্ষ্য সঞ্চালন করিয়াছেন। তাঁহারা কখনও নদ-নদীর উপাসনা করিতেছেন; তাঁহারা কখনও আলোক-অন্ধকারের ধ্যানে নিমগ্ন আছেন; তাঁহারা কখনও ক্ষিত্যপতেজোমরুদ্ব্যোম পঞ্চভূতের আরাধনায় ব্রতী রহিয়াছেন; আবার কখনও বা তাঁহারা প্রকৃতির যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা, সকলের যিনি আদিভূত, তাঁহারই অনুধ্যানে ব্যাকুল হইয়া আছেন। দুই একটী বৈদিক মন্ত্রের উল্লেখ করিতেছি; তাহার মর্ম্ম অনুধাবন করিলেও, আর্য্যগণের সেই উপাসনা-পদ্ধতির আভাস পাওয়া যাইতে পারে। ঋগ্বেদের প্রথম সূক্তের প্রথম শ্লোকের অধুনা-প্রচলিত অর্থ—"যজ্ঞের পুরোহিত অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা বহুরত্নপ্রদাতা ঋত্বিক অগ্নিকে আমরা স্তুতি করি। প্রাচীন এবং আধুনিক ঋষিগণ কর্ত্তৃক অগ্নি স্তুত হইয়াছেন ও হইতেছেন। দেবগণকে তিনি যজন-কার্য্যে যজ্ঞস্থলে আহ্বান করুন।" এইরূপ দ্বিতীয় সূক্তের বায়ু দেবতার উপাসনায় দেখিতে পাই, মধুচ্ছন্দা ঋষি স্তুতি করিতেছেন,—"হে বায়ু! আমাদের আহ্বান শ্রবণ করুন, আমাদিগের এই সোমরস পান করুন।" অষ্টম সূক্তে ইন্দ্রের উপাসনায় দেখিতে পাই, সেই ঋষিই আবার প্রার্থনা করিতেছেন,—"হে ইন্দ্র! আমাদিগের সম্ভোগের উপযুক্ত শত্রুবিজয়ক্ষম প্রচুর ধন প্রদান করুন। হে ইন্দ্র! আপনার কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া আমরা যেন বজ্রের ন্যায় কঠোর অস্ত্র ধারণ করিতে পারি এবং উন্নতশির শত্রুকে জয় করিতে সমর্থ হই।" এক দিকে যেমন এইরূপ ব্যষ্টিভাবের এক এক স্তোত্রে এক এক দেবতার স্তুতি-গান দেখিতে পাই, অন্য দিকে আবার সেইরূপ সমষ্টি-ভাবেও ভগবদারাধনা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম মণ্ডলেরই উন-নবতি সূক্তের শেষে ঋষি কণ্ব বিশ্বদেবতার স্তোত্রে বলিতেছেন,—"তুমি অদিতি, তুমি আকাশ, তুমি অন্তরীক্ষ,

তুমি পিতা, তুমি মাতা, তুমি পুত্র, তুমি সর্ব্বদেব, তুমি গন্ধর্ব্ব, তুমি দেবতা, তুমি অসুর, তুমি রাক্ষস, তুমি পিতৃদেব, তুমি জন্ম ও জন্মের মূল কারণ।" এইরূপ, দশম মণ্ডলের দ্ব্যশীতি সূক্তে আর এক ঋষি স্তব করিতেছেন,—"যিনি আমাদিগকে জীবন-দান করিয়াছেন, যিনি আমাদের সকলেরই সৃষ্টিকর্ত্তা, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সকল অবস্থাই যাঁহার গোচরীভূত; যিনি এক, যিনি অদ্বিতীয়,—অথচ যিনি সংসারে বহু নামে বহু দেবদেবীর আকারে বিরাজমান; তাঁহাকে জানিবার জন্য সংসার ব্যাকুল হইয়া বেড়াইতেছে।" ঐ মণ্ডলেরই আর এক সূক্তে আছে,—"যখন মৃত্যু ছিল না, তখন সেই একমাত্র তিনিই আপনাতে অবস্থিত হইয়া, আপনিই বিরাজমান ছিলেন। তখন তিনি ভিন্ন আর কিছুই ছিল না; ছিলেন কেবল তিনি।" শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জ্জুনকে আপন বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিতেছেন, তখন অর্জ্জুন যেমন দেখিতেছেন,—"ভগবানের দেহের মধ্যে স্থাবর-জঙ্গম সমস্তই বিদ্যমান; কমলাসন ব্রহ্মা, রুদ্র, সমস্ত ঋষি-মণ্ডল এবং বাসুকী প্রভৃতি দিব্য উরগগণ—সকলেই তাঁহাতে অবস্থিতি করিতেছেন; তাঁহাতে অসংখ্য বাহু, অসংখ্য উদর, অসংখ্য বক্ত্র, অসংখ্য নেত্র, অসংখ্য প্রাণী বিরাজমান রহিয়াছে;—চন্দ্র-সূর্য্য তাঁহার নেত্ররূপে, মুখমণ্ডলে প্রদীপ্ত হুতাশন, আদি-অন্ত-মধ্য-বিরহিত বিশ্বরূপে তিনি প্রকাশ পাইতেছেন;"—ঋগ্বেদের উল্লিখিত সূক্তদ্বয়ে এবং অন্যান্য স্থানেও ভগবানের সেই বিশ্বরূপের পরিচয় পাওয়া যায় না কি? যদি কেহ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একাদশ অধ্যায় এবং ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের অংশবিশেষ মিলাইয়া পাঠ করেন, তাঁহার প্রাণে এই একই ভাবের উন্মেষ হইতে পারে। * ফলতঃ, ভগবানকে নানারূপে কল্পনা করিয়া বেদে যে তাঁহার নানা উপাসনা-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত আছে, তাহাতে আমরা কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি? আমরা স্পষ্টতঃই বুঝিতে পারি না কি,—সকল মনুষ্যের জ্ঞান-বুদ্ধি শক্তি-সামর্থ্য সমান নহে; মহৎ হইতে মহত্তর ও মহত্তমের ধারণা করিতেও সকল মনুষ্য সমভাবে ক্ষমবান্ নহে। সুতরাং পর-পর স্তর-পর্য্যায়-অনুসারে মনুষ্যের অনুষ্ঠান-পদ্ধতিও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সূচিত হইয়াছে। আর, সেই জন্যই—হিন্দু-ধর্ম্ম বিজ্ঞান-সম্মত। যিনি যে ভাবে যে পথ দিয়া ভগবৎ-সান্নিধ্য লাভ করিতে পারিবেন, তাঁহার জন্য সেই পথ নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়াই—বৈদিক হিন্দু-ধর্ম্মের উদ্দেশ্য। তাহাতেই হিন্দু-ধর্ম্ম জ্ঞান-বিজ্ঞানের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সৃষ্টি, স্রষ্টা, আত্মা;—জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম;—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান;—ইহকাল, পরকাল, অদৃষ্ট;—সকল বিষয়েরই সম্বন্ধ-তত্ত্ব বৈদিক হিন্দু-ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত। এই ধর্ম্মের সার-সম্পৎ অধিগত হইলে,

* গীতার একাদশ অধ্যায়ের পঞ্চদশ হইতে একত্রিংশ শ্লোকে ভগবানের এই বিশ্বরূপের বর্ণনা আছে। অর্জ্জুন বলিতেছেন,—

> "পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসংঘান্।
> ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থমৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥"

এইরূপ ঋগ্বেদে দেখিতে পাই,—

> "চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত।
> মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্বায়ুরজায়ত॥" ইত্যাদি।

সৃষ্টি ও স্রষ্টার সম্বন্ধ মানুষ অবশ্যই বুঝিতে পারে; এবং তাহা বুঝিয়া, তন্নির্দ্দিষ্ট পথে প্রধাবিত হয়। যাঁহারা সেই সার সামগ্রী উপলব্ধি করিতে না পারেন, তাঁহারাই ভিন্ন ভিন্ন পথে ঘুরিয়া বেড়ান। একই বৈদিক-ধর্ম্মের অনুসরণকারী হইয়াও, পরিবর্ত্তি-কালে যে বিভিন্ন-সম্প্রদায় ধর্ম্মমত লইয়া পরস্পর শত্রুতাচরণ করিয়া গিয়াছেন, বৈদিক ধর্ম্মের সার মর্ম্ম উপলব্ধি না হওয়া—অথবা কোনও বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান-পদ্ধতির প্রতি অধিকতর আস্থাবান হওয়াই,—তাহার প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, শাক্ত-শৈব-বৈষ্ণব প্রভৃতির দ্বন্দ্বের বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহারা সকলেই হিন্দু—সকলেই বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন; অথচ, কর্ম্ম-পদ্ধতির এক-এক অংশের প্রতি তাঁহাদের কাহারও কাহারও লক্ষ্য নিপতিত হওয়ায়, অন্ধের হস্তি-দর্শনের ন্যায়, তাঁহারা সময় সময় ভ্রান্তবুদ্ধিতে পরিচালিত হইয়া থাকেন। প্রকারান্তরে ইহারও মূল—অধিকারিভেদ। অধিকার-ভেদ-তত্ত্বটুকু হৃদয়ঙ্গম হইলে, হিন্দুর সহিত হিন্দুর বিরোধ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

আর্য্যগণের আচার-ব্যবহার সভ্যতা প্রভৃতি।

বেদে আর দেখিতে পাই,—আর্য্য-হিন্দুগণের উচ্চ-সভ্যতার উজ্জ্বল প্রতিকৃতি। অধুনা সংসার, সভ্য-সমুন্নত জাতির পরিচয়-চিহ্ন বলিয়া যে সকল গুণ-পরম্পরার আরোপ করেন, আর্য্য-হিন্দুগণের তাহার কোন্ গুণের অভাব ছিল? যাঁহারা বলেন,—ধর্ম্মই সভ্যতার পরিচয়-চিহ্ন; বেদ তাঁহাদিগকে দেখাইতে পারেন,—পৃথিবীতে এমন নূতন ধর্ম্ম আজি পর্য্যন্ত কিছুই হয় নাই, বেদে যাহার উপাদান-সামগ্রী বিদ্যমান নাই! যাঁহারা বলেন,—বেদে প্রকৃতি-পূজা বা পৌত্তলিক-ধর্ম্মের প্রাধান্য আছে; তাঁহাদিগকেও নিঃসন্দেহে দেখাইতে পারা যায়,—অদ্বিতীয় ঈশ্বরের অনন্ত মহিমা বেদে বিবৃত রহিয়াছে। যাঁহারা বলেন,—হিন্দুর মধ্যে উদার বিশ্বজনীন ভাবের অভাব; বেদ তাঁহাদিগকেও চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইতে পারেন,—হিন্দুর ন্যায় উদার বিশ্বজনীন প্রাণ ক্বচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা বলেন,—'বেদ কৃষকের গান'; বেদে কৃষি-কার্য্যের উন্নতির জন্য উপাসনা আছে,—বৈদিক ঋষিগণ কৃষি-কার্য্যে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন, সুতরাং ঋষিগণ কৃষক ছিলেন; তাঁহাদের ন্যায় ভ্রান্ত-বুদ্ধি ব্যক্তিকেও বেদ দেখাইতে পারেন,—কৃষির উন্নতির জন্য ভগবানের করুণা-প্রার্থনা উদার বিশ্বজনীন ভাবেরই অভিব্যক্তি মাত্র। কৃষির উন্নতি হইলে, বসুন্ধরা শস্য-সম্পদে পরিপূর্ণ হইলে, জনসাধারণ সকলেরই সুখ-সৌভাগ্যে দেশ সমুন্নত শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন হইতে পারে;—আর্য্য-হিন্দুগণ মনে প্রাণে তজ্জন্যই কৃষির উন্নতি প্রার্থনা করিতেন। ইহা তাঁহাদের স্বদেশ-বাৎসল্য ও স্বজাতি-হিতৈষণারই পরিচায়ক। আর্য্য-ঋষিগণ কৃষির উন্নতির জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন *;—গো-মেষাদি পশুর এবং কৃষি-যন্ত্রাদির শুভকামনা করিতেছেন;—ইহাতে কদাচ তাঁহাদিগকে কৃষক-পর্য্যায়ভুক্ত করিতে পারা যায় না। যেমন বিভিন্ন ব্যক্তির ধর্ম্মানুষ্ঠান ও উপাসনা-পদ্ধতি বিভিন্ন আকারে বিদ্যমান ছিল, বিভিন্ন প্রকার কর্ম্ম-পদ্ধতিও তেমনি বিভিন্ন লোকের বা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য বিহিত হইয়াছিল। একই ব্যক্তি ভূমিকর্ষণ করিতেছেন, যজ্ঞ-কর্ম্মে ব্রতী রহিয়াছেন,

* ঋগ্বেদের চতুর্থ এবং দশম মণ্ডলে কৃষির উন্নতি-বিষয়ক স্তোত্রাদি দেখিতে পাওয়া যায়।

শাস্ত্র-গ্রন্থ রচনা করিতেছেন,—ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। ইহার কোনও প্রমাণও পাওয়া যায় না। কৃষক এবং কৃষি-কার্য্যের উন্নতির জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন বলিয়া, আর্য্য-হিন্দু-মাত্রকে কখনই কৃষক-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে না। ব্রাহ্মণ-পুরোহিত যদি যজমানের ব্যাধি-শান্তি-কামনায় দেবতার আরাধনা বা শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করেন; তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে,—পুরোহিত ব্রাহ্মণ স্বয়ংই সেই রোগাক্রান্ত? এ সিদ্ধান্তও যেরূপ ভ্রমমূলক; আর্য্য-হিন্দুগণ কৃষক ছিলেন এবং বেদ কৃষকের গান,—এ সিদ্ধান্তও তদ্রূপ ভ্রান্ত-বুদ্ধির পরিচায়ক। পাঠের এবং অর্থোদ্ধারের ব্যতিক্রমেও অনেকের ভ্রম-সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর। সাধারণ সংস্কৃত-সাহিত্যে একই শব্দের নানা অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়। বৈদিক সূক্তের অর্থ-পরিগ্রহ—আরও দুরূহ ব্যাপার। অর্থ-বিপর্য্যয় যে কতই ঘটিয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বিভিন্ন মতের বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সৃষ্টির অন্যতম কারণও—বৈদিক সূক্তের অর্থান্তর গ্রহণ। পরবর্ত্তি-কালে, কেহ যে জ্ঞানের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, কেহ যে কর্ম্মের প্রাধান্য কীর্ত্তন করিয়াছেন, আবার কেহ যে ভক্তির মাহাত্ম্যে বিভোর হইয়াছেন;—বৈদিক সূক্তের অংশবিশেষের সাহায্য-গ্রহণে আপনাপন মত-প্রতিষ্ঠা-চেষ্টাই তাহার হেতুভূত। যাহা হউক, ধর্ম্মবিষয়ে আর্য্য-হিন্দুগণ কতদূর উন্নত হইয়াছিলেন, সকল ধর্ম্মের সার সামগ্রী কিরূপভাবে তাঁহাদের অধিগত হইয়া ছিল,—বেদে তদ্বিষয়ের অভিজ্ঞতা লাভ হয়। আর্য্য-হিন্দুগণের আচার-ব্যবহারের পরিচয়ও বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। অধুনা বেদের যে সকল সংস্করণ এতদ্দেশে প্রচারিত ও ভাষান্তরিত হইয়া বিরাজমান আছে, তাহা হইতেই সকল বিষয়ের আভাস পাইতে পারি। অধুনা সভ্যজাতির সংসার-বন্ধন যেরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ, প্রাচীন আর্য্য-হিন্দুগণই তাহার আদর্শ-স্থানীয় ছিলেন। এখন যেমন সংসারের প্রধান ব্যক্তিই সংসারের সর্ব্বময় কর্ত্তা, তখনও সেই ভাবই বিদ্যমান ছিল। এখন যেমন সংসার ও বিবাহ-পদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাহারও আদর্শ—প্রাচীন আর্য্য-হিন্দুগণের সংসারে ও বিবাহ-পদ্ধতিতে দেখিতে পাই। এখন যেমন সভ্যজাতির মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ-ঘটিত ব্যভিচার দোষাবহ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে, তখনও স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে যথেচ্ছাচার-সম্বন্ধ তদ্রূপ দোষাবহ ছিল। এখন যেমন বিশেষ বিশেষ পূজা-পার্ব্বণে সতী সহধর্ম্মিণী-রূপে স্বামীর সহিত যাগযজ্ঞে ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত হইয়া থাকেন, বৈদিক কালেই তাহার আদর্শ দেখিতে পাই; ঋগ্বেদের প্রথম ও পঞ্চম মণ্ডলে, হিন্দু-দম্পতি ইন্দ্রের উপাসনায় ব্রতী রহিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। পিতার পরিচয়ে পুত্রের পরিচয়, বৈদিক কালের আর্য্য-হিন্দু-গণেরই অনুস্মৃতি মাত্র। হিন্দুর সংসারে এখন যেমন পিতাই ভরণ-পোষণ-দাতা রক্ষাকর্ত্তা, তখনও তাহাই ছিল। এখন যেমন জননী সন্তান-পালনে ও সংসার-পরিচর্য্যায় ব্রতী আছেন, তাহাও সেই বেদোক্ত কালের আর্য্য-হিন্দুগণের পদাঙ্ক অনুসরণ মাত্র। এখন যেমন হিন্দুর সংসারে পুত্র-পৌত্রাদি-সহ একান্নভুক্ত পরিবারের ব্যবস্থা আছে, বৈদিক কালেও সেই প্রথা প্রচলিত ছিল; প্রথম মণ্ডলের শততম চতুর্দ্দশ সূক্তে দেখিতে পাই, কুৎস ঋষি রুদ্রের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন,—"হে অমর রুদ্র।

আমাকে এবং আমার পুত্র-পৌত্রদিগকে সুখে রাখ এবং অন্নদান কর।" এখন যেমন পিতা উপযুক্ত পাত্রে আপন সালঙ্কারা কন্যা সমর্পণ করেন, বৈদিক কালেও সেই প্রথা প্রচলিত ছিল; ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে তাহার উল্লেখ আছে। এখন যেমন উত্তরাধিকার-বিধি প্রবর্ত্তিত আছে; পুত্র পিতৃধনের অধিকারী হন এবং পুত্র না থাকিলে দৌহিত্র সে সম্পত্তির অধিকারী হয়, তাহারও মূল সূত্র—ঋগ্বেদের তৃতীয় ও সপ্তম মণ্ডলে দেখিতে পাই। এখন যেমন সতীত্বের গৌরব আছে, বৈদিক কালেও সেই গৌরবের নিদর্শন পাওয়া যায়। এখন যেমন হিন্দুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা আছে, বৈদিক কালেও সেইরূপ দাহ-সৎকার-প্রথাই বিদ্যমান ছিল। বৈদিক যুগের রমণীগণ যেমন গৃহ-কার্য্যে পারদর্শী ছিলেন, সুশিক্ষার দিব্য-জ্যোতিও তাঁহাদের হৃদয়ে তদ্রূপ প্রবিষ্ট হইয়াছিল। তাঁহারা যেমন রন্ধন-কার্য্যে দক্ষ ছিলেন, বিদুষী বলিয়াও তাঁহাদের অনেকের সেইরূপ খ্যাতি ছিল। দেবাহুতি, অদিতি, যমী, উর্ব্বশী, অপালা, রোমাশা, লোপামুদ্রা প্রভৃতি বিদুষী রমণী-মণিগণের কাহিনী স্মরণ করিলেও হৃদয় বিস্ময়-রসে আপ্লুত হয়। কেহ কেহ বলেন,—বৈদিক সূক্তের সঙ্কলন-কার্য্যেও ঐ সকল রমণী সহায়তা করিয়াছিলেন। বৈদিক কালে—রাজা, নগরপতি, গ্রামপতি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পদের উল্লেখ দেখা যায়। সুনিয়মে রাজ্য-শাসনের, রাজকর-সংগ্রহের এবং যুদ্ধাদির সর্ব্বপ্রকার সুব্যবস্থার আভাস—বৈদিক সূক্তে বিদ্যমান রহিয়াছে। তখন, বীরত্বের আদর ছিল; কেহ ধন-গৌরবে উন্মত্ত, কেহ অন্নের জন্য লালায়িত, কেহ বা বাণিজ্যাদির দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিত! তখন, কামার, কুমার, ছুতার, কাঠুরিয়া, নাপিত, মাঝি, বৈদ্য, পুরোহিত,—সভ্য-সমাজের উপযোগী কিছুরই অভাব ছিল না। তখনও বয়ন-কার্য্য সূত্র-বস্ত্র প্রচলিত ছিল; তখনও স্বর্ণরৌপ্যের অলঙ্কারাদি ব্যবহৃত হইত; তখনও নগর ছিল, গ্রাম ছিল, অট্টালিকা ছিল, পান্থনিবাস ছিল, রাজপথ ছিল, শকট ছিল, যুদ্ধাস্ত্র ছিল, যোদ্ধা ছিল, আনন্দ ছিল, নৃত্য ছিল, গীত ছিল, বাণিজ্য ছিল, অতিথি-সৎকার ছিল, সংসারীর যাহা কিছু আবশ্যক—সকলই ছিল। আবার অন্যদিকে, ধর্ম্ম ছিল, কর্ম্ম ছিল, যাগযজ্ঞ ছিল, সত্য ছিল, সরলতা ছিল। এ কথা যে কেবল আমরা বলিতেছি, তাহা নহে; পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণও এ সকল কথা কখনই অস্বীকার করিতে পারেন নাই। কেবল যে সংসার-ধর্ম্মেই তাঁহাদের প্রতিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়—এমন নহে। এক কথায় কহিতে গেলে, সভ্যতার পরিচায়ক যে কিছু সম্পৎ-সামগ্রী, তাঁহারা তাহার সকলেরই অধিকারী ছিলেন। তাঁহাদের অজ্ঞাত কোনও নূতন তত্ত্ব আজি পর্য্যন্ত কেহ আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন বলিয়াও মনে হয় না। কয়েকটী দৃষ্টান্তই উল্লেখ করি না কেন? আধুনিক পণ্ডিতগণের মত,—সভ্যতার আদিকালে বিনিময় মুদ্রার প্রচলন ছিল না। কিন্তু ঋগ্বেদের চতুর্থ ও পঞ্চম মণ্ডলে এই বিনিময়-মুদ্রার উল্লেখ আছে। স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ প্রভৃতি ধাতব দ্রব্য ব্যবহারের অভিজ্ঞতাও যে আর্য্য-হিন্দুগণের ছিল,—বেদে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন মিশরের ও বাবিলনের প্রস্তর-স্তম্ভ প্রভৃতির নিদর্শন পাইয়া, প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের আনন্দের অবধি নাই;

কিন্তু আর্য্য-হিন্দুগণ পূর্ত্তকার্য্যে কিরূপ সুদক্ষ ছিলেন,—সহস্রস্তম্ভযুক্ত বিশাল অট্টালিকার প্রসঙ্গে ঋগ্বেদের দ্বিতীয় ও পঞ্চম মণ্ডলে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্ব্বে প্রতিপন্ন করিয়াছি,—মিশরের সভ্যতার কত কোটি-কল্প বৎসর পূর্ব্বে ঋগ্বেদ প্রচলিত ছিল। সেই ঋগ্বেদে যখন এতাদৃশ অট্টালিকার প্রসঙ্গ উত্থাপিত আছে, তখন বিচার করিয়া দেখুন, আদিকালেও আর্য্য-হিন্দুগণ পূর্ত্তকার্য্যে কীদৃশ পারদর্শী ছিলেন! অধুনাতন সভ্য-জাতি-মাত্রেরই মত,—"পৃথিবী দিন দিন সভ্যতার পথে অগ্রসর হইতেছে।" সেই মত সমর্থনের ব্যপদেশে তাঁহারা পৃথিবীর আদিম অধিবাসীদিগের সভ্যতার নানা স্তর নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আদিম জাতিগণ প্রথমে অস্ত্রশস্ত্র ও অগ্নির ব্যবহার করিতে জানিত না, তাহারা আম-মাংস ও অপরিপক্ক দ্রব্যাদি ভক্ষণ করিয়া জীবন-যাপন করিত, গিরিগুহা ও বৃক্ষ-কোটর প্রভৃতি তাহাদের আবাস-স্থান মধ্যে পরিগণিত ছিল; পরে ক্রমশঃ ধাতব পদার্থ অস্ত্র-শস্ত্রাদি ব্যবহার করিতে তাহারা অভ্যস্ত হয় এবং ধীরে ধীরে পূর্ব্ব অভ্যাস পরিত্যাগ করে। কিন্তু হিন্দু-শাস্ত্রের মত—উহার সম্পূর্ণ বিরোধী। শাস্ত্রের মতে,—মনুষ্য প্রথমে সভ্য-সমুন্নত ছিল; সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি প্রভৃতি যুগ-বিবর্ত্তনে দিন দিনই তাহাদের অধঃপতন সাধিত হইতেছে। অন্য দেশের ও ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস তুলনা করিলে, আপাতঃ-দৃষ্টিতে উভয় সিদ্ধান্তই প্রমাদশূন্য বলিয়া মনে হইতে পারে। ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য দেশে প্রথমে অসভ্য বর্ব্বর জাতির বসতি ছিল,—তত্তদ্দেশের প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণ তাহাই অনুসন্ধান করিয়া পাইয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসে ভারতবর্ষ আদিকাল হইতেই সভ্য-সমুন্নত বলিয়া কীর্ত্তি হইয়াছে। সুতরাং, উভয় দেশের সিদ্ধান্তে মতদ্বৈধ ঘটিবে,—তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যাহা হউক, যখন ভারতবর্ষের কথাই কহিতেছি;—আর্য্য-হিন্দুগণের ইতিহাস আলোচনায় ব্রতী হইয়াছি; তখন তাঁহাদের আচার-ব্যবহার প্রভৃতির যে পরিচয় তাঁহাদের গ্রন্থপত্রে পাওয়া যায়, তাহার আলোচনায়, তাঁহাদের সিদ্ধান্তই সমীচীন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। সে সিদ্ধান্তে, আদিকালে আর্য্য-হিন্দুগণ সভ্যতার উচ্চ সোপানে সমারূঢ় ছিলেন, পরবর্ত্তি-কালে ক্রমশঃ তাঁহাদের অধঃপতন সাধিত হইয়াছে,—ইহাই বুঝিতে পারা যায়।

বেদে জাতিভেদ।

আর্য্য-হিন্দুগণের সমাজ-ধর্ম্মের বিষয় আলোচনা করিতে গেলে, জাতি-বর্ণের কথা না বলিলে সে আলোচনা অসম্পূর্ণ রহিল বলিয়া মনে হয়। তাঁহাদের জাতিবর্ণের প্রসঙ্গ লইয়া বহু দিন হইতেই দ্বন্দ্ব চলিয়া আসিতেছে। শাস্ত্রানুশাসন পরিচালিত হিন্দুগণের মত,—"জাতি-বর্ণ-ভেদ সৃষ্টির আদিকাল হইতেই অব্যাহত আছে; উহা সর্ব্বথা বেদ-বিহিত।" তৎপক্ষে তাঁহারা বেদ হইতে প্রমাণ উদ্ধার করিতেও ত্রুটি করেন না। এ দিকে কিন্তু দেখিতে পাই,—অন্য পক্ষ বলেন,—"বেদে জাতিভেদ নাই; সৃষ্টির আদি-কালেও জাতিভেদ ছিল না; উহ ব্রাহ্মণগণের গূঢ় উদ্দেশ্য-সিদ্ধির কল্পনা মাত্র।" যখন এতাদৃশ মতদ্বৈধ, তখন দেখা উচিত নহে কি—বেদে জাতি-বর্ণের বিষয় বাস্তবিক কিছু আছে কি না? অথবা, জাতিবং বিজ্ঞান-সম্মত কি না? এ বিষয়ে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে মীমাংসা আছে। প্রথমে প্রঃ

করা হইয়াছে,—"পুরুষ যখন বিভক্ত হন, তখন তিনি কয় ভাগে বিভক্ত হইয়াছিলেন? তাঁহার মুখ, বাহু, উরু, পদ—কি আকার ধারণ করিয়াছিল?" পরক্ষণেই তাহার উত্তর দেখিতে পাই,—"তাঁহার মুখে ব্রাহ্মণ, বাহু-যুগলে রাজন্য, উরুদ্বয়ে বৈশ্য এবং পদ-যুগলে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছিল।" * তবেই বুঝা যায়,—পুরুষ-সৃষ্টির আদিকালেই ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-চতুষ্টয়ের সৃষ্টি। পরবর্ত্তী শাস্ত্রাদিতে এই বিষয় অধিকতর বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই জাতি-বর্ণ-ভেদই ভারতবর্ষের বিশেষত্ব। পৃথিবীর অন্য যে কোনও দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইলেও, সকল দেশের অধিবাসিগণই আপনাদিগকে এক-জাতি বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হয় না; কিন্তু ভারতবর্ষের আর্য্য-হিন্দুগণ তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত-ভাবাপন্ন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র,— প্রধানতঃ তাঁহাদের এই চারি বর্ণ। তাহা হইতেই অসংখ্য শাখা-উপশাখা উৎপন্ন হইয়া, ভারতবর্ষের সমাজ-শরীর পুষ্ট করিয়া আছে। ভারতবর্ষের জল-বায়ুর সহিত বুঝি বা এই জাতিভেদ-প্রথার ওতঃপ্রোত সম্বন্ধ। বিভিন্ন ধর্ম্মের, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের, বিভিন্ন মতের অভিঘাতে ভারতের সমাজ-শরীর এখন জীর্ণশীর্ণ; কিন্তু জাতিভেদ-প্রথা এখনও এমনিভাবে মজ্জায় মজ্জায় শিরায় শিরায় অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে যে, কোনক্রমেই তৎপ্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের ক্ষমতা সমাজের নাই। এখনও, ব্রাহ্মণ দেখিলে, সৎ-শূদ্র মাত্রেই প্রণাম না করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না। এখনও—এতাদৃশ সাম্য-স্বাধীনতার দিনেও, এক বর্ণ অন্য বর্ণের সহিত বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপন করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন। এখনও, সমাজে, ধর্ম্মে, ক্রিয়া-কর্ম্মে, আচারে-ব্যবহারে, বর্ণগত-পার্থক্য সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। এ পার্থক্য যদি মনুষ্য-কৃত হইবে, তাহা হইলে এত কাল ধরিয়া এমন অবিসম্বাদিত সত্য-রূপে ইহা কখনই অব্যাহত থাকিতে পারিত না। যাহা মনুষ্য-সৃষ্ট, তাহা বিনশ্বর—অস্থায়ী। অপিচ, যাহা অবিনশ্বর, অনাদি অনন্তকাল হইতে বিরাজমান, ঈশ্বরের সৃষ্ট ভিন্ন তাহাকে আর কি বলিতে পারি? যাঁহারা বেদ মানেন, বেদের অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকার করেন,—তাঁহারা কখনই জাতিবর্ণ-সম্বন্ধে অন্যমত হইতে পারিবেন না। তবে যাঁহারা বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না, তাঁহারা যে এ বিষয়ে অন্যমত প্রকাশ করিবেন,—তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? অধিক বলিব কি, তাঁহারা ঐ বৈদিক সূক্তটীকেই উড়াইয়া দিবার চেষ্টা পাইয়া থাকেন। প্রথমে ইউরোপীয় পণ্ডিত মিঃ কোলব্রুক ঐ বৈদিক সূক্তটীকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তিনি বলেন,— বৈদিক-ভাষার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে গেলে, ঐ সূক্তটী পরবর্ত্তি-কালে বেদের সহিত সংযুক্ত হইয়াছিল বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। সাহেব কোলব্রুক যখন এই কথা

* ঋগ্বেদের পুরুষ-সূক্তের দশম মণ্ডলে জাতিভেদ বিষয়ক এই ঋক্-দ্বয় দৃষ্ট হয়,—

"যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন।
মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কা উরুপাদা উচ্যেতে॥
ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরু তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়তঃ॥"

বেদে জাতিভেদের কথা নাই বলিয়া যাঁহারা অন্যকে ভ্রান্তপথে পরিচালনার প্রয়াস পান, তাঁহাদের ভ্রান্তি অপনোদনের জন্য দশম মণ্ডলের এই সূক্ত উদ্ধৃত করা হইল।

বলিতে সাহসী হন, পাশ্চাত্য-মতাবলম্বী অন্যান্য পণ্ডিতগণও অমনি তাহার প্রতিধ্বনি আরম্ভ করেন। সঙ্গে সঙ্গে এখন, ঐ সূক্তটী প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মানিয়া লইয়া, তাঁহারা জাতিভেদ-প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমার আবশ্যকানুযায়ী আমার বুদ্ধি-বৃত্তির সহায়তাকারী যাহা, তাহাই ঠিক—আর অন্যান্য সকল প্রক্ষিপ্ত, ইহা বড়ই অদ্ভুত সিদ্ধান্ত নহে কি? যদি মানিতেই হয়, সমস্তই মানিয়া লও; যদি না মানিতে হয়, কোনটীই মানিবার প্রয়োজন নাই। উহাতে কেবল লোকের মনে প্রমাদ-সংশয় উপস্থিত করে; সত্য তথ্য অল্পই নির্ণীত হইয়া থাকে। যাঁহারা জাতি-ধর্ম্মের বিরোধী, তাঁহারা শাস্ত্রের অংশ-বিশেষের দোহাই দিয়া আপনাদের সিদ্ধান্তের সার্থকতা প্রতিপাদনে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। শাস্ত্রে আছে,—'গুণকর্ম্ম-বিভাগ অনুসারেই জাতি সৃষ্টি হইয়াছে।' এই শাস্ত্রোক্তির দোহাই দিয়া, জাতি-ধর্ম্মের প্রতিপক্ষগণ বলিয়া থাকেন,—'কর্ম্ম ও গুণ অনুসারেই তো জাতি হইবার কথা! যে যেমন উচ্চ কর্ম্ম করিবে, সেই সেইরূপ উচ্চ-জাতি হইবে; যে যেরূপ নীচ-কর্ম্ম করিবে, তাহাকে সেইরূপ নীচ-জাতি হইতে হইবে।' এক হিসাবে, এ সিদ্ধান্তও ভ্রম-সঙ্কুল;—শাস্ত্রের একাংশ পরিত্যাগ করিয়া অপরাংশ গ্রহণের ফল। ভারতবর্ষের জাতি-ধর্ম্ম-সৃষ্টির ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাই,—আগে জাতি, পরে কর্ম্মভাগ। ভারত-বর্ষের ইহাই চিরন্তন প্রথা। যাঁহারা এ কথা অস্বীকার করিবার চেষ্টা পান, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি,—তাঁহারা কি বলিতে পারেন,—'আগে যজ্ঞকর্ম্মোপাসনা—না, আগে ব্রাহ্মণের জন্ম? আগে বিপ্রসেবা—না, আগে শূদ্রের উৎপত্তি? আগে যুদ্ধ বিগ্রহ—না, আগে ক্ষত্রিয়ত্ব?' ফলতঃ, জাতি-বর্ণ-ক্রমে জন্মগ্রহণ করিয়াই মানুষ এক-এক কর্ম্মের অধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে; পরন্তু, অধিকার প্রাপ্ত হইবার পর কেহই জন্মগ্রহণ করে না। আর এক কথা, যদি আগে গুণ-কর্ম্মের বিচারই হইবে, তাহা হইলে, চতুর্ব্বর্ণ না হইয়া, অসংখ্য বর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না কি? ইহ-সংসারে গুণ-কর্ম্মের কি কখনও সংখ্যা নির্দ্দেশ করা যায়? গুণকর্ম্মানুসারে জাতি-বিভাগ হইলে, বংশানুক্রমিক জাতি-বর্ণ কেনই বা অব্যাহত থাকিবে? তাহা হইলে, ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের পুত্র ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের পুত্র বৈশ্য, শূদ্রের পুত্র শূদ্র,—এরূপ নিয়ম-পদ্ধতিই বা কেন চলিয়া আসিবে? ভগবান বলিয়াছেন,—'গুণ-কর্ম্ম-বিভাগ অনুসারে চতুর্ব্বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি।' * ইহাতে সৃষ্টি-শব্দের উল্লেখ থাকায়, বুঝা যায়,—সৃষ্টির আদি হইতেই, জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই, জাত-ব্যক্তির জাতিধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে; জন্মগ্রহণের পর, বৃত্তি-গ্রহণানন্তর, তাহার জাতিধর্ম্ম-প্রাপ্তির বিষয় কোনক্রমেই প্রতিপন্ন হয় না। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে, এতদিন কোন্ কালে, কত শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিত, আবার কত ব্রাহ্মণ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইত। এই কথার উত্তরে, কেহ কেহ বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব-প্রাপ্তির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া থাকেন; কেহ বা, অন্য দুই একটী দৃষ্টান্তের অবতারণা করিবারও চেষ্টা পান। বিশ্বামিত্রের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে হইলে, প্রথমতঃ বুঝিবার প্রয়োজন হয়—কোন্ বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন? আমরা

* "চাতুর্ব্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।"—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

ঋগ্বেদেই একাধিক বিশ্বামিত্রের পরিচয় পাই। পুরাণাদিতেও নানা সময়ে নানা আকারে বিশ্বামিত্রের প্রসঙ্গ উল্লিখিত আছে। সুতরাং বিশ্বামিত্র নাম দেখিলেই তাঁহাকে এক ব্যক্তি বলিয়া ধারণা করিতে পারা যায় না। ঋগ্বেদে কোথাও বিশ্বামিত্র ঋষি দেবতারূপে স্তুত হইয়াছেন, কোথাও সূক্তসঙ্কলয়িতারূপে পরিচিত আছেন, কোথাও বা তাঁহার নামের শেষে 'গাথিন' শব্দের সংযোগ আছে। ঋগ্বেদের সত্যযুগে বিশ্বামিত্র আছেন, আবার রামায়ণের ত্রেতাযুগেও বিশ্বামিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং বিশ্বামিত্র যে এক ব্যক্তি নহেন, তাহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হয়। সে হিসাবে, বেদোক্ত বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য বর্ণ হওয়া কোনক্রমেই সম্ভবপর নহে। বেদে, বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণেতর অন্য বর্ণ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার কোনই প্রমাণ দেখা যায় না। তার পর, যে বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণত্ব-লাভ করিয়াছিলেন, পুরাণে তাঁহার যে জন্ম-বিবরণ বর্ণিত আছে, তদ্দ্বারা তিনি ব্রাহ্মণ-বীর্য্যে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়াই প্রতীত হয়। * যদি অতিরঞ্জিত উপাখ্যান বলিয়া সে পৌরাণিক প্রসঙ্গে কেহ আস্থা-স্থাপন করিতে পরাঙ্মুখ হন, এতৎপ্রসঙ্গে তাঁহাদিগকে আরও একটী কথা বলা যাইতে পারে। বিশ্বামিত্র, কর্ম্মবলে, তপঃপ্রভাবে, ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ইহা তাঁহার কর্ম্মফল। পূর্ব্ব-জীবনের কর্ম্মফলের সহিত ইহজীবনের প্রবল কর্ম্মফল সংযুক্ত হওয়ায়, বিশ্বামিত্র আপন অ-দৃষ্ট প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছিলেন। এক বিশ্বামিত্রই তাহা পারিয়াছিলেন,—আর কেহ তাহা পারেন নাই ;—ইহা বিশেষত্ব, ইহা দৃষ্টান্ত-মাত্র ; কিন্তু ইহা প্রচলিত সামাজিক রীতি-পদ্ধতি নহে। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে আরও কত কত ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারিত। তাহা যখন হয় নাই, সেরূপ দৃষ্টান্ত যখন আর খুঁজিয়া পাই না ; তখন, একটী মাত্র বিশেষ দৃষ্টান্তে, কি করিয়া সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি ? বিশেষতঃ, সে বিশ্বামিত্র কখনই তোমার-আমার ন্যায় সাধারণ মনুষ্য ছিলেন না। তিনি অলৌকিক অমানুষিক শক্তি-সম্পন্ন পুরুষ ছিলেন ; সুতরাং তিনি অলৌকিক ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। তেমন শক্তি-সম্পন্ন যদি কোনও মহাপুরুষ কখনও জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু তাই বলিয়া, বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব-লাভে, শাস্ত্রে বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধবাদ আছে,—ইহা কোনক্রমেই স্বীকার করিতে পারি না। বেদের আর একটী ঋষির কথা উল্লেখ করিয়া, পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন পণ্ডিতগণ বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন,—ব্রাহ্মণেতর বর্ণও বৈদিক সূক্তের রচয়িতা ছিলেন। তাঁহাদের সে প্রয়াসও বিড়ম্বনা মাত্র। বেদের নবম মণ্ডলের সূক্ত-বিশেষের ভাষান্তরে তাঁহারা বলেন,—একজন বেদ-রচয়িতা ঋষি, সোমের আরাধনার সময় বলিতেছেন,—"আমার পিতা চিকিৎসক, মাতা যাঁতায় শস্য পেষণ করেন ; কিন্তু দেখুন, আমি বৈদিক-মন্ত্র রচনা করিয়াছি।" † ঋষিপ্রবরের এই মাত্র কথার উপর নির্ভর করিয়া, জাতিভেদের প্রতিপক্ষগণ প্রমাণ করিতে চাহেন,—'ঋষি বর্ণসঙ্কর ছিলেন ; অথচ, তিনি বৈদিক-মন্ত্রের রচয়িতা, সুতরাং ব্রাহ্মণ-পদবাচ্য।' ইহা বড়ই হাস্যকর সিদ্ধান্ত। আমাদের মনে হয়, বৈদিক সূক্ত-রচয়িতা ঋষির ঐরূপ উক্তিতে পুরুষানুক্রমিক বর্ণধর্ম্মেরই প্রাধান্য

* মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব ও অনুশাসন-পর্ব্ব, বিশ্বামিত্রের জন্ম-বিবরণ দ্রষ্টব্য।

† নবম মণ্ডলের ১১২শ সূক্ত দ্রষ্টব্য।

প্রতিপন্ন হইতেছে। ঋষি যে ব্রাহ্মণ-সন্তান নহেন, তিনি কোথাও তাহা বলেন নাই। তিনি কেবলমাত্র বলিয়াছেন,—তাঁহার পিতামাতার জীবিকার কথা। সে হিসাবে, হয় তো তাঁহার পিতামাতা কোনরূপ পাতিত্য-দোষে দুষ্ট হইতে পারেন; কিন্তু তাহাতে তিনি যে ব্রাহ্মণ-বংশ-সম্ভূত নহেন,—তাহা কোনমতেই প্রমাণিত হয় না। বরং, এখন যে সকল ব্রাহ্মণ-সন্তান বৃত্ত্যন্তর গ্রহণ করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতেছেন, তাঁহাদের সন্তান-সন্ততির পাতিত্য-দোষ হইতে রক্ষা-প্রাপ্তির পক্ষে ইহা এক দৃষ্টান্ত-রূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে। ফলতঃ, এ দৃষ্টান্ত জন্মগত বর্ণধর্ম্মেরই প্রতিপোষক; ইহা কখনই তাহার অন্তরায়-সাধক নহে। এইরূপ, ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের 'কবষ' ও 'লুশ' ঋষির প্রসঙ্গে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন,—'তাঁহারা শূদ্র ছিলেন; অথচ বৈদিক সূক্ত রচনা করিয়া গিয়াছেন।' এই সম্বন্ধেও, আমাদের সেই একই উত্তর। 'কবষ ও লুশ' ঋষি যে শূদ্র ছিলেন, বেদে তাহার কোনই উল্লেখ নাই। অন্যত্রও, যেখানে যেখানে বর্ণান্তরের ব্রাহ্মণত্ব-প্রাপ্তির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়, কোথাও দৃঢ়-ভিত্তির উপর তাহা প্রতিষ্ঠিত নহে। মন্বাদি সংহিতা—বেদের অনুবর্ত্তিনী। সুতরাং মন্বাদি সংহিতায় যদি ঐরূপ কোনও প্রসঙ্গ আছে দেখাইতে পারা যায়, তাহা হইলে বর্ণাশ্রম-বিরোধিগণের উদ্দেশ্য অনেকাংশ সিদ্ধ হইতে পারে। তাই তাঁহারা, সময়ে সময়ে, মনুসংহিতার একটী শ্লোকের দোহাই দিয়াও বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন,—'মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ের পঞ্চষষ্টি শ্লোকে লিখিত আছে,—ব্রাহ্মণের শূদ্রত্ব এবং ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদির ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইতে পারে।' মনুসংহিতায় যে এই মর্ম্মের কোনও প্রসঙ্গ আদৌ নাই, তাহা আমরা কখনই বলি না। তবে সে সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই,—ঐ শ্লোকের পূর্ব্বে ও পরে কি কি বিষয়ের উল্লেখ আছে, এবং সে হিসাবে এই শ্লোকটী সম্পূর্ণ কি না,—তাহা বিবেচনা করিয়া, তৎপরে ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে বোধ হয় ন্যায়সঙ্গত ও সমীচীন কার্য্য হইত। কিন্তু তাহা না করায় একদেশদর্শিতা—প্রকারান্তরে শ্লোকার্দ্ধের অনুবর্ত্তিতা—প্রকাশ পাইতেছে। মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ে যে বর্ণ-সঙ্করের অথবা এক বর্ণের বর্ণান্তর-প্রাপ্তির বিষয় লিখিত আছে, বলা বাহুল্য, প্রোক্ত শ্লোকটী তাহারই অংশ-বিশেষ। সে সকল মিলাইয়া দেখিলে, স্পষ্টতঃই প্রতিপন্ন হয়, শূদ্রাদি বর্ণের যে ব্রাহ্মণত্ব-প্রাপ্তির কথা সেখানে লিখিত আছে, তাহাই সপ্ত জন্মের পরে; * অপিচ, সেরূপভাবে ব্রাহ্মণত্ব-লাভ কখনই প্রশংসনীয় বলিয়া গণ্য হয় নাই। আর এক কথা, একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে দেখিতে পাই, জাতিভেদ-প্রথার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের চেষ্টা করিয়াও কোনও সমাজ এ পর্য্যন্ত অভীষ্ট লাভ করিতে পারেন নাই। বরং তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন নূতন জাতির (বা সম্প্রদায়ের) সৃষ্টি হইয়াছে। বৌদ্ধগণ এক-জাতি সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার ফলে দাঁড়াইয়াছিল,—তাঁহারাই পৃথক হইয়া পড়িয়াছিলেন। এইরূপ, খৃষ্টানগণ, ব্রাহ্মগণ, যিনিই যখন একাকার বা একজাতি সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছেন, তিনিই তদ্দ্বারা আর এক নূতন জাতির বা নূতন সম্প্রদায়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া

* মনুসংহিতার দশম অধ্যায়, ৬৩—৬৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

গিয়াছেন মাত্র। অধিক বলিব কি, হিন্দুজাতির অন্তর্ভুক্ত বৈষ্ণব-সম্প্রদায় পর্য্যন্ত এই হিসাবে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছেন। তার পর, যাঁহারা ঐ সকল নূতন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া আছেন, তাঁহারাই কি আপনাপন সংস্কার পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছেন? হয় তো কোথাও কোথাও আহারে ব্যবহারে বা লৌকিকতায় তাঁহাদের এক-জাতিত্ব প্রতিপন্ন হইতে পারে; কিন্তু বিবাহাদি ব্যাপারে, এখনও তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে জাতিগত সংস্কারের ফল বিশেষরূপে প্রত্যক্ষীভূত হয় না কি? সে সংস্কার—আমরা কোথায় না দেখিতে পাই? এক-জাতি মধ্যে পরিগণিত হইলেও, পূর্ব্বে যিনি ব্রাহ্মণাদি উচ্চ-বর্ণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তিনি নিঃসঙ্কোচে কখনও চণ্ডালাদি অন্ত্যজ বর্ণের সহিত বিবাহাদি-সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত হইতে পারেন কি? হয় তো তিনি তাঁহার দৃষ্টিতে শিক্ষিত-সভ্য-ভব্য কোনও নীচ জাতির সহিত সম্বন্ধ-স্থাপনে কুণ্ঠিত না হইতে পারেন; কিন্তু অসভ্য কদাচারী ব্যক্তির সহিত কখনই তিনি সম্বন্ধ-বন্ধনে আবদ্ধ হইবেন না। আধুনিক বহু সম্প্রদায়ের আচার-ব্যবহার দেখিয়া, অন্ততঃ এই কথাই আমাদের মনে হয়। ফলতঃ, একাকারের পক্ষপাতী হইলেও, সকলেরই মধ্যে জাতিভেদের ফল্গু-প্রবাহ প্রবাহিত রহিয়াছে। কেবল এ দেশে বলিয়া নহে;—পাশ্চাত্য ইউরোপেও এ ভাবের অসদ্ভাব নাই। যদিও এদেশের সহিত সে দেশের তুলনা হইতে পারে না এবং সে তুলনা করিতেও চাহি না; তথাপি মোটামুটি দেখিতে পাই,—এক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইলেও, সেখানকার কোনও অভিজাত ব্যক্তি কখনও কোনও নীচ-বংশীয়ের সহিত সম্বন্ধ-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে চাহেন না; সময় সময়, এক পংক্তিতে ভোজনেও তাঁহাদের আপত্তি দেখা যায়। কি হিন্দু, কি অহিন্দু, কি আর্য্য, কি অনার্য্য, সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই কোন-না-কোন আকারে এই জাতিভেদ-প্রথার বীজ নিহিত আছে। আর সেই জন্যই, জাতিভেদ যে ঈশ্বরের সৃষ্টি, সৃষ্টির আদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা স্বতঃই মনে হয়। তবে, ভারতের সহিত অন্যান্য দেশের যে পার্থক্য দৃষ্ট হয়, তাহার কারণ,—ভারতবর্ষ সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন সভ্যতা লাভ করিয়াছিল, তাই ভারতীয় হিন্দুগণের জাতিভেদ-প্রথার সর্ব্বাঙ্গীণ পুষ্টি সাধিত হইয়াছিল। জন্মগত অধিকার-ভেদ—আর্য্য-হিন্দুগণের সেই সর্ব্বাঙ্গীন সভ্যতারই পরিচায়ক। আমরা প্রধানতঃ দেখিতে পাই—জন্মাগত জাতি-বর্ণানুক্রমে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির উন্মেষ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণাদি উচ্চ-বর্ণের বুদ্ধি-বৃত্তির সহিত নিম্নতম বর্ণের বুদ্ধি-বৃত্তির তারতম্য—কে না লক্ষ্য করিয়াছেন? কৃষক-শূদ্রের কৃষিকার্য্যে সংস্কার আপনিই সঞ্চিত হয়; কর্ম্মকার, কুম্ভকার, সূত্রধর প্রভৃতি বৃত্তি-জীবীদিগের সন্তান-সন্ততির উপর বংশানুক্রমিক প্রভাব আপনি আসিয়া পড়ে; অন্যান্য জাতিবর্ণ-সম্বন্ধেও সেই একই ভাব দেখিতে পাই। ইহাই বংশানুগত বর্ণ-ধর্ম্মের ভিত্তি। সেই জন্যই, ধর্ম্মান্তর পরিগ্রহ করিয়াও, মানুষ আপন সংস্কার পরিত্যাগ করিতে পারে না। বিপদে বা প্রলোভনে পতিত হইয়া, মানুষ অনেক সময় ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে; কিন্তু সর্ব্বথা তাহার পূর্ব্বসংস্কার দূর হয় কি? তাই দেখিতে পাই, মুসলমান-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াও, এ দেশের বহু অধিবাসী আজিও হিন্দু-দেব দেবীর উপাসনায় যোগ দেয়।

তাই দেখিতে পাই, মান্দ্রাজী খৃষ্টানগণ অনেকেই এখন শিখা ধারণ করে এবং দেবদেবীর পূজা করিয়া থাকে। তাহাদিগের ধারণা,—তাহারা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে বটে, কিন্তু জাতিত্যাগ করে নাই। বর্ণ, ব্রাহ্মণ, বিপ্র, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি শব্দ—বেদে একাধিক বার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তৃতীয় মণ্ডলের চতুস্ত্রিংশ সূক্তে বিশ্বামিত্র ঋষি ইন্দ্র দেবতার উপাসনা-স্তোত্রে বলিতেছেন,—"হত্বী দস্যূন প্র আর্য্যং বর্ণং আবৎ।" ঋগ্বেদের ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য তাহার অর্থ করিয়াছেন,—"হে ইন্দ্র, আপনি দস্যুদিগের বধ-সাধন করিয়া আর্য্যবর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি জাতিকে রক্ষা করুন।" যাঁহারা জাতি-ভেদ মানিতে চাহেন না, তাঁহারা কৌশলে উক্ত সূক্তান্তর্গত 'বর্ণ' শব্দটিকে একরূপ উড়াইয়া দিবার চেষ্টা পাইয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহারা বলেন,—"সায়ণের অর্থ ঠিক নহে; ঋগ্বেদের সময় দুই জাতি ছিল—আর্য্যজাতি ও অনার্য্য-জাতি। এখানে 'বর্ণ' শব্দে তাহাই বুঝাইতেছে।" * ইহার উপর বাঙ্‌নিষ্পত্তি বাহুল্য মাত্র। বেদ-ব্যাখ্যায় যাঁহারা সায়ণের উপর হস্তক্ষেপ করিতে চাহেন, তাঁহাদের স্পর্দ্ধায় বলিহারি যাই! বিপ্র ও ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ, তাঁহারা করিয়াছেন—স্তোত্র-রচয়িতা। ক্ষত্রিয়-শব্দের অর্থ করিয়াছেন,—বীর্য্যবান্। অথচ, বেদে যে যে স্থলে ঐ সকল শব্দের প্রয়োগ আছে, তত্তৎস্থলে সায়ণাচার্য্যের অর্থ গ্রহণ করিলে, ঐ সকল শব্দে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণের ভাবই মনে উদয় হয়। সপ্তম মণ্ডলের উননবতি সূক্তে বরুণের উপাসনা আছে। সেই উপাসনায় তাঁহাকে 'রাজা' বলা হইয়াছে এবং তিনি 'সুক্ষত্র' বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন। সূক্তটী পাঠ করিলে, সেই বরুণ রাজাকে কোনও ক্ষত্রিয় রাজা বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু, পাছে 'ক্ষত্রিয়' বর্ণের সৃষ্টির কথা স্বীকার করিতে হয়,—এই জন্য, পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ 'সুক্ষত্র' শব্দের অর্থ—'বলবান' করিয়াছেন। * ইহাও বিস্ময়ের বিষয় নহে কি? যাহা হউক, সায়াণাচার্য্য প্রভৃতির ভাষ্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া, আধুনিক পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন পণ্ডিতগণের স্বকপোল-কল্পিত অর্থ যে কেহ গ্রহণ করিবেন,—তাহা কখনই মনে হয় না। যিনিই যাহা বলুন, ফলে দেখা যায়,—বর্ণ-ভেদ প্রথা বৈদিক কাল হইতেই এদেশে প্রচলিত আছে; এবং ঐ প্রথা এ দেশের প্রকৃতির সহিত মজ্জাগত-ভাবে অবস্থিত।

বেদ হইতেই যে অন্যান্য শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে, হিন্দুকে তাহা বুঝাইবার আবশ্যক হয় না; অপরেও তাহা অস্বীকার করিতে পারেন না। যাহা বেদানুগত—তাহাই শাস্ত্র।

বেদই সর্ব্ব-শাস্ত্রের মূল।

শাস্ত্র—বেদেরই অভিব্যক্তি মাত্র। বেদ—হৃদয়ের সামগ্রী; বেদ—হৃদয়েই অধিষ্ঠিত ছিল। যতদূর প্রমাণ পাওয়া যায়, বেদ প্রথমে লিপিবদ্ধ হয় নাই; বৈদিক সূক্ত-সমূহ তখন ঋষিগণের হৃদয়ে হৃদয়ে কণ্ঠে কণ্ঠে সংগ্রথিত ছিল। পিতা, পুত্রকে সে স্তোত্র কণ্ঠস্থ করাইতেন; পুত্র, প্রপৌত্রকে সে মন্ত্রে

* ম্যাক্সমুলার প্রথমে এই অর্থ (সুক্ষত্র=Almighty) করিয়াছিলেন। তাঁহারই অনুসরণে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ও ঐ শব্দে 'অতিশয় বলবান' অর্থ গ্রহণ করেন। 'বর্ণ' শব্দের পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থও বোধ হয়, রমেশ বাবুরই কল্পনা-প্রসূত।

দীক্ষিত করিতেন।* পুরুষানুক্রমে এই ভাবেই বৈদিক স্তোত্র-সমূহ সংসারে চলিয়া আসিতেছিল। বেদের অপর নাম—শ্রুতি; শিষ্যানুশিষ্যক্রমে শ্রুতি-পরম্পরায় চলিয়া আসিয়াছিল,—সেই জন্যই বেদের অপর নাম—'শ্রুতি'। কালধর্ম্মে মনুষ্যের ধৃতি-শক্তির হ্রাস হইতেছে—উপলব্ধি করিয়া, জনহিত-ব্রতধারী ঋষিগণ বেদের সূক্ত-সমূহ লিপিবদ্ধ করিতে আরম্ভ করেন; এবং তাহারই কিছুকাল পরে, কোন্ সূক্ত কিরূপভাবে যাগ-যজ্ঞ-ক্রিয়াকাণ্ডে ব্যবহৃত হইবে,—তাহা নির্দ্দেশ করিবার জন্য, বেদের ব্রাহ্মণ-ভাগের সৃষ্টি হয়। ব্রাহ্মণ-ভাগ—গদ্যে রচিত। বেদের শাখা-অনুসারে ব্রাহ্মণ-ভাগের সংখ্যাধিক্য ঘটিয়াছিল,—পূর্ব্বেই তাহা বলা হইয়াছে। ব্রাহ্মণ-ভাগকে পরবর্ত্তি-কালে বেদের উপসংহার-ভাগ বলিয়াও কেহ কেহ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। বেদের ব্রাহ্মণ-ভাগের পর, আরণ্যক ও উপনিষদের নাম উল্লেখযোগ্য। ব্রহ্মচর্য্য-গ্রহণে অরণ্যাশ্রমে বাস করিবার সময়, গুরুর নিকট বেদ-বিষয়ক যে আলোচনা ও শিক্ষালাভ হইত, আরণ্যক-গ্রন্থে তাহাই লিপিবদ্ধ হয়। অরণ্যাশ্রমে উহা সূচিত হইয়াছিল বলিয়াই, উহার নাম—আরণ্যক। বেদ-সংহিতা পাঠের পর, সেই আরণ্যক অর্থাৎ বেদ-সংক্রান্ত আলোচনা পাঠ করার রীতি ছিল। আরণ্যকের পর—উপনিষৎ। কাহারও কাহারও মতে,—আরণ্যক ও উপনিষৎ একই সময়েই রচিত হইয়াছিল। উপনিষৎ শব্দের অর্থ—[উপ+নি+সদ(গমন)+ক্বিপ] সমীপ গমন; অর্থাৎ যদ্দ্বারা ব্রহ্মের সমীপত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়, আত্মভাব উপলব্ধি হয়,—তাহাই উপনিষৎ। ব্রাহ্মণ-ভাগ—কর্ম্মকাণ্ড; উপনিষৎ—জ্ঞানকাণ্ড। ব্রাহ্মণ-ভাগে কর্ম্মকাণ্ড দ্বারা পুণ্যলাভের সার্থকতা প্রতিপন্ন হইয়াছে; উপনিষদে জ্ঞানের দ্বারা আত্মতত্ত্ব-নিরূপণের বীজ নিহিত আছে। অধুনা উপনিষৎ নামে বহু গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু আদি উপনিষৎ বারখানি বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। তৎসমুদায়, বেদের ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক ভাগের অংশ-মধ্যে পরিগণিত। উপনিষদের পর—দর্শন। দর্শন-শাস্ত্র প্রধানতঃ ছয় ভাগে বিভক্ত এবং ষড়দর্শন নামে উহা অভিহিত। বেদে যাহার আভাস ছিল; আরণ্যক ও উপনিষদে যাহার বিবৃতি হইয়াছিল; দর্শন-শাস্ত্রে তাহারই প্রমাণ-প্রয়োগ প্রদর্শিত হয়। ব্রাহ্মণ-ভাগের অপর অঙ্গ—স্মৃতি। স্মৃতি শব্দের অর্থ—[স্মৃ (স্মরণ)+তি] পূর্ব্বানুভূতি। বেদে যাহা আছে, মন্বাদি ঋষিগণের স্মৃতি, তাহারই মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া যে গ্রন্থ রচনা করেন,—তাহাই স্মৃতি। স্মৃতি—সম্পূর্ণরূপ বেদানুবর্ত্তিনী। স্মৃতি-সমূহ—মন্বাদি-প্রণীত সংহিতা নামে অভিহিত। স্মৃতি এবং দর্শন-শাস্ত্রের প্রণয়ন সম্বন্ধে মতদ্বৈধ দৃষ্ট হয়। অনেকেই বলেন,—দর্শনের পূর্ব্বে স্মৃতি বিরচিত হইয়াছিল। স্মৃতির পর,—পুরাণ, উপপুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি। পুরাণের সংখ্যা—অষ্টাদশ; উপ-পুরাণের সংখ্যা—অনেকগুলি। বেদ-বিহিত ধর্ম্ম-কর্ম্ম, দৃষ্টান্ত উপদেশাদি দ্বারা জন-সাধারণের বোধগম্য করিবার উদ্দেশ্যই, প্রধানতঃ পুরাণ-পরম্পরা প্রণীত হয়। ইহাতে সময়-বিশেষের আচার-ব্যবহার ক্রিয়া-কলাপ প্রভৃতিরও পরিচয় পাওয়া যায়। এক হইতে যেমন বহুতর পদার্থের উৎপত্তি হইয়া থাকে; এক বৃক্ষ হইতে যেমন বহুতর বৃক্ষ

* ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলের অষ্টাদশ সূক্তে এই বিষয়ের উল্লেখ আছে।

উৎপন্ন হয়; এক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হইতে যেমন বহুতর দীপ-শিখার উদ্ভব হইয়া থাকে; এক বেদ হইতে তদ্রূপ বেদাঙ্গ বেদান্ত প্রভৃতির সৃষ্টি-পরিপুষ্টি সাধিত হইয়াছে।

বৈদিক-ধর্ম্মই সকল ধর্ম্মের আদিভূত।

ভগবদনুসরণই—মনুষ্যের ধর্ম্ম। সেই অনুসরণের ফলেই মনুষ্যের সমাজ-বন্ধন, মনুষ্যের সভ্যতা, মনুষ্যের জ্ঞানোন্নতি। যে জাতি যতটুকু পরিমাণে তাঁহার অনুসরণ করিতে পারিয়াছে, তাহার ধর্ম্ম ততদূর সমুন্নত, তাহার সভ্যতা ততদূর পরিমার্জ্জিত। আর্য্য-হিন্দুগণ তদ্বিষয়ে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছেন। বেদাদি শাস্ত্র—তাহার জীবন্ত নিদর্শন। এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত জাতি—যত ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে, সকল জাতির সকল ধর্ম্মের সার সামগ্রী—বৈদিক-ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত আছে, দেখিতে পাই। ফলতঃ, এমন কোনও অবিসম্বাদিত তত্ত্ব এ পর্য্যন্ত কেহ আবিষ্কার করিতে পারেন নাই, বৈদিক-ধর্ম্মে যাহার অস্তিত্ব নাই। পৃথিবীর প্রচলিত ধর্ম্ম-সমূহের আলোচনা করিলে, আমরা কি দেখিতে পাই? আমরা দেখিতে পাই না কি,—আর্য্য-হিন্দুগণের বৈদিক-ধর্ম্ম হইতেই অন্যান্য ধর্ম্মের সার-সামগ্রী সংগৃহীত হইয়াছে? আমরা দেখিতে পাই না কি,—অনেক সামগ্রী দেশ-ভেদে কাল-ভেদে রূপান্তরিত হইয়াছে মাত্র; কিন্তু সকলেরই মূল—সনাতন আর্য্য-ধর্ম্ম। কোনও এক সময়ে, আর্য্য-হিন্দুগণের আচার-ব্যবহার ও কর্ম্ম-পদ্ধতির সহিত পৃথিবীর প্রাচীন জাতি-সমূহের অনেকেরই আচার-ব্যবহার এবং কর্ম্ম-পদ্ধতির সামঞ্জস্য ছিল। পুরাবৃত্তে তাহার ভূয়োভূয় পরিচয় পাওয়া যায়। এখনও ভিন্ন ভিন্ন জাতির ধর্ম্ম-কর্ম্মের ও নীতি-তত্ত্বের অনেক অংশ—আর্য্য-হিন্দুগণের আদর্শের অনুসরণকারী। এক জ্যোতিঃ হইতে যেমন সকল জ্যোতির উৎপত্তি হয়; অথচ, সেই জ্যোতিঃ-সমূহের কোনটী উজ্জ্বল, কোনটী ক্ষীণপ্রভ, কোনটী বিমলিন হইয়া থাকে; ধর্ম্মের উৎপত্তি ও বিস্তৃতি সম্বন্ধেও সেই ভাব মনে আসিতে পারে। আর্য্য-হিন্দুগণের আদর্শ বৈদিক-ধর্ম্মের দিব্য-জ্যোতিঃ এককালে দিগ্দিগন্তে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল; এখনও তাহার অংশ-মাত্র কোথাও কোথাও সঞ্চিত আছে;—আর্য্য-ধর্ম্মের সহিত অন্যান্য ধর্ম্মের তুলনা করিলে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। পৃথিবীর ধর্ম্ম-সমূহের উৎপত্তি ও বিস্তৃতির বিষয় আলোচনা করিলেও, এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হই। পূর্ব্বে বলিয়াছি,—"পৃথিবীর অধিকাংশ লোক যে ধর্ম্মের অনুসরণকারী, সে ধর্ম্ম—এই ভারতবর্ষেরই।" তাহা যদি অবিসম্বাদিত-রূপে প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে, প্রোক্ত সিদ্ধান্তে কোনই সংশয় থাকিতে পারে না। সুতরাং, এখন দেখাইতেছি,—পৃথিবীর অধিকাংশ লোক এখনও কি প্রকারে ভারতীয় ধর্ম্মের অনুসরণকারী! মনুষ্যের গণনায় যতদূর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে দেখিতে পাই,—পৃথিবীতে এখন মোটামুটি এক শত কোটী লোকের বসতি আছে। এই এক শত কোটি লোকের মধ্যে তিপ্পান্ন কোটি লোক হিন্দু-ধর্ম্ম ও বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী; অবশিষ্ট সাতচল্লিশ কোটি লোক অন্যান্য ধর্ম্মের উপাসক। বলা বাহুল্য, সেই সাতচল্লিশ কোটির মধ্যে—খৃষ্ট-ধর্ম্ম আছে, মুসলমান-ধর্ম্ম আছে, জোরাষ্ট্রিয়ানিজম (প্রাচীন পারসীকগণের ধর্ম্ম) আছে, জুডাইজম্ (মোজেস-প্রবর্ত্তিত ইহুদিগণের ধর্ম্ম) আছে,

আরও কত ধর্ম্ম আছে। কিন্তু যতই যাহা থাকুক, আমরা স্পর্দ্ধা-সহকারে বলিতে পারি,—তাহার কোনটীই আদিভূত নহে। কোন্ ধর্ম্মের কোন্ সময় অভ্যুদয় হইয়াছিল,—ইতিহাসে তাহার প্রমাণ-পরম্পরা বিদ্যমান আছে। সে প্রমাণ-পরম্পরা দেখিয়া, কেহই কখনও বলিতে সাহসী হন নাই যে, আর্য্য-হিন্দু-ধর্ম্মের পূর্ব্বে ঐ সকল ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছিল। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, খৃষ্ট-ধর্ম্ম, মুসলমান-ধর্ম্ম প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। বৈদিক-ধর্ম্মের কত কাল পরে ঐ সকল ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছিল,—কে না তাহা অবগত আছেন? বিশেষ বিশেষ সত্য-তথ্যের আবিষ্কার-সম্বন্ধে আমরা দেখিতে পাই,—প্রথম যে স্থান হইতে তাহা আবিষ্কৃত হয়, প্রাধান্য—সেই স্থানেরই পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য-জাতির মধ্যে 'সার আইজাক নিউটন' মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির তত্ত্ব-কথা প্রথম প্রচার করিয়াছিলেন; তাই, মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া, তাঁহার নাম দেশে-বিদেশে বিঘোষিত। এখন যদি অপর কেহ, নিউটনের কথা না জানিয়াও, মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্ব আবিষ্কার করিলাম বলিয়া প্রচার করেন, কখনই তিনি নিউটনের উচ্চ-আসন লাভ করিতে পারিবেন কি? ধর্ম্ম-প্রচারকগণ সম্বন্ধেও নিঃসংশয়ে সেই কথাই বলিতে পারি। যদি এক ধর্ম্মের কোনও সার-তত্ত্বের সহিত অপর ধর্ম্মের সার-তত্ত্বের সাদৃশ্য লক্ষিত হয়, তাহা হইলে, প্রথমে যে ধর্ম্ম বিদ্যমান ছিল, শেষোক্ত ধর্ম্ম কখনই তদ্বিষয়ে উচ্চ-স্থান লাভ করিতে পারিবে না। নিরপেক্ষভাবে যাঁহারা বিভিন্ন ধর্ম্মের আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই দেখিতে পাইয়াছেন,—বৈদিক-ধর্ম্ম হইতে কিরূপভাবে কোন্ ধর্ম্ম পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে।* তার পর, খৃষ্ট-ধর্ম্ম, মুসলমান-ধর্ম্ম অথবা ইহুদী ও পারসীকদিগের প্রাচীন ধর্ম্ম প্রভৃতির উৎপত্তি-স্থানের বিষয় আলোচনা করিলেও, ঐ সকল ধর্ম্মে আর্য্য-হিন্দুগণের বৈদিক-ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায়। আর্য্যাবর্ত্তের (ভারতবর্ষের) সীমানা, সময়ে সময়ে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া, নানা স্থানে উল্লেখ দেখিতে পাই। গ্রীক ঐতিহাসিক আরিয়ানের মতে,—'আরব, পারস্য, তুরস্ক ও মধ্য-এসিয়ার বহুদূর পর্য্যন্ত এককালে ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত ছিল।'† হিন্দু-সভ্যতার, হিন্দু-গৌরবের—সে এক দিন গিয়াছে। সে দিনের কথা, কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। যদি তাহাই হয়, তৎকালে ঐ সকল দেশে বৈদিক-ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল—ইহা নিঃসন্দেহ। যে দেশ, যে রাজ্য, যে জনপদ, একেবারে ভারতবর্ষের—এমন কি আর্য্যাবর্ত্তের—অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল; সে দেশে, সে রাজ্যে, সে জনপদে, আর্য্য-হিন্দুগণের বৈদিক-ধর্ম্মের প্রাধান্য-বিস্তৃতি কখনই অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। যে ধর্ম্ম রাজা মান্য করেন, যে ধর্ম্ম রাজ-ধর্ম্ম, প্রজার মধ্যে অনেকেই সেই ধর্ম্মের অনুসরণ করে,—সকল দেশের সকল ইতিহাসেই তাহা দেখিতে পাই। যখন মুসলমানগণ কোনও দেশ অধিকার করিয়াছিলেন, তখন সে দেশের অনেকেই মুসলমান হইয়াছিল;—অন্ততঃ কতক

---

* কোন্ ধর্ম্মের উপর কোন্ ধর্ম্মের প্রভাব কিরূপভাবে বিস্তৃত হইয়া আছে; অথবা কোন্ ধর্ম্মের সার-তত্ত্বের সহিত কোন্ ধর্ম্মের সামঞ্জস্য আছে,—স্থানান্তরে তাহার আলোচনা করা যাইবে।

† এই গ্রন্থের "আর্য্যজাতি" শীর্ষক পরিচ্ছেদে ২৩ পৃষ্ঠায় এই বিষয়ের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

মুসলমান সে দেশে গিয়া নিশ্চয় বসবাস করিয়াছিলেন। ইংরেজও যখন যে দেশে আধিপত্য-বিস্তার করিয়াছেন, সে দেশেরও কতক লোক খৃষ্টান হইয়া গিয়াছে ;—অন্ততঃ কতক খৃষ্টান সে দেশে গিয়া বসবাস করিয়াছেন। এ কথা প্রমাণ করিবার জন্য, অধিক আলোচনার আবশ্যক হয় না। এক ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই, এ তথ্য অবগত হওয়া যায়। ইহাই মনুষ্যের প্রকৃতি। আর্য্য-হিন্দুগণ যখন দেশে-বিদেশে রাজ্য-বিস্তার করেন, তখন তাঁহাদের অনেকে যে সেই সেই দেশে বসবাস করিয়াছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং রাজধর্ম্ম-রূপে তত্তদ্দেশে হিন্দু-ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তৃত হওয়া কখনই অসম্ভব নহে। আর তজ্জন্যই আর্য্য-হিন্দু-ধর্ম্মের শেষ-স্মৃতি অনেক প্রাচীন জাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। এই যে দেখিতে পাই,—প্রাচীন পারসীকগণ অগ্নি-পূজক ছিলেন ; তাহাই বা কি ? তাঁহাদের সেই অগ্নি-পূজা—বৈদিক যাগযজ্ঞেরই অনুস্মৃতি নহে কি ? আরবে, তুরস্কে, এসিয়া মাইনরে এবং অন্যান্য স্থানে হিন্দুদিগের আধিপত্য-বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের যে প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, ইতিহাসে কত দিন পর্য্যন্ত তাহা দেখিয়া আসিয়াছি। কোন্ দেশে সে পরিচয় বিদ্যমান নাই ? ইউরোপে, আমেরিকায়, আফ্রিকায়—যেদিকেই দৃষ্টিপাত করি, সেইদিকেই সে স্মৃতি ওতঃপ্রোত বিজড়িত আছে। প্রাচীন গ্রীস, প্রাচীন রোম, প্রাচীন মিশর,—যে সকল দেবদেবীর পূজা করিতেন, তাহার অধিকাংশই ভারতবর্ষের দেবদেবীর রূপান্তর মাত্র। স্থান-ভেদে, কাল-ভেদে, উচ্চারণ-ভেদে, কোথাও কোথাও নামের পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে ; কোথাও কোথাও উপাসনা-প্রণালী বিকৃত হইয়া গিয়াছে। কাল-ধর্ম্মে একই দেশে কত পরিবর্ত্তন সাধিত হয় ! প্রদেশ-ভেদেও একই দেশে উচ্চারণের কত পার্থক্য দেখিতে পাই ! এই বাঙ্গালারই বিভিন্ন-প্রদেশে, জল-বায়ুর তারতম্য-হেতু, একই শব্দের উচ্চারণে কত রূপান্তর ঘটিয়া থাকে ! সে হিসাবে, চট্টগ্রামের সহিত বিক্রমপুরের এবং বিক্রমপুরের সহিত নবদ্বীপের উচ্চারণে এতই তারতম্য দেখা যায় যে, একই শব্দ, উচ্চারণগত পার্থক্যে, অন্য শব্দ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। একই দেশে, একই সময়ে, যখন এতাদৃশ পার্থক্য বিদ্যমান ; তখন, কোন্ দূর অতীতের, কোন্ দূর-দেশে, কিরূপ উচ্চারণ-পার্থক্য হওয়া সম্ভবপর,—সহজেই বুঝা যায় না কি ? সুতরাং আমাদের 'অগ্নি', লাটিনে 'ইগ্নিজ', শ্লাভোনিকে 'ওগ্নি'-রূপে পরিবর্ত্তিত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? যুগের পর যুগ চলিয়া গিয়াছে ; পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তনের ঝঞ্ঝাবাতে সকল পরিচয়-চিহ্ন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে ; কিন্তু তথাপি যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহাই কি উপেক্ষার সামগ্রী ? গভীর জলধির অতল-তলে প্রবেশ করিয়া অবগাহনকারী ব্যক্তি শুক্তির সন্ধান লাভ করে ; জ্যোতির্ব্বিদ্-গণ দূরবীক্ষণ সাহায্যে জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর সূক্ষ্ম-তত্ত্ব আবিষ্কার করেন ; ঐকান্তিকতার সহিত শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিলে, সকল বিষয়েরই স্বরূপ-তত্ত্ব অধিগত হয়। তখন, বুঝিতে পারা যায়,—সকল ধর্ম্মের সার-সামগ্রী এক, এবং সেই সামগ্রী বেদের মধ্যেই নিহিত আছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বৈদিক-প্রসঙ্গ।

[বেদে পুরাবৃত্ত,—ইতিহাস কি?—গীবন, কোম্‌ৎ, বাকলে, ইমারসান প্রভৃতির মতামত,—শাস্ত্রই ইতিহাসের সার-সামগ্রী,—আধুনিক ও প্রাচীনে পার্থক্য,—শাস্ত্র-নিহিত ইতিহাসের বিশেষত্ব;—বৈদিক কালের রাজন্যবর্গ,—দেবরাজ ইন্দ্র এবং তাঁহার সহিত পারসীক ও গ্রীক-দিগের দেবগণের সাদৃশ্য-প্রসঙ্গ,—রাজা সুদাস ও তাঁহার দিগ্বিজয়,—সাহিত্য-সেবায় ও ধর্ম্ম-কর্ম্মে তাঁহার উৎসাহ-দান;—বৈদিক-কালের যুদ্ধ-বিগ্রহ, ধর্ম্ম-সংস্থাপন ও প্রজা-রক্ষা,—দস্যু-দমন;—বেদ-বিষয়ক বিবিধ প্রসঙ্গ,—যাস্ক, সায়ণাচার্য্য প্রভৃতির বেদ-ব্যাখ্যা,—বৈদিক ধর্ম্ম-সম্বন্ধে পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত,—বেদ-বিষয়ে মনুর মত।]

বেদে যেমন হিন্দুর পারলৌকিক সমাচার প্রাপ্ত হওয়া যায়, উহাতে ইহলৌকিক সমাচারও সেইরূপ নিহিত আছে। বৈদিক-কালের রাজন্যবর্গ এবং তাঁহাদের আচার-ব্যবহার শাসন-প্রণালী প্রভৃতির আভাস, বেদেই দেখিতে পাই। সে হিসাবে, পক্ষান্তরে, বেদকে পুরাবৃত্ত-ইতিহাসও বলা যাইতে পারে। তবে, পুরাবৃত্ত বা ইতিহাস শব্দে অধুনা যে সামগ্রীটিকে বুঝাইয়া থাকে, বেদে বা অন্যান্য শাস্ত্র-গ্রন্থাদিতে হয় তো ঠিক সেটুকু না বুঝাইতে পারে; কিন্তু ইতিহাসের যাহা সার-সামগ্রী, পুরাবৃত্তের যাহা উপাদানভূত, বেদ বা শাস্ত্র-গ্রন্থে তাহার কিছুরই অসদ্ভাব নাই। হইতে পারে,—সময়-কাল-নির্দ্দেশে ধারাবাহিক ঘটনাবলীর বা রাজন্যবর্গের বিবরণ উহাতে নাই; হইতে পারে,—দিবা-মান-দণ্ড-নিরূপণে যুদ্ধ-বিগ্রহের বর্ণনাও উহাতে দেখিতে পাওয়া যায় না; হইতে পারে,—বর্ত্তমান ইতিহাসের ভাষাভাসে ও শাস্ত্র-বর্ণিত কাহিনী-কলাপে, আরও শত-পার্থক্য বিদ্যমান আছে; কিন্তু তথাপি বলিতে সাহস করিতেছি,—বেদাদি শাস্ত্র-গ্রন্থ, হিন্দুজাতির ইতিহাস;—একটী সভ্য-সমুন্নত জাতির যে ইতিহাস হওয়া উচিত, তাহা সেই ইতিহাস। এ কথা কেন বলিলাম, তাহা বুঝিতে হইলে, 'ইতিহাস কি',—অগ্রে তাহা বুঝিবার প্রয়োজন হয়। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গীবন বলেন,—"মনুষ্য-সমাজের দুর্ভাগ্য, পদস্খলন এবং দুষ্ক্রিয়ার ধারাবাহক-বিবরণীর নাম—ইতিহাস।" গেজো, বাক্‌লে প্রভৃতি প্রখ্যাত-নামা ঐতিহাসিকগণের মত,—"ইতিহাস কেবল ঘটনাবলীর সমাবেশ মাত্র নহে; কি কারণে কি ঘটনা-স্রোত প্রবাহিত হয়, তাহা নির্ণয় করাই ইতিহাসের মুখ্য উদ্দেশ্য।" প্রসিদ্ধ ফরাসী দার্শনিক কোম্‌ৎ বলেন,—"চিন্তার তিনটী স্তর আছে। প্রথম স্তরে মনুষ্য জাগতিক ব্যাপার-পরম্পরাকে কোনও এক দৈব শক্তির কার্য্য বলিয়া বিশ্বাস করে। দ্বিতীয় স্তরে সে কার্য্যকে মানুষ বস্তু-বিশেষেরই গুণ বা শক্তি বলিয়া স্থির করিয়া লয়। তৃতীয় স্তরে, মনুষ্য, সেই ঘটনাবলীর বিজ্ঞান-সম্মত কারণ-পরম্পরা নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।" * এ হিসাবে, তিন স্তরের ইতিহাস—তিন প্রকার। প্রথম স্তরে, যখন সকল ঘটনাকেই কোনও অচিন্ত্য-শক্তির কার্য্য বলিয়া বিশ্বাস হয়, মানুষ তখন

বেদে পুরাবৃত্ত।

* সেই তিন স্তরের নাম—Theological, Metaphysical and Positive or Scientific; অর্থাৎ আধিদৈবিক, আধিভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক বা বৈজ্ঞানিক।

তাহাতে অলৌকিকত্বের সমাবেশ করে। প্রাচীন জাতির পুরাণ-পরম্পরা, কোম্তের মতে, সেই প্রথম স্তরের সামগ্রী। দ্বিতীয় স্তরে, বস্তুগত শক্তির অনুভূতিতে, মানুষ অলৌকিক কল্পনার কথা ভুলিয়া যায়। তখনকার ইতিহাস—শক্তি-সামর্থ্যের ও বীরত্বের কাহিনীতে পরিপূর্ণ হয়। তৃতীয় স্তরে, মানুষ যখন বুঝিতে পারে,—কি কারণে কি ঘটনা সংঘটিত হইল, তখন তাহার ইতিহাস—বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত; প্রকারান্তরে তাহাই তাহার সভ্যতার ইতিহাস। নেপোলিয়ন বলিতেন,—"ইতিহাস—প্রচলিত গল্প মাত্র।" কিন্তু ইমার্সান বলেন,—"যিনি অসংখ্য লোকের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিয়া, তাহাদের আদর্শ বা মূর্ত্তিরূপে বিরাজমান, তাঁহার চরিত্র-কথা যাহাতে বিবৃত আছে—তাহাই ইতিহাস। ইতিহাসের ভিত্তি—ব্যক্তি-বিশেষের জীবনী। সে হিসাবে, এক সময়ের ইউরোপকে বা ফ্রান্সকে 'নেপোলিয়ন' সংজ্ঞা প্রদান করিলেও করা যাইতে পারে; যেহেতু, তৎকালে জনসাধারণের শক্তি তাঁহাতে কেন্দ্রীভূত হইয়া ছিল।" আমরা কিন্তু ইতিহাসকে আর এক নূতন সামগ্রী বলিয়া মনে করি। আমরা বলি,—যাহা লোক-শিক্ষার অনুকূল, অর্থাৎ যদ্দ্বারা মানুষ আপনার জীবনগতি নির্ণয় করিয়া লইতে পারে, তাহাই ইতিহাস। ইতিহাসে অতীতের উজ্জ্বল চিত্র প্রতিফলিত দেখি; ইতিহাসে বর্ত্তমানের ভাব-পরম্পরা বিশদীকৃত হয়; ইতিহাসে ভবিষ্যতের গন্তব্য-পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়। অতীত ঘটনার ফলাফল দর্শনে, বর্ত্তমানকে কিরূপভাবে আয়ত্ত করিতে পারিলে, ভবিষ্যতে সুফল লাভ হয়,—ইতিহাস তাহাই নির্দ্দেশ করে। এই জন্যই ইতিহাস—কখনও দর্শন, কখনও বা বিজ্ঞান নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বেদাদি শাস্ত্রগ্রন্থনিচয়—তাই আর্য্য-হিন্দুগণের সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন ইতিহাস। জীবনগতি নির্দ্ধারণে মনুষ্যের যাহা কিছু আবশ্যক, যে পথে যে আদর্শের অনুসরণ করিয়া চলিলে শ্রেয়ঃ-লাভ সম্ভবপর,—শাস্ত্র দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাই নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। আধুনিক ইতিহাসে সদসৎ পাপ-পুণ্য উভয় কর্ম্মেরই প্রাধান্য-প্রতিপত্তি দেখিতে পাই। কিন্তু শাস্ত্র, লোক-শিক্ষার উপযোগিতা প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে, অসতের ন্যূনতা এবং সতের প্রাধান্য, অধর্ম্মের পরাজয় এবং ধর্ম্মের জয়—এই চিত্র হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিফলিত করিবার জন্য, তদুপযোগী উপাদান-সমূহ সংগ্রহ করিয়া লোক-লোচনের সমক্ষে স্থাপন করিয়াছেন। আধুনিক ইতিহাসে এবং শাস্ত্র-নিহিত ইতিহাসে ইহাই পার্থক্য। রাজা কিরূপ প্রজাপালক হওয়া প্রয়োজন, তাঁহার কিরূপ ত্যাগশীলতা-আত্মোৎসর্গ আবশ্যক,—শ্রীরামচন্দ্র, হরিশ্চন্দ্র, দাতাকর্ণ, যুধিষ্ঠির প্রভৃতির শত শত চিত্রে শাস্ত্র সে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতির পতি-ভক্তির আদর্শে সংসার অনুপ্রাণিত হউক; লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, অর্জ্জুন প্রভৃতির ভ্রাতৃপ্রেম দেখিয়া জগৎ সৌভ্রাত্র শিক্ষা করুক; পিতৃভক্তি, স্বজন-প্রীতি, আত্ম-ত্যাগ, বীরত্ব, সত্য-ধর্ম্ম প্রভৃতির আদর্শ-চিত্র নয়নে নয়নে প্রতিভাত থাকুক;—শাস্ত্র তদনুরূপ উপাদান-সামগ্রীই সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। যাহা অনাবশ্যক, যাহাতে লোক-শিক্ষার কোনও বীজ নিহিত নাই,—শাস্ত্রে তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। শাস্ত্র-নিহিত ইতিহাসের ইহাই বিশেষত্ব। আরও এক কথা!—জলোচ্ছ্বাসের প্রবল প্লাবনে নগর-জনপদ ভাসমান

হইলে, সে স্মৃতি অনেকেই বিস্মৃত হইতে না পারেন ; কিন্তু কাল-সাগরের তরঙ্গ-প্রবাহে কত কত জলবুদ্‌বুদ্ উত্থিত হয়, কে তাহা গণনা করিয়া রাখিতে সমর্থ হন ? ঐতিহাসিক ঘটনা-পরম্পরাও অনেকটা সেইরূপ বলিয়া মনে হয়। বর্ত্তমান ইতিহাসে যাহা উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত থাকে, ভবিষ্যতের ঘটনা-পরম্পরার ঘাত-প্রতিঘাতে নিশ্চয়ই তাহার ঔজ্জ্বল্য কিয়ৎপরিমাণে কমিয়া যায়। এইরূপে কমিতে কমিতে, কালক্রমে অত্যুজ্জ্বল স্মৃতির চিহ্ন মাত্র অবশিষ্ট থাকে ; সাধারণ ঘটনা-পরম্পরা কেহই আর তখন গণনার মধ্যে আনিতে চাহেন না। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, ভারতে মুসলমান-রাজত্বের ও ইংরেজ-রাজত্বের সেদিনের ঘটনাই উল্লেখ করি না কেন ? মামুদ ঘোরীর ভারতলুণ্ঠন-কাহিনী স্মৃতি-পটে যতটা উজ্জ্বল হইয়া আছে, দাসবংশীয় রুকুমুদ্দীন বা নসিরুদ্দীনের কথা কি ততদূর মনে থাকিবে ? পলাশীর যুদ্ধ-কাহিনী, অথবা সিপাহি-যুদ্ধের পর ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা-বাণী যতদূর স্মরণ থাকা সম্ভবপর, রিত্তাম্বর বা পলিলুরের যুদ্ধ-কথা অথবা সেগৌলীর সন্ধি-কথা ইতিহাসে তাদৃশ প্রশস্ত স্থান লাভ করিবে কি ? ফলে, পরবর্ত্তি-কালে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাবলী একে একে ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে অন্তর্হিত হইবে ;—গুরুত্ব অনুসারে প্রসিদ্ধ ব্যাপার-পরম্পরাই ইতিহাসে স্থানলাভ করিবে। কয়েক দিনের কয়েক শতাব্দীর ইতিহাসের পৃষ্ঠা আলোড়ন করিলেই, এই তথ্য সংগৃহীত হয়। সে ক্ষেত্রে, কত কালের—কত কোটী কোটী বৎসরের—আর্য্য-সভ্যতার ইতিহাস, কিরূপে ধারাবাহিক সমস্ত ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনায় সমর্থ হইবে ? বিশেষতঃ, তাহার আবশ্যকতাও উপলব্ধি হয় নাই বলিয়া মনে হয়। যাহা বিশিষ্ট, যাহা সারভূত, যাহা প্রয়োজনীয়,—শাস্ত্র-নিহিত ইতিহাসে তাহাই স্থান পাইয়াছে। ইতিহাস-শব্দের ব্যুৎপত্তি-গত অর্থ আলোচনা করিলেও, অধুনা পাশ্চাত্য-জাতিগণ যাহাকে ইতিহাস বলেন, আমাদের ইতিহাস তাহা হইতে এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সামগ্রী ছিল। তাহাতে, ইতিহাস-শব্দে [ইতিহ (পরম্পরাগত উপদেশ) + অস্ (হওয়া) + অ] যাহাতে পরম্পরাগত উপদেশ আছে—তাহাই বুঝাইয়া থাকে। মহাভারতে ইতিহাসের সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—"যাহাতে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের উপদেশসহ পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে, তাহাই ইতিহাস।" * সে হিসাবে, শাস্ত্রমাত্রকেই প্রকারান্তরে ইতিহাস বলা যাইতে পারে। বেদ—সেই ইতিহাসের আদিভূত। বেদ—হিন্দুর পুরাবৃত্ত।

কিন্তু সেই পুরাবৃত্তে—বেদে—প্রাচীন রাজন্যবর্গের ও আচার-ব্যবহারের কি পরিচয় প্রাপ্ত হই ? বলিয়াছি তো, ধারাবাহিক ঐতিহাসিক ঘটনাবলী বেদাদি শাস্ত্র-গ্রন্থে নিবদ্ধ হয় নাই।

বৈদিক-কালের রাজন্যবর্গ।

প্রাচীন কালে অন্য কোনও আকারে ইতিহাসের অস্তিত্ব হয় তো বিদ্যমান ছিল। কিন্তু যুগ-যুগান্তরের বিপ্লব-বিবর্ত্তনে তৎসমুদায় লোপ পাইয়া গিয়াছে। বেদ কণ্ঠে কণ্ঠে অধিষ্ঠিত ছিল বলিয়া, উহার অস্তিত্ব লোপ পায় নাই। আর সেই জন্যই মনে হয়, বেদে ইতিহাসের সারভূত কয়েকটী তত্ত্বের উল্লেখ

* "ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশসমন্বিতং।
পূর্ব্ববৃত্তকথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে॥"

ব্যতীত বিশেষ ঐতিহাসিক তত্ত্ব অন্য কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। বেদে যে সকল রাজন্যবর্গের নাম উল্লেখ দেখিতে পাই, তন্মধ্যে দেবরাজ ইন্দ্র প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছেন। তিনি কখনও বজ্র-অস্ত্র গ্রহণ করিয়া দস্যুদিগের সংহার-সাধন করিতেছেন; তিনি কখনও দেবতাদিগের রক্ষা-কার্য্যে ব্রতী রহিয়াছেন; তিনি কখনও পূজা-উপচার প্রাপ্ত হইতেছেন। ঋগ্বেদের অধিকাংশ স্তোত্রেই দেবরাজ ইন্দ্রের গুণ-কীর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। ইন্দ্রের সহিত বৃত্রাসুরের ঘোর যুদ্ধ এবং তৎসংক্রান্ত বহু বিবরণ বেদে বর্ণিত আছে। সেই বর্ণনা হইতে কেহ কেহ স্থির করিয়াছেন,—"বৃত্র বা অহি মেঘের নামান্তর মাত্র। ইন্দ্র বজ্র দ্বারা মেঘকে আঘাত করিয়া বৃষ্টি-বর্ষণ করিয়াছিলেন, বৃত্রাসুর-বধ-বর্ণনায় তাহাই উপলব্ধি হয়। পুরাণাদিতে বৃত্রাসুর-বধের যে উপাখ্যান দৃষ্ট হয়, এই রূপক হইতেই তাহার উৎপত্তির সম্ভাবনা।" * মতান্তরে দেখিতে পাওয়া যায়,—"বাবিলন-নগরে সেমিটিক-জাতীয় এক প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। ইন্দ্র ঘোর যুদ্ধে তাঁহাকে পরাজিত করেন। সেই হইতেই বৃত্রাসুর-বধের উপাখ্যান চলিয়া আসিতেছে।" পারসীকগণের 'জেন্দ আভেস্তা' গ্রন্থেও উক্ত ঘটনার আভাস পাওয়া যায়। 'জেন্দ আভেস্তায়' বৃত্রকে 'বেরেথ্র' এবং ইন্দ্রকে 'বেরেথ্রঘ্ন' (বৃত্রঘ্ন) বলিয়া উল্লিখিত আছে। বেদে যেরূপ ইন্দ্রের মহিমা পরিকীর্ত্তিত; 'জেন্দ আভেস্তার' অন্তর্গত 'বহ্রাম যহৎ' অংশ তদ্রূপ বেরেথ্রঘ্নের স্তুতিবাদ-পরিপূর্ণ। বৃত্রের 'অহি' নামের আভাসও 'জেন্দ অভেস্তায়' পাওয়া যায়: এই জন্য বেদের 'ইন্দ্র' এবং জেন্দ আভেস্তার 'বেরেথ্রঘ্নকে পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের অনেকেই এক ব্যক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। প্রাচীন গ্রীকদিগের 'জিয়স্' দেবতার সহিতও অনেকে ইন্দ্রের তুলনা করিয়া থাকেন। ইন্দ্রের ন্যায় জিয়সও দেবতাদিগের রাজা ছিলেন; ইন্দ্রের ন্যায় জিয়সও বজ্র ধারণ করিতেন। দানব-দমনে ইন্দ্রের সাহায্যার্থ মহর্ষি দধীচির পবিত্র অস্থি লইয়া বিশ্বকর্ম্মা যেরূপ বজ্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন, আর সেই বজ্রে ইন্দ্র যেমন বৃত্রাসুরকে হনন করিয়াছিলেন; গ্রীকদিগের 'জিয়স'-সম্বন্ধেও তদ্রূপ উপাখ্যান প্রচলিত আছে। জিয়সের পুত্র 'হিফেষ্টস,' পিতার যুদ্ধের জন্য বজ্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন, এবং তাহাতে 'টিটান'-কুল নির্ম্মূল হইয়াছিল। গ্রীকদিগের 'আপোলো' দেবতার সহিতও অনেকে ইন্দ্রের সামঞ্জস্য দেখাইবার চেষ্টা পাইয়াছেন। † ইন্দ্রের ন্যায় আপোলোর সুবর্ণ-নির্ম্মিত তূণীর ছিল। 'আপোলো' সূর্য্যের ন্যায় মেঘ হইতে বৃষ্টি উৎপাদন করিতেন, এবং তদ্দ্বারা পৃথিবীর উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি পাইত। ইন্দ্রের ন্যায় গ্রীক-দেবতা 'ফোয়েবসের' কশা ছিল; ইন্দ্রের ন্যায় তাঁহাদের

* ম্যাক্সমুলার বলেন,—"বেদের এই বৃত্রাসুর বধ হইতেই হোমারের ইলিয়ড-গ্রন্থে ট্রয়-যুদ্ধের কল্পনা। বেদের সরমা—ট্রয়-যুদ্ধের হেলেন (Helen), বেদের পণিগণ (Pannis)—ট্রয়ের পারিস (Paris) নাম পরিগ্রহ করাই সম্ভবপর।" স্থানান্তরে আমরা এ বিষয়ের আলোচনা করিব।

† গ্রীকদিগের জিয়স (Zeus) লাটিন ভাষায় জুপিটার (Jupiter) নামে অভিহিত। টিটান (Titan) আপোলো (Apollo), ফোয়েবস (Phoebus), হেলস্ (Halos) প্রভৃতির বিবরণ যে কোনও ইংরেজী অভিধান দেখিলেই জানিতে পারা যাইবে।

'হেলিয়স' দেবতা অগ্নিময় রথে পরিভ্রমণ করিতেন ;—এইরূপ নানা বিষয়ে ইন্দ্রের সহিত গ্রীক-দেবতাদিগের সাদৃশ্যের কথা উল্লিখিত হইয়া থাকে। ইন্দ্রের হস্তী—ঐরাবত ; ইন্দ্রের অশ্ব—উচ্চৈঃশ্রবা ; ইন্দ্রের পুরী—অমরাবতী ; ইন্দ্রের উদ্যান—নন্দন ; ইন্দ্রের প্রাসাদ—বৈজয়ন্ত ; ইন্দ্রের পত্নী—শচী ; ইন্দ্রের পুত্র—জয়ন্ত। এ সকলের সহিতও গ্রীকদিগের অনেক দেবতার ঐশ্বর্য্য-সম্পদের সাদৃশ্য দেখা যায়। এই সকল দেখাইয়া, ইন্দ্রের সহিত পারসীক-দিগের এবং গ্রীকদিগের দেবদেবীর একত্ব-প্রতিপাদনে অনেকে প্রয়াস পান। তাঁহাদের সহিত আমরা অবশ্য এক-মত হইতে পারি না। প্রাচীন আর্য্য-হিন্দুগণের দেবরাজ ইন্দ্রের মাহাত্ম্য-কথা চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, আর তাহা হইতেই অন্যান্য জাতি আপনাপন দেবদেবীর আদর্শ গ্রহণ করিতে প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন,—এই সকল সামঞ্জস্যে তাহাই বরং মনে হইতে পারে। দেবরাজ ইন্দ্রের পর, যে সকল নরপতির প্রসঙ্গ বেদে উল্লেখ দেখিতে পাই, তন্মধ্যে 'রাজা সুদাস' সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন। স্বয়ং ইন্দ্র সুদাসকে অনেক সময় সাহায্য করিয়াছিলেন। প্রধানতঃ সেই বলে বলীয়ান হইয়া, রাজা সুদাস বহুদেশে আপন বিজয়-পতাকা উড্ডীন করেন। 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে' লিখিত আছে,—রাজা সুদাস সমগ্র পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদে সুদাসের যে বীরত্ব-কাহিনীর পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে সুদাসকে অদ্বিতীয় বীর বলিয়া মনে হয়। অনু এবং দ্রুহ্যু নামক দুই বীরের আধিনায়কত্বে এক সময়ে ষষ্টিশত এবং ষটসহস্র ষড়ধিক ষষ্টিসংখ্যক যোদ্ধা, রাজা সুদাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছিল। কিন্তু সুদাস তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়াছিলেন। সুদাসের এই বীরত্ব-বর্ণনা—ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের অষ্টাদশ সূক্তে দেখিতে পাওয়া যায়। এক সময়ে রাজা সুদাস দশ জন স্বাধীন নৃপতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন বলিয়া, বেদে উল্লিখিত আছে। সুদাসের একটী প্রধান প্রতিষ্ঠার পরিচয়—তিনি সাহিত্য-সেবী কবিগণের উৎসাহদাতা ছিলেন। বসিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্রের বংশধর কবিগণ তাঁহার নিকট যে উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, নানা স্থানে তাহা বর্ণিত আছে। এক সময়ে কবি ত্রিৎসু বা বসিষ্ঠ, রাজা সুদাসের নিকট দুই শত গাভী, দুইখানি রথ, চারিটি অশ্ব এবং বহু স্বর্ণালঙ্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অন্যান্য কবিগণও রাজা সুদাসের নিকট সর্ব্বদা বিবিধ প্রকার উপকার প্রাপ্ত হইতেন। ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলে অষ্টাদশ সূক্তের দ্বাবিংশ ও ত্রয়োবিংশ শ্লোকে মহর্ষি বসিষ্ঠ সুদাসের গুণ-গাথা কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। কেবল বসিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের বংশধরগণকে বলিয়া নহে ;—বিদ্যা এবং ধর্ম্মকার্য্যে উৎসাহ-দানের জন্য রাজা সুদাস সর্ব্বদাই অর্থ-সাহায্য করিতেন। তিনি প্রজাপালক, তিনি অতিথিবৎসল ছিলেন। সুদাসের পিতার নাম—দিবোদাস (পিজবন) ; তাঁহার পিতামহ ছিলেন—রাজা দেববান। সুদাসের ন্যায় আরও বহু রাজার বিবরণ বেদে নিবদ্ধ আছে ;—কোনও নৃপতি দূরদেশে অধিকার-বিস্তারে ব্রতী আছেন, কোনও নৃপতি যজ্ঞকার্য্য সমাপন করিতেছেন, কোনও নৃপতি সৎকর্ম্ম-প্রভাবে রাজর্ষি আখ্যা প্রাপ্ত হইতেছেন, কোনও নৃপতি প্রজাপালনে যশোসম্মান লাভ করিতেছেন। সেই প্রসিদ্ধ রাজগণের মধ্যে দুর্দ্দম্য, ত্রসদস্যু, যদু, দুর্ব্বেতি, বৃহদ্রথ, পুরু, বরুণ, অতিথিগ্ব, ঋজিশ্বান, সুশ্রবা, তূর্য্যবান, কুৎস,

আয়ু মর্য্য প্রভৃতির নাম পুনঃপুনঃ উল্লিখিত আছে। কোনও রাজা একচ্ছত্র সম্রাট-পদ লাভ করিয়াছিলেন; কোনও রাজা করদ-মিত্র রাজ্য-মধ্যে পরিগণিত ছিলেন।

রাজা সুদাস প্রভৃতির সমর-প্রসঙ্গে বৈদিক কালের যুদ্ধ-প্রণালীর বিষয় অভিজ্ঞতা লাভ হয়। তখনও রাজন্যবর্গ, সুসজ্জিত হস্তী ও অশ্ব প্রভৃতি লইয়া, পাত্র মিত্র সহ, মহা সমারোহে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেন। তখনও, বর্ম্ম শিরস্ত্রাণ এবং তরবারি প্রভৃতি ব্যবহৃত হইত। তখনও রণবাদ্য, ভেরি এবং পতাকা প্রভৃতির প্রচলন ছিল। তখনকার দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্র—এখনকার গোলাগুলি কামান প্রভৃতিকেও উপেক্ষা করে না কি? তখনকার তীর-পরিচালনার কি অপূর্ব্ব চিত্র দেখিতে পাই! তীরই কত প্রকারের? কোনও তীর অগ্নি উদ্গীরণ করে; কোনও তীর হইতে বিষ উদ্গীর্ণ হয়; কোনও তীরের অগ্রভাগে তীক্ষ্ণ-ধার লৌহময় শলাকা; কোনও তীরে সুতীক্ষ্ণ হরিণ-শৃঙ্গাগ্র বিরাজমান। * এক একটী যুদ্ধের ভীষণতাই কি ভয়ানক! রাজা সুদাস, একটী যুদ্ধে ষষ্টি সহস্রাধিক শত্রু-সৈন্যকে ভূতল-শায়ী করিয়াছিলেন। বীরবর কুৎস, দস্যুগণের সহিত যুদ্ধে তাহাদের পঞ্চাশ সহস্র সৈন্য নিহত করেন। ইন্দ্রের এক দিনের একটী যুদ্ধে সহস্রাধিক পাঁচ লক্ষ শত্রু-সৈন্য প্রাণদানে বাধ্য হয়। † এইরূপ আরও কত কত যুদ্ধের কত কত লোমহর্ষণ কাহিনী বেদে বর্ণিত আছে। সে তুলনায়, কোথায় লাগে—বর্ত্তমান অনলবর্ষী কামানের ভীষণতা! সে তুলনায়, কোথায় লাগে—শত্রু-সংহারে বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া! সমর-প্রাঙ্গণে কামানের ব্যবহার এবং ক্ষিপ্রগতিতে শত্রু-সংহার,—যাঁহারা সভ্যতার পরিচয়-চিহ্ন বলিয়া মনে করেন, ঋগ্বেদের কোন স্মরণাতীত যুগের ইতিহাস, তাঁহাদিগকে সে দৃশ্য দেখাইতে পারে! তবে এখনকার যুদ্ধে ও তখনকার যুদ্ধে পার্থক্য কি কিছুই নাই? পার্থক্য অবশ্যই আছে। প্রধান পার্থক্য—উদ্দেশ্যগত। তখনকার যুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল—ধর্ম্ম-রক্ষা, প্রজারক্ষা; আর এখনকার যুদ্ধের উদ্দেশ্য—আত্মপ্রাধান্য-রক্ষা। তখনকার রাজন্যবর্গ প্রধানতঃ ধর্ম্মদ্রোহী সমাজদ্রোহী দস্যুর বিরুদ্ধেই যুদ্ধযাত্রা করিতেন;—প্রজাগণের মঙ্গলের জন্য, ধর্ম্ম-সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে,যত কিছু যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হইত; কিন্তু এখনকার যুদ্ধ প্রায় স্থলেই স্বার্থসিদ্ধি-মূলক অথবা অভিমান-সঞ্জাত। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের কোনও কোনও পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন পণ্ডিত, আর্য্য-হিন্দুগণকে কোনও এক অভিনব দেশের আগন্তুক বলিয়া মনে করিয়া লইয়া, এই যুদ্ধ-ঘটনা-সমূহকে অন্য রঙে রঞ্জিত করিয়াছেন! তাঁহারা বলেন,—"আর্য্য ও অনার্য্যের এই যুদ্ধের সহিত স্পেনীয়গণের আমেরিকা অধিকারের তুলনা করা যাইতে পারে। স্পেনীয়গণ আমেরিকায় গিয়া আমেরিকার আদিম

বৈদিক-কালের যুদ্ধ-বিগ্রহ।

---

* ঋগ্বেদের চতুর্থ মণ্ডলের চতুর্থ সূক্তে সুসজ্জিত গজস্কন্ধারূঢ় রাজার যুদ্ধ-গমনের দৃষ্টান্ত আছে। 'ঐরাবত' হস্তী এবং 'উচ্চৈঃশ্রবা' ও 'দধিক্রা' (চতুর্থ মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তে) প্রভৃতি অশ্ব তৎকালে কি প্রসিদ্ধিই লাভ করিয়াছিল। ষষ্ঠ মণ্ডলের ৭৫ সূক্তে ঘোটক ও ধনুর্ব্বাণ প্রভৃতির বিশদ বর্ণনা দৃষ্ট হয়।

† সপ্তম মণ্ডলে ১৮শ সূক্তে সুদাসের এবং চতুর্থ মণ্ডলের ১৬শ ও ২৮শ সূক্তে কুৎসের ও ইন্দ্রের শত্রু-সংহার বিবরণ লিখিত আছে।

অধিবাসিগণকে যেরূপ নির্ম্মূল করিয়াছিল, আর্য্যগণও ভারতে আসিয়া ভারতীয় অনার্য্য-জাতির তদ্রূপ মূলোচ্ছেদ করিয়াছিলেন। আর্য্য ও অনার্য্যের যুদ্ধ-ব্যাপারে তাহাই প্রতীত হয়।" এ বিষয়ে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। যেহেতু, আমরা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছি,—আর্য্য-হিন্দুগণ এদেশেরই অধিবাসী, তাঁহারা কখনই অন্য দেশের আগন্তুক নহেন। বেদে যে সকল ধর্ম্মদ্রোহী ও সমাজদ্রোহী দস্যুর বিবরণ লিখিত আছে, তন্মধ্যে কুযব, অযু এবং কৃষ্ণ-নামা দস্যু বিশেষ প্রসিদ্ধ। প্রথমোক্ত দস্যুদ্বয় প্রধানতঃ সিফা, অঞ্জসী, কুলিশী ও বীরপত্নী নদী-সমূহের নিকটস্থিত বন্য-প্রদেশে বসবাস করিত; এবং একটু সুযোগ বুঝিলেই দলবলসহ নগর-গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়া গৃহস্থগণের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত। কৃষ্ণ-নামা দস্যু অংশুমতী নদীর তীরে অবস্থিতি করিত; তাহার দলে দশ সহস্র সৈন্য সর্ব্বদা সুসজ্জিত থাকিত। ঐ সকল দস্যুর উপদ্রবে নিরীহ জনসাধারণ বড়ই উত্যক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইন্দ্র ঐ দস্যুদলের সংহার-সাধন করেন। কেবল দস্যুদল বলিয়া নহে,—আর্য্য-রাজগণের মধ্যেও যাঁহারা ধর্ম্মাচারবিরোধী ও অবিমৃষ্যকারী ছিলেন, ইন্দ্র তাঁহাদিগেরও যথোপযুক্ত দণ্ডবিধান করিয়াছিলেন। সরযু-নদীর তীরের যুদ্ধে ইন্দ্রের হস্তে অর্ণ ও চিত্ররথ নামক আর্য্য-নরপতিদ্বয় নিহত হন। প্রজাপালক রাজা দিবোদাসকে ইন্দ্র শতসংখ্যক প্রস্তরনির্ম্মিত পুরী দান করিয়াছিলেন। তিনি কুযবাচকে নিহত করিয়া দুর্য্যোণি রাজাকে রাজ্য দিয়াছিলেন; এবং অনার্য্য-জাতীয় নববাস্ত্ব ও বৃহদ্রথকে নিহত করিয়া আর্য্য-রাজগণকে সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন। ইন্দ্র কর্ত্তৃক বহু অবাধ্য ব্যক্তি বহুজনের বশ্যতা-স্বীকারে বাধ্য হইয়াছিল।* এক কথায়, দেশপতি সম্রাট যেরূপ দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করেন, তিনি যেরূপ দুর্ব্বিনীত করদ রাজাকে সিংহাসন-চ্যুত করিয়া আশ্রিত অনুগত ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসাইয়া থাকেন,—এই সকল ঘটনা-পরম্পরা দর্শনে, তাহাও সেই বেদোক্ত কালেরই অনুসরণ বলিয়া মনে হয়।

বেদ-বিষয়ক বিবিধ প্রসঙ্গ।

বেদ-বর্ণিত সময়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই,—তখন অধিকাংশ লোকই ধর্ম্ম-পরায়ণ, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় ছিল। এক দস্যু-ভীতি ভিন্ন তাঁহাদের অপর কোনরূপ কষ্টের কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। পৃথিবী ধনধান্যে পরিপূর্ণা ছিলেন; দুর্ভিক্ষ বা অন্নকষ্টের বিভীষিকা কদাচিৎ উপস্থিত হইত; ক্রিয়া-কর্ম্ম যাগ-যজ্ঞের প্রভাবে ঋষিগণ দেবরোষ নিবারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তখন, রাজ্য-শাসনের সুব্যবস্থা ছিল; প্রজাপুঞ্জের সুখ-সাধনেই রাজা নিয়ত নিরত থাকিতেন। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতিতে শস্যহানি, অথবা অকাল-বার্দ্ধক্য অকাল-মৃত্যুর কথা আদৌ শুনা যাইত না। কৃষকেরা কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত থাকিত; বৈশ্যগণ বাণিজ্য-ব্যবসায়ে, ক্ষত্রিয়গণ শান্তি-রক্ষায় এবং ব্রাহ্মণগণ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সর্ব্ববিধ মঙ্গল-কামনায় ঈশ্বরারাধনায় ব্রতী থাকিতেন।

* কুযব, অযু ও কৃষ্ণ দস্যুর বিবরণ যথাক্রমে প্রথম মণ্ডলে ১০৪ সূক্তে এবং সপ্তম মণ্ডলে ৯৬ সূক্তে দেখিতে পাওয়া যায়। দুর্য্যোণি রাজার বিবরণ প্রথম মণ্ডলের ১১৪ সূক্তে এবং নববাস্ত্বাদির ও অন্যান্য ব্যক্তির বশ্যতা-স্বীকার-প্রসঙ্গ দশম মণ্ডলের ৪৯ সূক্তে দ্রষ্টব্য।

তখনও, সৌষ্ঠব-সম্পন্ন গ্রাম-নগর ছিল; ইষ্টক-প্রস্তরাদি দ্বারা অট্টালিকা নির্ম্মিত হইত; গতিবিধির সুবিধার জন্য সুপরিসর রাজপথ ছিল; দুরারোহ পর্ব্বত-শৃঙ্গে আরোহণের নিমিত্ত সুগম পথ প্রস্তুত হইত; অশ্বযোজিত শকট, নৌকা, অর্ণবপোত এবং অন্যান্য যানাদির কিছুরই অভাব ছিল না। তৎকালে, বাণিজ্য-ব্যপদেশে, রাজ্যাধিকার-উদ্দেশ্যে, আর্য্যগণ দেশে-বিদেশে গমন করিতেন; দূর সমুদ্র-পথেও তাঁহাদের গতিবিধির অবধি ছিল না। * উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে ধান্য, যব, কলাই, তিল এবং নানাবিধ ফলমূলের উল্লেখ দেখা যায়। ঘৃত, দুগ্ধ, পায়স, পিষ্টক প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্যের কিছুরই অভাব ছিল না। আর্য্যগণ 'সোমরস' পান করিতেন ও দেবতাদিগকে 'সোমরস' দান করিতেন বলিয়া উল্লেখ আছে; কিন্তু সেই 'সোমরস' যে কি, এখন তাহা কোনপ্রকারেই নির্ণীত হয় না। কেহ কেহ বলেন,—"চন্দ্র-দেব 'সোম'-নামে এবং চন্দ্রের সুধা 'সোমরস' নামে অভিহিত হইত।" কাহারও কাহারও মতে,—"সোমরস, সিদ্ধি-পত্রের রসের ন্যায়; আর্য্যগণ এবং তাঁহাদের দেবতাবৃন্দ সেই রস পান করিতেন।" সে হিসাবে তাঁহারা সোমরসকে মাদক-সামগ্রী বলিয়াই মনে করেন। বৈদিক কালের আর আর আচার-ব্যবহারের মধ্যে দেখিতে পাই,—তৎকালে পশুবলি প্রচলিত ছিল, এবং আর্য্যগণের কেহ কেহ পশ্বাদির মাংস ভক্ষণ করিতেন। এখনও পশ্চিমাঞ্চলে কূপ হইতে জল তুলিয়া সময়ে সময়ে যেরূপ ভাবে চাষ-আবাদ করা হয়, ঋগ্বেদের সময়েও কোথাও কোথাও সে প্রথা প্রচলিত ছিল। কোথাও কোথাও ঘোটকের দ্বারা চাষ-আবাদ হইত বলিয়াও প্রমাণ পাওয়া যায়। সভ্য আর্য্য-হিন্দুগণ তখন সংস্কৃত-ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতেন; অসভ্য অনার্য্যগণ অনার্য্য-ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করিত। তবে সে ভাষা এখনকার ভাষা হইতে যে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। বৈদিক-ভাষার সহিত পরবর্ত্তি-কালের সংস্কৃত-ভাষার প্রায়ই ঐক্য নাই। বর্ত্তমান-কালের সংস্কৃত-ভাষা ব্যাকরণের নিয়মানুবর্ত্তী। কিন্তু বৈদিক-ভাষা সে ব্যাকরণের নিয়মাধীন নহে। ভাষার গতি দিন দিনই পরিবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে। সুতরাং বেদের অর্থ-পরিগ্রহ দিন দিনই দুঃসাধ্য হইয়া আসিতেছে;—বিকৃত অর্থ প্রবর্ত্তিত হইতেছে। সেই অর্থ-বিপর্য্যয়-হেতু, আর্য্য-হিন্দুগণের প্রাচীন আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, ধর্ম্ম-কর্ম্ম সম্বন্ধেও ভ্রান্তমতের প্রচলন হইয়াছে। প্রথমতঃ, শব্দার্থের কতই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তখন যে শব্দে যে অর্থ উপলব্ধি হইত, এখন সে শব্দের অর্থান্তর দেখিতে পাই। দ্বিতীয়তঃ, পদার্থাদির নাম কতই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তখন যে পদার্থ যে নামে পরিচিত হইত, এখন সে পদার্থের সে নাম প্রায়ই অন্য আকার ধারণ করিয়াছে। তৃতীয়তঃ, বাক্য-সমাবেশেও বহু পার্থক্য দৃষ্ট হয়। তখন যে বাক্য যে ভাবে অবস্থিত হইলে যে অর্থ প্রতীত হইত, এখন সে বাক্যে সে অর্থ প্রায়ই উপলব্ধ হয় না। সুতরাং তখন যে ঋকের যে অর্থ হইত, এখন সে ঋকের সে অর্থ প্রতিপাদন করা বিশেষ আয়াস-সাপেক্ষ। সেইজন্য বেদ-ব্যাখ্যায় এখন পরবর্ত্তী শাস্ত্রের সাহায্য

* ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে ১১৬শ সূক্তে দেখিতে পাওয়া যায়,—রাজর্ষি 'তুগ্র' আপন পুত্র ভুজ্যুকে সসৈন্যে সমুদ্র-পথে দিগ্বিজয়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন। চতুর্থ মণ্ডলের ৫৫ সূক্তে দেখিতে পাই, ধনলাভেচ্ছু বণিকগণের সমুদ্র-যাত্রার বিবরণ উল্লিখিত আছে।

আবশ্যক; সেইজন্য, বেদ-ব্যাখ্যায় এখন নিরুক্তকার ভাষ্যকার প্রভৃতির পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে হয়। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি,—বেদ কিরূপে বংশ-পরম্পরায় পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিয়াছে। আমরা আরও দেখিয়াছি,—বেদব্যাস ও অথর্ব্ব ঋষি কিরূপে বেদ-বিভাগ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সময় কোন্ ঋকের কিরূপ অর্থ প্রচলিত ছিল, যদি কেহ তাঁহাদের গ্রন্থ-সমুদ্রে অবগাহন করিতে পারেন, তিনিই সে অর্থ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। কিন্তু সকলের পক্ষে সে শাস্ত্র-সমুদ্র-মন্থন সম্ভবপর নহে;—সেই জন্য সাধারণতঃ যাস্কের নিরুক্ত এবং সায়ণাচার্য্যের ভাষ্য অনুসারেই অধুনা বেদের ব্যাখ্যা হইয়া থাকে। নিরুক্ত—বেদাঙ্গ-গ্রন্থ বিশেষ; বেদান্তর্গত দুরূহ শব্দের ব্যাখ্যা নিরুক্তে লিখিত আছে। যাস্কের নিরুক্তই এখন প্রচলিত। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনুমান করেন,—"মহামুনি যাস্ক খৃষ্ট-জন্মের পূর্ব্ববর্ত্তী পঞ্চম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।" কিন্তু যাস্কই যে প্রথম নিরুক্তকার, তাহা নহে। তাঁহার পূর্ব্বে বেদ-ব্যাখ্যাতা অন্যান্য নিরুক্তকার বর্ত্তমান ছিলেন, যাস্কের গ্রন্থেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। শাকপূর্ণি (শাকপুণি), ঔর্ণনাভ (উর্ণনাভ) স্থালাষ্ঠিবী (স্থুলোষ্ঠিবি) প্রভৃতি নিরুক্তকারগণের এখন নাম-মাত্রের উল্লেখ দেখি; কিন্তু তাঁহাদের গ্রন্থ-পত্র কিছুই এখন সন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। পূর্ব্ববর্ত্তী নিরুক্তকারগণের গ্রন্থ-সমূহের উদ্ধার সাধন হইলে, বৈদিক ঋক-সমূহের আদি-অর্থ অনেকাংশে উপলব্ধ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তার পর, যাস্কের তুলনায় সায়ণাচার্য্য—সেদিনের বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসু পণ্ডিতগণ নির্ণয় করিয়াছেন,—"বিজয়-নগরের রাজার দরবারে খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মাধব বিদ্যারণ্য নামে এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বিদ্যমান ছিলেন। তিনিই বেদের ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য, এবং তাঁহারই ভাষ্যানুসারে অধুনা বেদের ব্যাখ্যা হইয়া থাকে।" পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের সকলেরই এখন অবলম্বন—সেই সায়ণাচার্য্যের টীকা বা ভাষ্য। * সেই ভাষ্য ব্যতীত বেদ বুঝিবার অন্য উপায় এখন আর কিছুই নাই। সুতরাং সে দিনের সায়ণাচার্য্য বেদ-ব্যাখ্যায় যদি কোনও ভুল-ভ্রান্তি করিয়া

* উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে (১৮২৯ খৃঃ—১৮৫২ খৃঃ) ইউরোপে বেদের চর্চ্চা আরম্ভ হয়। সার উইলিয়ম জোন্স্, কোলব্রুক, ডাক্তার উইলসন, প্রথমে সংস্কৃত সাহিত্য লইয়া আলোচনা আরম্ভ করেন। ঐ সময়ে ফরাসী-পণ্ডিত বার্ণুফ, 'জেন্দ' ও বৈদিক-ভাষার শব্দ-তত্ত্বের আলোচনায় সাহিত্য-জগতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের বন্ধু ও সমসাময়িক রোসেন, এই সময়েই ঋগ্বেদের প্রথম অষ্টক (আট অধ্যায়ে এক অষ্টক; ঋগ্বেদে আট অষ্টকে চৌষট্টি অধ্যায় আছে।) 'লাটিন'-ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁহার পর, ফরাসী-পণ্ডিত লাঙ্‌লো, ফরাসী-ভাষায় সমগ্র ঋগ্বেদের অনুবাদ করিয়াছিলেন। অতঃপর পঞ্চবিংশ বৎসর পরিশ্রম করিয়া (১৮৪৯ খৃঃ—১৮৭৪ খৃঃ) অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার সায়ণের টীকা-সহ সমগ্র ঋগ্বেদ-সংহিতা প্রকাশ করেন। তৎপূর্ব্বে এরূপ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর সংস্করণ আর মুদ্রিত হয় নাই। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক অফ্রেট, বার্লিন-সহরে বেদের কিয়দংশ প্রকাশ করিয়াছিলেন। অতঃপর, ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে লর্ড উইগ এবং গ্রাস্‌মান নামক দুই জন জর্ম্মণ-পণ্ডিত জর্ম্মণ-ভাষায় ঋগ্বেদ প্রচার করেন। ইতিমধ্যে ক্রমে ক্রমে অধ্যাপক বেনফি, অধ্যাপক ওয়েবর, অধ্যাপক রথ ও হুইটনী প্রভৃতি, সামবেদ, যজুর্ব্বেদ, অথর্ব্ববেদের অংশবিশেষ প্রকাশ করেন। ইঁহারা প্রায় সকলেই রোমান্ অক্ষরে বেদ-প্রচার করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের মধ্যে উইলসন, ডাক্তার ষ্টিভেন্‌সন এবং অধ্যাপক হোগ ভারতবর্ষে বেদ-প্রচারে প্রসিদ্ধি-লাভ করেন। পরিশেষে, অস্মদ্দেশীয় পণ্ডিত-প্রবর রমানাথ সরস্বতী, পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ প্রভৃতি কর্ত্তৃক বেদের অংশবিশেষ প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়। শেষে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় সামবেদ প্রকাশে এবং শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ সম্পন্ন করিয়া যশস্বী হইয়াছেন।

গিয়া থাকেন, সকলই এখন সেই ভ্রান্তির অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। বুঝি বা সে ভ্রান্তি অপনোদনের আর সম্ভাবনাও নাই! চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, ভারতে মুসলমান-রাজত্বের অভ্যুদয়-কালে, মাধব বিদ্যারণ্য বা মাধবাচার্য্য, বিজয়-নগরের রাজা বুকার্য্য এবং হরি-হরের মন্ত্রী ছিলেন; সায়ণাচার্য্য নাম তাঁহার কেন হইল, তাহার কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না। পরন্তু, মতান্তরে বুঝা যায়,—তাঁহার বহু পূর্ব্বে বেদের ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য বিদ্যমান ছিলেন এবং তাঁহারই অস্থি-কঙ্কালের উপর বেদের ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া, মাধবাচার্য্য সেই ভাষ্যকে সায়ণাচার্য্যের ভাষ্য-নামে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের ব্রাহ্মণের টীকাকার 'সায়ণমাধব' এবং শুক্ল যজুর্ব্বেদের ব্রাহ্মণের টীকাকার 'সায়ণাচার্য্য' বলিয়া উল্লেখ আছে; তাহাতে দুই টীকাকারকে দুই জন স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিয়া বিশ্বাস হয়। মাধবাচার্য্যের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া সায়ণাচার্য্যের সহিত তাঁহার তুলনাচ্ছলে, লোকে হয় তো 'সায়ণমাধব' বলিয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিত, এবং তাহা হইতেই হয় তো তিনি পরবর্ত্তি-কালে সায়ণাচার্য্য নামে পরিচিত হইয়া থাকিবেন। কেহ কেহ আবার বলেন,—"সায়ণাচার্য্য, মাধবাচার্য্যের সহোদর ছিলেন। মাধবাচার্য্য ব্রাহ্মণের টীকা প্রণয়ন করেন, আর সায়ণাচার্য্য ঋগ্বেদের ভাষ্য লিখিয়া যান।" যাহা হউক, কাল-বিপর্য্যয়ে বেদের এবং বেদ-ব্যাখ্যার যে বহু বিপর্য্যয় সংঘটিত হইয়াছে, তাহাতে আর কোনই সংশয় নাই। এখন যাহা বেদ বলিয়া পরিচিত, অথবা এখন যাহা বেদের ব্যাখ্যা বলিয়া প্রচারিত, তাহা যে বহুরূপে বিকৃত হইয়া আছে, অনেক স্থলেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

বেদোক্ত সনাতন ধর্ম্মের সার-মর্ম্ম আমরা পূর্ব্বেই বিবৃত করিয়াছি। পাশ্চাত্য-পণ্ডিত-গণ সে ধর্ম্মের কিরূপ পরিচয় দিয়া থাকেন, এক্ষণে সেই আভাস প্রদান করিতেছি।

বেদ-ব্যাখ্যায় অধিকারী অনধিকারী।

তাঁহারা বলেন,—"প্রকৃতি-পূজাই বৈদিক-ধর্ম্মের মূলীভূত। আর্য্য-হিন্দুগণ যখনই প্রকৃতির যে বিভূতির বিকাশ দেখিয়াছেন, তখনই তাহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অনন্ত-বিস্তৃত আকাশের বিশালতা নির্ণয় করিতে না পারিয়া, তাঁহারা আকাশের পূজা করিয়াছেন। সূর্য্যের অত্যুজ্জ্বল জ্যোতির নিকট পৃথিবীর সকল জ্যোতিঃ পরাভূত দেখিয়া, তাঁহারা সৌর উপাসনায় ব্রতী হইয়াছেন। নৈশ-অন্ধকারের ভীষণতার পর উষার মনোমোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া, তাঁহারা উষার পদ-প্রান্তে মস্তক লুটাইয়াছেন। এইরূপে, পঞ্চভূতাত্মক পৃথিবীর সকল সামগ্রীই তাঁহাদের উপাস্য-দেবতা মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। তাই তাঁহারা, অসংখ্য নাম ও অসংখ্য গুণের আরোপ করিয়া, প্রকৃতির ঐশ্বর্য্যাদির পূজা করিতেন। এক আকাশকেই তাঁহারা কত-নামে কত-প্রকারে পূজা করিয়া গিয়াছেন! 'দ্যু' (জ্যোতিঃ) রূপে আকাশের পূজা-কল্পনা অতি প্রাচীন-কালে বিদ্যমান ছিল। বহু প্রাচীন-জাতির পূজা-পদ্ধতির সহিত আর্য্য-হিন্দুগণের এই প্রথার সাদৃশ্য দেখা যায়। এই 'দ্যু' হইতেই গ্রীক-দিগের 'জিয়স', জর্ম্মণ-দিগের 'জিও', স্যাক্সন-দিগের 'তিউ' এবং রোমান-দিগের 'জু' (জুপিটারের প্রথম শব্দাংশ) প্রভৃতি উৎপন্ন হওয়া সম্ভবপর। আর্য্য-হিন্দুগণের বরুণ এবং মিত্র দেবতাও—আকাশেরই নামান্তর মাত্র। তাঁহাদের বরুণ-দেবতা গ্রীক-দিগের 'ইউরেনাস'

এবং জেন্দ-আভেস্তায় 'মিথ্‌রা' নামে পরিচিত। ইরাণের 'আহুরো মজ্‌দ্'—এই বরুণেরই অন্য নাম।* আকাশের অবস্থা নিয়ত পরিবর্তন-শীল। সেই পরিবর্তন অনুসারেই বিবিধ নামে আকাশের পূজা-পদ্ধতি এ দেশে প্রচলিত ছিল। ইন্দ্রের পূজাও সেই আকাশ-পূজারই অন্তর্ভুক্ত। সংসারে সুবৃষ্টি আনয়নের কর্তা ছিলেন বলিয়া, ইন্দ্র ক্রমশঃ হিন্দুগণের পূজায় প্রধান আসন লাভ করেন। সূর্য্য, সাবিত্রী, অদিতি, গায়ত্রী, পুষণ, বিষ্ণু প্রভৃতি আকাশ-সংক্রান্ত আরও নানা দেবতার কল্পনা বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। বায়ু, মরুৎ, রুদ্র, যম, সোম,—সে সকল দেবতার ইয়ত্তা আছে কি? তবে দেবতার মধ্যে প্রধানতঃ তিন দেবতার সম্বন্ধে অধিক ঋক্ দৃষ্ট হয়। অগ্নি-দেবতার পরই ইন্দ্র-দেবতা এবং তৎপরে সূর্য্য-দেবতার স্তোত্রের প্রাধান্য।" ফলতঃ, প্রকৃতির উপাসনা করিতে করিতে, আর্য্য-হিন্দুগণ ক্রমে ক্রমে প্রকৃতির সৃষ্টি-কর্তা জগতের আদিভূত পরমেশ্বরের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন,—বেদের আলোচনায়, পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ প্রধানতঃ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তার পর, আর আর সম্বন্ধে, যাঁহার যাহা মনে হইয়াছে, তিনিই তাহা বলিয়া গিয়াছেন;—যাঁহার যাহা কল্পনায় উদয় হইয়াছে, তিনিই তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। সে হিসাবে, আর্য্য-হিন্দুগণকে কেহ গাছ-পাথর-পূজক জড়োপাসক, কেহ বা অসভ্য বর্ব্বর বলিয়া কীর্ত্তন করিতেও ত্রুটি করেন নাই। বেদের এখন এতই বিবৃত অবস্থা,—বেদের এখন এতই অর্থ-বিপর্য্যয়,—বেদের এখন এমনই দুর্দ্দশার দিন উপস্থিত! বেদের এই দুর্দ্দশা হইবে বলিয়াই তো, ভবিষ্যদ্দর্শী শাস্ত্রকারগণ বেদ-পাঠের অধিকারী অনধিকারী নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন! বেদের এইরূপ পরিণতি ঘটিবে আশঙ্কা করিয়াই তো, শাস্ত্রকারগণ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বেদ-পাঠের ব্যবস্থা বিহিত করিয়া গিয়াছেন! আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বেদে সকল শাস্ত্রের সার মর্ম্ম নিহিত আছে; সুতরাং শাস্ত্র-মর্ম্মানুসারে বেদ-মর্ম্ম বুঝিতে হইলে, বহু সাধনার, বহু অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। কিন্তু সেরূপভাবে শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিয়া বেদ-পাঠের ক্ষমতা এখন আর কাহার আছে? তাই, বেদ লইয়া এখন নানা জনে নানা কথাই কহিতে পারিতেছেন! তাই, লোকের সুবিধা-অসুবিধা-অনুসারে, বেদের এখন নানা অর্থ সূচিত হইতেছে! কিরূপ চিত্ত-স্থির করিয়া শুদ্ধ-শান্ত হইয়া বেদ পাঠ করিলে অভীষ্ট-লাভ হয়, মনু-সংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ে তাহা বিশদ-রূপে বর্ণিত আছে। কোন্ বেদের কি প্রতিপাদ্য বিষয়, মনু সংক্ষেপে তাহাও উল্লেখ করিতে ত্রুটি করেন নাই। তিনি বলিয়া গিয়াছেন,—"ঋগ্বেদে দেব-দৈবত্য অর্থাৎ দেবতার স্তুতিই প্রধানভাবে বিদ্যমান আছে। মনুষ্যগণ যজুর্ব্বেদের দেবতা, অর্থাৎ মনুষ্য-গণের কর্ম্মকাণ্ডই যজুর্ব্বেদের মুখ্য বিষয়। সামবেদ পিতৃ-দেবতাক অর্থাৎ পিতৃ-লোকের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন—সামবেদের মুখ্য উদ্দেশ্য। বিদ্বানগণ, তিন বেদের এইরূপ তিন অধিষ্ঠাতা জানিয়া, সকল বেদের সারভূত প্রণব, ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী পূর্ব্বে উচ্চারণ করিয়া পশ্চাৎ বেদাধ্যয়ন করিবেন।"

---

* পাশ্চাত্য পণ্ডিত-গণের মত—"Dyu (দ্যুঃ) is the Zeus of the Greeks, Zio of the Germans, Tiu of the Saxons, Jupiter of the Romans; Varuna (বরুণ) is the Uranus of the Greeks; and Mitra (মিত্র) is the Mithra of the Zend-avesta, and Ahura Mazd of the Irans, &c."

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষৎ।

[বেদের ব্রাহ্মণ-ভাগের মর্ম্ম,—সৃষ্টি-তত্ত্বে জল-প্লাবন,—মনু ও নোয়া,—প্রজাপতির সৃষ্টি-প্রসঙ্গ,—উপাখ্যানে কুমারিল ভট্টের মন্তব্য;—হরিশ্চন্দ্র ও শুনঃশেপের প্রসঙ্গে নরবলির কল্পনা-কাহিনী,—আরণ্যক ভাগের উদ্দেশ্য ও পরিচয়;—উপনিষদের সারতত্ত্ব,—উপনিষদের সংখ্যা-পর্য্যায়,—উপনিষদে মুসলমানের হস্তক্ষেপ,—অল্লোপনিষদে শেখ ভাবন ও বদাউনীর কল্পনা-কৌশল;—উপনিষদের বর্ণনা ও কবিত্বের আভাস,—উপনিষদে দার্শনিক চিন্তার উন্মেষ-সম্বন্ধে মতামত,—উপনিষৎ রচনার কাল-নির্ণয়ে বাদানুবাদ।]

'ব্রাহ্মণ' ও 'আরণ্যক' বেদের উপসংহার ভাগ বলিয়া কথিত হয়। বৈদিক মন্ত্রসমূহ কিরূপে ক্রিয়া-কর্ম্মে ব্যবহৃত হইবে, ব্রাহ্মণ-ভাগে প্রধানতঃ তাহাই বিবৃত আছে।

ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক।

প্রসঙ্গতঃ, কর্ম্মকাণ্ডের উপদেশ-ছলে, ব্রাহ্মণ-ভাগে অন্যান্য কথাও অনেক লিখিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণে সৃষ্টি-তত্ত্বের কথা আছে; ব্রাহ্মণে বহু পৌরাণিক কাহিনীর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই; ব্রাহ্মণে বলিদান-প্রথার প্রাধান্য লক্ষিত হয়। জল-প্লাবনের উপাখ্যান—প্রথমতঃ ব্রাহ্মণেই দেখিতে পাওয়া যায়। শতপথ ব্রাহ্মণে এইরূপভাবে সে উপাখ্যান বর্ণিত আছে:—বৈবস্বত মনু একদিন তর্পণাঞ্জলি প্রদান করিতেছিলেন। সহসা সেই অঞ্জলি-জল-মধ্যে একটী ক্ষুদ্র মৎস্য দেখিতে পাইলেন। মৎস্য তাঁহাকে কহিল,—"আপনি আমায় প্রতিপালন করুন। আমার দ্বারা আপনার উপকার হইবে।" মনু সেই মৎস্যকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে মৎস্য এত বড় হইয়া উঠিল যে, মনু তাহাকে সমুদ্রে রাখিতে বাধ্য হইলেন। সেই সময় মৎস্য একদিন মনুকে সাবধান করিয়া বলিল,—"অমুক বৎসরের অমুক দিনে জল-প্লাবনে মহাপ্রলয় উপস্থিত হইবে। আপনি একখানি অর্ণব-পোত প্রস্তুত করিয়া আত্মরক্ষার উপায় করুন।" মৎস্যের সেই ভবিষ্যদ্বাণী-ক্রমে যথাসময়ে জল-প্লাবন উপস্থিত হইলে, অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া মনু আত্ম-রক্ষা করিলেন। জল-প্লাবনের সময় মনুর অর্ণব-পোত পরিচালনা করিয়া, মৎস্য উত্তর-দেশের গিরিশৃঙ্গে এক বৃক্ষের নিকট রক্ষা করে। সেই বৃক্ষে তরণী বাঁধিয়া প্লাবনের সময় মনু তথায় অবস্থান করেন। পরিশেষে, বন্যার প্রকোপ হ্রাস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, অর্ণবপোত-সহ মনু নিম্নে অবতরণ করিয়াছিলেন। তখন, সংসারের সকল লোকই ইহলীলা সংবরণ করিয়াছিল; একমাত্র মনুই আত্ম-রক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন। সেই মনু হইতেই সংসারে পুনরায় মনুষ্যের সৃষ্টি হয়। মন্বন্তরের উৎপত্তিও—সেই হইতেই। শতপথ ব্রাহ্মণের এই উপাখ্যানটী পুরাণে রূপান্তরে স্থান-লাভ করিয়াছে, এবং অন্যান্য দেশেও এই উপাখ্যানের প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। বাইবেলোক্ত 'নোয়ার' কাহিনী যাঁহারা অবগত আছেন, এই উপাখ্যান পাঠ করিলে, তাঁহারা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন, জল-প্লাবনের সময় 'আরারত'-পর্ব্বতে নোয়ার জাহাজ (আর্ক) অবস্থান—শতপথ ব্রাহ্মণের এই উপাখ্যানেরই পুনরাবৃত্তি মাত্র। এমন কি, এই জন্য কেহ কেহ নোয়া এবং মনুকে এক ব্যক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেও

কুণ্ঠিত হন নাই। শতপথ ব্রাহ্মণে এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণে সৃষ্টি-সম্বন্ধে এইরূপ আরও একটী উপাখ্যান আছে। সে উপাখ্যানের মর্ম্ম এই,—"প্রজাপতি সৃষ্টিকর্ত্তা আপন কন্যা উষা হইতে মনুষ্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন।" ঋগ্বেদের উষা ও সূর্য্যের স্তোত্র হইতে রূপান্তরিত হইয়া যে এই কল্পনার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা সহজেই বুঝা যায়। ঋগ্বেদে আছে,—'সূর্য্য, উষার পশ্চাতে ধাবমান হইতেছেন।' উষার পর সূর্য্যের প্রখর রশ্মি বিস্তীর্ণ হয়, তাহাতে সেই অর্থই উপলব্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু এই উপলক্ষে, কবি-কল্পনায় উষা-সুন্দরী বালিকা-রূপে এবং সূর্য্য সৃষ্টি-কর্ত্তা প্রজাপতি-রূপে পরিবর্ণিত হইয়া, কি বীভৎস উপাখ্যানেরই সৃষ্টি হইয়াছে! 'বীভৎস' কেবল আমরা বলিতেছি না;—শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তি-কালে যিনি বৌদ্ধ ধর্ম্মের ঘোর বিরুদ্ধবাদী হইয়া হিন্দু-ধর্ম্মের প্রাধান্য-রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই কুমারিল ভট্টও এই কথা বলিয়া গিয়াছেন। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে এই সৃষ্টি-প্রণালী আর এক নূতন রূপ ধারণ করিয়া আছে। তাহার মতে,—"সৃষ্টির প্রারম্ভে জল ভিন্ন অন্য পদার্থ কিছুই বিদ্যমান ছিল না; জলের উপর কেবল একটী পদ্মপত্র ভাসমান ছিল। প্রজাপতি বরাহ-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সেই জলমধ্যে গমন করেন, এবং তাহা হইতে মৃত্তিকা উত্তোলন করিয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া দেন; তখন, প্রস্তর-খণ্ডের সহিত সেই মৃত্তিকা-রাশি সম্মিলিত হইয়া এই পৃথিবীর সৃষ্টি হয়।" শতপথ ব্রাহ্মণে এই উপাখ্যানও অন্য আকারে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে আরও লিখিত আছে,—"সৃষ্টির পর, প্রজাপতি হইতে অসুর ও দেবতাগণ উদ্ভূত হন। তখন দেবাসুরের পরস্পরের প্রাধান্য লইয়া তাঁহাদের ঘোর দ্বন্দ্বে পৃথিবী পদ্মপত্রের ন্যায় প্রকম্পিত হইয়া উঠে।" ঐ ব্রাহ্মণেরই অন্য আর এক স্থলে আছে,—"সৃষ্টির আদিতে একমাত্র প্রজাপতি ব্রহ্মা বিরাজমান ছিলেন; তিনি প্রথমে জীব সৃষ্টি করেন; তৎপরে পক্ষী ও সরীসৃপ প্রভৃতির সৃষ্টি হয়। কিন্তু আহার্য্যাভাবে তাহারা সকলেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হওয়ায়, জীব-জন্তুর স্তনে প্রজাপতি দুগ্ধ-সঞ্চার করেন।" কৌষীতকী এবং শতপথ ব্রাহ্মণে শিব এবং রুদ্রের প্রাধান্য কীর্ত্তিত হয়। দক্ষ পার্ব্বতীর পূজা-প্রসঙ্গ শতপথ ব্রাহ্মণেই প্রথম দেখিতে পাওয়া যায়। অসুরদিগকে পরাজয় করিয়া দেবতাগণের সমগ্র পৃথিবী অধিকারের বিষয়,—ঐতরেয় এবং শতপথ ব্রাহ্মণে বর্ণিত আছে। শতপথ ব্রাহ্মণে প্রথমতঃ বিষ্ণুর প্রাধান্য পরিকীর্ত্তিত হয়। ইন্দ্র কর্ত্তৃক বিষ্ণুর মস্তকচ্ছেদ হইয়াছিল বলিয়া, শতপথ ব্রাহ্মণে একটী উপাখ্যান আছে। সামবেদের 'তান্দ্য ব্রাহ্মণে' ব্রাত্য-ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইয়া যাঁহারা ব্রাহ্মণ-বৃত্তি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অন্য বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের বিষয় বর্ণিত আছে। এই ব্রাত্যগণ ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৃত্ত্যন্তর গ্রহণ করায়, ব্রাহ্মণত্ব-ভ্রষ্ট হন নাই,—তান্দ্য ব্রাহ্মণে তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। যজ্ঞ-মাহাত্ম্য এবং যজ্ঞের প্রণালী বর্ণনা ব্যপদেশে, ব্রাহ্মণ-ভাগে আরও নানা আখ্যায়িকার অবতারণা আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে, হরিশ্চন্দ্র ও শুনঃশেপের প্রসঙ্গে নরবলির উল্লেখ প্রথম দৃষ্ট হয়। তাহাতে লিখিত আছে,—"রাজা হরিশ্চন্দ্র আপনার পুত্র রোহিতকে যজ্ঞে বলি দিতে চাহেন। পুত্র সম্মত না হওয়ায়, রাজা হরিশ্চন্দ্র, অজীগর্ত্তকে বুঝাইয়া তাঁহার পুত্র

শুনঃশেপকে বলি দিবার ব্যবস্থা করেন। শুনঃশেপ দেবগণের স্তুতি করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন।" রামায়ণ, বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবৎ প্রভৃতিতেও শুনঃশেপের কাহিনী বর্ণিত আছে। রামায়ণে দেখিতে পাওয়া যায়,—"তাঁহার পিতার নাম ঋচীক এবং অযোধ্যার অধিপতির নিকট তিনি বিক্রীত হইয়াছিলেন। কিন্তু বিশ্বামিত্রের পরামর্শে, দেবগণের স্তোত্র পাঠ করায়, তাঁহার জীবন রক্ষা হয়।" ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, সম্ভবতঃ ঋগ্বেদের একটী সূক্ত অবলম্বন করিয়া, শুনঃশেপকে বলি দিবার উপাখ্যান রচনা করিয়াছিলেন; এবং তাহার পর, ক্রমশঃ তাহা অধিকতর পল্লবিত হইয়া নানা আকারে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। বৈদিক-কালে এদেশে নরবলি ছিল—এ কথা যাঁহারা প্রমাণ করিতে চাহেন, শুনঃশেপের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া তাঁহারা আপনাদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির চেষ্টা পান। সায়ণাচার্য্যের ভাষ্যই ঐ মত পরিপোষণে তাঁহাদের প্রধান অবলম্বন। কিন্তু সায়ণাচার্য্য কোথা হইতে ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, কিছুতেই তাহা বুঝিতে পারা যায় না। বেদে কোথাও নরবলির কথা নাই; পরন্তু প্রথম মণ্ডলের চতুর্ব্বিংশ সূক্তে শুনঃশেপ যেখানে অগ্নি প্রভৃতি দেবতার স্তুতিগান করিতেছেন, সেখানেও কোনক্রমে তাঁহার বলির প্রসঙ্গ উঠিতে পারে না। সূক্তটী পড়িলে, স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়,—'তিনি পৃথিবীর বন্ধন হইতে মুক্তি পাইবার জন্য দেবগণের স্তুতি করিতেছিলেন।' শতপথ ব্রাহ্মণে রাজর্ষি জনকের উল্লেখ প্রথম দেখিতে পাওয়া যায়; বিদেহ-রাজ্য এবং কোশল-রাজ্যের সমৃদ্ধির আভাসও প্রথম প্রাপ্ত হই। ব্রাহ্মণের পরই আরণ্যক। সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে সন্ন্যাসাশ্রমে গিয়া বেদ-পাঠের আবশ্যকতা আরণ্যকে প্রতিপন্ন হয়। আরণ্যক—ব্রাহ্মণের উপসংহার ভাগ। সায়ণের ব্যাখ্যায় জানা যায়,—গৃহস্থের যজ্ঞাদি কর্ম্মের জন্য যেমন 'ব্রাহ্মণের' প্রয়োজন; অরণ্যে বাণপ্রস্থ অবলম্বনের জন্য সেইরূপ 'আরণ্যকের' আবশ্যক। কিরূপ আচার-সম্পন্ন হইলে কিরূপে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইতে পারে এবং ব্রহ্মই বা কি,—আরণ্যকে তাহারই মূল-তত্ত্ব নিহিত আছে। বেদ-পাঠ শেষ করিয়া আরণ্যক অধ্যয়ন করিতে হয়,—মহর্ষি মনু এইরূপ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন,—"যাঁহারা যোগ অভ্যাস করিতে চাহেন, তাঁহারা আরণ্যক এবং আমার যোগ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করুন।" * প্রত্যেক ব্রাহ্মণের একখানি করিয়া 'আরণ্যক' আছে; ঋগ্বেদের যেমন দুই খানি ব্রাহ্মণ, তেমনি দুই খানি আরণ্যক—কৌষীতকী ও ঐতরেয়। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের তৈত্তিরীয় আরণ্যক, শুক্ল যজুর্ব্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণের আরণ্যকের নাম বৃহদারণ্যক। সামবেদ এবং অথর্ব্ববেদের আরণ্যক নাই অথবা এখন আর পাওয়া যায় না। ঐতরেয় আরণ্যকে ঋগ্বেদের প্রত্যেক ঋষির পরিচয় আছে। ঐতরেয় আরণ্যকেই ঋগ্বেদের সূক্ত, পদ, পদাংশ, শব্দ, শব্দাংশ প্রভৃতির সংখ্যা-নির্ণয় দেখিতে পাই। শুক্ল যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে আর্য্য-হিন্দুগণের দাহ-সংকার-প্রথা বর্ণিত আছে। তৎপূর্ব্বে কোথাও কোথাও অস্থি ও চিতাভস্ম মৃত্তিকা প্রোথিত হইত,—এরূপও প্রমাণ পাওয়া যায়।

* মনুসংহিতা, চতুর্থ অধ্যায়, ১২৩শ শ্লোক এবং যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা। তৃতীয় অধ্যায়, ১১০ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

আরণ্যকের পর—উপনিষৎ। আরণ্যকই উপনিষদের মূলীভূত। আরণ্যকে ব্রহ্মতত্ত্বের যে মূল সূত্র নিহিত আছে, উপনিষদে তাহাই বিবৃত হইয়াছে। ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণের জন্য, ঋষিগণ অনেকেই উপনিষদকে বেদান্ত বা বেদের শিরোভাগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। 'উপনিষৎ' শব্দের ধাত্বর্থে আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি,—"ঈশ্বর-সামীপ্য-লাভই উপনিষদের উদ্দেশ্য।" যাঁহারা সংসার-পঙ্কে নিমজ্জমান, ব্রহ্ম-চিন্তায় যাঁহাদের চিত্ত কখনও প্রধাবিত নহে, উপনিষৎ তাঁহাদিগকে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভের পথ দেখাইয়া দেন। জীবাত্মা এবং পরমাত্মার অভেদ-ভাব উপনিষদেই প্রতিপন্ন হয়। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি—ধর্ম্ম-সাধনার দুই অঙ্গ। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুখ-সাধনের উদ্দেশ্যে হিন্দু যে অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাহাই প্রবৃত্তি অঙ্গ; আর যদ্দারা সংসারের মায়া-মোহ পরিত্যাগ করিয়া পরমাত্মায় লীন হওয়া যায়, তাহাই নিবৃত্তি অঙ্গ। উপনিষদে সেই নিবৃত্তি-অঙ্গই বর্ণিত আছে। সে হিসাবে উপনিষৎ—জ্ঞানযোগ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। উপনিষদের সংখ্যা অনেক ছিল। কোথাও এক শত আট খানি উপনিষদের, কোথাও দুই শত পঁয়ত্রিশ খানি উপনিষদের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বিদ্যারণ্য-স্বামীর মতে,—ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য, মুণ্ডক, প্রশ্ন, কৌষীতকী, মৈত্রায়ণীয়, কঠবল্লী, শ্বেতাশ্বর, বৃহদারণ্যক, তলবকার, নৃসিংহোত্তর-তাপনীয়,—এই বারখানিই প্রধান উপনিষৎ। মতান্তরে, বত্রিশখানি উপনিষদের প্রাধান্য কথিত হইয়া থাকে; যথা, ঋগ্বেদান্তর্গত—ঐতরেয়, কৌষীতকী; কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত—কঠ, তৈত্তিরীয়, ব্রহ্ম, কৈবল্য, শ্বেতাশ্বতর, গর্ভ, নারায়ণ, ব্রহ্মা বা অমৃতবিন্দু, অমৃতনাদ, কালাগ্নি রুদ্র, ক্ষুরিকা; শুক্ল যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত—ঈশ, বৃহদারণ্যক, জাবাল, হংস, পরমহংস, সুবাল, মন্ত্রিকা; সামবেদান্তর্গত—কেন, ছান্দোগ্য, আরুণি, মৈত্রায়ণী, মৈত্রেয়ী; অথর্ব্ব-বেদান্তর্গত—প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, অথর্ব্বশির, অথর্ব্বশিখা, বৃহজ্জাবাল, নৃসিংহতাপনি। এই বত্রিশখানি উপনিষৎ আজিও এদেশে প্রচলিত আছে। কিন্তু অন্যান্য উপনিষৎ এখন আর তাদৃশ প্রচলিত নাই। পরবর্ত্তি-কালে উপনিষৎ-সম্বন্ধে অনেক ব্যভিচার ঘটিয়াছিল;—এমন কি, তখন যে কোনও ব্যক্তি আপন মত-প্রতিষ্ঠার জন্য উপনিষৎ-নামে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। অল্লোপনিষৎ প্রভৃতিই ইহার প্রমাণ। অল্লোপনিষৎ—বাদসাহ আকবরের সময়, মুসলমান-ধর্ম্মের প্রাধান্য প্রতিপাদনের জন্য বিরচিত হয়। 'মন্তেখুবৎ তবারিক' গ্রন্থে অল্লোপনিষৎ-রচনার কারণ-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। কথিত হয়,—হিজরি ৯৮৩ সালে (১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে) সম্রাট আকবর বদাউনি নামক জনৈক মুসলমানকে অথর্ব্ববেদের অনুবাদ করিতে বলেন। ইসলাম-ধর্ম্মের সহিত অথর্ব্ববেদের কতকগুলি ধর্ম্মোপদেশের ঐক্য আছে—শুনিতে পাইয়া, বাদসাহ সেই আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। অনুবাদ-কালে বদাউনি অথর্ব্ববেদের অর্থ উপলব্ধি করিতে পারেন না। তখন, ফৈজি ও ইব্রাহিমের উপর সেই অনুবাদের ভার ন্যস্ত হয়। কিন্তু তাঁহারাই বা কি করিবেন? ইতিমধ্যে ভাবন নামক জনৈক দক্ষিণ-দেশীয় ব্রাহ্মণ, মুসলমান-ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। তখন তাঁহারই সাহায্যে পারস্য-ভাষায় অথর্ব্ববেদের

অনুবাদ আরম্ভ হয়। বদাউনি এবং ইব্রাহিমকে শেখ ভাবন যেরূপভাবে বুঝাইয়া দিতেন, তাঁহারা সেই ভাবেই অনুবাদ-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যাইতেন। সেই অনুবাদের সময় বেদের এক স্থানে কোরাণের 'লা ইল্লাহ্' বচনের মত কোনও অংশ দেখিতে পাইয়া, শেখ ভাবন তাহার রূপান্তর সংঘটিত করেন। অনেকে, ভাবনের কৌশল বুঝিতে না পারিয়া, সত্য সত্যই বেদে 'আল্লার' কথা আছে মনে করিয়া, ভ্রমে পতিত হয়; এবং তদনুসারে মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করে। অথর্ব্ববেদের যে দুইটী মন্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া শেখ ভাবন আপনার উদ্দেশ্য-সিদ্ধি করিয়াছিলেন, সে দুইটী মন্ত্র এই :—"আদলাবুকমেককং। অলাবুক নিখাতং।" এই হইতে প্রথমে "আদল্লাবুকমেককং। অল্লাং বুকং।"—ইত্যাদি বাক্যের সৃষ্টি হয়; এবং পরিশেষে 'অল্লোপনিষৎ' রচিত হইয়া যায়। অল্লোপনিষদের উপসংহারে পরিবর্ত্তনের মাত্রা চরম পন্থা পরিগ্রহ করে। তাহাতে লিখিত হয়,—"ইল্লাকবর ইল্লাকবর ইল্লল্লেতি ইল্লাল্লাঃ ইল্লা ইল্লাল্লা অনাদিস্বরূপা অথর্ব্বণী শাখাং হ্রুং হ্রীং জনান্ পশূন্ সিদ্ধান্ জলচরান্ অদৃষ্টং কুরু কুরু ফট্।" অর্থাৎ, আকবর বাদসাহ পর্য্যন্ত উপনিষদে স্থান লাভ করেন। ইহার অধিক শাস্ত্রের দুর্দ্দশা আর কি হইতে পারে? যাহা হউক, এই সকল কারণেই অথর্ব্ববেদকে এক সময়ে মুসলমানের বেদ বলিয়া কাহারও কাহারও মনে সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল।

ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ-ব্যপদেশে উপনিষদে যে যে বিষয় আলোচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে চারিটি বিষয় প্রধান উল্লেখযোগ্য। প্রথম,—আত্মার বিশ্বব্যাপকতা; দ্বিতীয়,—আত্মার দেহান্তর-গ্রহণ; তৃতীয়,—সৃষ্টিতত্ত্ব; চতুর্থ,—লয়-রহস্য। আমরা একে একে সংক্ষেপে এই চতুর্ব্বিধ বিষয়েরই আভাস প্রদান করিতেছি; তাহাতে উপনিষদের মূলতত্ত্ব কতকটা হৃদয়ঙ্গম হওয়া সম্ভবপর।

উপনিষদের প্রতিপাদ্য।

প্রথমতঃ—আত্মার বিশ্বব্যাপকতা। উপনিষদের মত এই,—পরমাত্মা সর্ব্বভূতে সমভাবে বিরাজমান আছেন; ইহসংসারের সকল পদার্থেই তিনি ওতঃপ্রোত অবস্থিতি করিতেছেন। অধুনা 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' বা একেশ্বর বলিতে যে ভাব সচরাচর উপলব্ধি হয়, সে হিসাবে উপনিষদের পরব্রহ্মের আদর্শ স্বতন্ত্র বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। এক্ষণে 'একেশ্বর' শব্দে 'একমাত্র ঈশ্বরই এই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং এই বিশ্বসংসার তাঁহার সৃষ্ট-সামগ্রী' এই অর্থ বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু উপনিষদের অর্থ তাহা হইতে স্বতন্ত্র। উপনিষদের মতে,—'জগদীশ্বর এক বটেন, পরব্রহ্ম এক বটেন; কিন্তু সৃষ্ট-সামগ্রী তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে; অর্থাৎ, পরমাত্মা অভিন্নভাবে বিশ্বসংসারে মিশিয়া রহিয়াছেন;—এ বিশ্ব তাঁহারই প্রতিকৃতি মাত্র।' উপনিষদে শত শত উপমা ও দৃষ্টান্ত দ্বারা এই পরব্রহ্ম-তত্ত্ব বুঝান হইয়াছে। ছান্দোগ্য, কেন ও ঈশ উপনিষদের দুই এক স্থলের মর্ম্ম নিম্নে প্রদান করিতেছি। তাহাতে আত্মার এই বিশ্বব্যাপকতা-তত্ত্ব কতকটা বুঝিতে পারা যাইবে। ছান্দোগ্যোপনিষদের তৃতীয় 'প্রপাঠক' চতুর্দ্দশ খণ্ডে লিখিত হইয়াছে,—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত।" অর্থাৎ,—"এই সংসারই ব্রহ্ম। ব্রহ্মই এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বের আদি, অন্ত ও প্রাণভূত। এই বুঝিয়া মনুষ্য তাঁহার

উপাসনা করিবে।" তার পর, আরও উক্ত হইয়াছে,—"তিনি মনোময়, তিনি প্রাণময়, তিনি জ্যোতির্ম্ময়, তিনি সর্ব্বকর্ম্মা, তিনি সর্ব্বকাম, তিনি সর্ব্বগন্ধ, তিনি সর্ব্বরস, তিনি সত্যসঙ্কল্প, তিনি আকাশাত্মা, তিনি সকলেরই মধ্যে বিরাজমান্। এক দিকে তিনি, আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ে, তণ্ডুলের কণা হইতে ক্ষুদ্র, যবের কণা হইতে ক্ষুদ্র, সরিষার কণা হইতে ক্ষুদ্র, তৃণবীজের কণা হইতে ক্ষুদ্র, আত্মারূপে অবস্থিত; অন্য দিকে, তিনিই আবার সেই আত্মা-রূপে, পৃথিবী অপেক্ষা বৃহৎ, আকাশের অপেক্ষা বৃহৎ, দিব্যলোকের অপেক্ষা বৃহৎ, সকল ভূলোকের অপেক্ষা বৃহৎ। তিনিই সকল কার্য্য করাইতেছেন; তাঁহার ইচ্ছাতেই সকল কার্য্য হইতেছে; সকল গন্ধ, সকল রস,—তিনিই সকলের মূলীভূত। এখানেও তিনি; আবার ইহসংসার পরিত্যাগের পরও তাঁহাতেই আশ্রয় পাইব।" পরব্রহ্মের এই বিশ্বব্যাপক ভাব, উপমা দ্বারা কিরূপ বিশদীকৃত হইয়াছে, উক্ত ছান্দোগ্য উপনিষদেরই ষষ্ঠ প্রপাঠক নবম খণ্ড হইতে তাহাও দেখাইতেছি। ঋষি উদ্দালক আরুণি আপন পুত্র শ্বেতকেতুকে পরমাত্মার বিষয়ে এইরূপ উপদেশ দিতেছেন,—"বৎস! মধুমক্ষিকাগণ বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে পরিভ্রমণ করিয়া মধু সংগ্রহ-পূর্ব্বক মধুচক্র রচনা করে। সেই মধু-চক্রে বিবিধ বৃক্ষের বিবিধ পুষ্পের মধু একত্রীভূত হইলে, কোন্ বৃক্ষের বা কোন্ জাতীয় পুষ্পের মধু কোথায় রহিল, কেহই তাহা নির্ণয় করিতে পারে না। প্রাণি-সমূহও সেইরূপ জানিবে। তাহারাও যখন সেই পরমাত্মায় বিলীন হইবে, তখন আর কোনক্রমে আপন অস্তিত্ব অনুসন্ধান করিয়া পাইবে না। আরও পুত্র, ঐ দেখ নদী-সমূহ!—কোনটি পূর্ব্বাভিমুখে, কোনটি পশ্চিমাভিমুখে প্রধাবিত; কিন্তু সকলেই সাগরে সম্মিলিত হইতেছে; প্রকৃত পক্ষে সাগরেই মিশিয়া যাইতেছে। কেবল তাহাই নহে;—সাগর হইতেই তাহাদের উৎপত্তি—সাগর-সম্ভূত বাষ্পেই তাহাদের পরিপুষ্টি! অথচ, তাহারা কখনও বলিতে পারে কি,—সাগরের কোন্ প্রান্তে কোথায় কাহার অবস্থিতি ছিল? কখনই না। পুত্র! প্রাণি-সমূহকেও সেইরূপ জানিবে। তাহারাও সেই সত্যস্বরূপ পরমাত্মা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে বটে; কিন্তু জানে না যে, কোথা হইতে আসিয়াছে!" বিষয়টি অধিকতর বিশদভাবে বুঝাইবার জন্য, পুত্রকে ঋষি আরও কহিলেন,—"পুত্র! আপাততঃ এই লবণগুলিকে ঐ জল মধ্যে রাখিয়া আইস। কাল প্রভাতে পুনরায় এই বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইবে।" পুত্র শ্বেতকেতু পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিলে, পরদিন প্রভাতে ঋষি উদ্দালক কহিলেন,—"কাল রাত্রে জলমধ্যে যে লবণ রাখিয়া আসিয়াছ, তাহা আনয়ন কর।" পুত্র দেখিলেন,—জলে লবণের চিহ্ন মাত্র নাই; সমস্তই গলিয়া গিয়াছে। পিতা কহিলেন,—"ভাল, উপর হইতে একটু জলের আস্বাদ লইয়া দেখ দেখি! কেমন লাগিতেছে?" পুত্র উত্তর করিলেন,—"লবণাক্ত।" পিতা পুনরপি কহিলেন,—"মধ্যের একটু জলের আস্বাদ লইয়া দেখ দেখি!" আস্বাদ গ্রহণ করিয়া, পুত্র একই উত্তর দিলেন। পিতা অতঃপর নিম্ন হইতে কিঞ্চিৎ জল তুলিয়া লইয়া আস্বাদ করিতে কহিলেন। পুত্র শ্বেতকেতু সেবারও উত্তর দিলেন,—"একই আস্বাদ।" তখন পিতা কহিলেন,—"জল ফেলিয়া দেও। যাহা বলিতেছি, বুঝিবার চেষ্টা কর।" পুত্র একাগ্রচিত্তে পিতার

উপদেশ শুনিতে লাগিলেন। পিতা বুঝাইয়া বলিলেন,—"পরমাত্মাও এই প্রকার। জলের মধ্যে অদৃশ্যভাবে লবণের বিদ্যমানতা যেরূপ সম্ভবপর, পরমাত্মাও তদ্রূপ অদৃশ্যভাবে সর্ব্বভূতে বিরাজমান্ আছেন।" ছান্দোগ্যোপনিষদের * এই ভাব, 'ঈশ' ও 'কেন' উপনিষদেও কেমন সুন্দর প্রকটিত দেখুন! 'কেন' উপনিষদে প্রথমেই প্রশ্ন করা হইয়াছে,—"মন কাহার প্রেরণায় কার্য্য করিতেছে? কাহার আদেশে প্রথম প্রাণবায়ু নিঃসরণ হইতেছে? কাহার ইচ্ছায় আমরা বাক্য কহিতেছি? চক্ষু এবং কর্ণকেই বা কোন্ দেবতা পরিচালনা করিতেছেন?" পরক্ষণেই উপনিষৎ উত্তর দিতেছেন,—

"শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্, বাচো হ বা বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ। ... ॥
যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥
যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥
যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূংষি পশ্যতি। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥
যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥
যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥"

অর্থাৎ,—"কর্ণের যিনি কর্ণ, মনের যিনি মন, বাক্যের যিনি বাক্য, প্রাণের যিনি প্রাণ, চক্ষুর যিনি চক্ষু,—তিনিই সকল কার্য্য করাইতেছেন ও করিতেছেন। বাক্যের দ্বারা যাঁহাকে ব্যক্ত করা যায় না, পরন্তু যাঁহা হইতে বাক্য উদ্ভূত হয়; মনের দ্বারা তাঁহাকে চিন্তা করা যায় না, পরন্তু মনই যদ্দ্বারা পরিচিন্তিত হয়; নেত্রের দ্বারা যাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না, পরন্তু যিনি সকলই দেখিতে পান; কর্ণের দ্বারা যাঁহাকে উপলব্ধি করা যায় না পরন্তু কর্ণ যাঁহার দ্বারা পরিচালিত হয়; প্রাণ-বায়ু যাঁহার অস্তিত্ব অনুসন্ধান করিয়া পায় না, পরন্তু যাঁহার দ্বারা প্রাণ-বায়ু প্রবাহিত হয়;—একমাত্র তিনিই ব্রহ্ম, একমাত্র তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে; তিনি ভিন্ন অন্য উপাসনা কদাচ শ্রেয়ঃ নহে।" † সেই তিনি; কিন্তু যিনি তাঁহাকে কিঞ্চিন্মাত্র উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার কি অনুপম আনন্দ! ঈশোপনিষদে সেই আনন্দ কি সুন্দর পরিবর্ণিত!

"যস্তু সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি। সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে ॥
যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ। তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ ॥"

অর্থাৎ,—"যিনি পরমাত্মায় সর্ব্বভূতের অবস্থান দেখিতে পান এবং যিনি সর্ব্বভূতে পরমাত্মার অবস্থিতি প্রত্যক্ষ করেন, তিনি কদাচ তৎপ্রতি বিমুখ হইতে পারেন না। যে মানুষ একবার বুঝিতে পারিয়াছে—স্রষ্টা ও সৃষ্ট পদার্থে কোনও প্রভেদ নাই, পরমাত্মাই সর্ব্বভূতে সর্ব্ব অবস্থায় বিরাজমান আছেন; তাঁহার আর কিসের দুঃখ, কিসের ক্লেশ?" † পরমাত্মার সর্ব্বভূতে অবস্থিতির বিষয় উপনিষদে যেরূপ বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে, আত্মার দেহান্তর-গ্রহণ-তত্ত্বও উহাতে তদ্রূপ পরিবর্ণিত আছে। তৎসম্বন্ধে বৃহদারণ্যক উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের কয়েক পংক্তির মর্ম্ম নিম্নে প্রদান করিতেছি।

---

* উদ্দালক আরুণি ও শ্বেতকেতুর প্রসঙ্গ ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠক ৯ম, ১০ম ও ১৩শ খণ্ডে বর্ণিত আছে।

† কেনোপনিষৎ, প্রথম খণ্ড ২য় হইতে ৮ম শ্লোক এবং ঈশোপনিষৎ ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্লোক দ্রষ্টব্য।

তাহা এই :—"তৃণ-জলৌকা একটী তৃণের প্রান্তভাগে উপনীত হইয়া প্রথমে অপর তৃণের প্রতি দেহ-সম্প্রসার করে ; পরে ক্রমশঃ প্রথম তৃণ পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণভাবে দ্বিতীয় তৃণে আশ্রয় লয়। এই ভাবে ক্রমে ক্রমে জলৌকা যদৃচ্ছা অগ্রসর হয়। আত্মার গতিও তদ্রূপ জানিবে। আত্মাও এক দেহ পরিত্যাগ করিয়া, এই ভাবেই দেহান্তরে আশ্রয় করেন।" পুনশ্চ,—"স্বর্ণকার পুরাতন স্বর্ণখণ্ডের মলামাটী পরিষ্কার করিয়া তদ্দ্বারা অভিনব সুন্দর সামগ্রী নির্ম্মাণ করে। পরমাত্মাও সেইরূপ এক দেহ পরিত্যাগ করিয়া, অজ্ঞানতা পরিহার-পূর্ব্বক, অভিনব নূতন দেহ গ্রহণ করেন। এইরূপে ইচ্ছাক্রমে তিনি কখনও পিতৃ-পুরুষের, কখনও গন্ধর্ব্বের, কখনও প্রজাপতির, কখনও ব্রহ্মের, কখনও অন্যান্য প্রাণীর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। ... কামনা অনুসারেই এইরূপ দেহান্তর ঘটিয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা কামনাশূন্য অথবা পরব্রহ্মেই কামনাযুক্ত এবং তাঁহাতেই নির্ভরশীল, তাঁহাদের আত্মা অন্যত্র কোথাও বিচালিত হয় না ; তাঁহাদের সেই ব্রহ্মভূত আত্মা, ব্রহ্মেই লীন হইয়া যায়। ... সর্প যেরূপ প্রাণহীন বল্মীক (খোলস) পরিত্যাগ করিয়া যথাস্থানে চলিয়া যায়, জ্যোতির্ম্ময় আত্মাও সেইরূপ দেহ পরিত্যাগ করিয়া জ্যোতিস্বরূপ পরমাত্মায় বিলীন হন।" আত্মার দেহান্তর-গ্রহণ বা পরমাত্মায় লীন হওয়া সম্বন্ধে উপনিষদের মত এই,—"জ্ঞান-কর্ম্মানুসারে আত্মার গত্যন্তর-প্রাপ্তি ঘটে। সংসারে যিনি যেরূপ কর্ম্ম করিবেন, তাঁহার আত্মা তদনুরূপ গতি প্রাপ্ত হইবে।" ছান্দোগ্যোপনিষদের অষ্টম প্রপাঠকের প্রথম খণ্ডের ষষ্ঠ সূত্রে এই তত্ত্ব স্পষ্টতঃ পরিবর্ণিত আছে। তাহার মর্ম্ম,—"পৃথিবীতে মনুষ্য কর্ম্ম দ্বারা যাহা কিছু লাভ করে, তৎসমস্তই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই পৃথিবীতে যাগ-যজ্ঞ এবং সৎকর্ম্ম প্রভৃতির দ্বারাও যাহা কিছু অর্জ্জন করা যায়, পরজন্মে তাহাও বিধ্বংস হইয়া থাকে। যিনি পরমাত্মাকে চিনিতে না পারিয়া, তাঁহার স্বরূপ তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ না হইয়া, কাম্য কর্ম্ম অনুষ্ঠান-পূর্ব্বক ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হন, তাঁহাকে পুনরায় ইহলোকেই প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় ; কর্ম্ম-ঘোরে আবদ্ধ থাকিয়া, তাঁহার আত্মা কখনই স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে না।" বলা বাহুল্য, উপনিষদের এই জন্মান্তর-বাদ বা আত্মার দেহান্তর-গ্রহণ-তত্ত্বের সহিত খৃষ্ট-ধর্ম্মের আত্মার অবস্থান্তর-গ্রহণের কিয়ৎ পরিমাণে সাদৃশ্য থাকিলেও পুনর্জ্জন্মগ্রহণ-সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে মতপার্থক্য দৃষ্ট হয়। খৃষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থের মতে আত্মা দেহ পরিত্যাগ করিয়া ভৌতিক জগতে অবস্থান করে ; তাহাকে পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হয় না ; ঈশ্বরের নিকট শেষ বিচারের দিন সে তাহার কর্ম্মাকর্ম্মের ফলভাগী হইয়া থাকে। কিন্তু উপনিষদের মতে ইহসংসারই কর্ম্মাকর্ম্মের নিয়ন্তা। ইহসংসারে যে যেরূপ কর্ম্ম করিবে, তাহার ফলভোগের জন্য জন্মজন্মান্তরে তাহাকে সংসারে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে। কাম্য কর্ম্মের শেষ না হইলে, জীবাত্মা কখনই পরমাত্মায় মিলিত হইতে পারিবে না। সৃষ্টি-তত্ত্ব সম্বন্ধে উপনিষদে বিবিধ মত দৃষ্ট হয়। এক স্থলে হেঁয়ালীর ভাবে লিখিত আছে,—"আদিতে কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। প্রথমে একটী ডিম্ব হয়। সেই ডিম্ব দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া, এক ভাগে রৌপ্যময় পৃথিবী এবং অন্যভাগে সুবর্ণময় আকাশ উৎপন্ন হইয়াছিল।" কিন্তু অন্যত্র প্রায়ই দেখা যায়,—"প্রথমে একমাত্র তিনিই

(পরব্রহ্মই) বিরাজমান ছিলেন, তিনি ভিন্ন অন্য কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না।" লয় বা মৃত্যু-সম্বন্ধেও উপনিষদের এই একই মত। উপনিষৎ বলেন,—"যিনি আত্মা ও পরমাত্মার অভেদ-জ্ঞান উপলব্ধি করিয়াছেন, যিনি সর্ব্বভূতে পরমাত্মাকে দর্শন করিয়াছেন, এবং পরমাত্মায় সর্ব্বভূতের সমাবেশ দেখিতেছেন; যাঁহার স্পৃহা নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই, পাপ নাই, সংশয় নাই, কলঙ্ক নাই; তিনিই পাপকে পরাজিত করিতে পারেন, কিন্তু পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না;—তিনিই পাপকে ভস্মীভূত করিতে পারেন, কিন্তু পাপ তাঁহাকে জ্বালা দিতে পারে না;—তিনিই ব্রহ্মরূপে পরব্রহ্মে লীন হইয়া থাকেন, সংসারের সুখদুঃখ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে পারে না।" কঠোপনিষদে ঋষিপুত্র নাচিকেত ও যমের প্রসঙ্গে এই মৃত্যু-রহস্য আরও বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। ঋষিকুমারের প্রশ্নের উত্তরে মৃত্যুরূপী যমরাজ বলিতেছেন,—"যিনি পরমাত্মার স্বরূপ তত্ত্ব বুঝিতে পারিয়াছেন, তিনি আর মৃত্যুর অধীন নহেন। তিনি জানেন—আত্মা কখনও জন্ম গ্রহণ করেন না, আত্মা কখনও মরেন না। আত্মা অজ অর্থাৎ জন্মবিরহিত, আত্মা শাশ্বত অর্থাৎ অবিনশ্বর, আত্মা পুরাণ অর্থাৎ অতি প্রাচীন। যদিও শরীর ধ্বংস হয়, কিন্তু আত্মা কখনই ধ্বংস প্রাপ্ত হন না।" ফলতঃ, উপনিষদের মতে,—"এই বিশ্বসংসারের আদিও নাই, অন্তও নাই, মধ্যও নাই। পরব্রহ্মই অনাদিকাল ইহসংসাররূপে বিরাজমান আছেন।' বলা বাহুল্য, এই মত—বেদেরই অনুসরণকারী।

উপনিষদে ব্রহ্ম-তত্ত্ব।

উপনিষদের উপদেশ-পরম্পরা আলোচনা করিলে, এক গভীর সমস্যায় নিপতিত হইতে হয়। উপনিষৎ ব্রহ্ম-পরিচয়ে কোথাও বলিয়াছেন,—"তিনি স্থূল নহেন, তিনি সূক্ষ্ম নহেন, তিনি হ্রস্ব নহেন, তিনি দীর্ঘ নহেন; তিনি শব্দের অতীত, তিনি স্পর্শের অতীত, তিনি রূপের অতীত, তিনি ক্ষয়ের অতীত; তাঁহার আদিতে বা অন্তে, অন্তরে বা বাহে, অন্য কিছুই নাই। তিনি অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র, অবর্ণ।" আবার উপনিষদে কোথাও দেখিতে পাই,—"তিনি সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস; তিনি আত্মারূপে সর্ব্বভূতে অবস্থিত আছেন; তিনি অণু হইতেও অণু, তিনি মহৎ হইতেও মহান্; তিনি সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, অন্তর্য্যামী, এবং বিশ্বের আদি উৎপত্তি ও লয়-স্থান।" * এইরূপে, একবার দেখিতেছি, তাঁহার অস্তিত্ব নাই; আবার দেখিতেছি, তিনি সকল অস্তিত্বের সারভূত। অল্পবুদ্ধি অল্পজীবী মনুষ্য, এই সমস্যায় পড়িয়াই তো সময় সময় বিভ্রান্ত হয়! ফলতঃ, উপনিষদের আলোচনায় দেখিতে পাই, তাঁহার স্বরূপ-নির্ণয় মনুষ্যের সাধ্যাতীত,—সত্য সত্যই তিনি 'অবাঙ্মনসোগোচর'। এই জটিল তত্ত্বের ঘোরাবর্ত্তে পড়িয়া মনুষ্য মুহ্যমান্ হয় দেখিয়া, শঙ্করাবতার শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য, উপনিষদের এই তত্ত্ব বুঝাইবার প্রয়াস পান। তিনি বলেন,—ব্রহ্মের দুইটী বিভবের পরিচয় ঐ দুই ভাবে প্রকাশ পায়। সেই দুইটী বিভবের একটীর নাম,—'সবিশেষ লিঙ্গ'; অপরটির নাম,—'নির্ব্বিশেষ লিঙ্গ।' ভাষান্তরে সেই দুই ভাবকে

* "অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘম", "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্" এবং "সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ", "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" প্রভৃতি।

'সবিশেষ সগুণ' এবং 'নির্ব্বিশেষ নিগুর্ণ' ভাব বলা যাইতে পারে। যখন বিশেষ করিয়া ব্রহ্মের কোনও পরিচয় দেওয়া হয়; যখন বিশেষ করিয়া বলা হয়,—"তিনিই সব; এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁহারই অভিব্যক্তি মাত্র; তিনিই এতৎসহ ওতঃপ্রোত বিদ্যমান্ আছেন;" আর যখন বিশেষ করিয়া বলা হয়,—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি।...তদ্ ব্রহ্মেতি। অর্থাৎ, যাঁহা হইতে সর্ব্বভূত উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহা কর্তৃক সর্ব্বপ্রাণী জাবিত রহিয়াছে, এবং অন্তকালে যাঁহাতে সকলেই প্রবেশ করিবে;...তিনিই ব্রহ্ম"; অপিচ, যখন বুঝান হয়,—"ঊর্ণনাভ হইতে যেমন তন্তু উদ্গীর্ণ হয়, অগ্নি হইতে যেমন স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, আত্মা হইতে সেইরূপ সর্ব্বপ্রাণ, সর্ব্বলোক, সর্ব্বদেব, সর্ব্বভূত নিঃসৃত হয়;" তখন তিনি 'সগুণ', 'সাকার' বা 'সবিশেষ লিঙ্গ'; তখন, তাঁহার রূপগুণ ঐশ্বর্য্য কিছুরই অভাব নাই। এইরূপ আবার যখন তিনি কোনই রূপগুণে পরিচিত না হন; যখন বলা হয়,—"তাঁহার আদি নাই, মধ্য নাই, অন্ত নাই; তিনি কিছুই নহেন;" তখন তিনি 'নিগুর্ণ', 'নিরাকার' বা 'নির্ব্বিশেষ লিঙ্গ'; তখন তাঁহার কোনই পরিচয়-চিহ্ন অনুসন্ধানে পাওয়া যায় না। ফলতঃ, সাকার নিরাকার উভয় ভাবেই ব্রহ্মের পরিচয় উপনিষদে প্রদত্ত হইয়াছে; এবং উপনিষদের সেই সার-তত্ত্বই শঙ্করাচার্য্য উদ্‌ঘাটন করিয়া গিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এ তত্ত্ব—বড়ই কঠোর তত্ত্ব। এ তত্ত্বের রহস্যোদ্‌ঘাটন—মনুষ্য সহজে করিতে পারে না। আর এই তত্ত্বের সমাধান জন্যই উপনিষদে অধিকারি-ভেদের এবং গুরুর নিকট উপদেশ-গ্রহণের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। মুণ্ডকোপনিষদে লিখিত আছে,—"ক্রিয়াবান বেদানুগত ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিকে এই বিদ্যা শিক্ষা দিবে।" শ্বেতাশ্বতর ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে,—"পুত্র বা শিষ্য ভিন্ন অন্য কাহারও নিকট এ তত্ত্ব প্রকাশ করিবে না।" কঠোপনিষদে আছে,—"বিশেষ পরীক্ষা ভিন্ন শিষ্য-গ্রহণও কর্ত্তব্য নহে।" * নাচিকেত যখন যমের নিকট তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, যম নানারূপে নাচিকেতকে পরীক্ষা করিয়া—সর্ব্ববিধ কাম্যবস্তু দান ও দীর্ঘজীবন প্রভৃতির প্রলোভন দেখাইয়া তাহাতেও ভুলাইতে না পারিয়া—পরিশেষে তাঁহাকে ব্রহ্মের স্বরূপ-তত্ত্ব-সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন। বাস্তবিক কথাই তাই। নচেৎ, পল্লবগ্রাহীর ন্যায় যে-সে ব্যক্তি উপনিষৎ পাঠ করিলে স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত হইতে পারে কি?

উপনিষৎ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ যাহা আলোচনা করিলাম, উপনিষদের কবিত্ব ও দার্শনিক তত্ত্বের আভাস তাহাতেই অল্প-বিস্তর পাওয়া যাইবে। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ বলেন,—

উপনিষৎ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য-মত।

"বৈদিক যাগযজ্ঞাদিতে একমাত্র কর্ম্মকাণ্ডের প্রতি মানুষের মন যখন প্রধাবিত হইয়াছিল, মনুষ্য সাধারণ যখন কর্ম্মকাণ্ড ভিন্ন অন্যদিকে মনঃসংযোগ করিতে কুণ্ঠা বোধ করিত; সেই সময় কয়েক জন জন-হিত-পরায়ণ ঋষির মন সন্দেহ-দোলায় দোলায়মান হয়। তাঁহারা চিন্তা করিতে থাকেন,—'কর্ম্ম

* উপনিষৎ শিক্ষার অধিকারী সম্বন্ধে মুণ্ডকোপনিষৎ, প্রথম মুণ্ডক, ১৩ শ শ্লোক; শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ, ষষ্ঠ অধ্যায়, ২২ শ শ্লোক; ছান্দোগ্যোপনিষৎ, তৃতীয় প্রপাঠক, ১১ শ খণ্ড, ষষ্ঠ শ্লোক; এবং বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ষষ্ঠ অধ্যায়, ৩য় ব্রাহ্মণ, ১৩শ পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

কি? কর্ম কেন করি?' সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের চিত্তে এক অভিনব দার্শনিক চিন্তার উন্মেষ হয়। তাঁহারা ভাবিতে আরম্ভ করেন,—'বিশ্ব কি? পরব্রহ্ম কি? আত্মা ও পরমাত্মায় কি সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে?' সেই চিন্তার ফলেই—উপনিষদের সৃষ্টি। উপনিষৎ মানুষের গন্তব্য পথ দেখাইয়াছেন, উপনিষৎ মানুষকে চিন্তা করিতে শিখাইয়াছেন, উপনিষৎ মানুষের বিবেক-শক্তির উন্মেষণ করিয়া দিয়াছেন, উপনিষৎ কর্মকাণ্ডের অসারত্ব প্রতিপাদন করিয়া জ্ঞান-কাণ্ডে মনুষ্যের বুদ্ধি-বৃত্তি নিয়োগ করাইয়াছেন; মানুষ অন্ধ-বিশ্বাসীর ন্যায় কর্ম-পথে প্রধাবিত না হয়,—মানুষের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া উপনিষৎ মানুষকে সত্যপথ প্রদর্শন করিয়াছেন। স্থূলতঃ, পরবর্ত্তি-কালে যে দর্শন-শাস্ত্রসমূহের উৎপত্তি হইয়াছে, উপনিষৎ তাহারই মূলীভূত। উপনিষৎ-সম্বন্ধে পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের এই মত যে সর্ব্বথা স্বীকার্য্য, আমরা তাহা মনে করি না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—কি কর্মকাণ্ড, কি জ্ঞানকাণ্ড, বেদে সকল কাণ্ডেরই বীজ নিহিত আছে। হইতে পারে,—উপনিষদে একবিধ বীজের অঙ্কুরোন্মেষ; হইতে পারে,—উপনিষদে জ্ঞান-বীজ অঙ্কুরিত পল্লবিত শাখাপ্রশাখা-সমন্বিত; কিন্তু তাই বলিয়া উপনিষৎ যে বেদ-বিরোধী, তাহা কোনক্রমেই প্রতিপন্ন হয় না। উপনিষৎ—বেদেরই একাঙ্গের ব্যাখ্যা-বিবৃতি মাত্র। যাহা হউক, উপনিষদের জ্ঞান-কাণ্ডের যিনি একবার পরিচয় পাইবেন, কি প্রাচ্য, কি পাশ্চাত্য, তিনি কখনই তাহা ভুলিতে পারিবেন না। জর্ম্মণীর প্রসিদ্ধ দার্শনিক 'সোপেনহার' এই উপনিষৎ-সাগরে অবগাহন করিয়া কি শান্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারই কথার মর্ম্মাভাসে সে পরিচয় পাওয়া যায়। উপনিষৎ পাঠ করিয়া, সোপেনহার একদিন উচ্চকণ্ঠে কহিয়াছিলেন,—"পৃথিবীতে উপনিষদের ন্যায় উচ্চভাবপূর্ণ শান্তিপ্রদ গ্রন্থ বুঝি আর নাই। উপনিষৎ আমার ইহজীবনের সান্ত্বনা;—উপনিষৎ আমার মরণের সান্ত্বনা।" * অধুনা যে যে উপনিষৎ অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশেরই আকার ক্ষুদ্র; কোনও কোনও উপনিষৎ দুই তিন পৃষ্ঠাতেই শেষ হইয়াছে। কেন, কঠ প্রভৃতি ঋষিগণের নামানুসারে উপনিষদের নামকরণ হইয়া থাকে। উপনিষৎ-সমূহ কোনও এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে রচিত হইয়াছিল বলিয়া বুঝা যায় না। সুতরাং উপনিষৎ-রচনার কাল-নির্ণয়-সম্বন্ধে নানা মতান্তর দেখিতে পাই। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত এই যে, খৃষ্টজন্মের এগার শত হইতে সহস্র বৎসর পূর্ব্বে উপনিষৎ-সমূহ রচিত হইয়াছিল। কিন্তু সে সিদ্ধান্ত যে সমীচীন নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধের অনেক পূর্ব্বে উপনিষৎ বিদ্যমান ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। মহাভারতে পুনঃপুনঃ উপনিষদের উল্লেখ আছে। সে হিসাবে, সাত আট সহস্র বৎসর পূর্ব্বে উপনিষদের বিদ্যমানতা সহজেই প্রতিপন্ন হয়; খৃষ্ট-জন্মের দশ সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও উপনিষদের অস্তিত্ব উপলব্ধি হইতে পারে। †

* "It has been the solace of my life; it will be the solace of my death."—Schopenhaur—*Latin translation of the Upanishads* quoted in Ancient India.

† মহাভারত ও কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ-বিষয়ক পরবর্ত্তী অধ্যায়ে তাহার সময়-নির্ণয়াদি দ্রষ্টব্য।

ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদে ভারতবর্ষের কয়েকটি প্রধান রাজ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কুরু, পাঞ্চাল, কোশল, বিদেহ প্রভৃতি রাজ্য—ঐ সময়ে উন্নতির উচ্চচূড়ায় সমারূঢ় ছিল। দিল্লী ও তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশে প্রবল পরাক্রান্ত কুরুগণ রাজত্ব করিতেন;—ঐ প্রদেশ কুরু রাজ্য; কনৌজ ও তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ পাঞ্চাল-রাজ্য; উত্তর বিহার বিদেহ-রাজ্য; অযোধ্যা ও তদন্তর্গত প্রদেশ কোশল-রাজ্য; এবং বারাণসী ও তৎসন্নিকটস্থ প্রদেশ কাশী-রাজ্য নামে অভিহিত হইত। জনক এবং অজাতশত্রু প্রভৃতি রাজগণ তৎকালে বিশেষ প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যামন্দির এবং পরিষৎ প্রভৃতির পরিচয়ে পৃথিবীর সভ্য-জাতিগণ আজিও গৌরব অনুভব করিয়া থাকেন। জনক, বিদেহ-দেশের এবং অজাত-শত্রু কাশীর রাজা ছিলেন। উভয়েই বিদ্যোৎসাহী এবং সাহিত্যের উৎসাহ-দাতা বলিয়া প্রতিষ্ঠান্বিত। যাজ্ঞবল্ক্য বাজসনেয়ী প্রভৃতি পণ্ডিতমণ্ডলীতে রাজর্ষি জনকের রাজ-ভবন সর্ব্বদা সমলঙ্কৃত ছিল। বিদ্যালোচনার জন্য জনকের রাজধানীতে দেশ-দেশান্তর হইতে শিক্ষার্থিগণ আগমন করিত। বিদ্যোৎসাহিতার জন্য রাজর্ষি জনকের প্রতিষ্ঠার অবধি ছিল না; দেশ-দেশান্তরের অধিবাসিগণ সকলেই তাঁহাকে আপনাদের সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক বলিয়া মান্য করিত। রাজা অজাতশত্রু তজ্জন্য এক সময়ে দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"রাজা জনককে পৃষ্ঠপোষক বলিয়া মনে করিয়া সকলেই তাঁহার রাজ্যে চলিয়া যাইতেছে। ইহার অধিক আমার ক্ষোভের বিষয় আর কি হইতে পারে?" বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই মর্ম্মে রাজা অজাতশত্রুর আক্ষেপ প্রকাশ পাইয়াছে। রাজর্ষি জনকের সাহায্যে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য যজুর্ব্বেদ সঙ্কলন করেন। তৎ-সঙ্কলিত যজুর্ব্বেদ—'শুক্ল-যজুর্ব্বেদ' নামে পরিচিত। শতপথ ব্রাহ্মণের মূল ভিত্তিও যাজ্ঞবল্ক্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। যাজ্ঞবল্ক্য এবং তাঁহার বংশধরগণ পুরুষানুক্রমে রাজর্ষি জনকের বৃত্তি-ভোগী হইয়া শাস্ত্রগ্রন্থ সঙ্কলনে যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন, সংসারে চিরদিন তাহা রাজর্ষি জনকের এবং ঋষিগণের কীর্ত্তিস্মৃতি-রূপে বিরাজমান থাকিবে। রাজর্ষি জনক এবং অজাতশত্রু—উভয়েরই পাণ্ডিত্য অতুলনীয়। কি ধর্ম্মানুষ্ঠানে, কি পাণ্ডিত্য-প্রদর্শনে, ইহাঁরা দুই জনে সময়ে সময়ে পণ্ডিত-গণকেও আশ্চর্য্যান্বিত করিতেন। সেই পাণ্ডিত্য-প্রভাবেই রাজর্ষি জনক ব্রাহ্মণের ন্যায় সম্মান-সম্ভ্রম লাভ করিয়াছিলেন। উপনিষদে রাজর্ষি জনকের প্রতিষ্ঠার পরিচয় পদে পদে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সাহিত্যের ও সাহিত্যসেবীর উৎসাহদাতা ছিলেন বলিয়া, রাজর্ষি জনক উপনিষদেও স্থান পাইয়াছেন। জনকের ব্রাহ্মণত্ব লাভ সম্বন্ধে শতপথ ব্রাহ্মণে একটী উপাখ্যান দৃষ্ট হয়। তাহাতে জানা যায়,—শ্বেতকেতু আরুণি, সোম, সুষমা, সত্যাগ্নি এবং যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি এক দিন জনকের রাজসভায় উপনীত হন। সভায় অগ্নিহোত্র যজ্ঞের বিষয় আলোচনা চলিতে থাকে। সেই আলোচনায় রাজর্ষি জনক ব্রাহ্মণগণেরও ভ্রম প্রদর্শন করেন;—তাঁহার পাণ্ডিত্যে সকলকেই মুগ্ধ হইতে হয়। ফলে, সেই হইতেই জনক ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। শাস্ত্র-জ্ঞান সম্বন্ধে কেকয় দেশের রাজা অশ্বপতি, গান্ধারনী দেশের রাজা চিত্র এবং কাশীর রাজা অজাতশত্রু প্রভৃতিও প্রতিষ্ঠান্বিত ছিলেন।

রাজন্যবর্গের কৃতিত্ব-পরিচয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ষড়বেদাঙ্গ।

[সূত্র-গ্রন্থ,—যাগযজ্ঞে শ্রৌত-সূত্র, সমাজ-ধর্ম্ম-পালনে ধর্ম্মসূত্র, গার্হস্থ্য-ধর্ম্মে গৃহ্যসূত্র,—সূত্রের প্রকৃতি-পরিচয় ;—সূত্র-সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতামত ;—ষড়বেদাঙ্গের পরিচয়,—কল্পসূত্র, শিক্ষা, ছন্দস্, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ,—শিক্ষা-অঙ্গের স্বরবিজ্ঞানই আধুনিক সঙ্গীতের ও রাগ-রাগিণীর মূল,—ছন্দস্-অঙ্গের বৈদিক সপ্ত ছন্দ হইতে অসংখ্য ছন্দের উৎপত্তি-পরিচয়,—বাল্মীকিই লৌকিক ছন্দের প্রবর্ত্তক,—ব্যাকরণ-অঙ্গে পাণিনির প্রসঙ্গ,—নিরুক্ত অঙ্গে যাস্ক,—জ্যোতিষে ভাস্করাচার্য্য, বরাহ-মিহির,—অনুক্রমণিতে বিশদ সূচীপত্র বা নির্ঘণ্ট ;—বেদাঙ্গ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত,—বিভিন্ন বেদাঙ্গের সমালোচনা।]

বেদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষৎ,—এতৎসমুদায় ভগবৎ-প্রেরিত ; অন্যান্য শাস্ত্র তদনুসরণেঋষিগণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন ;—ইহাই হিন্দুর বিশ্বাস। ঋষিগণ-প্রণীত সেই শাস্ত্র-সমূহের মধ্যে সূত্র প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আছে। উপ-নিষদের পর, অথবা উপনিষৎ-প্রচারের সম-সময়ে, সূত্র-গ্রন্থ-সমূহ প্রণীত হইয়াছিল,—ইহাই অনেকে অনুমান করেন। উপনিষদের দার্শনিক চিন্তার ফলে, মনুষ্যের মন যখন চঞ্চল হইয়া উঠিল ; অধিকারি-ভেদে অনুষ্ঠান-ভেদ-নীতি যখন অনেকে বিস্মৃত হইতে লাগিল ; জনহিত-পরায়ণ ঋষিগণ, বেদের ব্রাহ্মণ-ভাগ হইতে সার-তত্ত্ব গ্রহণ করিয়া, সূত্রাকারে সংসারে প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। 'ব্রাহ্মণে' যাহা বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ ছিল, সংক্ষিপ্ত সূত্রাকারে তাহাই হৃদয়ে হৃদয়ে গ্রথিত রাখিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। হিন্দু-সন্তান মাত্রেই ধর্ম্মবিধি কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতে পারেন ;—আচারে, ব্যবহারে, আহারে, বিহারে, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহে,—সর্ব্বকালে, সর্ব্বকার্য্যে, সেই বিধি বিস্মৃত না হন ;—সূত্র-সমূহ এমনই ভাবে বিরচিত এবং প্রচারিত হইল। যিনি যত সংক্ষিপ্তভাবে সূত্র রচনা করিয়া তন্মধ্যে অধিক তত্ত্বের সমাবেশ করিতে পারিলেন, তাঁহারই সূত্র তদনুরূপ সমাদর লাভ করিল। উপনিষদাদির ন্যায় 'সূত্র'-গ্রন্থসমূহের অনেকই এখন বিলুপ্তপ্রায়। ক্রিয়াকর্ম্মে অধুনা যাহা ব্যবহৃত হয়, প্রধানতঃ তাহা তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম—শ্রৌত-সূত্র ; দ্বিতীয়—ধর্ম্ম-সূত্র ; তৃতীয়—গৃহ্য-সূত্র। শ্রৌত-সূত্রে যাগযজ্ঞ বলিদান প্রভৃতির বিধি-বিধান নিবদ্ধ আছে ; কিরূপ নিয়মাদি পরিপালন করিয়া সমাজ-মধ্যে বসবাস করিতে হয়, ধর্ম্ম-সূত্রে সেই কর্ত্তব্য-পালনের ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে ; গৃহ্য-সূত্রে গৃহধর্ম্মের কথা,—অর্থাৎ পিতা, মাতা, পুত্র, পতি, পত্নী প্রভৃতি পরস্পরের অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম পরিবর্ণিত আছে। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সারাজীবনে গৃহস্থের যে কিছু কর্ত্তব্যানুষ্ঠান প্রয়োজন, গৃহ্য-সূত্রে তাহাই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। হিন্দুগণ আজিও গৃহ্য-সূত্র অনুসারে জাতকর্ম্ম, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া থাকেন। তিন শ্রেণীর

সূত্র-গ্রন্থের পরিচয়।

সূত্রের আবার নানা শাখা আছে। শ্রৌত-সূত্রের শাখার মধ্যে—আশ্বলায়ন, সাঙ্খ্যায়ন, মশক, লাট্যায়ন, দ্রাহ্যায়ন, বৌধায়ন, ভারদ্বাজ, আপস্তম্ব, হিরণ্যকেশীন্, কাত্যায়ন; ধর্ম্মসূত্রের শাখার মধ্যে—বাসিষ্ঠ, গৌতম, বৌধায়ন, আপস্তম্ব; গৃহ্য-সূত্রের শাখার মধ্যে—সাঙ্খ্যায়ন, আশ্বলায়ন, পারস্কর এবং গোভিল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। শ্রৌত-সূত্রের আশ্বলায়ন এবং সাঙ্খ্যায়ন শাখা—ঋগ্বেদের অন্তর্গত; মশক, লাট্যায়ন এবং দ্রাহ্যায়ন,—সামবেদের অন্তর্গত; বোধায়ন, ভারদ্বাজ, আপস্তম্ব ও হিরণ্যকেশীন,—কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত; কাত্যায়ন শাখা—শুক্ল-যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত। আশ্বলায়ন, সুবিখ্যাত শৌনকের শিষ্য ছিলেন। কথিত হয়,—শৌনক এবং অশ্বলায়ন, গুরু শিষ্য একযোগে, ঐতরেয় আরণ্যকের শেষ দুই ভাগ সঙ্কলন করিয়াছিলেন। শৌনক-প্রণীত যোগসূত্র তাঁহার প্রিয় শিষ্য আশ্বলায়নের নামেই প্রচারিত হয়। কেহ কেহ বলেন—ঋগ্বেদে শৌনক ঋষি গৃৎসমদ নামে পরিচিত ছিলেন। এদিকে আবার জন্মেজয় পরীক্ষিতের যজ্ঞক্ষেত্রেও শৌনকের আবির্ভাব দেখিতে পাই। ইহাতে মনে হয়, শৌনক-বংশ বহুকাল হইতেই পাণ্ডিত্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। শ্রৌত-সূত্রের সাঙ্খ্যায়ন শাখা পশ্চিমে এবং আশ্বলায়ন শাখা পূর্ব্ব-প্রদেশে প্রচলিত বলিয়া অনুমিত হয়। সামবেদের অন্তর্গত মশক শ্রৌত-সূত্রে ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞকর্ম্মের মন্ত্র-সমূহ ধারাবাহিকরূপে সজ্জিত আছে, এবং লাট্যায়ন শ্রৌত-সূত্রে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের উপদেশ-সমূহ নিবদ্ধ হইয়াছে। সামবেদের তান্দ্য বা পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণের সহিত এই দুই সূত্রের বিশেষ সম্বন্ধ বিদ্যমান। লাট্যায়নের সহিত দ্রাহ্যায়নের পার্থক্য অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। বৌধায়নাদি কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদান্তর্গত শ্রৌত-সূত্র-চতুষ্টয়ে কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদের যজ্ঞাদি প্রণালী বর্ণিত আছে। কাত্যায়ন শ্রৌত-সূত্র প্রধানতঃ শতপথ-ব্রাহ্মণের অনুসরণকারী। এই সূত্রের প্রথম অষ্টাদশ কণ্ডিকার (অধ্যায়ের) সহিত শতপথ ব্রাহ্মণের প্রথম নয় অধ্যায়ের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য রহিয়াছে। কাত্যায়ন কেবল শ্রৌত-সূত্র-রচয়িতা বলিয়া নহেন; গৃহ্যসূত্র এবং প্রতিহার-সূত্র রচনায়ও তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি আছে। ধর্ম্মসূত্রের মধ্যে প্রধান ধর্ম্ম সূত্র ছিল—"মানব ধর্ম্ম-সূত্র" অর্থাৎ মনুর সূত্র। প্রাচীন কালে সেই সূত্রই অধিকতর আদরণীয় ছিল। কিন্তু এখন আর তাহা সন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। তবে বাসিষ্ঠ ও গৌতম ধর্ম্মসূত্রের মধ্যে তাহার অনেকাংশ উদ্ধৃত হইয়াছিল এবং সেই সকল অংশ এখনও প্রচলিত আছে। মনু এবং যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির সংহিতা-সমূহ, বলা বাহুল্য, ধর্ম্মসূত্র হইতেই সমুদ্ভূত হইয়াছিল। পূর্ব্বে যে সূত্র-সমূহ কণ্ঠে কণ্ঠে অধিষ্ঠিত ছিল, পরবর্ত্তি-কালে পরিবর্দ্ধিত আকারে তাহাই স্মৃতিরূপে প্রকটিত হয়। বিবাহের সময়, উপনয়নের সময়, শ্রাদ্ধের সময়, যে যজ্ঞ কর্ম্মাদি হইয়া থাকে, গৃহ্যসূত্র অনুসারেই তাহা সম্পন্ন হয়। গৃহ্যসূত্র আজিও হিন্দুর দৈনন্দিন কর্ম্মপরম্পরা নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছে। শ্রৌত-সূত্র, ধর্ম্মসূত্র, গৃহ্য-সূত্র—এই তিন সূত্র একযোগে 'কল্প-সূত্র' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। আপস্তম্বের কল্প-সূত্র এখনও বর্ত্তমান আছে। তাহার প্রথম চতুর্ব্বিংশ প্রশ্নে বা ভাগে শ্রৌত বা যাগযজ্ঞের কথা আছে, ষড়বিংশ ও সপ্তবিংশ ভাগে গৃহ্য-সূত্রের বা গৃহ-ধর্ম্মের কথা আছে; অষ্টাবিংশ ও ঊনত্রিংশ

সূত্রে ধর্ম্মসূত্রের অর্থাৎ সামাজিক ভাবে চলিবার নিয়মাদি নিবদ্ধ রহিয়াছে; এবং ত্রিংশ খণ্ড 'সুলভ সূত্রে' যজ্ঞের বেদী প্রভৃতি কিরূপভাবে প্রস্তুত হইবে, তাহাই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—তাহাতে আর্য্য-হিন্দুগণের জ্যামিতি-বিদ্যার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সূত্রসমূহ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের নানা মত দৃষ্ট হয়। কোন্ সূত্র কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছিল, তাহার কালনির্ণয়েও আকাশ-পাতাল প্রভেদ দেখিতে পাই। ডাক্তার বুলার প্রাচীন কালের ব্যবহারিক সাহিত্যের আলোচনা করিয়া পাশ্চাত্য-জগতে প্রতিষ্ঠাপন্ন। ভারদ্বাজ সূত্রের পুনরুদ্ধার করিয়াও তিনি যশস্বী হইয়াছেন। বৌধায়ন এবং আপস্তম্ব ধর্ম্ম-সূত্রের কাল-নির্ণয় প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন,—"উভয় সূত্র-গ্রন্থ বহু শতাব্দী ব্যবধানে রচিত হইয়াছিল। আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্র দক্ষিণ-ভারতে অন্ধ্র-রাজগণের অভ্যুদয়কালে বিরচিত হইয়াছিল বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। কৃষ্ণা-নদীর তীরে এখন যেখানে অমরাবতী নগর প্রতিষ্ঠিত, তাহারই সন্নিকটে অন্ধ্র-রাজগণের রাজধানী ছিল। সেই রাজধানীতেই আপস্তম্ব জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। খৃষ্ট জন্মের তিন শত বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার জন্মকাল নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। আপস্তম্বের গ্রন্থে বেদাঙ্গ, বেদান্ত এবং পূর্ব্ব-মীমাংসার উল্লেখ আছে; সুতরাং ঐ সকল গ্রন্থ-রচনার পরবর্ত্তি-কালে তাঁহার বিদ্যমানতা প্রতিপন্ন হয়।" কাত্যায়ন-সম্বন্ধে ম্যাক্সমুলারের মত,—"কাত্যায়ন খৃষ্টজন্মের চারি শতাব্দী পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থে পাণিনির ব্যাকরণের সমালোচনা আছে; সুতরাং তিনি যে পাণিনির পরবর্ত্তি-কালের, তাহাতে কোনই সংশয় থাকিতে পারে না।" লাট্যায়ন এবং কাত্যায়নে 'মগধ-দেশীয় ব্রহ্মবন্ধু' শব্দের উল্লেখ আছে বলিয়া, কেহ কেহ অনুমান করেন,—এই দুই গ্রন্থ বৌদ্ধযুগে প্রণীত হইয়াছিল; যেহেতু 'মগধ-দেশীয় ব্রহ্মবন্ধু' নামে প্রথম বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী-দিগকে বুঝাইয়া থাকে। 'সুলভ-সূত্রে' যজ্ঞ-বেদী রচনার প্রণালী যে ভাবে বর্ণিত আছে,—তাহা দেখিয়া ডাক্তার থিবো বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"এই বেদী-নির্ম্মাণ-প্রণালী ভারতীয় হিন্দুগণের জ্যামিতি-বিদ্যা-পারদর্শিতার প্রকৃষ্ট পরিচয়। এই হইতেই পাশ্চাত্য-জাতি জ্যামিতি-জ্ঞান লাভ করিয়াছিল।" প্রসিদ্ধ প্রাচ্য-ভাষাবিৎ জর্ম্মণীর ভন-শ্রেডার একদিন বলিয়াছিলেন,—"গ্রীক দার্শনিক পীথাগোরাস, খৃষ্ট-জন্মের ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে, ভারতবর্ষ হইতে যে কেবল আত্মার দেহান্তর-গ্রহণ-তত্ত্ব শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা নহে; গণিত-বিজ্ঞানের মূল তত্ত্বও তিনি ভারতবর্ষ হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" 'সুলভ-সূত্র' সম্বন্ধে ডাক্তার থিবোর আলোচনায়, ভন-শ্রেডারের সিদ্ধান্তই এখন দৃঢ়ীকৃত হইতেছে। যাহা হউক, পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের অনেক সিদ্ধান্ত সমীচীন হইলেও, শাস্ত্রাদি রচনার সময়-নির্ণয়-সম্বন্ধে অনেক স্থলেই আমরা তাঁহাদের সহিত একমত হইতে পারি না। বৌধায়ন এবং আপস্তম্বের সময়-নির্ণয়-সম্বন্ধে ডাক্তার বুলার যাহা বলিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমাদের মতদ্বৈধ আছে। প্রথমতঃ, আপস্তম্ব ও বৌধায়ন নামে একাধিক ঋষির পরিচয় পাওয়া যায়। স্মৃতিকারের মধ্যেও আপস্তম্ব আছেন; সূত্রকারের মধ্যেও আপস্তম্ব আছেন; আবার যজুর্ব্বেদেও আপস্তম্বের নামোল্লেখ আছে। সুতরাং সকল আপস্তম্বই যে একজনকে

সূত্র-সম্বন্ধে পাশ্চাত্য-মত।

বুঝাইয়াছে, তাহা কোনক্রমেই প্রতীত হয় না। সে হিসাবে, পরবর্ত্তী আপস্তম্বগণকে প্রথম আপস্তম্বের বংশধর বলিয়া মনে হইতে পারে। অমরাবতীর নিকটস্থিত অন্ধ্র-রাজগণের রাজধানীতে যে আপস্তম্ব বিদ্যমান ছিলেন, তিনি এবং বৈদিক কালের আপস্তম্ব কখনই এক-ব্যক্তি হওয়া সম্ভবপর নহে। কাত্যায়ন-সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা যাইতে পারে। কাত্যায়ন নামে পঞ্চাধিক ঋষির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম কাত্যায়ন,—কাত্যায়ন-গোত্র-প্রবর্ত্তক অতি প্রাচীন ঋষি। তৈত্তিরীয় ও সাঙ্খ্যায়ন আরণ্যক প্রভৃতিতে তাঁহার নাম উল্লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয় কাত্যায়ন,—ধর্ম্মগ্রন্থ-রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। কাত্যায়ন শ্রৌত-সূত্রাদি তিনিই প্রণয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়। তৃতীয় কাত্যায়ন—গোভিল-পুত্র। গৃহ্য-সংগ্রহ ছন্দঃপরিশিষ্ট-প্রণেতা বলিয়া তিনি প্রসিদ্ধ। এই তৃতীয় কাত্যায়নই স্মৃতিপ্রণেতা কাত্যায়ন। কেহ কেহ বলেন,—ইনি এবং শ্রৌত-সূত্র-প্রণেতা কাত্যায়ন উভয়েই এক ব্যক্তি; কিন্তু তাহার বিশেষ কোনও প্রমাণ নাই। চতুর্থ কাত্যায়ন,—বররুচি কাত্যায়ন নামে পরিচিত। ইনি পাণিনি-সূত্রের বার্ত্তিককার। পঞ্চম কাত্যায়ন,—একজন বৌদ্ধাচার্য্য ছিলেন। এতদ্ভিন্ন 'হরিবংশে' বিশ্বামিত্র-বংশীয় বহু কাত্যায়নের নাম পাওয়া যায়। জৈনদিগের একজন স্থবিরের নামও কাত্যায়ন ছিল। সুতরাং শ্রৌত-সূত্র-রচয়িতা কাত্যায়ন, আর বৌদ্ধ-যুগের 'মগধ-দেশীয় ব্রহ্মবন্ধু' নামে অভিহিত কাত্যায়ন,—অভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না। ধর্ম্মসূত্র-সমূহের মধ্যে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে, গৌতম-সূত্র সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। বোধায়ন-সূত্রে গৌতম-সূত্রের প্রায় সমস্ত অংশই উদ্ধৃত আছে; আবার বাসিষ্ঠ-সূত্রে বোধায়নের উদ্ধৃত অংশ পুনরুদ্ধৃত হইয়াছে। আপস্তম্ব সূত্রে, বোধায়ন-সূত্রের বহু অংশ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং এতৎসমুদায়ের মধ্যে গৌতম-সূত্রই আদি-সূত্র। এই সকল ধর্ম্ম-সূত্রের মধ্যে বাসিষ্ঠ, গৌতম, বোধায়ন, আপস্তম্ব প্রভৃতি সূত্র—ডাক্তার বুলার কর্ত্তৃক পাশ্চাত্য-ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। অথচ, ক্ষোভের বিষয়, ঐ সকল সূত্র এদেশে এখন অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া দুরূহ।

প্রধানতঃ, বেদের ছয়টী অঙ্গ; ষড়বেদাঙ্গ নামে তাহা অভিহিত হয়। সূত্র-গ্রন্থ সমূহ—'কল্প-সূত্র' নামে ষড়বেদাঙ্গেরই অন্তর্ভুক্ত। এই ষড়বেদাঙ্গের নাম,—(১) শিক্ষা, (২) ছন্দস্, (৩) ব্যাকরণ, (৪) নিরুক্ত, (৫) জ্যোতিষ, (৬) কল্পসূত্র।

ষড়-বেদাঙ্গ। 'শিক্ষা' গ্রন্থ,—স্বর-বিজ্ঞান-বিশেষ। বৈদিক সূক্তসমূহ কিরূপ স্বরে উচ্চারণ করা কর্ত্তব্য, 'শিক্ষা'-গ্রন্থে তাহাই বিবৃত আছে। উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত,—এই তিন স্বরে বৈদিক মন্ত্রসমূহ গীত হইত। উচ্চারণের তারতম্যানুসারে, স্বরের শুদ্ধাশুদ্ধিক্রমে, পূজোপাসনা সিদ্ধ অসিদ্ধ হয়,—বৈদিক সূক্তে স্বরযোজনার পদ্ধতিতে তাহাই বুঝা যায়। আধুনিক লৌকিক গানে প্রধানতঃ সাতটি স্বর প্রচলিত আছে। স, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি,—সেই সপ্ত স্বরের অভিব্যক্তি। বৈদিক মন্ত্রসমূহ—উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত—এই তিন স্বরেই গীত হইত। এখনকার উদারা, মুদারা, তারা,—এই ত্রিবিধ উচ্চারণ-স্থানের সহিত তাহাদের সাদৃশ্য ছিল,—অনেকে এইরূপ অনুমান করেন। যাহা উচ্চস্বর, তাহাই 'উদাত্ত'; যাহা মৃদুস্বর, তাহাই 'অনুদাত্ত'; আর যাহা উভয় স্বরের

মধ্যবর্ত্তী কোমলে কঠোরে সংমিশ্রিত, তাহাই 'স্বরিত' স্বর। উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত,—এই তিন স্বরের সংমিশ্রণে যে স্বরের উৎপত্তি হয়, তাহা 'একশ্রুতি স্বর'; রোদনে বা আহ্বান-কালে এই স্বর ব্যক্ত হয়। যাহা হউক, বৈদিক মন্ত্র পাঠের উপযোগী সেই স্বর-সমূহের পরিচয়, এখন ক্বচিৎ পাওয়া যায়; এখনকার স্বর-বিজ্ঞানে স-ঋ-গ-ম-প-ধ-নি অর্থাৎ ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ,—এই সপ্তস্বরই প্রচলিত। অধুনা-প্রচলিত এই সপ্তস্বর যে বৈদিক স্বরত্রয় হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। 'শিক্ষা'-গ্রন্থে এই স্বর-বিজ্ঞানেরই পরিচয় পাওয়া যায়। উদাত্ত হইতে নিষাদ ও গান্ধার স্বরের উৎপত্তি; অনুদাত্ত হইতে ঋষভ ও ধৈবত; এবং স্বরিত হইতে ষড়্জ, মধ্যম ও পঞ্চম স্বরের উৎপত্তি হইয়াছে। উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত—এই তিন প্রকার উচ্চারণ-ভেদ বুঝাইবার জন্য, বৈদিক গ্রন্থসমূহে অনেক স্থলে শব্দান্তর্গত বর্ণের উপরে ও নিম্নে ত্রিবিধ পরিচয়-চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। নিম্নে সেইরূপ পরিচয়-চিহ্ন-সমন্বিত একটী ঋক্ উদ্ধৃত করিতেছি। ঋকের কোন্ অংশ কিরূপ স্বরে উচ্চারণ করিতে হইবে, তদ্দৃষ্টে বুঝা যাইবে। ঋক্‌টী এই ঃ—

চন্দ্রমা অপ্স্ব ন্তরা সুপর্ণো ধাবতে দিবি। নবে হিরণ্য
নেময়ঃ পদং বিন্দতি বিদ্যুতো বিত্তং মে। অস্য রোদসী।

ঋক্‌টীর উপরে ও নীচে লক্ষ্য করিলে, দেখিতে পাওয়া যাইবে—ত্রিবিধ সঙ্কেত-চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রথমতঃ, চন্দ্রমা, সুপর্ণো, নবে, নেময়ঃ শব্দের অন্তর্গত ন্দ্র, প, বে, য়ঃ প্রভৃতি বর্ণের শিরোভাগে দণ্ডাকারে বিদ্যমান যে রেখা (|) আছে, তাহা উদাত্ত-সঙ্কেত। উদাত্ত-উচ্চারণ ঐরূপ রেখায় বুঝাইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ, ঐ রেখা ঐরূপ লম্বভাবে বর্ণের নিম্নভাগে অবস্থিত হইলে, তদ্দ্বারা অনুদাত্ত স্বর সূচিত হইবে; সুপর্ণো, হিরণ্য শব্দদ্বয়ের অন্তর্গত সু ও র বর্ণের নিম্নস্থিত রেখা-চিহ্ন অনুদাত্ত উচ্চারণের পরিচায়ক। তৃতীয়তঃ, ঐ রেখা শায়িতভাবে শব্দের নিম্নে অবস্থিত হইলে তদ্দ্বারা স্বরিত উচ্চারণের সঙ্কেত বুঝিতে হইবে; ন্তরা, দিবি, বিদ্যুতো প্রভৃতি শব্দের নিম্নস্থিত শায়িত ঋজু রেখা (—) তাহারই পরিচায়ক। অধুনা সঙ্গীত-শাস্ত্রে রাগরাগিণী-তাললয়ের যে সঙ্কেত-চিহ্ন ব্যবহৃত হয়, বলা বাহুল্য, তৎসমুদায় এই বৈদিক মন্ত্রাদির উচ্চারণ-চিহ্নেরই অনুকৃতি মাত্র। উদাত্তানুদাত্তস্বরিত স্বরে গীত হইলে ত্রিস্বর্য্য বা ত্রিস্বরে গীত, এবং স-ঋ-গ-ম প্রভৃতি সপ্তস্বরে গীত হইলে গানগুলি সপ্তস্বর্য্য বা সপ্তস্বরযুক্ত গান বলিয়া কথিত হইত। শ্রীরামচন্দ্রের রাজসভায় কুশীলব যে রামায়ণ-গান করেন, তাহা সপ্তস্বর্য্য বা সপ্তস্বরে গীত হইয়াছিল। যাহা হউক, সঙ্গীত-স্বর-সম্বন্ধেও প্রাচীন আর্য্য-হিন্দুগণ কিরূপ অভিজ্ঞ ছিলেন;—বৈদিক কালেও ভারতবর্ষ যে স্বর-বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়াছিল;—'শিক্ষায়' তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ এবং আরণ্যক হইতেই যে 'শিক্ষা'-গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছিল, বিবিধ প্রকারে তাহা প্রতিপন্ন হয়। প্রত্যেক বেদের প্রত্যেক শাখার

উচ্চারণের জন্য এইরূপ শিক্ষা-গ্রন্থের প্রচলন ছিল, এবং তৎসমুদায় 'প্রতিশাখা' (প্রাতিশাখ্য) নামে অভিহিত হইত। সকল প্রতিশাখাই এখন বিলুপ্তপ্রায়। এখন মাত্র তিন বেদের তিনটী মাত্র প্রতিশাখা খুঁজিয়া পাওয়া যায়। সামবেদের প্রতিশাখা একেবারেই লোপ পাইয়াছে। ঋগ্বেদের প্রতিশাখা মহামুনি সনক কর্তৃক বিরচিত হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। শুক্ল-যজুর্ব্বেদের প্রতিশাখা কাত্যায়ন প্রণয়ন করিয়াছিলেন বটে ; কিন্তু তাহাও এখন লোপ পাইয়াছে। কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদের এবং অথর্ব্ববেদের প্রতিশাখাও এখন বিলুপ্তপ্রায়। তবে কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদের একটী প্রতিশাখা-প্রবর্ত্তকের মধ্যে বাল্মীকির নাম দেখিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু তিনি কোন্ বাল্মীকি, কেহই তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না। শিক্ষা বা স্বর-বিজ্ঞানের পর, ছন্দঃজ্ঞানের উপযোগিতা অনুভূত হয়। এই ছন্দস্-গ্রন্থের বীজ—বেদে, অঙ্কুরোদ্গম—আরণ্যকে, শাখা-প্রশাখা—উপনিষদে। ছন্দঃজ্ঞান ভিন্ন যজ্ঞকর্ম্ম বা বেদাধ্যয়ন অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায় ; ছন্দঃজ্ঞান ভিন্ন বেদ-পাঠ পণ্ড হয় ; তাই 'ছন্দস্'-গ্রন্থ বেদাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত। ছন্দঃজ্ঞান ভিন্ন রস-গুণ-দোষ উপলব্ধি হয় না ; ছন্দঃজ্ঞান ভিন্ন উচ্চারিত শব্দ-সমূহ হৃদয়ে প্রবেশ করে না ; তাই ছন্দের প্রাধান্য পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। বেদে সাতটী ছন্দের উল্লেখ দেখিতে পাই ;—গায়ত্রী, উষ্ণিক, অনুষ্টুভ্, বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুভ্, জগতী। সন্ধ্যা-বন্দনায় ব্রাহ্মণ মাত্রেই প্রত্যহ এই সকল ছন্দের পরিচয় পাইয়া থাকেন। চব্বিশ অক্ষরে (বা স্বরবর্ণে) তিন চরণে নিবদ্ধ যে ছন্দঃ,তাহাই গায়ত্রী। উষ্ণিক ছন্দে আটাইশটী অক্ষর, অনুষ্টুভে বত্রিশটী, বৃহতীতে ছত্রিশটী, পংক্তিতে চল্লিশটী, ত্রিষ্টুভে চুয়াল্লিশটী, এবং জগতীতে আটচল্লিশটী অক্ষর আছে। বেদ-ব্যবহৃত এই সাতটী ছন্দঃ,—'দৈবিক ছন্দঃ' নামে অভিহিত। মহর্ষি কাত্যায়ন তাঁহার সর্ব্বানুক্রমণিকা-গ্রন্থে এই সাতটী দৈবিক ছন্দের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তি-কালে আর আর যে সকল ছন্দঃ প্রচলিত হইয়াছে, তাহা লৌকিক ছন্দঃ। বাল্মীকিই লৌকিক ছন্দের আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া কথিত হন। তাঁহার মুখনির্গলিত "মা নিষাদ" ইত্যাদি কবিতাই লৌকিক ছন্দের আদিভূত।

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাংত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ। যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতং॥"

শ্লোকের পর, কত শ্লোক, কত ছন্দঃ, বিভিন্ন ভাষায় বিরচিত হইয়াছে,—কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? সংস্কৃত-সাহিত্যে দুই শতাধিক ছন্দের প্রচলন আছে, এবং তন্মধ্যে পঞ্চাশ প্রকার ছন্দঃ সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। বৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত ভেদে লৌকিক ছন্দঃ-সমূহ দ্বিবিধ। গুরু লঘু ও স্বর সংখ্যার নিয়মানুসারে বৃত্ত এবং কেবলমাত্র মাত্রার নিয়মানুসারে মাত্রাবৃত্ত ছন্দঃ রচিত হইয়া থাকে। লৌকিক ছন্দের যে সকল গ্রন্থ অধুনা প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে পিঙ্গলাচার্য্য কৃত ছন্দঃগ্রন্থ এবং ছন্দঃ-মঞ্জরী প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ। ঋগ্বেদের 'প্রতিশাখার' শেষভাগে বৈদিক ছন্দঃ-সম্বন্ধে কয়েকটী অধ্যায় আছে। সাম-বেদান্তর্গত নিদান-সূত্রেও ছন্দের আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। ছন্দের পর, ব্যাকরণের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়া থাকে। ব্যাকরণও বেদাঙ্গ-বিশেষ। বৈয়াকরণের মধ্যে পাণিনিই এখন আদি-স্থান অধিকার করিয়া আছেন। পাণিনির ব্যাকরণের পূর্ব্বে আর যে সকল ব্যাকরণ প্রচলিত ছিল, এখন আর তাহার অস্তিত্ব প্রায়ই অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না।

পাণিনির ব্যাকরণে "ঋর্য্যাঃ প্রাচাম্", "লঙঃ শাকটায়নস্য" প্রভৃতি সূত্র দেখিয়া প্রতীত হয়,—পাণিনির পূর্ব্বে অন্যান্য আচার্য্যগণের ব্যাকরণ প্রচলিত ছিল। পাণিনির ব্যাকরণে যাস্ক, পারস্কর, শাকটায়ন, ব্যাস এবং তাঁহাদের শিষ্য-পরম্পরার উল্লেখ আছে; তাহাতেও বুঝিতে পারা যায়,—পাণিনির পূর্ব্বে ঐ সকল বৈয়াকরণের রচিত ব্যাকরণ প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছিল। অনুসন্ধানে আরও প্রতিপন্ন হয়, অপিশালী, কাশ্যপ, গার্গেয়, গালব, শক্র-বর্ম্মণ, ভারদ্বাজ, শাকল্য, সেনাকা এবং স্ফোটায়ন প্রভৃতি বৈয়াকরণ পাণিনির পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। কেহ কেহ বলেন,—তখন সন্ধি, সুবন্ত, কৃদন্ত, তদ্ধিত প্রভৃতি শিক্ষার জন্য ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ অনুসন্ধান করিতে হইত; কিন্তু পাণিনির সূত্র-সমূহে তৎসমুদায় সংক্ষেপে একত্র লিপিবদ্ধ হওয়ায়, সেই সকল গ্রন্থের প্রচার কমিয়া আসে। যাহা হউক, এখন আর সে সকল গ্রন্থ সন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। অধুনা-প্রচলিত ব্যাকরণের মধ্যে পাণিনি, মুগ্ধবোধ, কলাপ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। বৈদিক সাহিত্যের পরিচয়ের জন্য যে 'প্রতিশাখ্য'-সমূহ বিদ্যমান ছিল, প্রকারান্তরে তাহাকে বৈদিক ব্যাকরণ বলা যাইতে পারে। পাণিনি, কাত্যায়ন, বাড়ি, গালব, ভাগুরি, পতঞ্জলি, বর্ষ প্রভৃতি যে সকল বৈয়াকরণ ছিলেন, তাঁহাদের ব্যাকরণ অনুসারে পরবর্ত্তি-কালে যে ভাষা লিখিত হইতে আরম্ভ হয়, তাহাতে বেদের ভাষা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়;—সংস্কৃত ভাষায় সেই হইতে যেন এক নূতন স্তরের উৎপত্তি হয়। বেদাঙ্গের অপর গ্রন্থের নাম—'নিরুক্ত'। এই নিরুক্তের বিষয় পূর্ব্বেই আমরা উল্লেখ করিয়াছি।* সেই নিরুক্তকারগণের মধ্যে যাস্কের নিরুক্তই এখন প্রচলিত। নিরুক্ত বলিতে এখন যাস্কের নিরুক্তই বুঝাইয়া থাকে। অপরাপর নিরুক্ত লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে। নিরুক্ত গ্রন্থে বৈদিক শব্দের ও বাক্য-সমূহের অর্থ লিখিত আছে বলিয়া, উহা বেদাঙ্গ-মধ্যে পরিগণিত। অন্যতম বেদাঙ্গের নাম—'জ্যোতিষ' বা জ্যোতিঃশাস্ত্র। যদ্দ্বারা সূর্য্যাদি গ্রহের অবস্থান-বিষয়ে জ্ঞান-লাভ হয়,—গ্রহাদির গতি-স্থিতি প্রভৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞতা জন্মে,—তাহাই জ্যোতিষশাস্ত্র। বেদবিহিত যজ্ঞকর্ম্ম সম্পন্ন করিতে হইলে, গ্রহাদির অবস্থান-কাল সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ প্রয়োজন, আর জ্যোতিষ-শাস্ত্রই সে জ্ঞান-প্রদানের উৎসস্থানীয়,—এই জন্যই জ্যোতিষ-শাস্ত্র বেদাঙ্গ-মধ্যে পরিগণিত। বেদে জ্যোতিষের বীজ নিহিত ছিল; পুরাকালে ঋষি-মহর্ষিগণ তদনুসারে কাল-গণনা করিয়া লইতেন; পরিশেষে ভাস্করাচার্য্য, বরাহ-মিহির প্রভৃতি তৎসমুদায় লিপিবদ্ধ করিয়া যান। কি ঋগ্বেদে, কি যজুর্ব্বেদে, কি অথর্ব্ববেদে,—কোনও-না-কোনও আকারে এই জ্যোতিষ-শাস্ত্রের পরিচয় আছে। ষড়-বেদাঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে অনুক্রমণি বা অনুক্রমণিকা উল্লেখযোগ্য। উহা নির্ঘণ্ট বা বিশদ সূচীপত্রবিশেষ। কি বেদ, কি সূত্র, কোন্ গ্রন্থের কোথায় কি আছে, অনুক্রমণি বা নির্ঘণ্টে তাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ঋগ্বেদের সাতখানি অনুক্রমণির নামোল্লেখ আছে। তন্মধ্যে কাত্যায়ন-প্রণীত ঋগ্বেদ-অনুক্রমণি বিশেষ প্রসিদ্ধ। যজুর্ব্বেদের তিন খানি অনুক্রমণির পরিচয় পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদের আত্রেয় এবং শুক্ল-যজুর্ব্বেদের

* এই গ্রন্থের চতুর্থ পরিচ্ছেদে ৫৯ পৃষ্ঠায় 'নিরুক্ত' বিষয়ক আলোচনা দ্রষ্টব্য।

মাধ্যন্দিন প্রতিষ্ঠান্বিত। সামবেদের অনুক্রমণির মধ্যে আর্ষ অনুক্রমণি প্রসিদ্ধ; তাহার নাম —নৈগেয়ানামৃক্ষ্বার্ষম। অথর্ব্ববেদের অনুক্রমণির নাম—বৃহৎ সর্ব্বানুক্রমণি।

বেদ, বেদান্ত, বেদাঙ্গ—শাস্ত্রীয়-সাহিত্যের তিনটী স্তর-বিশেষ। সে হিসাবে, তদ্দ্বারা ত্রিবিধ সাহিত্যের তিনটী যুগ-পরিচয় নির্দ্দিষ্ট হয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। একই সংস্কৃত ভাষার ক্রমে ক্রমে কিরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া আসিয়াছে, তাহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায়। বেদের সহিত ব্রাহ্মণের, ব্রাহ্মণের সহিত আরণ্যকের, আরণ্যকের সহিত উপনিষদের, এবং উপনিষদের সহিত সূত্র-গ্রন্থের—ভাষা-ভাবের কি আকাশ-পাতাল পার্থক্য! বেদ হইতে সূত্র-গ্রন্থের ভাষা-ভাবের তারতম্য আলোচনা করিলে, কত কালে ঐ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল, কে নির্ণয় করিতে পারেন? তার পর, আজি পর্য্যন্ত কত স্তরে কত কালে কত ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহারও সময়-নির্ণয় করিতে গেলে বিস্ময়-সাগরে নিমজ্জিত হইতে হয়। সেই কত কোটী কল্প কালের বেদ,—কোন্ স্মরণাতীত যুগের ব্রাহ্মণ, উপনিষৎ, সূত্র-গ্রন্থ;—অথচ, আজিও—এই বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য-উন্নতির পূর্ণ-প্রভাবের দিনেও—তাহার সমকক্ষতা-লাভে কেহই সমর্থ নহে। অধিক বলিব কি!—এখন যতই যিনি সেই পুরাতন কাহিনী আলোচনা করিতেছেন, কি প্রাচ্য, কি পাশ্চাত্য, সকলেই তাহাতে চমকিত হইতেছেন। কোন্ বিষয়ের কথা বলিব? 'ব্রাহ্মণের' বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া, অধ্যাপক ওয়েবার বলিয়াছেন,—"মনুষ্যের জ্ঞান যতদূর উচ্চ-চিন্তার সমাধান করিতে সমর্থ, ব্রাহ্মণে হিন্দুগণ তাহারই পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।" শুক্ল-যজুর্ব্বেদের প্রতিশাখ্যার কথা কহিতে গিয়া, অধ্যাপক উইলসন বলিয়াছেন,—"স্বর-বিজ্ঞান-সম্বন্ধে এমন সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন সূক্ষ্ম-তত্ত্ব আবিষ্কারে পৃথিবীর কোনও জাতি আজি পর্য্যন্ত সমর্থ হয় নাই।" তিনি আরও বলিয়াছেন,—"প্রাচীন গ্রীকগণ ব্যাকরণের পদ-পরিচয়-সম্বন্ধে কত কাল পর্য্যন্ত অনভিজ্ঞ ছিলেন! প্লেটোর সময়ে বিশেষ্য এবং ক্রিয়াপদ মাত্রের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। আরিষ্টোটল ঐ দুই পদের অধিক পদের ব্যবহার জানিতেন না। অলঙ্কার-বিষয়ক নিয়মাবলী আলোচনার সময় আরিষ্টোটল, অব্যয় এবং বিশেষণ (Conjunction এবং Article) পদের আবশ্যকতা কিয়ৎপরিমাণে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। জেনোডোটাসের পূর্ব্বে সর্ব্বনামের প্রয়োগ গ্রীক-ভাষায় প্রচলিত হয় নাই; আরিষ্টারকোস প্রথম অব্যয় (Preposition) ব্যবহার করেন। কিন্তু শুক্ল-যজুর্ব্বেদের প্রতিশাখায় পদ-পরিচয় কি বিশদভাবেই পরিবর্ণিত!" আগরা কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক টমসন একজন প্রসিদ্ধ ভাষাবিজ্ঞানবিৎ ছিলেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন,—"সংস্কৃত ভাষায় ব্যঞ্জনবর্ণের সৃষ্টি—মানব-প্রতিভার অদ্বিতীয় পরিচয়। এ বিষয়ে ইউরোপীয়গণ আজি পর্য্যন্ত হিন্দুগণের পশ্চাতে পড়িয়া আছেন।" অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনাল্ড বলেন,—"বিজ্ঞানের এই উন্নতির যুগে, আড়াই হাজার বৎসর পরে, আজিও আমরা (ইউরোপীয়গণ) বর্ণমালার অসম্পূর্ণতা দূরীকরণে সমর্থ হইলাম না। আমাদের বর্ণমালা এখনও আমাদের ভাষায় সর্ব্ববিধ শব্দ প্রকাশ করিতে সমর্থ নহে। তিন সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে আদিম সেমিটিক জাতির

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত।

নিকট হইতে গ্রীকগণ যে উপাদান প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাই এখন 'তাল পাকাইয়া' আমাদের বর্ণমালা-রূপে অসম্বদ্ধভাবে বিরাজমান আছে।" রেভারেণ্ড মিঃ ওয়ার্ড বলেন,—"কি প্রাচীন, কি আধুনিক, কোনও জাতিই ভাষা-বিজ্ঞানে হিন্দু-জাতির সমকক্ষতা লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই।" অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার বলেন,—"সমগ্র ভাষা কতকগুলি ধাতুর উপর প্রতিষ্ঠিত—এই অভিনব ভাবের উন্মেষ ইউরোপে ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বে দেখিতে পাওয়া যায় না। ঐ সময়ে হেন্‌রী এষ্টিন প্রথমে এই বিষয়ে মস্তিষ্ক-চালনা করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু ভারতবর্ষে, খৃষ্ট-জন্মের অন্যূন পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে, ভারতীয় ব্রাহ্মণগণ এই ধাতু-বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ ছিলেন।" সার উইলিয়ম হাণ্টারকে পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে হইয়াছে,—"পাশ্চাত্য-দেশের বৈয়াকরণ-গণ যখন ভাষা-বিজ্ঞান-সম্বন্ধে সন্দেহ-দোলায় দোদুল্যমান, ভারতে তখন ভাষা-বিজ্ঞানের পূর্ণতা সাধিত হইয়াছিল।" ব্যাকরণ-বিষয়ে ভারতবর্ষ কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে একমাত্র পাণিনির ব্যাকরণ দেখিয়াই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ চমকিত। অধ্যাপক মনিয়ার উইলিয়মস্ বলেন,—"ব্যাকরণ-সম্বন্ধে এরূপ মৌলিক গ্রন্থ পৃথিবীতে আজিও প্রকাশিত হয় নাই।" অধ্যাপক মাক্সমুলারেরও মত,—"হিন্দুগণ ভাষা-ব্যাকরণ সম্বন্ধে যেরূপ উচ্চ-স্থান অধিকার করিয়া আছেন, পৃথিবীর কোনও জাতি আজি পর্য্যন্ত সে স্থান অতিক্রম করিতে সমর্থ নহেন।" * কত দেখাইব? আর্য্য-হিন্দুগণ যে সর্ব্ব বিষয়েই শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া ছিলেন, যে দিক দিয়াই দেখি, তাহাই প্রতিপন্ন হয়। বেদাঙ্গ প্রভৃতি রচনার কাল-নির্ণয় দুরূহ। ষড়্‌বেদাঙ্গ এক-সময়ে রচিত হইয়াছিল বলিয়া কখনই মনে হয় না। পণ্ডিতগণ অনুমান করিয়া দেখিয়াছেন,—খৃষ্ট-জন্মের সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতে তিন শত বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী কালে বেদাঙ্গ-গ্রন্থ রচিত হওয়া সম্ভবপর। তাঁহাদের মতে, নিরুক্তকার যাস্ক খৃষ্ট-পূর্ব্ব নবম শতাব্দীতে, এবং বৈয়াকরণ পাণিনি খৃষ্ট-পূর্ব্ব অষ্টম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। † সুলভ-সূত্র বা জ্যামিতি-তত্ত্ব খৃষ্ট-পূর্ব্ব অষ্টম শতাব্দীতে এবং অন্যান্য সূত্র-সমূহ খৃষ্ট-পূর্ব্ব অষ্টম হইতে চতুর্থ শতাব্দীতে বিরচিত হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল সিদ্ধান্ত যে প্রমাদ-পরিশূন্য, তাহা কোনক্রমেই স্বীকার করা যায় না। যিনি যাহা বলিয়াছেন, সকলেই আপনাপন অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া আপন মত-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই বলিয়াছেন।

* "হিন্দু-সুপিরিয়রিটী"-গ্রন্থে (*Hindu Superiority*) এই বিষয়ের বিশদ আলোচনা দ্রষ্টব্য।

† পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী বৈয়াকরণ-গণের যথাযোগ্য পরিচয় প্রদান করিবার উপাদান এখন বড়ই বিরল। সুতরাং, পাণিনির ব্যাকরণই এখন আদি-স্থান অধিকার করিয়া আছে। প্রচার এই,—পাণিনি মহেশ্বরের নিকট উপদেশ পাইয়া আপন ব্যাকরণ রচনা করেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে গোল্ডষ্টুকার পাণিনি-সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। গোল্ডষ্টুকারের মতে,—পাণিনি ও তাঁহার বার্ত্তিককার কাত্যায়ন ১৪০ হইতে ১২০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। পাণিনির ব্যাকরণ আট অধ্যায়ে বিভক্ত বলিয়া, উহা "অষ্টাধ্যায়ী" নামে অভিহিত হয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পাদসংখ্যা চারিটী করিয়া। গ্রন্থের মোট সূত্র-সংখ্যা ৩৯৬৫টী। সূত্র-সমূহের আকৃতি-পরিচয় বুঝাইবার জন্য, নিম্নে তিনটি সূত্রের উল্লেখ করিতেছি,—(১)ছন্দসো যঃ; (২)কৃ বা পা জি মি স্বদি সাধ্যশূভ্য উণ্ (৩)দৃ সনি জনি চরি চটিভ্যো ঞুণ্। মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ-রচয়িতা বোপদেব এবং কলাপ-ব্যাকরণ-রচয়িতা শর্ব্ববর্ম্মা পাণিনির সূত্রগুলিকে অধিকতর সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনটি সূত্র কলাপ ব্যাকরণে "কৃ বা পা জি মি স্বদি সাধ্যশূ দৃসনিজনিচরি চটিভ্যো উণ্" এই একটী সূত্রে গ্রথিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, টীকা ভিন্ন এ সকল সূত্র বোধগম্য হওয়া দুরূহ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ষড়্‌দর্শন।

[দর্শন-শাস্ত্রে জ্ঞানকাণ্ড,—ষড়্‌দর্শনের পরিচয়,—চার্ব্বাক-দর্শনে নিরীশ্বরবাদ,—দর্শন-শাস্ত্রের সারমর্ম্ম,—দুঃখনাশে মোক্ষলাভই প্রধানতঃ প্রতিপাদ্য,—ভিন্ন ভিন্ন দর্শনের পার্থক্য-তত্ত্ব ;—হিন্দু-দর্শনের ও পাশ্চাত্য দর্শনের ('ফিলজফি') অর্থভেদ,—প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় দার্শনিকগণ,—পদার্থ-তত্ত্ব নিরূপণে প্রমাণের আবশ্যকতা,—ভিন্ন ভিন্ন দর্শনের প্রমাণ-প্রসঙ্গ,—আধ্যাত্মিক ও জড়জাগতিক উন্নতি।]

ষড়্‌দর্শন।
(সার-সঙ্কল্প।)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—ভারতবর্ষে সূত্র-সাহিত্যের এক যুগ আসিয়াছিল। তখন এক দিকে যেমন সমাজ-ধর্ম্ম, গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম, যজ্ঞবিধি প্রভৃতি সূত্রাকারে গৃহে গৃহে প্রচারিত হইতেছিল; অন্য দিকে তেমনই দার্শনিক কোবিদগণ আবির্ভূত হইয়া অপূর্ব্ব ধী-শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছিলেন। ষড়্‌দর্শন-রূপ যে মহান্ মহীরুহ ভারতীয় সাহিত্য-কাননের অনুপম শোভা সম্বর্দ্ধন করিয়া আছে, সূত্র-সাহিত্যের যুগে সে এক অপরূপ সৃষ্টি। এক দিকে কর্ম্মকাণ্ড-প্রতিপাদক ষড়্‌বেদাঙ্গ, অন্য দিকে পরমতত্ত্বজ্ঞানপ্রদ ষড়্‌দর্শন ;—জগতে ইহার তুলনা আছে কি? উভয়ই অল্প-বাক্যে অধিকভাবপূর্ণ সূত্রাকারে * সংগ্রথিত ;—উভয়ই আর্য্যগণের জ্ঞান-গবেষণা-প্রতিভার অপূর্ব্ব পরিচায়ক। ব্রাহ্মণ-ভাগে কর্ম্মকাণ্ডের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে আরণ্যক ও উপনিষদে যেমন জ্ঞানকাণ্ডের প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠার পরিচয় পাই, কল্পসূত্রে কর্ম্মকাণ্ডের প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে দর্শন-সূত্রে সেইরূপ জ্ঞানকাণ্ডের প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাই। দর্শন-শাস্ত্রের সংখ্যা প্রধানতঃ ছয়টী ;—(১) কপিল-প্রণীত সাঙ্খ্যদর্শন, (২) কণাদ-প্রণীত বৈশেষিক দর্শন ; (৩) গৌতম-প্রণীত ন্যায়দর্শন ; (৪) পতঞ্জলি-প্রণীত পাতঞ্জল বা যোগশাস্ত্র ; (৫) জৈমিনি-প্রণীত পূর্ব্ব-মীমাংসা ; (৬) বাদরায়ণ বা ব্যাস-প্রণীত উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্ত-দর্শন। এই ছয়খানি দর্শন—ষড়্‌দর্শন নামে অভিহিত। এতদ্ভিন্ন, বৌদ্ধদর্শন এবং নিরীশ্বরবাদমূলক দর্শনাদি 'চার্ব্বাক-দর্শন' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সকল দর্শনেরই মুখ্য উদ্দেশ্য,—দুঃখ-নাশ। সকল দর্শনেরই সার-সঙ্কল্প—সুখ-সাধন। সকল দর্শনই প্রকারান্তরে প্রতিপাদন করিতেছেন,—"ইহসংসার দুঃখের আলয় ; এ

* সূত্র শব্দের ব্যুৎপত্তি,—"সূচনাদ্ধি সূত্রং।" অর্থাৎ, বহু অর্থের সূচনাকারী বাক্যই সূত্র। সূত্রের লক্ষণ,—"অল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবৎ সর্ব্বতোমুখং। অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদোবিদুঃ।" অর্থাৎ, অল্পাক্ষর-সংযুক্ত যে সার সিদ্ধান্ত, যাহাতে সংশয় নাই, সংশয় হইলে তাহা নিবারণের উপায় আছে, যাহার একটী অক্ষরও নিরর্থক প্রযুক্ত নহে, অথচ যাহাতে তর্কের পথ সর্ব্বতোভাবে প্রদর্শিত,—তাহাই সূত্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

সংসারে মানুষ যাহাকে সুখ বলিয়া মনে করে, তাহা দুঃখেরই আদিভূত। সাংসারিক সুখ ক্ষণস্থায়ী; তদ্দ্বারা কেবল দুঃখই বৃদ্ধি হয়। সংসার অহরহ সুখের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; সুবিমল চিরসুখ ও চিরশান্তি লাভই মনুষ্য-জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।" স্থূলতঃ, দুঃখবাদ—দর্শন-শাস্ত্রের ভিত্তি; দুঃখনাশ—দর্শন-শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য। দুঃখ-নিবারণের উপায়-পরম্পরা নির্দ্দেশ করিয়া, দর্শন-শাস্ত্র নিত্য-সুখলাভের পথ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। সকল দর্শন-শাস্ত্রেরই মূল উদ্দেশ্য এক বটে; কিন্তু সকলেই যে একই পথে প্রধাবিত, তাহা নহে। ভিন্ন ভিন্ন পথে, ভিন্ন ভিন্ন তর্ক-যুক্তির অবতারণায়, দর্শন-শাস্ত্রসমূহ দুঃখ-নিবৃত্তির অর্থাৎ নিত্যসুখলাভের উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। দর্শনশাস্ত্রের মতে,—পদার্থ-তত্ত্বের জ্ঞানই দুঃখনিবৃত্তির উপায়। দর্শন-শাস্ত্রে তাই পদার্থ-তত্ত্বের আলোচনায় পদার্থের স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত করাইয়া চিরসুখ-লাভের (মোক্ষের) পথ নির্ণীত হইয়াছে। সে হিসাবে, দর্শন-শাস্ত্রসমূহ জ্ঞান-গবেষণার উৎস-স্থানীয় বটে; তবে, দর্শন-শাস্ত্রসমূহের উদ্ভাবিত সুখ-সাধনের উপায়-পরম্পরার সহিত সর্ব্বত্র ঈশ্বরের নৈকট্য সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে হয় না। সাঙ্খ্য-দর্শনে এবং মীমাংসা-দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রকারান্তরে অস্বীকার করা হইয়াছে। ন্যায়-দর্শন এবং বৈশেষিক দর্শন ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নাই বটে; কিন্তু মনুষ্যের দুঃখ-নিবৃত্তির সহিত ঈশ্বরের যে কোনও সম্বন্ধ আছে, তাহা স্বীকার করেন নাই। পতঞ্জলির যোগ-শাস্ত্রে ঈশ্বর-সান্নিধ্য-লাভের উপায়-পরম্পরা নির্দ্দিষ্ট আছে বটে; কিন্তু সে উপায়ও মুখ্য উপায় বলিয়া মনে হয় না। একমাত্র বেদান্ত-দর্শনেই ঈশ্বরের (ব্রহ্মের) প্রাধান্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। বেদান্তের মতে,—ব্রহ্মই সত্য, আর সকলই মিথ্যা। বেদান্ত বলেন,—মুক্তির পর আত্মা চিদানন্দরূপে অবস্থান করেন। উপনিষদে যে দেখিতে পাই—পরমাত্মার সহিত আত্মার মিলন হইলেই সকল দুঃখের অবসান হয়; বেদান্তের মত—তাহারই অনুসরণকারী। পণ্ডিতগণ ষড়দর্শনকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করেন। তাঁহাদের মতে,—সাঙ্খ্য ও পূর্ব্ব-মীমাংসা একশ্রেণীর দর্শন; ন্যায় ও বৈশেষিক একশ্রেণীর দর্শন; এবং পাতঞ্জল ও বেদান্ত একশ্রেণীর দর্শন। মূল দর্শন-শাস্ত্রসমূহ এখন লোপ পাইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দর্শন-শাস্ত্রসমূহের ভাষ্য ও টীকা প্রভৃতি কখনও কখনও দর্শনশাস্ত্র-রূপে প্রচারিত হইয়া থাকে। সুতরাং সাঙ্খ্য, ন্যায়, বৈশেষিক, পাতঞ্জল, মীমাংসা, বেদান্ত,—হিন্দু-দর্শনের এই ছয়টী প্রধান সম্প্রদায় বা শাখা হইলেও, এক এক শাখায় এখন বহু মত এবং বহু উপশাখা দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া অপবর্গের সাধনভূত তত্ত্বজ্ঞান-লাভ কি প্রকারে হইতে পারে, তাহা নির্দ্দেশ করাই—ষড়দর্শনের উদ্দেশ্য। বেদে ভগবান জগৎ-জীবনরূপে প্রতিষ্ঠিত আছেন। উপনিষদে বুঝান হইয়াছে,—'তিনিই পরমাত্মা; জীবাত্মা তাঁহার অংশ মাত্র। তিনিই সত্য; জগৎ মিথ্যা। আত্মা পরমাত্মায় লীন হইলেই জীবন্মুক্তি ঘটে।" দর্শনশাস্ত্র তর্ক-যুক্তি দ্বারা সেই স্বরূপ-তত্ত্ব নির্ণয় করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। কিসে মানবের দুঃখ দূর হয়, কি প্রকারে জীবাত্মা মুক্তি-লাভ করিতে পারে,—প্রমাণাদি দ্বারা দর্শনশাস্ত্র তাহারই অনুসন্ধান করিয়াছেন।

মানুষের জ্ঞান ও চিন্তা-শক্তি কতদূর পরিস্ফুট হইয়াছে, তাঁহাদের দর্শন-শাস্ত্রে সেই পরিচয় পাওয়া যায়। দর্শন-শব্দের অর্থ—জ্ঞান; দর্শন-শাস্ত্র—জ্ঞান-শাস্ত্র। বিচার ও মীমাংসা দ্বারা লৌকিক ও পারলৌকিক বিষয়ের যে জ্ঞান,—তাহাই দর্শন-শাস্ত্রে প্রকটিত অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার বলেন,—"যে রাজ্য উন্নতির উচ্চ-চূড়ায় অধিরূঢ় হয়, যে রাজ্যে বহিঃশত্রু বা অন্তঃশত্রুর উপদ্রবের আশঙ্কা মাত্র থাকে না, ধন-সম্পৎ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ বিদ্যামন্দির ও বিশ্ববিদ্যালয়াদি প্রতিষ্ঠায় যে রাজ্যের অধিবাসিগণ নির্ব্বিঘ্নে বিদ্যালোচনায় নিবিষ্ট হইতে পারে,—সেই সভ্য সমুন্নত রাজ্যেই দর্শন-শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়া থাকে।" সে হিসাবে, কীদৃশ সভ্য-সমুন্নত অবস্থার দিনে, ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্রের অভ্যুদয় হইয়াছিল,—তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হয় না কি? ভারতবর্ষই দর্শন-শাস্ত্রের আদিভূত; ভারতবর্ষ হইতেই পৃথিবীর অন্যান্য দেশে দার্শনিক চিন্তার স্রোত প্রবাহিত;—এ তত্ত্বও বিবিধ প্রকারে প্রতিপন্ন হইতে পারে। জর্ম্মণ দার্শনিক সেজেলের মতে,—"হিন্দুদর্শনের মূলীভূত আত্মার দেহান্তর-গ্রহণ তত্ত্ব, গ্রীক দার্শনিক পীথাগোরাস ভারত হইতেই গ্রীসে আনয়ন করিয়াছিলেন।" মনিয়ার উইলিয়মসের মতেও,—"ইউরোপীয় আদি-দার্শনিক প্লেটো ও পীথাগোরাস উভয়েই দর্শন-জ্ঞান সম্বন্ধে ভারতীয় হিন্দুগণের নিকট অশেষ প্রকারে ঋণী।" যাহা হউক, দর্শন-শাস্ত্রের মূল-তত্ত্ব সম্বন্ধে ইউরোপ ভারতবর্ষের নিকট ঋণী হইলেও, চিন্তা-শক্তির তারতম্যানুসারে ইউরোপের দর্শনে এবং ভারতীয় দর্শনে কালক্রমে অনেক তারতম্য ঘটিয়াছে। যদিও পদার্থ-মাত্রেরই জ্ঞান-লাভ দর্শন-শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য; কিন্তু সে জ্ঞান কোন্ বিষয়ে কিরূপ ভাবে প্রযোজ্য, ইউরোপে ও ভারতে তৎসম্বন্ধেই মতভেদ। তাই, ভারতবর্ষের দর্শন-শাস্ত্র বলিতে আমরা এখন যাহা বুঝিয়া থাকি, ইউরোপের 'ফিলজফি' শব্দে ঠিক সেই অর্থ উপলব্ধি হয় না। আমাদের দর্শন-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য,—সেই জ্ঞান-লাভ—যে জ্ঞানে নিঃশ্রেয়স বা মুক্তি বা মোক্ষ লাভ হয়—যে জ্ঞানে আর কখনও জন্ম-জরা-মৃত্যুর অধীন হইতে হয় না—যে জ্ঞানে আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তির ফলে আত্মা চিরসুখে চিরশান্তি লাভ করিতে পারে। কিন্তু ইউরোপের 'ফিলজফি' বা দর্শনের উদ্দেশ্য অন্যবিধ। ইউরোপের 'ফিলজফিতে'—সমাজ-নীতি আছে, অর্থ-নীতি আছে, ধর্ম্ম-নীতি আছে, প্রকৃতি-বিজ্ঞান আছে। ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্রের মতে,—'ইহসংসার দুঃখের আলয়। মনুষ্য যতই সুখের জন্য চেষ্টা করিতেছে, প্রকৃতি ততই বাধা দিতেছে। প্রকৃতির সহিত যেন মনুষ্যের চিরসমর চলিয়াছে। ইহজন্মেও সে দ্বন্দ্বের অবসান নাই; কর্ম্ম-ঘোরে জন্মজন্মান্তরেও মানুষ সেই দ্বন্দ্বে রত রহিয়াছে। সেই দ্বন্দ্বে জয়লাভ করিতে হইলে, প্রকৃতির সহিত সকল সম্বন্ধ ছেদ করিতে হইবে। একমাত্র জ্ঞানই—সেই জয়লাভের ব্রহ্মাস্ত্র। জ্ঞান-অস্ত্রে প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে পারিলেই—আত্মার মুক্তি।" ইহাই ভারতীয় হিন্দু-দর্শনের সার সিদ্ধান্ত। কিন্তু ইউরোপের দর্শন-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য,—"প্রকৃতির দ্বারাই প্রকৃতিকে জয় করা।" প্রকৃতির নিগূঢ়-তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া, প্রকৃতির বলে ইহজীবন সুখকর করিতে হইবে,—পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের

হিন্দু-দর্শনে ও পাশ্চাত্য-দর্শনে পার্থক্য।

ইহাই প্রধান লক্ষ্য। এই লক্ষ্যের ফলেই, পাশ্চাত্য-দর্শনে জড়-বিজ্ঞানের এতাদৃশ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এই লক্ষ্যের ফলেই, মানুষ প্রকৃতিকে আয়ত্ত করিয়া আপনার ইহ-লৌকিক সুখ-সাধনের চেষ্টা করিতেছে। এই লক্ষ্যের ফলেই, বিজ্ঞান, বাষ্পীয়-পোত, বৈদ্যুতিক আলোক, তাড়িত-বার্ত্তা প্রভৃতির আবিষ্কার করিয়া, ইহলৌকিক সুখের একবিধ উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে। ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিকের আবির্ভাব হইয়াছিল। সকলের সকল পরিচয় এ প্রসঙ্গে উত্থাপন করা অসম্ভব। প্রাচীন গ্রীসের সক্রেটিস, আরিষ্টটল, প্লেটো, পীথাগোরাস; জর্ম্মণীর কাণ্ট, হেজেল, সোপেনহার; ফ্রান্সের কোম্‌ৎ; এবং ইংলণ্ডের বেকন, জন ষ্টুয়ার্ট মিল, হার্ব্বার্ট স্পেন্সার, লোক, হ্যামিল্টন, হিউম, বার্কলে প্রভৃতি দার্শনিকগণ বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহাঁদের সকলেরই মত অবশ্য এক নহে; পরন্তু সময়ে সময়ে একের মতের প্রতিবাদ বা খণ্ডন অন্য মতে সাধিত হইয়াছে। তবে, স্থূলতঃ যে মত এখন প্রচলিত, তাহারই আভাস উপরে আমরা প্রদান করিলাম। ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্রের সহিত ইউরোপীয় দর্শন-শাস্ত্রের যে পার্থক্য দৃষ্ট হয়, সে পার্থক্যের প্রধান কারণ, আমাদের মনে হয়, প্রমাণ-বিষয়ক জ্ঞানের তারতম্য-হেতু। পদার্থ-নিরূপণ—প্রমাণ-সাপেক্ষ। এইজন্য পদার্থ-জ্ঞান-লাভ সম্বন্ধে দর্শনকারগণ প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন। বৈশেষিক-মতে,প্রমাণ দ্বিবিধ; সাঙ্খ্য-মতে ত্রিবিধ; ন্যায়মতে চতুর্ব্বিধ। মীমাংসকগণ প্রমাণ-পঞ্চকবাদী; বৈদান্তিকগণ ষড়বিধ প্রমাণ মান্য করেন; পৌরাণিকগণ প্রমাণাষ্টকের পক্ষপাতী। নিরীশ্বর চার্ব্বাকবাদীরা দুইটীর অধিক প্রমাণ স্বীকার করেন না। ইউরোপীয় দার্শনিকগণ ঘুরিয়া ফিরিয়া চার্ব্বাক-মতেরই অনুসরণকারী হইয়াছেন। চার্ব্বাক-মতাবলম্বিগণ 'প্রত্যক্ষ' ও 'অনুমান' দুইটী মাত্র প্রমাণ স্বীকার করেন। বৈশেষিক-কার কণাদেরও স্থূলতঃ সেই মত। সাঙ্খ্যকার কপিল, 'প্রত্যক্ষ', 'অনুমান' ও 'শব্দ'—এই তিন প্রমাণের পক্ষপাতী। নৈয়ায়িকগণ, সাঙ্খ্যের ঐ প্রমাণত্রয় ব্যতীত 'উপমান' প্রমাণ মানিয়া থাকেন। মীমাংসকগণ তদধিক 'অর্থাপত্তি' প্রমাণ স্বীকার করেন। বৈদান্তিকগণ উক্ত পঞ্চপ্রমাণাতিরিক্ত 'অনুপলব্ধি' প্রমাণের পক্ষপাতী। পৌরাণিকগণ ঐ ষড়বিধ প্রমাণাতিরিক্ত 'সম্ভব' ও 'ঐতিহ্য' প্রমাণবাদী। বিশেষ বিশেষ দর্শনের আলোচনার সময়, এই সকল প্রমাণের বিষয় যথাসম্ভব বিশদভাবে আলোচিত হইবে। আপাততঃ এই মাত্র বলিয়া রাখি,—সকল প্রমাণেরই মূল—প্রত্যক্ষ প্রমাণ; প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতেই অন্যান্য প্রমাণের অনুমিতি। যাঁহারা সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মাদপি তত্ত্বে চিত্ত-নিবেশ করিতে পারদর্শী, তাঁহারা আধ্যাত্মিক জগতে উন্নতিশীল। আর যাঁহারা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বহির্ব্বিষয়ের প্রমাণই প্রমাণ বলিয়া মান্য করিয়া থাকেন, তাঁহারা বহির্ব্বিষয়ে জড়-জগতে উন্নতি-শীল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সাঙ্খ্য-দর্শন।

[কপিল ও সাঙ্খ্য-দর্শন,—বিভিন্ন কপিল ও সাঙ্খ্য-দর্শনের বিভিন্ন রূপান্তরের আলোচনা;—সাঙ্খ্যের প্রতিপাদ্য,—ত্রিবিধ দুঃখনিবৃত্তিই মুক্তি,—ত্রিবিধ দুঃখের স্বরূপ তত্ত্ব,—দুঃখের স্থূল ও সূক্ষ্ম প্রকারভেদ,—পুরুষ ও প্রকৃতি,—প্রকৃতির অবস্থা ও বিকৃতি,—পঞ্চবিংশ পদার্থ বা তত্ত্ব,—পুরুষের দুঃখোৎপত্তি ও দুঃখনিবৃত্তি,—দুঃখোৎপত্তি-নিবৃত্তিই পুরুষার্থ;—সাঙ্খ্যে নিরীশ্বর-বাদ,—প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ—ত্রিবিধ প্রমাণ-প্রসঙ্গ,—ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্তৃত্ব অপ্রামাণ্য,—প্রকৃতিই সৃষ্টির আধার-স্থানীয়;—বেদ-বিষয়ে কপিলের মত,—পুরুষ বা আত্মার ভেদজ্ঞান,—উপনিষদের সহিত মতানৈক্য,—সাঙ্খ্য-দর্শনই বৌদ্ধ-দর্শনের ভিত্তি-স্থানীয়,—সাঙ্খ্য-মতে স্বর্গ-নরক ও নির্ব্বাণ-মুক্তি।]

ষড়্‌দর্শনের মধ্যে সাঙ্খ্য-দর্শনকে অনেকে আদি-দর্শন বলিয়া অনুমান করেন। সাঙ্খ্য-দর্শন—মহর্ষি কপিল-প্রণীত; অর্থাৎ, সাঙ্খ্য-মত প্রথমে মহর্ষি কপিল কর্তৃক প্রচারিত হয়।

কপিল ও সাঙ্খ্যদর্শন।

কপিল, আপন শিষ্য আসুরিকে এই দর্শন-জ্ঞান প্রথম প্রদান করেন। আসুরির শিষ্য পঞ্চশিখ আপন গুরুর নিকট সেই জ্ঞান লাভ করিয়া শিষ্য-পরম্পরায় তাহা প্রচার করিয়াছিলেন। তৎপরে, কি ভাবে সাঙ্খ্যসূত্র-সমূহ প্রচারিত হয়, তাহার বিশেষ কোনও নিদর্শন নাই। অনেকের মতে,—সাঙ্খ্য-শাস্ত্রের মধ্যে 'তত্ত্বসমাস' সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন।* কিন্তু অনেকে, আবার বলেন -সাঙ্খ্যসূত্র নামে অধুনা যে গ্রন্থ প্রচলিত আছে, অর্থাৎ বিজ্ঞান-ভিক্ষু যাহার 'সাঙ্খ্য-প্রবচন' ভাষ্য এবং অনিরুদ্ধ যাহার টীকা করিয়া যান, তাহাই মূল গ্রন্থ। বলা বাহুল্য, এই গ্রন্থই এখন সাঙ্খ্য-দর্শন নামে বিদ্যালয়াদিতে পঠিত হইয়া থাকে। ইহার পর, ঈশ্বরকৃষ্ণের নাম উল্লেখযোগ্য। ঈশ্বরকৃষ্ণাচার্য্য সাঙ্খ্য-সূত্রসমূহ 'আর্য্যাছন্দে" গ্রথিত করিয়া 'সাঙ্খ্য-কারিকা' গ্রন্থ প্রচার করেন। অনেকে সেই গ্রন্থকেও এখন সাঙ্খ্য-দর্শন বলিয়া চালাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। ঈশ্বরকৃষ্ণের সাঙ্খ্যকারিকা গ্রন্থ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে চীনদেশে চীন-ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। সে হিসাবে, ষষ্ঠ শতাব্দীর অনেক পূর্ব্বে ঈশ্বরকৃষ্ণাচার্য্য সাঙ্খ্যকারিকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন,—সহজেই তাহা প্রতিপন্ন হয়। † ঈশ্বরকৃষ্ণের পর, বাচস্পতি মিশ্রের নাম উল্লিখিত হইয়া থাকে। তিনি খৃষ্টীয় দ্বাদশ

* বিজ্ঞানভিক্ষু এই মত প্রচার করেন। মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারের 'হিন্দুদর্শন' এবং ম্যাক্সমুলারের (Six Systems of Indian Philosophy) ভারতীয় ষড়্‌দর্শনালোচনা-গ্রন্থে এই মত সমর্থিত হইয়াছে।

† ঈশ্বরকৃষ্ণের সাঙ্খ্যকারিকার সপ্ততি ও একসপ্ততি সংখ্যক শ্লোকে, কি ভাবে লোক-পরম্পরায় সাঙ্খ্য-দর্শন প্রচলিত হয়, তাহার পরিচয় আছে। যথা,—

"এতৎ পবিত্রমগ্র্যং মুনিরাসুরয়েঽনুকম্পয়া প্রদদৌ। আসুরিরপি পঞ্চশিখায় তেন চ বহুধাকৃতং তন্ত্রম্॥
শিষ্যপরম্পরয়াগতমীশ্বরকৃষ্ণেন চৈতদার্য্যাভিঃ। সংক্ষিপ্তমার্য্যমতিনা সম্যগ্‌বিজ্ঞায় সিদ্ধান্তম্॥"

শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। 'সাঙ্খ্য-তত্ত্ব-কৌমুদী' নামক ভাষ্য-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া, বাচস্পতি মিশ্র সাঙ্খ্য-দর্শন প্রচারের পথ অধিকতর প্রশস্ত করিয়া যান। অধুনা 'সাঙ্খ্য-সূত্র' নামে যে গ্রন্থ প্রচলিত, অনেকে অনুমান করেন, সাঙ্খ্য-তত্ত্ব-কৌমুদী হইতেই তাহা সংগৃহীত হইয়াছিল। যাহা হউক, এখন সাঙ্খ্য-দর্শন নামে যে সকল গ্রন্থ প্রচলিত আছে, তাহাতে কপিলের মত-মাত্র ব্যক্ত হইয়াছে,—ইহাই অনুমান করা যাইতে পারে। নচেৎ, কপিলের মূল গ্রন্থ কি ছিল, কে অনুসন্ধান করিয়া পাইবে? মহর্ষি কপিলের আবির্ভাব-সম্বন্ধেই কত মতান্তর দেখিতে পাই। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে মহর্ষি কপিলকে ব্রহ্মার পুত্র বলিয়া উল্লেখ আছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় কপিল নামে এক সিদ্ধর্ষির পরিচয় পাওয়া যায়। রামায়ণে দেখিতে পাই,—সগর রাজার ষষ্টি-সহস্র পুত্র কপিলের কোপানলে ভস্মীভূত হইয়াছিল। মহাভারতে কপিলের ধর্ম্ম-তত্ত্ব বিবৃতির এক অভিনব উপাখ্যান আছে; তৎপ্রসঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়,—সূর্য্য-রশ্মি গো-দেহে প্রবেশ করিয়া কপিলের নিকট ধর্ম্ম-তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। শিব-সংহিতায় এক যোগিশ্রেষ্ঠ কপিলের বর্ণনা আছে। বৌদ্ধদিগের গ্রন্থে দৃষ্ট হয়,—ইক্ষ্বাকু-বংশীয় রাজা বিরোধক আপনার দ্বিতীয়া মহিষীর মনোরঞ্জনার্থ পরলোকগতা প্রথমা মহিষীর গর্ভজাত কুমার-চতুষ্টয়কে নির্ব্বাসিত করেন। পাঁচটী সহোদরা ভগ্নীর সহিত কুমারগণ কপিল মুনির আশ্রমে উপনীত হইয়াছিলেন। সেই কপিল মুনিই পরে গৌতম বুদ্ধরূপে আবির্ভূত হন। বুদ্ধদেবের জন্মভূমি কপিলাবস্তু-নগরী তাঁহারই নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত বিতথ-পুত্র কপিল এবং বসুদেব-পুত্র কপিল প্রভৃতি আরও নানা কপিলের পরিচয় পাওয়া যায়। ভাগবতের মতে,—সাঙ্খ্য-দর্শন-প্রণেতা কপিলের পিতার নাম—কর্দ্দম; তাঁহার মাতার নাম—দেবহূতি। ভাগবতে তিনি ভগবানের পঞ্চম অবতার বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। ভাগবতে লিখিত আছে,—"তাঁহার জন্ম-কালে আকাশে বাদ্যধ্বনি হইয়াছিল; পক্ষিগণ পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিল; অপ্সরা গন্ধর্ব্বগণের নৃত্যামোদে দিগ্দিগন্ত মুখরিত হইয়াছিল। স্বয়ং ব্রহ্মা, কর্দ্দমকে কহিয়াছিলেন,—তোমার এই পুত্র ঈশ্বরাবতার; সাঙ্খ্য-জ্ঞান প্রদানের নিমিত্ত ইনি সংসারে 'কপিল' নামে সম্পূজিত হইবেন।" তবে, ভাগবতে কপিলের যে মত উল্লিখিত হইয়াছে, সাঙ্খ্য-দর্শনে কপিলের সে মত দেখিতে পাওয়া যায় না। সেইজন্য, কেহ কেহ সাঙ্খ্য-দর্শনকার কপিল এবং ভাগবদোল্লিখিত কপিল—এতদুভয়কে অভিন্ন বলিয়া স্বীকার করেন না। যাহা হউক, সাঙ্খ্য-দর্শনকার কপিল অনেকের নিকট ভগবানের অবতার বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইতে । উদয়নাচার্য্যকৃত 'আত্ম-তত্ত্ব-বিবেক' গ্রন্থের টীকাকারগণ সেই মতই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মত—'আত্ম-তত্ত্ব-বিবেক' মঙ্গলাচরণে "পূর্ব্বগুরুত্তমায়" বাক্যে কপিল-কমলাসনাদি ঋষিগণকে বুঝাইয়া থাকে। সাঙ্খ্য-দর্শন-প্রণেতা কপিল যিনিই হউন, তাঁহার দর্শন-শাস্ত্র যে জগতের এক অমূল্য সম্পৎ,—তাঁহার দর্শন-শাস্ত্র যে জ্ঞান-গবেষণা-প্রতিভার এক প্রস্ফুট চিত্র,—তাহা বলাই বাহুল্য। মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত এবং পুরাণাদিতে সাঙ্খ্য-দর্শনের মত উদ্ধৃত হইয়াছে। স্বয়ং শঙ্করাচার্য্য সাঙ্খ্য-দর্শনকে প্রধান দর্শন

বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। সাঙ্খ্য-দর্শনের মত-খণ্ডন উপলক্ষে শঙ্করাচার্য্য 'ব্রহ্ম-সূত্রের' ভাষ্যে এই মর্ম্মে লিখিয়া গিয়াছেন,—"প্রধান মল্লকে পরাজিত করিতে পারিলে, মল্লদলের পরাজয় মানিয়া লইতে হয়। সাঙ্খ্য-দর্শনের মত খণ্ডন করায়, অন্যান্য দর্শনের মত খণ্ডন করা হইল,—ইহাই বুঝিতে হইবে।" সাঙ্খ্য-মত অবলম্বন করিয়া পরবর্ত্তি-কালে সাঙ্খ্য-কারিকা, সাঙ্খ্য-সার, সাঙ্খ্য-প্রদীপ, সাঙ্খ্য-তত্ত্ব-প্রদীপ, তত্ত্ব-সমাস, ভোজ-বার্ত্তিক প্রভৃতি বহু গ্রন্থ এবং সেই সকল গ্রন্থের ভাষ্য-টীকা প্রণীত হয়। কিন্তু কপিল-সূত্র বলিয়া যাহা প্রচলিত, সাঙ্খ্য-দর্শন বলিতে প্রধানতঃ তাহাই বুঝাইয়া থাকে। সাঙ্খ্যের মতে,—পঞ্চ-বিংশতি তত্ত্বের জ্ঞান-লাভই মুক্তি; আর, সেই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের সংখ্যা গণনা করা হইয়াছে বলিয়াই কপিল-প্রণীত দর্শন 'সাঙ্খ্য-দর্শন' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

সাঙ্খ্যের প্রতিপাদ্য।

সাঙ্খ্যদর্শনের মুখ্য প্রতিপাদ্য—দুঃখনিবৃত্তি। সাঙ্খ্যকারের মত,—"সংসার দুঃখময়; পুরুষার্থ দ্বারা সেই দুঃখ দূর হয়; জ্ঞানই পরম পুরুষার্থ।" এক কথায়, জ্ঞানলাভ হইলেই মানুষের দুঃখ দূর হইল;—মানুষ মুক্তিলাভ করিল;—ইহাই সাঙ্খ্য-কারের মীমাংসা। সাঙ্খ্যকার প্রথমেই তাই বলিয়াছেন,—"অথ ত্রিবিধ-দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ।" এই প্রথম সাঙ্খ্য-সূত্রের অর্থ,—"ত্রিবিধ দুঃখনিবৃত্তিই পুরুষার্থ।" কিন্তু এই ত্রিবিধ দুঃখ কি? সাঙ্খ্যকারের নির্দ্দেশ মতে, 'আধ্যাত্মিক', 'আধিদৈবিক' ও 'আধিভৌতিক'—দুঃখ এই ত্রিবিধ। আধ্যাত্মিক দুঃখ আবার দুই প্রকার,—শারীরিক ও মানসিক। বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মাদি পীড়াজনিত যে দুঃখ, তাহা শারীরিক দুঃখ; আর, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, ঈর্ষা, ভয়, শোক ইত্যাদি জনিত যে দুঃখ, তাহাই মানসিক দুঃখ। দেবতা হইতে অর্থাৎ বাত-বৃষ্টি-বজ্রপাতাদি দ্বারা যে দুঃখের উৎপত্তি, তাহা 'আধিদৈবিক দুঃখ'। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, বৃক্ষ প্রভৃতি হইতে যে দুঃখের উৎপত্তি, তাহাই 'আধিভৌতিক দুঃখ'। প্রোক্ত ত্রিবিধ দুঃখের যে অত্যন্ত-নিবৃত্তি, তাহাই পরম পুরুষার্থ। সেই পুরুষার্থ লাভ করিলেই আত্যন্তিক সুখ বা মোক্ষ-লাভ হয়। এই পুরুষার্থ কি প্রকারে সিদ্ধ হয়,—সাঙ্খ্যদর্শনে তাহারই আলোচনা হইয়াছে। সাঙ্খ্যের মতে, দুঃখের দুই অবস্থা; এক অবস্থা—স্থূল, অন্য অবস্থা—সূক্ষ্ম। সংসারের অনেক দুঃখ মনুষ্য চেষ্টা করিয়া নিবারণ করিতে পারে, সেই দুঃখ—স্থূল দুঃখ; যেমন, ক্ষুধার নিবৃত্তি অন্নাহারে, রোগের নিবৃত্তি ঔষধ সেবনে, ইত্যাদি। ইহাকে লৌকিক উপায়ে দুঃখ-নিবৃত্তি বলে। কিন্তু এরূপ দুঃখ-নিবৃত্তি যে অব্যর্থ আত্যন্তিক সুখপ্রদ, তাহা কোন-ক্রমেই বলা যায় না। প্রথমতঃ, ঔষধ-সেবনে রোগ-উপশমন-চেষ্টায়, কটু-তিক্ত-কষায় ঔষধের পরিবর্ত্তে সুস্বাদু ঔষধ প্রাপ্ত হইবার আকাঙ্ক্ষা হওয়ায়, আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি হইল বলা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, ঔষধ-সেবনে আপাততঃ রোগ-শান্তি হইলেও ভবিষ্যতে সে রোগের পুনরুৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং, লৌকিক চেষ্টায় আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি কদাচ সম্ভবপর নহে। বৈদিক যাগযজ্ঞাদিতে দুঃখ-নাশে সুখধাম স্বর্গলোক প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে; কিন্তু কর্ম্মানুসারে তাহারও ফলভোগ হইয়া থাকে। যাজ্ঞিকের জীব-হিংসা প্রভৃতি কর্ম্মের পরিণতি কখনই সুখপ্রদ হইতে পারে না,—সাঙ্খ্যের ইহাই মত।

ইহার উপর আবার সূক্ষ্ম দুঃখ আছে। যাহা সূক্ষ্ম দুঃখ, তাহা লৌকিক উপায়ে নিবৃত্ত হইবার নহে। তোমার পুত্র-শোক হইয়াছে, তুমি অন্য চিন্তায় মনোনিবেশ করিয়া সে শোক-নিবৃত্তির চেষ্টা পাইতে পার; কিন্তু একেবারে সে শোক বিস্মৃত হইতে পারিবে কি? এইরূপ, কোনও রোগে তোমার কোনও অঙ্গবিশেষ ব্যবচ্ছেদ করিতে হইয়াছে; রোগমুক্ত হইয়াও, তোমার সে অভাব—সে দুঃখের নিবৃত্তি হয় কি? ইহাই সূক্ষ্ম দুঃখ। আরও, বর্ত্তমানের দুঃখ আপাততঃ দূর করিতে পারিলেও, অনাগত ভবিষ্য-দুঃখ দূর করিবার সামর্থ্য তোমার নাই। সেই অনাগত অদৃষ্ট ভবিষ্য-দুঃখও— সূক্ষ্ম দুঃখ। পুরুষার্থ প্রভাবে এই সর্ব্ববিধ দুঃখ দূর হয়,—সাঙ্খ্যকার তাহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। সাঙ্খ্যের মতে,—ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির উপায়—জ্ঞান। জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ,—"জ্ঞানান্মুক্তি"—জ্ঞানই মুক্তির মূলীভূত। কিন্তু জ্ঞান কি বিষয়ে? কি বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিলে, পরম পুরুষার্থ লাভ হয়? সাঙ্খ্য বলেন,—প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদ-জ্ঞানই শুদ্ধ জ্ঞান বা মুক্তিলাভের মূলীভূত। এক্ষণে, প্রকৃতি ও পুরুষ কি,—সাঙ্খ্যকার কি ভাবে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার একটু আভাস দেওয়া প্রয়োজন। 'আমি' বলিলে প্রধানতঃ আমরা কি বুঝিয়া থাকি? আমার এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, আমার এই বাক্য, আমার এই পরিদৃশ্যমান্ দেহ,—'আমি' বলিতে ইহার কোন্‌টীকে বুঝাইবে? অথবা, ইহার অতিরিক্ত অন্য কিছু আছে,—যাহাকে 'আমি' বলিতে পারি? আমার শরীরে কোনও আঘাত লাগিলে, আমি বলি,—'লাগিয়াছে।' কাহারও নিকট অপমানিত বা লাঞ্ছিত হইয়া কষ্ট পাইলে, আমি বলি,—'কষ্ট পাইয়াছি।' আমার এতদুভয় অবস্থার বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে, বেশ বুঝিতে পারি,—আমার শরীর, আমার দেহ, আমার মন প্রভৃতি হইতে 'আমি' স্বতন্ত্র। সুখ-দুঃখাদির ভোগকর্ত্তা অথচ ইন্দ্রিয়গোচর নহি,—এই যে 'আমি', সাঙ্খ্যকারের মতে, ইহারই নাম 'পুরুষ'। মতান্তরে,—ইহারই নাম 'আত্মা।' এই পুরুষ বা আত্মা ভিন্ন অন্য যত কিছু, সাঙ্খ্যের মতে, 'প্রকৃতি' নামে অভিহিত। সত্ত্বরজস্তমঃ—এই তিন অবস্থার সাম্য-ভাবই মূল-প্রকৃতি। ঐ তিন অবস্থার বৈষম্য-ভাবকে 'বিকৃতি' কহে। যে বিকৃতি সুখকর, তাহা সত্ত্বপ্রধান; যে বিকৃতি দুঃখকর, তাহা রজঃপ্রধান; যে বিকৃতি মোহকর, তাহা তমঃপ্রধান। দুগ্ধই যেমন দধ্যাদির মূল; অর্থাৎ, যেমন দুগ্ধ হইতে দধি, দধি হইতে নবনী, নবনী হইতে ঘৃত উৎপন্ন হয়, প্রকৃতি সেইরূপ সর্ব্বকার্য্যের মূল। প্রকৃতির এই পরিবর্ত্তনের নাম—বিকৃতি। সাঙ্খ্যে অষ্ট-প্রকৃতি ও ষোড়শ বিকারের পরিচয় পাওয়া যায়। সেই অষ্ট-প্রকৃতি,—অব্যক্ত মূল-প্রকৃতি (অন্তঃকরণ বা মহত্তত্ত্ব), বুদ্ধি, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র (রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শ)। সেই ষোড়শ বিকার,—পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক), পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় (বাক, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ) এবং মন,—এই একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ-মহাভূতের সংমিশ্রণ। পঞ্চ-মহাভূত—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। অষ্ট-প্রকৃতি, ষোড়শ বিকার এবং পুরুষ,—ইহাই পঞ্চবিংশ তত্ত্ব বা পঞ্চবিংশ পদার্থ নামে অভিহিত। পুরুষ বা আত্মা—প্রকৃতি ও বিকৃতির অতীত। পুরুষ ও প্রকৃতি,—উভয়েই নিত্য, উভয়েই অব্যয়, উভয়েই অনাদি। প্রকৃতি হইতে

পুরুষ পর্য্যন্ত উল্লিখিত এই পঞ্চবিংশ পদার্থ এবং তাহার জ্ঞান-লাভই—তত্ত্বজ্ঞান-লাভ। সাঙ্খ্যকার পুরুষকে নিত্যসত্ত্বাদিগুণশূন্য কূটস্থ চৈতন্যরূপে বর্ণন করিয়াছেন। পুরুষ নির্লিপ্ত—প্রকৃতির সহিত তাঁহার কোনই সংশ্রব নাই। প্রকৃতির সংযোগে তাঁহার দুঃখের উৎপত্তি এবং প্রকৃতির সহিত বিচ্ছিন্নতাই তাঁহার দুঃখনিবৃত্তি বা মুক্তি। প্রকৃতি হইতে পুরুষ স্বতন্ত্র; পুরুষ সুখ-দুঃখ ও কর্ম্মকর্তৃত্বের অতীত। আর, প্রকৃতি—সর্ব্ব-বিকৃতির—সকল সুখ-দুঃখের মূলীভূত। কেবল নৈকট্য-বশতঃ প্রকৃতির সুখদুঃখাদি পুরুষে অধিগত হয়। যেমন স্ফটিক-সন্নিধানে জবাকুসুম রাখিলে, স্ফটিকে পুষ্পবর্ণের সমাবেশ হয়, প্রকৃতি-সন্নিহিত পুরুষে সেইরূপ সুখ-দুঃখাদি-বুদ্ধির আরোপ হইয়া থাকে। স্বচ্ছ দর্পণে কালিমা প্রতিবিম্বিত হইয়া দর্পণের স্বচ্ছতা যেরূপ বিমলিন করিয়া রাখে, জড়-জগতের সুখ দুঃখ-বিকৃতা প্রকৃতিও সেইরূপ পুরুষকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। উভয়ের মধ্যে ব্যবধান থাকিলেও, কাচ-পাত্রে নিপতিত ছায়ার ন্যায়, প্রকৃতি পুরুষের স্বচ্ছতা ঢাকিয়া রাখে। প্রকৃতির সেই ছায়া দূর করিতে পারিলেই পুরুষ আত্মতত্ত্ব বুঝিতে পারেন। সেই বুদ্ধির অবস্থাই—পুরুষার্থ-লাভ বা দুঃখ-নিবৃত্তি। এই দুঃখ-নিবৃত্তির বিষয়, দ্বিতীয় সূত্রে, সাঙ্খ্যকার আরও একটু বিশদীকৃত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"ন দৃষ্টাৎ তৎসিদ্ধির্নিবৃত্তেঽপ্যনুবৃত্তিদর্শনাৎ।" অর্থাৎ, কেবল দুঃখ-নিবৃত্তিই পুরুষার্থ নহে;—দুঃখোৎপত্তি-নিবৃত্তিই পুরুষার্থ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সাধারণ দুঃখ-নিবৃত্তির নানা উপায় আছে। শারীরিক দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা থাকিতে পারে; মানসিক দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য সুন্দরী স্ত্রী ও ধনৈশ্বর্য্যের অভাব না ঘটিতে পারে; আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য বৈদিক ক্রিয়া-কর্ম্ম এবং শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদির ব্যবস্থা হইতে পারে; এবং তাহাতে অনেকে মনে করিতেও পারেন,—"অর্কে চেন্মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেৎ। ইষ্টস্যার্থস্য সংসিদ্ধৌ কো বিদ্বান্ যত্নমাচরেৎ।" গৃহকোণে যদি মধু পাই, পর্ব্বতে যাওয়ার কি প্রয়োজন? ইষ্ট পদার্থ সহজপ্রাপ্য হইলে, কে বল, বৃথা পরিশ্রম করিতে যত্নবান হয়? দুঃখ-নিবৃত্তি হইলেই যদি পরম-পুরুষার্থ লাভ হইত, তবে আর ভাবনা রহিল কি? কিন্তু কেবল দুঃখ-নিবৃত্তিই তো মুক্তি নয়। সাঙ্খ্যকার প্রথম সূত্রে তাই ত্রিবিধ দুঃখ-নিবৃত্তির কথা বলিয়াই, দ্বিতীয় সূত্রে তাহা বিশদীকৃত করিয়া বলিয়াছেন,—"কেবল দুঃখ-নিবৃত্তি নহে, দুঃখোৎপত্তি-নিবৃত্তিই পুরুষার্থ;—দুঃখোৎপত্তি-নিবৃত্তি করিতে পারিলেই মুক্তি লাভ হইয়া থাকে।" এখন প্রশ্ন হইতে পারে,—সে দুঃখোৎপত্তি-নিবৃত্তির উপায় কি? সে উপায়ও—পূর্ব্বেই বলিয়াছি তো,—সাঙ্খ্যকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন, "জ্ঞানান্মুক্তিঃ।" জ্ঞান-লাভেই মুক্তি।

প্রকৃতি ও পুরুষের সম্বন্ধালোচনাই সাঙ্খ্য-দর্শনের মেরুদণ্ড-স্বরূপ। জাগতিক পদার্থ-সমূহকে পঞ্চবিংশতি ভাগে বিভক্ত করিয়া, তাহার আদি-পদার্থ প্রকৃতি এবং অন্ত্য-পদার্থ পুরুষ—এতদুভয়কে সাঙ্খ্যকার নিত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; আর মধ্যবর্ত্তী সমস্ত পদার্থই, সাঙ্খ্যের মতে, অনিত্য;—"প্রকৃতিপুরুষয়োরন্যৎ সর্ব্বমনিত্যম্।" প্রকৃতির পরিণামেই সেই অনিত্য পদার্থের উৎপত্তি হইয়া থাকে। প্রকৃতির সাম্যাবস্থার (সত্ত্ব, রজঃ, তমের সমভাবের) পরিণামে

সাঙ্খ্যমতে সৃষ্টিতত্ত্ব।

'মহত্তত্ত্ব।' সেই মহত্তত্ত্ব হইতে অহংজ্ঞান বা অহঙ্কারের উৎপত্তি। অহঙ্কারের ফলে পঞ্চতন্মাত্র,—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতির অস্তিত্ব অনুভূতি। এইরূপে প্রকৃতির বিকারে স্থূল-সূক্ষ্ম জগতের সৃষ্টি হইয়া থাকে। সৃষ্টিকালে প্রকৃতির গুণ পুরুষে, এবং পুরুষের গুণ প্রকৃতিতে ন্যস্ত হয়। তখন, প্রকৃতি অচেতন হইলেও, চেতনের ন্যায় প্রতিপন্ন হন; পুরুষের কর্তৃত্ব না থাকিলেও, পুরুষ কর্তার ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। দৃষ্টান্ত-স্থলে, সাঙ্খ্যকার বলিয়াছেন,—দর্পণে তেজ না থাকিলেও যেমন সূর্য্যের প্রতিবিম্বে দর্পণের তেজ প্রতীত হয়; সূর্য্যে মলিনতা বা চাঞ্চল্য না থাকিলেও দর্পণের মলিনতায় বা চাঞ্চল্যে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব যেরূপ মলিন বা চঞ্চল হইয়া থাকে; সেইরূপ চেতন-পুরুষ-সন্নিধানে প্রকৃতি চৈতন্যযুক্তা, এবং প্রকৃতি-প্রতিবিম্বিত পুরুষ কর্তৃত্ব-শূন্য হইয়াও কর্তৃত্বযুক্ত হন। ঈশ্বরকৃষ্ণাচার্য্য প্রকৃতি-পুরুষের সেই ভাব এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন,—

"পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য। পঙ্গ্বন্ধবদুভয়োরপি সংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ॥"

অন্ধ ও পঙ্গুর স্বতন্ত্রভাবে কোনও বিশেষ কার্য্য করিবার শক্তি নাই। কিন্তু উভয়ে মিলিত হইলে, অনেক কার্য্যই সম্পন্ন হয়। "অন্ধ পঙ্গুকে স্কন্ধে করিলে দর্শনশক্তিসম্পন্ন পঙ্গু এবং চলচ্ছক্তিসম্পন্ন অন্ধ মিলিয়া একটী অবিকলেন্দ্রিয় মানুষের কার্য্য করিতে পারে। সেইরূপ ক্রিয়াশক্তিহীন চেতন পুরুষ এবং ক্রিয়াশীল অচেতন প্রকৃতি উভয়ে মিলিত হইয়া এক ক্রিয়াশীল চেতন ব্যক্তির ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকেন। সেই কার্য্যই মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি।" ফলে, উভয়ের মিলনেই—সৃষ্টি বা কার্য্য। সৃষ্টিই—ভোগ। ভোগের পরই—বিচ্ছেদ বা মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। সেই মুক্তি বা কৈবল্য-লাভই—পুরুষের দুঃখনাশ। এ সম্বন্ধে সাঙ্খ্যের ভাষ্যকার গৌড়পাদ বলিয়াছেন,—"কার্য্যসিদ্ধি হইলে অন্ধ ও পঙ্গু যেমন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে; ভোগ বা সৃষ্টির পর, পুরুষ ও প্রকৃতি সেইরূপ বিচ্ছিন্ন হন। তাঁহাদের সেই বিচ্ছিত্তির অবস্থাই মোক্ষ বা কৈবল্য। জ্ঞানের উদয় হইলেই প্রকৃতি ও পুরুষের বিচ্ছেদ ঘটিয়া থাকে। পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের ভেদজ্ঞান-লাভই—সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তির অর্থাৎ মুক্তির উপায়।" এ হিসাবে, প্রকৃতি পুরুষের সংযোগই সৃষ্টির মূলীভূত; প্রকৃতি হইতেই সৃষ্ট সামগ্রী উৎপন্ন হয়, সৃষ্টিকর্ত্তা বা ঈশ্বরের কোনই আবশ্যক অনুভূত হয় না। সাঙ্খ্যকার তাই সৃষ্টিকর্ত্তা বা ঈশ্বরের কোনও অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। সাঙ্খ্যের মতে, বস্তু-মাত্রই 'সৎ' অর্থাৎ চির-বিদ্যমান আছে; আবির্ভাবেও বস্তুর সত্তা, তিরোভাবেও বস্তুর সত্তা প্রমাণিত হয়। ঘট পটাদির মূল যেরূপ মৃত্তিকা, সৃষ্টির মূল সেইরূপ প্রকৃতি। একটী ফল দেখিয়া যেমন বৃক্ষের কথা মনে পড়ে, বৃক্ষের কথা মনে পড়িলে যেমন বৃক্ষের মূলীভূত মূল-বীজের কথা মনে পড়ে; সেইরূপ প্রত্যেক বস্তুরই উৎপত্তির কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া যখন মূল কারণ অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না, তখন প্রকৃতিই সেই মূল-কারণ বা মূল-প্রকৃতি নামে অভিহিত হন। ডিম্ব হইতে বহির্গত হইবার পূর্ব্বে, অণ্ডজাদির পরিচয় পাওয়া যেমন সম্ভবপর নহে; উৎপত্তির পূর্ব্বে অণ্ড-মধ্যে অণ্ডজ যেমন অব্যক্ত অবস্থায় অবস্থিতি করে;—প্রকৃতির মধ্যে সৃষ্ট-পদার্থও সেইভাবে অবস্থিত আছে। সাঙ্খ্যের মতে, সৃষ্টিকর্ত্তা কেহই নাই; প্রকৃতি হইতেই সংসার উৎপন্ন হইয়াছে।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব-সম্বন্ধেই সাঙ্খ্যকার সন্দিহান। তাঁহার মতে "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ", অর্থাৎ ঈশ্বর অসিদ্ধ। বলা বাহুল্য, এই জন্ত সাঙ্খ্যকারকে অনেকে নিরীশ্বরবাদী এবং সাঙ্খ্য-দর্শনকে নিরীশ্বরবাদপূর্ণ বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। সাঙ্খ্য বলেন, ঈশ্বর যদি থাকিতেন, তিনি যদি সৃষ্টিকর্ত্তা হইতেন, তাহা হইলে, হয় তিনি মুক্ত—নয় তিনি বদ্ধ;—ইহার একতর হইবেনই হইবেন।

সাঙ্খ্যমতে ঈশ্বর অসিদ্ধ।

মুক্ত হইলে, রাগাদি প্রবৃত্তির অভাব-প্রযুক্ত তাঁহার ক্রিয়ারাহিত্য ঘটিয়া থাকে। যিনি ক্রিয়াহীন তিনি আবার সৃষ্টিকর্ত্তা হইবেন কিরূপে? যদি তিনি বদ্ধ হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার অপরিচ্ছিন্ন অসীম শক্তির কল্পনা কখনই করা যাইতে পারে না। সাঙ্খ্যসূত্রের পঞ্চম অধ্যায়ে এই সম্বন্ধে কয়েকটী সূত্র আছে। সেই সূত্র কয়েকটীর মর্ম্ম,—"কেবলমাত্র ঈশ্বরের অধিষ্ঠান দ্বারা ফলনিষ্পত্তি হয় না। আবশ্যকানুরূপ কর্ম্ম দ্বারাই ফলনিষ্পত্তি হইয়া থাকে। যদি কার্য্যশক্তি বা অভিপ্রায় থাকে, তাহা হইলে ঈশ্বর সাংসারিক মনুষ্যের মধ্যে পরিগণিত হন। সেরূপ কল্পনা পরিভাষা মাত্র। রাগ বা উৎকট ইচ্ছা ভিন্ন সৃষ্টি সম্ভবপর নহে; কিন্তু তাহাতে মুক্তত্বের অসদ্ভাব প্রতিপন্ন হয়। ঈশ্বরের যদি রাগ বা উৎকট ইচ্ছাই থাকিল, তাহা হইলে তিনি তো মানুষের ন্যায় বিষয়ী হইয়া দাঁড়াইলেন! তার পর সত্তা আছে বলিয়াই তিনি যদি ঈশ্বর হন, তাহা হইলে সকল পদার্থকেই তো ঈশ্বর বলিতে হয়! সুতরাং প্রমাণাভাবে ঈশ্বর সিদ্ধ হইল না।" সাঙ্খ্যকার তাই উচ্চকণ্ঠে কহিলেন,—"প্রমাণাভাবান্নতৎসিদ্ধিঃ।" প্রত্যক্ষ প্রমাণ তো নাই-ই; অনুমান প্রমাণেও ঈশ্বর সম্ভবে না,—যেহেতু তাঁহার সহিত সম্বন্ধাভাব। শব্দ-প্রমাণেও তিনি প্রতিপন্ন হন না; যেহেতু, শ্রুতিও প্রকৃতির কার্য্য। সাঙ্খ্য যে প্রমাণের কথা বলিলেন, তাঁহার মতে সেই প্রমাণ—ত্রিবিধ;—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ। বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইতে যে অধ্যবসায় (বুদ্ধিবৃত্তিবিশেষ) হয়, তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ; ব্যাপ্যব্যাপক ভাব ও পক্ষধর্ম্মতা জ্ঞান জন্ত যে বুদ্ধিবৃত্তি, তাহা অনুমান প্রমাণ; এবং আপ্তবাক্য জন্য বাক্যার্থ-জ্ঞান—শব্দ-প্রমাণ। অনেকে বলেন,—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা উপলব্ধি হয়, তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কিন্তু সাঙ্খ্যাচার্য্যগণ তাহাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলেন না। তাঁহাদের মতে,—ইন্দ্রিয় সময়ে সময়ে ভ্রান্ত হইতে পারে; শুভ্র কুসুম-ভ্রমে কার্পাস আহরণে প্রবৃত্ত হওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব নহে। সুতরাং কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানকে কখনও প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলা যাইতে পারে না। ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা উপলব্ধি হয়, বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা তাহা পরিগৃহীত হইলে,—তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বতঃসিদ্ধ; তাহার আর কখনও প্রমাণের আবশ্যক নাই; তাহা কখনও প্রমাণ এবং কখনও অপ্রমাণ হয় না। অনুমান প্রমাণও বুদ্ধিবৃত্তিবিশেষ। ব্যাপ্যব্যাপক ভাব অর্থে—স্বাভাবিক সম্বন্ধ। কার্য্য-কারণ-সহচর প্রভৃতি দর্শনে অনুমান-প্রমাণ-জ্ঞান লাভ হয়। যেমন, অশ্রুপাত দর্শনে ক্লেশাদির অনুমান; নীলবর্ণ মেঘ-দর্শনে বৃষ্টির অনুমান, ধূম দর্শনে অগ্নির অনুমান, ইত্যাদি। সম্বন্ধই অনুমান-প্রমাণের মূলীভূত। ধূম দেখিয়া অগ্নির অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয়; যেহেতু, যেখানেই ধূম দেখিয়া থাকি, সেখানেই অগ্নির সম্বন্ধ দেখিতে পাই; আপন প্রপিতামহ, বৃদ্ধপ্রপিতামহ প্রভৃতিকে

অনেকেই হয় তো দেখেন নাই; অথচ তাঁহাদের সম্বন্ধ প্রমাণিত হয়। তাহা অনুমান প্রমাণ। শ্রবণেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, অথচ ভ্রমপ্রমাদাদি পরিশূন্য শব্দই,—শব্দ-প্রমাণ। শব্দের দ্বারা শব্দকর্ত্তার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয়। সেই শব্দ যদি প্রমাদশূন্য হয়, তাহাই শব্দ-প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। আপ্তবাক্য বেদাদি,—এই শব্দ-প্রমাণ। এই তিনটী প্রমাণ ভিন্ন সাঙ্খ্যকার অন্য প্রমাণ স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে, এই তিন প্রমাণই আবার পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত; প্রত্যক্ষ প্রমাণ—সর্ব্ব-মূলাধার; অনুমান ও শব্দপ্রমাণ তাহার অন্তর্ভুক্ত। পূর্ব্বে কোনও বস্তু দেখা থাকিলে বা পূর্ব্বে কোনও শব্দ শুনা থাকিলে, পরে সেইরূপ কোনও বস্তু দেখিলে বা সেইরূপ কোনও শব্দ শুনিলে, তত্তদ্বিষয়ের যে জ্ঞান, এক হিসাবে, তাহাই অনুমান জ্ঞান। সুতরাং অনুমান-জ্ঞানের সহিত প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের সম্বন্ধ অনিবার্য্য। শব্দজ্ঞান-সম্বন্ধেও ঐ একই কথা বলা যাইতে পারে। যাহা হউক, এই ত্রিবিধ প্রমাণের বিষয় আলোচনা করিয়া, তদ্দ্বারা যে ঈশ্বর সিদ্ধ হইতে পারে না, সাঙ্খ্যকার তাহাই দেখাইয়াছেন। তাঁহার মতে,—প্রত্যক্ষ প্রমাণে ঈশ্বরের সত্তা তো খুঁজিয়াই পাওয়া যায় না; পরন্তু "সম্বন্ধাভাবান্নানুমানম্", অর্থাৎ সম্বন্ধাভাব-নিবন্ধন অনুমান প্রমাণেরও অভাব; "শ্রুতিরপি প্রধানকার্য্যত্বস্য" অর্থাৎ শ্রুতিও প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্থলে তিনি বলিয়াছেন,—যেমন অঙ্কুরাদি। তিনি আরও বলেন,—ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিতে গেলে, ঈশ্বরের পক্ষপাতিত্ব দোষ আসিয়া পড়ে। একজনকে সুখী, আর একজনকে দুঃখী করা,—নিরপেক্ষ ঈশ্বরের কর্ত্তব্য কি? অপিচ, অচেতন প্রকৃতিতে সৃষ্টি-প্রবৃত্তি অসম্ভব নহে। অয়স্কান্তমণি লৌহ আকর্ষণ করে; মণি অচেতন হইলেও, এ আকর্ষণ-প্রবৃত্তি—তাহার স্বভাব-ধর্ম্ম। এই সকল নানা কারণে, সাঙ্খ্যকারকে অনেকে নিরীশ্বরবাদী বলেন।

কিন্তু অপর পক্ষ বলেন,—"সাঙ্খ্যকার কপিল নিরীশ্বরবাদী নহেন। 'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ' এই সূত্র দ্বারাই প্রতিপন্ন হয়, তিনি ঈশ্বর স্বীকার করিতেন। যদি তিনি ঈশ্বর স্বীকার না করিতেন, তাহা হইলে 'ঈশ্বরাভাবাৎ' ইত্যাকার কোনও সূত্র রচনা করিতে পারিতেন। কিন্তু 'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ' এই সূত্র রচনা দ্বারা প্রতিপন্ন হয়,—তিনি বলিয়াছেন, ঈশ্বর সিদ্ধ করা যায় না বটে, কিন্তু ঈশ্বর আছেন।" সাঙ্খ্য-প্রবচন-ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু নানারূপ যুক্তি-তর্ক দ্বারা এই তত্ত্বই প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। সাঙ্খ্যদর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের সপ্তপঞ্চাশৎ ও ষট্পঞ্চাশৎ সূত্রে "ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা এবং "স হি সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তা" এই দুই বাক্য আছে দেখিয়াও কেহ কেহ সাঙ্খ্যকারকে আস্তিক বলিয়া মান্য করেন; অপিচ, সাঙ্খ্যকার বেদ মানিতেন,—এজন্যও তিনি আস্তিক-সংজ্ঞায় অভিহিত। কিন্তু প্রতিপক্ষগণ এ বিষয়েও ঘোর আপত্তি করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন,—"ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা" প্রভৃতি বাক্য ঈশ্বর-সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয় নাই; উহা মুক্ত-পুরুষের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। কপিল বলিয়াছেন,—জ্ঞান ভিন্ন মুক্তি নাই, যজ্ঞাদি পুণ্যানুষ্ঠানে পুনর্জন্ম ও জরামরণাদি আছে; জলমগ্নের পুনরুত্থানের ন্যায়, তাহাতে পুরুষের পুনরুত্থান ঘটিয়া থাকে। সেরূপ পুরুষকে ঈশ্বর বলিলে বলিতে পার;—কপিলের "ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা" প্রভৃতি বাক্যের অর্থ এই মাত্র। আরও কপিল

কপিলের নিরীশ্বরবাদ।

যে বেদ মানিতেন,—সে কেবল লৌকিকতার ভয়ে। বেদ না মানিলে নাস্তিক বলিয়া অবজ্ঞাত হইতে হইবে, বেদ-বিরোধী হইলে সমাজ-চ্যুতি ঘটিবে,—এই সকল কারণেই তিনি বেদ-বিষয়ে কোনও বিতর্ক উপস্থিত করেন নাই। তবে তিনি যে বলিয়াছেন,—'বেদ পৌরুষেয়ও নহে, অপৌরুষেয়ও নহে; বেদ আপনাপনিই প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে';—তাহাতে তিনি যে অন্তরে বেদ মানিতেন না, কেবল মৌখিক বেদ-ভক্তি প্রকাশ করিতেন,—ইহাই বুঝা যায়। কপিলের মতে,—পুরুষ বা আত্মাও এক নহেন। তিনি বলেন,—শরীর-ভেদে নানা পুরুষ, নানা আত্মা। যদি এক পুরুষই সকল শরীরের অধিষ্ঠাতা হইতেন তাহা হইলে একের সুখ-দুঃখে বা একের জন্ম-মৃত্যুতে অপরের সুখ-দুঃখ বা জন্ম-মৃত্যু ঘটিত না কি? কিন্তু যখন জনন-মরণ সুখ-দুঃখের তারতম্য দেখিতে পাই, তখন কোনক্রমেই পুরুষ বা আত্মাকে এক বলিতে পারা যায় না। বলা বাহুল্য, এই ক্ষেত্রে উপনিষদের সহিত কপিলের মতভেদ ঘটিয়াছে। উপনিষৎ পরমাত্মার সর্ব্বব্যাপকত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন; সাঙ্খ্যকার তাহার পার্থক্য-সাধনে প্রয়াসী হইয়াছেন। পঞ্চবিংশ তত্ত্বের আলোচনায়, মহর্ষি কপিল, সৃষ্টির হেতু, সৃষ্টির ক্রম, শরীরের স্থূল-সূক্ষ্ম ভেদ এবং স্বর্গ ও নরক প্রভৃতির তত্ত্ব-কথা আলোচনা করিতেও ত্রুটি করেন নাই। শরীর-সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন,—স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে শরীর দ্বিবিধ। মাতা পিতা হইতে যে শরীরের উৎপত্তি, সেই শরীরই স্থূল শরীর; সে শরীরের, হয় মাটিতে, নয় অগ্নিতে, নয় পশু-পক্ষীর উদরে পরিসমাপ্তি হয়। অদৃষ্ট-ভোগের জন্যই সে শরীরের উৎপত্তি। অদৃষ্টভোগের অবসান হইলেই সে শরীরের ধ্বংস-প্রাপ্তি। সূক্ষ্ম-শরীর বা লিঙ্গ-শরীর অর্থে—আত্মা বলিয়া বুঝা যাইতে পারে। কর্ম্ম-অনুসারে সূক্ষ্ম শরীরের ভোগাভোগ ঘটিয়া থাকে। স্বর্গ-নরক-সম্বন্ধে সাঙ্খ্যের মত—উর্দ্ধগমন স্বর্গ-গমন, আর অধোগতি নরক-গমন। ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের ফলে এই স্বর্গ ও নরক-প্রাপ্তি ঘটে। জ্ঞানের ফল—মুক্তি; অজ্ঞানের ফল—বন্ধন। তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারে অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষের ভেদ-জ্ঞান উপস্থিত হইলে, ধর্ম্মাধর্ম্ম অর্থাৎ ভোগাদি কারণ লোপ পায়। ভোগাদি অবশিষ্ট না থাকিলেই,—কৃতার্থতা। সেই কৃতার্থতাই কৈবল্য বা নির্ব্বাণ-মুক্তি। সাঙ্খ্যদর্শনের এই নির্ব্বাণ-মুক্তিই, অনেকে মনে করেন, বৌদ্ধ-দর্শনের মূল-ভিত্তি। এই নির্ব্বাণ-মুক্তির স্বরূপ—আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি। মূলে এই দুঃখ-নিবৃত্তি বা নির্ব্বাণ-মুক্তি সাঙ্খ্যের প্রতিপাদ্য হইলেও, সাঙ্খ্য-সূত্র-সমূহের অর্থ নানা জনে নানা ভাবে গ্রহণ করায়, উহা হইতে নানা মতের উৎপত্তি হইয়াছে। যে সাঙ্খ্যের নিঃশ্রেয়স অবলম্বনে বৌদ্ধগণ নির্ব্বাণ-মুক্তি-তত্ত্ব গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া অনেকে অনুমান করেন; সেই সাঙ্খ্যের প্রকৃতি-পুরুষ অবলম্বন করিয়া এ দেশে তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের পরিপুষ্টি হইয়াছে,—এ সিদ্ধান্তেও অনেকে উপনীত হইয়াছেন। যাহার যেমন চিন্তা, যাহার যেমন শিক্ষা, তাহার চিত্তে সেইরূপ চিত্রই প্রতিফলিত হইয়া থাকে। মূল বেদ-বিষয়েই যখন নানা জনের চিত্তে নানা চিত্র প্রতিভাত, তখন দর্শনাদি সম্বন্ধে সেরূপ ঘটিবে,—তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

নবম পরিচ্ছেদ।

বৈশেষিক দর্শন।

[কণাদ ও বৈশেষিক দর্শন,—কণাদের প্রকৃত নাম উলুক,—বৈশেষিক দর্শনের ও তাহার ভাষ্যকারগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়;—বৈশেষিক দর্শনের প্রতিপাদ্য,—নিঃশ্রেয়স বা আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তিই ধর্ম্ম,—পদার্থ-তত্ত্ব-বিচার-প্রসঙ্গে পদার্থাদির পরিচয় ও সংজ্ঞা-নির্দ্দেশ;—পরমাণুবাদ-তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা,—পরমাণু-সমষ্টিতেই সৃষ্টি;—বৈশেষিকের মতে দেহান্তর-গ্রহণ অদৃষ্ট-সাপেক্ষ,—প্রমাণ দ্বিবিধ,—কণাদের বেদ ও ঈশ্বর-স্বীকার সম্বন্ধে বাদানুবাদ,—শঙ্করাচার্য্য কর্তৃক কণাদের পরমাণুবাদ-তত্ত্ব খণ্ডন।]

কণাদ ও বৈশেষিক দর্শন।

ষড়্‌দর্শনের মধ্যে বৈশেষিক দর্শনও—এক প্রধান দর্শন-শাস্ত্র। অনেকে বিশ্বাস করেন, সাঙ্খ্য-দর্শনের পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথমে বৈশেষিক দর্শন প্রণীত হইয়াছিল। মহর্ষি কণাদ বৈশেষিক দর্শনের প্রবর্ত্তক। তণ্ডুল-কণামাত্র ভক্ষণ করিয়া, ইনি দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনা করেন, এবং সেই আরাধনার ফলে জগতের অমূল্য সম্পৎ এই বৈশেষিক দর্শন শাস্ত্র প্রাপ্ত হন। তণ্ডুল-কণা ভক্ষণ করিয়া উপাসনা করিয়াছিলেন বলিয়া ইঁহার নাম হইয়াছিল,—কণাদ, কণভক্ষ, কণভূজ, ইত্যাদি। কণাদের প্রকৃত নাম—উলুক; সেইজন্য ইঁহার দর্শন কখনও কখনও 'ঔলূক্য দর্শন' নামে অভিহিত হয়। মহর্ষি উলুক কশ্যপ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন; এইজন্য ইনি কাশ্যপ নামেও পরিচিত। 'বিশেষ' নামে এক অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকার করায়, ইঁহার দর্শন-শাস্ত্রের নাম—'বৈশেষিক দর্শন।' বৈশেষিক দর্শনে বৌদ্ধ-মতের উল্লেখ নাই, পরন্তু মহাভারতাদিতে বৈশেষিক দর্শনের আলোচনা আছে,—এই জন্য আধুনিক পণ্ডিতগণ বৈশেষিক দর্শনকে তিন সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বের রচিত দর্শন বলিতে কুণ্ঠিত নহেন। বৈশেষিক সূত্রের মতাবলম্বন করিয়া পরবর্ত্তি-কালে বহুতর ভাষ্যগ্রন্থ বিরচিত হয়। অনেক ভাষ্যই এখন বিলুপ্তপ্রায়। প্রশস্তপাদাচার্য্য 'পদার্থ-ধর্ম্ম-সংগ্রহ' নামে বৈশেষিক দর্শনের যে ভাষ্য প্রণয়ন করেন, সেই ভাষ্য এবং শঙ্কর মিশ্র প্রণীত 'বৈশেষিক সূত্রোপস্কার' ভাষ্য বিশেষ প্রসিদ্ধ। পদার্থ-ধর্ম্মসংগ্রহের উপর শ্রীধরাচার্য্য 'ন্যায়কন্দলী' টীকা এবং উদয়নাচার্য্য 'কিরণাবলী' টীকা প্রণয়ন করেন। শঙ্করমিশ্র প্রণীত 'উপস্কার' নাম্নী টীকা এখন বিশেষ সমাদৃত; গবর্ণমেণ্টের উপাধি-পরীক্ষাদিতেও এখন সেই টীকাই পাঠ্যভুক্ত। বৈশেষিক দর্শনে দশটী অধ্যায় আছে। প্রত্যেক অধ্যায় আহ্নিক নামক দুইটী করিয়া পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে, প্রথম আহ্নিকের সূত্র-সংখ্যা একত্রিশটী এবং দ্বিতীয় আহ্নিকের সূত্রসংখ্যা সতেরটী। দ্বিতীয় অধ্যায়ে, প্রথম আহ্নিকের সূত্র-সংখ্যা একত্রিশটী এবং দ্বিতীয় আহ্নিকের সূত্রসংখ্যা সাঁইত্রিশটী। তৃতীয় অধ্যায়ে, প্রথম আহ্নিকের সূত্রসংখ্যা উনিশটী এবং দ্বিতীয় আহ্নিকের একুশটী। চতুর্থ অধ্যায়ে, প্রথম আহ্নিকের সূত্রসংখ্যা তেরটী এবং দ্বিতীয় আহ্নিকের এগারটী। পঞ্চম অধ্যায়ে, প্রথম আহ্নিকের সূত্র-সংখ্যা আঠারটী এবং দ্বিতীয় আহ্নিকের ছাব্বিশটী। ষষ্ঠ অধ্যায়ে, প্রথম আহ্নিকের সূত্রসংখ্যা

ষোলটী এবং দ্বিতীয় আহ্নিকেরও ষোলটী। সপ্তম অধ্যায়ে, প্রথম আহ্নিকের পঁচিশটী এবং দ্বিতীয় আহ্নিকের আটাইশটি। অষ্টম অধ্যায়ে, প্রথম আহ্নিকে এগারটি ও দ্বিতীয় আহ্নিকে ছয়টি। নবম অধ্যায়ে, প্রথম আহ্নিকে পনেরটি এবং দ্বিতীয় আহ্নিকে তেরটী। দশম অধ্যায়ে, প্রথম আহ্নিকে সাতটি এবং দ্বিতীয় আহ্নিকে নয়টী। বৈশেষিক দর্শনের মোট সূত্রসংখ্যা তিন শত সত্তরটী। বৈশেষিক দর্শনের প্রথম অধ্যায়ে দ্রব্যাদি সপ্ত পদার্থ এবং সেই সপ্ত পদার্থের গুণ, লক্ষণ, সত্ত্বা ও ধর্ম্মাদির বিষয় আলোচনা হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে, দ্রব্যতত্ত্ব আলোচনায়, পৃথিবীর, জলের, তেজের, বায়ুর লক্ষণাদি এবং প্রমাণাদি-বিষয় বিশদ-রূপে বর্ণিত আছে। তৃতীয় অধ্যায়ে, আত্মা ও অন্তঃকরণের বিষয় এবং তাহাদের মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ বিদ্যমান, তাহারই আলোচনা হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে, পরমাণুর মূল কারণ এবং শরীর ও দ্রব্য-তত্ত্বের সম্বন্ধ নিরূপিত আছে। পঞ্চম অধ্যায়ে, কর্ম্মবিচার ও কর্ম্ম-পরম্পরার (ভূমিকম্প, বৃষ্টিপাত প্রভৃতির) হেতু-নির্দ্দেশ হইয়াছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে, বৈদিক ধর্ম্মের আলোচনা, কর্ম্মফল-কথা ; সপ্তম অধ্যায়ে, গুণ ও সমবায়-বিচার ; অষ্টম অধ্যায়ে, জ্ঞান-প্রকরণ, প্রত্যক্ষের হেতু-নির্দ্দেশ এবং ইন্দ্রিয়াদির উৎপত্তি-বিচার ; নবম অধ্যায়ে, অভাব, ভ্রম, অবিদ্যা প্রভৃতির আলোচনা ও 'বিশেষ' পদার্থ নির্ণয় ; এবং দশম অধ্যায়ে সুখ-দুঃখের ভেদাভেদ-বিষয়ক জ্ঞান-সম্বন্ধে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

বৈশেষিক দর্শনেরও প্রতিপাদ্য—আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি। দর্শনকার প্রথমেই "অথাতো ধর্ম্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ"—অনন্তর ধর্ম্মব্যাখ্যা করিব, এই বলিয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন।

বৈশেষিকের প্রতিপাদ্য।

তার পরই দ্বিতীয় সূত্রে তিনি বলিয়াছেন,—"যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ।" অর্থাৎ, যদ্দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়,এবং যাহা আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তির বা মোক্ষ-লাভের হেতু-ভূত—তাহাই ধর্ম্ম। সাঙ্খ্যও বলিয়াছিলেন,—তত্ত্বজ্ঞান হইলেই নিঃশ্রেয়স (আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি) বা মুক্তি লাভ হয়। বৈশেষিকও বলিলেন,—তত্ত্বজ্ঞানই নিঃশ্রেয়স বা মোক্ষের মূল, তত্ত্বজ্ঞান-লাভই ধর্ম্ম। এক হিসাবে, সাঙ্খ্যেও যাহা দেখিয়াছি, বৈশেষিকেও তাহাই দেখিতে পাই। তবে পার্থক্য এই,—পদার্থ ও প্রমাণ-সম্বন্ধে বৈশেষিক ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছেন। মহর্ষি কণাদের মতে পদার্থ দ্বিবিধ,—ভাব পদার্থ ও অভাব পদার্থ। ভাব পদার্থ ছয়টী,—দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ এবং সমবায়। ভাবের অভাবই—অভাব পদার্থ, সুতরাং অভাব পদার্থ—একমাত্র। ষড়বিধ ভাব-পদার্থের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য প্রদর্শন-পূর্ব্বক নিঃশ্রেয়স-লাভের উপায়-নির্দ্দেশই—বৈশেষিক দর্শনের উদ্দেশ্য। সাধর্ম্ম্য অর্থে—সাধারণ ধর্ম্ম ; যেমন,—পৃথিবী, জল ইত্যাদি দ্রব্যের সাধর্ম্ম্য—'দ্রব্যত্ব'। দ্রব্যের বৈধর্ম্ম্য—গুণত্ব ; যেহেতু, দ্রব্যের গুণত্ব দৃষ্ট নহে। এইরূপ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে, গুণের বৈধর্ম্ম্য—দ্রব্যত্ব, দ্রব্যের বৈধর্ম্ম্য—কর্ম্মত্ব ইত্যাদি বিষয় বুঝিতে পারা যায়। বৈশেষিক মতে, দ্রব্য নয়টী,—ক্ষিতি, অপ্, তেজ্, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মন ; গুণ-পদার্থের সংখ্যা চব্বিশটী,—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন প্রভৃতি সতেরটী এবং ভাষ্যকার প্রশস্তপাদের

মতে, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও শব্দ এই সাতটী। কর্ম্মপদার্থ পাঁচটী,—উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ এবং গমন। সামান্য অর্থে—জাতি। উহা দুই প্রকার,—সামান্য বা সাধারণ জাতি, এবং বিশেষ জাতি। ঐ দুই জাতি 'পরা' এবং 'অপরা' নামেও অভিহিত হয়। প্রাণিত্ব বলিতে সাধারণ জাতিত্ব বুঝায়। মনুষ্যত্ব, পশুত্ব বলিতে বিশেষ জাতি বুঝাইয়া থাকে। বিশেষ পদার্থ—একটী; তাহাই পরমাণুর বিশেষত্ব। পরমাণুর সমষ্টিতে পৃথিবী গঠিত, এবং সমান পরমাণু হইতে বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপত্তি হইতেছে। সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, কোন্ পরমাণুর মধ্যে কোন্ অবয়ব নিহিত আছে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না; কিন্তু এক এক পরমাণু হইতে এক এক জাতীয় দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে,—ইহা আমরা দেখিতে পাই। তাহার কারণ—মহর্ষি কণাদের মতে—বিশেষ পদার্থ। যে পরমাণুতে ধান্যোৎপত্তি হয় এবং যে পরমাণুতে বৃক্ষের উৎপত্তি হয়,—উভয়ের মধ্যে যে বিশেষত্ব, তাহাই বিশেষ পদার্থ। একই পৃথিবীতে, দৃশ্যতঃ একই পরমাণু-রূপে বিরাজমান থাকিয়া, বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপত্তি হয়। যে কারণে ঐরূপ ঘটিয়া থাকে, বৈশেষিক দর্শনের তাহাই বিশেষ পদার্থ। এই পদার্থের বিশ্লেষণ-হেতুই কণাদের দর্শন 'বৈশেষিক দর্শন' নামে অভিহিত। সমবায় অর্থে—নিত্য সম্বন্ধ। ঘটের সহিত মৃত্তিকার, তন্তুর সহিত বস্ত্রের, জাতির সহিত ব্যক্তির যে নিত্য-সম্বন্ধ বিদ্যমান,—তাহাই সমবায়। অভাব পদার্থের—প্রধানতঃ দুই ভাব;—সংসর্গাভাব ও অন্যোন্যাভাব। সংসর্গাভাব আবার ত্রিবিধ;—ধ্বংসাভাব, প্রাগ্ভাব, অত্যন্তাভাব। স্থূলতঃ, ভাবের অভাবকে অভাব বলা হইয়াছে,—যেমন, আলোকের অভাব অন্ধকার। ঘট ছিল, চূর্ণ হইয়া গিয়াছে; দেহ ছিল, ভস্মসাৎ হইয়াছে;—তাহাই ধ্বংসাভাব। যেমন,—মৃত্তিকা আছে, ঘট প্রস্তুত হইবে; সূত্র আছে, বস্ত্র প্রস্তুত হইবে;—এস্থলে, মৃত্তিকা ও সূত্র, ঘট ও বস্ত্রের প্রাগ্ভাব। অত্যন্তাভাব অর্থে,—একে অন্যের একান্তাভাব; যেমন, জড় দেহে চৈতন্যাভাব। ঐ স্থানে ঘট নাই বলিলে, ঘটের প্রাগ্ভাব বা ধ্বংসাভাব কিছুই সূচিত হয় না, সুতরাং, তাহার অত্যন্তাভাব বুঝিতে হইবে। অন্যোন্যাভাব অর্থে—একে অন্যের অভাব; যেমন, ঘটে পটের অভাব, পটে ঘটের অভাব, সিংহে শৃগালের অভাব, আবার শৃগালে সিংহের অভাব, ইত্যাদি। বৈশেষিক দর্শনে প্রধানতঃ উল্লিখিত সপ্ত-পদার্থের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়া, পরি-শেষে তত্তৎপদার্থান্তর্গত বিভাগ-সমূহেরও সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ক্ষিতি বলিতে, জল বলিতে, তেজ বলিতে, অথবা উৎক্ষেপণ আকুঞ্চন প্রভৃতি বলিতেই বা কি বুঝায়, মহর্ষি কণাদ আপন সূত্রে তাহারও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সে হিসাবে, পৃথিবীর লক্ষণ, জলের লক্ষণ, তেজের লক্ষণ, বায়ুর লক্ষণ, গুণের লক্ষণ, কর্ম্মের লক্ষণ,—সকল লক্ষণই সংজ্ঞাকারে নিবদ্ধ আছে। পৃথিবী কি?—বুঝাইবার জন্য তিনি বলিয়াছেন,—"রূপরসগন্ধস্পর্শবতী পৃথিবী।" অর্থাৎ, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ যাহাতে আছে,—তাহাই পৃথিবী। 'জল' পদার্থ বুঝাইবার জন্য তিনি বলিয়াছেন,—"রূপরসস্পর্শবত্য আপো দ্রবাঃ স্নিগ্ধাঃ।" অর্থাৎ, যাহাতে রূপ, রস, স্পর্শ আছে, যাহা দ্রব ও স্নিগ্ধ, তাহাই জল। "তেজো রূপস্পর্শবৎ",—অর্থাৎ যাহাতে রূপ ও স্পর্শ আছে, তাহা তেজ; "স্পর্শবান্ বায়ু",—অর্থাৎ যাহাতে স্পর্শ আছে,

তাহা বায়ু; "ত্ব আকাশে ন বিদ্যন্তে",—অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, যাহাতে নাই, তাহাই আকাশ। এইরূপে প্রত্যেক পদার্থের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়া, তত্তৎপদার্থের কারণ-পরম্পরা অনুসন্ধানের পর, মহর্ষি কণাদ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন,—"সদকারণবন্নিত্যম্"; অর্থাৎ, সৎপদার্থের মধ্যে যাহা কারণবৎ নহে অর্থাৎ যাহার কারণ নাই, তাহা নিত্য। সে হিসাবে, একমাত্র পরমাণুই—সৎ-পদার্থ, নিত্য; তাহার আর কারণ নাই। স্থূলতঃ, পরমাণুবাদ-তত্ত্ব কণাদের দর্শন-সূত্রে প্রচারিত। তাঁহার মতে,—"ইহ-সংসার পরমাণু-সংযোগে উৎপন্ন হইয়াছে; এবং কোনও অব্যক্ত কারণে সে সংযোগ সাধিত হয়। পৃথিবীর সকল পদার্থই সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম পরমাণুর সমষ্টি মাত্র। বিভাগ করিতে করিতে সকল পদার্থই এক সূক্ষ্মতম অবস্থায় উপনীত হয়। সে অবস্থায়, আর তাহার বিভাগ করা যায় না। সেই অবিভাজ্য সূক্ষ্মতম পদার্থই নিত্য পরমাণু; তাহারই সংযোগে স্থূল সংসারের উৎপত্তি হয়।" *

বৈশেষিকের বিবিধ তত্ত্ব।

কণাদের মতে,—দ্রব্যাদি সপ্ত পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে, নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি-রূপ মোক্ষ লাভ হয়। তিনি বলেন,—"ভোগাভোগ এবং দেহান্তর-গ্রহণ সমস্তই অদৃষ্ট-সাপেক্ষ। কর্ম্মানুষ্ঠান-জন্য কর্ম্মের শুভাশুভ ফলভোগের জন্য শরীরের প্রয়োজন হয়; তাহাই অদৃষ্ট। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা সেই অদৃষ্টের নাশ হয়, এবং তাহাতেই জীবের মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে।" এ হিসাবে, ঈশ্বরের সহিত জীবের সম্বন্ধ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; যেহেতু, দ্রব্যাদি সপ্ত পদার্থের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য জ্ঞান জন্মিলেই মুক্তিলাভ ঘটিয়া থাকে,—বৈশেষিক দর্শনের ইহাই মত। ঈশ্বরের কোনও কার্য্যকারিতা বৈশেষিক দর্শন স্বীকার করেন নাই; পরন্তু অদৃষ্টকেই তিনি সকল সৃষ্টির মূলাধার বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। তিনি স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন,—"অগ্নেরূর্দ্ধজ্বলনং বায়োস্তির্য্যক্‌পবনমণুনাং মনসশ্চাদ্যং কর্ম্মাদৃষ্টকারিতম্"; অর্থাৎ,অগ্নির ঊর্দ্ধজ্বলন,বায়ুর তির্য্যক্ গমন এবং পরমাণু ও মনের আদ্য-ক্রিয়া অদৃষ্টের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। ফলতঃ, অদৃষ্ট-বশে পরমাণুতে ক্রিয়া; পরমাণুর ক্রিয়া-হেতু সৃষ্টি। সুতরাং সৃষ্টির সহিত ঈশ্বরের কোনই সম্বন্ধ নাই; পরমাণু ও অদৃষ্টই সর্ব্ব-মূলাধার। অদৃষ্টের অভাবে শরীর-সংযোগের অভাব হয়, এবং ভবিষ্যতে তাহার আর পুনরুৎপত্তি হয় না; তাহাই মোক্ষ। বৈশেষিক, প্রত্যক্ষ ও অনুমান—দুই প্রকার প্রমাণ স্বীকার করেন। শব্দ-প্রমাণ—তাঁহার মতে—অনুমান প্রমাণের অন্তর্গত। কোনও দ্রব্য আনয়ন করিতে বলিলে, শব্দ শ্রবণ করিয়া সেই দ্রব্য-বিষয়ে অনুমিতি জন্মে; অর্থাৎ, কোন্ দ্রব্য আনিতে বলা হইয়াছে বা তাহার স্বরূপ কি,—বুঝিতে পারা যায়। বৈশেষিকের মতে ইহাও অনুমান প্রমাণ। যাঁহারা 'শব্দ'-প্রমাণকে অনুমান-প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত করিতে প্রস্তুত

* পরমাণুবাদ-তত্ত্ব মহর্ষি কণাদ সর্ব্বপ্রথম প্রচার করেন। ভারতবর্ষে অধুনা পরমাণুবাদ-তত্ত্বের তাদৃশ সমাদর না থাকিলেও, ইউরোপের দার্শনিকগণ অনেকেই এই মতের পরিপোষণ করিয়া থাকেন। গ্রীক দার্শনিক ডেমক্রেটাস ৪৪০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে গ্রীসদেশে এই পরমাণুবাদ-তত্ত্ব প্রচার করেন। ডেমক্রেটাস ভারতবর্ষে আসিয়া সন্ন্যাসীদিগের মুখে শুনিয়া কণাদের মত শিক্ষা করিয়া যান। তাঁহার পর, এপিকিউরাস এই পরমাণুবাদ-তত্ত্ব বিশেষরূপে প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। পরিশেষে ড্যাল্টন পরমাণুবাদ-তত্ত্বের পুনরুদ্ধার করিয়া এতৎসম্বন্ধে ইউরোপের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দেন।

মহেন, তাঁহারা বলেন,—"এমন অনেক তত্ত্ব আছে, যাহা প্রত্যক্ষ বা অনুমান প্রমাণে পাওয়া যায় না, অথচ যাহা অবিসম্বাদিত সত্য; যেমন, আপ্ত বাক্য, গুরুর উপদেশ প্রভৃতি। শব্দ-শ্রবণে পদার্থ-জ্ঞান; যেমন,—পূর্ব্বে কোনও পদার্থ না দেখিলেও, প্রায়শঃ শব্দ-কর্ত্তার প্রতি বিশ্বাস-বশতঃ, শব্দ-সূচিত পদার্থ মানিয়া লইতে হয়। পুত্র পিতৃ-উচ্চারিত শব্দ-সাহায্যে বহু তত্ত্ব অবগত হইয়া থাকে; সেই পিতৃ-উচ্চারিত শব্দই তাহার নিকট প্রমাণ। মোটামুটি তাহাকেই শব্দ-প্রমাণ বলা যাইতে পারে।" কিন্তু, বৈশেষিক তাহাকে অনুমান প্রমাণের মধ্যে গণ্য করিয়া লইয়াছেন। বৈশেষিক দর্শনের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় এবং দশম অধ্যায়ের শেষ সূত্রে "তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্"—তাঁহার বাক্য বলিয়াই ইহা প্রমাণ,—এইরূপ উক্তির অন্তর্গত 'তৎ' বা তাঁহার শব্দের, টীকাকারগণ ঈশ্বর-বাক্য বা বেদবাক্য বলিয়া অর্থ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন,—যদ্দ্বারা প্রমা অর্থাৎ ভ্রম ভিন্ন জ্ঞান জন্মে (যথার্থ জ্ঞান জন্মে), তাহাই প্রমাণ। বেদ সেই যথার্থ জ্ঞান জন্মাইয়া থাকেন;—কেন-না, বেদ ঈশ্বরের বাক্য। বেদ যদি মনুষ্য-প্রণীত হইত, তাহা হইলে ভ্রম-প্রমাদ, বিরোধ, অপটুত্ব প্রভৃতি দোষ আসিয়া পড়িত। কিন্তু বৈশেষিক-কার বেদে সে দোষ স্বীকার করেন নাই; তিনি স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন,—"বুদ্ধিপূর্ব্বা বাক্য-কৃতি-র্বেদে। অর্থাৎ, বুদ্ধিপূর্ব্বক বেদ-বাক্য রচনা হইয়াছে; বেদবাক্য—ঈশ্বর-বাক্য; বেদবাক্য—ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রমাণ; বেদবাক্য—অভ্রান্ত।" কিন্তু অপর পক্ষ বলেন,—"পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে; যেহেতু, কণাদ তাঁহার গ্রন্থে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা বেদের অপৌরুষেয়ত্ব কোথাও স্বীকার করেন নাই। ঈশ্বর শব্দটী পর্য্যন্ত বৈশেষিক দর্শনে দেখিতে পাওয়া যায় না; এবং 'বুদ্ধিপূর্ব্বা বাক্যকৃতির্বেদে' বাক্যে—'পুরুষ-বুদ্ধি দ্বারা বেদ রচিত হইয়াছে' অর্থ করা যাইতে পারে। ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্ত্তা বা জগতের কারণ বলিয়াও কণাদ কোথাও উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং নিরীশ্বরবাদী ভিন্ন তাঁহাকে আর কি বলা যাইতে পারে?" ইহার উত্তরে পূর্ব্ব-পক্ষের মত,—'তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্' এই সূত্রের 'তৎ'-শব্দ ঈশ্বর-বাচক। শঙ্করমিশ্র উপস্কার নামক ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—"তদিত্যনুপক্রান্তমপি প্রসিদ্ধিসিদ্ধতয়েশ্বরং পরামৃশতি।" অর্থাৎ, প্রসিদ্ধি-সিদ্ধি-হেতু সর্ব্বপ্রসিদ্ধি-নির্ণয়-নিবন্ধন 'তৎ'-শব্দে ঈশ্বরকে বুঝাইয়া থাকে। "ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধ স্মৃতঃ"—এই স্মৃতি-বাক্যেও তৎ-শব্দ ব্রহ্মবোধক। ফলতঃ, পূর্ব্বসূচনা না থাকিলেও, তৎ-শব্দে ঈশ্বর প্রতিপন্ন হয়, এবং তদ্দ্বারা গৌণভাবে মহর্ষি কণাদ ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য কিন্তু এই পরমাণুবাদের অশুদ্ধ দোষ প্রদর্শন করেন। তাঁহার মতে, পরমাণু অবিভাজ্য অদৃষ্ট অবয়ব-হীন হইতে পারে না। পরমাণুর সংযোগে যখন দৃষ্ট পদার্থের উৎপত্তি হয়, তখন পরমাণুর সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম অবয়ব আছে। যাহার অবয়ব আছে, তাহা কখনই অবিভাজ্য অদৃষ্ট হওয়া সম্ভবপর নহে।* সুতরাং, পরমাণুর অনিত্যত্ব সপ্রমাণ হইতে পারে না।

---

* শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যে পরমাণুবাদ এইরূপে খণ্ডিত হইয়াছে,—"সংযোগশ্চাণোরণ্বন্তরেণ সর্ব্বাত্মনা বা স্যাদেকদেশেন বা সর্ব্বাত্মনা চেদুপচয়ানুপপত্তেরেণুমাত্রত্বপ্রসঙ্গো দৃষ্ট বিপর্য্যয়প্রসঙ্গশ্চ।" সর্ব্বাঙ্গ কিম্বা একদেশ ভাবে দুই অণুর সংযোগ সম্ভবপর। সর্ব্বাঙ্গ ভাবে সংযোগ ঘটিলে, তাহা দুই পদার্থ হয়। একদেশ ভাবে সংযুক্ত হইলেও অণুর সাবয়বত্ব প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।

দশম পরিচ্ছেদ।

ন্যায়-দর্শন।

[ন্যায়দর্শন ও গৌতম,—ন্যায় ও আন্বীক্ষিকী নামের উৎপত্তি,—ন্যায়-দর্শনের সূত্র ও প্রকরণাদি,—গৌতম ও ভাষ্যকারগণ,—গৌতম মুনির আশ্রম-প্রসঙ্গ,—রঘুনাথের মিথিলায় ন্যায়শিক্ষা ;—ন্যায়-দর্শনের প্রতিপাদ্য,—প্রমাণ, প্রমেয় প্রভৃতি ষোড়শ পদার্থের স্বরূপ তত্ত্ব,—প্রমাণ চতুষ্টয়,—অনুমান প্রমাণের বিশেষত্ব,—নব্য ও প্রাচীন ন্যায়,—ব্যাকরণ কাব্যাদি পাঠে ন্যায়ের উপযোগিতা,—নৈষধ কাব্যের দৃষ্টান্ত ;—ন্যায়দর্শন সংক্রান্ত বিবিধ তত্ত্ব,—ঈশ্বর, আত্মা, অদৃষ্ট, জন্মান্তর, বেদ, পরমাণু প্রভৃতি,—বেদের প্রামাণ্য,—পঞ্চাবয়বী ন্যায়,—গ্রীসদেশে শর্ম্মণাচার্য্য,—নব্য ন্যায়ের আলোচনা।]

ন্যায়-দর্শন মহর্ষি গৌতম-প্রণীত। গোত্রপতি গোতম ঋষির 'ন্যায়সূত্র'—উহার ভিত্তি-স্থানীয়। * প্রমাণ দ্বারা পদার্থ নিরূপণে অথবা পরপ্রত্যয়নার্থ (পরকে বুঝাইবার জন্য) প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন—এই পঞ্চ অবয়বের অবতারণার নাম 'ন্যায়'। ন্যায়-দর্শনের আরও একটী নাম আছে ; সে নাম—আন্বীক্ষিকী। আগম-শাস্ত্র-প্রতিপাদিত বস্তুতত্ত্ব জানিবার পর যে দর্শন (অর্থাৎ আত্ম-তত্ত্বের শ্রবণান্তর তাহার অনুমা-রূপ মনন) তন্নির্ব্বাহক শাস্ত্র আন্বীক্ষিকী। আন্বীক্ষিকী শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ,—"অনুশ্রবণাদনু ঈক্ষামননং তন্নির্ব্বাহিকা বিদ্যা আন্বীক্ষিকী।" অর্থাৎ শ্রবণাখ্য উপাসনার অনন্তর মননাখ্য উপাসনা, তন্নির্ব্বাহিকা বিদ্যাই আন্বীক্ষিকী বিদ্যা। স্থূলতঃ, মুক্তিলাভই এই বিদ্যার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই আন্বীক্ষিকী শাস্ত্রকে মনন-শাস্ত্রও বলা যাইতে পারে। গৌতম ঋষির অপর নাম—অক্ষপাদ ; † তজ্জন্য তাঁহার এই দর্শন-শাস্ত্র 'অক্ষপাদ-দর্শন' নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। ন্যায়-দর্শন পাঁচটী অধ্যায়ে ৫২৯টী সূত্রে গ্রথিত। প্রতি অধ্যায়ে দুইটী করিয়া আহ্নিক আছে। আহ্নিকের অপর নাম 'প্রকরণ'। প্রকরণে এক একটী প্রস্তাবের পরিসমাপ্তি। কোথাও চারি পাঁচটী সূত্রে, কোথায়ও তদধিক সূত্রে, এক একটী প্রকরণ শেষ হইয়াছে। পণ্ডিতগণ প্রধানতঃ ন্যায়দর্শনকে তিন অংশে বিভক্ত করেন,—তর্কাংশ, ন্যায়াংশ ও দর্শনাংশ। তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, ছল, বিতণ্ডা প্রভৃতি লইয়া

গৌতম ও ন্যায়-দর্শন।

---

* কাহারও কাহারও মতে, আদি-ঋষি গোত্রপতি গোতমই ন্যায়-দর্শনের প্রবর্ত্তক। কেহ কেহ বলেন, তাঁহার গোত্রাপত্য গৌতম ঋষিই ন্যায়সূত্রসমূহ প্রণয়ন করেন।

† গৌতমের অক্ষপাদ নাম-সম্বন্ধে একটী উপাখ্যান প্রচলিত আছে। মহর্ষি বেদব্যাস একদা ন্যায়-দর্শনের নিন্দা করিয়াছিলেন গৌতম তজ্জন্য বেদব্যাসের মুখদর্শন করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন। ইহার পর, গৌতমের তুষ্টি-বিধানের জন্য বেদব্যাস চেষ্টা করিলে, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ-ভয়ে, গৌতম বেদব্যাসের প্রতি দৃষ্টি-সঞ্চালন করেন নাই। তখন গৌতমের চরণে দৃষ্টিশক্তি প্রকাশ পায়, এবং তদ্দ্বারা তিনি বেদব্যাসকে দেখিতে পান। "অক্ষং দর্শনশক্তিঃ পাদে প্রকাশিতং যস্য"—এইজন্যই গৌতমের অক্ষপাদ নাম। কেহ কেহ আবার বলেন,—"অক্ষে চক্ষুসি জ্ঞানে বা গমনং যস্য",—অর্থাৎ যিনি অক্ষ বা জ্ঞান দ্বারা বিখ্যাত, তিনিই অক্ষপাদ।

ন্যায়-দর্শনের 'তর্কাংশ' পরিপূর্ণ। প্রমাণাদির আলোচনায় অর্থাৎ প্রমাণ কত প্রকার, কিরূপে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে ইত্যাদিতে 'ন্যায়াংশ' নিয়োজিত। আত্মা ও দেহ প্রভৃতির সম্বন্ধতত্ত্বালোচনাই 'দর্শনাংশের' উদ্দেশ্য।

গৌতম ও ভাষ্যকারগণ।

গৌতম নামেও অনেক ঋষির পাওয়া যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদে গৌতম ঋষির প্রসঙ্গ আছে;—তিনি মহর্ষি জাবালির গুরু বলিয়া পরিচিত। শ্বেত-বরাহ কল্পে ব্রহ্মার মানস-পুত্ররূপে মহর্ষি গৌতম জন্মগ্রহণ করেন,—বায়ু-পুরাণে উল্লেখ আছে। রামায়ণে অহল্যা-উপাখ্যানে এবং হরিবংশে সপ্তর্ষির মধ্যে গৌতমের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ভরদ্বাজ মুনির অপর নাম—গৌতম। শাক্য-সিংহ শাক্যমুনি বুদ্ধদেব—গৌতম নামেও অভিহিত হন। স্মৃতিশাস্ত্রকারের মধ্যে গৌতম একজন প্রসিদ্ধ। বৌদ্ধাচার্য্যগণের মধ্যেও গৌতম ঋষি ছিলেন। ন্যায়-দর্শন-সংক্রান্ত ভাষ্য-গ্রন্থসমূহের মধ্যে, অনেকে বলেন,—পক্ষিলস্বামি-বিরচিত 'ন্যায়ভাষ্য' সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ। তিনি খৃষ্ট-জন্মের পূর্ববর্ত্তী চতুর্থ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। * পক্ষিল-স্বামীর পর, উদ্দ্যোতকর 'ন্যায়বার্ত্তিক' গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তৎপরে বাচস্পতি মিশ্র কর্ত্তৃক 'ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্য-টীকা' এবং উদয়নাচার্য্য কর্ত্তৃক 'বার্ত্তিক-তাৎপর্য্যটীকা-পরিশুদ্ধি' বিরচিত হয়। ন্যায়-শাস্ত্রের অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে উদয়নাচার্য্য-কৃত—দ্রব্য-প্রকাশ, কুসুমাঞ্জলি, কিরণাবলী, আত্মতত্ত্ববিবেক, রামকৃষ্ণকৃত—তর্কচন্দ্রিকা, বল্লভ পণ্ডিত কৃত—ন্যায়-লীলাবতী, সহদেব পণ্ডিত কৃত—ন্যায়-কৌস্তভ, রঘুদেব ভট্টাচার্য্য কৃত—দ্রব্যসার-সংগ্রহ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। বৌদ্ধাচার্য্যগণের মধ্যে ধর্ম্মোত্তরাচার্য্য এবং দিঙ্নাগাচার্য্য প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। দিঙ্নাগাচার্য্যের কুতর্ক-জাল ছিন্ন করিবার জন্যই উদ্দ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশ্র বদ্ধ-পরিকর হইয়াছিলেন। ধর্ম্মোত্তরাচার্য্যের 'ন্যায়বিন্দু-টীকা'—বৌদ্ধমত-প্রতিষ্ঠার জন্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এতদ্দেশে মিথিলা এবং নবদ্বীপ ন্যায়শাস্ত্র চর্চ্চার জন্য চির-বিখ্যাত। অনেকে মিথিলাকেই গৌতমের জন্মভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কাহারও কাহারও মতে দ্বারবঙ্গ হইতে সীতামারী যাইবার পথে, দ্বারবঙ্গের ক্রোশত্রয় উত্তর-পূর্ব্বে, গৌতমের আশ্রম ছিল। তত্রত্য একখণ্ড প্রস্তরকে অনেকেই অহল্যার পাষাণ-দেহ বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। কাহারও কাহারও মতে, বক্সার নগরের নিকটস্থিত ভাগীরথী-তীরে গৌতমের আশ্রম ছিল। সারণ জেলার রেভেলগঞ্জের নিকটস্থিত গটনা-গ্রামকেও কেহ কেহ গৌতমের আশ্রম বলিয়া অনুমান করেন। পক্ষিলস্বামী, গঙ্গেশ উপাধ্যায়, পক্ষধর মিশ্র, বাচস্পতি মিশ্র, বর্দ্ধমান উপাধ্যায় প্রভৃতি পণ্ডিতগণের জন্মভূমি বলিয়াও মিথিলা প্রতিষ্ঠান্বিত। যে মণ্ডন মিশ্রের সহিত বিচারে জয়লাভ করিয়া শঙ্করাচার্য্য মিথিলায় বিজয়-পতাকা উড্ডীন করেন, সেই প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক মণ্ডন মিশ্র মিথিলাতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নবদ্বীপের নৈয়ায়িকদিগের মধ্যে বাসুদেব সার্ব্বভৌম, রঘুনাথ শিরোমণি, রামভদ্র তর্কবাগীশ, জগদীশ তর্কালঙ্কার,

* হেমচন্দ্রের অভিধানে পক্ষিলস্বামী ও চাণক্য একব্যক্তি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। পক্ষিলস্বামী বা চাণক্যের অপর নাম—বাৎস্যায়ন। চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় তাঁহার বিদ্যমানতা সপ্রমাণ হয়।

গদাধর ভট্টাচার্য্য, মথুরানাথ তর্কবাগীশ—কত নাম করিব?—সকলেই চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন। রঘুনাথ শিরোমণি মিথিলায় ন্যায়-দর্শন শিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। রঘুনাথের শিক্ষাগুরু ছিলেন—পক্ষধর মিশ্র। ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া কোনও ছাত্র ন্যায়গ্রন্থ বিদেশে লইয়া যাইতে না পারে,—মিথিলার ইহাই রীতি ছিল। তদনুসারে, শিক্ষা শেষ হইলে, গুরুর নিকট বিদায় লইবার সময়, রঘুনাথের নিকট হইতে গুরু গ্রন্থ-পত্র কাড়িয়া লন। কিন্তু রঘুনাথের মেধা-শক্তি এতই প্রবল ছিল যে, তিনি সমগ্র ন্যায়শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া লইয়াছিলেন। সুতরাং, গুরু কর্ত্তৃক গ্রন্থ-পত্র গৃহীত হইবার সময়, তিনি গুরুকে বলিয়াছিলেন,—"গ্রন্থ-পত্রে কি হইবে? আমার হৃদয়ে হৃদয়ে এ গ্রন্থ অঙ্কিত হইয়া আছে।" অতঃপর নবদ্বীপে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, রঘুনাথ ন্যায়গ্রন্থ সঙ্কলন করেন; এবং সেই গ্রন্থ দেশে-বিদেশে সমাদৃত হয়। পাণ্ডিত্য-প্রভাবে রঘুনাথ এক সময়ে আপন গুরুকে পর্য্যন্ত পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।—এইরূপ কিংবদন্তী আছে। ন্যায়শাস্ত্রের বহু গ্রন্থ এক্ষণে প্রচলিত ঋষি-প্রণীত ন্যায়শাস্ত্র 'প্রাচীন ন্যায়' নামে এবং পরবর্ত্তী পণ্ডিতগণ-বিরচিত ন্যায়গ্রন্থ 'নব্য ন্যায়' নামে পরিচিত।

ন্যায়-দর্শনের প্রতিপাদ্য।

ন্যায়-দর্শনেরও মুখ্য প্রতিপাদ্য—সেই দুঃখ-নিবৃত্তি। দুঃখ কেন উৎপন্ন হয়, আর কিরূপেই বা সেই দুঃখের নিবৃত্তি হইতে পারে,—নানারূপ তর্ক উত্থাপন করিয়া, ন্যায়-দর্শনে তাহারই সিদ্ধান্ত হইয়াছে। একটী সূত্র উদ্ধৃত করিতেছি; সেই সূত্রেই ন্যায়-দর্শনের মূল উদ্দেশ্য বুঝিতে পারা যাইবে। সূত্রটী এই,—"দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরা-পায়াদপবর্গঃ।" পক্ষিল স্বামী উহার ভাষ্য এইরূপ লিখিয়াছেন,—"যদা তু তত্ত্বজ্ঞানাৎ মিথ্যাজ্ঞানম্ অপৈতি তদা মিথ্যাজ্ঞানাপায়ে দোষা অপযন্তি দোষাপায়ে প্রবৃত্তিরপৈতি প্রবৃত্ত্যপায়ে জন্ম অপৈতি জন্মাপায়ে দুঃখম্ অপৈতি দুঃখাপায়ে চাত্যন্তিকোঽপবর্গো-নিঃশ্রেয়সমিতি।" অর্থাৎ, নিঃশ্রেয়স বা ত্রিবিধ দুঃখের নিবৃত্তিই মুক্তি; সেই মুক্তিলাভ করিতে হইলে, ত্রিবিধ দুঃখের নিবারণ করিতে হয়; দুঃখের নিবারণ করিতে হইলে, জন্ম নিবারণ করিতে হয়; জন্ম নিবারণ করিতে হইলে, প্রবৃত্তির বিনাশ করিতে হয়; প্রবৃত্তির বিনাশ করিতে হইলে, ত্রিবিধ দোষ অর্থাৎ রাগ-দ্বেষ-মোহ দূর করিতে হয়; দোষ নিবারণ করিতে হইলে, মিথ্যাজ্ঞানের নিবারণ করিতে হয়। মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায়;—আর সেই তত্ত্বজ্ঞান-লাভই মুক্তি। ফলতঃ, তত্ত্বজ্ঞান লাভ না হইলে মিথ্যাজ্ঞান ধ্বংস হয় না এবং তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারিলেই আত্যন্তিক দুঃখনাশ বা নিঃশ্রেয়স লাভ হইয়া থাকে। এই তত্ত্বজ্ঞান-লাভ সম্বন্ধে প্রথম সূত্রেই মহর্ষি গৌতম বলিয়াছেন—"প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্তাবয়ব-তর্ক-নির্ণয়-বাদ-জল্প-বিতণ্ডা-হেত্বাভাস-ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ।" অর্থাৎ, নিঃশ্রেয়স-রূপ পরম মঙ্গল লাভ করিতে হইলে, তত্ত্বজ্ঞান চাই,—প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল জাতি, নিগ্রহ-স্থান—এই ষোড়শ পদার্থের। এই ষোড়শ পদার্থ কি প্রকার, তাহা বুঝাইবার

জন্ত দর্শনকার বিশেষরূপ প্রয়াস পাইয়াছেন। তদনুসারে ন্যায়-দর্শনে প্রথমে পদার্থের উল্লেখ, পরে তাহার লক্ষণ-বিচার এবং শেষে তাহার পরীক্ষা-প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বৈশেষিক দর্শন আলোচনায় যেরূপ সংজ্ঞা ও পদার্থ-বিচার দেখা যায়, ন্যায়-দর্শনের পদার্থ-বিচারও অনেকটা তদনুরূপ। ন্যায়-মতে, প্রথম পদার্থ—প্রমাণ। প্রমাণ শব্দের অর্থ—যথার্থ জ্ঞান-লাভের উপায়। বলা বাহুল্য, জ্ঞান দুই প্রকার—যথার্থ এবং অযথার্থ; রজ্জুকে রজ্জুবোধ—যথার্থ-জ্ঞান, এবং রজ্জুকে সর্পজ্ঞান—অযথার্থ-জ্ঞান। প্রমাণ দ্বারা এই যথার্থ ও অযথার্থ ভেদ উপলব্ধি হয়। ফলতঃ, প্রমাণ—যথার্থ-জ্ঞান; আর যাহা অযথার্থ অথচ প্রমাণবৎ প্রতীয়মান, তাহা প্রমাণ নহে,—প্রমাণাভাস মাত্র। ন্যায়-দর্শনের মতে,—প্রমাণ চতুর্ব্বিধ;—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধ জ্ঞানই—প্রত্যক্ষ। গৌতমের মতে, সেই প্রত্যক্ষ আবার দুই প্রকার;—সবিকল্পক ও নির্ব্বিকল্পক। ঘট, পট প্রভৃতি পদার্থ যখন 'ঘট-পট' নামে অভিহিত হয়, তখন সবিকল্পক-জ্ঞান বলিয়া থাকি। আর যখন ঘট-পটাদি পদার্থনিচয় সাধারণ 'বস্তু' সংজ্ঞা লাভ করে, তখন উহা নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান। সূত্রে এই প্রত্যক্ষের লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে,—"ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানং অব্যপদেশ্যং অব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষং।" ভাষ্যকারগণ ইহার ব্যাখ্যায় নানারূপ তর্ক-বিতর্ক উত্থাপন করিয়াছেন। 'অনুমান' প্রমাণ-সম্বন্ধে গৌতমের সূত্র,—"অথ তৎপূর্ব্বকং ত্রিবিধমনুমানং পূর্ব্ববৎ শেষবৎ সামান্যতোদৃষ্টঞ্চ।" অর্থাৎ, অনুমান তিন প্রকার—পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্টানুমান। মেঘ দর্শন করিয়া বৃষ্টির অনুমান—'পূর্ব্ববৎ' অনুমান। এ স্থলে, 'পূর্ব্ব' শব্দের অর্থ—কারণ; অর্থাৎ, পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ দর্শনে পরবর্ত্তী ঘটনার অনুমান। 'শেষবৎ' অনুমান—যেমন, নদীর জল-বৃদ্ধিতে পার্ব্বত্য-প্রদেশে বৃষ্টির অনুমান। এখানে 'শেষ' অর্থ—কার্য্য; অর্থাৎ, অতীত কার্য্য দেখিয়া কার্য্যান্তরের অনুমান। কারণ বা কার্য্য নাই, অথচ দর্শনাধীন যে অনুমান, তাহাই সামান্যতোদৃষ্টানুমান। এই অনুমান বুঝিতে হইলে, 'অবিনাভাব-সম্বন্ধ'—এই বাক্যার্থ বুঝিতে হয়। অবিনাভাবের মোটামুটি অর্থ—ব্যাপ্তি। যদি বলি,—লৌহপিণ্ডে ধূম নাই, কিন্তু অগ্নি আছে; তাহা হইলে ধূমের 'বিনাভাব' এবং অগ্নির 'অবিনাভাব' সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে। 'শব্দ' প্রমাণ-সম্বন্ধে গৌতম-সূত্র "আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ";—অর্থাৎ,ভ্রম,প্রমাদ,প্রতারণা-ইচ্ছা এবং ইন্দ্রিয়াদির অপটুতা প্রভৃতি দোষ-শূন্য যে বাক্য, তাহাই আপ্তবাক্য। সেই আপ্তবাক্যই 'শব্দ-প্রমাণ' মধ্যে গণ্য। যেখানে একের সহিত অন্যের উপমা দেওয়া যায়, তাহাই উপমান। ন্যায় মতে উপমান সাদৃশ্য-জ্ঞান-সাধন। গৌতমের উপমান সূত্রটী এই,—"প্রসিদ্ধ সধর্ম্ম্যাৎ সাধ্যসাধনমুপমানং।" গবয়ে গোর সাদৃশ্য, মুখে চন্দ্রের সাদৃশ্য ইত্যাদি জ্ঞান যদ্দ্বারা লাভ হয়, তাহাই উপমান। প্রত্যক্ষাদি চতুর্ব্বিধ প্রমাণ বিবৃতি করিবার জন্য নব্য-নৈয়ায়িকগণ চারিখানি বিস্তৃত প্রমাণ-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। সেই গ্রন্থ চতুষ্টয়ের নাম,—প্রত্যক্ষ-পরিচ্ছেদ, অনুমান-পরিচ্ছেদ, উপমান-পরিচ্ছেদ এবং শব্দ-পরিচ্ছেদ। এই গ্রন্থ-চতুষ্টয়ে নব্য-নৈয়ায়িকগণ সপ্রমাণ করিয়াছেন,—নব্য-ন্যায়শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি না জন্মিলে, কি বেদ, কি বেদান্ত, কি

কাব্য, কি ব্যাকরণ, কোনও শাস্ত্রেই জ্ঞান জন্মিতে পারে না। এই জন্য ন্যায়-শাস্ত্র পড়িবার পূর্ব্বে, প্রথমে প্রমাণ-গ্রন্থ-চতুষ্টয় অধ্যয়ন করিতে হয়। কাব্য-গ্রন্থ পাঠে ন্যায়-শাস্ত্রের সাধারণ জ্ঞান আবশ্যক,—নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণ তাহাও প্রমাণ করিয়া থাকেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ মহাকবি শ্রীহর্ষ-প্রণীত 'নৈষধ'-কাব্যের একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি,—

"উদয়তি স্ফুতদদ্ভুত মালিভিধ রশিতৃদ্ ভুবিস্তত্র বিমুব্যায়ৎ।
অনুমিতোপিচ বাষ্পনিরীক্ষণাদ্ ব্যভিচচার ন তাপকরোঽনলঃ॥"

নলবিরহে দময়ন্তী যখন রোদন করিতেছিলেন, দময়ন্তীর সখীগণ তাহার নয়নবাষ্প দেখিয়া অনুমান করেন,—অনলই অর্থাৎ নলাভাবই সন্তাপের কারণ। এই শ্লোকে বাষ্প ও অনল এই দুইটী শব্দ লইয়া সাধারণতঃ বিরোধ উপস্থিত হয়। কবি বলিতেছেন,—নয়ন-বাষ্প দেখিয়া সন্তাপকর অনল অনুমিত হইতেছে। কিন্তু এ অনুমান কি যথার্থ! পর্ব্বতে ধূমায়মান বাষ্প দেখিতে পাইলেই যে তাহাতে অগ্নির অস্তিত্ব বুঝিতে হইবে, তাহা কোনও ক্রমেই বলা যায় না। ধূম নাই, ধূমের সদৃশ বাষ্প আছে,—ইহাতে কি অগ্নির অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয়? অথচ, এখানে সখীগণের অনুমানও মিথ্যা নহে। দময়ন্তীর নয়নে বাষ্প ও হৃদয়ে অনল,—কে না উপলব্ধি করিতে পারেন? সুতরাং সখীগণের অনুমান আশ্চর্য্যজনক হইলেও, শ্লোকের বাষ্প ও অনল পদদ্বয় অশিষ্ট-প্রয়োগ নহে। এখানে ঐ দুই পদ দ্ব্যর্থবোধক; 'বাষ্প' অর্থে 'উষ্মা' ও 'নয়ন-জল,' 'অনল' অর্থে 'অগ্নি' ও 'নলাভাব'। বৈয়াকরণ ইহাতেও আপত্তি করিয়া বলিতে পারেন,—"নলাভাব অর্থ সিদ্ধ করিতে গেলে, শ্লোকস্থিত 'অনল'-পদ 'নপুংসক লিঙ্গ' হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু তাহা না হইয়া উহা পুংলিঙ্গ-বৎ ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং 'অনল' ও 'বাষ্প'-পদ-দ্বয়ের ঐরূপ ব্যবহার ভ্রমমূলক। কিন্তু শ্রীহর্ষ কবির কি সেরূপ ভ্রমপ্রমাদ সম্ভাবনা? ন্যায়শাস্ত্রের 'শব্দ-খণ্ড' বিভাগে জগদীশ তর্কালঙ্কার ইহার মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—'বিবাদস্যাভাবঃ' অর্থে যখন 'অবিবাদঃ' এই পুংলিঙ্গ-পদ নিষ্পন্ন হয়, তখন 'নলস্যাভাবঃ' অর্থে 'অনলঃ' পুংলিঙ্গ-পদ, কেন না নিষ্পন্ন হইবে? এ সম্বন্ধেও নানা তর্ক-বিতর্ক আছে; কিন্তু সে তর্কের স্থান ইহা নহে। এখানে আমরা এইমাত্র দেখাইতেছি, কাব্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার সর্ব্ব-বিষয়েই নব্য ন্যায়-শাস্ত্র এক্ষণে আপনার প্রভাব বিস্তার করিয়া বসিয়াছেন। নৈয়ায়িকগণের মত এই,—ন্যায়-শাস্ত্র আলোচনা না করিলে সংস্কৃত সাহিত্যে সম্যকরূপে প্রবেশ করিবার কোনও উপায় নাই। প্রমাণের পর প্রমেয়, অর্থাৎ প্রমাণের বিষয়। ন্যায়-মতে এই প্রমেয় আবার দ্বাদশ প্রকার; আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ, অপবর্গ। বলা বাহুল্য, এই দ্বাদশ প্রমেয়েরও অনেক প্রকার-ভেদ আছে; যেমন, ইন্দ্রিয় প্রমেয়ের মধ্যে চক্ষু কর্ণ ইত্যাদি, দোষ প্রমেয়ের মধ্যে রাগ দ্বেষ ইত্যাদি। ফলতঃ, প্রমাণ হইতে নিগ্রহস্থান পর্য্যন্ত ষোড়শ পদার্থের আলোচনায় বা অর্থ-গ্রহণে কত কথারই অবতারণা হইয়াছে ও হইতে পারে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ন্যায়-দর্শন সেই সকল কথার সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন,—উক্ত ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারিলেই নিঃশ্রেয়স বা অপবর্গ মুক্তি লাভ হয়।

ন্যায়-দর্শনের বিবিধ তত্ত্ব।

ঈশ্বর, অদৃষ্ট, আত্মা, জন্মান্তর, বেদ প্রভৃতি সম্বন্ধেও ন্যায়-দর্শনে সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। মহর্ষি গৌতম ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু ঈশ্বরের সৃষ্টি-কর্তৃত্ব স্বীকার করেন নাই। সৃষ্টি-বিষয়ে ঈশ্বরাতিরিক্ত অন্য এক মুখ্য কারণ আছে,—ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। তিনি প্রথমে ঈশ্বর প্রতিপাদনের জন্য তর্ক উত্থাপন করেন,—"ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকর্ম্মাফল্য-দর্শনাৎ।" অর্থাৎ, মনুষ্যকৃত কর্ম্মের সর্ব্বদা সাফল্য দেখা যায় না; সুতরাং ঈশ্বরই জগতের কারণ। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি আবার মীমাংসা করিতেছেন,—"ন পুরুষকর্ম্মাভাবে ফলনিষ্পত্তেঃ।" অর্থাৎ, পুরুষ-কর্ম্ম ভিন্ন ফলনিষ্পত্তি হয় না। ফলনিষ্পত্তি ঈশ্বরাধীন হইলে, কখনও পুরুষ-চেষ্টার প্রয়োজন হয় না। সুতরাং ঈশ্বর ভিন্ন সৃষ্টির অন্য কারণ অবশ্যই আছে। সেই কারণই—অদৃষ্ট বা কর্ম্মফল। এ বিষয়ে গৌতম আত্মার অনাদিত্ব স্বীকার করেন। তিনি বলেন,—"পূর্ব্বাভ্যস্ত-স্মৃত্যনুবন্ধাজ্জাতস্য হর্ষভয়শোকসম্প্রতিপত্তেঃ।" অর্থাৎ, সদ্যোজাত শিশুর হর্ষ, ভয়, শোক হইয়া থাকে; তাহার কারণ—পূর্ব্বাভ্যস্ত স্মৃতি। ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র স্তন্যপানে শিশুর প্রবৃত্তি জন্মে। আহারই যে ক্ষুন্নিবৃত্তির উপায়, শিশু কি করিয়া বুঝিতে পারিল? পূর্ব্বাভ্যাস স্মরণ ভিন্ন শিশুর আহারে প্রবৃত্তি কি প্রকারে হইতে পারে? এ জন্মে সে তো আহারের উপযোগিতা শিক্ষা করে নাই! সুতরাং তাহার আত্মা নূতন শরীর গ্রহণ করিয়া তাহার পূর্ব্বাভ্যস্ত স্মৃতি—শরীর রক্ষার জন্য আহার করা প্রয়োজন—স্মরণ করাইয়া দিল। এই স্থলে বার্ত্তিক-কার তর্ক উত্থাপন করিয়াছেন,—"পদ্মাদিষু প্রবোধঃ সম্মিলন-বিকারবত্তদ্বিকারঃ।" অর্থাৎ, কমল যেমন আপনাপনিই প্রস্ফুটিত হয়, তাহার যেমন পূর্ব্ব-সংস্কার থাকা সম্ভবপর নহে, বালকের হর্ষ-শোক-জনিত বিকারও সেইরূপ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু ন্যায়-দর্শন তাহার এইরূপ উত্তর দিয়াছেন,—"উষ্ণশীতবর্ষাকাল-নিমিত্তত্বাৎ পঞ্চাত্মক বিকারাণাং।" গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীত ঋতু-প্রভাবে এই বিকার পঞ্চভূতাত্মক পদার্থে সম্ভবপর; বিনা কারণে কখনই কার্য্য হয় না; কার্য্যের কারণ অবশ্যই আছে। এস্থলে পুনরায় তর্ক উঠিতে পারে,—"তাহাই যদি হয়, অয়স্কান্তের প্রতি লৌহ আকৃষ্ট হয় কেন?" ইহারও উত্তর, অয়স্কান্তের প্রতি লৌহ যে আকৃষ্ট হয়, সে আকর্ষণে কালাকাল নাই, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিরও পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু ক্ষুধা না পাইলে শিশু কখনই স্তন্য পান করে না; পরন্তু ক্ষুধা নিবৃত্তি হইলেই সে স্তন্যপানে অনভিলাষ প্রকাশ করে। শিশুর এ প্রবৃত্তি নিবৃত্তি কোথা হইতে আসিল? উহাও তাহার সেই পূর্ব্বস্মৃতির কার্য্য নহে কি? ভূমিষ্ঠ হইবা-মাত্রই শিশু যে রাগদ্বেষাদি প্রকাশ করে, পূর্ব্বজন্মের স্মৃতির কার্য্য ভিন্ন তাহাকেই বা আর কি বলিতে পারি? মহর্ষি গৌতম তাই স্পষ্টই বলিয়াছেন—সকলই "পূর্ব্বকৃতফলানু-বন্ধাত্তদুৎপত্তিঃ।" অর্থাৎ, পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফলানুসারেই এরূপ ব্যাপার-পরম্পরা সংঘটিত হইয়া থাকে। ফলতঃ, নৈয়ায়িকগণের যুক্তি এই—পূর্ব্ব-জন্মের স্মৃতিই সর্ব্বমূলাধার; আমরা যাহা কিছু করি, যাহা কিছু ভাবি, সকলই সেই স্মৃতি হইতে সমুৎপন্ন। ইহজন্মে যেমন সাদৃশ্য দেখিয়া পদার্থ-তত্ত্ব নির্ণয় করি; এমন কি, বর্ণমালা শিক্ষার সময়ও শিশু যেমন তাহার পূর্ব্বদৃষ্ট আকারাদির সহিত বর্ণমালা-সমূহের সাদৃশ্য বুঝিবার চেষ্টা করে;

আত্মাও সেইরূপ পূর্ব্ব-দৃষ্ট বিষয়ের স্মৃতি দ্বারা পরিচালিত হয়। ইহজীবনে শৈশবের স্মৃতি বয়োবৃদ্ধির সহিত মানুষ যেমন ধীরে ধীরে ভুলিয়া যায়; পূর্ব্বজন্মের অতীত-স্মৃতিও ইহ-জন্মে মানুষ তেমনই ভুলিতে থাকে। শেষে সে স্মৃতি কিছুমাত্র তাহার মনে আর উদয় হইতে পারে না; ইহজীবনের নবনব চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাতে পূর্ব্বস্মৃতি সকলই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। জন্মিয়াই মানুষ যে সুখদুঃখভাগী বা ধনী দরিদ্র হয়, নব্য ন্যায়মতে, তাহাও পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল বা অদৃষ্ট ভিন্ন আর কি হইতে পারে? তবে ন্যায়-দর্শন পুরুষের এই কর্ম্মফল বা অদৃষ্টকে ঈশ্বরাধীন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন,—"ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকর্ম্মাফল্যদর্শনাৎ।" যেমন বীজানুসারে ভূমিতে শস্য উৎপন্ন হয়, ভূমির তাহাতে কোনও দোষাদোষ নাই, সেইরূপ অদৃষ্টানুসারে ঈশ্বর জীবের সুখ-দুঃখের বিধান করেন,—ইহাতে তাহাই বুঝিতে পারা যায়। ঈশ্বরের সহিত সৃষ্টির বা মুক্তির সম্বন্ধ ইহার অধিক আর কিছু ন্যায়দর্শন-কার স্বীকার করেন নাই। গৌতমের মতে,—শরীর হইতে আত্মা বিভিন্ন; শরীরের সহিত আত্মার সংযোগ হওয়ায়, 'আমি বড়—আমি ছোট' ইত্যাদি অহংজ্ঞানের উদয় হয়; আর তাহা হইতেই যত কিছু কষ্টের সূত্রপাত। তাই ন্যায়-দর্শন বলেন,—শরীর হইতে আত্মার পার্থক্য বুঝিবার চেষ্টা কর; আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি বা নিঃশ্রেয়স লাভ হইবে। বেদ-বিষয়ে, নৈয়ায়িকগণ প্রথমে বহু তর্ক বিতর্ক উত্থাপন করিয়া, অবশেষে বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। গৌতম বেদের প্রামাণ্য-বিষয়ে তর্ক উত্থাপন করিয়াছেন,—"তদপ্রামাণ্যমনৃতব্যাঘাতপুনরুক্তদোষেভ্যঃ।" অর্থাৎ, বেদে মিথ্যাবাদ, ব্যাঘাত এবং পুনরুক্তি দোষ আছে; সুতরাং বেদ-বাক্য মিথ্যা। বেদে কোথাও আছে—উদয়কালে হোম করিবে, কোথাও আছে—অনুদয়-কালে হোম করিবে, এবং তাহাতে এক কালের প্রসঙ্গে অন্য কালের নিন্দাবাদও দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং পদে পদেই ব্যাঘাত ঘটিবার আশঙ্কা। এইরূপ আরও দেখা যায়, ঈশ্বর-সম্বন্ধেও শ্রুতিবাক্যের পরস্পর ঐক্য নাই। শ্রুতিতে কোথাও আছে—"একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম"; কোথাও আছে—"দ্বে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে পরঞ্চাপরমেব চ।" অর্থাৎ, একটিতে অদ্বৈত-বাদ, অপরটিতে দ্বৈতবাদ প্রতিপন্ন হয়। পুনরুক্তির তো কথাই নাই; একই কথা বেদে পুনঃপুনঃ উক্ত হইয়াছে। এই ত্রিবিধ দোষ প্রদর্শনে সাধারণতঃ বেদের অপ্রামাণ্য প্রতিপন্ন হইতে পারে—এই আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া, মহর্ষি গৌতম নিজেই তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। বেদবাক্য যে মিথ্যা নহে, তৎসম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন,—"ন কর্ম্মকর্তৃ-সাধনবৈগুণ্যাৎ।" তাঁহার মতে,—তিন কারণে বৈদিক কর্ম্মে ফললাভ হয় না; (১) কর্ম্মকর্ত্তা অনধিকারী, (২) মন্ত্রের উচ্চারণে দোষ, (৩) বিধি-বিগর্হিত কর্ম্মানুষ্ঠান। এই তিনটিই অভীষ্ট ফললাভের অন্তরায়-সাধক। উপযুক্ত কর্ম্ম না করিলে, ফলের আশা কিরূপে করা যাইতে পারে? সুতরাং বেদ-বাক্য মিথ্যা নহে; কর্ম্মকারীর কর্ম্মদোষেই কর্ম্মানুষ্ঠান পণ্ড হইয়া থাকে। দ্বিতীয়, কালাকাল-ঘটিত ব্যাঘাত-দোষ-বিষয়ে গৌতমের উত্তর,—উদয় অনুদয় উভয় কালই হোমাদির পক্ষে প্রশস্ত বটে; কিন্তু এক কালের সঙ্কল্প করিয়া অন্য কালে কার্য্য করিলে অভীষ্ট-লাভে বিঘ্ন ঘটিতে পারে,—মন্ত্রের ইহাই মাত্র উদ্দেশ্য। ব্রহ্ম-সম্পর্কেও

'তিনি এক' 'তিনি দুই' —এই যে অদ্বৈত ও দ্বৈতবাদ দৃষ্ট হয়, তাহারও কারণ,—জীবের জ্ঞান-বৈগুণ্য। জীবের যখন অজ্ঞানাবস্থা, জীব তখন আত্মা-পরমাত্মার অভেদভাব বুঝিতে পারে না; তাই তখন আপনাকে ও ব্রহ্মকে দুই বলিয়া মনে করে। কিন্তু যখন তাহার তত্ত্বজ্ঞান উপস্থিত হয়, সে তখন সর্ব্বত্রই ব্রহ্ম-কর্তৃত্ব দেখিতে পায়। জীবের সেই অবস্থাদ্বয় বুঝাইবার জন্যই দ্বৈতাদ্বৈতবাদ-প্রসঙ্গ। বেদের প্রামাণ্য-বিষয়ে উহাতে ব্যাঘাত ঘটিবার কি আছে? পুনরুক্তি-সম্বন্ধে গৌতম বলিয়াছেন,—প্রয়োজন বুঝাইবার জন্য যে বাক্য পুনঃপুনঃ উচ্চারিত হয়, তাহা পুনরুক্তি নহে। পাছে ভ্রান্তিবশে জীব কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হয়, তাই তাহাকে উদ্বোধিত করিবার জন্য বেদে কোনও কোনও বিষয় একাধিকবার উল্লিখিত হইয়াছে। উহা জীবের মঙ্গলার্থ প্রযুক্ত,—উহা পুনরুক্তি-দোষ-দুষ্ট নহে। অপিচ, বেদ বহু কাল হইতে প্রচলিত—এজন্য উহার নিত্যত্ব; বেদে সত্য তত্ত্ব নিহিত আছে—এজন্য উহা প্রামাণ্য। তবে বেদ যে কোনও অভ্রান্ত পুরুষের প্রণীত, ন্যায়দর্শনে তাহারই আভাস পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত-স্থলে দর্শনকার বলেন,—ঘট দেখিয়া যেমন তাহার নির্ম্মাতা কুম্ভকারের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয়, অভ্রান্ত বেদ-বাক্যেরও সেইরূপ পুরুষোক্তত্ব সম্ভবপর। মহর্ষি গৌতম প্রকারান্তরে পরমাণুবাদ স্বীকার করিয়াছেন। মুক্তি তাঁহার মতে একপ্রকার মূর্চ্ছা-বিশেষ। তাঁহার জন্মান্তর-তত্ত্ব আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়, একমাত্র ব্রাহ্মণই অপবর্গ-লাভের অধিকারী; কর্ম্মগুণে ব্রাহ্মণ-জন্ম লাভ করিয়া তত্ত্বজ্ঞান উদয় হইলে মুক্তি হইতে পারে। ন্যায়দর্শনের বিশেষত্ব—উহার যুক্তিবাদে। ন্যায়াংশের যুক্তিবাদ প্রধানতঃ পঞ্চ অবয়বে বিভক্ত। অবয়ব অর্থে—বিচারাদি বাক্য-বিশেষ। ন্যায়াংশের সেই পঞ্চ অবয়ব,—(১) প্রতিজ্ঞা, (২) হেতু, (৩) উদাহরণ, (৪) উপনয়, (৫) নিগমন। এই ন্যায়াংশে প্রথমে একটী প্রস্তাব বা প্রতিজ্ঞা উত্থাপন করা হয়; তার পর, তাহার হেতু নির্দ্দিষ্ট হয়; অতঃপর উদাহরণ দ্বারা সেই হেতুর কারণ দৃঢ়ীভূত করা হয়; এইরূপে হেতু নির্দ্দিষ্ট হইলে, কার্য্যস্থলে তাহার উপনয় বা প্রয়োগ হয়; অবশেষে, তদ্দ্বারা নিগমন বা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি,—(১) প্রতিজ্ঞা—'পর্ব্বতো বহ্নিমান্'—পর্ব্বতে আগুন আছে; (২) হেতু—'পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ'—যেহেতু পর্ব্বত হইতে ধূম নির্গত হইতেছে; (৩) উদাহরণ;—এই উদাহরণ আবার দুই প্রকারে প্রদর্শিত হইতে পারে—(ক) অন্বয়ী, (খ) ব্যতিরেকী। অন্বয়ী উদাহরণ অর্থ—বিদ্যমানতা; আর ব্যতিরেকী উদাহরণ অর্থ—অবিদ্যমানতা। যেমন, (ক) 'যো যো ধূমবান্ স বহ্নিমান্'; অর্থাৎ, যে যে স্থান হইতে ধূম নির্গত হয়, সেই সেই স্থানেই আগুনের অস্তিত্ব আছে; দৃষ্টান্ত—রন্ধনগৃহ প্রভৃতি; এবং (খ) 'যত্রৈবং তত্রৈবং'; অর্থাৎ,যেখানে বহ্নি নাই,সেখানে ধূমও নাই; দৃষ্টান্ত—জলাশয় প্রভৃতি। বলা বাহুল্য, প্রথমোক্ত উদাহরণের নামই—অন্বয়ী উদাহরণ, এবং শেষোক্ত উদাহরণের নামই—ব্যতিরেকী উদাহরণ। (৪) উপনয় অর্থাৎ প্রমাণপ্রয়োগে বুঝা গেল,—অগ্নি হইতেই ধূম নির্গত হয়। অতঃপর (৫) নিগমন অর্থাৎ সিদ্ধান্ত বা সংশয়-নিবৃত্তি। ইহাই তর্কের শেষ। পূর্ব্বাবয়ব-চতুষ্টয়ে প্রতিপন্ন হইল,—যাহা হইতেই ধূম নির্গত হয়, তাহাতেই অগ্নি আছে; সুতরাং পর্ব্বত হইতে যখন ধূম নির্গত হইতেছে, তখন পর্ব্বতে নিশ্চয়ই অগ্নি

আছে। এই সিদ্ধান্তই নিগমন। স্থূলতঃ ইহাই ন্যায়াংশ। এই ন্যায়াংশের আলোচনায় আর্য্য হিন্দুগণ যে জ্ঞান-গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার তুলনা হয় না। ভাষা, চিন্তা ও বিষয় প্রধানতঃ এই তিনটীকে অবলম্বন করিয়া ন্যায়শাস্ত্র প্রবর্ত্তিত। এই তিন বিষয়ের বিচারই—ন্যায়ের প্রধান বিচার। ভাষা-বিচারের সময়, বাক্য, প্রতিজ্ঞা এবং ব্যাপ্তি নামক ভাগত্রয়ে তাহাকে বিভক্ত করা হয়। চিন্তা-বিচারের সময়, সামান্য জ্ঞান, বিশেষ জ্ঞান ও ব্যাপ্তি জ্ঞান—এই ভাগত্রয়ে চিন্তাকে ভাগ করা হইয়া থাকে। বিষয়-বিচারের সময়, প্রত্যক্ষ, স্মৃতি ও উপমিতি—এই তিন ভাগে বিচার্য্য-বিষয় বিভক্ত হয়। এই সকল ভাগের আবার কত উপভাগ আছে। ভাষা বুঝিতে হইলে, শব্দ-পদ-বাক্য বুঝিতে হয়; শব্দ বুঝিতে হইলে, তাহার প্রকৃতি-প্রত্যয়, শক্তি ও বৃত্তি বুঝিতে হয়, এবং পদ-জ্ঞানের আবশ্যক হয়; আবার আকাঙ্ক্ষা আসক্তি প্রভৃতি পদ-সমূহ হইতেই বাক্যের উৎপত্তি। এইরূপ, কোনও একটি পদার্থকে মূল-স্বরূপ গ্রহণ করিয়া, অসংখ্য অবয়বের কল্পনা-পূর্ব্বক, তাহার যে বিচার পদ্ধতি—সংক্ষেপতঃ তাহাই ন্যায়-শাস্ত্র। মনে করুন, কেহ বলিলেন,—"রাম মৃত্যুর অধীন।" সেই কথা লইয়া ন্যায়ের তর্ক উপস্থিত হইল। তখন, "রাম মৃত্যুর অধীন"—এই বাক্যটীকে প্রতিজ্ঞা-রূপে গ্রহণ করিয়া, তাহার হেতু দেখাইবার চেষ্টা চলিল। 'হেতু' হইল,—"রাম একজন মনুষ্য।" তখন আবার, কেন এইরূপ 'হেতু' নির্দ্দেশ করা হয়, তাহার 'উদাহরণ' প্রদর্শনের আবশ্যক হইল। এই 'উদাহরণ'—পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অন্বয়ী ও ব্যতিরেকী—দুই প্রকারে দেখান যাইতে পারে। অন্বয়ী স্থলে বলা হইল,—"দেখা গিয়াছে, যে মনুষ্য,—সে মৃত্যুর অধীন।" ব্যতিরেকী স্থলে বলা হইল,—"যাহারা মৃত্যুর অধীন নহে, তাহারা মনুষ্য নহে।" অন্বয়ী ও ব্যতিরেকী—এই দুইরূপ উদাহরণের দ্বারা 'উপনয়' বা সংশয়-নিরসন হইল,—"যাহারা মৃত্যুর অধীন, তাহারা মনুষ্য; সুতরাং রাম একজন মনুষ্য" কাজেই নিগমন বা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল,—"মনুষ্য মাত্রেই মৃত্যুর অধীন; রাম একজন মনুষ্য; সুতরাং রামও মৃত্যুর অধীন।" ন্যায়দর্শনে এইরূপ কত বিষয়ের কত তর্কই উত্থাপিত ও মীমাংসিত হইয়াছে; কত পরিভাষায় কত সংজ্ঞায় কত তত্ত্বেরই বিচার চলিয়াছে। স্থূলতঃ, জ্ঞান-বুদ্ধির পরিস্ফুটনে ন্যায়শাস্ত্র প্রধান-স্থানীয়। কথিত হয়, গ্রীকগণ ভারতবর্ষ হইতে ন্যায়শাস্ত্রের মূলতত্ত্ব ইউরোপে লইয়া গিয়াছিলেন। শর্ম্মণাচার্য্য নামক জনৈক ব্রাহ্মণ, আলেকজাণ্ডার কর্তৃক গ্রীসদেশে নীত হন। শর্ম্মণাচার্য্য ন্যায়দর্শনে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন; আলেকজাণ্ডারের আদেশে গ্রীসদেশে তিনি ন্যায়দর্শন প্রচার করেন। তাঁহারই প্রচারিত দর্শন-তত্ত্ব অবগত হইয়া আরিষ্টটল প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ শর্ম্মণাচার্য্য ন্যায়দর্শন প্রচার-রূপ আপন কার্য্য সমাপনান্তে অগ্নিতে আত্ম-বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন—এইরূপ কিংবদন্তী আছে। অন্যান্য দর্শনের প্রভাব অধুনা কতক পরিমাণে লোপ পাইলেও, ন্যায়-দর্শনের চর্চ্চা এখনও এদেশে বিশেষরূপ দেখা যায়। তবে নব্য-ন্যায়ের আধিপত্যে প্রমাণ-পরিচ্ছেদ-চতুষ্টয়ের শব্দতত্ত্ব আলোচনাতেই আজকাল অনেক সময় কাটিয়া যায়।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

পাতঞ্জল-দর্শন।

[মহর্ষি পতঞ্জলি ও তাঁহার যোগশাস্ত্রের পরিচয়,—সাঙ্খ্য ও পাতঞ্জলে সাদৃশ্য,—পতঞ্জলি কর্তৃক অতিরিক্ত পুরুষ বা ঈশ্বর স্বীকার,—কৈবল্যপ্রাপ্তিই পাতঞ্জল-দর্শনের প্রতিপাদ্য,—একমাত্র যোগই কৈবল্য-প্রাপ্তির উপায়,—যোগের প্রকার-ভেদ,—চিত্তবৃত্তি ও তাহার অবস্থার বিচার,—স্বরূপপ্রাপ্তি বা চিৎরূপে অবস্থিতিই কৈবল্য ;—বিবিধ যৌগিক ক্রিয়া,—মহারাজ রণজিৎ সিংহের দরবারে সাধুর অলৌকিক সমাধি,—যোগ-মাহাত্ম্য।]

মহর্ষি পতঞ্জলি-প্রণীত দর্শন—পাতঞ্জল-দর্শন বা যোগশাস্ত্র নামে অভিহিত। পাতঞ্জল-দর্শন চারি পাদে (ভাগে) বিভক্ত। (১) সমাধি-পাদ,—এই পাদে যোগের লক্ষণাদি বর্ণিত হইয়াছে ; (২) সাধন-পাদ,—কিরূপে যোগক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হইবে, ইহাতে তাহার প্রকরণাদি লিখিত আছে ; (৩) বিভূতি-পাদ,—ইহাতে ধ্যান-ধারণাদি বিভূতি-বিবরণ পরিবর্ণিত ; (৪) কৈবল্য-পাদ,—ইহাতে সিদ্ধিপঞ্চকাদি দ্বারা কৈবল্য বা মোক্ষলাভের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে।

পতঞ্জলি ও যোগশাস্ত্র।

এই চারি পাদে সর্ব্বসমেত এক শত পঁচানব্বইটি সূত্র আছে। সাঙ্খ্যদর্শনের সহিত পাতঞ্জল-দর্শনের বিবিধ সাদৃশ্য দেখা যায়। সেই জন্য, এই দর্শনের অপর নাম—সাঙ্খ্য-প্রবচন। পরন্তু এই দর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত হওয়ায়, ইহা 'সেশ্বর সাঙ্খ্য' নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। মহর্ষি পতঞ্জলির জন্ম-সম্বন্ধে এক অদ্ভুত কিম্বদন্তী আছে ;—তিনি স্বর্গ হইতে সর্পাকারে পাণিনি মুনির হস্তে নিপতিত হইয়াছিলেন,—এই জন্যই তাঁহার নাম পতঞ্জলি হইয়াছিল (পাণিনির 'অঞ্জলিতে পতন' এই জন্যই 'পতঞ্জলি')। যাহা হউক, পতঞ্জলি নামেও একাধিক ঋষির পরিচয় পাওয়া যায়। পাণিনির একজন ভাষ্যকারের নাম পতঞ্জলি ছিল। যোগশাস্ত্র-প্রযোক্তা বলিয়াও একজন পতঞ্জলির পরিচয় পাওয়া যায়। পাতঞ্জল-দর্শন-প্রণেতা পতঞ্জলি তো আছেনই। পাতঞ্জল-দর্শনের ভাষ্যের মধ্যে 'ব্যাস-ভাষ্য' বিশেষ প্রসিদ্ধ। সেই ব্যাসভাষ্যের দুইটী টীকা আছে ; 'তত্ত্ব-বৈশারদী' নাম্নী টীকা বাচস্পতি মিশ্র প্রণয়ন করেন, এবং 'যোগবার্ত্তিক'-টীকা বিজ্ঞান-ভিক্ষু কর্তৃক রচিত হয়। ভোজরাজ কর্তৃক পাতঞ্জল-দর্শনের এক বৃত্তি লিখিত হইয়াছিল। সে বৃত্তিও এখন পণ্ডিত-সমাজে বিশেষ আদরণীয়।

সংসারকে দুঃখনিদান বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া, পতঞ্জলি দুঃখ-নিবৃত্তির যে উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—এই পাতঞ্জল-দর্শনে বা যোগশাস্ত্রে তাহাই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এ বিষয়ে পতঞ্জলির মত প্রধানতঃ সাঙ্খ্যমতের অনুসরণকারী। প্রত্যুত্তঃ, পাতঞ্জল বলেন,—প্রকৃতি-পুরুষের ভেদজ্ঞান লাভ করিতে হইলে যোগ আবশ্যক। যোগ ভিন্ন, তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না ;—কৈবল্য বা মোক্ষলাভ সম্ভবপর নহে। পদার্থ-তত্ত্ব-নিরূপণ-সম্বন্ধেও সাঙ্খ্যের সহিত পাতঞ্জলের সামান্য পার্থক্য আছে। সাঙ্খ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব বা পদার্থের উপর পাতঞ্জল-দর্শন অতিরিক্ত

পাতঞ্জল-দর্শনের প্রতিপাদ্য।

এক পুরুষ বা "ঈশ্বর" স্বীকার করেন। তিনি বলেন,—পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব ব্যতীত সেই এক পুরুষ আছেন,—যিনি "ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ।" অর্থাৎ, যিনি অবিদ্যামূলক ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক ও আশয়ের সহিত সম্বন্ধশূন্য, সেই পুরুষ-বিশেষই ঈশ্বর; তিনি জ্ঞানাধার, তিনি ব্রহ্মাদি গুরুগণের গুরু, তিনি ত্রিকালের অতীত। পাতঞ্জলের মতে,—সাধারণ পুরুষ রাগদ্বেষাদি ক্লেশের, পাপপুণ্য কর্ম্মের, জন্মায়ুভোগ কর্ম্মফলের এবং তদনুরূপ সংস্কারের অধীন। কিন্তু বিশেষ পুরুষ বা ঈশ্বর সে সকলের অতীত,—সকলেরই সহিত সম্পর্কশূন্য; তিনিই সর্ব্বজ্ঞ, তিনিই অনন্ত, তাঁহাতেই জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা। যোগ-প্রভাবে জ্ঞানের সেই পরাকাষ্ঠা লাভ হয়। সেই জ্ঞানলাভই—কৈবল্য। কৈবল্য-নিরূপণই পাতঞ্জল-দর্শনের প্রতিপাদ্য। তাই প্রথমে স্থূলভাবে পদার্থাদির বিচার করিয়া, যোগের প্রকরণ এবং যোগপ্রভাবে কিরূপে কৈবল্যলাভ হয়,—এই দর্শনে তাহাই দেখান হইয়াছে। পতঞ্জলি 'যোগ'-শব্দের সংজ্ঞা-নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।" অর্থাৎ, যদ্দ্বারা চিত্তবৃত্তি রোধ করিতে পারা যায়, তাহারই নাম যোগ। যোগের আট অঙ্গ;—"যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি"; অর্থাৎ, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। এতন্মধ্যে প্রথমোক্ত পাঁচটী বহিরঙ্গ এবং শেষোক্ত তিনটী অন্তরঙ্গ; যেহেতু, যম-নিয়মাদির সহিত শরীরের এবং ধ্যান-ধারণাদির সহিত চিত্তের সম্বন্ধ। হেয়, হেয়-হেতু, হান ও হানোপায়—যোগশাস্ত্রের এই চারিটী পর্ব্ব। পতঞ্জলির মতে সংসার হেয়; কেন-না, দুঃখময়। প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগই দুঃখের হেতু; কেন-না, তাহাতেই যত কিছু অবিদ্যার উৎপত্তি। প্রকৃতি-পুরুষের সেই সংযোগ-বিচ্ছিত্তিই হান; কেন-না, তদ্দ্বারা অবিদ্যা হনন হইয়া থাকে। প্রকৃতি-পুরুষের ভেদজ্ঞানই হানোপায়; কেন-না, তদ্দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে মিথ্যাজ্ঞান তিরোহিত হয়। যোগদ্বারাই পুরুষ এই হানোপায় স্থির করিতে পারেন। "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ"—যোগের এই সংজ্ঞা নির্দ্দেশের পর, পতঞ্জলি চিত্তের অবস্থা ও চিত্তের বৃত্তির আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে,—চিত্তের অবস্থা পাঁচ প্রকার; বৃত্তিও পঞ্চবিধ। চিত্তের সেই পাঁচ অবস্থার নাম,—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র, নিরুদ্ধ। চিত্তে নিতান্ত চাঞ্চল্য উপস্থিত হইলে চিত্ত ক্ষিপ্ত, অর্থাৎ রজোগুণাধিক্যযুক্ত; চিত্ত মোহাচ্ছন্ন হইলে, চিত্ত মূঢ় (অর্থাৎ তমোভাবাপন্ন); চিত্তে কখনও স্থৈর্য্য কখনও অস্থৈর্য্য ভাবের সমাবেশে, চিত্ত বিক্ষিপ্ত (অর্থাৎ, সত্ত্বরজাদির দ্বন্দ্ব-ভাব-পূর্ণ); চিত্ত অবিচলিত ভাবে ধ্যেয় বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট থাকিলে, চিত্ত একাগ্র; এবং সকল বৃত্তির নিরোধ হইলে, চিত্ত নিরুদ্ধ। বৃত্তি-পঞ্চক,—প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা, স্মৃতি। প্রমাণের প্রসঙ্গ পুনঃপুনঃ আলোচিত হইয়াছে; বিপর্য্যয় অর্থ—বৈপরীত্য অর্থাৎ মিথ্যা জ্ঞান; বিকল্প—ইচ্ছানুযায়ী কল্পনা বিশেষ ইত্যাদি। যোগ-প্রভাবে এই সকল চিত্ত-বৃত্তির রোধ হইতে পারে; অর্থাৎ, পুরুষে কোনরূপ বিকৃতি উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। পতঞ্জলির যোগ-শাস্ত্র তাই, বিবিধ প্রকারে চিত্তবৃত্তি-নিরোধের উপায়-পরম্পরা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে,—চিত্তের বিক্ষিপ্ত অবস্থায় যোগের আরম্ভ হইয়া থাকে; নিরুদ্ধ-চিত্তেই পূর্ণ

যোগ। কিন্তু চিত্তবৃত্তি-নিরোধ কি প্রকারে হইতে পারে? তদুত্তরে পতঞ্জলি বলেন,—"অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাম্ তন্নিরোধঃ।" অর্থাৎ, অভ্যাস ও বৈরাগ্য-দ্বারাই চিত্তবৃত্তি-নিরোধ হয়। সেই চিত্তবৃত্তি-নিরোধের অপর নাম—সমাধি। সমাধি নানাপ্রকার এবং নানারূপে সিদ্ধ হইয়া থাকে। ঈশ্বর-প্রণিধান দ্বারা সমাধি হয়; চিত্ত-স্থৈর্য্যের দ্বারা সমাধি হয়। যে সমাধি দ্বারা সমস্ত বৃত্তি নিরুদ্ধ হয়, তাহা নির্বীজ সমাধি; সেই সমাধি আয়ত্ত হইলেই পুরুষ শুদ্ধ-মুক্ত; সেই অবস্থার নামই—পুরুষের কৈবল্য-লাভ। কৈবল্য-লাভ হইলে পুরুষ কি অবস্থায় অবস্থিতি করেন, পতঞ্জলি তাহার এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন,—

"পুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তেরিতি।"

গুণের সহিত পুরুষ সম্বন্ধ-শূন্য হইলে, পুনরায় বিকার উপস্থিত হয় না। সেই অবস্থায় কৈবল্য অর্থাৎ আত্মার স্ব-রূপে অবস্থিতি। সে অবস্থায় ভেদজ্ঞান থাকে না; আত্মা স্ব-রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। কপিলাদি যে অবস্থাকে নিঃশ্রেয়স বা মোক্ষ প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়াছিলেন, পতঞ্জলি-কথিত স্ব-রূপে অবস্থান বা কৈবল্য সেই-অর্থেই প্রযোজ্য। পতঞ্জলির মতে,—সুখ-দুঃখ আত্মার ধর্ম্ম নহে; উহা চিত্তের ধর্ম্ম, আত্মায় প্রতিবিম্বিত হয় মাত্র। সুতরাং, রাগদ্বেষাদি চিত্ত-বৃত্তির সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া, স্ব-রূপে অবস্থান করিতে পারিলেই আত্মার কৈবল্য বা মোক্ষলাভ হয়।

পতঞ্জলি-কথিত যোগ-ক্রিয়ার যে নানা প্রকার-ভেদ আছে, পূর্ব্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি। প্রাণায়াম, নিশ্বাস-রোধ, অঙ্গন্যাশ প্রভৃতি যৌগিক ক্রিয়া,—উপযুক্ত গুরুর নিকট যোগ-শাস্ত্র শিক্ষা না করিলে ফলপ্রদ হয় না। যথাবিহিত পদ্ধতি-ক্রমে যোগ-শিক্ষা করিলে, অসাধ্য সাধন সম্ভবপর। যোগ-প্রভাবে যোগীর দেহ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া যথেচ্ছ ঊর্দ্ধে আরোহণ করিতে পারে। যোগবলে যোগী ত্রিকালের বার্ত্তা অবগত হইতে পারেন। কিন্তু যোগ-শিক্ষার পাত্রও এখন বিরল এবং শিক্ষকও এখন অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। যখন যোগ-শাস্ত্রের পূর্ণ-প্রভাব এদেশে বিদ্যমান ছিল, তখন যোগ-বলে যে সকল অলৌকিক ব্যাপার সম্পন্ন হইত, এখন তাহা উপন্যাসেরও অধিক আশ্চর্য্য-জনক। অধিক বলিব কি, অর্দ্ধ-শতাব্দী পূর্ব্বেও এদেশের যোগিগণের যে ক্রিয়া-কলাপ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিলেও চমকিত হইতে হয়। কয়েকটী দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছি,—যে সকল ব্যাপারের সাক্ষ্য, বৈদেশিক ইংরেজগণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত আছেন। প্রথম,—পঞ্জাব-কেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহের দরবারে সাধু হরিদাসের যোগ-সমাধি। ডাক্তার ম্যাক্‌গ্রীগর আপনার 'শিখ-ইতিহাস' গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন,—"১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে মহারাজ রণজিৎ সিংহের উদ্যানে এই অভাবনীয় ব্যাপার সংঘটিত হয়। লাহোরে এক ফকির আসিয়াছিলেন। ফকির বলেন,—তাঁহাকে বাক্সের মধ্যে বদ্ধ করিয়া মৃত্তিকা-প্রোথিত করিলে, তিনি বিনা পানাহারে যতদিন ইচ্ছা বাঁচিয়া থাকিতে পারেন। মহারাজ রণজিৎ সিংহ সে কথা বিশ্বাস করেন না; তিনি প্রমাণ দেখিতে চান। সুতরাং সাধুকে বাক্সের মধ্যে পুরিয়া চাবি বদ্ধ করা হয় এবং সেই অবস্থায় উদ্যান-মধ্যস্থিত কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে

যোগ-মাহাত্ম্য।

বাক্স-সহ সাধু মৃত্তিকা-প্রোথিত হন। অতঃপর উদ্যান-বাটির দ্বারদেশ রুদ্ধ করিয়া, চারিদিকে প্রহরীর বন্দোবস্ত হয়। উদ্যান-বাটিকার চতুঃসীমায় যাহাতে জন-প্রাণী পদার্পণ করিতে না পারে, মহারাজ রণজিৎ সিংহ সেইরূপ আদেশ প্রদান করেন। এই ভাবে চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত্রি সাধুকে মাটীর মধ্যে পুতিয়া রাখা হয়। অবশেষে মহারাজ স্বয়ং, তাঁহার পৌত্র, তাঁহার কয়েক জন প্রধান সর্দ্দার, জেনারেল ভেণ্টম, কাপ্তেন ওয়েড এবং ডাক্তার ম্যাক্‌গ্রীগর (ইতিহাস লেখক স্বয়ং) প্রভৃতি উপস্থিত থাকিয়া সাধুকে কবর হইতে উত্তোলন করেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়—সাধুর তখনও পর্য্যন্ত কোনই বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই; বাক্সের আবরণ উন্মোচন হইলে, সাধু, যথারীতি অভিবাদন করিয়া, সহাস্য-বদনে সকলের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। ব্যাপার দেখিয়া, সকলেই আশ্চর্য্য ও স্তম্ভিত! সাধুর সম্মানার্থ তখন রাজ্য-মধ্যে ঘনঘন তোপধ্বনি হইতে লাগিল; মহারাজ রণজিৎ সিংহ স্বহস্তে সাধুর গলদেশে রত্নহার পরাইয়া দিলেন।" যে উদ্যানে হরিদাস সাধুকে মৃত্তিকা-প্রোথিত করা হইয়াছিল, সেই উদ্যানের নাম—'সর্দ্দার গওনা সিং ভণিয়াওয়ালা'; ইরাবতী (রাভী) নদীর তীরে ঐ উদ্যান বিদ্যমান ছিল। সে ব্যাপার যাঁহারা দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলেন; এবং অনেকেই তাহার নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। কাপ্তেন ওয়েডের বর্ণনায় প্রকাশ,—হরিদাস সাধুকে যখন মৃত্তিকা-মধ্য হইতে উত্তোলন করা হইয়াছিল, তখন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শীতল, কেবল মস্তকে উষ্ণা মাত্র ছিল। হানিগ্‌বার্জ্জারের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত-গ্রন্থে আর এক সাধুর অপূর্ব্ব সমাধির কথা বর্ণিত আছে। অমৃতসহরে মৃত্তিকা-খননের সময় মজুরেরা মাটীর মধ্যে সাধুকে প্রাপ্ত হইয়াছিল। সাধু কতকাল মৃত্তিকা-প্রোথিত ছিলেন, কেহই তাহা নির্ণয় করিতে পারে নাই। সাধুও যোগভঙ্গে অমৃতসহরের পরিবর্ত্তনাদি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সমাধির পূর্ব্বে সহরের এক অবস্থা ছিল; আর সমাধির পর, সহরের সম্পূর্ণ নূতন অবস্থা। তিনি সহরের যে অতীত কথা কহিয়াছিলেন, তাহাতে শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে তিনি সমাধিস্থ হইয়াছিলেন,—ইহাই প্রতিপন্ন হয়। শিখ-গুরু অর্জ্জুন-সিংহের সময়ে, প্রায় তিন শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে, এই ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। যোগদ্বারা অসাধ্য সাধনের এইরূপ কত ঘটনাই শুনিতে পাওয়া যায়। যোগবলে মানুষ আকাশে উঠিতে পারে, জল-মধ্যে ভাসমান সোলার ন্যায় বায়ু-মধ্যে ভাসমান থাকিতে পারে,—এ দৃশ্যও অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে দার্জ্জিলিং পাহাড়ে কতকগুলি ইংরেজের সমক্ষে একজন তিব্বত-দেশীয় লামা এই আশ্চর্য্য যোগ-ক্রিয়া প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যোগবলে মানুষ দীর্ঘ জীবন লাভ করে, যথেচ্ছ-স্থানে গমন করিতে সমর্থ হয় এবং সর্ব্ববিষয়ে তাহার অভিজ্ঞতা জন্মে,—যোগের এইরূপ কত মহিমাই কীর্ত্তিত আছে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি তো—শিক্ষকের ও শিক্ষার অভাবে যোগ-সাধনা এখন বিলুপ্ত-প্রায়। যোগশাস্ত্র-বিষয়ক যে সকল গ্রন্থাদি আছে, তাহার প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা এবং তদনুসারে কার্য্য করা—এখন ক্রমশঃই কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

মীমাংসা-দর্শন।

[জৈমিনি ও মীমাংসা-দর্শন,—বিভিন্ন জৈমিনির প্রসঙ্গ,—কর্ম্মকাণ্ডের প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠায় জ্ঞানকাণ্ডের অপ্রাধান্য,—ভাষ্য ও টীকাকারগণ;—বেদের নিত্যত্ব,—যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকর্ম্মই মোক্ষের মূলীভূত,—বেদের পঞ্চ অঙ্গ,—বিধি-চতুষ্টয়,—ঈশ্বর-বিষয়ক বাদানুবাদ,—অধিকারি-প্রসঙ্গ,—শব্দের নিত্যত্ব,—ন্যায় ও মীমাংসার শব্দ-প্রমাণ-বিচারে তর্ক-বিতর্ক,—বেদ-বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানই মোক্ষফলপ্রদ।]

মহর্ষি জৈমিনি-প্রবর্ত্তিত দর্শন—প্রধানতঃ 'মীমাংসা-দর্শন' নামে পরিচিত। জৈমিনি নামেও একাধিক ঋষির পরিচয় পাওয়া যায়; সুতরাং কোন্ জৈমিনি মীমাংসা-দর্শন প্রণয়ন করেন, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের এক শিষ্যের নাম জৈমিনি ছিল। 'জৈমিনি ভারত' নামক গ্রন্থ তাঁহারই রচিত বলিয়া কথিত হয়। তিনি বেদব্যাসের নিকট মহাভারত ও সামবেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। জৈমিনির নামে সামবেদের এক শাখা আছে; কোন্ জৈমিনি কর্ত্তৃক সে শাখা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তিনি ও বেদব্যাস-শিষ্য জৈমিনি এক কি-না,—তাহারও কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না। জৈমিনি-প্রমুখ ছয় জন ঋষি বজ্রবারক নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন; তাঁহাদের নাম স্মরণে বা উচ্চারণে বজ্রাহত হইতে হয় না,—এইরূপ লিখিত আছে। এতদ্ভিন্ন দর্শনকার জৈমিনির প্রসিদ্ধির বিষয়—কে না অবগত আছেন? যাহা হউক, জৈমিনি-প্রণীত দর্শন এখন মীমাংসা-দর্শন, জৈমিনি-দর্শন ও পূর্ব্ব-মীমাংসা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই দর্শন-সংক্রান্ত শবর-স্বামি-রচিত ভাষ্য, কুমারিল ভট্ট-কৃত 'বার্ত্তিক,' মাধবাচার্য্য-কৃত 'অধিকরণ' এবং অপদেব ও লৌগাক্ষী ভাস্করের 'প্রকরণ' প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ প্রসিদ্ধ।* বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডের প্রতিষ্ঠাই—এই দর্শন-শাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য। কর্ম্মকাণ্ডের প্রাধান্য প্রতিপাদন করিয়া ধর্ম্মতত্ত্বের মীমাংসা হইয়াছে বলিয়াই, এই দর্শন—মীমাংসা-দর্শন সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। কর্ম্ম-মীমাংসা, অধ্বর-মীমাংসা বা কর্ম্ম-কাণ্ড নামেও জৈমিনি-দর্শন পরিচিত। ধর্ম্মতত্ত্ব-নিরূপণে মীমাংসার প্রয়োজন—"ধর্ম্মাখ্যং বিষয়ং বক্তুং মীমাংসায়াঃ প্রয়োজনম্",—এই হেতুবাদে, শ্রুতি-স্মৃতির বিরোধভঞ্জনোদ্দেশ্যে, মীমাংসা-দর্শন বিরচিত হয়। এই দর্শনের প্রথম সূত্র,—"অথাতো ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা।" ধর্ম্ম-মীমাংসার জন্যই এই দর্শনের অবতারণা। বেদের মীমাংসা আছে বলিয়া, সেই মীমাংসায় বেদ-বিহিত যজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ডের প্রাধান্য কীর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া, মীমাংসা-দর্শনের প্রাধান্য। কেহ কেহ বলেন,—উপনিষৎ এবং দর্শন-শাস্ত্রের জ্ঞান-কাণ্ডের প্রভাব যখন দেশমধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, জন-সাধারণ যখন ক্রমে

জৈমিনি ও মীমাংসা দর্শন।

* শবর-স্বামীর ভাষ্যের 'তন্ত্রবার্ত্তিক' নামক যে টীকা আছে, কুমারিল ভট্ট তাহা প্রণয়ন করেন। মাধবাচার্য্যের গ্রন্থের নাম—জৈমিনি ও ন্যায়মালা বিস্তার। আপদেবের গ্রন্থের নাম—মীমাংসা-ন্যায়-প্রকাশ। লৌগাক্ষী ভাস্করের গ্রন্থের নাম—অর্থ-সংগ্রহ।

ক্রমে কর্ম্ম-কাণ্ডে উদাসীনতা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করে, সেই সময় এই মীমাংসা-দর্শন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। মীমাংসা-দর্শন দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। যজ্ঞ, অগ্নি-হোত্র, দান প্রভৃতি বিষয় এই দর্শনে বিশদ-ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

মীমাংসা দর্শন বেদের নিত্যত্ব-স্বীকার করেন। বেদ অপৌরুষেয় ও অভ্রান্ত; বেদ চিরদিন বিদ্যমান আছে, এবং চিরদিন বিদ্যমান থাকিবে; বেদ স্বতঃসিদ্ধ;—মীমাংসা-দর্শন ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। জৈমিনির মতে,—বেদের কর্ম্ম-কাণ্ডই সর্ব্বস্ব; তদতিরিক্ত বেদে আর যাহা আছে, সে কেবল কর্ম্ম-কাণ্ডে প্রবৃত্তি জন্মাইবার উদ্দেশ্যে। মীমাংসাকার বেদকে পঞ্চাঙ্গে বিভক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে,—বিধি, নিষেধ, মন্ত্র, নামধেয়, অর্থবাদ,—বেদের এই পাঁচটী অঙ্গ। বেদের যে বাক্যে মনুষ্যের কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাই বিধি; এবং যদ্দ্বারা অকর্ত্তব্যে নিরস্ত করা হইয়াছে, তাহাই নিষেধ। যেমন,—স্বর্গলাভের জন্য যজ্ঞ করিবে,—ইহাই বিধি; দিবাভাগে নিদ্রা যাইও না,—ইহাই নিষেধ। উৎপত্তি, বিনিয়োগ, প্রয়োগ, অধিকার প্রভৃতি ভেদে 'বিধি' নানাবিধ। কোন্ যজ্ঞ করিবে, কাহার উদ্দেশ্যে বা কি দ্রব্যে সে যজ্ঞ সাধিত হইবে, যজ্ঞানুষ্ঠানে কি কি অঙ্গের প্রয়োজন, কোন্ যজ্ঞ কাহার অনুষ্ঠেয়,—বিধি-চতুষ্টয়ে তাহাই নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। মনে করুন,—কেহ 'অগ্নিহোত্র'-যজ্ঞ করিবেন। তাঁহার অবশ্যই জানা প্রয়োজন—কোন্ দ্রব্যের দ্বারা কোন্ দেবতার উপাসনা আবশ্যক। তার পর, আরও জানা প্রয়োজন,—সেই যজ্ঞে কোন্ ক্রিয়ার পর কোন্ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান বিধি-সঙ্গত। আর জানা আবশ্যক,—তিনি কিরূপ যজ্ঞের অধিকারী। ফলে, যে কোনও ব্যক্তি যে কোনও দ্রব্যে যে কোনও যজ্ঞানুষ্ঠানের অধিকারী নয়,—বিধি-চতুষ্টয় তাহাই নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। নিয়ম ও পরিসংখ্যার দ্বারা এই বিধির আবার বিচার হইয়া থাকে। মন্ত্র অর্থ,—দেবতাদিগের আবাহন। তাহার ক্রমভঙ্গ, শব্দ-বিপর্য্যয় বা উচ্চারণ-দোষ অভীষ্ট কার্য্যের অন্তরায়-সাধক। যে উদ্দেশ্যে যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়,—তাহাই সেই যজ্ঞের নামধেয়। অর্থবাদ দ্বারা বিধি-নিষেধের প্রশংসা-নিন্দা সূচিত হয়। অর্থবাদ ত্রিবিধ;—গুণবাদ, অনুবাদ, ভূতার্থবাদ। সকল বাদের সকল শব্দের সংজ্ঞা-নির্দ্দেশ এস্থলে সম্ভবপর নহে; এখানে স্থূলতঃ এই মাত্র বলিয়া রাখি,—বেদে কি কি বিষয় আছে এবং তদ্দ্বারা যাগ-যজ্ঞাদির প্রাধান্য কি প্রকারে সূচিত হইতেছে,—মীমাংসা-দর্শন প্রধানতঃ তাহাই দেখাইয়াছেন। তাঁহার মতে,—যজ্ঞই সারভূত; অন্যান্য সকলই অবান্তর মাত্র। তাই তিনি স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন,—"আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ আনর্থক্যমতদর্থানং।" অর্থাৎ, কর্ম্মই বেদের সার; কর্ম্ম ভিন্ন বেদে অন্য যে অংশ দৃষ্ট হয়, তাহা অনর্থক। অধিক বলিব কি, মীমাংসাকার দেবতার পর্য্যন্ত অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তিনি বলেন,—"মন্ত্রই দেবতা। দেবতা কখনও শরীরী হইতে পারেন না; শরীরী হইলে, একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তাঁহার অবস্থান অসম্ভব; পরন্তু, তাহাতে তাঁহার স্তুতিকারীর চাক্ষুষ হওয়া সম্ভবপর ছিল।" জৈমিনির মতে,—যজ্ঞাদি কর্ম্মই মোক্ষ-ফলপ্রদ। তবে যজ্ঞের

মীমাংসার প্রতিপাদ্য।

ক্রিয়া-পদ্ধতি এবং মন্ত্রোচ্চারণাদি বিশুদ্ধ-ভাবে সমাহিত না হইলে, অভীষ্ট-লাভে বিঘ্ন ঘটিতে পারে,—ইহাই তাঁহার মীমাংসা। জৈমিনির দর্শনের মধ্যে ঈশ্বরের নাম নাই। শঙ্করাচার্য্য এইজন্য জৈমিনির মীমাংসা-দর্শনকে নাস্তিকা-দর্শন নামে অভিহিত করিয়াছেন। অপরাপর ভাষ্যকার কিন্তু জৈমিনির প্রতি সেরূপ কটাক্ষপাত করেন নাই। তাঁহারা বলেন,—"জৈমিনির মীমাংসা-দর্শনে যদিও 'ঈশ্বর'-শব্দ নাই ; তথাপি,উহাকে নিরীশ্বরবাদপূর্ণ বলা যাইতে পারে না। মীমাংসা-দর্শনের "ব্রহ্মাপীতি চেৎ" সূত্রে জৈমিনি ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, সপ্রমাণ হয়।" জৈমিনি অধিকারিভেদ স্বীকার করিতেন ; জৈমিনি বেদ মানিতেন ; কিন্তু বেদকে ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া স্বীকার করিতেন না। তাঁহার মতে,—বেদের কর্ত্তা থাকিতে পারে না ; শব্দের নিত্যত্ব ও একত্বই বেদের মূলীভূত। তাই শব্দের নিত্যত্ব প্রমাণের জন্য তিনি একাধিক সূত্র প্রয়োগ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—(১) "নিত্যস্তু স্যাৎ দর্শনস্য পরার্থত্বাৎ," (২) "সর্ব্বত্র যৌগপদ্যাৎ, (৩) "সংখ্যাভাবাৎ", (৪) "অনপেক্ষত্বাৎ", এবং (৫) "লিঙ্গদর্শনাচ্চ।" অর্থাৎ—উচ্চারণ-মাত্র শব্দের অর্থ-পরিগ্রহ হয়, শব্দ বিনষ্ট হয় না, সুতরাং শব্দ নিত্য ; সর্ব্বদা সর্ব্বত্র এক শব্দের একই অর্থ গৃহীত হইয়া থাকে,—এজন্যও শব্দ এক ও নিত্য ; শব্দের ক্ষয়বৃদ্ধি নাই, যেহেতু একই শব্দ পুনঃপুনঃ উচ্চারিত হইলে তদ্দ্বারা শব্দোচ্চারিত বস্তুর সংখ্যাবৃদ্ধি হয় না, শব্দ বিনষ্ট হইবারও কোনও হেতু দেখা যায় না। * সেই নিত্য অপৌরুষেয় শব্দই—বেদ ; বেদ-বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানই—মোক্ষলাভের একমাত্র শরণি।

* নৈয়ায়িকগণ শব্দের নিত্যত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহাদের যুক্তি,—(১) "কর্ম্ম একে তত্র দর্শনাৎ", (২) "অস্থানাৎ", (৩) "করোতি শব্দাৎ," (৪) "সত্ত্বান্তরে যৌগপদ্যাৎ", (৫) "প্রকৃতি বিকৃতিশ্চ," (৬) "বৃদ্ধিশ্চ কর্ত্তৃভূমাস্য।" অর্থাৎ, যত্ন দ্বারা শব্দ উচ্চারিত হইয়া থাকে ; সুতরাং তাহার সর্ব্বকালবিদ্যমানতা বা নিত্যত্ব নাই। উৎপত্তি মাত্র শব্দ নষ্ট হয় ; শব্দ অস্থায়ী ; সুতরাং তাহাতে নিত্যত্ব সম্ভবে না। 'শব্দ করিয়া থাকে' অর্থাৎ লোকে শব্দের সৃষ্টি-কর্ত্তা ; সুতরাং শব্দের নিত্যত্ব সপ্রমাণ হয় না একক্ষালে বহু ব্যক্তির কর্ণগোচর হয় ; সুতরাং বহুত্ব-হেতু তাহার একত্ব ও নিত্যত্ব অসম্ভব। প্রকৃতি-প্রত্যয়হেতু শব্দের রূপান্তর বা বিকৃতি ঘটিয়া থাকে ; সুতরাং শব্দ নিত্য হইতে পারে না। একই শব্দ একাধিক ব্যক্তি উচ্চারণ করিলে, একাধিক বার সেই শব্দ উচ্চারিত হইতে পারে ; শব্দকর্ত্তার সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি-হেতু শব্দেরও হ্রাস-বৃদ্ধি হয় ; সুতরাং শব্দের নিত্যত্ব নাই। মীমাংসকগণ কিন্তু নৈয়ায়িকগণের ঐ আপত্তিও খণ্ডন করেন। তাঁহারা বলেন,—(১) "সতঃ পরমদর্শনং বিষয়ানাগমাৎ", (২) "প্রয়োগস্য পরম্", (৩) "আদিত্যবৎ যৌগপদ্যং", (৪) "বর্ণান্তরমবিকারঃ" এবং (৫) "নাদবৃদ্ধিঃ পরা।" অর্থাৎ, শব্দ সর্ব্বসময়ে উচ্চারণকারীর সহিত সম্বন্ধযুক্ত থাকে না,—এই জন্য উহা অনিত্য বলিয়া বোধ হয় বটে ; কিন্তু যে শব্দে যে জ্ঞান, সে জ্ঞান চিরকালই সমভাবে রহিয়া যায়। সুতরাং শব্দ অনিত্য নহে—নিত্য। 'শব্দ করে' ইহার তাৎপর্য্য—শব্দের উচ্চারণমাত্র, শব্দের নির্ম্মাণ নহে। সূর্য্য যেমন সর্ব্বত্র পরিদৃশ্যমান, শব্দও তদ্রূপ এক হইয়াও বহুব্যক্তির শ্রাব্য হইয়া থাকে। প্রকৃতি-প্রত্যয়ে বর্ণের পরিবর্ত্তনে বর্ণের বিকার হয় না ; বর্ণ বর্ণান্তরে অবস্থিতি করে মাত্র। একই শব্দ বহুবার উচ্চারিত হইলে, ধ্বনিমাত্র বৃদ্ধি হয় ; শব্দ-বৃদ্ধি কদাচ সম্ভবপর নহে। সুতরাং শব্দের নিত্যত্ব স্বতঃ-প্রমাণিত।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বেদান্ত-দর্শন।

[বাদরায়ণ ও বেদান্ত-দর্শন,—বেদান্ত-দর্শনের প্রণেতা ও তাঁহার নানা নাম-পরিচয়,—অধ্যায় ও সূত্র-সংখ্যা,—অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত তত্ত্ব,—শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, মধ্বাচার্য্য, বল্লভাচার্য্য প্রভৃতির ভাষ্যে দ্বৈতাদ্বৈত বিবিধ মত প্রতিষ্ঠা,—বেদান্ত-দর্শন সম্বন্ধে নানা মতের নানা গ্রন্থ;—দ্বৈতাদ্বৈত মতের পার্থক্য-প্রসঙ্গ;—প্রথম সূত্রে অধিকার-তত্ত্ব,—তৎসম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্য ও বলদেব ভাষ্যের মত;—অদ্বৈত মতের পরিচয়,—জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নত্ব,—শ্রবণ-মননাদি সাধন-পরম্পরা,—জ্ঞানের বিক্ষেপ ও আবরণ-শক্তি,—অজ্ঞান-নাশে তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে মুক্তি;—সত্য-মিথ্যার সংজ্ঞা-নির্দ্দেশ,—ঘট ও মৃত্তিকার দৃষ্টান্তে জীব ও ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদন,—ব্রহ্মের স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ,—অদ্বৈতবাদীর উপাসনার তাৎপর্য্য;—দ্বৈতবাদীর সহিত অদ্বৈতবাদীর মত-পার্থক্য,—ব্রহ্ম ও জীবের স্বাতন্ত্র্য,—ব্রহ্ম উপাস্য, জীব উপাসক,—ধ্যান-ধারণা-উপাসনা-পদ্ধতি;—বেদান্ত-দর্শনে বিবিধ তত্ত্ব,—সৃষ্টি-প্রসঙ্গ (দ্বৈতাদ্বৈত মতে),—উপাসনা-পদ্ধতি (সগুণ নির্গুণ ভেদে),—পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদ,—মায়াবাদ ও প্রকৃতিবাদ,—প্রলয়;—বেদান্ত-সূত্রে ব্যাসের অভিপ্রায়, বেদান্তসূত্রে জীবের ইষ্টানিষ্ট।]

বেদান্ত-দর্শন—দর্শন-শাস্ত্রের শিরোমণি-স্বরূপ। বেদোক্ত জ্ঞান-কাণ্ডের প্রতিষ্ঠা—বেদান্ত-দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য। তজ্জন্য এই দর্শনের নাম—বেদান্ত (বেদের অন্ত বা শেষ ভাগ) বা বেদান্ত-সূত্র। মহর্ষি বাদরায়ণ বা বেদব্যাস * এই দর্শন প্রণয়ন করেন। এই বাদরায়ণ বা বেদব্যাস সম্বন্ধে অনেক মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ বলেন, উঁহারা দুই জন স্বতন্ত্র ঋষি ছিলেন। কেহ বলেন,—উঁহারা একই ব্যক্তি। আবার কেহ বলেন,—বদরিকাশ্রমে নিত্যবাস-হেতু বেদব্যাস এবং তাঁহার বংশধরগণ 'বাদরায়ণ'-নামে অভিহিত হইতেন। অষ্টাদশ মহাপুরাণ বেদব্যাসের রচিত দেখিয়া, কেহ কেহ বেদব্যাস-নামধেয় বহু ঋষির কল্পনা করিতেও ত্রুটি করেন না। কিন্তু যতদূর প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাতে পরাশর-তনয় বেদ-ব্যাসই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বাদরায়ণ প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ এবং বেদান্ত-দর্শন তাঁহারই প্রণীত।

বাদরায়ণ ও বেদান্ত-দর্শন।

বেদান্ত-দর্শনের সূত্র-সমূহ প্রধানতঃ ব্রহ্ম-নির্ণয়ার্থ রচিত হইয়াছিল বলিয়া, এই দর্শন 'ব্রহ্মসূত্র' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বাচস্পতি মিশ্র বেদান্ত-দর্শনকে 'ভিক্ষু-সূত্র' সংজ্ঞা প্রদান করেন। সংসার-ত্যাগী চতুর্থাশ্রমিগণ প্রধানতঃ বেদান্ত-দর্শনের আলোচনা করিতেন বলিয়া, বেদান্ত-সূত্র ভিক্ষু-সূত্র নামে পরিচিত হয়। জৈমিনির মীমাংসা-দর্শনে কর্ম্মকাণ্ডের উপযোগিতা প্রতিপন্ন হইয়াছিল; আর এই বেদান্ত-দর্শনে জ্ঞানকাণ্ডের উপযোগিতা প্রতিপন্ন হয়। প্রকারান্তরে দুই দর্শনে বেদের দুই অঙ্গের (একে কর্ম্মকাণ্ডের, অন্যে জ্ঞানকাণ্ডের) আলোচনা হইয়াছে। সেই হেতু, জৈমিনির দর্শন 'পূর্ব্বমীমাংসা' নামে এবং বাদরায়ণের দর্শন 'উত্তর-মীমাংসা' নামেও পরিচিত। বেদান্ত-দর্শনে চারিটি অধ্যায় আছে। প্রত্যেক অধ্যায় আবার চারিটি করিয়া 'পাদে' বিভক্ত। ইহার সূত্রসংখ্যা—পাঁচ শত আটান্নটী;—প্রথম অধ্যায়ের চারি পাদে এক শত পঁয়ত্রিশটী, দ্বিতীয় অধ্যায়ের চারি

পাদে এক শত পঞ্চান্নটী (শঙ্করাচার্য্যের মতে এক শত ছাপান্নটী), তৃতীয় অধ্যায়ের চারি-পাদে একশত নব্বইটী, এবং চতুর্থ অধ্যায়ের চারি পাদে আটাত্তরটী। গণনায় সূত্র-সংখ্যার কোথাও কোথাও কমিবেশী দেখিতে পাই ; তাহার কারণ,—কেহ বা একাধিক সূত্রকে একটী সূত্রে এবং কেহ বা একটী সূত্রকে একাধিক সূত্রে গ্রথিত করিয়া লইয়াছেন। প্রথম অধ্যায়ের সাধারণ নাম—সমন্বয়াধ্যায়। এই অধ্যায়ে নানাবিধ শ্রুতি-বাক্যের সমন্বয়-সাধন বা বিরোধ-ভঞ্জন হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদে স্পষ্ট-জ্ঞাপক শ্রুতি-সমূহের, দ্বিতীয় পাদে অস্পষ্ট ব্রহ্ম-ভাবাত্মক শ্রুতি-সমূহের এবং তৃতীয় ও চতুর্থ পাদে সংশয়াত্মক শ্রুতি-সমূহের সমন্বয় করা হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের সাধারণ নাম—অবিরোধাধ্যায়। এই অধ্যায়ের প্রথম পাদে স্বমত প্রতিষ্ঠার জন্য স্মৃতি-তর্কাদি বিরোধের পরিবর্জ্জন, দ্বিতীয় পাদে বিরুদ্ধ-মতে দোষারোপ, তৃতীয় পাদে ব্রহ্ম হইতে তত্ত্বসমূহের উৎপত্তি-প্রমাণ, এবং চতুর্থ পাদে ভূত-বিষয়ক শ্রুতি-সমূহের বিরোধ ভঞ্জন করা হইয়াছে। ফলে, এই অধ্যায়ে বিরোধী দার্শনিক মত খণ্ডন-পূর্ব্বক মহর্ষি বাদরায়ণ বেদান্ত-মতের অবিরোধ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তৃতীয় অধ্যায়ের সাধারণ নাম—সাধনাধ্যায়। এই অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে ব্রহ্ম ভিন্ন অন্যের প্রতি আকাঙ্ক্ষা পরিহার-পূর্ব্বক ব্রহ্ম-প্রাপ্তির সাধনভূত ব্রহ্ম-তৃষ্ণার সার্থকতা প্রদর্শিত হইয়াছে ; তৃতীয় পাদে ভগবদ্‌গুণ নিরূপণ করিয়া দর্শনকার নিখিল পুরুষার্থ-হেতুত্ব বর্ণন করিয়াছেন। সাধন-তত্ত্ব বিচারিত হইয়াছে বলিয়াই, তৃতীয় অধ্যায় 'সাধন অধ্যায়' নামে অভিহিত হয়। চতুর্থ অধ্যায়ের সাধারণ নাম—ফলাধ্যায়। এই অধ্যায়ের সূত্রসমূহে নানাবিধ সাধনের ফল বিচারিত হইয়াছে। বেদান্ত দর্শনের ভাষ্যসমূহের মধ্যে বোধায়ন-কৃত ভাষ্যই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, বল্লভাচার্য্য, মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণ যে সকল ভাষ্য-গ্রন্থ রচনা করেন, তৎসমুদায় বিশেষ প্রসিদ্ধ। শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যের নাম—শারীরিক ভাষ্য ; রামানুজের ভাষ্যের নাম—শ্রীভাষ্য ; মধ্বাচার্য্যের ভাষ্যের নাম—পূর্ণপ্রজ্ঞ ভাষ্য ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত, বিষ্ণুস্বামী, নিম্বাদিত্য, বিজ্ঞানভিক্ষু, নীলকণ্ঠ, বলদেব, যাদবমিশ্র, বল্লভ, শ্রীকণ্ঠ প্রভৃতির ভাষ্যও উল্লেখযোগ্য। শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যে অদ্বৈতবাদ, রামানুজের ভাষ্যে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, বল্লভাচার্য্যের ভাষ্যে শুদ্ধাদ্বৈতাবাদ এবং মধ্বাচার্য্যের ভাষ্যে দ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত। নীলকণ্ঠের শৈবভাষ্যে শৈবমত এবং বলদেবের গোবিন্দ-ভাষ্যে বৈষ্ণব-মত স্থাপিত হইয়াছে। এইরূপ নানা ভাষ্যে নানা মত প্রতিষ্ঠিত হইলেও, পণ্ডিতগণ বেদান্ত-দর্শনকে প্রধানতঃ দ্বৈতাদ্বৈত দুই মতের পরিপোষক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। বেদান্ত-দর্শনের যত ভাষ্যই প্রচলিত থাকুক, তাঁহাদের মতে, সকল ভাষ্যই প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত,—(১) অদ্বৈত ভাষ্য, (২) দ্বৈত ভাষ্য। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য-বিরচিত ভাষ্যই অদ্বৈত-ভাষ্যের মধ্যে প্রধান ; এবং রামানুজ, মধ্বাচার্য্য, বিষ্ণুস্বামী, নিম্বাদিত্য, প্রভৃতি প্রণীত ভাষ্য—চারি-সম্প্রদায়ের চারিখানি দ্বৈত-ভাষ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। 'গরুড় পুরাণ' প্রভৃতি মহাপুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়,—বেদান্ত-সূত্র দুর্ব্বোধ্য বুঝিয়া, স্বয়ং ব্যাসদেবও উহার এক ভাষ্য প্রণয়ন করেন ; সেই ভাষ্যই—শ্রীমদ্ভাগবত। দেবর্ষি

নারদের উপদেশে সমাধি-যোগ-সাধনায় বেদব্যাস ঐ ভাষ্য প্রাপ্ত হন—পুরাণাদি শাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে। বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মতে মধ্বাচার্য্যের ভাষ্যই শ্রীমদ্ভাগবতের অনুমোদিত; শ্রীমদ্ভাগবত-রূপ ভাষ্যগ্রন্থ প্রচলিত ছিল বলিয়া, শ্রীচৈতন্যদেব বেদান্ত-দর্শনের কোনরূপ নূতন ভাষ্যগ্রন্থ প্রণয়ন করা আবশ্যক বলিয়া মনে করেন নাই। তবে যে যে স্থলে মধ্বাচার্য্যের মতের সহিত চৈতন্যদেবের মতবিরোধ ঘটিয়াছিল, তত্তৎস্থলে তিনি যে অর্থ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তি-কালে বলদেব-বিদ্যাভূষণ-কৃত গোবিন্দভাষ্যে তাহাই লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। আনন্দগিরি ও বাচস্পতি মিশ্র শঙ্করাচার্য্য-কৃত ভাষ্যের এবং সুদর্শন রামানুজ-কৃত ভাষ্যের টীকা প্রণয়ন করেন। বাচস্পতি মিশ্রের সেই টীকার নাম—'ভামতী' এবং সুদর্শনের টীকার নাম—'শ্রুতপ্রকাশিকা'। ঐ দুই টীকা এখন বিশেষ প্রসিদ্ধ। মূল বেদান্ত-সূত্রের অর্থ ও উদ্দেশ্য—শ্রুতি-স্মৃতির সামঞ্জস্য রাখিয়া ব্রহ্ম-প্রতিপাদন হইলেও, ভাষ্য ও টীকাকারগণের গবেষণা-প্রভাবে তাহা হইতে নানা মত ও নানা অর্থোৎপত্তি হইয়াছে। তদনুসারে, বেদান্ত-দর্শনকে ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করিয়া, বিভিন্ন মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ বিভিন্ন গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। বেদান্ত-সূত্রের ভাষ্য-সমূহে অদ্বৈতাদি যে মত-পরম্পরা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বেদান্ত-দর্শন প্রণয়নের পূর্ব্বেও তাহা প্রচলিত ছিল। যে অদ্বৈতবাদ মাণ্ডুক্যোপনিষদে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত ছিল, গৌড়পাদাচার্য্য আপন কারিকায় যাহার আভাস প্রদান করিয়া গিয়াছিলেন, শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক তাহা প্রস্ফুট হইয়াছিল। এইরূপ বিশিষ্টাদ্বৈত মতও বৌধায়ন-প্রমুখ আচার্য্যগণের অনুসরণে রামানুজ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল—প্রমাণ পাওয়া যায়। * শঙ্করাচার্য্য এবং রামানুজের মত এখন বিশেষ প্রচলিত। শঙ্করাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত অদ্বৈতমতের পরিপোষণ-কল্পে পরবর্ত্তি-কালে যে সকল গ্রন্থ বিরচিত হয়, তন্মধ্যে পঞ্চদশী, বেদান্তসার, বেদান্ত-পরিভাষা, তত্ত্বপ্রদীপিকা, অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। বিশিষ্টাদ্বৈত মত সংস্থাপন জন্য রামানুজ যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তন্মধ্যে বেদার্থসংগ্রহ, বেদান্তসার, বেদান্তদীপ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বেদান্ত-দর্শন সম্বন্ধে এইরূপ বিভিন্ন মতের সৃষ্টি-পরিপুষ্টি সাধিত হইলেও, উহার একই সূত্রের কতরূপ অর্থ হইতে পারে, ভাষ্যসমূহ আলোচনা করিলে, তাহা বুঝিতে পারা যায়; এবং তদ্দ্বারা প্রাচীন মনীষিগনের জ্ঞান-গবেষণায় বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইতে হয়।

ভাষ্যকারগণের ব্যাখ্যানুসারে বেদান্ত-সূত্রে দ্বৈত ও অদ্বৈত দ্বিবিধ ভাবের আভাস প্রতিফলিত হইলেও, বেদান্ত-দর্শনেরও মুখ্য-উদ্দেশ্য—সেই নিঃশ্রেয়স বা আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি। অদ্বৈতবাদীর মতে,—"জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন; অবিদ্যা বা মায়ার আবরণে আবৃত হইয়া, সে আপনাকে ও ব্রহ্মকে ভেদভাবে ভাবিয়া থাকে; তত্ত্বজ্ঞান উদয় হইলে, অর্থাৎ জীব যে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন—এই ভাব অন্তরে জাগরুক হইলে, অবিদ্যা দূর হয়; অবিদ্যা দূর হইয়া জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য জ্ঞান সাধিত হইলেই, জীবের মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। 'সোঽহং', 'অহং ব্রহ্মাস্মি',—'তিনিই

দ্বৈতদ্বৈত মত।

* পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত,—শঙ্করাচার্য্য খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে এবং রামানুজ দ্বাদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। সে আলোচনা অন্যত্র দ্রষ্টব্য।

আমি', 'আমিই ব্রহ্ম',—জীব তখন ইহাই বুঝিতে পারে।" দ্বৈতবাদীর (বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী প্রভৃতির) মতে,—"জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন নহে। যাঁহা হইতে জগতের উৎপত্তি, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই নিয়ামক,—সকলই তাঁহার কর্তৃত্বাধীন। সাধনাদির দ্বারা জীব তাঁহার ন্যায় গুণ-সম্পন্ন হইতে পারিলেই মুক্তির অধিকারী হয়। মুক্ত পুরুষ, ব্রহ্মের সহিত সমগুণসম্পন্ন হইলেও, ব্রহ্মের কর্তৃত্বাধীন। মুক্তপুরুষ সকল ক্ষমতা লাভ করেন; তাঁহার সকল সঙ্কল্প সিদ্ধ হয়।" অদ্বৈতবাদীরা বলেন,—"ব্রহ্মই সত্য, আর সমস্তই মিথ্যা। ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুরই অস্তিত্ব সম্ভবপর নহে; জগৎ বলিয়া যাহা প্রতীত হয়, তাহা ব্রহ্মের নাম ও রূপের ভেদ মাত্র; বস্তুগত প্রভেদ তাহাতে কিছুই নাই। যাহা স্বতন্ত্র বলিয়া মনে হয়, তাহা ভ্রম বা মায়া;—রজ্জুতে সর্পভ্রম, শুক্তিতে মুক্তা-ভ্রম, অথবা মরীচিকায় জলভ্রম মাত্র। কুণ্ডল-বলয়াদি স্বর্ণালঙ্কার, স্থূল-দৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও, মূলতঃ তাহাই যেমন সুবর্ণের বিকার মাত্র; নাম-রূপের ভেদ থাকিলেও, জগতের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধও তদ্রূপ। অলঙ্কারের যেমন নানা নাম, নানা রূপ, জাগতিক পদার্থেরও তেমনই নানা নাম, নানা রূপ। সে হিসাবে,—মনুষ্য, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, পর্ব্বত, নদী প্রভৃতি—নানা নাম-রূপে জগৎ পরিকল্পিত হইলেও, জগৎ, ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য আর কিছুই নহে।" ইহাই শঙ্করা-চার্য্য-প্রবর্ত্তিত অদ্বৈত-সম্প্রদায়ের মত। কিন্তু রামানুজাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী সম্প্রদায় বলেন,—"জীব ও ব্রহ্ম এক নহে। জীব অপেক্ষা ব্রহ্ম শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্ম উপাস্য; জীব উপাসক। ব্রহ্ম ইষ্ট; জীব ইষ্ট-প্রার্থী। ধ্যান-ধারণা-উপাসনা প্রভৃতির দ্বারা জীব ব্রহ্মের সামীপ্য-লাভ করিতে পারে।" এক হিসাবে এই দ্বৈতাদ্বৈত উভয় মতে ঘোর পার্থক্য দৃষ্ট হয়; অন্য হিসাবে আবার দুই মতে সামঞ্জস্যও দেখিতে পাওয়া যায়। নদীর জল ভিন্ন দেশ দিয়া প্রবাহিত হইলেও, শেষে যেমন একই মহাসমুদ্রে গিয়া মিলিত হয়; সেইরূপ, একই অভিপ্রায়ে, বিভিন্ন-প্রকৃতির মনুষ্য বিভিন্ন পথে প্রধাবিত হইলেও, তাঁহাদের সকলেরই উদ্দেশ্য অভিন্ন,—একই ব্রহ্ম-সাগরে আত্ম-লীন। পণ্ডিতগণ তাই বলেন,—"দ্বৈতাদ্বৈতের বিরোধ, সে কেবল প্রণালী-ভেদ-মাত্র। অদ্বৈতবাদিগণের যাহা মায়া-বিজৃম্ভিত জীব ও শুদ্ধ-চৈতন্য ব্রহ্ম; দ্বৈতবাদিগণের তাহাই জীব ও ব্রহ্ম। মাত্র বিশেষ্য-বিশেষণের ব্যবহার-ভেদ।"

বেদান্ত-দর্শনের প্রথম সূত্র—"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।" শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ এই সূত্রান্তর্গত 'অথ' শব্দের ব্যাখ্যায় বুঝাইয়াছেন,—উপযুক্ত অধিকার লাভ করিয়া, পরিশেষে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে,—'অথ'-শব্দের ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। অর্থাৎ, ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের উপযুক্ত অধিকারী না হইয়া যে-কোনও ব্যক্তি যখন-তখন ব্রহ্ম-তত্ত্ব জানিতে চাহিলে, সে তত্ত্ব কখনই তাহার অধিগত হইবে না। শঙ্করাচার্য্য তাই 'অথ' শব্দের ভাষ্যে বলিয়াছেন,—"বিধিবদধীতবেদবেদাঙ্গত্বেনাপাততোধিগতাখিলবেদার্থঃ অস্মিন জন্মনি জন্মান্তরে বা কাম্য-নিষিদ্ধ-বর্জ্জন-পুরঃসর নিত্যনৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্তোপাসনানুষ্ঠানেন নির্গত-নিখিল-কল্মষতয়া নিতান্তনির্ম্মলস্বান্তঃ সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্নঃ প্রমাতা অধিকারী।" অর্থাৎ, অধ্যয়ন-বিধি-

অধিকার-তত্ত্ব।

অনুসারে বেদ-বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়া যিনি বেদার্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন; ইহজন্মেই হউক বা জন্মান্তরেই হউক, যিনি স্বর্গাদিজনক যজ্ঞ বা দানাদি কাম্য কর্ম্ম সমাপন করিয়াছেন; যিনি নরকাদিজনক ব্রহ্মহত্যাদি নিষিদ্ধ কর্ম্ম পরিবর্জ্জন করিয়াছেন; অপিচ, যিনি নিত্যনৈমিত্তিক (সন্ধ্যা-বন্দনা, ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, নৃ-যজ্ঞ, পার্ব্বণশ্রাদ্ধাদি) প্রায়শ্চিত্ত এবং সগুণব্রহ্মবিষয়ক মনন-রূপ উপাসনা প্রভৃতির অনুষ্ঠানে নিষ্পাপ এবং নিতান্ত নির্ম্মলচিত্ত হইয়া শমদমাদি সাধন-চতুষ্টয় অভ্যাসে অভ্রান্ত হইয়াছেন; তিনিই ব্রহ্মজ্ঞানলাভের অধিকারী। ব্রহ্মজ্ঞানলাভের অধিকারী হইতে হইলে, কত দূর কঠোর সাধন আবশ্যক, শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য অথ-শব্দের অর্থে প্রথমেই তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। কেবল শঙ্করাচার্য্য নহেন;—ভাষ্যকারগণ অনেকেই 'অথ'-শব্দের ঐ অর্থ করিয়াছেন। এমন কি, বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মান্য বলদেব-বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্যেও 'অথ' শব্দের ঐরূপ অর্থ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তবে, বলদেব গোবিন্দ-ভাষ্যে সাধুসঙ্গের প্রাধান্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি বলেন,—যজ্ঞাদি সম্পন্ন হইলেও সাধু-সঙ্গের অভাব নিবন্ধন ব্রহ্ম জিজ্ঞাসায় বিঘ্ন ঘটে। 'অথ'-শব্দের 'মাঙ্গলিক' অর্থও কোনও কোনও ভাষ্যে সূচিত হইয়া থাকে। বিঘ্নবিনাশাশঙ্কায় 'অথ' শব্দের প্রয়োগ—ভাষ্যকারগণ সমর্থন করেন। মতান্তরে যে অর্থই সূচিত হউক, 'অথ'-শব্দের অনন্তর অর্থ হইলেও, উহা দ্বারা সাধারণতঃ পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও কার্য্যের পরিসমাপ্তি অনুমিত হয়। শঙ্করাচার্য্য পূর্ব্ববর্ত্তী সেই অনুষ্ঠানকে অধিকার-লাভের সোপান বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রকারান্তরে অধিকার-অনধিকার-ভেদ-তত্ত্ব ঐ সূত্রে পরিকল্পিত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের মতে,—সাধন চতুর্ব্বিধ ঃ—নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ইহামুত্রফলভোগবিরাগ, শমদমাদি-সম্পত্তি, মুমুক্ষুত্ব। কোন্ বস্তু নিত্য, কোন্ বস্তু অনিত্য—তাহা বিচার করিয়া, 'ব্রহ্মই সত্য, আর সকলই মিথ্যা'—এইরূপ পরিকল্পনাই নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক; ইহা প্রথম সাধন। স্রক্-চন্দন-সম্ভোগাদি ইহলৌকিক এবং স্বর্গাদি-ভোগ-রূপ পারলৌকিক সুখের প্রতি একান্ত বিতৃষ্ণার নামই—ইহামুত্রফলভোগ-বিরাগ; ইহাই দ্বিতীয় সাধন। শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা—এই ষড়বিধ সম্পৎ—শমদমাদি-সম্পত্তি। ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বিষয়ের শ্রবণাদি হইতে মনকে নিবৃত্ত করার নাম—শম; ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বিষয় হইতে বাহ্যেন্দ্রিয়াদিকে নিবৃত্ত করার নাম—দম; বিধিপূর্ব্বক বিহিত-কর্ম্মসমূহ পরিত্যাগ অর্থাৎ বাসনাত্যাগ বা বৈরাগ্যের নাম—উপরতি; শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতার নাম—তিতিক্ষা; ইন্দ্রিয়াদি নিগ্রহ বা সংযমের পর, ব্রহ্ম-বিষয়ে মনোনিবেশের বা একাগ্রতার নাম—সমাধান; গুরু ও বেদান্তবাক্যে অর্থাৎ ধর্ম্ম-কার্য্যে বিশ্বাসের নাম—শ্রদ্ধা। এতৎ-সমুদায়ের অনুষ্ঠানই—তৃতীয় সাধন। চতুর্থ সাধন—মুমুক্ষুত্ব; অর্থাৎ, মুক্তিলাভের ঐকান্তিক ইচ্ছা। পর-পর এই সাধন-চতুষ্টয় সম্পন্ন করিয়া, অহং-জ্ঞানে অধিকার জন্মিলে মুক্তি লাভ হয়। বৈদান্তিকগণ তাই বলেন,—সাধন-চতুষ্টয়-রূপ বিবিধ সোপান অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার জন্মিলে, জ্ঞানকাণ্ডাত্মক বেদান্ত-শাস্ত্র আলোচনা করিতে করিতে জীব ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে।

অদ্বৈত-মতে, ব্রহ্ম সৎ, ব্রহ্ম চিৎ, ব্রহ্ম আনন্দ। তিনি অনাদি, তিনি অনন্ত, তিনি অপরিবর্ত্তনীয়। তিনি নির্গুণ, তিনি নিষ্ক্রিয়, তিনি নিত্য-বুদ্ধ-শুদ্ধ-সত্ত্ব। তবে তাঁহাতে যে নানা জ্ঞানের নানা রূপের অনুভব হয়, তাহা ভ্রান্তি মাত্র;—তাহা মায়া বা অবিদ্যার কার্য্য মাত্র। সাঙ্খ্যের আলোচনায় যেমন দেখিয়াছি—পুরুষ নির্লিপ্ত, প্রকৃতির বিকৃতিই সর্ব্ব-পরিবর্ত্তনের মূলাধার; সৃষ্টি-সম্বন্ধে বেদান্তের মতও অনেকাংশে তাহারই অনুরূপ বলিয়া মনে হয়; সাঙ্খ্যের প্রকৃতির বিকৃতিই প্রকারান্তরে বেদান্তের মায়া বা অবিদ্যা। যাহা অবিদ্যা বা মায়া—তাহাই অজ্ঞান; যাহা জ্ঞান—তাহাই ব্রহ্ম। ব্রহ্মও এক—জ্ঞানও এক। যখন ভিন্ন বোধ হয়, তখন তাহা অজ্ঞান। যে জ্ঞানে আমি ঘটকে ঘট বলিয়া মনে করি, সেই জ্ঞানেই আমি পটকে পট বলিয়া বুঝিতে পারি; বিষয়-বিশেষের উপাধির বিভিন্নতা-হেতু কখনই জ্ঞানের বিভিন্নতা প্রতিপন্ন হয় না। একই পদার্থ দর্পণে-জলে নানা-স্থানে প্রতিবিম্বিত হইলেও, পদার্থের নানাত্ব যেরূপ সম্ভবপর নহে; জ্ঞান-ব্রহ্মও তদ্রূপ নানা অবয়বে প্রতীত হইলেও, তিনি এক ভিন্ন কখনই বহু হইতে পারেন না। একই নৃপতি ভিন্ন ভিন্ন দেশের শাসনকর্ত্তা বলিয়া পরিচিত হইলেও, এক ভিন্ন তিনি যেমন দ্বিতীয় নহেন, ব্রহ্মও সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান্ হইলেও, তিনি কখনই এক ভিন্ন দ্বিতীয় নহেন। যাহারা ইহা বুঝিতে না পারে, তাহারাই ভ্রান্ত—তাহারাই অবিদ্যোপহত। সেই অবিদ্যাচ্ছন্ন জীবই মিথ্যা জগৎকে সত্য জ্ঞান করে; মিথ্যা জগতের সত্যত্ব-জ্ঞানই তাহার ভ্রান্তি। তাহার সেই ভ্রান্তি যতদিন না দূর হইবে, ততদিন সে সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ থাকিবে; ততদিন তাহাকে কর্ম্মঘোরে ইহ-সংসারে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে হইবে; ততদিন তাহার মুক্তির পথ অবরুদ্ধ থাকিবে। জ্যোতির আধার সূর্য্যদেব মেঘাচ্ছন্ন হইলে যেমন দৃষ্টি-শক্তির বহির্ভূত হন; সত্যস্বরূপ জ্ঞান-স্বরূপ ব্রহ্ম, অসত্য অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন হইলে, জীব তাঁহার স্বরূপ তত্ত্ব বুঝিতে পারে না। ক্ষুদ্র একখণ্ড মেঘে বহু-যোজন-ব্যাপী সূর্য্যমণ্ডলের কতটুকু আচ্ছন্ন করিতে পারে? কিন্তু অজ্ঞ জন মনে করে,—মেঘে বুঝি সমগ্র সূর্য্যমণ্ডলকেই আচ্ছন্ন করিয়াছে। মূঢ় জীব আরও মনে করে,—মেঘাচ্ছন্ন হইলেই, বুঝি বা সূর্য্যদেব প্রভাহীন হন। এ সকল যেমন ভ্রান্তি, মিথ্যা জগৎকে সত্য বলিয়া মনে করাও সেইরূপ ভ্রান্তি মাত্র। বৈদান্তিকগণ তাই বলেন,—"ঘনাচ্ছন্নদৃষ্টির্ঘনাচ্ছন্নমর্কং যথা নিষ্প্রভং মন্যতে চাতিমূঢ়ঃ। তথা বদ্ধবদ্ভাতি যো মূঢ়দৃষ্টেঃ স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা।" মেঘাচ্ছন্ন-দৃষ্টি অতি-মূঢ় ব্যক্তির নিকট সূর্য্য যেরূপ মেঘাচ্ছন্ন নিষ্প্রভ বলিয়া প্রতীত হয়; যে বিমূঢ়-বুদ্ধি, আপনাতে পরমাত্মার অধিষ্ঠান-সত্ত্বেও, অজ্ঞানতা-নিবন্ধন সে আপনাকে বদ্ধ বলিয়া মনে করে। ফলতঃ, বৈদান্তিকগণের মতে, অজ্ঞানতাই মুক্তির অন্তরায়-সাধক; অজ্ঞানতা দূর করিতে না পারিলে, 'ব্রহ্মই সত্য—আর সমস্তই মিথ্যা'—এই তত্ত্ব না বুঝিলে, জীবের কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হয় না। তাঁহারা বলেন,—অজ্ঞানের দুই শক্তি দুই ভাবে জীবকে বেষ্টন করিয়া আছে। তাহার 'আবরণ-শক্তি' দ্বারা স্বরূপ-তত্ত্ব আচ্ছন্ন হয়; আর তাহার 'বিক্ষেপ-

অদ্বৈত-মতের পরিচয়।

শক্তি' দ্বারা মিথ্যা বস্তু কল্পিত হয়। সে যখন অন্ধকারে রজ্জুদৃষ্টে সর্পজ্ঞানে চমকিয়া উঠে, তখন অজ্ঞানতার আবরণ-শক্তি রজ্জুর স্বরূপ তত্ত্ব আবৃত করিয়া রাখে; আর অজ্ঞানতার বিক্ষেপ-শক্তি রজ্জুতে মিথ্যা-বস্তু সর্প কল্পনা করিয়া দেয়। অদ্বৈতবাদীরা এই ভ্রান্তি-তত্ত্ব উপলব্ধি করাইবার জন্য কত দৃষ্টান্তেরই অবতারণা করেন। শিশুর কণ্ঠে সুবর্ণ-হার দোদুল্যমান; অথচ, হার অপহৃত হইয়াছে বলিয়া, শিশু ভ্রান্তিবশে চারিদিকে অন্বেষণ করিতেছে। এমন সময় কেহ যদি তাহাকে দেখাইয়া দেন,—হার তাহার কণ্ঠদেশেই বিদ্যমান; এমন সময় কেহ যদি তাহাকে বুঝাইয়া দেন,—সে কেন নিকটস্থ বস্তুকে দূরস্থ বলিয়া মনে করিতেছে; তাহাতে শিশুর যে আনন্দ—সদ্‌গুরুর উপদেশ-লাভে যে জন আত্ম-তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন, জীব ও ব্রহ্মের অভেদ-ভাব বুঝিতে সমর্থ হন, তাঁহারও সেই আনন্দ,—তিনিই তখন অবিদ্যাজাল ছিন্ন করিয়া মুক্ত-বুদ্ধ-শুদ্ধ-পুরুষ। সিংহশাবক মেষদলে মিশিয়া ভ্রান্তিবশে আপনাকে যদি মেষ বলিয়া মনে করে, আর সেই সময় যদি কেহ তাহাকে জলাশয়ের নিকটে লইয়া গিয়া স্বচ্ছজলে তাহার প্রতিবিম্ব দেখাইয়া দেয়;—সে তখন আপন স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে; সদ্‌গুরুর কৃপা প্রাপ্ত হইলে, জীবেরও সেইরূপ ভ্রান্তি-বুদ্ধি দূর হয়,—জীব সত্তা-তত্ত্ব উপলব্ধি করে। মায়া বা অবিদ্যার প্রভাব—যেন ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া। শঙ্করাচার্য্য মায়ার কুহক-জাল বিস্তারের দৃষ্টান্তে ঐ উপমাই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বাজীকর সূত্র-সাহায্যে শূন্যমার্গে ক্রীড়া করে; লোকের চক্ষের উপর জীবন্ত মনুষ্যকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলে; জ্বলন্ত অনলে জীবন্ত দেহ ভস্মীভূত করিতে পারে; অথচ, সে সমস্তই মিথ্যা—চোখের ধাঁধাঁ মাত্র। মায়াবশে মানুষও সেইরূপ মিথ্যা জগৎকে সত্য বলিয়া মনে করে; আত্ম-স্বরূপ বুঝিতে না পারিয়া, স্বপ্নঘোরে ঘুরিয়া বেড়ায়। ফলে, যতদিন সেই মায়া, ভ্রান্তি বা অজ্ঞানতা, ততদিন জীবের দুঃখভোগ,—ততদিন জীবকে এই নক্রকুম্ভীরসঙ্কুল আবর্ত্ত-বহুল সংসার-সমুদ্রে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে হইবে। এই অজ্ঞানতা দূর করিতে না পারিলে, জীবের গত্যন্তর নাই। এই অজ্ঞানতা দূর করিতে পারিলেই তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে জীবের ব্রহ্মত্ব-প্রাপ্তি হয়। কিন্তু কিরূপে এই অজ্ঞানান্ধকার দূর হয়?—কিরূপে জ্ঞান-সূর্য্যের দিব্য জ্যোতি প্রতিভাত হইতে পারে? দর্শনকার তাহারও উপায় নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"আত্মসাক্ষাৎকার-রূপ তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তিলাভের মুখ্য উপায়।" তিনি বুঝাইয়াছেন,—প্রত্যক্ষ্যাদি প্রমাণ দ্বারা প্রথমে ইহলৌকিক সুখসম্ভোগাদির অনিত্যত্ব দর্শন করিতে হইবে; তার পর, পরম-সুখ-স্বরূপ পরব্রহ্ম-লাভের জন্য সাধনার আবশ্যক। সাধনা চতুর্ব্বিধ;—শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, সমাধি। শ্রবণ অর্থে—শ্রুতিবাক্য-শ্রবণে ব্রহ্মের তাৎপর্য্যাবধারণ; মনন অর্থে—দর্শনশাস্ত্র-বিহিত যুক্তির দ্বারা পরব্রহ্মের চিন্তন, নিদিধ্যাসন অর্থে—দেহাদি সমস্ত বুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে অদ্বিতীয় ব্রহ্মের নিরন্তর ধ্যান; সমাধি অর্থে—চিত্তের নিরোধ বা একাগ্রতা;—অর্থাৎ, ধ্যান ধারণা নিদিধ্যাসন প্রভৃতির অনুষ্ঠানে চিত্ত যখন একমাত্র ব্রহ্মেই লীন হয়,—সেই অবস্থা। ব্রহ্ম হইতে জীব স্বরূপতঃ অভিন্ন; অথচ, ভ্রান্তিবশে ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। শ্রবণ মননাদি সাধন-পরম্পরায় জীবের সেই ভেদজ্ঞান দূর হয়। ভেদজ্ঞান দূরই—মুক্তি।

অদ্বৈতবাদীরা সত্য ও মিথ্যার বিবিধ লক্ষণ নির্দ্দেশ করেন। তাঁহারা বলেন,—যাহা ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান তিন কালেই একরূপে অবস্থিত, যাহা নির্ব্বাধ, তাহাই সত্য। আজ আছে, কিন্তু কাল নাই; ছয় মাস পূর্ব্বে ছিল না, কিন্তু আজ হইয়াছে;—অদ্বৈতবাদীদিগের মতে তাহা মিথ্যা। যাহা পরিবর্ত্তনশীল, যাহাতে বাধ বা ক্রমভঙ্গ আছে,—তাহা কখনই সত্য হইতে পারে না। শঙ্করাচার্য্য বলেন,—"একরূপেণ হ্যবস্থিতো যোঽর্থঃ স পরমার্থঃ।" অর্থাৎ, যাহা সর্ব্বকালে সকল অবস্থায় একভাবে অবস্থিত,—তাহাই পরমার্থ; জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, তুরীয়—মানুষের এই চারি অবস্থায় যাহা একইরূপে প্রতীয়মান হয়, কোনও অবস্থাতেই যাহার বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় না, তাহাই সত্য, তাহাই ব্রহ্ম; তাহা ভিন্ন আর সমস্তই মিথ্যা, মায়া বা বিকার মাত্র। সূত্রে আছে,—"তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ।" শঙ্করাচার্য্য তাঁহার ভাষ্যে লিখিয়াছেন—"ব্রহ্ম ব্যতিরেকেন কার্য্যজাতস্যাভাবঃ। বিকারজাতস্যানৃতাভিধানাৎ" ইত্যাদি। অর্থাৎ, ব্রহ্ম ব্যতীত কার্য্য হয় না; কিন্তু কার্য্যমাত্রই বিকার বা অসত্য মিথ্যাজ্ঞান-বিজৃম্ভিত। বলদেব কৃত গোবিন্দ-ভাষ্যেও ঐ সূত্রের ব্যাখ্যায় একই সিদ্ধান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার ভাষ্যের মর্ম্মার্থ,—ব্রহ্ম হইতে জগৎ ভিন্ন নহে। কারণ, 'বাচারম্ভণং বিকারনামধেয়ং মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যম্' ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যে জগৎ ও ব্রহ্মের অভিন্নত্ব সূচিত হইতেছে। দৃষ্টান্ত-স্থলে, তিনি শ্বেতকেতুর উপাখ্যান উল্লেখ করিয়াছেন। শ্বেতকেতু, উপাদেয় ও উপাদানের অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে জগৎ অভিন্ন নহে—এতদ্বাক্যের অর্থ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, আচার্য্যকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; আচার্য্য তাহাতে উত্তর দেন—"একস্মাদেব মৃৎপিণ্ডোপাদানাৎ জাতং ঘটাদি সর্ব্বং তেনৈব সিদ্ধান্তেন বিজ্ঞাতং স্যাৎ তস্য ততো নতিরেকাৎ।" অর্থাৎ, একই মৃৎপিণ্ডরূপ উপাদান হইতে ঘটাদি বস্তু-সমূহ উৎপন্ন হয়; সুতরাং মৃত্তিকাকে জানিলেই ঘটাদিকে জানা হয়; বুদ্ধি ও শব্দের তারতম্য-হেতু উপাদান ও উপাদেয় কখনও ভিন্ন হইতে পারে না; মৃৎপিণ্ডের কম্বু-গ্রীবাদি রূপ-বিকার সংঘটিত হইলেই ব্যবহার-সিদ্ধির নিমিত্ত লোকে ঘটাদি নামান্তর প্রদান করে, কিন্তু বাস্তব পক্ষে মৃত্তিকাই সত্য। মৃত্তিকা ও ঘট যে ভিন্ন নহে,—তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য, ভাষ্যকারগণ আরও কত কত দৃষ্টান্তেরই অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন,—ঐ দুই পদার্থ যে পরস্পর ভিন্ন নহে, তাহার কারণ,—মৃত্তিকার রূপান্তরে বা বিকারে ঘটাদি নির্ম্মিত হইলেও উহার পরিমাণাদির কখনও তারতম্য হয় না। যে পরিমাণ মৃত্তিকায় যে ঘট প্রস্তুত হয়, তুলাদণ্ডে পরিমাপ করিলে উপাদানভূত মৃত্তিকার সহিত ঘটের পরিমাণ কখনই বৃদ্ধি হয় না। ব্রহ্ম এবং জগৎ যে অভিন্ন, একের বিকারেই যে অন্যের উৎপত্তি,—বেদান্ত নানা-প্রকারে তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ব্রহ্ম ও জগতের একত্ব প্রতিপাদনের জন্য শঙ্করাচার্য্য যে সকল শ্রুতিবাক্যের অবতারণা করিয়াছেন, তাহাতেও দেখা যায়—একই ভূতাত্মা সর্ব্বভূতে অবস্থিত। জলমধ্যে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব পতিত হইলে ভিন্ন ভিন্ন জলাশয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়; অথচ, চন্দ্র একই। সেইরূপ, পরব্রহ্মও জগৎ-রূপে ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রতীত হইলেও, তিনি একই;—তিনি ভিন্ন অন্যের অস্তিত্ব ভ্রান্তিমাত্র। শ্রুতিতে ব্রহ্মের যে দ্বিবিধ লক্ষণ দৃষ্ট

অদ্বৈত-বাদের অন্যান্য কথা।

হয়; শ্রুতি যে কখনও বলেন—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম", কখনও বলেন,—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"; অদ্বৈতবাদীরা তাহাতে শ্রুতির দুইটি লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। প্রথমোক্ত শ্রুতি, তাঁহাদের মতে, ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ; শেষোক্ত শ্রুতি—তটস্থ লক্ষণ। ব্রহ্ম চিৎস্বরূপ, ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, ব্রহ্ম অনন্ত রূপ—ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায়। এতদ্দ্বারা তাঁহার কোনই কর্ম্মকর্তৃত্ব উপলব্ধি হয় না; কেবল তাঁহার স্বরূপ মাত্র বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু, তিনি কর্ত্তা, তিনি বিধাতা, তিনি সংহর্ত্তা—ইত্যাদি বাক্যে গুণ-বিশেষণের সাহায্যে তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করা হয়; ইহাই তাঁহার তটস্থ লক্ষণ। বেদান্তের যেটি দ্বিতীয় সূত্র—"জন্মাদ্যস্য যতঃ"- অদ্বৈতবাদিগণ সেটিকে ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাঁহারা বলেন, ঐ সূত্রের অর্থ—যাহা হইতে জন্মাদি অর্থাৎ সৃষ্টি-স্থিতি-লয় সাধিত হয়, তিনিই ব্রহ্ম। তিনিই আদি, তিনিই অনন্ত, তিনিই সৎ; আর সমস্তই তাঁহার বিকার বা মায়া মাত্র। ফলতঃ, অদ্বৈতবাদীরা ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুরই অস্তিত্ব মানিতে চাহেন না। যখন ব্রহ্ম ও জীব অভিন্ন, তখন অদ্বৈতবাদীদিগের মতে, ব্রহ্মের উপাসনা-প্রথাও স্বতন্ত্র। তাঁহারা উপাস্য-উপাসক-ভাবে, ভক্ত ও ভজনীয় রূপে, ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধ রাখিতে চাহেন না। সাধারণতঃ উপাসনা অর্থে যাহা প্রতীত হয়, সে হিসাবে অদ্বৈতবাদীদিগের উপাসনা এক অভিনব সামগ্রী। সে উপাসনা অর্থ,—আমি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, 'সোঽহং' ইত্যাদি পরিচিন্তন মাত্র। সেই উপাসনার নাম—'অহংগ্রহ' বা আত্মগ্রহ উপাসনা।* দৃষ্টান্তস্থলে বৈদান্তিকগণ "আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ" সূত্রটী উদ্ধৃত করেন। শঙ্করাচার্য্য ঐ সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—"আত্মেত্যেব পরমেশ্বরঃ প্রতিপত্তব্যঃ।" অর্থাৎ, আত্মকেই পরমেশ্বর বলিয়া মনে করিবে। বলা বাহুল্য, সেই মননই অদ্বৈতবাদীর উপাসনা। তাঁহারা বলেন,—'আত্মা ও ব্রহ্ম অভিন্ন; আত্মাই ব্রহ্ম—এই ভাবনা ভাব; তুমি মুক্তপুরুষ হইবে।" শ্রুতি-দৃষ্টান্তে তাঁহারা প্রতিপন্ন করেন,—"তং যথাযথোপাসতে তদেব ভবতি।" অর্থাৎ, যে যেভাবে উপাসনা করে, সে সেইভাব প্রাপ্ত হয়। তত্ত্বজ্ঞানীর পাপ-পুণ্য নাই। পদ্মপত্রে যেমন জল থাকিতে পারে না, তত্ত্ব-জ্ঞানীতে সেইরূপ পাপ থাকিতে পারে না। মুক্তজীব ব্রহ্মে লীন হইলে, তাহার নাম-রূপ সমস্তই লয় প্রাপ্ত হয়। "নদী সমুদ্রাদি নিদর্শনানি চ"—নদী সমুদ্রে মিলিত হইলে, তাহার যেমন নাম-রূপ অস্তিত্ব সমস্তই সমুদ্রে লীন হয়, ভেদাভেদ জ্ঞান দূর হইলে, জীবও তদ্রূপ পরব্রহ্মে লীন হয়।

দ্বৈত-মতের পরিচয়।

অদ্বৈতবাদীর সহিত দ্বৈতবাদীর প্রধান পার্থক্য,—অদ্বৈতবাদী যাঁহাকে নির্ব্বিকল্প নির্গুণ বলিয়া অভিহিত করেন, তাঁহারা যাঁহাকে জগৎ হইতে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন, দ্বৈতবাদীরা সেই ব্রহ্মকে অন্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। একই সূত্রের ব্যাখ্যায় দুই পক্ষের দুই মত পরিস্ফুট দেখিতে পাই। দ্বৈতবাদীরা বলেন,—ঈশ্বর সগুণ, ঈশ্বর সবিশেষ; তিনি নিখিল-হেয়-প্রত্যনীক (অর্থাৎ দোষশূন্য), তিনি অখিল-কল্যাণ-গুণাকর; তিনি জ্ঞানের অতীত নহেন, তিনি চিন্তার

* উপাসনা তিন প্রকার,—অঙ্গাবদ্ধ, প্রতীক, অহংগ্রহ। প্রথমোক্ত উপাসনায় যজ্ঞাঙ্গে ব্রহ্মানুভূতি। দ্বিতীয়োক্ত উপাসনায় ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য পদার্থে (সূর্য্য, চন্দ্র, মন প্রভৃতিকে) ব্রহ্ম-ভাবনা। শেষোক্তে আত্মচিন্তন।

অতীত নহেন, পরন্তু তিনিই সকলের কর্ত্তা ও উপাদান। অদ্বৈতবাদীরা ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণেরই প্রাধান্য স্বীকার করেন; কিন্তু দ্বৈতবাদীরা লক্ষণের কোনই ভেদাভেদ স্বীকার করেন না। "জন্মাদ্যস্য যতঃ"—বেদান্তের দ্বিতীয় সূত্রে অদ্বৈতবাদিগণ ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু দ্বৈতবাদিগণ ঐ সূত্র হইতেই জীব ও ব্রহ্মের পার্থক্য প্রতিপন্ন করেন। তাঁহারা বলেন,—যাহা হইতে জগতের উৎপত্তি, তিনি স্বতন্ত্র, তিনি সর্ব্ব-গুণাধার, তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের মূলীভূত,—তিনিই ব্রহ্ম। জীব ও জগৎ যে তাঁহা হইতে পৃথক, তাঁহাদের মতে, 'জন্মাদ্যস্য'-সূত্রেই তাহা প্রতিপন্ন হয়। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের দৃষ্টান্তে তাঁহারা উল্লেখ করেন,—পরমেশ্বর ও জীব দুইটী পক্ষিবিশেষ। উভয়েই তুল্যভাবে দেহরূপ বৃক্ষে আশ্রয় করিয়া আছেন। এক জন সুস্বাদু ফল ভোজন করিতেছেন; অন্য জন অনাহারী থাকিয়া কেবল তাহা দর্শন করিতেছেন। অর্থাৎ, ঈশ্বর-রূপ পক্ষী সুখদুঃখরূপ কর্ম্মফলাদির অধীন নহেন; কিন্তু জীব-রূপ পক্ষী তৎসমুদায়ের একান্ত অধীন।* দ্বৈতবাদিগণ আরও বলেন,—"উপলব্ধি হয় বলিয়াও জগতের সত্তা স্বীকার করিতে হয়।" এ সম্বন্ধে "ভাবে চোপলব্ধেঃ" ও "ন ভাবেঽনুপলব্ধেঃ" পর্য্যায়ক্রমে দুইটী সূত্র (দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের পঞ্চদশ এবং দ্বিতীয় পাদের ত্রিংশ) উদ্ধার করিয়া, 'যাহা উপলব্ধি হয় তাহা আছে' এবং 'যাহা উপলব্ধি হয় না তাহা নাই'—এইরূপ অর্থ-সঙ্গতি-পূর্ব্বক, "জগৎ উপলব্ধি হয় সুতরাং জগতের সত্তা আছে"—ইহাই প্রতিপন্ন করেন। অপিচ, যে নদী ও সমুদ্রের দৃষ্টান্তে, যে ঘট ও মৃত্তিকার দৃষ্টান্তে, যে কুণ্ডল-বলয়াদি ও সুবর্ণের দৃষ্টান্তে, অদ্বৈতবাদিগণ আপনাদের মত প্রতিষ্ঠা করেন; সেই সেই দৃষ্টান্তেরই অবতারণায় রূপান্তরে দ্বৈতবাদিগণ দ্বৈতমত প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বৈতবাদীরা বলেন,—"নদীর ও সমুদ্রের জল দৃষ্টতঃ অভিন্ন বলিয়া মনে হইলেও, উহাতে বিবিধ ভেদ দৃষ্ট হয়। নদীর জল বিশুদ্ধ; সমুদ্রের জল লবণাক্ত। নদী—ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ; সমুদ্র—অসীম অনন্ত। নদী যখন সমুদ্রে মিলিত হয়, তখন তাহার ইতর-বিশেষ বুঝিতে পারা যায় না বটে; কিন্তু বস্তুগত জলের মধ্যে বিশুদ্ধতা ও লবণাক্ততার প্রভেদ থাকেই থাকে। জীব ও ঈশ্বরের সম্বন্ধও ঠিক সেইরূপ। প্রলয়ে জীব পরব্রহ্মে মিলিত হইলেও, উভয়ের পার্থক্য অবশ্যই আছে। দুগ্ধ ও জল মিশ্রিত হইলে, তাহার পার্থক্য অনুভূত হয় না বটে; কিন্তু হংসগণ সে পার্থক্য ভেদ করিতে পারে; তাহারা অনায়াসেই জল ত্যাগ করিয়া দুগ্ধ পান করিয়া থাকে। সেই দুগ্ধ ও জলের প্রভেদ—ব্রহ্ম ও জীবের প্রভেদ তুল্য। জল ও দুগ্ধের প্রভেদ যেমন হংসগণ বুঝিতে পারে; গুরূপদেশ-প্রাপ্ত নির্ম্মলচেতা সাধুগণ সেইরূপ জীব ও ব্রহ্মের প্রভেদ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন। তখন, জীব আপনাকে সেবক ও ঈশ্বরকে সেব্যরূপে বুঝিতে পারেন। বুঝিতে পারিয়া, জীব যখন ব্রহ্মের উপাসনায় প্রবৃত্ত হন, তখনই তাঁহার দুঃখভোগের অবসান হয়। আপনাকে ঈশ্বর ভিন্ন জানিয়া, ঈশ্বরের ভজনা দ্বারাই জীবের মুক্তিলাভ হয়।" মুক্তি-সম্বন্ধে রামানুজাচার্য্য-প্রমুখ দ্বৈতবাদিগণের ইহাই সিদ্ধান্ত। রামানুজাচার্য্য, বেদান্ত-দর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের

* "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥"—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, চতুর্থ অধ্যায়, ৬ষ্ঠ শ্লোক।

দ্বিতীয় পাদের চতুর্দ্দশাদি সূত্রের ভাষ্য-প্রসঙ্গে অদ্বৈতবাদীদিগের মত খণ্ডন-পূর্ব্বক বলিয়াছেন,—"জীব আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ দুঃখের অধীন; ব্রহ্ম দুঃখের অতীত; ব্রহ্ম ও জীব কখন কি এক হইতে পারে?" শ্রুতি-দৃষ্টান্তেও তিনি দেখাইয়াছেন,—"স কারণং কারণাধিপাধিপ", "য আত্মনি তিষ্ঠন"; তিনি কারণ এবং কারণাধিপতি জীবের অধিপতি, তিনি আত্মায় আত্মার মধ্যে অধিষ্ঠিত;—এই সকল শ্রুতিবাক্যে স্রষ্টা ও সৃষ্টির, ব্রহ্ম ও জীবের, স্বাতন্ত্র্য সূচিত হয়। অদ্বৈতবাদীরা প্রকৃতির বিকারের যে দৃষ্টান্তে জগৎকে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করেন; দ্বৈতবাদীরা সেই দৃষ্টান্তের উল্লেখেই বলেন,—"প্রকৃতি যখন বিকারী অর্থাৎ পরিবর্ত্তনশীল, তখন সেই অপরিবর্ত্তনীয় নিত্য-শুদ্ধ ব্রহ্মের সহিত তাহার সমান সত্তা কখনও সম্ভবপর কি? তাহা যদি না হইল, তবে ব্রহ্ম ও জীব স্বতন্ত্র বৈ কি!" ফলতঃ, অদ্বৈতবাদিগণ যেখানেই জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নত্ব প্রতিপাদনে প্রয়াসী, দ্বৈতবাদিগণ সেখানেই পার্থক্য প্রদর্শনে অগ্রসর। অপিচ, দ্বৈতবাদে জীব ও ব্রহ্মের এই যে পার্থক্য,—দ্বৈতবাদিগণের মধ্যে যাঁহারা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, তাঁহারা সেই পার্থক্যীভূত প্রকৃষ্ট সামগ্রীকে "বিশিষ্ট" এবং যাঁহারা শুদ্ধাদ্বৈতবাদী, তাঁহারা তাহাকে "শুদ্ধ" ইত্যাদি সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়া থাকেন। আর তাহা হইতেই, কেহ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে, কেহ মহেশ্বর মহাদেবের সম্বন্ধে, কেহ ব্রহ্মাদি দেবগণের সম্বন্ধে, সূত্র-বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। দ্বৈতবাদিগণ দুঃখ-নিবৃত্তির বা মুক্তির উপায় কিরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজাচার্য্যের 'বেদার্থ-সংগ্রহে' তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি এই মর্ম্মে বলিয়াছেন,—"ভক্তিই ব্রহ্ম-লাভের একমাত্র উপায়; যিনি প্রকৃত সাধক, তিনি স্তব, স্মরণ, নমস্কার, বন্দন, কীর্ত্তন, অর্চ্চন প্রভৃতি দ্বারা ব্রহ্মের করুণা প্রাপ্ত হন। তদ্দ্বারা তাঁহার অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হয়। অজ্ঞানতা দূর হইলে, তিনি পরম পুরুষের অনুগ্রহ-লাভে কৃতার্থ হন।" দ্বৈতবাদীর মতে,—"ব্রহ্ম ভক্তবৎসল ও করুণাময়। তিনি প্রতিমায় আছেন, তিনি অবতারে আছেন, তিনি নানা স্তরে অবস্থান করিতেছেন। ধ্যান-ধারণা-উপাসনাদি দ্বারা জীব তাঁহার অনুকম্পা লাভ করিলে, তাঁহার স্বভাব প্রাপ্ত হন, তাঁহার গুণপরম্পরা লাভ করেন।" তাহা হইলেও, ব্রহ্মের সহিত তাঁহারা এক হইতে পারেন না; "নাপি সাধনানুষ্ঠানেন নিরস্তাবিদ্যস্য পরেণ স্বরূপৈক্যসম্ভবঃ;" সাধনানুষ্ঠানে অবিদ্যা দূরীভূত হইলেও পরমেশ্বরের স্বারূপ্যলাভ সম্ভবপর নহে। মুক্তজীব "প্রদীপবদাবেশস্তথাহি দর্শয়তি" সর্ব্ববস্তু-বিষয়ক জ্ঞান প্রাপ্ত হইতে পারেন; প্রদীপ যেমন প্রভা দ্বারা অনেক দেশ প্রকাশ করে, ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রসূত প্রজ্ঞা দ্বারা মুক্তজীবে সেইরূপ তত্ত্ব-জ্ঞান আবিষ্ট হইয়া থাকে। ফলতঃ, আলোকের অস্তিত্বে যেমন দর্শন-শক্তি নির্ভর করে, দর্শকের দর্শনেন্দ্রিয় উপলক্ষ মাত্র; সেইরূপ মুক্তপুরুষ, সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ করিতে পারিলেও, সর্ব্বসুখের অধিকারী হইলেও, ব্রহ্মের স্বারূপ্য-লাভ করিতে পারেন না। "জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাৎ"—এই সূত্রের ভাষ্যেও দ্বৈতবাদিগণ ঐ কথাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। জগদ্ব্যাপার অর্থাৎ সৃষ্টি প্রভৃতি সমস্তই ব্রহ্মের কার্য্য; মুক্তজীবে জগদ্ব্যাপারত্ব বা সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব কখনই সম্ভবপর নহে;—শ্রুতি-বাক্যেও তাঁহারা তাহা প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। 'যতো বা

ইমানি ভূতানি'—এই বাক্যের প্রকরণে এবং 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' ইত্যাদি সূত্রের লক্ষণে ব্রহ্ম-কর্তৃত্বই প্রতিপন্ন হয়। অতএব, মুক্তপুরুষ ভগবদানুগ্রহেই সমস্ত বিভূতি লাভ করিয়া থাকেন; নচেৎ, সৃষ্টি-ব্যাপারের সহিত জীবের কোনই সম্পর্ক নাই। নানা-প্রকারে অদ্বৈত-মতের প্রতিবাদ করিয়া, রামানুজাচার্য্য তাই বলেন,—"অদ্বৈতাখ্যং মতং বিহায় ঝটিতি দ্বৈতি প্রবৃত্তো ভব। সোঽহং জ্ঞানমিদং ভ্রমস্ত্যজ ভজ ত্বং পাদপদ্মং হরে।" অর্থাৎ, অদ্বৈত-মত পরিহার-পূর্ব্বক সত্বর দ্বৈত-মতে প্রবৃত্তি-পরায়ণ হও;—'আমিই ব্রহ্ম' এই ভ্রম-জ্ঞান দূর করিয়া শ্রীহরির পাদপদ্ম ভজনা কর।

দুঃখ-নিবৃত্তির বিচার-প্রসঙ্গে বেদান্তদর্শনে নানা তত্ত্বের আলোচনা দেখিতে পাই। জীব ও ব্রহ্ম, সৃষ্টি ও প্রলয়, স্বর্গ ও নরক, অদৃষ্ট ও কর্ম্মফল,—কত কথাই কত ভাবে উত্থাপিত ও মীমাংসিত হইয়াছে। সূত্রে অভাস-মাত্র আছে কি না—সন্দেহ; কিন্তু ভাষ্যকারগণের গবেষণা-প্রভাবে তাহা হইতে অনন্ত বিষয়ের অবতারণা ও বিচার চলিয়াছে। জীব ও ব্রহ্ম সম্বন্ধে, পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, নানা-মত নানা-বিতর্ক আছে। কেহ প্রমাণ করিয়াছেন,—"জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন; জীব মিথ্যা, ব্রহ্ম সত্য।" কেহ প্রতিপন্ন করিয়াছেন,—"জীব ও ব্রহ্মে অশেষ পার্থক্য; জীব উপাসক ব্রহ্ম উপাস্য।" কেহ দেখাইয়াছেন,—"এই জগদ্রূপেই ব্রহ্ম বিরাজমান; ইহসংসার তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-স্বরূপ।" আবার কেহ দেখাইয়াছেন,—"জগৎ বলিয়া কোনও পদার্থের সত্ত্বা নাই; যাহাকে জগৎ বলিয়া মনে হইতেছে, তাহা মায়া বা স্বপ্ন মাত্র।" সৃষ্টি ও প্রলয় সম্বন্ধেও এরূপ নানা-মত নানা-বিতর্ক দেখিতে পাই। একবিধ সূত্রে প্রতীত হয়,—"ব্রহ্মই সৃষ্টি কর্ত্তা; তিনিই কারণ; তাঁহার সঙ্কল্প-বশতঃ ইহসংসার সৃষ্টি হইয়াছে; অথবা, সৃষ্টি তাঁহার লীলা মাত্র;—সুখোন্মত্ত ব্যক্তিরা ফলাফল বিবেচনা না করিয়া যেরূপ নৃত্যাদিতে প্রবৃত্ত হয়, ঈশ্বরও সেইরূপ লীলা-বশতঃ সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হন।" * অন্যবিধ সূত্রে আবার দেখিতে পাই,—"বিপর্য্যয় বা বিকার হইতেই উৎপত্তি হয়; দুগ্ধ ও জলের বিকারে যেরূপ ক্ষীর ও তুষার প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে জগতের সৃষ্টিও সেইরূপ বিকার মাত্র।" † প্রথমোক্ত মতাবলম্বীরা বলেন,—"ইন্দ্রাদি দেবগণ দৃশ্যমান না হইলেও এই পৃথিবীতে যেরূপ তাঁহাদের বর্ষণাদি কর্ম্ম-কর্তৃত্ব সিদ্ধ হয়, তদ্রূপ ঈশ্বর অনুপলভ্যমান্ হইলেও তাঁহার বিশ্ব-কর্তৃত্ব সিদ্ধ হইতেছে।" শেষোক্ত মতাবলম্বীরা বলেন,—"মহাপ্রভাবসম্পন্ন চেতন পুরুষ কিঞ্চিন্মাত্র বাহ্য সাধন না করিলেও, তাঁহার সঙ্কল্প মাত্রই সৃষ্টিকার্য্য সমাহিত হয়।" বৈদান্তিকগণ আরও বলেন,—"অজ্ঞানই জগতের কারণ। তাহার দুই অবস্থা, দ্বিবিধ শক্তি। অবস্থাদ্বয়ের নাম—মায়া ও অবিদ্যা; শক্তিদ্বয়—আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি। যে

বেদান্ত-দর্শনে বিবিধ তত্ত্ব।

* "জগদ্বাচিত্বাৎ"—১ম অধ্যায়, ৪র্থ পাদ, ১৬শ সূত্র; "তদভিধ্যানাদেব তু তল্লিঙ্গাৎ সঃ"—২য় অধ্যায়, ৩য় পাদ, ১২শ সূত্র; "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্"—২য় অধ্যায়, ১ম পাদ, ৩৩ সূত্র।

† "বিপর্য্যয়েণ তু ক্রমোঽত উপপদ্যতে চ"—২য় অধ্যায়, ৩য় পাদ, ১৩শ সূত্র; "উপসংহার দর্শনান্নেতি চেন্ন ক্ষীরবদ্ধি"—২য় অধ্যায়, ১ম পাদ, ২৪শ সূত্র।

শক্তি বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা আত্মাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, তাহাই তাহার আবরণ-শক্তি; আর যে শক্তি উপাদান-রূপে জগৎ সৃষ্টি করে, তাহাই বিক্ষেপ-শক্তি। মায়া বিশুদ্ধ, অবিদ্যা মলিন; মায়া-প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মই ঈশ্বর, আর অবিদ্যা-প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মই জীব। ঐ মায়া ও অবিদ্যা আবার যথাক্রমে ব্রহ্মের 'আনন্দময় কোষ' ও 'কারণ-শরীর' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। জীবের কর্ম্মফল-দানের জন্য ব্রহ্মের যখন সঙ্কল্প হয়, মায়াচ্ছন্ন ব্রহ্ম হইতে তখনই পঞ্চতন্মাত্রের উৎপত্তি। ব্রহ্ম হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী—উৎপত্তির ইহাই ক্রম। এইরূপ ক্রম-পর্য্যায়ে মনুষ্যাদি সমস্তই সৃষ্টি হইয়া থাকে।" এতৎপ্রসঙ্গে ব্রহ্মকে কেহ 'উপাদান কারণ' বলিয়া অভিহিত করেন, কেহ বা 'নিমিত্ত কারণ' বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; কেহ আবার বলেন—"তিনি নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান-কারণ উভয় কারণই বটেন।" উপাদান-কারণ ও নিমিত্ত-কারণ কিরূপ অর্থে প্রযুক্ত হয়, তাহারও একটু আভাস দিতেছি। স্থূলতঃ, যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাই উপাদান-কারণ; আর, যাহা কর্ত্তৃক উৎপন্ন, তাহাই নিমিত্ত-কারণ। যেমন,—ঘটের উপাদান-কারণ মৃত্তিকা, বলয়ের উপাদান-কারণ সুবর্ণ; যেমন,—ঘটের নিমিত্ত-কারণ কুম্ভকার, বলয়ের নিমিত্ত-কারণ স্বর্ণকার; ইত্যাদি। যাহা হউক, কোনও মতে কর্ম্মকর্ত্তৃত্ব, কোনও মতে সঙ্কল্প-মাত্র, কোনও মতে বিকার-বশতঃ,—এইরূপ নানা-মতে নানারূপে সৃষ্টি-কার্য্য সংসাধিত হইয়া থাকে। সকল মতেরই প্রায় সার সিদ্ধান্ত,—সৃষ্টি ও লয় অনুলোম-বিলোম ক্রিয়া-বিশেষ। অনুলোম অর্থে—এক হইতে অন্যের উৎপত্তি; বিলোম অর্থে—একে অন্যের লয়। ব্রহ্ম হইতেই উৎপত্তি, ব্রহ্মেই লয়,—অনুলোম-বিলোমে তাহাই বুঝাইয়া থাকে। এই উৎপত্তি ও বিলয় অবস্থাকেই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা ব্রহ্মের কার্য্যাবস্থা ও কারণাবস্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কার্য্যাবস্থায় নাম-রূপের ব্যক্ত-ভাব, কারণাবস্থায় তাহার তিরোভাব। সাঙ্খ্যের সহিত বেদান্তের প্রধান পার্থক্য, আমাদের মনে হয়, এই উৎপত্তি ও লয় লইয়াই। সাঙ্খ্যে প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে, বিকৃতি-বশতঃ, সৃষ্টি-ক্রিয়া সম্পাদিত হয়; বেদান্তেও বিকৃতির কথা আছে বটে; কিন্তু সর্ব্বমূলাধার—"জন্মাদ্যস্য যতঃ"—সেই ব্রহ্ম। ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণন-প্রসঙ্গে বেদান্ত-সূত্রে তাঁহার সগুণ ও নির্গুণ উভয় ভাবেরই পরিচয় আছে। আবার সেই সগুণ ও নির্গুণ উভয় ভাবেই ব্রহ্মের স্বরূপ কিরূপে উপলব্ধি হইতে পারে, দৃষ্টান্ত দ্বারাও বেদান্ত তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। সগুণভাবদ্যোতক সূত্র,—"সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ", "সর্ব্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ" ইত্যাদি; নির্গুণভাবদ্যোতক সূত্র,—"অদৃশ্যত্বাদি গুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ", "প্রতিষেধাচ্চ", ইত্যাদি; সগুণ-নির্গুণ উভয় ভাবদ্যোতক সূত্র,—"ন স্থানতোঽপি পরস্যো-ভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি", "উভয়ব্যপদেশাত্ত্বহিকুণ্ডলবৎ", ইত্যাদি। শেষোক্ত দৃষ্টান্তে ব্রহ্মের বিশেষ্য-বিশেষণ নির্গুণ-সগুণ ভাব বড় সুন্দর পরিস্ফুট হইয়াছে। 'অহিকুণ্ডলবৎ' —অর্থাৎ সর্প কুণ্ডলাকারে থাকিলে, তাহাকে যেমন সর্পও বলা যায়, সর্পকুণ্ডলীও বলা যায়, ব্রহ্মও তদ্রূপ জানিবে। এইরূপ আরও সূত্র আছে—"প্রকাশাশ্রয়বদ্বা তেজস্ত্বাৎ", "প্রকাশশ্চ কর্ম্মণ্যভ্যাসাৎ", ইত্যাদি; অর্থাৎ, সূর্য্যের জ্যোতিঃ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পতিত হইয়া বিভিন্ন আকারে ও বিভিন্ন বর্ণে প্রতিফলিত হইলেও, এবং ঋজু-বক্র বা নীল-পীত প্রভৃতি

তাহার নানা নাম-বিশেষণ কল্পিত হইলেও, তাহা যেমন স্বরূপতঃ এক; ব্রহ্মও তদ্রূপ সসীম-অসীম সগুণ-নির্গুণ নানা নাম-বিশেষণে কল্পিত হইলেও স্বরূপতঃ এক। সমুদ্র ও তাহার জলে যদিচ কোনই পার্থক্য নাই; তথাপি বেলা, তরঙ্গ, বুদ্‌বুদ, প্রবাহ—তাহার কত নাম-রূপেরই পরিচয় পাই; ব্রহ্ম-সম্বন্ধেও তাহাই বুঝিতে হয়। তথাপি কেহ যে সগুণ উপাসনার, কেহ যে নির্গুণ উপাসনার প্রাধান্য কীর্ত্তন করিয়া থাকেন; তাহার কারণ, যাঁহার চিত্তে যে ভাব প্রতিফলিত হয়, তিনি সেই ভাবেই ব্রহ্মের কল্পনা করিয়া লন। জীব ব্রহ্ম, জগৎ ব্রহ্ম, সকলই ব্রহ্ম,—বেদান্ত-মতের এই ভিত্তির উপর, 'পরিণাম-বাদ' ও 'বিবর্ত্তবাদ' দুই মতের সৃষ্টি হইয়াছে। যাঁহারা বলেন—জগৎ ব্রহ্মেরই পরিণাম, তাঁহারা পরিণামবাদী; আর যাঁহারা বলেন—ব্রহ্মই জগদ্রূপে ব্যাবৃত (অবস্থিত), তাঁহারা বিবর্ত্তবাদী। এই দুই মতেই উপাস্য-উপাসকের ভেদ নষ্ট; সুতরাং কেহ কেহ এই দুই মতকে নাস্তিক্য-মত বলিয়া কটাক্ষ করিয়া থাকেন। এ হিসাবে সাংখ্যের প্রকৃতি-বাদকে তাঁহারা বরং অনুকূল বলিয়া মনে করেন; কিন্তু বেদান্তের মায়াবাদকে প্রচ্ছন্ন নাস্তিক্য-বাদ বলিতেও কুণ্ঠিত হন না।* প্রলয় (লয়) যে বিলোম-ক্রিয়া, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তবে বৈদান্তিকগণ বলেন,—"এই প্রলয় আবার চারি প্রকার; নিত্য, প্রাকৃত, নৈমিত্তিক, আত্যন্তিক। সুষুপ্তি-কালে বাহ্য-বস্তুর জ্ঞান-লোপে নিত্য-প্রলয়; প্রারব্ধ-ক্ষয়ে দেহত্যাগে প্রাকৃত-প্রলয়; যুগান্তে ব্রহ্মার রাত্রিতে নৈমিত্তিক-প্রলয়; মুক্তিলাভে আত্যন্তিক-প্রলয়। শেষোক্ত প্রলয়ে মুক্তিলাভ হইলে, জন্মজরামরণশীল দেহ ধারণ করিয়া জীবকে আর ইহসংসারে কষ্টভোগ করিতে আসিতে হয় না।"

ব্যাখ্যানুসারে বেদান্তদর্শনে নানা মতের নানা আভাস প্রতিফলিত হইলেও, বেদান্ত-সূত্র-সমূহে বাদরায়ণ বেদব্যাসের প্রধানতঃ কি উদ্দেশ্য প্রতীত হইতে পারে?

বেদান্ত-সূত্রে ব্যাসের অভিপ্রায়।

সূত্র-সমূহের আলোচনায় আমরা দেখিতে পাই, তিনি পূর্ব্বপক্ষ উত্তর-পক্ষ-রূপে অন্যান্য দার্শনিক মত-সমূহের বিচার-বিতর্ক উত্থাপন করিয়া, তৎসমুদায়ের সমন্বয়-সাধন-পূর্ব্বক, বিদ্যা বা জ্ঞানকে মোক্ষলাভের উপায় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। বাদরায়ণ মনে করেন,—বিদ্যা হইতেই পরমপুরুষার্থ লাভ হয়; "পুরুষার্থোঽতঃ শব্দাৎ ইতি বাদরায়ণঃ" (তৃতীয় অধ্যায়, ৪র্থ পাদ, ১ম সূত্র)। তাঁহার মতে,—জৈমিনি-কথিত যাগাদি বৈদিক ক্রিয়া-কর্ম্ম, বিদ্যা-লাভের উপায় মাত্র; বিদ্যাই কর্ম্মের শেষ; যজ্ঞাদি কর্ম্ম—জ্ঞানের সোপান বিশেষ।† তাই তিনি পূর্ব্ব-পক্ষরূপে জৈমিনির মত আলোচনা করিয়া, সেই মত খণ্ডন পূর্ব্বক, বলিয়াছেন,—"বিহিতত্বাচ্চাশ্রমকর্ম্মাপি। সহকারিত্বেন চ।" অর্থাৎ,—জ্ঞানের জন্য কর্ম্মানুষ্ঠান বিহিত বটে; কিন্তু উহা বিদ্যার সহকারিভাবে অনুষ্ঠেয়;—মুক্তির সাধন-স্বরূপ অনুষ্ঠেয় নহে।‡ আরও,

* এ সম্বন্ধে শাস্ত্রে এরূপ উক্তি আছে,—"বেদার্থবন্মহাশাস্ত্রং মায়াবাদমবৈদিকম্"; "মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নবৌদ্ধমেব চ"; ইত্যাদি।

† জৈমিনি বলিয়াছিলেন,—কর্ম্মের জন্য জ্ঞান আবশ্যক; কিন্তু বাদরায়ণ বলেন,—জ্ঞানের জন্য কর্ম্মের আবশ্যক। তৃতীয় অধ্যায়, ৪র্থ পাদ, ২য় সূত্র,—"শেষত্বাৎ পুরুষার্থবাদো যথান্যেষু ইতি জৈমিনিঃ।"

‡ বেদান্তদর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের ৪র্থ পাদে ৩য় হইতে ৭ম সূত্রে জৈমিনির মত আলোচনা, ৮ম হইতে ১৭শ সূত্রে তাহার খণ্ডন এবং পরিশেষে উপরি উদ্ধৃত ৩২শ ও ৩৩শ সূত্রে ঐরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে।

তিনি যজ্ঞাদি কর্ম্ম-পরম্পরাকে বহিরঙ্গ সাধনের অন্তর্ভুক্ত করিয়া, শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন অন্তরঙ্গ-সাধনের প্রাধান্যই প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মকে আত্মরূপে সাক্ষাৎকারই, তাঁহার মতে, উপাসনার প্রধান অঙ্গ। "আত্মেতি তুপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ", * "মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ," "আত্মা প্রকরণাৎ," "অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ" † ইত্যাদি সূত্রে ব্রহ্মকে আত্মবুদ্ধিতে উপাসনা করিবে অর্থাৎ ব্রহ্মরূপে আপনাকে উপলব্ধি করিবে,—এই অর্থই সূচিত হয়। বেদান্ত-দর্শনে ভক্তির প্রাধান্য কচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। গৌণভাবে কোথাও ভক্তির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলেও, আত্মজ্ঞানই যে মোক্ষলাভের উপায়,—উহাতে সেই চিত্রই বিশদ প্রতিফলিত। সুতরাং শঙ্করাচার্য্য বেদান্ত-সূত্রের যে ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, অনেকে তাহাকেই 'বিশেষভাবে সূত্রানুসারী' বলিয়া মনে করেন; অন্যান্য ভাষ্যে যে ভাবে ভক্তির প্রাধান্য পরিকীর্ত্তিত হয়, তাঁহাদের মতে, তাহা দূর-অন্বয়-মূলক। এ হিসাবে, প্রায় বার আনা লোক বেদান্তে শঙ্কর-ভাষ্যের অনুসারী, এবং অবশিষ্ট চারি আনা মাত্র লোক রামানুজাদির ভাষ্যের অনুসরণকারী। ব্রহ্ম চেতন, জগৎ অচেতন;—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা;—এ সকল বিষয়েও বাদরায়ণ যাহা বলিয়াছেন, সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিলে, তাহাও শঙ্করাচার্য্যের মতেরই অনুকূল বলিয়া প্রতীত হয়। ফলতঃ "আমি ব্রহ্ম," "আমিই তিনি"—এই অভেদ-জ্ঞান লাভ হইলেই মুক্তি বা সর্ব্বদুঃখনাশ হয়,—বেদান্তের ইহাই প্রধান প্রতিপাদ্য, এবং বেদান্ত-মত বলিতে গেলে সাধারণতঃ এই মতই এখন বুঝাইয়া থাকে। যাহা হউক, সেই অভেদ-জ্ঞান-লাভও যে সাধনা-সাপেক্ষ, অদ্বৈতবাদিগণ তাহা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। সাধনা-গুণে 'অহংজ্ঞান' লাভ করিলে জীব মুক্তিলাভ করিবে,—স্থূলতঃ দ্বৈতাদ্বৈতবাদী সকল সম্প্রদায়েরই এই মত। তবে যত কিছু বিতণ্ডা—সে কেবল সাধনার প্রকার-ভেদ লইয়া। ফলে, তাহাতেও অধিকারী অনধিকারীর কথা উঠিতে পারে; কেহ সিধা-পথে, কেহ বক্র-পথে, সকলে একই স্থানের উদ্দেশ্যে রওনা হইয়াছেন—বুঝা যায়। কিন্তু যাহারা ভ্রান্তবুদ্ধি, তাহারা সে নিগূঢ় তত্ত্বে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে না,—তাহারা একেবারেই 'অহং ব্রহ্ম' হইয়া, শেষে নাস্তিক্য-মতের পরিপোষণ করে। ঐ শ্রেণীর লোকের ভ্রান্ত-বুদ্ধি অপনোদনের জন্য মনীষিগণ সুন্দর একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেন। তাঁহারা বলেন,—"মানিলাম—জীব ব্রহ্ম, জগৎ ব্রহ্ম, সকলই ব্রহ্ম, সকলই এক; কিন্তু তাই বলিয়া সকল ব্রহ্মই কি সকলের পক্ষে সমান কার্য্যকরী? পুত্রও ব্রহ্ম, কন্যাও ব্রহ্ম, আগুনও ব্রহ্ম, সর্পও ব্রহ্ম,—সকলই যদি এক-ব্রহ্মই হয়, সকলের সহিত কি সমান ব্যবহার সম্ভবপর? পুত্র-কন্যাকে মানুষ যেভাবে আলিঙ্গন করে, আগুন ও সর্পকেও কি সেইভাবে আলিঙ্গন করিতে পারে?" স্থূলতঃ, ইহাও অধিকার-তত্ত্ব। এই অধিকার-তত্ত্ব লইয়াই হিন্দুসমাজে যত কিছু বিতণ্ডা-বিতর্ক! হিন্দু বলেন,—"অধিকারী হও, তত্ত্বজ্ঞান লাভ কর, মুক্তি অধিগত হইবে।" বলা বাহুল্য, বেদান্তেরও ইহাই সার সঙ্কল্প।

* চতুর্থ অধ্যায়, ১ম পাদ, ৩য় সূত্র। এই সূত্রের ব্যাখ্যায় অদ্বৈতবাদীদের 'সোঽহং' ভাব প্রকাশ পায়। কিন্তু দ্বৈতবাদীরা, পূর্ব্বেই খণ্ডন করা হইয়াছে বলিয়া, এই সূত্রটীর অসার্থকতা প্রতিপাদন করেন।

† চতুর্থ অধ্যায়, ৪র্থ পাদ, ২য়, ৩য়, ৪র্থ সূত্র।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

চার্ব্বাক ও বৌদ্ধ-দর্শন।

[চার্ব্বাক-দর্শন,—বৃহস্পতির প্রসঙ্গ,—চার্ব্বাক, নিরীশ্বরবাদী, নাস্তিক, লোকায়ত, পাষণ্ড প্রভৃতি;—চার্ব্বাক-দর্শনের সার সঙ্কল্প—সুখবাদ,—'ইহকাল সত্য, পরকাল মিথ্যা, ইহজীবনেই সুখভোগ করিয়া লও' ইত্যাদি মত-প্রচার,—ঈশ্বর ও বেদাদির প্রামাণ্য অস্বীকার;—বৌদ্ধ-দর্শন,—প্রমাণ-পার্থক্য,—জন্মজরামৃত্যুর প্রসঙ্গ,—প্রতীত্যসমুৎপাদ—বৌদ্ধ-দর্শনের মূল ভিত্তি,—জীবাদি উৎপত্তির হেত্বাদি;—বৌদ্ধ-দর্শনের প্রতিপাদ্য,—ভূত-তত্ত্বাদির আলোচনা,—ক্ষণিকত্ব প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা;—বৌদ্ধ-দর্শনের বিভিন্ন মত,—মাধ্যমিকাদি সম্প্রদায়-চতুষ্টয়।]

চার্ব্বাক-দর্শন নাস্তিক্যবাদপূর্ণ, অথবা নাস্তিক্য দর্শন-মাত্রই অধুনা চার্ব্বাক-দর্শন নামে পরিচিত। সুরগুরু বৃহস্পতি এই দর্শনের প্রবর্ত্তক। তাঁহার শিষ্য চার্ব্বাক কর্ত্তৃক এই দর্শন সংসারে প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া, ইহা চার্ব্বাক-দর্শন নামে অভিহিত। 'চারু' আপাতঃ-মনোহর 'বাক্য'-পরম্পরায় পরিপূর্ণ বলিয়াও নাস্তিক্য-দর্শনের নাম চার্ব্বাক-দর্শন। বৃহস্পতি নামে একাধিক ঋষির এবং চার্ব্বাক নামে বিভিন্ন ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং চার্ব্বাক-দর্শনের প্রবর্ত্তক ও প্রচারক সম্বন্ধেও নানা মতভেদ দৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদে দুই জন বৃহস্পতি ঋষির উল্লেখ আছে; তাঁহাদের একজন আঙ্গিরস (অঙ্গিরস-বংশোদ্ভব) এবং অপর জন লৌক্য (লোক-বংশোদ্ভব)। * তৈত্তিরীয় সংহিতায় 'দেব-পুরোহিত' বলিয়া এক বৃহস্পতির পরিচয় আছে। মৈত্রেয্যুপনিষদে দৃষ্ট হয়, অসুরগণের বুদ্ধিভ্রংশের জন্য বৃহস্পতি কর্ত্তৃক নাস্তিক্য-মত প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। তদনুসারে তিনি দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের রূপ পরিগ্রহ করিয়া অবিদ্যার সৃষ্টি করেন, এবং সেই অবিদ্যা-ঘোরে পড়িয়া অসুরেরা বেদাদি-শাস্ত্রে অবজ্ঞা প্রকাশ করে ও হিত-বাক্যকে অহিত-বাক্য বলিয়া মনে করে। † ফলে, তাহাতেই তাহাদের পতন হয়। সংহিতাকারগণের মধ্যেও বৃহস্পতির প্রসিদ্ধি আছে; বৃহস্পতি-সংহিতা—উনবিংশ সংহিতারই অন্তর্ভুক্ত। মহাভারতে দুই জন বৃহস্পতির পরিচয় পাওয়া যায়; একজন 'অহিংসা পরম ধর্ম্ম' এই মত প্রচার করেন; অপর জন বঞ্চনাশাস্ত্র-প্রণেতা বলিয়া উল্লিখিত হন। মৈত্রেয্যুপনিষদোল্লিখিত এবং মহাভারতোক্ত বঞ্চনাশাস্ত্র-প্রণেতা বৃহস্পতিকে অনেকে এক ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন। তিনিই চার্ব্বাক-দর্শনের আদিভূত, তিনিই সুরগুরু বৃহস্পতি,—ইহাই পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত। চার্ব্বাক নামেও বহু জনের পরিচয় পাই। বৃহস্পতির শিষ্য চার্ব্বাক তো আছেনই; মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে দুর্য্যোধন-সখা চার্ব্বাক, যুধিষ্ঠিরের নিন্দা করিয়া, ব্রহ্ম-কোপানলে ভস্মীভূত হন; খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে এক জন চার্ব্বাক, নাস্তিক্য-

বৃহস্পতি ও চার্ব্বাক-দর্শন।

* এই লৌক্য বৃহস্পতি কর্ত্তৃক লোকায়ত নাস্তিক্য মত প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল—কেহ কেহ অনুমান করেন।

† মতান্তরে প্রজাপতি ব্রহ্মা নাস্তিক্য-মতের প্রবর্ত্তক বলিয়া উক্ত হন। মৈত্রেয্যুপনিষদের অন্যত্র এবং ছান্দোগ্যোপনিষদে তিনি অসুরগণকে আত্ম-তত্ত্ব বুঝাইবার সময় ঐরূপ উপদেশ দিতেছেন—দেখা যায়।

মত প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়াও প্রমাণ পাওয়া যায়। লোকায়তিক, নাস্তিক্য, বার্হস্পত্য, পাষণ্ড প্রভৃতি নামেও চার্ব্বাকের পরিচয় আছে। পরলোক স্বীকার করেন না বলিয়া এই দর্শন 'লোকায়ত', ঈশ্বর মানেন না বলিয়া এই দর্শন 'নাস্তিক্য', বৃহস্পতি-প্রবর্ত্তিত বলিয়া এই দর্শন 'বার্হস্পত্য' নামেও অভিহিত হইয়া থাকে।

চার্ব্বাক-দর্শনের সারসঙ্কল্প।

এই দর্শনের সংক্ষিপ্ত মত এই,—"দেহ ভিন্ন অন্য আত্মার অস্তিত্ব নাই। আত্মাই দেহ; আত্মার ধ্বংসেই দেহের ধ্বংস। ইহসংসারের সুখই পরম পুরুষার্থ। প্রত্যক্ষ ভিন্ন প্রমাণ নাই। পৃথিবী, জল, বায়ু, অগ্নি,—এই চারি ভূত হইতেই সমস্ত সৃষ্টি হইয়াছে। চৈতন্যও ভূত হইতে উৎপন্ন। পরলোক ও পুনর্জন্ম নাই। মৃত্যুই অপবর্গ।" * চার্ব্বাক-বাদীরা বলেন,—'সংসারের সুখ দুঃখমিশ্রিত বলিয়া যাহারা সে সুখ-ভোগে উপেক্ষা করে, তাহারা পশুবৎ মুর্খ। মাছে কাঁটা ও আঁইস আছে বলিয়া কি মাছ ত্যাগ করিতে হইবে? ধান্যে তুষ-কুটা আছে বলিয়া কি অন্নাহার পরিত্যাগ করিব?" † ফলে, তাঁহাদের মতে, ইহকালের সুখই সুখ, পরকাল মিথ্যা। তাঁহারা বলেন,—"যেমন গুড় তণ্ডুল প্রভৃতির সংযোগে মাদকতা-গুণবিশিষ্ট সুরার উৎপত্তি হয়; ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ—এই ভূতচতুষ্টয়ের সংযোগে সেইরূপ চৈতন্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ঐ চারি ভূতের অভাব হইলেই দেহের নাশ হয়। দেহ-নাশে আর পুনরুৎপত্তির সম্ভাবনা নাই। দেহ ধারণ করিয়া, চৈতন্যলাভ করিয়া, আমরা যে মনে করি—আমি স্থূল, আমি কৃশ, আমা হইতে আত্মা বিভিন্ন, তাহা লৌকিক কল্পনা মাত্র। দেহ-নাশে শরীর-ত্যাগে সকলই শেষ হইয়া যায়।" তাই তাঁহারা উপদেশ দেন,—"যাহা কিছু পার, সুখভোগ এই জন্মেই করিয়া লও। যত দিন বাঁচ, সুখ করিয়া যাও; ঋণ করিয়াও ঘৃত পান কর। দেহ একবার ভস্মীভূত হইলে, তাহার আর পুনরাগমনের সম্ভাবনা কোথায়?" লোকে যে সচরাচর বলিয়া থাকে,—"যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেদৃণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ। ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ।"—ইহা সেই চার্ব্বাক-দর্শনেরই উপদেশ। স্বর্গ, অপবর্গ, পরলোক, আত্মা, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম বা বৈদিক-ক্রিয়াকর্ম্ম—চার্ব্বাক-গণ কিছুরই সার্থকতা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে,—"সকলই ধূর্ত্তের চাতুরী মাত্র; এক শ্রেণীর লোকের জীবিকার উপায় মাত্র। নচেৎ, জ্যোতিষ্টোম-যজ্ঞে নিহত জীব যদি সত্য সত্যই স্বর্গে গমন করিত, তাহা হইলে লোকে আপন জনক-জননীকে ঐ যজ্ঞে বলি দেয় না কেন? শ্রাদ্ধাদির পিণ্ড-দানে যদি প্রেত-লোকের পরিতৃপ্তি হইত, তাহা হইলে

---

* মাধবাচার্য্য-কৃত 'সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে' চার্ব্বাক-মতসমূহ উল্লিখিত আছে। সেই মতের সার-সঙ্কল্প,—"সর্ব্বথা লোকায়তমেব শাস্ত্রম্ যত্র প্রত্যক্ষমেব প্রমাণম্ পৃথিব্যপতেজোবায়বস্তত্ত্বানি। অর্থকামৌ পুরুষার্থৌ। ভূতান্যেব চেতয়ন্তে। নাস্তি পরলোকঃ। মৃত্যুরেবাপবর্গ ইতি।"

† "সুখমেব পুরুষার্থঃ। ন চাস্য দুঃখসংভিন্নতয়া পুরুষার্থমেব নাস্তীতি মন্তব্যং অবর্জ্জনীয়তয়া প্রাপ্তস্য দুঃখস্য পরিহারেণ সুখমাত্রস্যৈব ভোক্তব্যত্বাৎ। তদ্যথা মৎস্যার্থী সশল্কান্ সকণ্টকান্‌মৎস্যানুপাদত্তে স যাবদাদেয়ং তাবদাদায় নিবর্ত্ততে।...তস্মাদ্দুঃখভয়ান্নানুকূলবেদনীয়ং সুখং ত্যক্তুমুচিতম্। যদি কশ্চিদ্ ভীরু-দৃষ্টঃ সুখং ত্যজেৎ স তর্হি পশুবন্মূর্খো ভবেৎ।"—সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহোক্ত চার্ব্বাক-মত।

উঠানে অন্ন রাখিলে অট্টালিকার উপরিস্থিত ব্যক্তির উদরপূর্ত্তি হয় না কেন?" চার্ব্বাক-দিগের মতে,—শাস্ত্রাপেক্ষা যুক্তিই শ্রেষ্ঠ; "কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যোঽর্থ-নির্ণয়ঃ। যুক্তিহীন বিচারেতু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে।" প্রমাণের মধ্যেও প্রত্যক্ষ প্রমাণ মাত্র তাঁহারা মান্য করেন। তাঁহারা বলেন,—"অনুমানাদি প্রমাণ, ভ্রমসঙ্কুল। যেহেতু, অনুমান প্রমাণ ব্যাপ্তিজ্ঞান-সাপেক্ষ। কিন্তু প্রত্যক্ষ ভিন্ন ব্যাপ্তিজ্ঞান সম্ভবপর নহে। অথচ, প্রত্যক্ষ বর্ত্তমান-সম্বন্ধেই প্রযুক্ত; ভূত বা ভবিষ্যৎ বিষয় প্রত্যক্ষ হওয়া অসম্ভব।" চার্ব্বাক-গণ শব্দ-প্রমাণ স্বীকার করেন না; সুতরাং, তাঁহাদের মতে, বেদ অপ্রামাণ্য। ফলতঃ, ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া, বেদাবিহিত ধর্ম্মকর্ম্ম প্রভৃতির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন-পূর্ব্বক ইহলৌকিক সুখকে সারসামগ্রী বলিয়া মনে করাই—চার্ব্বাক-দর্শনের মুখ্য লক্ষ্য। দেবগুরু বৃহস্পতি অসুরগণের বিনাশ-সাধনের জন্য তাহাদের বুদ্ধি-বিকৃতি ঘটাইবার উদ্দেশ্যে এই দর্শনশাস্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন; সুতরাং, এই দর্শন-শাস্ত্রের মতানুসারী হইলে, জীবের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী—হিন্দু-শাস্ত্রের ইহাই অভিমত।

চার্ব্বাক-দর্শনের সহিত বৌদ্ধ-দর্শনের নিকট সম্বন্ধ। সুতরাং, তুলনায় পরবর্ত্তি-কালে রচিত হইলেও, চার্ব্বাক-দর্শনের প্রসঙ্গেই বৌদ্ধ-দর্শনের আলোচনা হইয়া থাকে।

বৌদ্ধ-দর্শন।

মাধবাচার্য্য সংগৃহীত 'সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ'-গ্রন্থে চার্ব্বাক-দর্শনের পরই বৌদ্ধ-দর্শনের পরিচয় আছে। চার্ব্বাক-দর্শনের সহিত বৌদ্ধ-দর্শনের পার্থক্য,—চার্ব্বাকগণ একমাত্র 'প্রত্যক্ষ' প্রমাণ স্বীকার করেন। কিন্তু বৌদ্ধগণ 'প্রত্যক্ষ' ও 'অনুমান'—দুইটী প্রমাণ স্বীকার করিয়া থাকেন। বৌদ্ধ-দর্শনের প্রারম্ভে 'অনুমান' প্রমাণ সম্বন্ধে চার্ব্বাক-গণের বিরুদ্ধ-মত খণ্ডন করিয়া 'অনুমান' প্রমাণের প্রাধান্য স্থাপন করা হইয়াছে। ভগবান বুদ্ধদেব এই দার্শনিক মতের প্রবর্ত্তক; সুতরাং উহা বৌদ্ধ-দর্শন নামে অভিহিত। সংসার জন্মজরামৃত্যুর অধীন, দুঃখভোগই সংসারের চরম ফল;—সংসারের এই ভাব লক্ষ্য করিয়া বুদ্ধদেব ব্যাকুল হন। কি প্রকারে সংসারের দুঃখ দূর হইতে পারে,—এই চিন্তায়, সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া, তিনি যখন সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন, সেই সময়ই বৌদ্ধ-দর্শনের উৎপত্তি হয়। প্রায় ছয় বৎসর কাল গয়া-তীর্থের সন্নিকটে নৈরঞ্জনা-নদীর তীরে বোধি-বৃক্ষমূলে বুদ্ধদেব তপস্যায় নীরত ছিলেন। সেই সময়ে দুঃখোৎপত্তি এবং দুঃখনিবৃত্তির কারণ-পরম্পরা তাঁহার মনোমধ্যে উদয় হইয়াছিল। তখন দুঃখ ও দুঃখের উৎপত্তি-সম্বন্ধে এবং দুঃখধ্বংস ও দুঃখধ্বংসের উপায়-বিষয়ে তাঁহার মনে যে চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হয়,—বৌদ্ধ-দর্শনের তাহাই মূলীভূত। বুদ্ধদেব জন্মজরামৃত্যু প্রভৃতি দুঃখের বিবিধ রূপ-নির্দ্দেশ করেন। তাঁহার মতে,—রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান,—এই 'পঞ্চস্কন্ধ-সমুপেত' দেহই দুঃখস্বরূপ। যে অবস্থায় আর এই দেহ ধারণ করিতে না হয় অর্থাৎ নির্ব্বাণ হয়, তাহাই সুখ। বুদ্ধদেব স্থির করেন,—জন্ম-গ্রহণই সকল দুঃখের হেতুভূত; জন্ম না হইলে, জরা, মরণ, ব্যাধি, শোক, নৈরাশ্য প্রভৃতির সম্ভাবনা থাকে না; সুতরাং যাহাতে জন্মগ্রহণ করিতে না হয়,—দুঃখনাশে তাহাই প্রয়োজন। তিনি বুঝিলেন,—"কর্ম্মই জন্মের মূল; কর্ম্মে যে ধর্ম্মাধর্ম্ম—তাহাই

জন্মের হেতু। সেই কর্ম্মের আবার তৃষ্ণা হইতে উৎপত্তি। ইন্দ্রিয় হইতেই তৃষ্ণার সূচনা। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ হইলে যে বেদনা সমুপস্থিত হয়, তাহাই তৃষ্ণার মূলীভূত। তৃষ্ণা বা বাসনা অবিদ্যামূলক।" এইরূপে কারণ-পরম্পরা অনুসন্ধান করিয়া, বুদ্ধদেব স্থির করেন,—"অবিদ্যা দূর করিতে পারিলে, তৃষ্ণার উচ্ছেদ-সাধন হইলে, জন্মগতি রোধ হয়। সেই জন্মরোধই নির্ব্বাণ; তাহাই আত্যন্তিক দুঃখনাশ। জন্ম না হইলে, 'তুমি' 'আমি' ভেদ থাকে না; রূপ-রসাদির বোধ হয় না; আশা-নৈরাশ্যের ঘাতপ্রতিঘাতের সম্ভাবনা থাকে না।" বুদ্ধদেব যখন ধ্যাননিবিষ্ট ছিলেন, প্রথমেই তাঁহার মনে এই চিন্তার উদয় হয়,—'জরামরণং কিং মূলকং?' পরক্ষণেই উত্তর হয়,—'জাতিপ্রত্যয়ংহি জরামরণং।' তখন পুনরায় প্রশ্ন উঠে,—'কি মূলকং জাতি?' উত্তর,—জাতির্ভবতি ভবপ্রত্যয়া।' অর্থাৎ, সিদ্ধান্ত হয়,—উৎপত্তিই জাতির হেতুভূত। তিনি দেখিতে পান, —উৎপত্তির বীজ উপাদান (ক্ষিত্যপতেজ ইত্যাদি), উপাদানের বীজ তৃষ্ণা, তৃষ্ণার বীজ বেদনা। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ-লাভই বেদনার কারণ; চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, মন,—এই ষড়ায়তনেই সেই সন্নিকর্ষ সাধিত হয়। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ,—এই পঞ্চ বিষয়েই ষড়ায়তনের প্রবর্ত্তনা। রূপ-রসাদির বীজ বিজ্ঞান; বিজ্ঞানোৎপত্তির বীজ সংস্কার; সংস্কারের মূল অবিদ্যা। দুঃখের এই হেতুসমূহ অবগত হইয়া তাহার উচ্ছেদ-চিন্তায় বুদ্ধদেব যখন নিমগ্ন হন, তখন তাহার মনে হয়, অবিদ্যা রোধ করিলে সংস্কার নিরুদ্ধ হইবে; সংস্কার রোধ হইলে, বিজ্ঞান দূর হইবে; তৎপরে ক্রমে ক্রমে সমস্ত দুঃখ নিরুদ্ধ হইলে, নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ হইবে। বলা বাহুল্য, বুদ্ধদেব স্বয়ং এই সম্বন্ধে কোনও গ্রন্থ রচনা করেন নাই। তাঁহার নিকট উপদেশ পাইয়া পরবর্ত্তি-কালে তাঁহার শিষ্যগণ এই দুঃখ-নিবৃত্তি বা নির্ব্বাণ-বিষয়ে যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়া যান, তাহাই বৌদ্ধ-দর্শন নামে অভিহিত হইয়াছিল। বৌদ্ধ-দর্শনে এই দুঃখোৎপত্তি 'প্রতীত্যসমুৎপাদ' নামে অভিহিত হয়। সকল বস্তুরই অস্তিত্ব প্রতীতি মাত্র। প্রতীতি হইতে বস্তু ও কার্য্য মাত্রের জ্ঞান উৎপন্ন হয়;—এই জন্যই ইহার নাম—'প্রতীত্যসমুৎপাদ'।* বাহ্য ও আধ্যাত্মিক ভেদে প্রতীত্যসমুৎপাদ দুই প্রকার। এই দুই প্রকার প্রতীত্য-সমুৎপাদের প্রত্যেকে আবার 'হেতূপনিবদ্ধ' ও 'প্রত্যয়োপনিবদ্ধ' দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। হেতূপনিবদ্ধ অর্থ,—কার্য্যোৎপত্তিকালে যাহাতে কেবলমাত্র হেতুভাব বিদ্যমান; প্রত্যয়োপনিবদ্ধ অর্থ,—কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বে কারণ-দ্রব্যের সমবায়-ভাব। যেমন,—

* বুদ্ধদেব স্বয়ং প্রতীত্যসমুৎপাদ বিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশের কিয়দংশ এই,—"উৎপাদাদ্বা তথাগতানামনুৎপাদাদ্বা স্থিতৈবৈষাং ধর্ম্মাণাং ধর্ম্মিতা ধর্ম্মস্থিতিতা ধর্ম্মনিয়ামকতা প্রতীত্য-সমুৎপাদানুলোমতা ইতি। অথ পুনরয়ং প্রতীত্যসমুৎপাদো দ্বাভ্যাং কারণাভ্যাং ভবতি হেতূপনিবন্ধতঃ প্রত্যয়োপনিবন্ধতশ্চ। যদিদং বীজাদঙ্কুরোঽঙ্কুরাৎ পত্রং পত্রাৎ কাণ্ডং কাণ্ডান্নালং নালাদ্গর্ভো গর্ভাচ্ছূকং শূকাৎ পুষ্পং পুষ্পাৎ ফলমিতি।......ইত্যুক্তো হেতূপনিবন্ধঃ।......প্রত্যয়ো হেতূনাং সমবায়ঃ হেতুং হেতুং প্রতি অয়ন্তে হেত্বন্তরাণীতি তেষাময়মানানাং ভাবঃ প্রত্যয়োহেতুসমবায় ইতি যাবৎ। ষন্নাং ধাতূনাং সমবায়াৎ বীজ হেতুরঙ্কুরো জায়তে।" ইত্যাদি।

বীজে অঙ্কুরোৎপত্তির হেতু-ভাব; যেমন,—অঙ্কুরোৎপত্তির পূর্ব্বে বীজে ক্ষিত্যপতেজাদি পার্থিব দ্রব্যের সংযোগ। বাহ্য ও আধ্যাত্মিক ভেদে যে চারি প্রকার প্রতীত্যসমুৎপাদ, তাহার দৃষ্টান্ত এইরূপ;—মূল বীজ হইতে অঙ্কুর, পত্র, কাণ্ড, নাল, পুষ্প, ফল প্রভৃতির যে উৎপত্তি-পর্য্যায়, তাহাই হেতুপনিবন্ধ বাহ্য প্রতীত্যসমুৎপাদ। আর, ক্ষিত্যপতেজো-মরুদ্ব্যোম ও কাল এই ষড়বিধ পদার্থের সমন্বয়ে বীজাঙ্কুরাদির যে উৎপত্তি, তাহাই প্রত্যয়ো-পনিবন্ধ বাহ্য প্রতীত্যসমুৎপাদ। অবিদ্যা হইতে বিজ্ঞান, নাম, রূপ, স্পর্শ, তৃষ্ণা, উপদান, ভব, জাতি প্রভৃতির যে উৎপত্তি, তাহাই হেতুপনিবন্ধ আধ্যাত্মিক প্রতীত্যসমুৎপাদ; আর, ক্ষিত্যপতেজোমরুদ্ব্যোম ও বিজ্ঞানের সংযোগে যে জীবাদির উৎপত্তি, তাহাই প্রত্যয়োপনিবন্ধ আধ্যাত্মিক প্রতীত্যসমুৎপাদ। মাধবাচার্য্য সংগৃহীত 'সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ'-গ্রন্থে 'বৌদ্ধদর্শন' অধ্যায়ে এই প্রতীত্যসমুৎপাদের বিবরণ বিশদভাবে বর্ণিত আছে। কাহারও কোনও চেতনা নাই, কাহারও কোনও নিয়ামক নাই, আপনাপনিই সকল পদার্থের সৃষ্টি হয়,—স্থূলতঃ ইহাই প্রতীত্যসমুৎপাদের অভিপ্রায়। সুতরাং এই মতে সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের প্রয়োজন নাই; নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভ করিতে পারিলেই সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হয়।

বৌদ্ধ-দর্শনের প্রতিপাদ্য।

ষড়দর্শন আলোচনায় দেখিয়াছি,—দার্শনিকগণ মূল তত্ত্বকে কেহ পঞ্চবিংশতি ভাগে, কেহ ষোড়শ ভাগে, কেহ বা সাত ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। কিন্তু বৌদ্ধ-দার্শনিকগণের মতে জগতের মূলতত্ত্ব দুইটী মাত্র—চিত্ত ও ভূত। তাঁহারা বলেন,—"ভূতং ভৌতিকং চিত্তং চৈত্তঞ্চ।" অর্থাৎ, ভূত হইতে জগতাদি ভৌতিক পদার্থের এবং চিত্ত হইতে রূপ-বিজ্ঞানাদি পঞ্চস্কন্ধাত্মক চৈত্ত পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে। সে হিসাবে ভৌতিক পদার্থ চারিটি;—পৃথিবী, অপ, তেজ, বায়ু। এই চতুর্ব্বিধ ভূত বা 'ধাতু' হইতে পরিদৃশ্যমান্ বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে। পৃথিব্যাদি চতুর্ব্বিধ ধাতুর (পরমাণুর) সংহতিক্রমে স্থূল সৃষ্টি সাধিত হয়। চতুর্ব্বিধ ধাতুর আবার—খর, স্নেহ, উষ্ণ, ঈরণ (গতিশীল) চতুর্ব্বিধ স্বভাব। আকর্ষণ, বিকর্ষণ, বিক্রিয়া, ধর্ম্মবত্ত প্রভৃতিও ধাতুচতুষ্টয়ের স্বভাবান্তর্গত। স্বভাব-বশে সংযোগ-বিয়োগে স্থূল জগতের সৃষ্টি হয়, ভৌতিক জগৎ উৎপন্ন হয়। চৈত্ত পদার্থের মধ্যে,—"রূপ-বিজ্ঞান-বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কার-সংজ্ঞকাঃ পঞ্চস্কন্ধাশ্চিত্তচৈত্তাত্মকাঃ",—রূপ, বিজ্ঞান, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার—এই পাঁচটী অবয়ব। ইন্দ্রিয়ের সহ বিষয়ের সম্বন্ধ—রূপস্কন্ধ; সুখদুঃখাদির অনুভব—বেদনা-স্কন্ধ; আমি, আমার ইত্যাদি অহংভাব—বিজ্ঞানস্কন্ধ; ইহা মনুষ্য, ইহা পশু ইত্যাদি ভেদভাব,—সংজ্ঞাস্কন্ধ; রাগদ্বেষাদি ভাব—সংস্কার-স্কন্ধ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—সংস্কারই অবিদ্যার মূল। ক্ষণস্থায়ী পদার্থের স্থায়িত্ব-কল্পনাই অবিদ্যা। অবিদ্যা হইতে রাগ, দ্বেষ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম প্রভৃতি চিত্তবৃত্তির আবির্ভাব হয়। বৌদ্ধেরা ঈশ্বর স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে,—সৃষ্টি স্বভাবের ক্রিয়া; সৃষ্টি চিরদিন সমভাবে চলিতেছে; কর্ম্মদ্বারা জীব সংসারে আগমন করে, এবং কর্ম্মফলভোগে বাধ্য হয়। সুতরাং কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করিয়া, প্রজ্ঞালাভের দ্বারা নির্ব্বাণপ্রাপ্তিই বৌদ্ধ-দর্শনের সার সিদ্ধান্ত। করুণা, চিত্তস্থৈর্য্য, গৌরবত্যাগ, শম,

দম, ক্ষান্তি প্রভৃতি দ্বারা প্রজ্ঞালাভ হইয়া থাকে। মূলতঃ বৌদ্ধগণের মতে,—সকল পদার্থই ক্ষণিক; সকল পদার্থই দুঃখময়; সকল পদার্থই বিসদৃশ; সকল পদার্থই অলীক।

"সর্ব্বং ক্ষণিকং ক্ষণিকং দুঃখং দুঃখং। স্বলক্ষণং স্বলক্ষণং শূন্যং শূন্যং॥"

এবম্বিধ ভাবনাই, এবম্বিধ অভ্যাসই, এবম্বিধ ভাবনার উৎকর্ষই, আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি-রূপ নির্ব্বাণের হেতুভূত। করুণাদি গুণ-পরম্পরায় বিভূষিত হইয়া যাঁহারা সংসারের এবম্বিধ নশ্বরত্ব ধারণা করিতে পারেন, তাঁহারাই নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভের অধিকারী হন। প্রায় সমস্ত বৌদ্ধ-দর্শনেরই মূলতত্ত্ব এইরূপ। এই মূল-তত্ত্ব-বিষয়েই বেদান্তের সহিত বৌদ্ধমতের বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। বৈদান্তিকগণের মুক্তি বা নির্ব্বাণে জীবাত্মা-স্বরূপ পরব্রহ্ম নাম-রূপ ইত্যাদি মায়োপাধি হইতে নির্ম্মুক্ত হন। কিন্তু বৌদ্ধ-নির্ব্বাণে সকলই ভৌতিক পদার্থে বিলীন হইয়া যায়। ভৌতিক পদার্থে লীন হওয়াই বৌদ্ধগণের নির্ব্বাণ। নির্ব্বাণ-সম্বন্ধে বৌদ্ধগণের মূল-তত্ত্ব এক হইলেও, বুদ্ধদেবের উপদেশ অভিন্ন হইলেও, বৌদ্ধগণ কিন্তু নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত। 'সর্ব্বং ক্ষণিকং' ইত্যাদি চতুর্ব্বিধ ভাবনা দ্বারা নির্ব্বাণ লাভ হয়,—সকলেই ইহা স্বীকার করেন বটে; কিন্তু তথাপি তাঁহাদের মধ্যে সম্প্রদায়-ভেদের ত্রুটি নাই। সেই সম্প্রদায়-সমূহের মধ্যে চারিটি সম্প্রদায় বিশেষ প্রসিদ্ধ;—(১) মাধ্যমিক, (২) যোগাচার, (৩) সৌত্রান্তিক, এবং (৪) বৈভাষিক। মাধ্যমিকগণ শূন্যবাদী; ইহাঁরা সর্ব্বশূন্যত্ব প্রচার করেন। ইহাঁদের মতে,—জ্ঞান ও বিষয় সকলই শূন্য। সৃষ্টির পূর্ব্বে আদ্যন্তহীন শূন্যই বিরাজমান ছিল; শূন্য অবলম্বনেই বিশ্ব-প্রপঞ্চের সৃষ্টি; আবার শূন্যেই তাহার লয় হইবে। যোগাচারগণ বাহ্যশূন্যত্ববাদী। তাঁহারা বলেন,—'বাহ্য বিষয়ের কোনও অস্তিত্ব নাই; জ্ঞানমাত্রই প্রত্যক্ষ; জ্ঞানের দ্বারাই সর্ব্বশূন্যত্ব প্রতিপন্ন হয়। নীল, পীত প্রভৃতির ক্ষণিকত্ব বিজ্ঞান সাহায্যেই নির্ণীত হইয়া থাকে; সুতরাং বিজ্ঞানের সত্তা আছে,—বিজ্ঞান ভিন্ন আর সমস্তই অসত্য।' সৌত্রান্তিকগণ বাহ্যার্থানুমেয়ত্ব স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন,—'জ্ঞান প্রত্যক্ষ, বিষয় অনুমেয়। জ্ঞান আত্মাংশে অনুভূত হয়, বাহ্যবস্তু বহিরংশে অনুভাব্য। সুতরাং জ্ঞান সত্য হইলে, বাহ্যবস্তুও অবশ্যই সত্য হইবে।' বৈভাষিকগণ বাহ্যার্থ-প্রত্যক্ষত্ব স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন,—'জ্ঞানও প্রত্যক্ষ, বিষয়ও প্রত্যক্ষ। আত্মাংশে অবস্থিত বলিয়া জ্ঞান যদি প্রত্যক্ষ হয়, জ্ঞানানুভূত বাহ্য বস্তুই বা প্রত্যক্ষ-পর্য্যায়ভুক্ত না হইবে কেন?' যাহা হউক, অন্যান্য বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও, পদার্থের ক্ষণিকত্ব-সম্বন্ধে বৌদ্ধগণের মধ্যে কোনই মতভেদ দৃষ্ট হয় না। দীপশিখা এবং বায়ুচালিত মেঘসমূহ যেমন ক্ষণিক, অথচ সৎ; বৌদ্ধগণের মতে—পৃথিবীও তদ্রূপ ক্ষণিক ও সৎ। সকলেই এক-মত ব্যক্ত করিয়াছেন, সকলেই এক নির্ব্বাণ-মুক্তির পথে প্রধাবিত হইয়াছেন; অথচ, সকলেরই পরিগৃহীত পন্থা স্বতন্ত্র। সেই স্বতন্ত্রতা-নিবন্ধনই পরবর্ত্তি-কালে জৈন-দর্শন প্রভৃতি আরও বিভিন্ন দর্শনের উৎপত্তি হইয়াছে। তত্তৎ বিবরণও যথাস্থানে আলোচিত হইবে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ষড়্‌দর্শন-সমন্বয়।

[হিন্দু-দর্শনের সাদৃশ্য,—দুঃখ-নাশে সুখ-সাধন সকল দর্শনেরই মুখ্য উদ্দেশ্য,—মতভেদ প্রকার-ভেদ মাত্র,—তত্ত্বজ্ঞান লাভই দুঃখনাশের মূলীভূত,—বিভিন্ন দর্শনে দুঃখনাশ ও মুক্তির প্রসঙ্গ,—বেদান্তের মুক্তি,—পদার্থাদি বিচারে পার্থক্য-তত্ত্ব,—কর্ম্মফল-ভোগ জন্ম-নিবন্ধ,—ব্রহ্মতত্ত্ব, বিশ্বতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব, পরলোকতত্ত্ব এই তত্ত্ব-চতুষ্টয়ে দর্শনশাস্ত্র ;—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন,—প্রাচ্যের প্রকৃতি পাশ্চাত্যে নামান্তরে প্রকাশমান,—সাংখ্যের বিকৃতি ডারউইনের 'ইভলিউশন', কণাদের পরমাণু পাশ্চাত্যের 'য়্যাটম' প্রভৃতি,—ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও প্রমাণ বিষয়ে ঐক্যানৈক্য,—স্পেন্সার, বার্কলে, প্লেটো, কাণ্ট, ডেকার্টে প্রভৃতির মতালোচনা,—অহং-তত্ত্বাদি বিশেষ বিশেষ বিষয়ে সাদৃশ্য,—পার্থক্য অদৃষ্টবাদে,—ইউরোপে হিন্দু-দর্শনের অনুবাদাদি।]

দর্শন-শাস্ত্রসমূহ আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই,—সকল দর্শনেরই মুখ্য উদ্দেশ্য এক, সকল দর্শনেরই প্রতিপাদ্য অভিন্ন, সকল দর্শনই জীবের দুঃখনাশ ও সুখ-সাধনের উপায় নির্দ্ধারণে নিয়োজিত। মূলে সকল দর্শনেরই সমন্বয় আছে ; তবে মীমাংসায় পরস্পরের মধ্যে যে মতভেদ দৃষ্ট হয়, তাহা প্রকার ভেদমাত্র। সকল দর্শনকারই সংসারকে দুঃখময় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ; সকল দর্শনকারই সেই দুঃখনিবৃত্তির উপায় উদ্ভাবনে যত্নবান হইয়াছেন। এতদ্বিষয়ে কোনও দর্শনের মধ্যেই বিরোধ নাই। দুঃখনিবৃত্তি বা সুখ-প্রাপ্তি—কোনও দর্শনে নিঃশ্রেয়স বা কৃতকৃত্যতা, কোনও দর্শনে কৈবল্য বা স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা, কোনও দর্শনে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি বা মুক্তি,—এইরূপ বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়াছে বটে ; কিন্তু সকলেরই উদ্দেশ্য যে এক, সকলই যে কেবল শব্দের বিভিন্নতা মাত্র, তাহা বলাই বাহুল্য। 'জল' পদার্থ বুঝাইতে—কখনও পানীয়, কখনও তোয়, কখনও সলিল—নানা শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; অথচ, বস্তুগত জল পদার্থ, যেমন এক ভিন্ন দুই নহে ; সেইরূপ মুক্তি, নিঃশ্রেয়স, কৈবল্য প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত হইলেও, আত্যন্তিক-দুঃখনিবৃত্তি পদার্থ টীও মূলতঃ এক ভিন্ন দুই নহে। বিবেকীর দৃষ্টিতে সংসারের সকলই যে দুঃখময়,—কি সাংখ্য, কি পাতঞ্জল, কি বৈশেষিক, কি মীমাংসা, কি ন্যায়, কি বেদান্ত,—সকলেই তাহা একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। পতঞ্জলি বলিয়াছেন,—"পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ।" অর্থাৎ, পরিণাম, তাপ ও সংস্কার এবং গুণবৃত্তির বিরোধ-হেতু সংসারের সকলই বিবেকীর দৃষ্টিতে দুঃখময়। কপিল বলিয়াছেন,—"তদপি দুঃখকা চলমিতি দুঃখপক্ষে নিক্ষেপন্তে বিবেচকাঃ।" অর্থাৎ, যাহা আপাতঃ-সুখকর বলিয়া প্রতীত হয়, তাহাও দুঃখমিশ্রিত ; তজ্জন্য বিবেকিগণ ঐরূপ সুখকে দুঃখের মধ্যেই গণনা করিয়া থাকেন। বেদান্ত তো সংসারের সকল পদার্থকেই দুঃখময় 'অবস্তু' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দুঃখাবসানের অথবা সেই সুখ-লাভের অবস্থা-বিষয়ে অবশ্য মতান্তর দৃষ্ট হয়। কেহ বলেন,—ব্রহ্মানন্দে মিলনই বিদেহ-মুক্তি ; কেহ বলেন,—স্বরূপে অবস্থানই মুক্তি ; কেহ বলেন,—আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিই মুক্তি। স্থূলতঃ, কাহারও মতে—চির-আনন্দ-লাভই মুক্তি ; কাহারও মতে—

হিন্দু-দর্শনের সাদৃশ্য।

সুখ-দুঃখের সংস্রব-শূন্যতাই মুক্তি। বেদান্ত বলেন,—ব্রহ্মের সহিত অভিন্নতাই মুক্তি; "অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ।" পতঞ্জলি বলেন,—স্বরূপে অবস্থানই মুক্তি; "তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্।" সাঙ্খ্য বলেন,—আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তিহেতু কৃতকৃত্যতাই মুক্তি; "অত্যন্তদুঃখনিবৃত্ত্যা কৃত-কৃত্যতা।" ন্যায় বলেন,—আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তিই মুক্তি; "আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির্মুক্তিঃ।" বৈশেষিক বলেন,—পদার্থের সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য-জ্ঞান দ্বারা যে দুঃখনিবৃত্তি, তাহাই নিঃশ্রেয়স বা মুক্তি; "ধর্ম্মবিশেষপ্রসূতাদ্দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্যবিশেষ-সমবায়ানাং পদার্থানাং সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানাৎ নিশ্রেয়সম্।" মীমাংসকের মতে,—কর্ম্মকাণ্ডের দ্বারা স্বর্গাপবর্গ-প্রাপ্তিই সুখলাভ অর্থাৎ মুক্তি। সকলেরই লক্ষ্য যে এক—দর্শনশাস্ত্রসমূহ আলোচনা করিলে তাহাতে আর কোনই সংশয় থাকে না। জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত আজীবন অহরহ জীব এই দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য চেষ্টা করিয়া বেড়াইতেছে। মানুষ যে কোনও কর্ম্মই করে, সকলেরই মূল উদ্দেশ্য—দুঃখ-নিবৃত্তি বা সুখ-লাভ। সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক প্রভৃতি দর্শন এইরূপভাবে সংসারের সেই দুঃখের নিবৃত্তি করিতে চাহেন,—যাহাতে আর কখনও দুঃখের মুখ দেখিতে না হয়। সুখলাভ হউক বা না হউক, সর্ব্বতোভাবে দুঃখের নিবৃত্তি হইলেই মুক্তিলাভ হইল,—প্রধানতঃ ইহাই তাঁহাদের অভিপ্রায়। এক হিসাবে, বৌদ্ধগণের নির্ব্বাণ-মুক্তি এবং সাঙ্খ্য প্রভৃতির আত্যন্তিক-দুঃখ-নিবৃত্তিরূপ মুক্তি একই পর্য্যায়ভুক্ত বলা যাইতে পারে। বেদান্তের মত কিন্তু তাহা হইতে আর একটু স্বতন্ত্র। বোধ হয়, সে মত—তুলনায় উচ্চতর। এই জন্যই শঙ্করাচার্য্য বেদান্ত-মতেরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা পাইয়াছিলেন; এবং সেই জন্যই শঙ্করাচার্য্যের মতের অনুবর্ত্তী হইয়া মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন,—"সর্ব্বদর্শনশিরোমণিভূতং শাঙ্করদর্শনম্।" অর্থাৎ, শঙ্করাচার্য্য-পরিগৃহীত বেদান্তদর্শনই সর্ব্বদর্শনের শিরোমণিস্বরূপ। বেদান্ত-মতকে কেন এতদূর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হইয়াছে, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলেই বা কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই,—বেদান্ত-দর্শন কেবল দুঃখ-নাশকেই সার বলিয়া মনে করেন নাই; তাঁহার মতে,—দুঃখ-নিবৃত্তির পরবর্ত্তী যে আনন্দময় অবস্থা, যে অবস্থায় জীব ও ব্রহ্মের কোনই ভেদাভেদ থাকে না, সেই অবস্থা-প্রাপ্তিই মুক্তি। উপনিষদে আছে,—"সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মঃ।" অর্থাৎ, ব্রহ্ম—সত্য-স্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ। কিন্তু তিনি কেমন সত্য, কেমন জ্ঞান, কেমন আনন্দ, বৈদান্তিকগণ তাহারও বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। সংসারে সত্য আছে, জ্ঞান আছে, আনন্দ আছে; কিন্তু সে সত্য, সে জ্ঞান, সে আনন্দ, বেদান্তের মতে, অপূর্ণ, বিকৃত বা ভ্রান্তি-মূলক। জলস্থিত সূর্য্য-প্রতিবিম্বে প্রভা আছে; কিন্তু সে প্রভা এবং সূর্য্যমণ্ডলস্থিত প্রভার মধ্যে যেরূপ বিভিন্নতা, সংসারের আনন্দ বা জ্ঞানের সহিত ব্রহ্মানন্দ বা ব্রহ্মজ্ঞানের সেইরূপ পার্থক্য। একই উদ্যানের একই মৃত্তিকার রস আকর্ষণ করিয়া, বিভিন্ন বৃক্ষের বিভিন্ন ফল বিভিন্ন আস্বাদ-বিশিষ্ট হইয়া থাকে; সেইরূপ, একই ব্রহ্মানন্দ ইহসংসারে কর্ম্মানুসারে বিভিন্ন জীবে বিভিন্ন প্রকার ফল দান করে। বেদান্ত বলেন,—সকল পার্থক্য পরিত্যাগ করিতে হইবে, অগ্নিকণা হইয়া অগ্নিতে মিশিতে হইবে। অনন্ত আনন্দসাগরে

আত্মলীন হওয়াই বেদান্তের মুখ্য উদ্দেশ্য। সে হিসাবে জীবের তিন অবস্থা;—বদ্ধাবস্থা, জীবন্মুক্তাবস্থা এবং বিদেহমুক্তি বা নির্ব্বাণাবস্থা। বদ্ধাবস্থার দৃষ্টান্তে পণ্ডিতগণ বলেন,—উহা গঙ্গাজলনিমগ্ন ছিদ্রশূন্য জলপূর্ণ কলসবৎ। অর্থাৎ, কোনও জলপূর্ণ কলসীর মুখ বদ্ধ করিয়া গঙ্গাজলের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিলে কলসীর মধ্যস্থিত জল যেমন বিকৃত হইয়া যায়, সংসারাবদ্ধ জীব মায়া-দ্বারা আবদ্ধ হইয়া সেইরূপ বিকৃতি-প্রাপ্ত হয়। জীবন্মুক্তের দৃষ্টান্তে তাঁহারা গঙ্গাজলনিমগ্ন জলপূর্ণ সচ্ছিদ্র কলসের উপমা দিয়া থাকেন। সেরূপ অবস্থায়, ছিদ্র-মধ্য দিয়া কলসীর ভিতর গঙ্গার জল প্রবেশ করে; এবং প্রবাহ-মুখে কখনও তাহা নির্গত হয়, কখনও বা তাহা সঞ্চিত হয়। ফলে, জীব যখন আপনার সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ রক্ষা করে, তখন তাহার জীবন্মুক্ত অবস্থা। বিদেহ-মুক্তি-অবস্থা ঐ দুই অবস্থা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। সে অবস্থায় কলসীর অস্তিত্ব নাই; সে অবস্থায় জলে জল মিশিয়া সকলই এক হইয়া গিয়াছে; তখন আর, কতটুকু ব্রহ্ম, কতটুকু জীব, কতটুকু গঙ্গার জল, কতটুকু কলসীর জল,—কোনক্রমেই তাহা উপলব্ধি হয় না। ইহাই বেদান্তের ব্রহ্মানন্দ বা মুক্তি। মুক্তিলাভ করিতে হইলে, তত্ত্ব-জ্ঞানের আবশ্যক,—প্রায় সকল দর্শনেই এই মত প্রতিফলিত। সাঙ্খ্য বলেন,—প্রকৃতি পুরুষের ভেদজ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান। বৈদান্তিকগণের মতে,—জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্মই সত্য, এই জ্ঞানই অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য-জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান। ন্যায় বলেন,—প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের আলোচনায়, আত্মা যে শরীর হইতে ভিন্ন—এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়; তাহাতে মিথ্যা জ্ঞানের উচ্ছেদ; ফলে, দুঃখ-নিবৃত্তি-রূপ অপবর্গলাভ। বৈশেষিক মতে,—দ্রব্যাদি সপ্ত পদার্থের তত্ত্ব অবগত হইলে, তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়; তত্ত্বজ্ঞানে অদৃষ্ট-নাশ; অদৃষ্ট-নাশে কর্ম্মরোধে দুঃখনিবৃত্তি-রূপ মোক্ষপ্রাপ্তি। পতঞ্জলি বলেন,—সুখ-দুঃখ চিত্তের ধর্ম্ম; আত্মার সহিত তাহার কোনই সম্পর্ক নাই; তত্ত্বজ্ঞানে চিত্তের শুদ্ধি সম্পন্ন হয়; আত্মা মুক্তি লাভ করে। মীমাংসকের তত্ত্বজ্ঞান—কর্ম্মকাণ্ডের বিঘ্ন-দূরীকরণে; বৈদিক কর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন হইলে যে স্বর্গলাভ হয়, তাহাই মুক্তি। বলিয়াছি তো, মূল বিষয়ে সকল দর্শনকারের মধ্যেই ঐক্য আছে। তবে পার্থক্য মাত্র—জ্ঞান-লাভের উপায়-পরম্পরা-নির্দ্দেশে। কি প্রকারে কোন বিষয়ের জ্ঞান লাভ হয়, এবং সেই জ্ঞান লাভ হইলে কি প্রকারে মুক্তির অধিকারী হইতে পারা যায়,—ভিন্ন ভিন্ন দর্শনে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে তাহার আলোচনা দেখিতে পাই। কপিল বলেন,—প্রকৃত্যাদি পঞ্চবিংশ পদার্থে জগতের সৃষ্টি; সেই পঞ্চবিংশতি পদার্থের পার্থক্য-তত্ত্ব অবগত হইতে পারিলেই দুঃখনিবৃত্তি হয়। বাদরায়ণের বেদান্ত-মতও প্রায় ঐরূপ। তবে, কপিল যাহাকে প্রকৃতির বিকৃতি বলিয়াছেন, বাদরায়ণ তাহাকে 'মায়া' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। গৌতম ষোড়শ পদার্থ স্বীকার করিয়া কপিলের পঞ্চবিংশ পদার্থকে তাহারই অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। কণাদ সপ্ত পদার্থ মাত্রের উল্লেখ করিয়া আর যত কিছু তাহারই মধ্যে পর্য্যবসিত করিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায়,—কেহ সংক্ষেপে, কেহ বিস্তৃত-ভাবে, কেহ সূত্রাকারে, কেহ ব্যাখ্যার ভাবে, আপন আপন মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন; বস্তুতঃ, মূল বিষয়ে পার্থক্য বিশেষ কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। দৃষ্টান্তস্থলে, ব্যাকরণের

স্ত্রের বিষয় উল্লেখ করিতে পারি। পাণিনির তিনটী সূত্র কলাপের একটী স্ত্রে গ্রথিত আছে; মুগ্ধবোধেও ঐ সকল সূত্র অধিকতর সংক্ষিপ্তভাবে দেখিতে পাই। উহাও যেরূপ প্রকার-ভেদ মাত্র, দর্শনকারগণের পদার্থ-সংখ্যা-নিরূপণও সেইরূপ প্রণালীভেদ-বিশেষ। সংসারে আসিয়া জীবদেহ-ধারণে কর্ম্মভোগ-সম্বন্ধে সকল দর্শনকারই অদৃষ্ট বা কর্ম্মফল স্বীকার করিয়াছেন। কর্ম্মফলভোগের জন্য জীব সংসারে গমনাগমন করে, তাহার সেই সংসরণ বা গমনাগমন কি প্রকারে রুদ্ধ হয়,—স্থূলতঃ দর্শনশাস্ত্রসমূহের তাহাই প্রতিপাদ্য। সেই অবস্থাই—মুক্তির অবস্থা। সেই মুক্তির পথ দেখাইতে গিয়া, সকল দর্শনকারই ব্রহ্মতত্ত্ব, বিশ্বতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব এবং পরলোকতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। স্থূলতঃ, এই তত্ত্বচতুষ্টয় লইয়াই দর্শন-শাস্ত্র।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য-দর্শন।

ভারতীয় দর্শন-সমূহের সহিত পাশ্চাত্য-দর্শনের বহু বিষয়ের ঐক্য আছে, আবার বহু বিষয়ের পার্থক্যও আছে। প্রথমতঃ সাঙ্খ্যের যাহা প্রকৃতি, পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের 'ম্যাটার' (Matter), 'এলিমেণ্ট' (Element), 'ইথার' (Ether), 'প্রোটাইল' (Protyle) প্রভৃতি তাহারই নামান্তর মাত্র। সাঙ্খ্য মতে,—প্রকৃতির উৎপত্তি ও বিনাশ নাই; হার্ব্বার্ট স্পেন্সার বলেন,—'ম্যাটার' কখনও উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয় না। অপিচ, প্রকৃতির বিকৃতিই যে সৃষ্টির কারণ, হার্ব্বার্ট স্পেন্সার তাহাও স্বীকার করিয়া বলেন,—"ম্যাটারের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়;—সেই পরিবর্ত্তনই সৃষ্টি-বিশেষ।" এ হিসাবে, ডারউইনের বিবর্ত্তবাদ (Evolution Theory) এবং সাঙ্খ্যের প্রকৃতির বিকৃতি অভিন্ন বলিয়াও মনে হয়। ডারউইন বলেন,—'নানা জাতীয় তরু-লতা এবং পশু-পক্ষী কখনই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সৃষ্ট হয় নাই; জাগতিক পদার্থের পুনঃপুনঃ অবস্থান্তর-বশতঃ তাহারা নানা রূপে প্রকটিত হইতেছে।' পরিবর্ত্তনের ঘাতপ্রতিঘাতে বানর হইতে বনমানুষ এবং বনমানুষ হইতে মনুষ্যের উৎপত্তি হয়,—ইহাই ডারউইনের মত বলিয়া প্রচারিত। সুতরাং সাঙ্খ্যোক্ত প্রকৃতির বিকৃতি-রূপ ভিত্তির উপর ডারউইনের বিবর্ত্তবাদ প্রতিষ্ঠিত, তাহা বলাই বাহুল্য।* সার উইলিয়ম ক্রুকস আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ। তিনি বলেন,—সকল পদার্থের উপর 'প্রোটাইল' অবস্থিত। তাহাই জগতের প্রধান উপাদান; অন্যান্য পদার্থের সহিত তাহার ঘাত-প্রতিঘাতে সৃষ্টি-কার্য্য সম্পন্ন হয়। সে হিসাবে, 'প্রোটাইল' আদি-পদার্থ এবং প্রকৃতি ভিন্ন তাহাকে অন্য কিছু বলিয়া মনে করা যায় না। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ বহুদিন হইতে 'এলিমেণ্ট' বা ভূত-সমষ্টির সমবায়ে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের হিসাবে, সেই ভূত-সংখ্যা কখনও পঁয়ষট্টিটি, কখনও চৌষট্টিটি, কখনও সত্তরটি; কখনও বা তাহার কমিবেশী দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ মূল উপাদান চারিটী;—বায়ু, জল, মৃত্তিকা, অনল; অধিকন্তু, বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় যে সকল পার্থিব সামগ্রী দ্রবীভূত হয় না, তাঁহাদের মতে, সেই সেই সামগ্রীও 'এলিমেণ্ট'। বলা বাহুল্য, যতই যাহা দেখিতে পাই, সকলই

*"The Origin of Species by means of Natural Selection."—By Charles Darwin.

নামের প্রভেদ মাত্র। নচেৎ, ভূত-সম্বন্ধে হিন্দু-দর্শনকারগণের মধ্যেও সংখ্যার যে তারতম্য দৃষ্ট হয়, উহাও তদনুরূপ। ফলে, প্রকৃতির বিকৃতি-বশতঃ সৃষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়—এই সাঙ্খ্য-মতের সহিত পাশ্চাত্য-মতের প্রায়ই অভিন্নতা দৃষ্ট হয়। মহর্ষি কণাদ যে পরমাণু-তত্ত্ব প্রচার করেন, পাশ্চাত্যের 'য়্যাটম্' (Atom) ও 'য়্যাটমিক থিওরি' (Atomic Theory) অনেকাংশ তাহারই সহিত সাদৃশ্য-সম্পন্ন। উক্ত মতাবলম্বিগণ বলেন,—সৃষ্টি-কর্ত্তার সাহায্য না লইয়া, পরমাণু-সমূহের ক্রিয়ায় সৃষ্টি-কার্য্য সম্পন্ন হয়। ইউরোপে প্রথমে গ্রীস-দেশীয় দার্শনিক ডেমক্রেটাস এই পরমাণুবাদ-তত্ত্ব প্রচার করেন; পরিশেষে এপিকিউরাস কর্ত্তৃক সেই পরমাণুবাদ অধিকতর প্রতিষ্ঠান্বিত হয়। সে হিসাবে, ৫১০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ হইতে ইউরোপে পরমাণুবাদ-তত্ত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অবশেষে অষ্টাবিংশ শতাব্দীতে রসায়ন-বিজ্ঞানের আলোচনায় জন ড্যাল্টন এই পরমাণু-তত্ত্বকে এক অভিনব বৈজ্ঞানিক অবয়ব প্রদান করিয়া ইংলণ্ডে আপন কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করেন। † ঈশ্বরের অস্তিত্বে প্রমাণাভাব এবং তাঁহার সৃষ্টি-কর্ত্তৃত্বে মতান্তর,—কপিলাদির দর্শন-শাস্ত্রে যেরূপভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, পাশ্চাত্য দর্শনকারগণের মধ্যেও তাহারই প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাই। ঈশ্বর আছেন; কিন্তু তাঁহার অস্তিত্বের প্রমাণাভাব,—জন ষ্টুয়ার্ট মিল ঠিক এইভাবেই ঈশ্বরকে স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে,—"সৃষ্টি-কার্য্য দেখিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় বটে; কিন্তু তাহাতে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা বা সর্ব্বশক্তিমত্তা সপ্রমাণ হয় না। তিনি যদি সর্ব্বশক্তিমান্ হইতেন, তাহা হইলে সৃষ্টিকার্য্য-সম্বন্ধে সংসারে কৌশলের কখনই আবশ্যক হইত না। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ হইলে, সংসারের কেহ সুখী, কেহ দুঃখী হইত না; তাহা হইলে, মহামারীতে বা প্রলয়ে জীবের ধ্বংস ঘটিত না; তাহা হইলে, কখনই পাপীর প্রাধান্য ও পুণ্যবানের ক্লেশ দেখিতাম না। ইহাতে ঈশ্বরকে সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়া তো মনেই হয় না; পরন্তু তিনি দয়াবানও নহেন। তিনি সর্ব্বশক্তি-মান হইলে, সর্ব্বজ্ঞ হইলে, তাঁহার এত কৌশলের সৃষ্টি কখনও ক্ষণভঙ্গুর হইত কি?" হার্ব্বার্ট স্পেন্সার বলেন,—"ঈশ্বরের ইচ্ছায় জগতের সৃষ্টি হইয়াছে কিনা, তাহা নির্ণয় করা যায় না; জগতের কারণ অজ্ঞাত, ঈশ্বর জ্ঞানাতীত।" প্রমাণাদি সম্বন্ধে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পাশ্চাত্য-দর্শনকারগণ প্রায়ই প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দ্বিবিধ প্রমাণ মান্য করেন। চার্ব্বাকাদি প্রত্যক্ষ-বাদীরা যেমন বলেন,—"অনুমান প্রমাণের মূল—প্রত্যক্ষ"; তাঁহারা যেমন দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দেন,—"অন্ধকার গৃহে পুষ্পের ঘ্রাণ পাইলে, পুষ্প না দেখিয়াও লোকে তাহাকে পুষ্পের ঘ্রাণ বলিয়া যে অনুমান করে, তাহার কারণ,—পূর্ব্বে সেইরূপ পুষ্পের ঘ্রাণ তাহার প্রত্যক্ষ হইয়াছিল; সুতরাং প্রত্যক্ষই সর্ব্বমূলাধার।"—মিল, বেইন, হিউম প্রভৃতির মত প্রায়ই এইরূপ। তবে এ বিষয় লইয়াও অনেক সময় তর্ক বিতর্ক দেখিতে পাওয়া যায়। এক-পক্ষ বলেন,—"যাহা দেখিতে পাই, তাহাই যদি প্রমাণ হয়, তাহা হইলে কাল, আকাশ প্রভৃতির প্রমাণ কোথায়?" ইহার উত্তরে অপর পক্ষ সমান্তরাল রেখার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেন। তাঁহারা বলেন,—"সমান্তরাল রেখার মিল হয় না দেখিতে পাই; কিন্তু সকল

† John Dalton's *Atomic Theory* in the New System of Chemical Philosophy.

কালের সকল সমান্তরাল রেখাই কি মনুষ্যের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে? সুতরাং বুঝিতে হয়,— দুই একটী দৃষ্টান্ত দেখিয়া যে জ্ঞান সঞ্চার হয়, তদ্দ্বারা আমরা অপরাপর বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিয়া লই। সে হিসাবে, প্রত্যক্ষ ভিন্ন অন্যরূপেও জ্ঞান লাভ হয়।" যাহা হউক, এ সকল বিষয়ে হিন্দু দর্শনকারগণ বিচার-বিতণ্ডার ক্রটি করেন নাই, এবং শেষে তাঁহারা প্রত্যক্ষ ও অনুমান ভিন্ন অন্যান্য প্রমাণের সার্থকতা উপলব্ধি করিয়াছেন। মিল কার্য্য-কারণের সম্বন্ধের বিষয় স্বীকার করেন। হার্ব্বার্ট স্পেন্সার পুরুষানুক্রমিক সংস্কারের পক্ষপাতী। হিউম ও বার্কলের মতে,—'যাহা ইন্দ্রিয়-জ্ঞান-সাপেক্ষ, তাহাই পদার্থ।' কাণ্ট বলেন,—"বাহ্যবস্তু আত্মায় প্রতিভাত না হইলে, তৎসম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান জন্মে না। সেই জ্ঞানের ফলেই পদার্থ-তত্ত্ব উপলব্ধি হয়।" বলা বাহুল্য, এই দুই মতই কপিলের মানস-প্রত্যক্ষের অন্তর্ভুক্ত। বাচস্পতি মিশ্র সাঙ্খ্যের টীকায় এই ভাবটী একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন,—'গ্রাম্য-পঞ্চায়ৎ কর-সংগ্রহ করিয়া, বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করেন; তাঁহার নিকট হইতে ক্রমশঃ উচ্চ উচ্চতর শাসন-কর্ত্তার হস্তে তৎসমুদয় ন্যস্ত হয়; এবং পরিশেষে রাজা সেই কর প্রাপ্ত হন। পদার্থ-বিষয়ক জ্ঞানও তদ্রূপ। প্রথমে বাহ্যেন্দ্রিয়ে, তৎপরে জ্ঞানেন্দ্রিয়ে এবং পরিশেষে আত্মায় ঐ জ্ঞান উপনীত হয়।" প্লেটো ও কাণ্টের 'আইডিয়ালিজ্‌ম্‌' (Idealism) এবং বেদান্তের মায়াবাদে বিশেষ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ফরাসী দার্শনিক ডেকার্টে আত্মার অস্তিত্ব-সম্বন্ধে 'কজিটো আর্গো সম' (Cogito ergo sum) অর্থাৎ, 'আমি চিন্তা করিতেছি, অতএব আমার সত্ত্বা আছে',—এই মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সাঙ্খ্য বেদান্তাদি দর্শনে এই আত্মতত্ত্ব ঠিক এমনইভাবে বিশদীকৃত হইয়া আছে। সাঙ্খ্যের দুঃখবাদ,—সোপেনহরের 'পেসিমিজম্‌' (Pessimism); বৌদ্ধগণের নির্ব্বাণ,—স্রায়ার মেশারের 'য়্যাব্‌জর্‌সন' (Absorption); ন্যায়ের অন্যোন্যাশ্রয় দোষ,—পাশ্চাত্য 'লজিক' বা ন্যায়ের 'পেটিসিয়ো প্রিন্সিপিয়া' (Petitio Principii); বেদান্তের ব্রহ্মবাদ,—পাশ্চাত্য-দর্শনের 'প্যান্থেইজ্‌ম' (Panthiesm); ইত্যাদি। প্রাচ্য-দর্শনের সহিত পাশ্চাত্য-দর্শনের এইরূপ বহু বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিলেও, একটী বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। সে বিষয়টী— অদৃষ্ট বা কর্ম্মফল। এক হিন্দু ভিন্ন জগতের অন্য কোনও জাতি এই কর্ম্মফল-তত্ত্বের মাহাত্ম্য প্রচার করেন নাই। সৃষ্টি যে কর্ম্মফলমূলক, এ সিদ্ধান্তও অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। যাহা হউক, ইউরোপের নানা ভাষায় ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্র-সমূহ এখন অনুবাদিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ঈশ্বরকৃষ্ণের "সাঙ্খ্যকারিকা"—লাসেন লাটিন-ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন, উইণ্ডিস্‌ম্যান ও লরিন্সার কর্তৃক জর্ম্মণ ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে, প্যাণ্টিয়ার ও সেণ্ট হিলিয়ার ফরাসী-ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন,—কোলব্রুক, উইলসন ও ডেভিস্‌ কর্তৃক ইংরেজী ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। কেবল সাঙ্খ্য-কারিকা বলিয়া নহে; অন্যান্য দর্শনও নানারূপে ভাষান্তরিত ও আলোচিত হইতেছে। ম্যাক্সমুলার, কোলব্রুক, মনিয়র উইলিয়মস্‌, ডেভিস, ডাইসেন প্রভৃতির গ্রন্থে তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। *

* (1) Max Muller's *Six Systems of Indian Philosophy*, (2) Colebrooke's *The Philosohy of the Hindus*, (3) Monier Williams '*Indian Wisdom*, (4) Davies's *Hindu Philsophy*, প্রভৃতি।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

স্মৃতি।

[স্মৃতি বা ধর্ম্মসংহিতা,—মন্বাদি বিংশতি সংহিতার পরিচয়,—সংহিতার সময়-নির্দ্দেশে পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের মতালোচনা,—'ম্লেচ্ছ' শব্দ ও 'ম্লেচ্ছ-দেশ' প্রসঙ্গ ;—মনুসংহিতা,—বিভিন্ন মনু,—মনুসংহিতার বিষয়-পরম্পরা,—মনুর শিষ্য কর্ত্তৃক মনুসংহিতা প্রচার,—মনুসংহিতার দ্বাদশ অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ,—সৃষ্টিতত্ত্ব,—স্ত্রী-ধর্ম্ম, রাজা-প্রজার সম্বন্ধ, রাজধর্ম্ম,—দায়ভাগ ও দ্বাদশবিধ পুত্র,—বর্ণবিশেষের তপস্যা ও মোক্ষলাভ ;—অত্রি-সংহিতা,—ইষ্ট-পূর্ত্ত-কার্য্যে মোক্ষলাভ,—বর্ণধর্ম্ম-কথন,—সহমরণ-প্রসঙ্গ ;—বিষ্ণুসংহিতা—সংহিতার নামকরণ ও বিশেষত্ব,—চতুর্ব্বর্ণের কর্ম্মবিভাগ,—বিচার-বিবরণ,—লক্ষ্মীর বসতি-স্থান ;—হারীত-সংহিতা,—সৃষ্টি-প্রসঙ্গ,—নারসিংহ-পূজা ;—যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা,—দায়ভাগ ও মিতাক্ষরার সার সামগ্রী ;—উশনঃ-সংহিতা,—অশৌচ-বিধি, শ্রাদ্ধপদ্ধতি, ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার, প্রায়শ্চিত্ত,—ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বর ও ওঙ্কারের প্রাধান্য কীর্ত্তন,—সমুদ্র-যাত্রা নিষেধ ;—অঙ্গিরঃ-সংহিতা,—প্রায়শ্চিত্ত ও স্ত্রী-ধর্ম্মের প্রসঙ্গ ;—যম-সংহিতা,—বিধি-নিষেধাদি ;—আপস্তম্বসংহিতা,—প্রায়শ্চিত্ত বিধি ;—সংবর্ত্ত-সংহিতা,—খাদ্যাখাদ্যবিচার ;—কাত্যায়ন-সংহিতা,—গণেশ-পূজা,—গৌরীপূজা প্রভৃতি ;—বৃহস্পতি-সংহিতা,—দান-ধর্ম্ম,—বাপীকূপতড়াগ প্রতিষ্ঠার পুণ্যকথা ;—পরাশর-সংহিতা,—কলিশাস্ত্র,—গৃহস্থালী ও সমাজ সম্পর্কীয় কথা,—বিধবার কর্ত্তব্য-প্রসঙ্গ ;—ব্যাস-সংহিতা,—গৃহস্থের নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া ;—শঙ্খসংহিতা,—গয়াক্ষেত্রাদি তীর্থের মাহাত্ম্য,—বিবাহাদি প্রসঙ্গ ;—লিখিত-সংহিতা,—কাশী-গয়া-তীর্থ,—বৃষোৎসর্গ ;—দক্ষসংহিতা,—সর্ব্ববর্ণের কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ ;—গৌতম-সংহিতা,—রাজধর্ম্ম ;—শাতাতপ-সংহিতা,—রুদ্র, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, যম, বাসুদেব, সরস্বতী প্রভৃতির প্রসঙ্গ,—কর্ম্মবিপাক ;—বশিষ্ঠ-সংহিতা,—আচার-প্রসঙ্গ,—বিবাহ, আয়ুর্বৃদ্ধি ;—সংহিতা-সমূহের সমালোচনায় সামাজিক চিত্র,—কাল-বিচার ;—রঘুনন্দনাদির স্মৃতিতত্ত্ব।]

আর্য্য-হিন্দুগণের প্রতিষ্ঠার আর এক পরিচয়—স্মৃতি। স্মৃতি বা ধর্ম্মসংহিতা হিন্দু-সমাজের মেরুদণ্ডস্বরূপ। স্মৃতি অনুসারে আজিও হিন্দু-সমাজ পরিচালিত হইয়া থাকে।

স্মৃতি বা ধর্ম্ম-সংহিতা।

পণ্ডিতগণ বলেন,—দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনায়, ভ্রান্ত-বুদ্ধি জনগণের চিত্ত যখন বিভিন্ন পথে প্রধাবিত হয়,—জ্ঞানকাণ্ডের বিভিন্নমুখী শাখা-পল্লবে আবার যখন কর্ম্মকাণ্ড আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে,—জনহিত-পরায়ণ ঋষিগণ তখন শ্রুত্যুক্ত ধর্ম্মোপদেশসমূহ সংহিতাকারে প্রচার করেন। বহু পূর্ব্বে ধর্ম্মসূত্র-সমূহে অঙ্কুর-রূপে যে উপদেশ-পরম্পরা নিহিত ছিল, স্মৃতিরূপে এইবার তাহা পল্লবিত মুকুলিত হয়। পূর্ব্ব-বিষয়ের অনুভূতি বলিয়া উহার নাম স্মৃতি ('স্মৃ'=স্মরণ+ভাবে 'ক্তি')। এই স্মৃতির সহিত শ্রুতির সম্বন্ধ অভিন্ন বলিয়া শাস্ত্রকারগণ শ্রুতি ও স্মৃতিকে ব্রাহ্মণের দুই চক্ষু-রূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।* এই স্মৃতি বা ধর্ম্ম-সংহিতার সংখ্যা—বিংশতি। সেই বিংশতি সংহিতার নাম,—(১) মনু, (২) অত্রি, (৩) বিষ্ণু, (৪) হারীত, (৫) যাজ্ঞবল্ক্য, (৬) উশনঃ, (৭) অঙ্গিরাঃ, (৮) যম, (৯) আপস্তম্ব, (১০) সংবর্ত্ত, (১১) কাত্যায়ন, (১২) বৃহস্পতি, (১৩) পরাশর, (১৪) ব্যাস, (১৫) শঙ্খ, (১৬) লিখিত, (১৭) দক্ষ, (১৮) গৌতম, (১৯) শাতাতপ, (২০) বশিষ্ঠ। প্রধানতঃ

* "শ্রুতিঃ স্মৃতিশ্চ বিপ্রাণাং নয়নে দ্বে প্রকীর্ত্তিতে।"—অত্রিসংহিতা।

উল্লিখিত বিংশতি সংহিতা অধুনা প্রচলিত হইলেও, পরাশর-সংহিতায়, যম, বৃহস্পতি ও ব্যাস-সংহিতার পরিবর্তে, কশ্যপ, গর্গ ও প্রচেতা সংহিতার নাম দৃষ্ট হয়। * যাহা হউক, স্মৃতি-সমূহে ধর্ম্ম-কর্ম্ম, আচার-ব্যবহার, রাজনীতি প্রভৃতির পরিচয় বিশদ-ভাবে বর্ণিত আছে। তাহাতে হিন্দু-সমাজের—আর্য্য-সভ্যতার—একটী বিশদ চিত্র প্রতিফলিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্মৃতি-শাস্ত্রসমূহ কোন্ সময়ে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহার বিশেষ কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না; সুতরা যাঁহার মনে যাহা উদয় হয়, তিনি সেই ভাবেই উহার সময়-নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের মধ্যে স্যর উইলিয়ম জোন্সের মতে—খৃষ্ট-জন্মের ১২৮০ বৎসর পূর্ব্বে মনুসংহিতা বিরচিত হইয়াছিল। কোনও কোনও আধুনিক পণ্ডিতের সিদ্ধান্তে—বৌদ্ধযুগে মনুসংহিতার প্রচলন হয়। কেহ কেহ আবার বলেন—সংহিতাসমূহের উৎপত্তি পূর্ব্ববর্ত্তি-কালে হইলেও, ভারতে মুসলমান-শাসনের সময়ে উহার মধ্যে অনেকাংশ নূতন সংযোজিত হইয়াছে। পণ্ডিতগণের এইরূপ সিদ্ধান্তের হেতুবাদ,—সংহিতা-সমূহের নানা-স্থানে ম্লেচ্ছ-শব্দের উল্লেখ আছে; কোথাও ম্লেচ্ছদেশে গমনের ও ম্লেচ্ছদেশে শ্রাদ্ধ-কার্য্যের নিন্দাবাদ আছে; কোথাও বা ম্লেচ্ছ-ভাষা শিক্ষায় নিষেধ করা হইয়াছে। † সংহিতাদির এইরূপ কাল-নির্ণয় সম্বন্ধে অবশ্য বাদ-প্রতিবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা 'ম্লেচ্ছ' শব্দ দেখিয়া মুসলমান শাসন-সময়ে উহা রচিত হইয়াছিল বলিয়া স্থির করেন, তাঁহাদের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদচ্ছলে কয়েকটী আপত্তি উত্থাপিত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ, আপত্তিকারিগণ বলেন,—ম্লেচ্ছ-শব্দে মুসলমানদিগকে বুঝায় না। 'ম্লেচ্ছ'-শব্দের অর্থ,—শিষ্টাচারহীন অসভ্য জাতি-বিশেষ। চাতুর্ব্বর্ণ্য ব্যবস্থাদি-রহিত যে দেশ, সে হিসাবে, তাহাই ম্লেচ্ছদেশ। ‡ সুতরাং, আর্য্য-হিন্দুগণের প্রতিষ্ঠার দিনে যে দেশ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পালন করিত না, সেই দেশই তখন 'ম্লেচ্ছদেশ' নামে অভিহিত ছিল। ৫৭০ খৃষ্টাব্দে মুসলমান-ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহম্মদ জন্মগ্রহণ করেন; মহম্মদীয়-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তনা—তাহার পরবর্ত্তি-কালের ঘটনা। সে হিসাবে মুসলমান-গণের ভারতাধিকার সেদিনের ঘটনা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু তাহার কত পূর্ব্বের শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে 'ম্লেচ্ছদেশ' ও 'ম্লেচ্ছ'-শব্দের উল্লেখ আছে। সুতরাং, সংহিতায় 'ম্লেচ্ছ' শব্দের ব্যবহার আছে বলিয়া কখনই উহা মুসলমান-শাসনাধিকারের সময় রচিত হইয়াছিল বলা যায় না। যদি মুসলমান-শাসনাধিকারে কোনও সংহিতা রচিত হইত, তাহা হইলে 'মুসলমান' 'ইসলাম' 'মহম্মদ' প্রভৃতি শব্দও উহাতে সন্নিবিষ্ট থাকার সম্ভাবনা ছিল। হরিবংশ, মহাভারত এবং কোনও কোনও পুরাণের পরবর্ত্তি-কালে

---

* পরাশর-সংহিতায় প্রথম অধ্যায়ের ১৩শ হইতে ১৫শ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

† অত্রি-সংহিতার ১৮০ ও ১৮৩ শ্লোকে ম্লেচ্ছজাতির নিন্দা, বিষ্ণু-সংহিতার ৮৪শ অধ্যায়ে ম্লেচ্ছ-দেশে গতিবিধি-গমনাগমনে এবং ম্লেচ্ছ-দেশে শ্রাদ্ধকার্য্যে নিন্দাবাদ, ব্যাস-সংহিতার প্রথম অধ্যায়ে অখাদ্যখাদক-গণকে অন্ত্যজ নাম প্রদান এবং শঙ্খ-সংহিতার চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে ম্লেচ্ছ দেশে গমন ও শ্রাদ্ধের নিষেধ প্রভৃতিই ইহার হেতুবাদ। বশিষ্ঠ-সংহিতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে, "ন ম্লেচ্ছভাষাং শিক্ষেৎ"—এইরূপ উক্তি আছে।

‡ "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ব্যবস্থানং যস্মিন্ দেশে ন বিদ্যতে।"

কোনও কোনও সংহিতা সঙ্কলিত হইয়াছিল, অনেকে তাহারও প্রমাণ দেখাইয়া থাকেন; শাতাতপ সংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের একত্রিংশৎ এবং সপ্তত্রিংশৎ শ্লোকে 'হরিবংশ ও মহাভারত পাঠ করিয়া শুদ্ধ হইবে'—এইরূপ উক্তি আছে, ইত্যাদিই তাঁহাদের হেতুবাদ।

স্মৃতি বা ধর্ম্ম-শাস্ত্রের মধ্যে মনুসংহিতা প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। 'মনু'-নামের সহিতই কত স্মৃতি বিজড়িত। ব্রহ্মার পুত্র মনু, মনুষ্যজাতির আদি-পুরুষ মনু, স্বায়ম্ভুবাদি চতুর্দ্দশ মনু, সূর্য্য-পুত্র মনু, পৃথিবীর প্রথম রাজা মনু, ধর্ম্মসূত্র-প্রণেতা মনু,—মানব-জাতির সহিত মনুর সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন। সুতরাং কোন্ মনু কর্ত্তৃক কোন্ সময়ে মানব-ধর্ম্ম-সংহিতা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, কে তাহা নির্ণয় করিবে? লিখিত আছে, সংসারীর জ্ঞাতব্য ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে মহর্ষি মনু তাঁহার শিষ্যগণকে যে উপদেশ দিয়া গিয়াছিলেন, মনুসংহিতায় পরবর্ত্তি-কালে তাঁহার শিষ্যগণ তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই সংহিতায়, জগতের উৎপত্তি বিবরণ, জাতকর্ম্মাদি সংস্কার-বিধি, ব্রহ্মচর্য্যের বিবরণ, গুরুর প্রতি অভিবাদন ও স্নান-বিধি, দারাধিগমন, বিবাহ ও বিবাহের লক্ষণ, মহাযজ্ঞবিধান, সনাতন শ্রাদ্ধ-কল্প, ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের জীবিকার লক্ষণ, গৃহস্থের কর্ত্তব্য, ভক্ষ্যাভক্ষ্য-বিচার, শৌচ, দ্রব্যাদি শুদ্ধির বিধি, স্ত্রী-ধর্ম্ম, যতি সন্ন্যাসী ও রাজগণের ধর্ম্ম, ঋণদানাদির বিচার-নির্ণয়, সাক্ষীদিগের প্রশ্ন-বিধান, স্ত্রী-পুরুষের ধর্ম্ম, দায়ভাগ, দ্যূতক্রীড়া, তস্করাদির দণ্ডবিধান, বৈশ্য-শূদ্রের কর্ত্তব্য-বিধান, সঙ্কীর্ণ জাতি-সমূহের উৎপত্তি-বিবরণ, চতুর্ব্বর্ণের আপদ্ধর্ম্ম, প্রায়শ্চিত্ত-বিধি, কর্ম্ম-জনিত দেহান্তর-প্রাপ্তিরূপ উত্তম-মধ্যম-অধম প্রভৃতি ত্রিবিধ গতি, মোক্ষোপায়, কর্ম্মসমূহের দোষ-গুণ, দেশধর্ম্ম, জাতিধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম এবং বেদবিরোধী পাষণ্ডগণের ধর্ম্ম প্রভৃতির বিষয় আলোচিত হইয়াছে। মনুসংহিতা—মহর্ষি মনু প্রণয়ন করিয়া গিয়াছিলেন, অনেকেই এইরূপ বিশ্বাস করেন। কিন্তু বাস্তবপক্ষে তাহা নহে। মনুসংহিতা আলোচনা করিলে দেখা যায়,—মহর্ষি মনু আপন শিষ্যগণকে যে শাস্ত্র-তত্ত্ব উপদেশ দিয়াছিলেন, বহুকাল পর্য্যন্ত মুখে মুখে তাহা প্রচলিত ছিল; পরিশেষে তাঁহার কোনও শিষ্য কর্ত্তৃক তাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। বর্ত্তমান মনুসংহিতা যে মনু কর্ত্তৃক লিখিত সংহিতা নহে, মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে তাহা বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। মহর্ষি মনুর কোনও শিষ্য পরবর্ত্তি-কালে ঐ সংহিতা-শাস্ত্র যে ভাবে বর্ণনা করিতেছেন, তাহা হইতেই প্রোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। সংহিতার প্রথম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে শিষ্য বলিতেছেন,—"যথেদমুক্তবান্ শাস্ত্রং পুরা পৃষ্টো মনুর্ময়া। তথেদং যূয়মপ্যস্য মৎসকাশান্নিবোধত॥" অর্থাৎ,—"পুরাকালে ভগবান মনু আমার প্রশ্নের উত্তরে আমাকে যাহা বলিয়াছিলেন, আমি যথাযথভাবে সেই শাস্ত্র আপনাদিগের নিকট ব্যক্ত করিতেছি,—আপনারা শ্রবণ করুন।" মনুসংহিতার শেষ শ্লোকেও দৃষ্ট হয়,—"ইত্যেতন্মানবং শাস্ত্রং ভৃগুপ্রোক্তং পঠন্ দ্বিজঃ।" অর্থাৎ, মহর্ষি মনুর শিষ্য ভৃগু কর্ত্তৃক যে শাস্ত্র বিবৃত হইয়াছিল, তাহাই এই মনুসংহিতা আখ্যা প্রাপ্ত হয়। ইহাতে আরও বুঝা যায়,—এই ভাবে বহুকাল পর্য্যন্ত শ্রুতি-পরম্পরায় চলিয়া আসিয়া পরিশেষে উহা বর্ত্তমান আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। সে উপদেশ, প্রথমে সূত্রাকারে

মনুসংহিতা।

'মানব ধর্ম্মসূত্র' নামে পরিচিত ছিল, শেষে সংহিতাকারে এইরূপে গ্রথিত হইয়া আসিয়াছে। পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রাখিতে হইলে, এতদতিরিক্ত অন্য কিছু বলিতে পারা যায় না। মনুসংহিতা বেদানুগত; উহাতে বেদ-বিহিত ধর্ম্মই পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে;

"বেদার্থোপনিবন্ধাচ্চ প্রাধান্যং হি মনোঃস্মৃতেঃ। মন্বর্থ বিপরীতা চ যা স্মৃতিঃ সা ন শস্যতে॥"

সুতরাং মনু-স্মৃতির প্রাধান্য সর্ব্বপ্রকারেই প্রতিপন্ন হয়। মনুসংহিতা দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। সেই দ্বাদশ অধ্যায়ে সর্ব্বসমেত দুই সহস্র সাত শত চারিটি শ্লোক আছে। অধ্যায়-সমূহে সংক্ষেপে নিম্নলিখিত বিষয়-সমূহ আলোচিত হইয়াছে;—প্রথম অধ্যায়ে,—মুনিগণের ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা, তৎসম্বন্ধে মনুর প্রত্যুত্তর, সৃষ্টি-প্রকরণ, মনুর আদেশে ভৃগু-কর্ত্তৃক মানব-ধর্ম্ম-কথন, দৈবাদি কাল-নির্ণয়, বর্ণ-ধর্ম্ম-কথন এবং গ্রন্থের অনুক্রমণিকা; দ্বিতীয় অধ্যায়ে,—ধর্ম্মের চতুর্ব্বিধ প্রমাণ-প্রসঙ্গ, ব্রহ্মচর্য্য বিধি, শিষ্যগণের কর্ত্তব্য, গুরুজনাদির অভিবাদন-প্রক্রিয়া; তৃতীয় অধ্যায়ে,—চাতুর্ব্বর্ণের বিবাহ-প্রণালী, ব্রাহ্মাদি অষ্টবিধ বিবাহের লক্ষণ, পঞ্চ মহাযজ্ঞ, অতিথি-সৎকার, শ্রাদ্ধাদির নিত্যত্ব কথন; চতুর্থ অধ্যায়ে,—উঞ্ছশীল বৃত্তি প্রভৃতি জীবিকা-সংস্থানোপায়, গার্হস্থ্য-নিয়ম; পঞ্চম অধ্যায়ে,—ভক্ষ্যাভক্ষ্য-বিচার, অশৌচ-নির্ণয়, দ্রব্য-শুদ্ধি এবং স্ত্রী-ধর্ম্ম-কথন; ষষ্ঠ অধ্যায়ে,—আশ্রম-ধর্ম্মের বিধি-ব্যবস্থা; সপ্তম অধ্যায়ে,—রাজধর্ম্ম এবং রাজ্যরক্ষার উপায়াদি বর্ণন; অষ্টম অধ্যায়ে,—ব্যবহার-দর্শন-নিয়ম, অষ্টাদশ বিবাদ-পদাদি-কথন, সাক্ষি-বিবরণ, দণ্ড-নির্ণয়, রাজ-দণ্ডের পাপ-নাশকতা; নবম অধ্যায়ে,—স্ত্রী-পুরুষের ধর্ম্ম-বিচার, দায়-বিভাগ, দ্যূতক্রীড়া, চৌর্য্যাদি নিরাকরণোপায় এবং বৈশ্য-শূদ্রের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ; দশম অধ্যায়ে,—সঙ্কর-বর্ণের উৎপত্তি, বর্ণ-চতুষ্টয়ের বৃত্তি-নিরূপণ; একাদশ অধ্যায়ে,—প্রায়শ্চিত্ত-বিধি; দ্বাদশ অধ্যায়ে,—কর্ম্মানুসারে জন্মান্তর-গ্রহণ-বিবরণ, জ্ঞান ও মোক্ষের সাধকতা প্রভৃতি। সৃষ্টি-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে মনুসংহিতায় দৃষ্ট হয়,—সৃষ্টির পূর্ব্বে সকলই তমসাচ্ছন্ন অপ্রত্যক্ষ ও ধারণার অতীত ছিল; তর্ক ও জ্ঞানের অতীত অবস্থায় সকলই যেন প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ছিল। অতঃপর স্বয়ম্ভু অব্যক্ত ভগবান্, মহাভূতাদি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের সৃষ্টি-প্রবৃত্ত হইয়া, স্বয়ং প্রকাশমান হন। তিনিই প্রথম শরীরাকারে প্রাদুর্ভূত হন; তাঁহার প্রকাশে অন্ধকার দূরীভূত হয়। আপন শরীর হইতে বিবিধ প্রজা সৃষ্টির ইচ্ছা করিয়া, তিনি চিন্তা-মাত্রে প্রথমে জলের সৃষ্টি করেন, এবং তাহাতে আপন শক্তিবীজ অর্পণ করেন। তাহা হইতে এক অণ্ডের উৎপত্তি হয়; সেই অণ্ডে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করেন। পরিশেষে তাঁহার ধ্যানবলে সেই অণ্ড (ব্রহ্মাণ্ড) দ্বিধা বিভক্ত হয়; তাহার একভাগে ঊর্দ্ধখণ্ডে স্বর্গাদি লোক এবং অপর ভাগে অধঃখণ্ডে পৃথিব্যাদি নির্ম্মিত হয়। মধ্যভাগে আকাশ, অষ্টদিকে ও শাশ্বত-সলিল-স্থান সমুদ্র অবস্থিতি করে। অতঃপর পরমাত্মাস্বরূপ মন, মনের পূর্ব্ব অহং জ্ঞান্ এবং অহং-জ্ঞানের পূর্ব্বে মহত্তত্ত্বের স্ফুরণ হয়। তৎপরে ক্রমে ক্রমে ইন্দ্রিয়াদি এবং ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ-ভূতের সহিত যোজনায় দেব-মনুষ্য-তীর্য্যগাদি জীবের সৃষ্টি করেন। বায়ু, নক্ষত্র, গ্রহ, ঋতু, কাল প্রভৃতি সমস্তই তাঁহারই ইচ্ছায় সৃষ্ট হয়। যাঁহা হইতে সৃষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তিনি

হিরণ্যগর্ভ, ব্রহ্মা ইত্যাদি নামে অভিহিত হন। তাঁহারই দেহ হইতে স্ত্রী ও পুরুষের উৎপত্তি হয়। আপনার মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র,—এই চারি বর্ণেরও তিনিই সৃষ্টি করেন; ইত্যাদি। মনুর মতে,—'সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে যাহাদের প্রাণ আছে, তাহারা শ্রেষ্ঠ; প্রাণিগণের মধ্যে বুদ্ধিজীবিগণ শ্রেষ্ঠ; বুদ্ধিজীবি-গণের মধ্যে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ; এবং মনুষ্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণের মধ্যে যাঁহারা বিদ্বান, তাঁহারা শ্রেষ্ঠ; বিদ্বানগণের মধ্যে যাঁহারা শাস্ত্রানুষ্ঠানে কর্ত্তব্যবুদ্ধি, তাঁহারা শ্রেষ্ঠ; আবার কর্ত্তব্য-কর্ম্মকারীর মধ্যে যাঁহারা ব্রহ্মবাদী, তাঁহারা শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণের যে শরীরোৎপত্তি, তাহা ধর্ম্মের সনাতন মূর্ত্তিমান্ অবস্থা। ত্রিলোকের সমুদায় ধন ব্রাহ্মণের; ব্রাহ্মণ সর্ব্ববর্ণের শ্রেষ্ঠ; ব্রাহ্মণই সমুদায় সম্পত্তির যোগ্যাধিকারী। ব্রাহ্মণ সর্ব্বদাই আচারানুষ্ঠানে যত্নবান থাকিবেন। আচার-ভ্রষ্ট হইলে, ব্রাহ্মণ বেদের ফলভাগী হইতে পারেন না।" গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম-বিষয়ে মনুসংহিতায় যে সুন্দর সারগর্ভ উপদেশ আছে, তাহাতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র,—সকলেরই বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; স্বাস্থ্য-রক্ষাদির উপায় পরিবর্ণিত হইয়াছে; শিক্ষা, সদাচার প্রভৃতির বিধি-বিধান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; কিরূপ ভাবে কাহার সহিত সম্বন্ধ রাখা উচিত, তদ্বিষয়েও উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম-কথন প্রসঙ্গে মনু বলিয়াছেন,—"শ্রদ্ধয়েষ্টঞ্চ পূর্ত্তঞ্চ নিত্যং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ। শ্রদ্ধাকৃতে হ্যক্ষয়ে তে ভবতঃ স্বাগতৈর্ধনৈঃ॥" অর্থাৎ,—নিরলসভাবে শ্রদ্ধার সহিত সর্ব্বদা ইষ্ট ও পূর্ত্তকার্য্য সম্পন্ন করিবে। ঐ দুই কার্য্য শ্রদ্ধা-সহকারে সম্পন্ন করিলে, অক্ষয় পুণ্য লাভ হয়। বলা বাহুল্য,—যজ্ঞকর্ম্ম ইষ্ট নামে; এবং পুষ্করিণী-কূপাদি খনন—পূর্ত্তকার্য্য বলিয়া অভিহিত হয়।* জলদান ও যজ্ঞকর্ম্ম উভয়ই তখন সমভাবে স্বর্গলাভের উপায় বলিয়া গণ্য হইত,—ইহাতে তাহাই প্রতিপন্ন হয়। বিবাহাদি সম্বন্ধে হিন্দু-সমাজে এখনও যেরূপ জাতিকুলের প্রতি দৃষ্টি করা হয়, মনুসংহিতাও তদনুরূপ সম্বন্ধ-বিধানই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। মনু স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন,—"হীনকুল সকল পরিত্যাগ করিয়া উত্তমোত্তম কুলের সহিত ব্রাহ্মণগণ সম্বন্ধ রক্ষা করিবেন; সেই সম্বন্ধেই তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব; তাহার বিপরীতাচরণ করিলে, তাঁহাদের হীনত্ব ঘটিয়া থাকে।"† স্ত্রীধর্ম্ম-কথন প্রসঙ্গে মহর্ষি মনু স্পষ্টতঃ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন,—"কি বালিকা, কি যুবতী, কি বৃদ্ধা—কোনও স্ত্রীরই স্বাধীন ও স্বতন্ত্র-ভাবে কার্য্য করা উচিত নহে। বাল্যকালে পিতার বশে, যৌবনে স্বামীর বশে, স্বামীর অভাবে পুত্রের বশে, স্ত্রীলোকদিগকে থাকিতে হইবে। তাহাদের স্বাধীনতা অবলম্বন কখনই কর্ত্তব্য নহে। পিতা, ভর্ত্তা বা পুত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্ত্রীলোক স্বতন্ত্রভাবে থাকিবার চেষ্টা করিলে, তাহাতে পিতৃকুল, ভর্ত্তৃকুল উভয় কুল কলঙ্কিত হয়। স্বামী ভিন্ন স্ত্রীলোকের পৃথক যজ্ঞ নাই, ব্রত নাই, উপবাস নাই; পতি-সেবাই স্ত্রীলোকের স্বর্গ-লাভের উপায়। পতি মৃত হইলে, স্ত্রী বরং শুভ্র পুষ্পফলমূলের দ্বারা জীবন ধারণ করিবেন;

---

* "ইষ্টমন্তর্ব্বেদি যজ্ঞাদিকর্ম্ম, পূর্ত্তং ততোহন্যৎ পুষ্করিণীকূপপ্রপারামাদি।"—মনুসংহিতা, চতুর্থ অধ্যায়, ২২৬শ শ্লোক, কুল্লুক ভট্টের টীকা।

† মনুসংহিতা, চতুর্থ অধ্যায়, ২৪৪শ ও ২৪৫শ শ্লোক।

কিন্তু কখনও পরপুরুষের নামোচ্চারণও করিবেন না। স্বামীর মৃত্যুর পর একমাত্র ব্রহ্মচর্য্য-বলেই স্ত্রীলোক স্বর্গলাভ করিতে পারেন।" * রাজধর্ম্ম-কথন-প্রসঙ্গে মহর্ষি মনু রাজা ও প্রজা উভয়েরই কর্ত্তব্য অতি সুন্দরভাবে নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। প্রজা রাজাকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিবে; রাজা বালক হইলেও তিনি মহান্ দেবতা—মনুষ্য-রূপে অবস্থান করিতেছেন,—প্রজা তাঁহাকে সেই ভাবে দর্শন করিবে; রাজা বিনয়াদি গুণ-সম্পন্ন হইয়া ব্রাহ্মণগণের আদেশানুসারে রাজকার্য্য সম্পন্ন করিবেন; বিনীত রাজা কখনও বিনাশ প্রাপ্ত হন না; গজাশ্বাদি বহুবিভবশালী হইলেও বিনয়াভাবে রাজার বিনাশ হইয়া থাকে; আবার চিরকাননচারী ব্যক্তিও বিনয়গুণে রাজত্ব লাভ করিয়া থাকে। নহুষ, বেণ, সুদাস, সুমুখ ও নিমি প্রভৃতি প্রবলপরাক্রান্ত রাজচক্রবর্ত্তিগণ একমাত্র বিনয়াভাবেই বিনষ্ট হইয়াছিলেন; আবার পৃথু, মনু প্রভৃতি বিনয়-বলে সাম্রাজ্যাধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। † যে রাজা বুদ্ধিদোষে, উগ্রতাবশে, প্রজার বিরুদ্ধাচরণ করেন, তিনি অবিলম্বে রাজ্যভ্রষ্ট ও সবংশে ধ্বংসপ্রাপ্ত হন। সর্ব্বধর্ম্ম অপেক্ষা প্রজাপালনই রাজার শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম; শাস্ত্রোক্ত করাদি-ভোক্তা রাজা প্রজাপালনে সর্ব্বতোভাবে বাধ্য। যে রাজ্যের প্রজাগণ, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণ, ক্ষুধায় অবসন্ন হন, সে রাজ্য দুর্ভিক্ষগ্রস্ত হইয়া উৎসন্ন-দশা প্রাপ্ত হয়। কিরূপভাবে রাজা অপরের সহিত ব্যবহার করিবেন, কিরূপ-ভাবে যুদ্ধ-যাত্রা করিবেন, কিরূপভাবে যুদ্ধ করিবেন, কিরূপভাবে সৈন্যব্যূহ রচনা করিবেন,—মহর্ষি মনু তাহাও নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তৎকালে কোন্ কোন্ দেশীয় কীদৃশ সৈন্য যুদ্ধকার্য্যে নিযুক্ত হইত, মনুসংহিতায় তাহারও উল্লেখ আছে। দেখা যায়, —বিরাট, কান্যকুব্জ, কুরুক্ষেত্র, মথুরা প্রভৃতি দেশের সৈন্য তৎকালে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল।

"কুরুক্ষেত্রাংশ্চ মৎস্যাংশ্চ পাঞ্চালান্ শূরসেনজান্। দীর্ঘান্ লঘূংশ্চৈব নারানগ্রানীকেষু যোধয়েৎ॥" †

সেই সকল সৈন্য পুরোভাগে রক্ষা করিয়া রাজা যুদ্ধ-কার্য্যে ব্রতী হইতেন,—এইরূপ উল্লেখ দেখিতে পাই। ‡ ব্যবহার-দর্শন-নিয়ম কথন-প্রসঙ্গে মহর্ষি মনু যাহা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, আজি পর্য্যন্ত তাহা সমাদৃত হইয়া থাকে। তৎপ্রসঙ্গে উত্তমর্ণ-অধমর্ণের ব্যবহার, রাজা-প্রজার সম্বন্ধ, বিচার ও দণ্ড-পদ্ধতি—কি সুন্দর পরিবর্ণিত! ঋণদান ও ঋণপরিশোধের বিষয়, বন্ধক ও সুদ-প্রসঙ্গ, সাক্ষী জামিন ও প্রমাণ প্রভৃতির কথা—সকলই উহাতে আলোচিত হইয়াছে। অধুনা যে 'হিন্দু-ল'-অনুসারে হিন্দু-সমাজের বিচার-নিষ্পত্তি হইয়া থাকে, তাহারও মূল-ভিত্তি—এই মনুসংহিতা। এখন যেমন ব্যবহার-গ্রন্থের অবতরণিকায় নানারূপ সংজ্ঞার পরিচয় দেখিতে পাই, তাহাও মনে হয়—এই মন্বাদি-সংহিতার অনুস্মৃতি। একটী দৃষ্টান্ত দিই,—"স্যাৎ সাহসন্ত্বন্বয়বৎ প্রসভং কর্ম্ম যৎ কৃতম। নিরন্বয়ং ভবেৎ স্তেয়ং হৃত্বাপহ্নূয়তে চ যৎ॥" অর্থাৎ,—বলপূর্ব্বক অপহরণের নাম—'সাহস'; গোপন-ভাবে অপহরণের নাম 'চুরি'; কোনও দ্রব্য গ্রহণ করিয়া অস্বীকার করার নামও 'চুরি';

* মনুসংহিতা, পঞ্চম অধ্যায়, ১৪৭শ হইতে ১৪৯শ এবং ১৫৭শ ও ১৬৯শ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

† মনুসংহিতা, সপ্তম অধ্যায়, ১৯৩শ শ্লোক।

‡ মনুসংহিতা, সপ্তম অধ্যায়, ৩৯শ—৪১শ শ্লোক।

ইত্যাদি। স্ত্রী-পুরুষের ধর্ম্ম-বিচারে মহর্ষি মনুর মত,—স্ত্রী যেরূপ সর্ব্ব-বিষয়ে পতির অনুগত হইয়া থাকিবে, ভার্য্যারক্ষণ-ধর্ম্মও পতির সেইরূপ শ্রেষ্ঠ-ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইবে। বিবাহের বয়স-নির্দ্ধারণ, স্ত্রী-জাতির দ্বিতীয়বার বিবাহের অর্থাৎ বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধ মত; পতি ভিন্ন অপরের ঔরসোৎপন্ন সন্তানের নীচত্ব-প্রাপ্তি প্রভৃতির বিষয়; এবং কিরূপ-ভাবে সন্তান-সন্ততিগণ পিতৃ-মাতৃ-সম্পত্তির অধিকারী হইবে,—মনু তাহাও নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। * তিনি দ্বাদশ-বিধ পুত্রের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া, তাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব-নিকৃষ্টত্ব বিচার করিয়াছেন। তাঁহার মতে,—বিবাহ-সংস্কারে সংস্কৃতা সবর্ণা পত্নীতে স্বয়ং উৎপাদিত সন্তানকে ঔরস পুত্র বলে; ঔরস পুত্রই মুখ্য পুত্র। † ক্ষেত্রজ, দত্তক, কৃত্রিম, গূঢ়োৎপন্ন, অপবিদ্ধ, কানীন্, সাহোঢ়, ক্রীতক, পৌনর্ভব, স্বয়ং-দত্ত, পারশব—এই একাদশ প্রকার পুত্র পর্য্যায়ক্রমে নিম্নশ্রেণীভুক্ত। জন্মান্তর ও বর্ণধর্ম্ম-সম্বন্ধে মহর্ষি মনু বলিয়াছেন,—"পরলোকে কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয়, এই মনে করিয়া মনুষ্যের শুভকর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। অজ্ঞান-কৃত হউক বা জ্ঞানকৃত হউক, যে কোনও পাপে মুক্তিলাভ করিতে হইলে, সে পাপ আর কখনও করিবে না; তপস্যাই সকল সুখ-সম্পত্তির মূল। ব্রাহ্মণের তপস্যা—জ্ঞানের উৎকর্ষ-সাধন; ক্ষত্রিয়ের তপস্যা—দেশের শান্তি-রক্ষা; বৈশ্যের তপস্যা—বাণিজ্য ও পশুপালন; শূদ্রের তপস্যা—দ্বিজসেবা। স্বর্গাদি লাভের মূল—এই তপস্যা।" ‡ মনুসংহিতার উপসংহারে আমরা দেখিতে পাই,—

"এবং যঃ সর্ব্বভূতেষু পশ্যত্যাত্মানমাত্মনা।
স সর্ব্ব সমতামেত্য ব্রহ্মাভ্যেতি পরং পদম্॥"

যিনি সর্ব্বভূতে আত্ম-দর্শন করেন, সর্ব্ব-সমতা প্রাপ্ত হইয়া, তিনি পরমপদ ব্রহ্ম লাভ করেন। মূলে, এখানেও সেই আত্মজ্ঞান; জ্ঞানলাভই মোক্ষ।

দ্বিতীয়—অত্রিসংহিতা। মহর্ষি অত্রি এই সংহিতা প্রচার করেন। অত্রি নামে অনেক ঋষির পরিচয় পাওয়া যায়। মনু হইতে যে দশ জন প্রজাপতির উৎপত্তি হইয়াছিল, অত্রি তাঁহাদের অন্যতম। সপ্তর্ষিদিগের মধ্যেও অত্রির প্রসঙ্গে দেখা যায়,—তিনি পাঁচটী প্রসিদ্ধ বংশের পৌরহিত্য করিতেন। § এই সংহিতা ৩৯১টী শ্লোকে সম্পূর্ণ। অত্রি-সংহিতায় বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম, শৌচাশৌচ-বিধি, ব্রাহ্মণ-বিভাগ, প্রায়শ্চিত্ত-বিধান প্রভৃতি বর্ণিত আছে। এই সংহিতার মতেও—ইষ্ট ও পূর্ত্ত উভয় কার্য্য দ্বারা স্বর্গ মোক্ষ লাভ হয়। ইহাতে বিশদ-ভাবে লিখিত আছে,—অগ্নিহোত্র, তপস্যা, সত্য, বেদাজ্ঞা প্রতিপালন, অতিথি-সৎকার এবং বিশ্বদেব উপাসনা প্রভৃতি 'ইষ্ট'-কার্য্য; আর, বাপি-কূপ-তড়াগ প্রভৃতি জলাশয় উৎসর্গ,

অত্রি-সংহিতা।

* মনুসংহিতার নবম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

† অধুনা ঔরস ও দত্তক পুত্রই প্রচলিত। অন্যবিধ পুত্র 'জারজ' পুত্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

‡ মনুসংহিতা, একাদশ অধ্যায়ের ২৩৩শ হইতে ২৩৮শ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

§ সপ্তর্ষি,—"মরীচিরত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ। ব্রহ্মণো মানসাঃ পুত্রাঃ বশিষ্ঠশ্চেতি সপ্ততে।" প্রজাপতিদশক,—"মরীচিমত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুং প্রচেতসং বশিষ্ঠঞ্চ ভৃগুনারদমেবচ।"

দেব-মন্দির প্রতিষ্ঠা, অন্নদান ও বৃক্ষ-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি 'পূর্ত্ত'-কার্য্য। দ্বি-জাতি—ইষ্ট ও পূর্ত্ত উভয় কার্য্যেরই অধিকারী; শূদ্র—পূর্ত্ত-কার্য্য করিবে; কিন্তু তদন্তর্গত বৈদিক-ক্রিয়া করিবে না। এই সংহিতার মতে,—"ব্রাহ্মণের ছয়টি কার্য্য। তাহার মধ্যে যজন, দান, অধ্যয়ন – এই তিনটি তপস্যা; আর প্রতিগ্রহ, অধ্যাপন ও যাজন—এই তিনটী জীবিকা। ক্ষত্রিয়ের পাঁচটি কার্য্য। যজন, দান, অধ্যয়ন—এই তিনটি তপস্যা; আর অস্ত্র-ব্যবহার ও প্রাণী-রক্ষা—এই দুইটী জীবিকা। বৈশ্যের চারিটী কার্য্য; যজন, দান, অধ্যয়ন—এই তিনটী তপস্যা; আর, বার্ত্তা (অর্থাৎ কৃষি, বাণিজ্য, গো-রক্ষা) তাহার জীবিকা। শূদ্রের দ্বিজ-সেবাই তপস্যা; আর, শিল্প-কার্য্যই জীবিকা। অত্রি-সংহিতা-মতে গয়াধামে গমন করিয়া ফল্গু-নদীতে স্নান-পূর্ব্বক গদাধরকে দর্শন করিলে, ব্রহ্ম-হত্যার পাপ হইতেও মুক্ত হওয়া যায়। গঙ্গাস্নানে অশেষ পুণ্যের কথাও এই সংহিতাতে দৃষ্ট হয়। সহমরণে গিয়া চিতা হইতে পতিত হইলে, এই সংহিতায় তাহার প্রায়শ্চিত্ত-বিধি আছে। তদ্দ্বারা বুঝা যায়,—ঐ সময় সহমরণ-প্রথা প্রচলিত ছিল। কন্যা-বিক্রয় অতি দোষাবহ বলিয়া অত্রি-সংহিতায় উল্লিখিত হইয়াছে। এমন কি, অত্রি-সংহিতার মতে,—ক্রীতা কন্যার গর্ভজাত সন্তান পিতৃ-পিণ্ডেরও অধিকারী নহে।

তৃতীয়—বিষ্ণু-সংহিতা। বিষ্ণুর প্রাধান্য কীর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়াই এই সংহিতার নাম বিষ্ণু-সংহিতা। মতান্তরে,—স্বয়ং বিষ্ণু এই সংহিতা প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া, ইহার নাম বিষ্ণু-সংহিতা; অথবা, বিষ্ণু-নামক জনৈক ঋষি কর্ত্তৃক এই সংহিতা প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়াই ইহার এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। অন্যান্য সংহিতা হইতে এই সংহিতার একটু বিশেষত্ব দৃষ্ট হয়; সেই বিশেষত্ব,—ইহার কতকাংশ কবিতাচ্ছন্দে লিখিত, কতকাংশ গদ্যে বিরচিত, কতকাংশ সূত্রাকারে গ্রথিত। সূত্র-সাহিত্যের যুগে ধর্ম্মসূত্র-সমূহ যে ভাবে গ্রথিত ছিল দেখিয়াছিলাম, এই সংহিতার অধিকাংশই সেইরূপ সূত্রাকারে অবস্থিত। যেমন,—"ভর্ত্তুঃসমানব্রতচারিত্বম্", "শ্বশ্রূশ্বশুরো গুরুদেবতাতিথিপূজনম্", "সুসংস্কৃতোপোস্করতা", ইত্যাদি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক শতটী অধ্যায়ে এই সংহিতা বিভক্ত। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, পাতকাদি, উত্তমর্ণ-অধমর্ণের লক্ষণ, লেখ্য অর্থাৎ দলীল, সাক্ষী, অসাক্ষী, শপথ, বিবাহ-বিধি, পুত্র-লক্ষণ, স্ত্রী-ধর্ম্ম, সংস্কার, প্রায়শ্চিত্ত, নরক, সদাচার প্রভৃতি বিবিধ বিষয় এই সংহিতায় আলোচিত হইয়াছে। এই সংহিতার প্রথম অধ্যায়ে ক্ষীরোদশায়ী লক্ষ্মী-নারায়ণের সমীপে বসুমতী আসিয়া বর্ণাশ্রম সনাতন ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিতেছেন। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের মতে,—এই অধ্যায়টী পরবর্ত্তি-কালে রচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের কর্ম্মবিভাগ, তৃতীয় অধ্যায়ে রাজধর্ম্ম-বর্ণন, চতুর্থ অধ্যায়ে মহাপাতকের দণ্ডকথা, ষষ্ঠ হইতে অষ্টম অধ্যায়ে উত্তমর্ণ-অধমর্ণ, দলীল ও সাক্ষী প্রভৃতির বিষয়, নবম হইতে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে দোষী নির্দ্দোষের পরীক্ষা, পঞ্চদশ অধ্যায়ে দ্বাদশবিধ পুত্রের উল্লেখ, ষোড়শ অধ্যায়ে নানা জাতি উৎপত্তির বিষয়, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিষয়-প্রাপ্তির কথা, ইত্যাদি বিষয় লিখিত আছে। পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে স্ত্রী-জাতির কর্ত্তব্য-নির্ণয়-প্রসঙ্গে

বিষ্ণু-সংহিতা।

ব্রহ্মচর্য্যের কিম্বা সহগমনের উল্লেখ, পঞ্চষষ্টিতম প্রভৃতি অধ্যায়ে বিষ্ণুকে দেবতারূপে পূজার ব্যবস্থা, সপ্তনবতিতম অধ্যায়ে সাঙ্খ্য ও যোগ-শাস্ত্রের সহিত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সামঞ্জস্য-বিধান, চতুরশীতিতম অধ্যায়ে ম্লেচ্ছদেশে গমনাদিতে ধর্ম্মহানি-প্রসঙ্গ, পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়ে নানা তীর্থ স্থানের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। মধ্যবর্ত্তী অন্যান্য অধ্যায়ে শ্রাদ্ধের কাল, শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা, কূপতড়াগাদি নির্ম্মাণের এবং অন্যান্য নানা প্রসঙ্গ আছে। নবনবতিতম অধ্যায়ে বসুমতীর প্রশ্নের উত্তরে লক্ষ্মী আপনার অবস্থান-স্থান নির্দ্দেশ করিয়া এই মর্ম্মে বলিতেছেন,—"আমি ধর্ম্মনিরতা, পরহিতব্রতা, সত্যবাদিনী, জিতেন্দ্রিয়া, উদারচেতা, দয়ান্বিতা, মুক্তহস্তা, প্রিয়বাদিনী রমণীগণের মধ্যে বাস করি। রম্য প্রদেশে সাধু ও ধর্ম্ম পরায়ণ ব্যক্তির হৃদয়ে, অধ্যয়নসম্পন্ন ব্রাহ্মণে, নির্ম্মল জলে, পূর্ণ-সরোবরে আমার অবস্থিতি।" ইত্যাদি।

চতুর্থ—হারীত-সংহিতা। প্রাচীনকালে মহর্ষি হারীত এই সংহিতার বিষয় বর্ণন করিয়াছিলেন। মার্কণ্ডেয় মুনি, ঋষিদিগের নিকট হারীতের সেই উপদেশ শ্রবণ করেন। তাঁহার নিকট হইতে অম্বরীষ রাজা উহা শ্রবণ করিয়াছিলেন। প্রথমে মুখে মুখেই এই সংহিতার মর্ম্ম প্রচারিত হইয়া আসিতেছিল; পরিশেষে ইহা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয়। বৌধায়ন, বাসিষ্ঠ, আপস্তম্ব প্রভৃতির গ্রন্থে সূত্রাকারে গ্রথিত হারীতের মত উদ্ধৃত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং এই সংহিতাও প্রথমে সূত্রাকারে প্রচলিত ছিল; ক্রমশঃ ছন্দাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে। এই সংহিতা সাত অধ্যায়ে বিভক্ত; ইহাতে এখন মাত্র এক শত চুরানব্বইটি শ্লোক আছে। এই সংহিতার প্রথম অধ্যায়ে সৃষ্টি-প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে,—সৃষ্টির প্রাক্কালে জগৎস্রষ্টা বিষ্ণু, লক্ষ্মীর সহিত নাগ-পর্য্যঙ্কে শয়ান ছিলেন। সেই যোগনিদ্রাগত ভগবানের নাভিদেশ হইতে একটী মহৎ পদ্মের উৎপত্তি হয়, এবং সেই নাভিপদ্মে বেদ-বেদাঙ্গ-ভূষণ ব্রহ্মা আবির্ভূত হন। তখন তাঁহাকে বার বার জগৎ সৃষ্টি করিতে বলায়, তিনি ক্রমে ক্রমে সৃষ্টি-কার্য্য সম্পন্ন করেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে, বর্ণচতুষ্টয়ের কর্ম্ম-নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক নরসিংহ দেবতার পূজার প্রাধান্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মচর্য্যের বিষয়, চতুর্থ অধ্যায়ে গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম ও নরসিংহের প্রধান্য-কীর্ত্তন, ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে আশ্রম-ধর্ম্ম ও যোগশাস্ত্রের বিষয় বর্ণিত আছে। এই সংহিতার মতে,—স্বধর্ম্মাচারী মনুষ্য নরসিংহের প্রসাদে নারসিংহ-পদ প্রাপ্ত হইতে পারেন।

হারীত-সংহিতা।

পঞ্চম—যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা। যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য এই সংহিতার প্রবর্ত্তক। তিনি সামশ্রবা প্রভৃতি মুনিগণের নিকট বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-বিষয়ে, ব্যবহার-শাস্ত্র-সম্বন্ধে এবং প্রায়শ্চিত্তাদি প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছিলেন, পরবর্ত্তি-কালে তাহাই এই সংহিতাকারে লিপিবদ্ধ হয়। রাজর্ষি জনকের রাজসভায় যে যাজ্ঞবল্ক্যের পরিচয় পাই, যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা-প্রবর্ত্তক যাজ্ঞবল্ক্য এবং সেই যাজ্ঞবল্ক্য উভয়ে অভিন্ন ব্যক্তি কিনা, তদ্বিষয়ে মতান্তর আছে। কেহ বলেন,—জনকরাজ-সভার যাজ্ঞবল্ক্যই এই সংহিতার প্রবর্ত্তক; কেহ বলেন,—তাঁহার বংশধর অপর কোনও যাজ্ঞবল্ক্য

যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা।

কর্ত্তৃক ইহা প্রণীত হইয়াছিল। কিন্তু এই সংহিতার প্রারম্ভে যে দুইটী শ্লোক আছে, তাহাতে এই সংহিতাকার 'মিথিলাস্থ' এবং 'যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য' বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। সুতরাং জনক-রাজসভার যাজ্ঞবল্ক্য-ঋষিই এই সংহিতার প্রবর্ত্তক বলিয়া মনে হইতে পারে। বিশেষতঃ, এই সংহিতায় রাজধর্ম্ম, ব্যবহার-বিধি, দায়ভাগ, মিতাক্ষরা প্রভৃতি বিষয়ে যে সকল সার-তত্ত্ব প্রকটিত আছে, তাহাতে এই গ্রন্থের বীজাঙ্কুর কোনও শ্রেষ্ঠ নৃপতির শাসন-সময়ে বিনির্গত হইয়াছিল—তাহাই মনে হওয়া সম্ভবপর। এই সংহিতা তিনটী অধ্যায়ে দ্বাদশাধিক সহস্র শ্লোকে সম্পূর্ণ। ইহার প্রথম অধ্যায়ে,—গর্ভাধান, বিবাহ, যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ ও বর্ণসঙ্কর উৎপত্তির কথা আছে; ভক্ষ্যাভক্ষ্য প্রকরণ অর্থাৎ কোন্‌রূপ খাদ্য বা কোন্‌রূপ পাত্রে ভোজন করা কর্ত্তব্য, শুদ্ধি-প্রকরণ ও নানাবিধ পূজা-পদ্ধতির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে,—ব্যবহার-শাস্ত্রের বিষয়, অর্থাৎ ঋণদান, ঋণ-গ্রহণ, প্রতিভূ-প্রকরণ, সাক্ষি-প্রকরণ, লেখ্য-প্রকরণ, দিব্য-প্রকরণ, দায়ভাগ-প্রকরণ, দণ্ড-পারুষ্য-প্রকরণ, সাহস-প্রকরণ, সম্ভূয়-সমুত্থান-প্রকরণ, স্ত্রী-সংগ্রহ-প্রকরণ প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ আছে। তৃতীয় অধ্যায়ে,—অশৌচ-প্রকরণ, আপদ্ধর্ম্ম প্রকরণ, যতি-প্রকরণ, অধ্যাত্ম-প্রকরণ, প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণ প্রভৃতি পরিবর্ণিত। এই যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতার অন্তর্গত দায়ভাগ-প্রকরণ আজি পর্য্যন্ত আইন মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। এই দায়ভাগের বচন-পরম্পরা উদ্ধার করিয়া বিজ্ঞানেশ্বর ভট্টারক 'মিতাক্ষরা' এবং জীমূতবাহন 'দায়ভাগ' গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। আজিও ভারতবর্ষে পিতৃ-পিতামহ-আত্মীয়-স্বজন-পরিত্যক্ত বিষয়-সম্পত্তি সেই মিতাক্ষরা ও দায়ভাগ অনুসারেই উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে বিভাগ হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে দায়ভাগ এবং বঙ্গদেশ ভিন্ন ভারতের অন্যত্র মিতাক্ষরা প্রচলিত। পিতা জীবন-কালে পুত্রদিগকে কিরূপভাবে সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিতে পারেন, পিতার ইচ্ছায় পিতামহ-সম্পত্তি কেন অসম-ভাগে বিভাগ হইতে পারে না, এবং পিতা শাস্ত্রবিরুদ্ধ বিভাগ করিলে কিরূপে তাহা রহিত হইতে পারে, মাতৃ-ধন কিরূপে বিভাগ হইয়া থাকে, কোন সম্পত্তিতে কাহার কিরূপ অধিকার বর্ত্তিতে পারে;—এই সকল বিষয় এই সংহিতার দায়ভাগ-প্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে। মনুসংহিতায় উচ্চবর্ণ নিম্ন-বর্ণের কন্যা বিবাহ করিবার বিধি ছিল;—যদিও সে বিধি ইতর-বিধি বলিয়া উক্ত হইয়াছিল;—কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য তাহাও নিষেধ করিয়া যান। *

ষষ্ঠ—উশনঃ-সংহিতা। ভৃগু-বংশীয় ঔশনঃ, ঋষি-মণ্ডলীর নিকট ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের হেতুভূত যে শাস্ত্রতত্ত্ব বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র উশনঃ, সৌনকাদি মুনিগণের নিকট তাহাই কীর্ত্তন করেন। এই সংহিতায় তাহাই পরিবর্ণিত। উশনঃ—

উশনঃ-সংহিতা।

সুরগুরু শুক্রাচার্য্যের অপর নাম বলিয়া কথিত হয়। তিনি কবি এবং গাথাকার বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। এই সংহিতা নয়টি অধ্যায়ে এবং ছয় শত কুড়িটী শ্লোকে সম্পূর্ণ। এই সংহিতায় অশৌচ-বিধি, শ্রাদ্ধ-পদ্ধতি, ভক্ষ্যাভক্ষ্য-বিচার, এবং নানাবিধ প্রায়শ্চিত্তের কথা আছে। সমুদ্র-যাত্রাকারী পিতৃশ্রাদ্ধে অধিকারী নহে,—এই সংহিতায় উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ত্রি-মূর্ত্তির এবং ওঙ্কারের গুণ-

* যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা, প্রথম অধ্যায়ের ৫৬শ শ্লোক। মনু-সংহিতা, তৃতীয় অধ্যায়ের ৪১শ শ্লোক।

মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন,—এই সংহিতায় দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মঘাতী, সুরাপায়ী, চোর প্রভৃতি পঞ্চবিধ মহাপাতকীর উল্লেখে, তাহাদের সঙ্গে বসবাসেও পাপ হইয়া থাকে,—মহর্ষি উশনঃ তাহাই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। সতীদাহ এবং পাপীর আত্ম-নাশের প্রসঙ্গ, ইহাতে পরিবর্ণিত রহিয়াছে। এই সংহিতায় লিখিত আছে,—দশ সহস্র গায়ত্রী জপ করিলে, ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইতে পারেন;—'অযুতে নৈব গায়ত্র্যামুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ।'

সপ্তম—অঙ্গিরঃ-সংহিতা। এই সংহিতা দ্বিসপ্ততি-সংখ্যক শ্লোকে সম্পূর্ণ। ইহাতে প্রায়শ্চিত্ত ও স্ত্রী-ধর্ম্মের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। অঙ্গিরস (অঙ্গিরাঃ, অঙ্গিরসৌ, অঙ্গিরসঃ) ব্রহ্মার দ্বিতীয় পুত্র নামে অভিহিত হন। মহাভারতের বনপর্ব্বে

অঙ্গিরঃ-সংহিতা।

অঙ্গিরঃ ঋষির তপস্যার প্রসঙ্গ আছে। তপোবলে তিনি অগ্নি-সদৃশ তেজস্বী হইয়াছিলেন। এই সংহিতায় নীলবর্ণ বস্ত্র-ব্যবহারের এবং নীলি-বপনের অশুচিত্বের বিষয় লিখিত হইয়াছে। সেই জন্য কেহ কেহ মনে করেন,—এই সংহিতা আধুনিক কালে বিরচিত হইয়াছিল। এই সংহিতাকার বলেন,—"যে কন্যা অন্যের উদ্দেশে বাগ্‌দত্তা হইয়াছে, অপরের সহিত তাহার বিবাহ হইলে সে কন্যা 'পুনর্ভূ' বলিয়া কীর্ত্তিত হয়; তাহার হস্তের অন্ন পর্য্যন্ত ভোজন করিতে নাই।"

অষ্টম—যম-সংহিতা। এই সংহিতা মাত্র অষ্ট-সপ্ততি শ্লোকে সম্পূর্ণ। বিধি-নিষেধ ও প্রায়শ্চিত্তের কথাই এই সংহিতায় আলোচিত হইয়াছে। এই সংহিতায়, রজক, চর্ম্মকার, নট, বরুড়, কৈবর্ত্ত, মেদ এবং ভিল্ল—এই সপ্ত জাতিকে অন্ত্যজ-জাতি

যম-সংহিতা।

বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সংহিতায়, সন্ধ্যাকালে আহার, সন্ধ্যাকালে নিদ্রা, সন্ধ্যাকালে বেদপাঠ, প্রভৃতি পরিবর্জ্জন করিবার আদেশ বিহিত আছে। যম—এই সংহিতার প্রবর্ত্তক। কিন্তু তিনি যম-নামক ঋষি, অথবা ধর্ম্মরাজ যম, সে সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। পাশ্চাত্য-মতাবলম্বিগণ এই সংহিতাকে আধুনিক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

নবম—আপস্তম্ব-সংহিতা। দূষিত বর্ণ-সমূহের হিতের জন্য তাহাদের প্রায়শ্চিত্ত-নির্ণায়ক এই সংহিতা—আপস্তম্ব ঋষি-কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছিল। এই সংহিতা দশটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধ্যায়ে এবং একশত তিরাশীটি শ্লোকে সম্পূর্ণ। মহর্ষি আপস্তম্বের নাম যজু-

আপস্তম্ব-সংহিতা।

র্ব্বেদে আছে, কল্প-সূত্রে আছে, সংহিতায় আছে। সুতরাং যিনি এই সংহিতা-শাস্ত্রের প্রবর্ত্তনা করেন, তিনি যে কোন্ আপস্তম্ব, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। আপস্তম্ব-সংহিতা প্রধানতঃ প্রায়শ্চিত্ত-বিধির আলোচনায় বিনিযুক্ত। এই সংহিতার মতে,—ক্ষমা গুণই মনুষ্যের ইহ-পরকালের সুখদাতা, ক্ষমাগুণ থাকিলে কোনও ক্লেশ হয় না; বলবান কিংবা শাস্ত্রানুসরণকারী ব্যক্তিরই যে মুক্তি হইবে, এরূপ নহে; সুরম্য গৃহ, উত্তম ভোজন, উত্তম বস্ত্র প্রভৃতির অধিকারী হইলেই যে মুক্তির অধিকারী হইবে, তাহা নহে; ক্ষমা-গুণ থাকিলেই মানুষের মোক্ষ প্রাপ্তি হয়।

"মোক্ষো ভবেৎ প্রত্যহনিবর্ত্তকস্য অধ্যাত্ম-যোগৈকরতস্য সম্যক্।
মোক্ষো ভবেন্নিত্যমহিংসকস্য স্বাধ্যায়যোগাগতমানসস্য॥"

সংবর্ত্ত-সংহিতা।

দশম—সংবর্ত্ত-সংহিতা। সংবর্ত্ত মুনি এই সংহিতার বিষয় ঋষিগণের নিকট বর্ণনা করেন। দুই শত সাতাইশটী শ্লোকে এই সংহিতা সম্পূর্ণ ইহাতে চতুর্ব্বর্ণের ধর্ম্ম-কর্ম্মের বিষয়, খাদ্যাখাদ্য-বিচার এবং প্রায়শ্চিত্ত-বিধান বর্ণিত আছে। এই সংহিতার মতে,—জলদান ও অন্নদান বিশেষ পুণ্য কর্ম্ম। সংহিতাকার বলেন,—"যে ব্যক্তি জলদান করে, সকল বস্তুতে তৃষ্ণাশূন্য হইয়া সে অতুল তৃপ্তি প্রাপ্ত হয়। আর, যে ব্যক্তি অন্নদান করে, সকল বস্তুর ভোগজাত তৃপ্তি তাহার অধিগত হয়। নিয়মিতরূপে একমাস কাল প্রত্যহ গায়ত্রী-মন্ত্র জপ করিলে, সর্পের খোলস-পরিত্যাগের ন্যায় ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন।"

"অহন্যহনি যোহধীতে গায়ত্রীং বৈ দ্বিজোত্তমঃ। মাসেন মুচ্যতে পাপাদুরগঃ কঞ্চুকাদ্‌যথা।"

কাত্যায়ন-সংহিতা।

একাদশ—কাত্যায়ন-সংহিতা। এই সংহিতা ঊনত্রিংশ অধ্যায়ে পাঁচশতাধিক শ্লোকে গ্রথিত। ইহার মধ্যে কয়েকটী স্থান গদ্যে লিখিত আছে; দ্বাদশ ও চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের কিয়দংশ গদ্যে লিখিত। গৃহসূত্রকার গোভিল যে সমস্ত কর্ম্মের বিষয় ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহারই অস্পষ্টাংশ এই কাত্যায়ন-সংহিতায় বর্ণিত আছে। শ্রাদ্ধ ও সদাচার-বিষয়ক উপদেশে ইহার কয়েকটী অধ্যায় নিয়োজিত হইয়াছে। এই সংহিতায়, গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা, সাবিত্রী, বিজয়া, জয়া, দেবসেনা, স্বধা, স্বাহা, ধৃতি, পুষ্টি, তুষ্টি ও আত্ম-দেবতা—এই চতুর্দ্দশ মাতৃগণের এবং গণেশের পূজার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। সকল কর্ম্মের প্রথমে গণপতি ও মাতৃগণের পূজা করার বিধি, এই সংহিতায় দৃষ্ট হয়। চিত্র, প্রতিমা বা পটে পূজার কথা এই সংহিতায় উল্লিখিত আছে। তর্পণ, শ্রাদ্ধ, পিণ্ড ও অশৌচাদির বিষয় এই সংহিতায় উক্ত হইয়াছে। জ্যেষ্ঠ বর্ত্তমানে কনিষ্ঠ কিরূপ অবস্থায় বিবাহ করিতে পারে, মহর্ষি কাত্যায়ন এই সংহিতায় বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। এই সংহিতায় উমা এবং রাম-সীতার প্রসঙ্গ আছে। কাত্যায়ন নামে বহু ঋষির পরিচয় পাওয়া যায়। সংহিতাকার কাত্যায়ন—গোভিলের পুত্র বলিয়া কথিত হন। *

বৃহস্পতি-সংহিতা।

দ্বাদশ—বৃহস্পতি-সংহিতা। এই সংহিতা মাত্র অশীতি সংখ্যক শ্লোকে নিবদ্ধ। দেবরাজ ইন্দ্র, এক শত যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া, বাগ্মিশ্রেষ্ঠ বৃহস্পতিকে জিজ্ঞাসা করেন,—"হে ভগবন্! কোন্ কোন্ বস্তু দান করিলে সর্ব্বদা সুখবৃদ্ধি হয়, তাহা আমাকে বলুন।" তদনুসারে বৃহস্পতি যে দান-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন, এই সংহিতায় তাহাই লিপিবদ্ধ আছে। এ হিসাবে সুরগুরু বৃহস্পতিই এই সংহিতার প্রবর্ত্তক। † কিন্তু এক্ষণে যে ভাবে এই সংহিতা প্রচারিত, তাহাতে পরবর্ত্তি-কালে ইহা লিপিবদ্ধ হইয়াছিল বলিয়াই অনেকে বিশ্বাস করেন। এই সংহিতার সার মর্ম্ম—দান-ধর্ম্ম। দীর্ঘিকা, কূপ, পুষ্করিণী, উদ্যান প্রভৃতি নির্ম্মাণের পুণ্য-ফল, এই সংহিতায় বিশদ-ভাবে বর্ণিত আছে। এই সংহিতার মতে—যে ব্যক্তি

* এই গ্রন্থের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ৭৭ পৃষ্ঠায় কাত্যায়ন-নামক ঋষিগণের পরিচয় দ্রষ্টব্য।

† এই গ্রন্থের ১৪শ পরিচ্ছেদে ১৩২ পৃষ্ঠায় বৃহস্পতির প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

পুষ্করিণী খনন করে, কিংবা পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করে, সে ব্যক্তি সকল কুল উদ্ধার করিয়া স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়।* ব্রাহ্মণকে দান-সম্বন্ধে মাহাত্ম্য-কথা এই সংহিতায় উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্ম-মন্ত্রাতে কুলক্ষয় হয়,—সংহিতাকার তাহা স্পষ্টতঃ বলিয়া গিয়াছেন।

ত্রয়োদশ—পরাশর-সংহিতা। মহর্ষি বেদব্যাসের নিকট ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করেন,—"কলিযুগে কোন্ ধর্ম্ম, কিরূপ শৌচাচার, মনুষ্যের মঙ্গলজনক, আপনি তাহার বর্ণন করুন।"

পরাশর-সংহিতা।

ব্যাসদেব তাহার উত্তর দেন,—"আমি সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ নহি। চলুন, আমার পিতার নিকট গমন করিয়া এতদ্বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ করি।" তদনুসারে ব্যাস-প্রমুখ ঋষিগণ বদরিকাশ্রমে গমন করিয়া, পরাশরের নিকট যে শাস্ত্রতত্ত্ব অবগত হন, তদনুসরণে এই পরাশর-সংহিতা বিরচিত হয়। এই সংহিতার প্রথমেই প্রশ্নচ্ছলে ব্যাসদেব পিতাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—"আপনার নিকট বশিষ্ঠ, মনু, কশ্যপ, গর্গ, গৌতম, উশনঃ, অত্রি, বিষ্ণু, সংবর্ত্ত, দক্ষ, অঙ্গিরা, শাতাতপ, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, কাত্যায়ন, প্রচেতস, আপস্তম্ব, শঙ্খ প্রভৃতি ঋষিগণ প্রণীত ধর্ম্ম-শাস্ত্র শ্রবণ করিয়াছি; কিন্তু তত্তৎশাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মসমূহ, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগের জন্যই নির্দ্দিষ্ট। এক্ষণে চারি বর্ণের কলিযুগ-ধর্ম্ম এবং কিছু কিছু সাধারণ-ধর্ম্ম অবগত করুন।" উত্তরে পরাশর বলেন,—"সত্য যুগের ধর্ম্ম—তপস্যা, ত্রেতার ধর্ম্ম—জ্ঞান, দ্বাপরে—যজ্ঞ, কলি যুগের একমাত্র ধর্ম্ম—দান। সত্যযুগে—মনু-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম, ত্রেতাযুগে—গৌতম-ব্যবস্থাপিত ধর্ম্ম, দ্বাপরযুগে—শঙ্খলিখিত ধর্ম্ম, কলিযুগে পরাশর-নিরূপিত ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট।" এই বলিয়া মহর্ষি পরাশর একে একে কলি-ধর্ম্ম বর্ণনা করেন। তাঁহার এই পরাশর-সংহিতা দ্বাদশ অধ্যায়ে এবং পঞ্চাশত নিরানব্বই শ্লোকে সম্পূর্ণ। প্রথম অধ্যায়ে মহর্ষি বলিয়াছেন,—আচারই চতুর্ব্বর্ণের ধর্ম্মপালক; আচারভ্রষ্ট ব্যক্তির প্রতি ধর্ম্ম পরাঙ্মুখ;—

"চতুর্ণামপি বর্ণানামাচারো ধর্ম্মপালকঃ। আচারভ্রষ্টদেহানাং ভবেদ্ধর্ম্মপরাঙ্মুখঃ।"

এই অধ্যায়ে প্রতি বর্ণের কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে চারি আশ্রম, চারি বর্ণ এবং গৃহস্থের অনায়াস-সাধ্য সাধারণ ধর্ম্মাচারের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে দেখা যায়,—ষট্‌কর্ম্মনিরত ব্রাহ্মণ কৃষিকর্ম্ম করিতে পারেন; ক্ষত্রিয়ও কৃষিকর্ম্মের দ্বারা জীবিকা-অর্জ্জনে এবং ব্রাহ্মণ-সেবায় অধিকারী। বৈশ্য ও শূদ্রগণ কৃষি-বাণিজ্য-শিল্পাদি দ্বারা জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে। পরন্তু দ্বিজ-সেবায় বিবর্জ্জিত হইলে, শূদ্রগণ অল্পায়ু নিরয়গামী হয়। তৃতীয় হইতে ষষ্ঠ পর্য্যন্ত অধ্যায়-চতুষ্টয়ে জন্মমরণাশৌচের কথা পরিবর্ণিত হইয়াছে। এতন্মধ্যস্থিত চতুর্থ অধ্যায়ের ষড়্‌বিংশ শ্লোকে 'বিধবা-বিবাহের ব্যবস্থা আছে'—এই বিশ্বাসে, তদ্বিষয়ে বিষম বাদানুবাদ চলিয়া থাকে। সেই শ্লোকটী এই;—

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ। পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে।"

বিধবা-বিবাহের পক্ষগণ ইহার অর্থ এইরূপ নির্দেশ করেন,—"স্বামী নিরুদ্দেশ হইলে, মরিলে, সংসার-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে, ক্লীব স্থির হইলে, অথবা পতিত হইলে, স্ত্রী-দিগের পুনর্ব্বার বিবাহ শাস্ত্র-বিহিত।" কিন্তু বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধবাদিগণ এই শ্লোকের অর্থ

* "[illegible]কং নবং কুর্য্যাৎ পুরাণং বাপি খানয়েৎ। স সর্ব্বং কুলমুদ্ধৃত্য স্বর্গে লোকে মহীয়তে।"

করেন,—"যে পাত্রের সহিত বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির হইয়া আছে,—সেই ভাবী পতি যদি নিরুদ্দেশ হয়, মরিয়া যায়, প্রব্রজ্যা অবলম্বন করে, ক্লীব বলিয়া স্থির হয় বা পতিত হয়, তবে এই পঞ্চপ্রকার আপদে ঐ কন্যার পাত্রান্তরে প্রদান বিহিত।" এক পক্ষ বলেন,—শ্লোকটী বিবাহিত কন্যার সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে; অন্য পক্ষ বলেন,—শ্লোকটী বাগ্‌দত্তা কন্যার সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে। যাহাই হউক, মহর্ষি পরাশর বিধবার ব্রহ্মচর্য্যের প্রাধান্যই যে কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, পরবর্ত্তী শ্লোকত্রয়ে তাহা স্পষ্টতঃ উপলব্ধি হয়;—

"মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা। সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥
তিস্রঃ কোট্যর্দ্ধ কোটী চ যানি রোমাণি মানবে। তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গং ভর্ত্তারং প্রানুগচ্ছতি॥
ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বিলাদুদ্ধরতে বলাৎ। এবমুদ্ধৃত্য ভর্ত্তারং তেনৈব সহমোদতে॥"

অর্থাৎ, 'স্বামীর মরণান্তে যে নারী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন, তিনি মৃত্যুর পর ব্রহ্মচারীর ন্যায় স্বর্গলাভ করেন। আর স্বামীর মরণে যিনি সহমৃতা হন, তিনি সার্দ্ধ ত্রিকোটী কাল স্বর্গভোগ করেন। ব্যালগ্রাহী যেমন গর্ত্ত হইতে সর্পকে বল-পূর্ব্বক বাহির করিয়া আনে, সহমৃতা নারী তেমনি মৃত পতিকে উদ্ধার করিয়া আনন্দ উপভোগ করে।' ফলে, পতির মৃত্যুর পর, স্ত্রীলোকের পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য অথবা সহমরণের ব্যবস্থাই প্রকৃষ্ট বলিয়া বুঝা যাইতেছে। সহমরণ এখন বিধি-নিষিদ্ধ; সুতরাং বর্ত্তমান কালে বিধবার পক্ষে ব্রহ্মচর্য্যই শ্রেয়ঃ;—ইহাই এখন হিন্দুসমাজের অভিমত। পরাশর-সংহিতার সপ্তম অধ্যায়ে দ্রব্যশুদ্ধির বিষয়, অষ্টম হইতে দশম অধ্যায়ত্রয়ে নানাবিধ প্রায়শ্চিত্ত-সংস্কারের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হইয়াছে। পরাশর এই সংহিতার নানা স্থানে মনুসংহিতার মতই প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তীর্থযাত্রা ও তীর্থস্থান-দর্শন প্রসঙ্গে এই সংহিতায় সেতুবন্ধ-দর্শনের পুণ্য-কথা লিখিত আছে। পাপাচারীর সহিত একত্র বসবাসে, শরীরে যে কিরূপ-ভাবে পাপ সংক্রমিত হয়,—পরাশর একটী সুন্দর উপমায় তাহা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন;—

"আসনাদয়নাদ্‌যানাৎ সম্ভাষাৎ সহভোজনাৎ। সংক্রামন্তি হি পাপানি তৈলবিন্দুরিবাম্ভসি॥"

অর্থাৎ,—জলের উপর তৈলবিন্দু পতিত হইলে তাহা যেমন সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে, পাপীর সহিত বসিলে, শয়ন করিলে, গমন করিলে, আলাপ করিলে, ভোজন করিলে শরীরে সেইরূপ পাপ-সঞ্চার হইয়া থাকে।

চতুর্দ্দশ—ব্যাস-সংহিতা। মহর্ষি বেদব্যাস এই সংহিতার প্রবর্ত্তক। চারিটি ক্ষুদ্র অধ্যায়ে দুই শত একচল্লিশটী শ্লোকে সম্পূর্ণ। বারাণসী ধামে অবস্থানকালে, মহর্ষি বেদব্যাস মুনিগণের নিকট চারি বর্ণের কর্ত্তব্য-বিষয়ে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, ইহাতে তাহাই উল্লিখিত আছে। ম্লেচ্ছ-শব্দের ব্যবহার আছে দেখিয়া, এই সংহিতা মুসলমান-শাসন-সময়ে রচিত হইয়াছে বলিয়া অনেকের ভ্রম ধারণা। এই সংহিতায় মানবের নিত্য কর্ত্তব্য-কর্ম্মের ও সংস্কার-বিধির আলোচনা আছে, দানধর্ম্মের ও দানের ফলাফলের বিষয় পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। এই সংহিতার মতে,—বিধবা নারীদিগের ব্রহ্মচর্য্য অথবা সহমরণ শ্রেয়ঃ। এই সংহিতার কোনও কোনও অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।

ব্যাস-সংহিতা।

পঞ্চদশ—শঙ্খ-সংহিতা। এই সংহিতা শঙ্খ ঋষি প্রণয়ন করেন। ক্ষুদ্র বৃহৎ অঠারটি অধ্যায়ে তিন শত চৌদ্দটি শ্লোকে ইহা সম্পূর্ণ। এই সংহিতার একাদশ এবং দ্বাদশ অধ্যায়ের কিয়দংশ গদ্যে বিরচিত। তাহাতে এবং এই সংহিতার বর্ণিত বিষয়-পরম্পরা দৃষ্টে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহাকে একখানি প্রাচীন সংহিতা বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের মতে,—সূত্র-সাহিত্যের আভাস এই সংহিতায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহর্ষি শঙ্খ বলেন,—যজন, যাজন, দান, অধ্যাপনা, প্রতিগ্রহ এবং অধ্যয়ন,—বিপ্রগণ এই ছয়টী মাত্র কার্য্যের অধিকারী; দান, অধ্যয়ন ও যজন,—এই তিনটি কার্য্যে ক্ষত্রিয়ের ও বৈশ্যের অধিকার; এতদতিরিক্ত, ক্ষত্রিয় প্রজাপালনে এবং বৈশ্য কৃষি-বাণিজ্যে অধিকারী; শূদ্র দ্বিজ-সেবায় এবং শিল্প-কার্য্যে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবে। ক্ষমা, সত্য-বাক্য, ইন্দ্রিয়-দমন ও শৌচ,—এই চারিটী কার্য্যে সকল বর্ণেরই সমান অধিকার এবং সকলেরই উহা কর্ত্তব্য-কর্ম্ম মধ্যে গণ্য। এই সংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রাহ্মণের উপাধি 'শর্ম্মা,' ক্ষত্রিয়ের উপাধি 'বর্ম্মা,' বৈশ্যের উপাধি 'ধন' এবং শূদ্রের উপাধি 'দাস' নির্দ্দিষ্ট আছে। দ্বি-জাতি কি প্রকারে ব্রাত্যত্ব প্রাপ্ত হন, এই সংহিতায় তাহার আভাস পাওয়া যায়। উচ্চবর্ণ শূদ্রের কন্যা বিবাহ করিলে পাতকগ্রস্ত হইবে, ম্লেচ্ছদেশে শ্রাদ্ধ করিলে বা ম্লেচ্ছদেশে গমন করিলে পতিত হইতে হইবে,—এই সংহিতায় উক্ত হইয়াছে। চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে গয়া, প্রভাস, পুষ্কর, প্রয়াগ, নৈমিষারণ্য, গঙ্গা, যমুনা, অমরকণ্টক, নর্ম্মদা বারাণসী, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি তীর্থের মাহাত্ম্য পরিবর্ণিত। এতদ্ব্যতীত, এই সংহিতায় অশৌচ, প্রায়শ্চিত্ত, ভক্ষ্যাভক্ষ্য-বিচার প্রভৃতি নানা প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়।

শঙ্খ-সংহিতা।

ষোড়শ ও সপ্তদশ—লিখিত ও দক্ষ-সংহিতা। লিখিত-সংহিতা বিরানব্বইটি শ্লোকে এবং দক্ষ-সংহিতা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাতটি অধ্যায়ে দুই শত এগারটি শ্লোকে সম্পূর্ণ। লিখিত-সংহিতা—লিখিত-ঋষি-প্রণীত, এবং দক্ষ-সংহিতা—প্রজাপতি দক্ষ কর্ত্তৃক পরিবর্ণিত হয়। লিখিত-সংহিতার মতে,—পুষ্করিণ্যাদি খনন এবং ব্রাহ্মণের পক্ষে অগ্নিহোত্র যজ্ঞ পুণ্যজনক কর্ম্ম। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য যে কেহ জলদান করিবে, তাহারই মুক্তিলাভ হইবে,—এই সংহিতা পুনঃপুনঃ তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। ৺কাশীধামে বাস, গয়াধামে পিণ্ডদান—সংহিতাকারের মতে শ্রেয়ঃ-কার্য্য। লিখিত-ঋষি বলেন,—যে যে কার্য্যে আপনাকে অমঙ্গল-যুক্ত বিবেচনা করিবেন, একশত আট বার গায়ত্রী জপ করিলে, ব্রাহ্মণের তাহাতে মঙ্গল হইবে। দক্ষ-সংহিতায় গৃহস্থের নিত্য-কর্ম্ম অতি সুন্দর-রূপে পরিবর্ণিত আছে। শৌচাশৌচ ও যোগ-প্রসঙ্গ এই সংহিতায় দেখিতে পাওয়া যায়। প্রজাপতি দক্ষের মতে ধর্ম্মই সকল সুখের আকর; যাঁহার যে ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে, তিনি সেই ধর্ম্ম পালন করিলেই মুক্তি-লাভের অধিকারী হন। স্ত্রীলোকের সহমরণ-সম্বন্ধে পরাশর-সংহিতার শ্লোকটী ('ব্যালগ্রাহী' ইত্যাদি) এই সংহিতায় অবিকল দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ এক এক সংহিতার অনেক শ্লোকের সহিত অন্যান্য সংহিতার অনেক শ্লোকের অভিন্নতা দৃষ্ট হয়।

লিখিত-সংহিতা ও দক্ষ-সংহিতা।

অষ্টাদশ—গৌতম-সংহিতা। এই সংহিতা উনত্রিশটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধ্যায়ে বিভক্ত, এবং গদ্যে লিখিত। গৌতম ঋষির সূত্র অবলম্বন করিয়া এই সংহিতা বিরচিত; ইহার স্থানে স্থানে সূত্রের ভাষা পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সংহিতায় উপনয়ন, বেদাধ্যায়ন, গৃহধর্ম্ম ও সন্তানোৎপাদন প্রভৃতির উপদেশ নিবদ্ধ আছে; রাজার কার্য্য, বিচার-পদ্ধতি, শৌচাশৌচ, শ্রাদ্ধ, প্রায়শ্চিত্ত, পৈত্রিক ধন-বণ্টন প্রভৃতির প্রসঙ্গও ইহাতে পরিবর্ণিত। বিশেষ বিশেষ বিষয়ের মীমাংসায় মত-দ্বৈধ ঘটিলে, এই সংহিতার মতে, পরিষদের দ্বারা তাহার মীমাংসা করাইয়া লইতে হইবে। চারিজন বেদজ্ঞ, ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্য ও বাণপ্রস্থ—এই তিন আশ্রমের তিন জন সচ্চরিত্র ব্যক্তি, এবং ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মমতাবলম্বী তিন জন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি লইয়া, এইরূপ পরিষৎ গঠিত হওয়া আবশ্যক। পরিষদের অভাবে বেদজ্ঞ শিষ্ট ব্রাহ্মণে মীমাংসা করিয়া দিবেন। এই সংহিতার মতে,—জ্ঞান অভিনিবেশ দ্বারাই ধর্ম্ম হয়, স্ব স্ব ধর্ম্ম পালন করিলেই ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ স্বর্গলাভ করেন।

গৌতম-সংহিতা।

ঊনবিংশ—শাতাতপ-সংহিতা। শিষ্য শরভঙ্গ ঋষির নিকট শাতাতপ ঋষি কর্ম্মফল-তত্ত্ব-বিষয়ে যে উপদেশ দেন, এই সংহিতায় তাহাই লিপিবদ্ধ হয়। এই সংহিতা ছয়টি অধ্যায়ে দুই শত একত্রিশটি শ্লোকে সম্পূর্ণ। এই সংহিতার মতে,—মানুষের যত কিছু ক্লেশভোগ, সমস্তই জন্মান্তরীণ পাপকর্ম্ম-বশতঃ ঘটিয়া থাকে; প্রায়শ্চিত্ত ভিন্ন সেই পাপ মুক্তির সম্ভাবনা নাই। সংহিতাকার তাই বিভিন্ন প্রকার পাপ-নাশের জন্য বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাহাদিগের পূজার উপদেশ দিয়াছেন। এই সংহিতার প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, ত্রিনেত্র বিষ্ণু, মহিষবাহন যম, বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ, অশ্বিনা, কুবের, ইন্দ্র, প্রচেতস্ এবং সরস্বতী-পূজার বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে সুবর্ণ-রজতাদির দ্বারা দেব-দেবীর মূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া, পূজা সমাপনান্তে সেই মূর্ত্তি-সমূহ ব্রাহ্মণকে দান করিবে,—এইরূপ উপদেশ আছে।

শাতাতপ-সংহিতা।

বিংশ—বশিষ্ঠ-সংহিতা। এই সংহিতা একবিংশ অধ্যায়ে বিভক্ত, এবং পদ্য ও গদ্য দ্বিবিধ ভাবে লিখিত। বশিষ্ঠ কর্তৃক এই সংহিতার প্রবর্ত্তনা হইয়াছিল বলিয়াই ইহার নাম বশিষ্ঠ-সংহিতা। এই সংহিতার মধ্যেও সূত্র-সাহিত্যের প্রভাব বিশেষরূপে বিদ্যমান্। এই সংহিতার মতে,—"ধর্ম্মই মুক্তির নিদান; বেদবিহিত-কার্য্যই ধর্ম্ম; বেদ-বিধি না জানিতে পারিলে শিষ্টাচারকেই ধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করিবে।" বশিষ্ঠ-সংহিতার অনেকাংশে মনুসংহিতারই অনুসরণ দৃষ্ট হয়; ইহাতে মনুসংহিতার অনেক শ্লোক দৃষ্টান্ত-স্বরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ এই সংহিতায় গৌতমাদি অন্যান্য সংহিতার মতোল্লেখও দেখিতে পাওয়া যায়। এই সংহিতায়, প্রায়শ্চিত্ত, ভক্ষ্যাভক্ষ্য-বিচার, ব্যবহার-বিধি, পুত্রাদির প্রসঙ্গ, রাজধর্ম্ম প্রভৃতি বিবিধ বিষয় আলোচিত হইয়াছে। আচার-রক্ষাই, এই সংহিতার মতে, প্রথম ধর্ম্ম। সংহিতাকার বলেন,—"আচারো পরমো ধর্ম্মঃ সর্ব্বেসামিতি নিশ্চয়ঃ।" এই সংহিতার

বশিষ্ঠ-সংহিতা।

মতে,—বাগ্‌দত্তা কন্যার বিবাহ অন্য পাত্রে হইতে পারে। এই সংহিতাকারই স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—"ন ম্লেচ্ছভাষাং শিক্ষেৎ।"

বিংশতি সংহিতার আলোচনায়, আমরা হিন্দু-সমাজের একটী প্রস্ফুট-চিত্র দেখিতে পাই। একটি জাতি কতদূর উন্নত হইলে, তাহার দৈনন্দিন কার্য্যাবলী ঐরূপভাবে লিপিবদ্ধ হইতে পারে, সে চিত্র তাহারই প্রকৃষ্ট পরিচয়। সমাজের সুশৃঙ্খলা রক্ষা করিতে হইলে, মনুষ্যের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুখ সাধন করিতে হইলে, সমাজ-মধ্যে কিরূপ আচার-ব্যবহার ও বিধি-ব্যবস্থার প্রচলন আবশ্যক,—সংহিতা-সমূহে আমরা তাহার পরিচয় পাই। যাদৃশ কর্ম্মানুষ্ঠান-পরম্পরায় সমাজ উন্নতি লাভ করিতে পারে, এবং যাদৃশ কর্ম্ম পরিবর্জ্জন করা মনুষ্যের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন,—তাহারই বিধি-নিষেধ, সংহিতা-সমূহে বিশদরূপে পরিবর্ণিত আছে। প্রাতে শয্যাত্যাগ করিয়া পরদিন শয্যাত্যাগ পর্য্যন্ত, কোন্ শ্রেণীর লোকের কিরূপ কার্য্য কর্ত্তব্য,—কিরূপভাবে মুখপ্রক্ষালন, স্নান-ভোজন, পূজা-ব্রত প্রভৃতি বিধেয়,—সংহিতা-সমূহে তাহার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের, স্ত্রী-পুরুষ সকলের, নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম-পদ্ধতি-বিধানই, সংহিতা-সমূহের উদ্দেশ্য। স্বধর্ম্ম-পালনে এবং সত্য ও সদাচার-রক্ষায়, সকল সংহিতাই সমভাবে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। যাঁহাদের বিশ্বাস, আপনাদিগের প্রাধান্য-রক্ষার জন্যই ব্রাহ্মণগণ সংহিতাদি শাস্ত্রগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, সংহিতা-সমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিলে, তাঁহাদের সে ভ্রম বিদূরিত হইতে পারে; পরন্তু, সংহিতা-সমূহে তাঁহারা সংহিতাকারগণের মহান্ সাম্যভাবের—ন্যায়-নিষ্ঠার পরিচয় পাইতে পারেন। সকল সংহিতাই ব্রাহ্মণকে সর্ব্ব-বর্ণের শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু সেই ব্রাহ্মণও যদি তপস্যা-বিহীন মূর্খ ও লোভী হন, তাঁহাকে নরকস্থ হইতে হইবে, সংহিতা-সমূহের ইহাই মত। ব্রাহ্মণকে অন্যান্য বর্ণ সম্মান করিবে, আরাধনা করিবে,—সংহিতায় এরূপ আদেশ আছে বটে; কিন্তু ব্রাহ্মণও অন্যান্য বর্ণকে স্নেহের চক্ষে দেখিবেন, কদাচ তাহাদের অনাদর করিবেন না, অভদ্র হইলেও ভদ্রবাক্য প্রয়োগ করিবেন,—ইহাও কথিত হইয়াছে। অগম্য-গমন, সুরাপান, অভক্ষ্য-ভক্ষণ,—সকল বর্ণের পক্ষেই পাপমূলক; অধিকন্তু, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের পক্ষে ঐরূপ পাপে গুরু-দণ্ডের ব্যবস্থা বিহিত আছে। সে ক্ষেত্রে উচ্চ-নীচ গুরু-লঘু ভেদ নাই; সকলের পক্ষেই সমান দণ্ড, বরং ব্রাহ্মণাদির পক্ষে বিশেষ দণ্ডের ব্যবস্থা। সুরাপানে কোন্ বর্ণের কি দণ্ড বিহিত আছে, মনুসংহিতার একাদশ অধ্যায়ের একনবতিতম শ্লোকে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়,—

"সুরাং পীত্বা দ্বিজো মোহাদগ্নিবর্ণাং সুরাং পিবেৎ। তয়া স্বকায়ে নির্দ্দগ্ধে মুচ্যতে কিল্বিষাত্ততঃ॥"

দ্বিজাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য, যদি মোহ-বশতঃ কখনও সুরাপান করে, পাপ-ক্ষয়ার্থ তাহাকে অগ্নিবর্ণ জ্বলন্ত সুরাপান করিয়া, দগ্ধীভূত হইতে হইবে; সেইরূপভাবে আত্ম-নাশ ভিন্ন তাহার পাপক্ষয় হয় না। প্রায়শ্চিত্ত, দায়ভাগ এবং দণ্ডবিধি-সমূহ আলোচনা করিলে, সকল বর্ণের পক্ষেই সমান বিধি দৃষ্ট হয়। চৌর্য্যাপরাধে অপরাধী দ্বি-জাতিকে দ্বাদশ-বর্ষ বনবাসী অথবা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে; সেখানেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,

সংহিতা-সমূহে সামাজিক চিত্র।

বৈশ্যের কোনই পার্থক্য নাই। পরদার-গমন-পাপযুক্ত ব্রাহ্মণের কি ভীষণ গুরুদণ্ডের ব্যবস্থাই বিহিত আছে! মন্বাদি-সংহিতা-সমূহে দৃষ্ট হয়,—উচ্চবর্ণ নীচ-বর্ণের কন্যা বিবাহ করিতে পারিতেন; কিন্তু তাহা হইলেও সেই অসবর্ণ-বিবাহের সন্তান কখনই শ্রেষ্ঠ-পদ-বাচ্য হয় নাই। মনু বলেন,—"স্ব-পরিণীতা ব্রাহ্মণীতে ব্রাহ্মণ কর্তৃক সমুৎপাদিত সন্তান ব্রাহ্মণ; ক্ষত্রিয় কর্তৃক স্ব-পরিণীতা ক্ষত্রিয়ার গর্ভ সমুৎপাদিত সন্তান ক্ষত্রিয়; বৈশ্য-কর্তৃক স্ব-পরিণীতা বৈশ্যার গর্ভে সমুৎপাদিত সন্তান বৈশ্য; আর, শূদ্র কর্তৃক স্ব-পরিণীতা শূদ্রার গর্ভে সমুৎপাদিত সন্তান শূদ্র। এতদ্ভিন্ন, অসবর্ণা পত্নীতে সমুৎপাদিত সন্তান বর্ণসঙ্কর হয়, অর্থাৎ পিতার সহিত তাহারা সবর্ণ হয় না। অম্বষ্ঠ, নিষাদ, পারশব, মাগধ, চণ্ডাল, উগ্র, দাশ, বেণ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতি এই সঙ্করবর্ণের মধ্যে গণ্য।" আচার-ভ্রষ্ট সবর্ণের মধ্যে বিবাহে যে জাতির উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহারা 'ব্রাত্য' নামে অভিহিত হইত। ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় উভয়ের মধ্যেই 'ব্রাত্য'-জাতির উল্লেখ,মনুসংহিতায় দেখিতে পাওয়া যায়। সংস্কারাভাবে এবং যজন-যাজনাদির অভাবে অনেক জাতি শূদ্রত্ব লাভ করিয়াছিল। মনুসংহিতার মতে,—"পৌণ্ড্রক, ওড্র, দ্রাবিড়, কম্বোজ, জবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ এবং খশ—এই কয়েক দেশোদ্ভব ক্ষত্রিয়েরা কর্ম্মদোষে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল।" * মনুর এই উক্তিতে বেশ বুঝিতে পারা যায়,—এক সময়ে চীন, পারস্য, কাম্বোডিয়া, আরব, তিব্বত প্রভৃতি দেশ ভারতবর্ষের অধীন ছিল, এবং সেই সকল দেশে ভারতীয় আর্য্য-হিন্দুগণের প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু সেই সকল দেশের লোক ক্রমশঃ আচার-হীন হইয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। কি প্রকারে প্রজাপালন এবং রাজ্যের সুরক্ষণ-বিধান হইতে পারে; মন্বাদি-সংহিতায় তাহার বিশিষ্ট নিয়মাবলী দেখিতে পাওয়া যায়। মনু বলেন,—"বিস্তৃতি-অনুসারে দুই, তিন, পাঁচ অথবা শত গ্রামের উপযুক্ত এক এক জন অধিনায়কের অধীনে এক এক দল সৈন্য রক্ষা করিয়া, এক একটী 'গুল্ম' গঠন করিবে। প্রত্যেক গ্রামে এক এক জন গ্রামাধিপতি, এবং সেইরূপ দশ গ্রামের, বিংশতি গ্রামের ও সহস্র গ্রামের এক একজন অধিপতি নির্দ্দিষ্ট হইবে। রাজা সকলের উপর বিরাজমান থাকিবেন। গ্রামাধিপতি স্ব-গ্রামে শান্তি-রক্ষায় সমর্থ না হইলে, তিনি তাঁহার উপরিস্থিত দশগ্রামাধিপতির নিকট সাহায্য গ্রহণ করিবেন। তিনিও যদি তৎপ্রতিকারে অসমর্থ হন, তাহা হইলে বিংশতিগ্রামাধিপতির নিকট তাহা জানাইবেন। তিনিও যদি অসমর্থ হন, তাহা হইলে বিংশতিগ্রামাধিপতি শতগ্রামাধিপতির নিকট, শতগ্রামাধিপতি সহস্র-গ্রামাধিপতির নিকট এবং সহস্রগ্রামাধিপতি রাজার নিকট সাহায্য গ্রহণ করিবেন। প্রত্যেক অধিপতি আপনাপন কার্য্যের গুরুত্ব-অনুসারে ভূমি-বৃত্তি ভোগ করিবার অধিকারী হইবেন। রাজ-ভৃত্যগণ অধিকাংশ স্থলেই পরস্বাপহারী ও প্রবঞ্চক হয়; অতএব রাজা তাহাদিগের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবেন; উচ্চবংশ-সম্ভূত তেজস্বী ব্যক্তিকে নগরের তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবেন। যে সকল রাজ-কর্ম্মচারী প্রজার প্রতি পীড়ন করিবে বা প্রজার অর্থ শোষণ করিবে, রাজা তাহাদের সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে নির্ব্বাসন-দণ্ডে

* মনুসংহিতা, দশম অধ্যায়, ৪৪শ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

দণ্ডিত করিবেন।" * জনসাধারণের অপরাধের জন্য, অপরাধের তারতম্যানুসারে নানাবিধ দণ্ডের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অপরাধ-বিশেষে অঙ্গচ্ছেদ এবং প্রাণদণ্ড পর্য্যন্তের ব্যবস্থা ছিল। শূদ্র যদি জঘন্য ভাষায় দ্বি-জাতিকে গালি দেয়, তাহার পক্ষে জিহ্বাচ্ছেদ; শূদ্র যদি কোনও অঙ্গের দ্বারা দ্বি-জাতিকে প্রহার করে, তাহার দণ্ড—সেই অঙ্গচ্ছেদ; চোর যে অঙ্গ দ্বারা পরধন হরণ করিবে, পুনর্ব্বার তেমন কার্য্য না করে, তজ্জন্য রাজা তাহার সেই অঙ্গ ছেদন করিয়া দিতেন। কেবল শূদ্র বলিয়া নহে;—এ বিষয়ে দ্বি-জাতির দণ্ড আরও গুরুতর। সে ক্ষেত্রে জ্ঞানের তারতম্যানুসারে দণ্ডের তারতম্য হইত। চুরি করা পাপ-কার্য্য বুঝিয়াও কোনও শূদ্র যদি চুরি করে, সাধারণ চোরের অপেক্ষা তাহার দণ্ড—আট গুণ অধিক; তদ্রূপ বৈশ্য-চোর ষোড়শ গুণ দণ্ডনীয়, ক্ষত্রিয়-চোরের বত্রিশ গুণ, ব্রাহ্মণ-চোরের চৌষট্টি গুণ, এবং গুণবান ব্রাহ্মণ চোরের এক শত আটাইশ গুণ দণ্ড হইত। পরস্ত্রী-গমন সম্বন্ধেও অঙ্গচ্ছেদ-রূপ গুরু-দণ্ডের বিধান আছে। এইরূপ নানা অপরাধের কঠিন-কঠোর দণ্ড সংহিতা-শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। রাজ-কর গ্রহণ-সম্বন্ধে মহর্ষি মনু নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন,—"যাহাতে প্রজাবর্গের অণুমাত্র কষ্ট না হয়, সেই ভাবে বিশেষ বিবেচনা-পূর্ব্বক আপন রাজ্যমধ্যে রাজা রাজ-কর নির্দ্ধারণ করিবেন;—

যথাল্পাল্পমদন্ত্যাদং বার্য্যোকোবৎসষট্‌পদাঃ।
তথাল্পাল্পো গ্রহীতব্যো রাষ্ট্রাদ্রাজ্ঞাব্দিকঃ করঃ॥

জলৌকার শোণিতপানের ন্যায়, বৎসের দুগ্ধপানের ন্যায় এবং ভ্রমরের মধুপানের ন্যায় অল্পে অল্পে প্রজার নিকট রাজার কর গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ধান্যাদি শস্যের ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশাংশ এবং অধিকাংশ পণ্য-দ্রব্যের ষষ্ঠাংশ রাজার প্রাপ্য।" দাসদাসীগণের বৃত্তি তখন এইরূপভাবে নির্দ্দিষ্ট হইত;—সাধারণতঃ তাহাদের দৈনিক বেতন—একপণ কড়ি, ছয় মাস অন্তর বস্ত্র এবং মাসিক এক দ্রোণ (প্রায় দুই মণ) ধান্য প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। যোগ্যতানুসারে বিশেষ বিশেষ ভৃত্যগণ ছয়গুণ পর্য্যন্ত বেতন প্রাপ্ত হইত। মনুর মতে,— বিবাদের মূল—অষ্টাদশবিধ। সেই অষ্টাদশ স্থানেই লোকে প্রধানতঃ বিবাদে প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং তদনুসারেই তিনি বিবাদ-নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। সেই অষ্টাদশ বিবাদ-স্থান-মধ্যে ঋণদান, সম্ভূয়-সমুত্থান, বেতন-দান, ক্রয়-বিক্রয়ানুশয়, সীমা-বিবাদ, স্ত্রী-সংগ্রহণ, দ্যূতক্রীড়া প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। বিচার-পদ্ধতি-বিষয়ে দেখিতে পাওয়া যায়,—রাজা বা মন্ত্রী সকল কার্য্য পরিদর্শন করিতেন; সময়ে সময়ে রাজার প্রতিনিধি-রূপে একজন বিদ্বান ব্রাহ্মণ, তিন জন সদস্যের সহিত ধর্ম্মাধিকরণে রাজ-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। দুই এক স্থলে বিষয়-বিশেষে সংহিতা-সমূহের মধ্যে মতান্তর দৃষ্ট হইলেও, সকল সংহিতারই মূল প্রতিপাদ্য,—আচার-রক্ষা, ধর্ম্ম-রক্ষা, সমাজ-শৃঙ্খলা-রক্ষা। সে পক্ষে, সকল সংহিতাই প্রধানতঃ প্রায় মনুসংহিতার মতানুসারী; সকলেই প্রায় এক পথের পথিক। তবে যে তাঁহাদের মধ্যে বিষয়-বিশেষে মতান্তর দৃষ্ট হয়, সে কেবল দেশ-কাল-পাত্রের সামঞ্জস্য-বিধানে প্রণালী-ভেদ মাত্র।

* মনুসংহিতা, সপ্তম অধ্যায়, ১১০শ হইতে ১২৪শ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

কোন্ সংহিতা কোন্ সময়ে সঙ্কলিত হইয়াছিল, তাহার নির্দ্দিষ্ট কাল-নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কেহ কেহ অনুমান করেন,—'সংহিতা-সমূহ একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের জনগণের জীবন-গতি নির্ণয় জন্য সঙ্কলিত হইয়াছিল। সে হিসাবে, সূত্র-সাহিত্যের যেমন এক যুগ আসিয়াছিল, স্মৃতি-সংহিতারও সেইরূপ এক যুগ উপস্থিত হইয়াছিল। তখন যে প্রদেশে যিনি প্রধান শাস্ত্র-বেত্তা ছিলেন, সেই প্রদেশের জন্য তিনি সেইভাবে স্মৃতি-সংহিতা-সমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন।' দ্বিতীয়-পক্ষ বলেন,—'সংহিতা-নিবদ্ধ ভাব-পরম্পরা বহু পূর্ব্ব হইতেই এদেশে প্রচলিত ছিল; কিন্তু উহা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে,—সে অতি অল্প দিন মাত্র। এমন কি, কোনও কোনও সংহিতা মুসলমান-শাসন-সময়ে বিরচিত হওয়াও সম্ভবপর।' তৃতীয় পক্ষের মত,—'কোনও কোনও সংহিতা বহু পূর্ব্ব কাল হইতে প্রচলিত থাকিলেও, উহার মধ্যের অনেক বিষয় পরবর্ত্তি-কালে সংযোজিত হইয়াছে।' চতুর্থ পক্ষ বলেন,—'স্মৃতি-সংহিতার মত-পরম্পরা অনাদিকাল হইতেই প্রচলিত। কেবল ভাষার পরিবর্ত্তনে, সময়ে সময়ে উহা রূপান্তরে অবস্থিতি করে মাত্র।' সংহিতা-সমূহের এই সময়-নির্ণয়-বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মস্তিষ্ক সমধিক আন্দোলিত। তাঁহাদের প্রায় সকলেই মনুসংহিতাকে আদি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন বটে; কিন্তু খৃষ্ট-জন্মের বার শত আশী বৎসরের পূর্ব্বে যে উহা বিরচিত হইয়াছিল,—কেহই তাহা স্বীকার করিতে সাহস করেন নাই। সেও কেবল—স্যার উইলিয়ম জোন্স্। এলফিন্‌ষ্টোন ও কাউয়েলের মতে,—নয় শত পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে মনুসংহিতা রচিত হয়। ঐতিহাসিক হাণ্টার বলেন,—পাঁচ শত পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে। অধ্যাপক উইলসনের মতে,—'খৃষ্ট-জন্মের আট শত বৎসর পূর্ব্বে মনু-সংহিতার কোনও কোনও অংশ বিদ্যমান ছিল; বৌদ্ধ-যুগের সম-সময়ে বা তাহার পরবর্ত্তি-কালে তাহাতে কোনও কোনও অংশ সংযোজিত হয়। পরিশেষে, খৃষ্ট-জন্মের দুই শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে উহা বর্ত্তমান আকার প্রাপ্ত হইয়াছে।' যাহা হউক, ইউরোপের নানা ভাষায় এখন মনুসংহিতার অনুবাদ হইয়াছে। সার উইলিয়ম জোন্স্, হাটন, ডি'ল্যাঙ, বুলার, ল্যাসেলিয়া প্রভৃতির অনুবাদ—অধুনা ইউরোপের অনেক স্থলেই প্রচলিত। মনুসংহিতা প্রধান ও আদি বলিয়া, তদালোচনারই বাহুল্য; অন্যান্য সংহিতা সে হিসাবে অত্যন্ত আধুনিক বলিয়া, পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের নিকট উপেক্ষিত। যাহা হউক, সূক্ষ্মভাবে সংহিতা-সমূহের যদি আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে উহার সঙ্কলন-কাল-নির্ণয়-সম্বন্ধে আমরাই বা কি অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারি? আমরা দেখিতে পাই,—মনুসংহিতার আভাস অন্যান্য সংহিতায় আছে। এমন কি, কোনও কোনও সংহিতাকার মনুসংহিতার নামোল্লেখেও আপন মত-প্রতিষ্ঠার ত্রুটি করেন নাই। অথচ মনুসংহিতায় অন্য কোনও সংহিতার নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতার প্রথম অধ্যায়ে, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোকে, পরাশর-সংহিতার প্রথম অধ্যায়ে, ত্রয়োদশ চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ শ্লোকে এবং অন্যান্য নানা স্থানে মনুর প্রসঙ্গ ও মনুর মত উত্থাপিত হইয়াছে। বিষ্ণু-সংহিতায় এবং বশিষ্ঠ-সংহিতায়, উদাহরণচ্ছলে মনুসংহিতার অনেক মত উদ্ধৃত হইয়াছে। মনুসংহিতায়

স্মৃতি-সংহিতার কাল-নির্ণয়।

যদিও অত্রি, গৌতম, শৌনক ও ভৃগুর মতের উল্লেখ আছে, কিন্তু সে মত যে অত্রি বা গৌতম সংহিতার পরবর্ত্তি-কালে মনুসংহিতার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, তাহা কোনক্রমেই বুঝা যায় না; যেহেতু, মনুসংহিতায় 'সংহিতা' বলিয়া অন্য কোনও স্মৃতির নামোল্লেখ দৃষ্ট হয় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—অত্রি প্রভৃতি ঋষিগণ অতি প্রাচীন-কালে বিদ্যমান ছিলেন; তাঁহাদের মত পরম্পরাও তখন প্রচারিত হইয়াছিল; কিন্তু তখন তাহা বর্ত্তমান স্মৃতির আকার গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না। তার পর, মনু-সংহিতার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আর এক কথা বলা যাইতে পারে;—ঐ সংহিতায় রামায়ণের বা মহাভারতের অর্থাৎ ত্রেতার বা কলির প্রারম্ভের কোনও পরিচয় নাই। পরন্তু, রামায়ণ ও মহাভারতে মনুসংহিতার বহু শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। যাঁহারা বৌদ্ধ-যুগে মনুসংহিতা সঙ্কলিত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করেন, তাঁহারাও ভ্রান্ত-বুদ্ধি-প্রণোদিত; যেহেতু, বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বা বৌদ্ধদিগের কোনই নাম-গন্ধ মনুসংহিতায় দৃষ্ট হয় না। মনুসংহিতায় 'মাগধ' শব্দের উল্লেখ আছে দেখিয়া, বৌদ্ধ-যুগে মগধ-রাজ্যের উন্নতির স্মৃতি স্মরণ করিয়া, মনুসংহিতা বৌদ্ধ-যুগের পরিবর্ত্তি-কালে সঙ্কলিত হইয়াছিল বিবেচনা করাও সমীচীন নহে। মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ের একাদশ ও সপ্তদশ শ্লোকে যে 'মাগধ' শব্দদ্বয় দৃষ্ট হয়, তাহার অর্থ,—বৈশ্য-কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়া-গর্ভ-সম্ভূত সন্তান। 'ম্লেচ্ছ'-শব্দের উল্লেখ আছে বলিয়া, উহা মুসলমান শাসনের সময়ে বিরচিত হইয়াছিল বলিয়া যাঁহারা মনে করেন তাঁহাদের যুক্তির অসারত্বও পূর্ব্বেই (এই গ্রন্থের ১৪৫ পৃষ্ঠায়) প্রতিপন্ন করিয়াছি। যাজ্ঞবল্ক্য এবং পরাশর-সংহিতায় অন্যান্য সংহিতার নামোল্লেখ আছে দেখিয়া, ঐ দুই সংহিতা অন্যান্য সংহিতার পরবর্ত্তি-কালে সঙ্কলিত হইয়াছিল,—অনেকে এইরূপ অনুমান করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে,—'বিক্রমাদিত্যের পূর্ব্বে এবং বৌদ্ধ-ধর্ম্মোৎপত্তির পরবর্ত্তি-কালে, খৃষ্ট-জন্মের চারি পাঁচ শত বৎসর পরে, যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা বিরচিত হইয়াছিল; এবং পরাশর সংহিতা আরও পরবর্ত্তি-কালের রচনা।' কিন্তু এ সিদ্ধান্তও সমীচীন নহে। কাত্যায়ন-সংহিতায় রাম-সীতার কথা আছে; * শাতাতপ-সংহিতায় হরিবংশ ও মহাভারত-পাঠের সার্থকতা কীর্ত্তিত হইয়াছে; † অথচ, ঐ দুই সংহিতার নাম পরাশর ও যাজ্ঞবল্ক্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে তর্কচ্ছলে পরাশর ও যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতাদ্বয়কে, কাত্যায়ন ও শাতাতপ সংহিতার, অতএব রামায়ণ ও মহাভারতের, পরবর্ত্তি-সময়ের সঙ্কলিত গ্রন্থ বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলেও খৃষ্ট-জন্মের বহু পূর্ব্বে ঐ দুই সংহিতা যে সঙ্কলিত হইয়াছিল, সর্ব্বপ্রকারেই তাহা প্রমাণিত হয়। দ্বাপরান্তে কলির প্রারম্ভে যে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ হয়, সে তো প্রায় পাঁচ-সহস্রাধিক বৎসর অতীত হইতে চলিল! ‡ সুতরাং খৃষ্ট-জন্মের পরবর্ত্তি-কালে স্মৃতি-সংহিতা প্রণীত হইয়াছিল,—এরূপ মনে করা কোনক্রমেই সঙ্গত হইতে পারে না। বিংশতি-সংহিতা আলোচনা করিলে, আমরা কতকগুলি নৃপতির নাম দেখিতে পাই; মনু, পৃথু, নহুষ, বেণ,

* কাত্যায়ন-সংহিতা, বিংশ অধ্যায়, ১০ম শ্লোক।

† শাতাতপ-সংহিতা, দ্বিতীয় অধ্যায়, ৩১শ ও ৩২শ শ্লোক।

‡ এই গ্রন্থের পরিশিষ্টাংশে—'মহাভারত' প্রসঙ্গে এতদালোচনা দ্রষ্টব্য।

সুদাস, সুমুখ, নিমি, দক্ষ, দিলীপ,রাম প্রভৃতি। সংহিতা-সমূহ যদি একান্ত পরবর্ত্তি-কালের রচনা হইত, তাহা হইলে তৎকালবর্ত্তী অন্যান্য রাজগণের নামও কোনও-না-কোনও আকারে এতন্মধ্যে স্থান পাওয়া সম্ভবপর ছিল। বৌদ্ধ-যুগে বা মুসলমান-শাসনের সময়ে হিন্দু-সমাজ যেরূপ বিচঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে, তত্তৎকালে সংহিতা-সমূহ রচিত হইলে নিশ্চয়ই তাহার কোনও-না-কোনও উল্লেখ দেখিতে পাইতাম। সংহিতা-সমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও, উহা আধুনিক বলিয়া প্রতীত হয় না। ফলে, হিন্দুর বিশ্বাস,— সংহিতা-সমূহ আবহমানকাল প্রচলিত আছে। যুগে যুগে ভাষার তারতম্যে যদিচ উহার কোনও কোনও অংশ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হওয়া অসম্ভব নহে; কিন্তু ভাবপরম্পরা যে পূর্ব্বাপর সমভাবেই বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করা যায়।

স্মৃতি-সংহিতার প্রসঙ্গ আলোচনা করিতে করিতে স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের স্মৃতি আপনাপনিই মনোমধ্যে জাগিয়া উঠে। যদিও রঘুনন্দন তুলনায় সে দিনের লোক—সেদিন মাত্র বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মতানুসারে বঙ্গদেশের হিন্দু-সমাজ এখনও পরিচালিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ। সুতরাং স্মৃতির কথা কহিতে হইলে, এখন তাঁহার কথা কহিবার প্রয়োজন হয়। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের উল্লাস-তরঙ্গাভিঘাতে বঙ্গ-সমাজ যখন বিভঙ্গ-প্রায়, মুসলমান-শাসনের সংসর্গাধীনে পড়িয়া হিন্দু-সমাজ যখন বিমলিন-প্রায়, ঘোর বিধর্ম্ম-কুজ্ঝটিকায় যখন বঙ্গের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত সমাচ্ছন্ন, সেই সময়ে নবদ্বীপে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের মাত্র কুড়ি পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে, রঘুনন্দনের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা হরিদেব (বন্দোপাধ্যায়) ভট্টাচার্য্যও নবদ্বীপের মধ্যে স্মার্ত্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। কিন্তু রঘুনন্দন সেই পিতার স্মৃতি অধিকতর উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিলেন। সুলতান সৈয়দ হোসেন তখন বাঙ্গালার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত; চারি শত বৎসর অব্যাহত-ভাবে মুসলমান-সংসর্গে থাকিয়া, বাঙ্গালী তখন আপন রীতি-নীতি-আচার-ব্যবহারে ভ্রষ্ট হইতে বসিয়াছে। রঘুনন্দনের হৃদয়-দর্পণে যখন সেই চিত্র প্রতিভাত হইল, তখন তিনি সমাজ-সংস্কারের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিলেন। তিনি যতই সমাজের বিশৃঙ্খলার বিষয় ভাবিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার প্রাণ অধীর হইয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন,— পণ্ডিতগণ তখন স্মৃতির মত লইয়া বিতণ্ডা আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি বুঝিলেন,—ভিন্ন ভিন্ন স্মৃতিতে ভিন্ন ভিন্ন মত ব্যক্ত হইয়াছে দেখিয়া, জন-সাধারণ অধিকতর বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে; অধিকন্তু, সেই মত-বৈষম্যের সুযোগ পাইয়া, ভিন্ন-ধর্ম্মিগণ আপন স্বার্থ-সিদ্ধির সুবিধা পাইতেছে; তাহাতে মোহ-ঘোরে, কেহ বা ধর্ম্মান্তরের আশ্রয় লইতেছে, কেহ বা নাস্তিক্য-মতের অনুসরণ করিতেছে। এই দেখিয়া, সমাজের দারুণ দুর্দ্দশার দিন বুঝিতে পারিয়া, রঘুনন্দন শ্রুতি-স্মৃতির সামঞ্জস্য বিধানে—প্রকৃষ্ট মত স্থাপনে—প্রাণ-মন সমর্পণ করিলেন। পঁচিশ বৎসর কাল ঐকান্তিক সাধনার ফলে, 'অষ্টাবিংশতি স্মৃতি-তত্ত্ব' সঙ্কলিত হইল। তাহাতে শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-তন্ত্রাদি নানা শাস্ত্রের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া রঘুনন্দন পরস্পর-বিরোধী মত-সমূহের এক-বাক্যতা নিরূপণ করিলেন। অষ্টাবিংশতি

স্মার্ত্ত রঘুনন্দন।

স্মৃতি-তত্ত্বের সহিত রঘুনন্দনের যশঃ-প্রভা দিগ্‌দিগন্তে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তাঁহার সেই অষ্টাবিংশতি স্মৃতি-তত্ত্বের পরিচয়, তাঁহারই গ্রন্থে এইরূপ পরিবর্ণিত আছে;—

"মলিম্লুচে দায়ভাগে সংস্কারে শুদ্ধি-নির্ণয়ে।
প্রায়শ্চিত্তে বিবাহে চ তিথৌ জন্মাষ্টমী-ব্রতে॥
দুর্গোৎসবে ব্যবহারবেকাদশ্যাদিনির্ণয়ে।
তড়াগভবনোৎসর্গে বৃষোৎসর্গ-ত্রয়ে ব্রতে॥
প্রতিষ্ঠায়াং পরীক্ষায়াং জ্যোতিষে বাস্তুযজ্ঞকে।
দীক্ষায়ামাহ্নিকে কৃত্যে ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে॥
সামশ্রাদ্ধে যজুঃশ্রাদ্ধে শূদ্রকৃত্য বিচারণে।
ইত্যষ্টাবিংশতি স্থানে তত্ত্বং বক্ষ্যামি যত্নতঃ॥"

'মলমাস, দায়ভাগ, সংস্কার, শুদ্ধি, প্রায়শ্চিত্ত, বিবাহ, তিথি, জন্মাষ্টমী, দুর্গোৎসব, ব্যবহার, একাদশী, জলাশয় ও ভবন-উৎসর্গ, ঋগ্বেদীয় বৃষোৎসর্গ, সামবেদীয় বৃষোৎসর্গ, যজুর্ব্বেদীয় বৃষোৎসর্গ, ব্রত, দেব-প্রতিষ্ঠা, দিব্য, জ্যোতিষ, বাস্তুযাগ, দীক্ষা, আহ্নিক, কৃত্য, পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র, সামবেদীয় শ্রাদ্ধ, যজুর্ব্বেদীয় শ্রাদ্ধ, শূদ্রকৃত্য-বিচার,—এই অষ্টাবিংশতি-তত্ত্ব যত্ন-সহকারে আমি বর্ণন করিতেছি।' বলা বাহুল্য, এই অষ্টাবিংশতি স্মৃতি-তত্ত্ব অনুসারেই বঙ্গদেশের প্রায় সমস্ত ক্রিয়া-কর্ম্ম (একমাত্র উপনয়ন ভিন্ন) নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। উপনয়ন-সম্বন্ধে পূর্ব্ব-স্মৃতি পূর্ব্ব-পদ্ধতি এখনও চলিয়াছে বটে; কিন্তু অন্যান্য সকল কর্ম্মে রঘুনন্দনের মতই অব্যাহত। অষ্টাবিংশতি স্মৃতি-তত্ত্ব প্রণয়ন করিয়া, কাশী, মিথিলা প্রভৃতি স্থানে গমন-পূর্ব্বক, তত্তদ্দেশের পণ্ডিতগণের সহিত রঘুনন্দন বিচার-বিতর্কে প্রবৃত্ত হন। তখন কেহই তাঁহার মতের প্রতিবাদ করিতে সমর্থ হন না। ফলে, রঘুনন্দনের মতই প্রতিষ্ঠা লাভ করে। রঘুনন্দন কিরূপভাবে এক এক বিষয়ের মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, রঘুনন্দনের 'তিথি-তত্ত্বোক্ত' একাদশী-প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেছি। যদি কাহারও মনে সংশয় উপস্থিত হয়,—একাদশী যদি খণ্ডিত হইয়া দুই দিন স্থায়ী হয়, এবং দুই দিনই কর্ম্মযোগ্য কাল প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে একাদশীতে বিহিত ধর্ম্মকার্য্য কোন্ দিনে করিবে? রঘুনন্দন তাহার বিচার করিতেছেন,—"সা চ পরযুতা গ্রাহ্যা যুগ্মাৎ।" অর্থাৎ, একাদশী যে দিন পরবর্ত্তিনী তিথির সহিত সংযুক্তা হইবে এবং অবশ্য কর্ম্মযোগ্য কাল প্রাপ্ত হইবে, একাদশী-বিহিত ধর্ম্ম-কার্য্য সেই দিনই করিবে; কেন-না, যুগ্মাদি-বিষয়ক বচনে এইরূপ নিয়মই করা হইয়াছে। ইহার পর, রঘুনন্দন অগ্নি-পুরাণ ব্রহ্ম-পুরাণ, ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত-পুরাণ, নারদ-পুরাণ, তত্ত্ব-সাগর, জৈমিনি-বচন, বরাহ-পুরাণ, ভবিষ্য-পুরাণ, কূর্ম্ম-পুরাণ, মৎস্য-পুরাণ, বায়ু-পুরাণ, পদ্ম-পুরাণ, বামন-পুরাণ, মহাভারত এবং স্মৃতি-সমূহ হইতে একাদশী-সংক্রান্ত বচন-পরম্পরা উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেই বচন-সমূহের সামঞ্জস্য-বিধানে, কোন্ দিন, কোন্ সময়, কিরূপভাবে, একাদশী-তিথির সংযোগ থাকিলে, একাদশী-কৃত্য এবং উপবাসাদি শ্রেয়ঃ, রঘুনন্দন তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। প্রায় সকল শাস্ত্রের

সকল মত উদ্ধৃত করিয়া তিনি সংক্ষেপে আপন সিদ্ধান্ত মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ তাঁহার তিথিতত্ত্ব হইতে একাদশীর বিচার-সংক্রান্ত মত উদ্ধৃত করিতেছি;—

"তদয়ং সংক্ষেপঃ। গৃহস্থাদীনামুভয়পক্ষে একাদশ্যামুপবাসেঽধিকারঃ। হরিশয়নাভ্যন্তরে তস্যাপ্যধিকারঃ। বৈষ্ণব-পুত্রবদ্‌গৃহস্থস্ত সর্ব্বকৃষ্ণায়ামপ্যধিকারঃ। শুক্রবাররবিবারাদাবপ্যেকাদশ্যামুপবাসে ফলাধিক্যং। বিধবায়াস্তু সর্ব্বত্রাধিকারঃ। তত্রাষ্টাব্দাদধিকাপূর্ণাশীতিবর্ষমানবো নিত্যাধিকারী। একাদশী-ব্রতং নিত্যং। পারণ-দিনে দ্বাদশীলাভে সর্ব্বএব পূর্ণামেকাদশীং ত্যক্ত্বা খণ্ডামুপবসেৎ। তদলাভে গৃহী পূর্ব্বাং, তদন্য পরাং। বিধবাপি যদা তু পূর্ব্বদিনে দশম্যা পরদিনে দ্বাদশ্যা যুতৈকাদশী তদোত্তরামুপোষ্য দ্বাদশ্যাং পারণং কুর্য্যাৎ। পারণ-দিনে দ্বাদশ্যনির্গমে তু ত্রয়োদশ্যামপি। যদা সূর্য্যোদয়ানন্তরং দশমী-যুতৈকাদশী পরদিনে ন নিঃসরতি তদা তাং বিহায় পরদিনে দ্বাদশীমুপবসেৎ। যদা তু সূর্য্যোদয়-পূর্ব্বকালীন-দশমীবিদ্ধৈকাদশী পরদিনে ন নিঃসরতি তদা তামুপবসেৎ। যদা তু তথা বিধা সতী পরদিনেঽপি নিঃসরতি তৎপরদিনে চ দ্বাদশী তদা তাং বিহায় খণ্ডামুপোষ্য দ্বাদশ্যাং পারয়েৎ। যদা তূভয়োদিনে তদ্বিধৈকাদশী তৎপরদিনে চ ন দ্বাদশী তদা ষষ্টিদণ্ডাত্মিকাং বিদ্ধামুপোষ্য পরদিনে দ্বাদশ্যাদ্যপাদমুত্তীর্য্য পারয়েৎ। বৈষ্ণবস্তু তত্রাপি শুক্লপক্ষে পরামুপোষ্য ত্রয়োদশ্যাং পারয়েদিতি। একাদশ্যুপবাসঃ সূতকাদাবপি কার্য্যঃ।"

সংক্ষেপতঃ,—শুক্ল কৃষ্ণ উভয় পক্ষের একাদশীতেই গৃহস্থাদির উপবাসে অধিকার। "হরিশয়নাভ্যন্তরবর্ত্তী একাদশীতেও তাঁহাদিগের অধিকার আছে। বৈষ্ণব এবং পুত্রবান্ গৃহস্থের সমুদয় কৃষ্ণৈকাদশীতেই উপবাসে অধিকার। শুক্রবার এবং রবিবারাদিতে একাদশী হইলে, তাহাতে উপবাসে অধিক ফল হয়। বিধবাদিগের কিন্তু সকল একাদশীতেই উপবাসের অধিকার। আট বৎসর বয়স উত্তীর্ণ হইবার পর, ঊনাশী বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রমী মনুষ্যমাত্রেরই একাদশীর উপবাসে নিত্য অধিকার। এই একাদশীতে উপবাস-রূপ ব্রত নিত্য—অর্থাৎ সমর্থ হইয়া না করিলে, পাপভোগী হইতে হয়। যদি একাদশী প্রথম দিন পূর্ণা হইয়া অর্থাৎ সূর্য্যোদয় কাল হইতে আরম্ভ হইয়া তৎপরদিন সূর্য্যোদয়ের পরও কিছুক্ষণ স্থায়ী হয়, এবং তৃতীয় দিন দ্বাদশীও সূর্য্যোদয়ের পর কিছুক্ষণ অবস্থিত হয়; এরূপস্থলে, সকল ব্যক্তিই, প্রথম দিনের পূর্ণ একাদশী ত্যাগ করিয়া, দ্বিতীয় দিনের খণ্ডৈকাদশীতেই উপবাস করিবে। যদি তৃতীয় দিন সূর্য্যোদয়ের পর দ্বাদশীর স্থিতি না ঘটে, তাহা হইলে পুত্রবান্ ব্যক্তি প্রথম দিনের পূর্ণাতে উপবাস করিবে; তদ্ভিন্ন অপর সকলেই এবং বিধবাগণ দ্বিতীয় দিনের খণ্ডৈকাদশীতে উপবাস করিবে। যদি প্রথম দিন একাদশী সূর্য্যোদয়ের পরও দশমীযুক্ত, এবং দ্বিতীয় দিন সূর্য্যোদয়ের পরও দ্বাদশীযুক্ত হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয় দিনের দ্বাদশীযুক্ত একাদশীতে উপবাস করিয়া, তৃতীয় দিন দ্বাদশীর মধ্যেই পারণ করিবে। যদি তৃতীয় দিন সূর্য্যোদয়ের পর দ্বাদশীর অপ্রাপ্তি ঘটে, তথাপি দ্বিতীয় দিনের খণ্ডৈকাদশীর উপবাস, এবং তৃতীয় দিনের ত্রয়োদশীতেও নির্দেন পারণ করিবে। যে স্থলে প্রথম দিন সূর্য্যোদয়ের পর কিছুক্ষণ দশমী থাকিয়া পরে একাদশী হইবে, কিন্তু ঐ একাদশী পরদিন অর্থাৎ দ্বিতীয় দিন আর সূর্য্যোদয়ের পর অবধি থাকিবে না, পূর্ব্বেই নিঃশেষিত হইবে, এরূপস্থলে পূর্ব্ব বা প্রথম দিনের দশমী-বিদ্ধা একাদশীকেও ত্যাগ করিয়া পরদিনের নিছক দ্বাদশীতেই উপবাস করিবে। কিন্তু যে স্থলে প্রথম দিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে দশমী-বিদ্ধা হইয়া একাদশী, পরদিন সূর্য্যো-

দয়ের পর আর অবস্থিত না হয়, সে স্থলে সেই সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বকালীন দশমী-বিদ্ধা একাদশীতেই উপবাস করিবে। যে স্থলে একাদশী প্রথম দিন, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে দশমী-বিদ্ধা হইয়া, দ্বিতীয় দিনেও সূর্য্যোদয়ের পর কিছুক্ষণ অবস্থান করে, এবং তৃতীয় দিন দ্বাদশীও সূর্য্যোদয়ের পর কিছুকাল অবস্থিত হয়, সে স্থলে প্রথম দিনের সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বকালীন দশমী-বিদ্ধা একাদশীকে পরিত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় দিনের খণ্ডৈকাদশীতেই উপবাস করিবে, এবং তৃতীয় দিনের দ্বাদশীর মধ্যেই পারণ করিবে। অন্যদিকে যে স্থলে প্রথম দিন একাদশী সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে দশমী-বিদ্ধা হইয়া দ্বিতীয় দিন সূর্য্যোদয়ের পর কিছুক্ষণ স্থায়ী হইবে, কিন্তু তৃতীয় দিন দ্বাদশী আর সূর্য্যোদয়ের পরবর্ত্তিনী হইবে না, এরূপ স্থলে প্রথম দিনের ষাট-দণ্ড-ব্যাপিনী একাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বিতীয় দিন দ্বাদশীর প্রথম পাদ উত্তীর্ণ হইবার পর পারণ করিবে। বৈষ্ণবগণ কিন্তু এরূপ স্থলে, শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয় দিনে খণ্ডৈকাদশীতে উপবাস করিয়া তৃতীয় দিন ত্রয়োদশীতেই পারণ করিবে। এই একাদশীর উপবাস অশৌচাদিতেও কর্ত্তব্য।" * এইরূপে আপন মত প্রতিষ্ঠা করিয়া, পরিশেষে কোন্ কোন্ স্থলে, কোন্ কোন্ শাস্ত্রের মতে একাদশী তিথিতেও কিরূপভাবে আহারাদির ব্যবস্থা হইতে পারে, রঘুনন্দন তৎসম্পর্কীয় মতসমূহ উদ্ধৃত করিয়াছেন। ফলতঃ, অগাধ হিন্দু-শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিয়া, যেখানে যে মত সমীচীন বুঝিয়াছিলেন, রঘুনন্দন আপন গ্রন্থনিচয়ে তাহাই সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। তিথিতত্ত্বান্তর্গত একমাত্র একাদশী প্রসঙ্গেই এতাদৃশ পাণ্ডিত্য-প্রকাশ। সুতরাং বুঝা যায়, অষ্টাবিংশতি স্মৃতি-তত্ত্বের অসংখ্য বিষয়ের আলোচনায়, রঘুনন্দনের গবেষণা কীদৃশী স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছিল। স্মৃতি-তত্ত্ব ভিন্ন রঘুনন্দন আরও বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তদ্বিরচিত রাসযাত্রা-পদ্ধতি, প্রমাণ-তত্ত্ব, দায়ভাগের টীকা—বিশেষ প্রসিদ্ধ। কাশীরাম বাচস্পতি এবং রাধামোহন গোস্বামী, রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি স্মৃতি-তত্ত্বের যে টীকা প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন; এখনও তাহা প্রচলিত। রঘুনন্দন—এখন স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য বা স্মার্ত্ত রঘুনন্দন নামে পরিচিত। সপ্ততি বর্ষ বয়সে, খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে, রঘুনন্দন লোকান্তরে গমন করেন। সে আজ প্রায় তিন শত বৎসরের অধিক কাল অতীত হইতে চলিল; কিন্তু আজিও তাঁহার অনুশাসনে বঙ্গদেশীয় হিন্দুসমাজ পরিচালিত।

শূলপাণি ও স্মৃতি-শাস্ত্র।

বাঙ্গালায় যেমন রঘুনন্দন, ভারতের উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশে সেইরূপ শূলপাণি। বঙ্গদেশে যেমন রঘুনন্দনের মত প্রচলিত, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে তদ্রূপ স্মার্ত্ত-শিরোমণি শূলপাণির মত অব্যাহত। শূলপাণি অযোধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। কথিত হয়, প্রায় সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে তিনি বিদ্যমান ছিলেন; এবং দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া পণ্ডিত-সমাজে আপনার মত প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন যেরূপ-ভাবে শ্রুতি-স্মৃতির সামঞ্জস্য-বিধান পূর্ব্বক সমাজের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করেন, স্মার্ত্ত শূলপাণিও সেই পদ্ধতিতেই আপন স্মৃতি-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। কিংবদন্তী এই,—শূলপাণি বিধবা-বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা করিতে গিয়া,

* তিথিতত্ত্বম্,—স্মার্ত্ত শ্রীরঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রণীতম্। বঙ্গবাসী-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

আপনার কন্যার নিকট বিচারে পরাজিত হইয়াছিলেন। প্রথমে শূলপাণি স্থির করিয়াছিলেন, আপনার বিধবা কন্যার বিবাহ দিয়া, হিন্দু-সমাজে বিধবা-বিবাহের দৃষ্টান্ত স্থাপন করিবেন। কিন্তু তাঁহার সেই কন্যা বিদুষী ও ধর্ম্মপ্রাণা ছিলেন; পিতার প্রস্তাব শাস্ত্র-বিরুদ্ধ অবৈধ মনে করিয়া, তিনি তাহার প্রতিবাদ আরম্ভ করেন। তদুপলক্ষে পিতা ও কন্যায় অনেক দিন ধরিয়া বিচার-বিতর্ক চলিতে থাকে। সেই সময় শূলপাণি একবার দেশান্তরে গমন করেন। বিদেশ-যাত্রার পূর্ব্বে দেব-পূজার জন্য তাঁহার গৃহে বস্ত্রাদি বহু সামগ্রী সঞ্চিত রাখিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু কিছু দিন পরে বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন,—তাঁহার কন্যা সেই সকল পূজোপকরণ লইয়া শিশু বালিকার ন্যায় ধূলাখেলা খেলিতেছে। শূলপাণি কন্যার এতাদৃশ ভাবান্তর-দৃষ্টে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কন্যাকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন,—"তুমি এ কি করিতেছ? পূজার সামগ্রী এরূপ-ভাবে ব্যবহার করিয়া অপবিত্র করা কি তোমার উচিত হইয়াছে?" কন্যা উত্তর দিলেন,—"আমার' খেলা-ঘরের দেবতাকে আমি এই সমুদায় দান করিয়াছি; ইহাতে কি দোষ হইতে পারে? আপনার দেবতাকে ইহাই আবার দান করিবেন।" পিতা উত্তর করিলেন,—"একবার যাহা দান করিয়াছ, সেই উচ্ছিষ্ট সামগ্রী কি প্রকারে অন্য দেবতাকে পুনর্দ্দান করিতে পারি?" কন্যা অমনি কহিলেন,—"তবে পুনরায় আমার বিবাহ দিতে কি প্রকারে প্রস্তুত হইয়াছেন? একবার দান করিয়া, আবার আমায় কি প্রকারে সম্প্রদান করিতে পারিবেন?" এতদিন বিচার-বিতর্কে শূলপাণি যে মীমাংসায় উপনীত হইতে পারেন নাই, কন্যার ঈদৃশ বাক্যে তদ্বিষয়ে তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল। আবার তিনি শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থনে প্রবৃত্ত হইলেন। ফলে, বিধবা-বিবাহ-প্রচলন-সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ব্ব-সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত বলিয়া প্রতীতি জন্মিল। তিনি বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে শাস্ত্র-যুক্তি প্রদর্শনে বদ্ধপরিকর হইলেন। সেই হইতেই শূলপাণির স্মৃতি ভারত-বিখ্যাত। দাক্ষিণাত্যে অবশ্য শূলপাণি বা রঘুনন্দনের মত প্রচলিত নহে। প্রধানতঃ মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যের মতই "নির্ণয়-সিন্ধু" গ্রন্থে নিবদ্ধ হইয়া দাক্ষিণাত্যের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রচারিত আছে। সমগ্র স্মৃতি-শাস্ত্রের সার-সংগ্রহ-পূর্ব্বক সমাজ-বিধি প্রবর্ত্তনার জন্য, এক দিকে রঘুনন্দন এবং অন্য দিকে শূলপাণি—দুই দিকে দুই দিক্‌পাল-রূপে যেরূপ প্রতিষ্ঠিত হন; সেইরূপ 'মিতাক্ষরা' সঙ্কলন-পূর্ব্বক বিজ্ঞানেশ্বর ভট্টারক এবং 'দায়ভাগ' সঙ্কলন করিয়া জীমূতবাহন যশোসম্মান লাভ করেন। প্রধানতঃ তাঁহাদের অবলম্বন—যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা; কিন্তু স্মৃতি-পুরাণাদির সামঞ্জস্য-বিধানে তাঁহারা যে ভাবে মিতাক্ষরা ও দায়ভাগ সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন, পাশ্চাত্য-রীতিনীতি-নিয়ম-পদ্ধতি-প্রচলিত দেশেও অধুনা তাহা সমাদৃত হইতেছে। কোন্ স্মরণাতীত-কালে যে সংহিতা-তত্ত্ব ভারতে উদ্ভাসিত হইয়াছিল, আজিও তাহার প্রভাব অক্ষুণ্ণ,—ইহার অধিক সংহিতা-সমূহের নিত্যত্ব ও মৌলিকত্বের প্রমাণ আর কি হইতে পারে? হিন্দু-সমাজ কতকাল হইতে কিরূপ-ভাবে উন্নত-অবস্থায় অবস্থিত, ইহা তাহারই প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

পুরাণ।

[পুরাণ-প্রসঙ্গ,—পুরাণের লক্ষণ ;—মহাপুরাণ ও উপপুরাণ,—পুরাণের শ্লোক-সংখ্যা,—পুরাণ-সম্বন্ধে নানা মত ;—অষ্টাদশ মহাপুরাণের সংক্ষিপ্ত তত্ত্ব,—বিষ্ণু-পুরাণে প্রাচীন ও ভবিষ্য রাজ-বংশ ;—শ্রীমদ্ভাগবতে কবিত্বের স্ফূর্ত্তি ও শ্রীকৃষ্ণের লীলা-প্রসঙ্গ ;—অগ্নি-পুরাণে যুদ্ধাস্ত্র, যুদ্ধ-পদ্ধতি ;—ভবিষ্য-পুরাণে প্রক্ষিপ্তের প্রকট চিত্র ;—মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবী-মাহাত্ম্য চণ্ডী ;—স্কন্দ পুরাণে তীর্থ-মাহাত্ম্য-প্রাধান্য ;—সর্ব্ব পুরাণের সারমর্ম্ম ও সমন্বয়-বিধান,—পুরাণে ইতিহাস ;—পুরাণ-রচনার কাল নির্দ্দেশে বাদানুবাদ ;—পুরাণে সামাজিক, রাজ-নৈতিক ও ধর্ম্ম-বিষয়ক বিবিধ চিত্র ;—পুরাণ-সম্বন্ধে পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের মতালোচনা।]

পুরাণ-প্রসঙ্গ।

মন্বাদি-রচিত বিংশতি সংহিতার পরই—ভারতবর্ষে পুরাণের প্রাধান্য। পুরাণ—অনন্ত রত্ন-ভাণ্ডার। পুরাণে আর্য্য-হিন্দুগণের দৈনন্দিন ধর্ম্মানুষ্ঠান-পদ্ধতি পরিবর্ণিত আছে; পুরাণে প্রাচীন ইতিহাসের সার-তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে; পুরাণে হিন্দু-জাতির প্রতিষ্ঠার, গৌরবের, মহত্ত্বের, বীরত্বের, সাহসের, ন্যায়-নিষ্ঠার, দয়া-দাক্ষিণ্যের—কি মনোমদ চিত্রই প্রতিফলিত। কর্ম্ম ও অকর্ম্ম, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, পাপ ও পুণ্য,—মনুষ্যের জীবন-গতি নির্ণয়ের মূল-মন্ত্র—দৃষ্টান্ত, উদাহরণ প্রভৃতির দ্বারা পুরাণে কি সুন্দরভাবেই পরিবর্ণিত রহিয়াছে। পুরাণের সংখ্যা, পুরাণের আকৃতি, পুরাণের বিষয়-পরম্পরা, পুরাণের ধর্ম্মতত্ত্ব, পুরাণের কবিত্ব ও লিপি-কৌশল প্রভৃতির বিষয় আলোচনা করিলে, বিস্ময়-বিহ্বল হইতে হয়। মনে হয়,—বুঝি বা পৃথিবীর কোনও দেশে কোনও ভাষায় পুরাণের ন্যায় বিরাট্ বিপুল গ্রন্থ কখনও রচিত হয় নাই। 'পুরাণ'-শব্দের অর্থ—প্রাচীন, পুরাতন; অর্থাৎ, যাহাতে পুরাকালের রাজ-নৈতিক, সামাজিক ও প্রাকৃতিক অবস্থা বর্ণনা করিয়া, মানুষের মন ধর্ম্মের পথে আকৃষ্ট করিতে পারে, তাহাই 'পুরাণ' নামে অভিহিত। কোনও মতে, পুরাণ পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত; আবার কোনও মতে, পুরাণ দশ-লক্ষণ-যুক্ত। যাঁহারা পুরাণকে পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাঁহাদের মধ্যে আবার দ্বিবিধ মত দৃষ্ট হয়। বরাহপুরাণে লিখিত আছে,—"সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশোমন্বন্তরানি চ। বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণম্ পঞ্চলক্ষণং॥" অর্থাৎ, সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর এবং বংশানুচরিত,—এই পঞ্চলক্ষণ-যুক্ত ব্যাসাদি-মুনি-প্রণীত গ্রন্থই 'পুরাণ' নামে অভিহিত। কিন্তু অমরসিংহের 'কোষ'-গ্রন্থে পুরাণের যে পঞ্চ-লক্ষণ বর্ণিত আছে, তাহাতে দেখিতে পাই,—যাহাতে সৃষ্টির বিষয়, প্রলয়ের বিষয়, দেব-তত্ত্ব, অবতার-তত্ত্ব, মনু ও মন্বন্তরের বিবরণ এবং চন্দ্র-সূর্য্য-বংশের প্রাচীন ও আধুনিক বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে, তাহাই 'পুরাণ'। শ্রীমদ্ভাগবতে পুরাণের দশ-বিধ লক্ষণের উল্লেখ আছে; যথা,—(১) সর্গ, অর্থাৎ প্রকৃতির গুণত্রয় হইতে ক্রমে ক্রমে কিরূপে স্থূল পদার্থ সকল ও তত্তৎ-পদার্থের অধিষ্ঠাতা দেবগণের উৎপত্তি হয়; (২) বিসর্গ, অর্থাৎ কর্ম্ম-ফল-বশে

বীজোৎপত্তির ন্যায় কিরূপে চরাচরের সৃষ্টি হয়; (৩) বৃত্তি, অর্থাৎ বিধিবশে কিরূপে মনুষ্যের জীবনোপায় নির্দ্দিষ্ট হয়; (৪) রক্ষা, অর্থাৎ বেদ-বিদ্বেষী দৈত্যাদিগের উপদ্রব হইতে মনুষ্য ও ঋষিগণকে রক্ষার জন্য কিরূপে নারায়ণ অবতার-রূপ গ্রহণ করেন; (৫ অন্তর, অর্থাৎ মনু, দেবতাগণ, মনুপুত্রগণ, সুরেশ্বরগণ, ঋষিগণ এবং নারায়ণের অবতারগণ কিরূপে আপনাপন অধিকারে বিদ্যমান থাকেন; (৬) বংশ, অর্থাৎ ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন বিশুদ্ধ রাজ-বংশের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান চিত্র; (৭) বংশানুচরিত, অর্থাৎ রাজ-বংশীয়গণের চরিত্র; (৮) সংস্থা, অর্থাৎ নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক, আত্যন্তিক—বিশ্বের চারিপ্রকার বিকার বা লয়; (৯) হেতু, অর্থাৎ অজ্ঞানতা-নিবন্ধন কর্ম্মবশে জীব কিরূপে বিশ্বের হেতুভূত হয়; (১০) অপাশ্রয়, অর্থাৎ সর্ব্বাবস্থায় ব্রহ্মের সহিত জীবের সম্বন্ধ। * কালক্রমে অনেক পুরাণ এখন আর অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া যায় না। সুতরাং পুরাণের সকল লক্ষণ মিলাইয়া পাওয়াও এখন দুর্ঘট।

মহাপুরাণ ও উপপুরাণ।

পুরাণ-সমূহ প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত;—মহাপুরাণ ও উপপুরাণ। মহর্ষি ব্যাস-প্রণীত দশ-সহস্রাধিক শ্লোক-যুক্ত যে পুরাণ, তাহাই মহাপুরাণ নামে অভিহিত হয়; আর, ব্যাস ভিন্ন অন্য ঋষির প্রণীত ক্ষুদ্র পুরাণগুলিকে উপপুরাণ কহে। মহাপুরাণের সংখ্যাও অষ্টাদশ, উপপুরাণের সংখ্যাও অষ্টাদশ। অষ্টাদশ মহাপুরাণের নাম,—(১) ব্রহ্মপুরাণ, (২) পদ্মপুরাণ, (৩) বিষ্ণু-পুরাণ, (৪) শিবপুরাণ (৫) লিঙ্গপুরাণ, (৬) গরুড়পুরাণ, (৭) নারদীয় পুরাণ, (৮) শ্রীমদ্ভাগবত, (৯) অগ্নিপুরাণ, (১০) স্কন্দপুরাণ, (১১) ভবিষ্যপুরাণ, (১২) ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, (১৩) মার্কণ্ডেয় পুরাণ, (১৪) বামনপুরাণ, (১৫) বরাহপুরাণ, (১৬) মৎস্য-পুরাণ, (১৭) কূর্ম্মপুরাণ, (১৮) ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ। † শ্রীমদ্ভাবত-কার পুরাণের দশবিধ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া উল্লিখিত অষ্টাদশ পুরাণকে মহাপুরাণ নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে পুরাণান্তরে অবশ্য মতভেদ দৃষ্ট হয়। নারদীয় পুরাণের মতে, শিবপুরাণের পরিবর্ত্তে বায়ুপুরাণ অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্ভুক্ত। আবার কূর্ম্মপুরাণের মতে,—স্কন্দ, নারদীয় ও বামন পুরাণ—উভয়-পর্য্যায়ভুক্ত। সে হিসাবে উপপুরাণ এই আঠারখানি,—(১) সনৎ-কুমারোক্ত 'আদ্য', (২) নারসিংহ, (৩) কুমারোক্ত 'স্কন্দ', (৪) নান্দীশভাষিত 'শিবধর্ম্ম', (৫) দুর্ব্বাসাঃ, (৬) নারদীয়, (৭) কাপিল, (৮) বামন, (৯) উশনাঃ, (১০) ব্রহ্মাণ্ড, (১১) বারুণ, (১২) কালিকা, (১৩) মাহেশ্বর, (১৪) শাম্ব, (১৫) সৌর, (১৬) পরাশর, (১৭) মারীচ, (১৮) ভার্গব। অন্যত্র আবার দেখিতে পাওয়া যায়,—বায়বীয়, নান্দিকেশ্বর, পাদ্ম, দেবী ও ভাস্কর—এই পুরাণপঞ্চক উপপুরাণ-মধ্যে গণ্য। যাহা হউক, প্রধানতঃ বায়ুপুরাণ লইয়াই মতদ্বৈধ দেখিতে পাওয়া যায়। পণ্ডিতগণ বলেন,—কল্পভেদে কখনও বায়ু-পুরাণ, কখনও বা শিবপুরাণ মহাপুরাণ-মধ্যে গণ্য হয়। শ্রীমদ্ভাগবত ভিন্ন আর দুইখানি

---

* শ্রীমদ্ভাগবত, দ্বাদশ স্কন্ধ, সপ্তম অধ্যায়, ৯ম হইতে ২০শ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

† শ্রীমদ্ভাগবত, দ্বাদশ স্কন্ধ, সপ্তম অধ্যায়, ২৩শ ও ২৪শ শ্লোকে এই অষ্টাদশ মহাপুরাণের নাম এইরূপ-ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের শেষ অধ্যায়োল্লিখিত মতের সহিত ইহার ঐক্য দেখা যায়।

ভাগবত আছে; দেবীভাগবত ও বিষ্ণু-ভাগবত। কেহ কেহ সে দুইখানিকেও মহাপুরাণের অন্তর্ভুক্ত করেন। মতান্তরে আবার মহাভারত—মহাপুরাণের অন্তর্ভুক্ত। ফলতঃ, কোন্ খানি মহাপুরাণ, কোন্ খানি উপপুরাণ, যে সম্বন্ধে এখন নানা মত দৃষ্ট হয়। সে হিসাবে, উপপুরাণের সংখ্যা অষ্টাদশাতিরিক্ত বলিয়াই বুঝিতে পারা যায়। উল্লিখিত অষ্টাদশ মহাপুরাণকে শাস্ত্রকারগণ প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করেন;—সাত্বিক, তামসিক ও রাজসিক; অথবা বৈষ্ণব, শৈব, ব্রাহ্ম। সাত্বিক মহাপুরাণ ছয়খানি,—বিষ্ণু, নারদীয়, ভাগবত, গরুড়, পদ্ম, বরাহ; প্রধানতঃ বিষ্ণুর মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়াই এই ছয়খানি পুরাণ 'বৈষ্ণব পুরাণ' বলিয়া অভিহিত হয়। তামসিক মহাপুরাণ ছয়খানি,—মৎস্য, কূর্ম্ম, লিঙ্গ, শিব, স্কন্দ ও অগ্নি। এই কয়খানি পুরাণ তমোগুণ-প্রধান; এবং এই সকল পুরাণে প্রধানতঃ শিব-মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে; তজ্জন্যই এই ষট্-মহাপুরাণ তামসিক ও 'শৈব পুরাণ' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। রাজসিক মহাপুরাণের সংখ্যাও ছয় খানি,—ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য, বামন, ব্রহ্ম। এই সকল পুরাণে রাজসিক ভাব প্রকটিত; সুতরাং পুরাণ কয়েকখানি রাজসিক পুরাণ সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে। প্রধানতঃ ব্রহ্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনেই এই পুরাণ-ষষ্ঠ 'ব্রাহ্ম-পুরাণ' নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। এই বিভাগ-সম্বন্ধেও আবার মতান্তর আছে। কাহারও মতে,—বরাহপুরাণ তামসিক পুরাণের, এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও মার্কণ্ডেয় সাত্বিক পুরাণের অন্তর্ভুক্ত। কথিত হয়,—সমগ্র অষ্টাদশ মহাপুরাণে সাধারণতঃ চারি লক্ষ শ্লোক এবং ষোল লক্ষ পংক্তি সন্নিবিষ্ট আছে; কিন্তু মতান্তরে, এ গণনা সংক্ষিপ্ত বলিয়া উল্লিখিত হয়। তদনুসারে, অষ্টাদশ মহাপুরাণে দশ কোটী হইতে এক শত কোটী শ্লোক থাকা সম্ভব; কিন্তু গণনায় তাহা এখন আর পাওয়া যায় না। কোনও কোনও পুরাণে (বিষ্ণুপুরাণাদিতে) আলোচ্য বিষয়ের কতক কতক গদ্যে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়াও শ্লোকাদির সংখ্যা গণনায় বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। যাহা হউক, শ্রীমদ্ভাগবত-কার মহাপুরাণ-সমূহের শ্লোকসংখ্যা যেরূপ-ভাবে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক-ষষ্ঠকেই তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে;—

> "ব্রাহ্মং দশ-সহস্রাণি পাদ্মং পঞ্চোনষষ্টি চ। শ্রীবৈষ্ণবং ত্রয়োবিংশচ্চতুর্বিংশতি শৈবকম্॥
> দশাষ্টৌ শ্রীভাগবতং নারদং পঞ্চবিংশতি। মার্কণ্ডং নববাহ্নঞ্চ দশপঞ্চচতুঃশতম্॥
> চতুর্দ্দশ ভবিষ্যং স্যাৎ তথা পঞ্চশতানি চ। দশাষ্টৌ ব্রহ্মবৈবর্ত্তং লৈঙ্গমেকাদশৈব তু॥
> চতুর্ব্বিংশতি বারাহমেকাশীতিসহস্রকম্। স্কান্দং শতং তথাচৈকং বামনং দশকীর্ত্তিতম্॥
> কৌর্ম্মং সপ্তদশাখ্যাতং মাৎস্যং তত্তু চতুর্দ্দশ। একোনবিংশৎ সৌপর্ণং ব্রহ্মাণ্ডং দ্বাদশৈব তু॥
> এবং পুরাণসন্দোহশ্চতুর্লক্ষ উদাহৃতঃ। তত্রাষ্টাদশসাহস্রং শ্রীভাগবতমিষ্যতে॥"

এ হিসাবে,—ব্রহ্মপুরাণে দশ-সহস্র, পদ্মপুরাণে পঞ্চপঞ্চাশৎ সহস্র, বিষ্ণুপুরাণে ত্রয়োবিংশতি সহস্র, শিবপুরাণে চতুর্ব্বিংশতি সহস্র, শ্রীমদ্ভাগবতে অষ্টাদশ সহস্র, নারদীয় পুরাণে পঞ্চবিংশতি সহস্র, মার্কণ্ডেয় পুরাণে নয় সহস্র, অগ্নিপুরাণে চতুঃশতাধিক পঞ্চদশ সহস্র, ভবিষ্যপুরাণে পঞ্চশতাধিক চতুর্দ্দশ সহস্র, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে অষ্টাদশ সহস্র, লিঙ্গপুরাণে একাদশ সহস্র, বরাহপুরাণে চতুর্ব্বিংশতি সহস্র, স্কন্দপুরাণে একশতাধিক একাশীতি সহস্র, বামনপুরাণে দশ সহস্র, কূর্ম্মপুরাণে সপ্তদশ সহস্র, মৎস্যপুরাণে চতুর্দ্দশ সহস্র, গরুড়পুরাণে ঊনবিংশতি

সহস্র, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে দ্বাদশ সহস্র,—সর্ব্ব-সাকুল্যে পুরাণ-সমূহে প্রায় চারি লক্ষ শ্লোক নিরূপিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য উপপুরাণে আরও কত শ্লোক নিবদ্ধ আছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? যাহা হউক, এই পুরাণ-উপপুরাণ-সমূহে কি ধর্ম্ম-তত্ত্ব, কি সমাজ-তত্ত্ব, কি প্রত্ন-তত্ত্ব, কি ইতিহাস, কি যুদ্ধ-বিগ্রহ-পদ্ধতি, কি রাজ-নীতি, কি দর্শন, কি বিজ্ঞান, কি শিল্প, কি সাহিত্য,—সকল বিষয়েরই বিশদ চিত্র প্রতিফলিত দেখিতে পাই। পুরাণ-সমূহ পূর্ব্বে যে ভাবে বিরচিত হইয়াছিল, এখন যে তাহা অব্যাহত আছে, সে বিষয়ে সংশয় হয়। প্রথমতঃ, যে পুরাণের যেরূপ শ্লোকসংখ্যা সূচীপত্রে নির্দ্দেশ আছে, গণনায় প্রায়ই তাহার হ্রাস-বৃদ্ধি দেখা যায়। দ্বিতীয়তঃ, এক এক পুরাণে যে যে বিষয় বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া পূর্ব্বাভাষে পরিচয় পাই, পুঙ্খানুপুঙ্খ মিলাইতে গিয়া, তাহার কোনও কোনও বিষয়ে অসামঞ্জস্য লক্ষিত হয়। তৃতীয়তঃ, একই বিষয়ের বর্ণনায় ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে ভিন্ন ভিন্ন মত দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকন্তু, কোনও কোনও পুরাণের বিশেষ বিশেষ বিষয়-পরম্পরার মধ্যে ভাবের, ভাষার ও ঘটনার অনৈক্য দেখিয়া, তৎ-সমুদায় প্রক্ষিপ্ত বা পরবর্ত্তি-কালে সংযোজিত বলিয়া বিশ্বাস হইতে পারে। মহাপুরাণ-সমূহ প্রধানতঃ মহর্ষি বেদব্যাস-প্রণীত বলিয়াই প্রচারিত। কিন্তু সকল পুরাণ যথাযথরূপে আলোচনা করিলে, তদ্বিষয়েও মতভেদ ঘটিবার সম্ভাবনা। অনেকে মনে করেন,—পরবর্ত্তি-কালে লিপিকারগণের লিপি-চাতুর্য্য-বশতঃ বিষয়-পরম্পরার সংযোগ-বিয়োগ-হেতু এরূপ গণ্ডগোল বাধিয়াছে। যাহা হউক, যে অবস্থায়, যে আকৃতিতে, পুরাণ-সমূহ এখন বিদ্যমান, আমরা তাহারই পরিচয় দিবার প্রয়াস পাইতেছি।

প্রথম—ব্রহ্ম-পুরাণ। সূত ও সৌনক ঋষির কথোপকথন-প্রসঙ্গে এই পুরাণ বিরচিত। পূর্ব্ব ও উত্তর—এই দুই ভাগে এই পুরাণ বিভক্ত। পূর্ব্বভাগে সৃষ্টি-প্রসঙ্গ, দেবতা ও অসুরগণের জন্ম-বিবরণ এবং চন্দ্রবংশ ও সূর্য্যবংশের বর্ণনা আছে।

ব্রহ্ম-পুরাণ। সূর্য্যবংশ বর্ণনাকালে এই গ্রন্থে শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র পরিবর্ণিত হইয়াছে; এবং চন্দ্রবংশ বর্ণনা-কালে ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র বর্ণিত আছে। প্রিয়ব্রত, উত্তানপাদ, বেণ, পৃথু, পুরুরবা প্রভৃতি রাজন্যবর্গেরও পরিচয় ইহাতে দৃষ্ট হয়। প্রজাপতি দক্ষের জন্মবৃত্তান্ত, পার্ব্বতীর জন্ম ও বিবাহ,—ব্রহ্ম-পুরাণের অন্যতম বর্ণনার বিষয়। দ্বীপ, বর্ষ, স্বর্গ, নরক ও পাতালের বর্ণনা এবং সূর্য্য প্রভৃতি দেবগণের স্তুতিবাদ, এই খণ্ডে দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর খণ্ডে,—পুরুষোত্তম তীর্থের বিস্তৃত বর্ণনা, শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র ও গুণানুবাদ এবং ধর্ম্ম-তত্ত্ব ও দর্শন-তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। পুরুষোত্তম বর্ণনা-প্রসঙ্গে,—উড়িষ্যা ও জগন্নাথ-দেবের মন্দিরের পুরাতত্ত্ব এবং মন্দির ও নিকুঞ্জসমূহ কিরূপ-ভাবে সূর্য্য শিব ও জগন্নাথ-দেবের নামে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল, তদ্বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ব্রহ্ম-পুরাণের উত্তর খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের যে চরিত্র-চিত্র আছে, বিষ্ণুপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র বর্ণনার সহিত বর্ণে বর্ণে তাহার মিল দৃষ্ট হয়। এই পুরাণের উপসংহার-ভাগে,—যোগ-প্রসঙ্গ উত্থাপিত ও আলোচিত হইয়াছে। যুগ-ধর্ম্ম, তীর্থ-প্রসঙ্গ, গঙ্গার উৎপত্তি, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম, মৃত্যু এবং পিতৃ শ্রাদ্ধ প্রভৃতির কথাও এই পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়।

দ্বিতীয়,—পদ্ম-পুরাণ। একমাত্র স্কন্দ-পুরাণ ভিন্ন এত বড় বৃহৎ পুরাণ আর দৃষ্টিগোচর হয় না। এই মহাপুরাণ পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত;—(১) সৃষ্টি-খণ্ড, (২) ভূমিখণ্ড, (৩) স্বর্গ-খণ্ড, (৪) পাতাল-খণ্ড (৫) উত্তর-খণ্ড। সৃষ্টি-খণ্ডে ভীষ্মের প্রশ্নের উত্তরে পুলস্ত্য ঋষি যে ধর্ম্ম-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন, তাহাই বর্ণিত আছে। পুষ্কর-তীর্থের (আজমীঢ়ে) মাহাত্ম্য-বর্ণনা, ব্রহ্মযজ্ঞ, বেদপাঠ-বিধি, দান-তত্ত্ব, বিবিধ ব্রত-কথা, শৈল-জায়ার বিবাহ, গো-মাহাত্ম্য, তাড়কার উপাখ্যান, কালকেয় প্রভৃতি দৈত্য-বিনাশ-প্রসঙ্গ এবং গ্রহগণের পূজা-পদ্ধতি,—সৃষ্টি-খণ্ডের প্রধান আলোচ্য বিষয়। ভূমি-খণ্ডে,—পৃথিবীর বর্ণনা আছে। পৃথু, নহুষ, যযাতি প্রভৃতি রাজগণের উপাখ্যান; শিবশর্ম্মা, সুব্রত, চ্যবন প্রভৃতির প্রসঙ্গ; পিতৃ-মাতৃ-পূজা, ধর্ম্মের আলোচনা, হুণ্ড প্রভৃতি দৈতবধ-বিবরণ,—ভূমিখণ্ডে আলোচিত হইয়াছে। এই ভূমি-খণ্ডে ভূ-তত্ত্ব ও পুরা-তত্ত্ব সংমিশ্রিত। সুতরাং, এই খণ্ডকে এক সময়ের ইতিহাস ও ভূগোল বলিয়াও অনেকে বর্ণনা করিয়া থাকেন। সূত ও সৌনক ঋষির কথাবার্ত্তা অনুসরণে এই খণ্ড বিরচিত। এই ভূমি-খণ্ড এক শত সাতাইশটী অধ্যায়ে বিভক্ত। সৌনকাদি ঋষির প্রশ্নে ব্যাস-শিষ্য রোমহর্ষণ সূত স্বর্গ-বিবরণ বর্ণন করেন। স্বর্গখণ্ডে তাহাই লিপিবদ্ধ আছে। উনপঞ্চাশটী অধ্যায়ে এই খণ্ড বিভক্ত। স্বর্গখণ্ডের প্রথমে সৃষ্টি-তত্ত্ব পরিবর্ণিত। তৎপরে বহুবিধ তীর্থের মাহাত্ম্য, ধর্ম্মের আলোচনা, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম, যোগ-ধর্ম্ম, ব্রতাদির আলোচনা এবং বিবিধ স্তোত্রে এই খণ্ড পরিপূর্ণ। এই খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে,—ভারতবর্ষের পরিমাণ, নদ-নদী, পর্ব্বত এবং অধিবাসীদিগের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। চতুর্থ অধ্যায়ে,—সমগ্র ভূমণ্ডলের একটী আভাস পাওয়া যায়। এই খণ্ডে,—দিলীপ পৃথু, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি রাজগণের প্রসঙ্গ আছে; অধিকন্তু নিঃসন্তান হওয়ার হেতু এবং সন্তান-লাভের উপায়-প্রসঙ্গে শ্রীধর রাজার উপাখ্যান, লক্ষ্মীব্রত প্রসঙ্গে ভদ্রশ্রবা রাজার উপাখ্যান, ব্রাহ্মণের প্রাণরক্ষা করার ফল-কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে দীননাথ রাজার নরমেধ-যজ্ঞ-বৃত্তান্ত, শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী ব্রত-প্রসঙ্গে চিত্রসেন রাজার উপাখ্যান পরিবর্ণিত। পাতাল-খণ্ড দ্বি-সপ্ততি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। এই খণ্ডে ঋষিগণের নিকট মহাভাগ সূত শ্রীরাম চরিত বর্ণনা করিতেছেন। রামের রাজ্যাভিষেক এবং অশ্বমেধ যজ্ঞ হইতে এই খণ্ডের আরম্ভ। মধ্যে বহু তীর্থের এবং শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রের বর্ণনা আছে। ভরদ্বাজ-আশ্রমে আতিথ্য-গ্রহণান্তে শ্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যাগমন এবং কৌশল্যার মাসিক শ্রাদ্ধকৃত্যাদিতে এই খণ্ডের পরিসমাপ্তি। পাতাল-খণ্ডে 'শেষ নাগ' যে রামচরিত বর্ণনা করিয়াছিলেন, এই খণ্ডে তাহাই বর্ণিত আছে। সে হিসাবে এই খণ্ডকে রামায়ণের একটী অংশ বলা যাইতে পারে। উত্তর খণ্ডে,—শিব ও পার্ব্বতীর কথোপকথন-প্রসঙ্গে বহু ধর্ম্ম-তত্ত্ব বিবৃত। সগর রাজার উপাখ্যান, দেব শর্ম্মার উপাখ্যান জালন্ধর উপাখ্যান, নানা তীর্থ-মাহাত্ম্য, শ্রীভাগবত-মাহাত্ম্য, গীতা-মাহাত্ম্য, ভক্তি-মাহাত্ম্য, বিষ্ণুর সহস্র নাম, শ্রীরামের শতনাম, নৃসিংহ ও মৎস্য প্রভৃতি অবতারের বর্ণনা,—এই খণ্ডে দেখিতে পাওয়া যায়।

পদ্ম-পুরাণ।

তৃতীয়,—বিষ্ণু-পুরাণ। অষ্টাদশ মহাপুরাণের মধ্যে এই পুরাণ সর্ব্বশিষ্ট-সম্মত ও বসম্বাদশূন্য। বিষ্ণুপুরাণ ছয় অংশে বিভক্ত। পরাশরের প্রতি মৈত্রেয়ের প্রশ্ন ও তাহার উত্তরে ধর্ম্ম-তত্ত্ব-ব্যাখ্যায় এই পুরাণ বিরচিত। বিষ্ণু-পুরাণের প্রথম অংশে,—

বিষ্ণু-পুরাণ।

সৃষ্টি-বিবরণ, ধ্রুবোপাখ্যান, বেণ ও পৃথু-রাজার প্রসঙ্গ, প্রচেতস্ ও কণ্ডু মুনির চরিত্র, প্রহ্লাদ-চরিত্র এবং বিষ্ণুর চারি প্রকার বিভূতির বর্ণনা আছে। দ্বিতীয় অংশে,—রাজা প্রিয়ব্রতের পুত্রগণের এবং ভরতবংশের বিবরণ পরিবর্ণিত। জম্বু-দ্বীপ, ভারতবর্ষ, সপ্তপাতাল, সূর্য্যাদি গ্রহ ও সপ্তলোকের সংস্থান-তত্ত্ব, জড়ভরত উপাখ্যান, সৌবীর রাজার প্রসঙ্গ,—দ্বিতীয় অংশের অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয় অংশে,—মন্বন্তর, বেদব্যাস-মাহাত্ম্য, ধর্ম্মাচার-প্রসঙ্গে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের উৎপত্তি এবং শতধনু রাজার উপাখ্যান লিখিত হইয়াছে। চতুর্থাংশে,—বংশ-বিস্তার-কথনে ব্রহ্মা ও দক্ষাদির উৎপত্তি; পুরূরবা ও ইক্ষ্বাকুর জন্ম, কুকুৎস্থ-বংশ, কুশধ্বজ-বংশ, চন্দ্র-বংশ, পুরূরবা ও জহ্নুর বংশ, আয়ু ও ধন্বন্তরির বংশ, ক্ষত্র-বৃদ্ধের বংশ, নহুষ-বংশ, যদু-বংশ, তুর্ব্বসুর-বংশ, দ্রুহ্যুর-বংশ, অনু-বংশ, জন্মেজয়-বংশ পরিবর্ণিত আছে। এই অংশে,—ভবিষ্য রাজবংশ-বর্ণন-প্রসঙ্গে পরিক্ষিৎ-বংশীয়গণের, ইক্ষ্বাকু-বংশীয় ভবিষ্যৎ রাজ-বংশের, বৃহদ্রথ-বংশীয় ভাবী রাজগণের, প্রদ্যোৎবংশীয় ভাবী রাজগণের এবং নন্দ-বংশীয় ভাবী নৃপতিদিগের বংশ-বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই অধ্যায়ে বিশেষ বিশেষ সময়ের রাজগণের পরিচয় পাইতে পারি। ভবিষ্য-রাজ বংশের বিবরণ এই অধ্যায়ে লিখিত আছে দেখিয়া, অনেকে বিষ্ণু-পুরাণকে বৌদ্ধযুগের পরবর্ত্তি-কালের রচিত গ্রন্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে ত্রুটি করেন না। পঞ্চম অংশে,—বসুদেব-দেবকীর বিবাহ হইতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও দেহত্যাগ পর্য্যন্ত জীবন-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে। কলিযুগারম্ভে অর্জ্জুনের প্রতি ব্যাসের উপদেশ এবং পরীক্ষিতের অভিষেক প্রভৃতির বর্ণনায় এই অংশের পরিসমাপ্তি। ষষ্ঠ অংশে,—কলিস্বরূপ এবং কলি-ধর্ম্ম বর্ণন, ত্রিবিধ দুঃখ-নাশের উপায়-পরম্পরা, বিষ্ণু-নাম-স্মরণ-মাহাত্ম্য প্রভৃতির উল্লেখ আছে। বিরাট বিশ্বরূপে ভগবানের অবস্থিতি,—উপনিষদের সেই যে বীজ-তত্ত্ব,—এই বিষ্ণু-পুরাণে প্রহ্লাদের বিষ্ণু-স্তোত্রে কি সুন্দর পরিস্ফুট! প্রহ্লাদ বিষ্ণুর স্তব করিতেছেন;—

নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ নমস্তে পুরুষোত্তম। নমস্তে সর্ব্বলোকাত্মন্ নমস্তে তিগ্মচক্রিণে॥
নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥
ব্রহ্মত্বে সৃজতে বিশ্বং স্থিতৌ পালয়তে পুনঃ। রুদ্ররূপায় কল্পান্তে নমোস্তভ্যং ত্রিমূর্ত্তয়ে॥
দেবা যক্ষা সুরাঃ সিদ্ধা নাগা গন্ধর্ব্ব কিন্নরাঃ। পিশাচা রাক্ষসাশ্চৈব মনুষ্যাঃ পশবস্তথা॥
পক্ষিণঃ স্থাবরাশ্চৈব পিপীলিকা সরীসৃপাঃ। ভূমিরাপো নভো বায়ুঃ শব্দস্পর্শস্তথারসঃ॥
রূপং গন্ধো মনোবুদ্ধিরাত্মা কালস্তথা গুণাঃ। এতেষাং পরমার্থশ্চ সর্ব্বমেতৎ ত্বমচ্যুত॥
বিদ্যাবিদ্যে ভবান্ সত্যমসত্যং ত্বং বিষামৃতে। প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ কর্ম্ম বেদোদিতং ভবান্॥
সমস্তকর্ম্মভোক্তা চ কর্ম্মোপকরণানি চ। ত্বমেব বিষ্ণো সর্ব্বাণি সর্ব্বকর্ম্মফলঞ্চ যৎ॥
ময্যান্যত্র তথা শেষভূতেষু ভুবনেষু চ। তবৈব ব্যাপ্তিরৈশ্বর্য্য গুণসংসূচিকা প্রভো॥
ত্বাং যোগিনশ্চিন্তয়ন্তি ত্বাং যজন্তি চ যজ্বিনঃ। হব্যকব্যভুগেকস্ত্বং পিতৃদেবস্বরূপধৃক্॥
... ...
নমোঽস্তু বিষ্ণবে তস্মৈ নমস্তস্মৈ পুনঃপুনঃ। যত্র সর্ব্বং যতঃ সর্ব্বং যঃ সর্ব্বং সর্ব্বসংশ্রয়ঃ॥

সর্ব্বগত্বাদনন্তস্য স এবাহমবস্থিতঃ। মত্তঃ সর্ব্বমহং সর্ব্বং ময়ি সর্ব্বং সনাতনে॥
অহমেবাক্ষয়ো নিত্যঃ পরমাত্মাত্মসংশ্রয়ঃ। ব্রহ্ম সংজ্ঞোঽহমেবাগ্রে তথান্তে চ পরঃ পুমান্॥"

প্রথমে প্রহ্লাদ, তাঁহাকে বিশ্বের সৃষ্টি-কর্ত্তা বলিয়া নমস্কার করিলেন; তাঁহাকে পালন-কর্ত্তা বলিয়া নমস্কার করিলেন; তাঁহাকে সংহার-কর্ত্তা বলিয়া নমস্কার করিলেন। কিন্তু তার পর, ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে আত্ম-রূপে দর্শন করিলেন। বলিলেন,—'তিনিই আমি, আমা হইতেই সমস্ত উৎপন্ন; আমিই সর্ব্বরূপে বর্ত্তমান; সনাতন-রূপ আমাতেই সমস্ত লয়প্রাপ্ত হইবে।" বেদান্তের সেই "অহংজ্ঞান"—উপনিষদের সেই 'সোঽহং' চিন্তা,—প্রহ্লাদের প্রাণে, প্রহ্লাদের স্তোত্রে, কি সুন্দর পরিস্ফুট! বিষ্ণুপুরাণ গৃহধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিতে করিতে, এই 'অহং-তত্ত্ব' ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

চতুর্থ—শিবপুরাণ। শিবপুরাণ প্রকাণ্ড গ্রন্থ। এই মহাপুরাণের এক স্থলে লিখিত আছে,—'ইহা লক্ষ শ্লোকযুক্ত এবং দ্বাদশ সংহিতায় বিভক্ত।" এই পুরাণে আরও দেখিতে পাওয়া যায়,—মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রথমতঃ শতকোটী শ্লোকে পুরাণ-সমূহ রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষে মনুষ্যগণকে অল্পায়ু ও অল্পবুদ্ধি হইতে দেখিয়া তদন্তর্গত চারি লক্ষ মাত্র শ্লোক ইহ-সংসারে প্রচার করেন। তদনুসারে লক্ষ শ্লোকাত্মক শিবপুরাণের চতুর্বিংশতি সহস্র মাত্র শ্লোক জন-সমাজে প্রচারিত হয়। শিবপুরাণ—দুই খানি। তন্মধ্যে ব্রহ্মবৈবর্ত্তের নির্দ্দেশানুসারে "চতুর্ব্বিংশতি সহস্রং শৈবমত্র নিরূপিতং" চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোকে নিবদ্ধ শিবপুরাণই মহাপুরাণ বলিয়া পরিচিত। শিবপুরাণ অধুনা ছয় সংহিতায় বিভক্ত; জ্ঞান-সংহিতা, বিদ্যেশ্বর-সংহিতা, কৈলাশ-সংহিতা, সনৎকুমার-সংহিতা, বায়বীয়-সংহিতা (পূর্ব্ব ভাগ ও উত্তর ভাগ) এবং ধর্ম্ম-সংহিতা। প্রধানতঃ, শিবতত্ত্ব ও শিব-মাহাত্ম্য পরিবর্ণনই এই পুরাণের উদ্দেশ্য। কিন্তু তদুপলক্ষে পুরাণের আলোচ্য অন্যান্য সকল কথাই ইহাতে পরিবর্ণিত। নৈমিষারণ্য-বাসী মুনিগণের প্রশ্নের উত্তরে ব্যাস-শিষ্য সূত এই পুরাণের বিষয় ব্যক্ত করেন। ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি ও ঋষি-আদির সৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়া পার্ব্বতীর তপস্যা, শিবের বিবাহ, কার্ত্তিকেয়ের জন্ম, গণেশের চরিত্র ও শিব কর্ত্তৃক গণেশের শিরশ্ছেদন প্রসঙ্গ, কাশী-মাহাত্ম্য, শিবপূজাবিধি, শিবরাত্রি-ব্রত-মাহাত্ম্য, লিঙ্গপূজা, শিবনাম-কীর্ত্তন-ফল প্রভৃতি বিবিধ-তত্ত্বের আলোচনায় শিব-মাহাত্ম্য কীর্ত্তনেই এই পুরাণ পরিপূর্ণ। এই পুরাণের শেষ অংশে বিবিধ পাপ-ফল-কথন, ধর্ম্ম-প্রসঙ্গ, অন্নদান-জলদান-পুরাণ-পাঠ প্রভৃতির মাহাত্ম্য এবং প্রজাপতি-কৃত সৃষ্টি-প্রক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে পৃথু-চরিত, অঙ্গ-বংশের বিবরণ, সূর্য্য-বংশের বিবরণ, সত্যব্রত ও সগর রাজার উপাখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের জ্ঞান-সংহিতায় শিবের সহস্র নাম এবং ধর্ম্ম-সংহিতায় শিবের অষ্টোত্তর সহস্র নাম পরিকীর্ত্তিত হইয়া ছে। দুই স্থলে দ্বিবিধ-ভাবে নাম-কীর্ত্তনে কোথাও বর্ণে বর্ণে মিল আছে, আবার কোথাও আদৌ মিল নাই। গণেশের শিরশ্ছেদন এবং গজাস্য-যোজনার কারণ এই শিবপুরাণের জ্ঞান-সংহিতার ত্রয়োস্ত্রিংশ-চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়ে এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণান্তর্গত গণেশ-খণ্ডে অষ্টাদশ ও বিংশ অধ্যায়ে রূপান্তরে দৃষ্ট হয়।

পঞ্চম—লিঙ্গ-পুরাণ। শিব-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন এবং লিঙ্গ-পূজা-পদ্ধতি-প্রচার,—এই পুরাণের সারভূত। এই পুরাণ—উত্তর ও পূর্ব্ব দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে,—সৃষ্টি-বিবরণ, লিঙ্গের উদ্ভব ও পূজা প্রসঙ্গ, দক্ষযজ্ঞ, মদনভস্ম ও শিবের বিবাহ, বরাহ-চরিত্র, নৃসিংহ-চরিত্র এবং সূর্য্য ও সোম বংশের বর্ণনা আছে। উত্তর ভাগে,—বিষ্ণু-মাহাত্ম্য, শিব-মাহাত্ম্য, স্নান-দানাদি-মাহাত্ম্য এবং গায়ত্রী-মাহাত্ম্য প্রভৃতি বিষয় কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই পুরাণে অষ্টাবিংশতি অবতারের কথা এবং শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব পর্য্যন্ত হিন্দু-রাজগণের বংশ-বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। এই পুরাণের মতে,—প্রলয়ের পরে অগ্নিময় লিঙ্গের উৎপত্তি হয়, এবং তাহা হইতে বেদাদি শাস্ত্র-গ্রন্থ উদ্ভূত হইয়াছিল; ব্রহ্মা ও বিষ্ণু পর্য্যন্ত সেই লিঙ্গের জ্যোতিঃতেই জ্যোতির্ম্ময় হইয়াছিলেন। অনেকের বিশ্বাস, এই লিঙ্গ-পুরাণের অনুসরণেই এদেশে শিব-লিঙ্গ-নির্ম্মাণে লিঙ্গ-মূর্ত্তি-পূজা-পদ্ধতির প্রবর্ত্তনা হইয়াছে।

লিঙ্গ-পুরাণ।

ষষ্ঠ—গরুড় পুরাণ। পূর্ব্ব-খণ্ড ও উত্তর-খণ্ড—এই দুই ভাগে গরুড়-পুরাণ বিভক্ত। সৃষ্টি-কথা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রজাপতির উৎপত্তি, সূর্য্য-পূজা, বিষ্ণু-পূজা, লক্ষ্মীপূজা, শিব-পূজা, পাদুকা-পূজা, গোপাল-পূজা, হয়গ্রীব-পূজা, দুর্গা-পূজা প্রভৃতি পূজা-পদ্ধতি; দীক্ষা-বিধি, প্রায়শ্চিত্ত-বিধি, তর্পণ-বিধি, সন্ধ্যা-বিধি, শ্রাদ্ধ-বিধি, স্নান-বিধি ও নানাবিধ ব্রত-মাহাত্ম্য; রত্নোৎপত্তি-কথন ও রত্ন-পরীক্ষা; গৃহধর্ম্ম, যতিধর্ম্ম, গয়াকৃত্য; সূর্য্য-বংশ, চন্দ্র-বংশ, জন্মেজয়-বংশ; রামায়ণ-কথন, হরিবংশ-কথন ও ভরত-কথন এবং আয়ুর্ব্বেদ-কথনে সর্ব্বরোগ-নিদান; বিষ্ণুধ্যান, নারায়ণ-ধ্যান; নৃসিংহ-স্তব; ব্যাকরণ-নিয়ম, ছন্দ-শাস্ত্র; এমন কি,—স্ত্রী-বশীকরণ ও মশকবারণাদি কথন পর্য্যন্ত,—গরুড় পুরাণে বর্ণিত রহিয়াছে। নরক-বর্ণন, প্রেত-বিবরণ, সপিণ্ডকরণের বিধি-ব্যবস্থা প্রভৃতিও ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। গরুড় পুরাণের মতে—অবতার-সংখ্যা একবিংশতি। ভাগবতে দেখিতে পাই, এই পুরাণের শ্লোক-সংখ্যা উনবিংশতি সহস্র। কিন্তু ইহার প্রথম অধ্যায়ে লিখিত আছে,—এই পুরাণ অষ্টশতাধিক অষ্টসহস্র শ্লোকে পরিপূর্ণ।

গরুড়-পুরাণ।

"অষ্টৌ শ্লোক-সহস্রাণি তথা চাষ্টৌ শতানি চ। পুরাণং গারুড়ং ব্যাসঃ পুরাসৌ মোহব্রবীদিদম্॥"

সুতরাং কি ভাবে, কি অবস্থায় এই পুরাণ অবস্থিত, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এই পুরাণে তন্ত্রের বহু মন্ত্র এবং আয়ুর্ব্বেদের বহু ঔষধ-প্রকরণ দৃষ্ট হয়। রত্ন-পরীক্ষা প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে,—"হিমালয়, মাতঙ্গ পর্ব্বত, সুরাষ্ট্র, পুণ্ড্র, কলিঙ্গ, কোশল, বেণ্বাতট ও সৌবীর দেশ—এই অষ্টস্থান হীরকের আকর। হিমগিরি-জাত হীরক ঈষৎ তাম্রবর্ণ, সৌবীর-দেশজ হীরক নীলপদ্ম ও মেঘের ন্যায় আভা-সম্পন্ন, সুরাষ্ট্র-দেশোৎপন্ন হীরক তাম্রবর্ণ, কলিঙ্গ-দেশজ হীরক সুবর্ণবৎ মনোহর কান্তিবিশিষ্ট, কোশল-দেশীয় হীরক পীতবর্ণ, পুণ্ড্রক-দেশজ হীরক শ্যামবর্ণ, মতঙ্গ-দেশজ হীরক ঈষৎ পীতপ্রভ।..... ক্ষার-দ্বারা উল্লেখন করিয়া হীরকের পরীক্ষা করিতে হয়। পৃথিবীতে যত প্রকার রত্ন ও লৌহ প্রভৃতি ধাতু আছে, হীরক সেই সমস্তকেই বিলেখন করিতে পারে; কিন্তু অন্য কোনও রত্ন বা ধাতু হীরককে বিলেখন করিতে পারে না। সর্ব্ব-প্রকার রত্নের গুরুতাই গৌরবের

কারণ। কিন্তু হীরক যতই লঘু হইবে, ততই তাহার প্রাধান্য জানা যাইবে।" এইরূপ মুক্তা-প্রসঙ্গে, মুক্তার উৎপত্তি ও মূল্য প্রভৃতির পরিচয় এই পুরাণে পাওয়া যায়। সূর্য্যাদি প্রমাণ-সংস্থান কীর্ত্তন, জ্যোতিঃসার কীর্ত্তন, লগ্ন-মান-কথন, প্রশ্নগণনা এবং নানা নীতিসার,—এই গরুড় পুরাণে পরিবর্ণিত রহিয়াছে। চাণক্যের বহু নীতি-কথা এই পুরাণের পূর্ব্বখণ্ডে অষ্টাধিকশততম অধ্যায় হইতে পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায়ে দৃষ্ট হয়। বিষ্ণুশর্ম্মার হিতোপদেশ গ্রন্থেও সেই সকল নীতি-কথা দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন,—

"যো ধ্রুবাণি পরিত্যজ্য অধ্রুবাণি নিষেবতে। ধ্রুবাণি তস্য নশ্যন্তি অধ্রুবং নষ্টমেব চ ॥"

"মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ। আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ ॥"

রাজ-ধর্ম্ম-পালন সম্বন্ধে এই পুরাণের নীতিসার-প্রসঙ্গে কি সুন্দর দৃষ্টান্তই উক্ত হইয়াছে।

"পুষ্পাৎ পুষ্পং বিচিনুয়ান্মূলচ্ছেদং ন কারয়েৎ। মালাকার ইবারণ্যে ন যথাঙ্গারকারকঃ ॥
দোগ্ধারঃ ক্ষীর-ভুঞ্জানা বিকৃতং তন্ন ভুঞ্জতে। পররাষ্ট্রং মহীপালৈর্ভোক্তব্যং ন চ দূষয়েৎ ॥
নোধশ্ছিন্দ্যাত্তু যো ধেন্বাঃ ক্ষীরার্থী লভতে পয়ঃ। এবং রাষ্ট্রং প্রয়োগেণ পীড্যমানং ন বর্দ্ধয়েৎ ॥"

মালাকার পুষ্প-বৃক্ষ হইতে পুষ্প গ্রহণ করে; কিন্তু অঙ্গারকারীর ন্যায় বৃক্ষের মূলোচ্ছেদ করে না। রাজাও তদ্রূপ প্রজার অনিষ্ট না করিয়া, তাহার নিকট যথাসম্ভব কর-গ্রহণ করিবেন। দোগ্ধা যেমন দুগ্ধ পান করে, কিন্তু তাহা বিকৃত করে না; রাজা তেমনি কর-গ্রহণ করিবেন; কিন্তু অত্যাচারাদি-দোষে রাজ্য দূষিত করিবেন না। দুগ্ধার্থী যেমন দুগ্ধ দোহন করে, কিন্তু গাভীর স্তনঃচ্ছেদন করে না; রাজাও সেইরূপ পর-রাজ্যকে শাসনে রাখিবেন, কিন্তু তাহার উচ্ছেদ-সাধন করিবেন না।

সপ্তম—নারদীয়-পুরাণ। এই পুরাণ চারি পাদে বিভক্ত। প্রথম-পাদ,—মোক্ষ-ধর্ম্ম, মোক্ষোপায়, দীক্ষা-গ্রহণ, বিষ্ণু-শিব-শক্তির বিবরণ, বিবিধ স্তোত্র মন্ত্র প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ।

নারদ-পুরাণ।

দ্বিতীয় পাদে,—গাণপত্য, সৌর, বৈষ্ণব ও শৈব—চারি সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম-কথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তৃতীয় পাদে,—নারদ ও সনৎকুমারের কথোপকথনচ্ছলে পুরাণ-প্রসঙ্গ, দান-ধর্ম্ম ও ব্রত-বিবরণ লিখিত আছে। চতুর্থ ভাগে,—কাশী, পুরুষোত্তম, প্রয়াগ, হরিদ্বার, কামাখ্যা প্রভৃতি বহু তীর্থের মাহাত্ম্য-কথা এবং বশিষ্ঠ, মান্ধাতা, গৌতম ও মোহিনীর উপাখ্যান প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। বিষ্ণুর প্রাধান্য-কীর্ত্তনই—এই পুরাণের মুখ্য লক্ষ্য। শ্রীহরির উপাসনায় অভীষ্ট-সিদ্ধির বিষয়ে বিবিধ উপাখ্যানের অবতারণায় সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে। অধুনা দুই খানি নারদীয় পুরাণ প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে একখানি নারদীয়-পুরাণ এবং অপর-খানি বৃহন্নারদীয়-পুরাণ নামে অভিহিত হয়। মূলতঃ উভয় পুরাণেরই উদ্দেশ্য অভিন্ন।

অষ্টম—শ্রীমদ্ভাগবত। অনেকের মতে, শ্রীমদ্ভাগবত শ্রেষ্ঠ পুরাণ। বৈষ্ণব-সম্প্রদায় শ্রীমদ্ভাগবতকে পরম ভক্তি-সহকারে পূজা করিয়া থাকেন। এই মহাপুরাণের রচনা এতই

শ্রীমদ্ভাগবত।

সুন্দর ও এতই মধুর যে, সাহিত্য-জগতে ইহা শ্রেষ্ঠ-স্থান অধিকার করিয়া আছে। শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য-প্রচার এবং হৃদয়ে ধর্ম্ম-ভাবের উন্মেষণ,—শ্রীমদ্ভাগবতের প্রধান উদ্দেশ্য। এই শ্রীমদ্ভাগবতের দশম-স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের লীলা-মাধুরী বড়ই মনোমুগ্ধকর। বৈষ্ণব-মাত্রেই সে মাধুর্য্য-রসে আত্মহারা

হইয়া আছেন। শ্রীমদ্ভাগবত দ্বাদশ স্কন্ধে বিভক্ত। প্রথম স্কন্ধে,—ঋষিগণের প্রশ্নের উত্তরে লোমহর্ষণ-নন্দন উগ্রশ্রবা সূত ভগবদ্‌গুণ-বর্ণন-পূর্ব্বক ভগবানের অবতার-গ্রহণ-প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। নারদের পূর্ব্ব-জন্ম, যুধিষ্ঠিরের রাজ্যলাভ, শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা-গমন, যুধিষ্ঠিরাদির স্বর্গারোহণ এবং পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ প্রভৃতি এই প্রথম স্কন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় স্কন্ধে,—সৃষ্টি-বর্ণন, ভাগবত-বিষয়ে পরীক্ষিতের প্রশ্নে শুকদেব ভাগবদারম্ভ করিয়াছেন। তৃতীয় স্কন্ধে,—শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-চরিত্র-বর্ণন, সৃষ্টি-তত্ত্ব, বরাহ-রূপে ভগবান কর্ত্তৃক জলমগ্না ধরিত্রীর উদ্ধার, কপিলের জন্ম ও সাঙ্খ্য-যোগ-কথন প্রভৃতি বিবিধ বিষয় পরিবর্ণিত। চতুর্থ স্কন্ধে,—মনু-কন্যাগণের বংশ-বর্ণন, সতীর দেহত্যাগ, ধ্রুব-চরিত্র, বেণ, পৃথু, পুরঞ্জন ও প্রচেতা-দিগের চরিত্র-বর্ণন প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। এই অংশ হইতেই উপাখ্যানের আরম্ভ। পঞ্চম স্কন্ধে,—প্রিয়ব্রত, অগ্নিধ্র, জড়ভরত, এবং ভরত-বংশীয় নরপতিগণের বৃত্তান্ত লিখিত আছে। বর্ষ-বর্ণন ও ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠত্ব, জ্যোতিষ-তত্ত্ব ও পাতালের বিবরণ—এই স্কন্ধের অন্তর্ভুক্ত। ষষ্ঠ স্কন্ধে,—অজামিলের জন্ম ও চরিত্র, দক্ষ-কাহিনী, বৃত্রাসুরের বিবরণ এবং সবিতা প্রভৃতি দেবগণের বংশ-কীর্ত্তন হইয়াছে। সপ্তম স্কন্ধে,—হিরণ্যকশিপু ও প্রহ্লাদের প্রসঙ্গে দেশকালাদিভেদে বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম-মাহাত্ম্য পরিবর্ণিত আছে। অষ্টম স্কন্ধে,—মন্বন্তর-বর্ণন, বামন কর্ত্তৃক বলির নিকট ত্রিপাদ-ভূমি-প্রার্থনা, বলির পাতাল-প্রবেশ ও মৎস্য-চরিত-বর্ণন পরিদৃষ্ট হয়। নবম স্কন্ধে,—মনু-পুত্রের বংশ-বৃত্তান্ত, অম্বরীষ-বংশ, সগর-বংশ, শ্রীরাম-তনয় কুশের বংশ, সোম-বংশ, বিশ্বামিত্র-বংশ, পুরু-বংশ, যদুবংশ প্রভৃতির বিবরণ লিখিত আছে। ভগীরথের গঙ্গা-আনয়ন, শ্রীরামচন্দ্রের যজ্ঞানুষ্ঠান, পরশুরামের কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন-বধ প্রভৃতি এই স্কন্ধের অন্তর্ভুক্ত। দশম স্কন্ধ,—শ্রীকৃষ্ণের লীলা-প্রসঙ্গে পরিপূর্ণ। কংস-কারাগারে দেবকীর গর্ভে ভগবানের আবির্ভাব এবং বাল্য-ক্রীড়া হইতে আরম্ভ করিয়া কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ব্রজলীলা-সংক্রান্ত সমস্ত তত্ত্ব এই স্কন্ধেই পরিবর্ণিত রহিয়াছে। গোপীগণের বস্ত্রহরণ, রাসলীলা, মথুরা-বাস, রুক্মিণী-হরণ, প্রভৃতি এই স্কন্ধের অন্তর্গত। একাদশ স্কন্ধে,—ধর্ম্মালোচনা, মুক্তির প্রসঙ্গ, যদুবংশ-ধ্বংস; দ্বাদশ স্কন্ধে,—ভবিষ্য-রাজবংশ-বর্ণন ও কলি-ধর্ম্ম-কথন। এই দ্বাদশ স্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ে শ্রীমদ্ভাগবদালোচ্য সমস্ত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের কোনও কোনও অংশ গদ্যে বিরচিত এবং ইহার ভাষা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বোধ্য। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবানের ষোড়শ অবতারের বর্ণনা আছে। ভাগবত—ভক্তি-প্রধান গ্রন্থ। মহর্ষি নারদের অনুরোধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুণানুকীর্ত্তন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছিল। মহর্ষি বেদব্যাস পুরাণাদি বহু শাস্ত্র গ্রন্থ এবং মহাভারতাদি মহাকাব্য-গ্রন্থ প্রণয়ন করিলে, দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে বলিলেন,—"তুমি ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সকল বিষয়েরই বর্ণনা করিয়াছ; তুমি বহু পুরাণ ও কাব্য-গ্রন্থ রচনা করিয়াছ; কিন্তু ভগবানের যশোবর্ণন ভিন্ন তাঁহার পরিতোষ হয় না; যেহেতু,—

"ন যদ্বচশ্চিত্রপদং হরের্যশো জগৎপবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ।
তদ্বায়সং তীর্থমুশন্তি মানসা ন যত্র হংসা নিরমন্ত্যুশিক্‌ক্ষয়াঃ॥

তদ্বাগ্বিসর্গো জনতাঘবিপ্লবো যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি।
নামান্যনন্তস্য যশোঽঙ্কিতানি যৎ শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ॥"

'মনোহর পদাবলী-সম্বলিত বাক্য-রচনা বৃথা, যদি তাহাতে শ্রীহরির গুণানুকীর্ত্তন না হয়। রাজহংসগণ বায়স-সেবিত অপরিষ্কৃত জলাশয় পরিত্যাগ করিয়া নির্ম্মল স্বচ্ছ সরোবরে বিহার করে; ভগবদ্ভক্ত পরমহংসগণ সেইরূপ বাক্যচ্ছটাপূর্ণ রচনায় বিতৃষ্ণা প্রদর্শন পূর্ব্বক হরিগুণানুবাদপূর্ণ রচনার প্রতি আকৃষ্ট হন। যে গ্রন্থের প্রতি শ্লোকে ভগবানের গুণানুকীর্ত্তন আছে, সেই গ্রন্থই জনসাধারণের পাপ-নাশ করিতে সমর্থ; যেহেতু, সেই গ্রন্থ পাঠে সাধুগণ ভগবানের নাম শ্রবণ, উচ্চারণ ও কীর্ত্তন করিবার অবসর প্রাপ্ত হন।' শ্রীমদ্ভাগবতের মতে,—ভক্তিই প্রধান, ভক্তি হইতেই জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ভাগবতকার তাই ভগবৎ-কার্য্যকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

"যদত্র ক্রিয়তে কর্ম্ম ভগবৎ পরিতোষণম্। জ্ঞানং যত্তদধীনংহি ভক্তিযোগ সমন্বিতম্॥"

ব্রহ্মা কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব-প্রসঙ্গে কৃষ্ণের রূপ কি সুন্দর পরিবর্ণিত! কবিত্ব ও ভক্তির মধুর স্রোতে—ভাবের ও ভাষার তরতর প্রবাহে—তাহা পরিপ্লুত। ব্রহ্মা বলিতেছেন,—

"নৌমীড্য তেঽভ্রবপুষে তড়িদম্বরায় গুঞ্জাবতংসপরিপিচ্ছলসন্মুখায়।
বন্যস্রজে কবলবেত্রবিষাণবেণুলক্ষ্মশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায়॥
অস্যাপি দেববপুষো মদনুগ্রহস্য স্বেচ্ছাময়স্য ন তু ভূতময়স্য কোঽপি।
নেশে মহি ত্ববসিতুং মনসান্তরেণ সাক্ষাৎ তবৈব কিমুতাত্মসুখানুভূতেঃ॥
... ...
শ্রেয়ঃস্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবল বোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥"

'হে পূজ্য! তোমাকে আমি নমস্কার করি। তোমার নবনীরদ-সদৃশ শ্যাম-কলেবরে পীতবসন বিদ্যুদ্বৎ শোভা পাইতেছে। গুঞ্জাবৃত কর্ণভূষণ এবং ময়ূরপুচ্ছ তোমার মুখমণ্ডলের শোভা সম্পাদন করিয়াছে। তোমার গলদেশে বনমালা কি সুন্দর দেখাইতেছে! ইত্যাদি। হে বিভো! তোমার ভক্তি-পথে মঙ্গল-স্রোত প্রবাহিত। তৎপথ-পরিত্যাগে যাহারা কেবল জ্ঞানমার্গানুসারী, তাহারা কষ্টই পাইয়া থাকে। যাহারা ক্ষুদ্রপ্রমাণ ধান্য পরিত্যাগ করিয়া, বৃহত্তর দর্শনে তুষের প্রতি অবঘাত করে, তাহারা কেবল বৃথাই ক্লেশ পায়।' এইরূপ, কবিত্বের মধ্যে ভক্তির প্রাধান্য কীর্ত্তনেই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রেষ্ঠস্থানীয়।

নবম—অগ্নি-পুরাণ। সৌনকাদি ঋষির প্রশ্নোত্তরে সূত এই পুরাণ বর্ণন করিতেছেন। তিনি বলেন,—"কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস এই পুরাণের বিষয় বশিষ্ঠের নিকট শ্রবণ করিয়াছিলেন, এবং বশিষ্ঠ অগ্নির নিকট হইতে ইহা শ্রবণ করেন।"

অগ্নি-পুরাণ।

অগ্নি-কর্ত্তৃক ইহা সর্ব্বপ্রথম পরিবর্ণিত হইয়াছিল বলিয়াই এই পুরাণ অগ্নি-পুরাণ নামে অভিহিত হয়। অন্যান্য পুরাণের ন্যায়, এই পুরাণে,—মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহাদি অবতারের বিবরণ; রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ প্রভৃতির স্থূল স্থূল আখ্যায়িকা; নানাবিধ পূজা ও ব্রত-পদ্ধতি; এবং তীর্থ-মাহাত্ম্য ও মন্ত্র-মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। অধিকন্ত, যুদ্ধ বিদ্যা, ধনুর্ব্বিদ্যা, ও আয়ুর্ব্বিদ্যা, সাহিত্য-বিদ্যা, পশ্বাদির চিকিৎসা-বিদ্যা,

ব্যাকরণ, ছন্দ-প্রকরণ, রাজ-ধর্ম্ম, রত্ন-নিরূপণ প্রভৃতি নানা বিষয়, এই অগ্নি-পুরাণে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। অগ্নি-পুরাণের ব্যাকরণ-অংশে শব্দরূপ ধাতুরূপ পর্য্যন্ত পরিবর্ণিত আছে। এই পুরাণের কিয়দংশ গদ্যে রচিত। ইহাতে তন্ত্রের বহু বীজ-মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। যুদ্ধের অস্ত্রাদি নির্ম্মাণ-প্রণালী এবং কিরূপ-ভাবে যুদ্ধ করিবে, এই পুরাণে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। নগর, গ্রাম ও দুর্গাদি নির্ম্মাণ বিষয়ে এই পুরাণে যে উপদেশ আছে, তাহাতে তাৎকালিক বিশেষ সমৃদ্ধিশালী রাজ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। অধুনা যেরূপভাবে দশ অবতারের মূর্ত্তি প্রস্তুত হইয়া থাকে, এই পুরাণান্তর্গত দশ অবতার বর্ণনার সহিত তাহার বিশেষ সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়। অন্যান্য দেবদেবীর আকৃতিও এই পুরাণে বিশদভাবে পরিবর্ণিত। অগ্নি-পুরাণের সহিত অমরকোষ অভিধানের বহু অংশের সাদৃশ্য দেখিয়া, অনেকে মনে করেন,—অগ্নি-পুরাণ হইতে অমরকোষের তত্তৎ অংশ সঙ্কলিত হইয়াছে।

দশম—স্কন্দ-পুরাণ। এই পুরাণ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এ পর্য্যন্ত এই পুরাণ একত্র সংগৃহীত হইয়াছে কিনা, তদ্বিষয়ে সন্দেহ জন্মে। স্কন্দ-পুরাণ প্রধানতঃ ছয়টী খণ্ডে বিভক্ত,—কাশী-খণ্ড, উৎকল-খণ্ড, প্রভাস-খণ্ড, মহেশ্বর-খণ্ড, বৈষ্ণব-খণ্ড এবং ব্রহ্ম-খণ্ড। এই ছয় খণ্ডকে ছয় খানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলিলেও বলা যাইতে পারে। সেই স্বাতন্ত্র্য-নিবন্ধন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা এই পুরাণ বিরচিত হইয়াছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। স্কন্দ-পুরাণান্তর্গত কাশীখণ্ডে,—কাশী-ধামের সমস্ত তীর্থের মাহাত্ম্য যেরূপ-ভাবে পরিবর্ণিত আছে, সেরূপ আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। কাশী-বর্ণন উপলক্ষে গঙ্গা-মহিমা, গঙ্গার সহস্র নাম, সদাচার, স্ত্রী-লক্ষণ এবং কাশীর পৌরাণিক ইতিহাস ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। দিবোদাস নৃপতির প্রতাপ-বর্ণন, পতিব্রতার আখ্যান, শিবশর্ম্মার নির্ব্বাণ-প্রাপ্তি প্রভৃতি এই খণ্ডে বিশেষ কৌতূহল-প্রদ। উৎকল-খণ্ডে,—শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মাহাত্ম্য ও পূজা-পদ্ধতি পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। উৎকল দেশের বিবরণ, পুরী-প্রতিষ্ঠা, পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রের পরিমাণ-নির্দ্দেশ, পুণ্ডরীক ও অম্বরীষের জগন্নাথ-দর্শন, ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার যজ্ঞানুষ্ঠান ও স্বপ্নে ভগবদ্দর্শন-লাভ, পরিশেষে রাজা কর্তৃক মূর্ত্তি-নির্ম্মাণোদ্যোগ, দারুময় মূর্ত্তিতে জগন্নাথ-দেবের আবির্ভাব, ইন্দ্রদ্যুম্নের বরলাভ, স্নানযাত্রা, রথযাত্রা প্রভৃতি পুরুষোত্তম-সংক্রান্ত যাবতীয় জ্ঞাতব্য-তত্ত্ব উৎকল-খণ্ডে স্থানলাভ করিয়াছে। কাশীখণ্ড এবং উৎকল-খণ্ড পাঠ করিলে, স্বভাবতঃই লোকের মন তীর্থ-দর্শনে আকৃষ্ট হয়। প্রভাসখণ্ডে,—প্রভাস-তীর্থের মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত আছে। মহেশ্বর-খণ্ডে,—শিবের মাহাত্ম্য-বর্ণন উপলক্ষে দক্ষ-যজ্ঞ, লিঙ্গ-পূজা-মাহাত্ম্য, ইন্দ্রদ্যুম্ন ও দমনক প্রভৃতির উপাখ্যান এবং হর-গৌরী-লীলা বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে। বাসুদেবের মহিমা এবং পাণ্ডবদিগের উপাখ্যান এই খণ্ডে দেখিতে পাওয়া যায়। বৈষ্ণব-খণ্ডে,—প্রধানতঃ বিষ্ণুর মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত। মার্কণ্ডেয়, অম্বরীষ, ইন্দ্রদ্যুম্ন, জৈমিনি, নীলকণ্ঠ, নৃসিংহ প্রভৃতির নানা উপাখ্যানে, তীর্থ-মাহাত্ম্য, ব্রত-মাহাত্ম্য প্রভৃতি নানা মাহাত্ম্য-তত্ত্বে, এই বৈষ্ণব-খণ্ড পরিপূর্ণ। ফুল, ফল, তুলসীদল ও নৈবেদ্য প্রভৃতির দ্বারা দেব-পূজায় সুফল-প্রাপ্তির বিষয় এই পুরাণে বিশদভাবে পরিবর্ণিত আছে। ব্রহ্ম-খণ্ডে,—

স্কন্দ-পুরাণ।

দাক্ষিণাত্যের সেতুবন্ধ-রামেশ্বর প্রভৃতি বহু তীর্থের পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীরাম-চরিত্র, বিষ্ণু পূজা-মাহাত্ম্য, শালগ্রাম নিরূপণ, উমা-মহেশ্বর-ব্রত, এবং নানাবিধ দান-ধর্ম্ম-ব্রতের বিষয় ইহাতে উল্লিখিত আছে। স্কন্দ-পুরাণের বিশেষত্ব,—এই পুরাণে একদিকে শিবের মাহাত্ম্য, অন্যদিকে বিষ্ণুর মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত; একদিকে কাশী-খণ্ডে বিশ্বেশ্বর অন্ন-পূর্ণার প্রভাব, অন্যদিকে উৎকল-খণ্ডে জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রার মহিমা কীর্ত্তন। একই পুরাণে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের উন্মেষ দেখিয়া, অনেকে ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ের রচনা বলিয়া মনে করেন। মতান্তরে আবার দেখিতে পাওয়া যায়,—স্কন্দ-পুরাণে 'অবন্তী-খণ্ড' নামে আর একখানি খণ্ড আছে। তাহাতে বহু তীর্থের এবং বহুতর বিষ্ণুর প্রাধান্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। অধিক সংখ্যক তীর্থের মহিমা বর্ণিত আছে বলিয়া, স্কন্দ-পুরাণকে কেহ কেহ তীর্থের পুরাণ নামেও অভিহিত করেন।

একাদশ—ভবিষ্য-পুরাণ। ইহা পাঁচটী পর্ব্বে বিভক্ত। প্রথম পর্ব্বে,—সৃষ্টি-প্রক্রিয়া, তিথি-মাহাত্ম্য এবং বিষ্ণু, শিব ও সূর্য্য পূজার প্রসঙ্গ আছে। দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ পর্ব্বে,—যথাক্রমে শিব-মাহাত্ম্য, বিষ্ণু-মাহাত্ম্য, সূর্য্য-মাহাত্ম্য বিশদভাবে পরিবর্ণিত। পঞ্চম পর্ব্বে, স্বর্গের বর্ণনা। এই পুরাণে সর্ব্ব-ধর্ম্মের সামঞ্জস্য-বিধানের চেষ্টা হইয়াছে বলিয়া, অনেকের বিশ্বাস,—ইহাতে সকল দেবতা অপেক্ষা ব্রহ্মের প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠার জন্যই পুরাণ-কার প্রয়াস পাইয়াছেন: এই পুরাণে শাকদ্বীপ-বাসী সূর্য্যোপাসক 'মগ' জাতির উল্লেখ দেখিয়া, পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ মনে করেন,—"ইরাণ (পারস্য) দেশীয় অগ্নি-উপাসকদিগের সম্বন্ধে উহা প্রযুক্ত হইয়াছিল।" * অন্যান্য পুরাণের ন্যায়, এই পুরাণে প্রাচীন-রাজগণের এবং চন্দ্র-সূর্য্যাদি বংশের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। পরন্তু, আজিকালি যে ভবিষ্য-পুরাণ বোম্বাই-প্রদেশ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে আবার মোগল-বাদসাহ আকবরের কথা, কলিকাতা রাজধানীর বর্ণনা এবং ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম-প্রচারক সুপ্রসিদ্ধ কেশবচন্দ্র সেনের নামোল্লেখ আছে। ভবিষ্য-পুরাণে এই সকল আধুনিক বিষয়ের সমাবেশ দেখিয়া, অনেকে এই পুরাণকে, অন্ততঃ এতদন্তর্গত বিশেষ বিশেষ বিষয়কে, আধুনিক বা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করেন।

ভবিষ্য-পুরাণ।

দ্বাদশ—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ। ব্রহ্ম-খণ্ড, প্রকৃতি-খণ্ড, গণেশ-খণ্ড, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-খণ্ড,—এই চারিখণ্ডে ইহা সম্পূর্ণ। নৈমিষারণ্য তীর্থে সৌনকাদি ঋষিগণের নিকট পরম-পৌরাণিক সৌতি এই ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ বর্ণনা করেন। এই পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকার লীলা-প্রসঙ্গ বিশদ-ভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। অনেকের বিশ্বাস,—শ্রীরাধা সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যে-কোনও গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে, তাহার সকলেরই মূল,—এই ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত। পুরাণের মধ্যে এক ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত ভিন্ন শ্রীরাধিকার প্রসঙ্গ অন্য কোনও পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই পুরাণের ব্রহ্ম-খণ্ডে সৃষ্টি-নিরূপণ-প্রসঙ্গে দেখিতে পাই,—শ্রীকৃষ্ণের শরীর হইতে নারায়ণাদির আবির্ভাব, রাসমণ্ডলে রাধার উৎপত্তি, রাধা-কৃষ্ণের দেহ হইতে গো-গোপী ও গোপদিগের

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ।

* Wilson's Preface to *Bishnupurana.*

আবির্ভাব, তৎপরে বিশ্ব-চরাচরের সৃষ্টি। প্রকৃতি-খণ্ডে,—সৃষ্টি-কার্য্যে, দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, সাবিত্রী—এই পঞ্চ-প্রকৃতির মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ, সাবিত্রী-সত্যবান, সুরভি, স্বাহা ও স্বধার উপাখ্যান, দেবী-মাহাত্ম্যে সুরথ-বংশ-বর্ণন, গঙ্গার উপাখ্যান, রামায়ণ প্রভৃতির কথা, ইন্দ্রের প্রতি দুর্ব্বাসার অভিশাপ এবং লক্ষ্মী-পূজার প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয়। গণেশ-খণ্ডে,—প্রধানতঃ গণেশের মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত; প্রসঙ্গতঃ, জমদগ্নি, কার্ত্তবীর্য্য, পরশুরাম প্রভৃতির উপাখ্যান উত্থাপিত। শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ডে—কৃষ্ণলীলা আনুপূর্ব্বিক পরিবর্ণিত। ব্রজলীলা, মাথুর, রাধাকৃষ্ণের পুনর্ম্মিলন, গোকুলবাসীদের গোলোকে গমন প্রভৃতিও এই জন্মখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। ব্রহ্মবৈবর্ত্তের শেষ অধ্যায়ে, মহাপুরাণ ও উপপুরাণের লক্ষণ, মহাপুরাণ সকলের শ্লোক-সংখ্যা, উপপুরাণ সকলের নাম-কীর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকাংশে শ্রীমদ্ভাগবতের মতের সহিত তাহার ঐক্য আছে। ঐ শেষ অধ্যায়ের পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে কি কি বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সন্নিবিষ্ট। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণের মতে,—মহাপুরাণ-সমূহের দশটী লক্ষণ। যথা,—সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, পালন, কর্ম্ম, বাসনা-বর্ণন, চতুর্দ্দশ মনুর প্রত্যেকের নামাদ্যয়াদি কীর্ত্তন, মোক্ষ-নিরূপণ, শ্রীহরির গুণানুকীর্ত্তন এবং পৃথক পৃথক দেবগণের মহিমা-বর্ণন। এই দশটী বিশেষ লক্ষণ; কিন্তু প্রধানতঃ পাঁচটী লক্ষণ পুরাণোপপুরাণ উভয়ত্রই থাকিবে। সে পাঁচটী লক্ষণ,—সৃষ্টি, প্রলয়, চন্দ্র ও সূর্য্যাদির বংশ-ক্রমন্বয়ে চতুর্দ্দশ মনুর অধিকার-কীর্ত্তন এবং চন্দ্র-সূর্য্য-বংশীয় নৃপতিগণের বংশ-বর্ণন।

মার্কণ্ডেয়-পুরাণ।

ত্রয়োদশ—মার্কণ্ডেয়-পুরাণ। এই পুরাণের অন্তর্গত দেবী-মাহাত্ম্য চণ্ডী, হিন্দু-মাত্রেরই পূজার সামগ্রী। হিন্দুর বিশ্বাস,—যে গৃহে যথানিয়মে চণ্ডীপাঠ হয়, আধি-ব্যাধি-শোক-তাপ সে গৃহে প্রবেশ করিতে পারে না; চণ্ডীপাঠে সকল বিপদ দূর হয়। চণ্ডীকে দুর্গাস্তব বলে,—চণ্ডীকে দেবী-মাহাত্ম্য বলে। পুরাকালে হিন্দুর গৃহে চণ্ডী নিত্য পঠিত হইত বলিয়া, চণ্ডী-গৃহের নাম—চণ্ডীমণ্ডপ। মার্কণ্ডেয়-পুরাণে অন্যান্য কতই মনোহর উপাখ্যান আছে; কিন্তু একমাত্র দেবী-মাহাত্ম্য-চণ্ডীর ঔজ্জ্বল্যে সকলের ঔজ্জ্বল্য আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। মার্কণ্ডেয়-পুরাণে হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান আছে; দত্তাত্রেয়ের উপাখ্যান আছে; দ্রুপদের, নহুষের, যযাতির, পুরুরবার, ইক্ষ্বাকুর, রামচন্দ্রের,—সকলের কথাই, সকলের চরিত্র-কাহিনীই আলোচিত হইয়াছে। দর্শন-তত্ত্ব, সৃষ্টি-রহস্য, তীর্থ-মাহাত্ম্য, দ্বীপ ও বর্ষের প্রসঙ্গ, পাপ-পুণ্যের চিত্র,—এই পুরাণের অন্তর্নিবিষ্ট। অথচ, সর্ব্বোপরি প্রতিষ্ঠা,—দেবী-মাহাত্ম্য চণ্ডীর। মার্কণ্ডেয় ঋষি প্রসঙ্গতঃ এই চণ্ডী-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। এই দেবী-মাহাত্ম্য চণ্ডীর উপাখ্যান-ভাগ এইরূপ,—"চৈত্র-বংশ-সম্ভূত রাজা সুরথ, রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া, মেধস-মুনির শরণাপন্ন হন। মেধস-মুনি তাঁহাকে উপদেশ দেন,—মহামায়ার কৃপা ভিন্ন কোনই সুফল লাভের আশা নাই। তখন সুরথ রাজা মহামায়ার স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অতঃপর, মেধস ঋষি, ভগবতীর উৎপত্তি-বিবরণ বর্ণন করিয়া, সূর্য্য-পুত্র সাবর্ণি কি

প্রকারে মহামায়ার অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হন। তৎপ্রসঙ্গ পরিসমাপ্ত হইলে, মেধস কহিলেন,—"'কশ্যপ-তনয় শুম্ভ-নিশুম্ভ অসুরদ্বয় দর্পভরে দেবরাজের ত্রৈলোক্যাধিপত্য ও দেবতাদিগের যজ্ঞভাগ হরণ করিয়াছিল। হৃতাধিকার দেবগণ রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া মহামায়াকে আরাধনা করেন।" দেবগণ যেরূপে মহামায়ার স্তব করিয়াছিলেন, চণ্ডী-মাহাত্ম্যের তাহা মেরুদণ্ড-স্বরূপ। দেবগণের সে স্তব এই,—

"নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ। নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্ম তাং॥
রৌদ্রায়ৈ নমো নিত্যায়ৈ গৌর্য্যৈ ধাত্র্যৈ নমোনমঃ। জ্যোৎস্নায়ৈ চেন্দুরূপিণ্যৈ সুখায়ৈ সততং নমঃ।
কল্যাণ্যৈ প্রণতা বৃদ্ধ্যৈ সিদ্ধ্যৈ কূর্ম্মৈ নমোনমঃ। নৈঋ৴ত্যৈ ভূভৃতাং লক্ষ্ম্যৈ সর্ব্বাণ্যৈ তে নমোনমঃ॥
দুর্গায়ৈ দুর্গপারায়ৈ সারায়ৈ সর্ব্বকারিণ্যৈ। খ্যাত্যৈ তথৈব কৃষ্ণায়ৈ ধূম্রায়ৈ সততং নমঃ।
অতি সৌম্যাতি রৌদ্রায়ৈ নতাস্তস্যৈ নমোনমঃ। নমো জগৎপ্রতিষ্ঠায়ৈ দেব্যৈ কৃত্যৈ নমোনমঃ।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ছায়ারূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু তৃষ্ণারূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ক্ষান্তিরূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু জাতিরূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু লজ্জারূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শ্রদ্ধারূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু লক্ষ্মীরূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বৃত্তিরূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু তুষ্টিরূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাঞ্চাখিলেষু যা। ভূতেষু সততং তস্যৈ ব্যাপ্তি দেব্যৈ নমোনমঃ।
চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
স্তুতা সুরৈঃ পূর্ব্বমভীষ্ট সংশ্রয়াত্তথা সুরেন্দ্রেণ দিনেষু সেবিতা॥
করোতু সা নঃ শুভহেতুরীশ্বরী শুভানি ভদ্রাণ্যভিহন্তু চাপদঃ॥
যা সাম্প্রতং চোদ্ধতদৈত্যতাপিতৈরস্মাভিরীশা চ সুরৈর্নমস্যতে॥
যা চ স্মৃতা তৎক্ষণমেবহন্তি নঃ সর্ব্বা পদো ভক্তিবিনম্রমূর্ত্তিভিঃ॥"

দেবগণের এই স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া, মহামায়া দুরন্ত শুম্ভ-নিশুম্ভের সংহার-সাধন-পূর্ব্বক

দেবগণকে স্বর্গ-রাজ্য পুনঃ-প্রদান করেন। মেধস ঋষির নিকট মহামায়ার মাহাত্ম্য-কথা শ্রবণ করিয়া, রাজা সুরথ তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। তাহার ফলে, দেবীর নিকট বর প্রাপ্ত হইয়া তিনি সাফল্য লাভ করেন। রাজা সুরথ কিরূপ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া কোন্ ঋতুতে মহামায়ার পূজা করিয়াছিলেন, মার্কণ্ডেয়-পুরাণে তাহার কোনও উল্লেখ নাই। তবে কিংবদন্তী এই,—তিনি বসন্ত-কালে এবং শ্রীরামচন্দ্র শরৎ-কালে দেবীর আরাধনা করিয়াছিলেন। আর, তদনুসরণেই বাসন্তী এবং শারদীয় পূজার প্রবর্ত্তনা। দেবী-মাহাত্ম্য পাঠ করিবার পূর্ব্বে, প্রথমে 'নারায়ণং নমস্কৃত্যৈ' ইত্যাদি বন্দনা পাঠ; পরে অর্গলা-স্তোত্র, কীলক-স্তব, কবচ, দেবীসূক্ত, ঋগ্যাদি পাঠ আবশ্যক। অবশেষে চণ্ডীপাঠ করিতে হয়।

চতুর্দ্দশ—বামন-পুরাণ। প্রধানতঃ বামন অবতারে বলি-রাজের দান-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনই এই পুরাণের উদ্দেশ্য। তৎপ্রসঙ্গে ইহাতে বিষ্ণুর প্রাধান্য পরিকীর্ত্তিত। এই পুরাণে দেখিতে পাই,—প্রহ্লাদের পৌত্র বলি, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করায়, প্রহ্লাদের নিকট শাপ-গ্রস্ত হইয়াছিলেন। বলিরাজ দানধর্ম্মে অদ্বিতীয়ত্ব লাভ করিলেও, পিতামহের শাপে তাঁহাকে রাজ্যভ্রষ্ট হইতে হয়; ভগবান বামনরূপে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া, ত্রিপাদ-ভূমি ভিক্ষা-প্রার্থনা করেন। মহাবাহু বলি যে সময়ে বামন-দেবকে ত্রিপাদ-ভূমি দান করিতে প্রস্তুত হন, সেই সময়ে ভগবান বিরাট্-রূপ ধারণ করেন; সকলে দেখিতে পান,—চন্দ্র-সূর্য্য নয়ন, স্বর্গ মস্তক, পৃথিবী চরণ ইত্যাদি বিরাট্-রূপে তিনি প্রকটিত হইয়াছেন। ফলে, সর্ব্বস্ব দানে বলিকে পাতালে গমন করিতে হয়। ব্রহ্মার শিরশ্ছেদ-বিবরণ, কপাল-মোচনের উপাখ্যান, দক্ষ-যজ্ঞ, দেব-দানব-যুদ্ধ, মহিষাসুর বধ, বলি-বংশ বর্ণন, প্রহ্লাদ কর্ত্তৃক বলিকে শাপ প্রদান, চণ্ড-মুণ্ড বধ, শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ প্রভৃতি বিষয়ের বর্ণনা, এই পুরাণে দৃষ্ট হয়। দেবর্ষি নারদের প্রশ্নের উত্তরে পুলস্ত্য ঋষি এই পুরাণের বিষয় বর্ণন করেন। ভগবানের বামন অবতারের কথা ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই এই পুরাণের নাম—বামন-পুরাণ।

বামন-পুরাণ।

পঞ্চদশ—বরাহ-পুরাণ। বরাহ অবতারের লীলা-প্রসঙ্গ এই গ্রন্থে পরিবর্ণিত। প্রলয়-জলোত্থিতা বসুধার প্রশ্নে বরাহ-অবতার কর্ত্তৃক এই পুরাণ ব্যক্ত হয়;—এই জন্যই ইহার নাম—বরাহ-পুরাণ। পুরাণের লক্ষণ, সৃষ্টি-প্রকরণ, প্রিয়ব্রতের উপাখ্যান, দশাবতার-তত্ত্ব, বিবিধ ব্রত-কথা, বহুতর তীর্থ-মাহাত্ম্য, জম্বু-দ্বীপ-প্রমাণাদি, দেশ-নদী প্রভৃতির বর্ণনা, দেব-দেবীর প্রতিমা-নির্ম্মাণ-বিধি,—এই পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়। বরাহ-পুরাণের শেষ অধ্যায়ে ইহার বিষয়ানুক্রমণি লিখিত আছে। অন্নদান, জলদান, ধেনুদান প্রভৃতি দান-মাহাত্ম্য এই গ্রন্থে কীর্ত্তিত হইয়াছে। বরাহ-পুরাণের দ্বাদশাধিক শততম-অধ্যায়ে পুরাণ-সকলের নাম ও সংখ্যা লিখিত আছে। পুরাণের লক্ষণ সম্বন্ধে এই গ্রন্থের মত,—'পুরাণ পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত। সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুকীর্ত্তন—এই পাঁচটী পুরাণের লক্ষণ।' এই পুরাণের মতে,—অবতার দশটী মাত্র;—মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কি। এই গ্রন্থে বুদ্ধ-দ্বাদশী ব্রত-প্রসঙ্গে কাঞ্চনময় বুদ্ধ-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া

বরাহ-পুরাণ।

পূজা করিতে বলা হইয়াছে। কিন্তু এই বুদ্ধকে এবং কপিলাবস্তুর বুদ্ধকে অভিন্ন বলিয়া মনে হয় না। এই বুদ্ধকে হৃষীকেশ, দামোদর, চক্রপাণি প্রভৃতি নামে সম্বোধন করা হইয়াছে; এবং সত্যযুগেও যে বুদ্ধ-দ্বাদশী-ব্রত প্রচলিত ছিল, তাহার উল্লেখ আছে। ফলে, বুদ্ধ-অবতার-সম্বন্ধে নানা মতভেদ দাঁড়াইয়াছে; সুতরাং কোন্ বুদ্ধ অবতার-রূপে শাস্ত্র-গ্রন্থাদিতে সম্পূজিত, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ।

ষোড়শ—মৎস্য-পুরাণ। মহা-প্রলয়ে ভগবান বিষ্ণু মৎস্য-রূপ ধারণ করিয়া মনুকে এবং সংসারের সমস্ত সামগ্রীর বীজ রক্ষা করিয়াছিলেন;—এই পুরাণে প্রধানতঃ তাহাই পরিবর্ণিত। সৃষ্টি-রক্ষার জন্য ভগবানের এই অবতার-গ্রহণ—মৎস্যাবতার নামে অভিহিত হয়। মনু ও মৎস্যের যে বিবরণ শতপথ-ব্রাহ্মণে সংক্ষেপে দেখিতে পাই, এই গ্রন্থে তাহাই পল্লবিত ও শাখা-প্রশাখা-সমন্বিত।

মৎস্য-পুরাণ।

মৎস্য পুরাণে প্রসঙ্গতঃ নিম্ন-লিখিত বিষয়-পরম্পরা সন্নিবিষ্ট আছে;—নরসিংহ-মাহাত্ম্য, বিষ্ণুর দশ অবতার প্রসঙ্গে অনন্ত তৃতীয়া প্রভৃতি ব্রতের এবং প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থের মাহাত্ম্য; চন্দ্র-বংশ, সূর্য্য-বংশ, কুরু-বংশ, হুতাশন-বংশ এবং যযাতি ও কার্ত্তবীর্য্য প্রভৃতির উপাখ্যান; কল্প ও যুগ-বিবরণ, প্রতিমা-লক্ষণ, দেব-মণ্ডপ-লক্ষণ, সাবিত্রী-চরিত, গ্রহাদির শুভাশুভ-যাত্রা-ফল; পার্ব্বতীর জন্ম, মদন-ভস্ম, শিবের বিবাহ, কার্ত্তিকেয়ের জন্ম; রাজ-ধর্ম্ম, ভবিষ্য-রাজগণের বিবরণ, ইত্যাদি। এই পুরাণ-প্রসঙ্গে মৎস্যাবতার বিষ্ণু-কর্ত্তৃক পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্ত-কল্পের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। খৃষ্টানদিগের বাইবেলোক্ত ('ওল্ড টেষ্টামেণ্টে') নোয়া এবং জল-প্লাবনের ঘটনা, অনেকে মনে করেন, মৎস্য-পুরাণের উপাখ্যানের অনুস্মৃতি। জল-প্লাবনের সময় মনু যখন পর্ব্বতোপরি আপন পোত রক্ষা করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় মৎস্য-রূপী ভগবান মনুর নিকট এই পুরাণ-প্রসঙ্গ বর্ণন করেন।

সপ্তদশ—কূর্ম্ম-পুরাণ। কূর্ম্মরূপ ধারণ করিয়া ভগবান দেবগণের মঙ্গল-বিধান করিয়াছিলেন, তজ্জন্যই ভগবানের কূর্ম্মাবতার সম্পূজিত হইয়া থাকে। কূর্ম্ম-রূপী ভগবান এই পুরাণ-প্রসঙ্গ প্রথমে বর্ণনা করিয়াছিলেন। নারদের নিকট তিনি যাহা বর্ণনা করেন, ঋষিগণকে সূত তাহারই মর্ম্ম শ্রবণ করান। ব্রাহ্মী, ভাগবতী, সৌরী ও বৈষ্ণবী,—এই চারি সংহিতায় পূর্ব্বে ইহা বিভক্ত ছিল। কিন্তু এখন তদন্তর্গত ব্রহ্ম-সংহিতা ভিন্ন অন্য কোনও সংহিতা পাওয়া যায় না।

কূর্ম্ম-পুরাণ।

সুতরাং ব্রহ্ম-সংহিতাই এখন কূর্ম্ম-পুরাণ নামে পরিচিত। সৃষ্টি ও বংশানুকীর্ত্তন হইতে আরম্ভ করিয়া, দক্ষ-যজ্ঞ, বামনাবতার, কৃষ্ণ-চরিত্র, যুগ-ধর্ম্ম প্রভৃতির বিষয় এই পুরাণে বর্ণিত আছে। দান-ধর্ম্ম, তীর্থ-মাহাত্ম্য, নিত্য-কর্ম্ম, অশৌচ-বিচার প্রভৃতিও ইহার অন্তর্নিবিষ্ট। এই পুরাণে ঈশ্বর-গীতা এবং ব্যাস-গীতা অধ্যায়-দ্বয়ে যথাক্রমে জ্ঞানযোগ এবং ব্রহ্মচারি-ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে। পণ্ডিতগণ মনে করেন,—এতদন্তর্গত শ্রীমদীশ্বর-গীতা মহাভারতের শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সহিত তুল্য-মূল্য। ঈশ্বর-গীতায় দর্শন-তত্ত্বের আলোচনায় সাংখ্য-যোগ, জ্ঞান-যোগ, ভক্তিযোগ প্রভৃতি অতি সুন্দরভাবে পরিবর্ণিত।

এই ঈশ্বর-গীতা একাদশ অধ্যায়ে চারি শত আটাত্তরটি শ্লোকে সম্পূর্ণ। শিব-দুর্গার মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন, কূর্ম্ম-পুরাণে প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই পুরাণের মতে,—বায়ু-পুরাণ ও শিব-পুরাণ উভয়ই মহাপুরাণের অন্তর্গত। সে হিসাবে, উহাতে অষ্টাদশ মহা-পুরাণের উল্লেখ থাকিলেও, গণনায় মহাপুরাণ-সংখ্যা ঊনবিংশ হইয়া দাঁড়ায়। কূর্ম্ম-পুরাণে দেবীর সহস্র-নাম-পূর্ণ স্তব দৃষ্ট হয়।

অষ্টাদশ—ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ। স্কন্দ-পুরাণের ন্যায়, এই পুরাণের বহু অংশ বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত। সুতরাং সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ এখন সন্ধান করিয়া পাওয়া দুর্লভ। অধ্যাত্ম রামায়ণ—এই ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণের অন্তর্গত। অথচ, এখন যেভাবে ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ প্রকাশিত হয়, তাহার মধ্যে অধ্যাত্ম-রামায়ণ সন্নিবিষ্ট নহে। পুরাণ-পরম্পরার বর্ণনানুসারে দেখিতে পাই,—ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ চারিপাদে বিভক্ত;—প্রক্রিয়া-পাদ, অনুষঙ্গ-পাদ, উপোদ্‌ঘাত-পাদ এবং উপসংহার-পাদ। তন্মধ্যে এখন যে ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ পাওয়া যায়, তাহাতে প্রক্রিয়া-পাদ এবং অনুষঙ্গ-পাদের কিয়দংশ মাত্র দেখিতে পাই। অধ্যাত্ম-রামায়ণ—সে তো স্বতন্ত্র-ভাবেই প্রকাশিত হইয়া থাকে। মহানুভব সূত দৃষদ্বতী-তীরে যজ্ঞক্ষেত্রে এই পুরাণ বর্ণন করিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণনায় প্রকাশ,—তিনি বেদ-ব্যাসের নিকট এই পুরাণ শুনিয়াছিলেন; এবং তৎপূর্ব্বে বায়ু কর্ত্তৃক এই পুরাণ পরিবর্ণিত হইয়াছিল। ইহাতে কি কি বিষয় সন্নিবিষ্ট আছে, প্রথম অধ্যায়ের ষট্‌চত্বারিংশ শ্লোক হইতে ষট্‌সপ্তত্যাধিক শততম শ্লোকে সংক্ষেপে নিবদ্ধ রহিয়াছে। যাহা হউক, এখন প্রধানতঃ নিম্ন-লিখিত বিষয়গুলি ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়;—সৃষ্টি-প্রকরণ, কল্প নিরূপণ, যুগভেদ ও মন্বন্তর-ক্রম-কথন, জম্বু-দ্বীপ-বর্ণন, ভারতবর্ষ-বর্ণন; কিম্পুরুষ, অম্বুদ্বীপ, কেতুমালাবর্ষ প্রভৃতির বিবরণ; ভরত-বংশ, পৃথু-বংশ, দেব-বংশ, ঋষি-বংশ, অগ্নি-বংশ এবং সংহিতাকারগণের বংশানুকীর্ত্তন। এই পুরাণান্তর্গত অধ্যাত্ম-রামায়ণ সপ্ত-কাণ্ডে বিভক্ত। আদি-কাণ্ডে,—শ্রীরামের ব্রহ্ম-স্বরূপত্ব কথনে রাক্ষস-পীড়িতা পৃথিবীর উদ্ধারার্থ তাঁহার অবতার-গ্রহণ, বাল্য লীলা, অহল্যা-উদ্ধার, ভার্গব-দর্প-চূর্ণ প্রভৃতি বর্ণিত আছে। অযোধ্যাকাণ্ডে,—শ্রীরামচন্দ্রের বন-গমন, দশরথের প্রাণত্যাগ; অরণ্য-কাণ্ডে,—মায়ামৃগ-বধ, সীতাহরণ; কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে,—বালী-বধ, সীতার অন্বেষণ; সুন্দর-কাণ্ডে,—হনুমানের লঙ্কা-প্রবেশ এবং রাম-সমীপে সংবাদ আনয়ন; লঙ্কাকাণ্ডে,—রাবণ-বধ, শ্রীরামের রাজ্যাভিষেক; উত্তরকাণ্ডে,—রাবণাদির জন্ম-বিবরণ, সীতার বনবাস, লক্ষ্মণ-বর্জ্জন, লব-কুশাদির রাজ্যাভিষেক, শ্রীরাম-চন্দ্রের বৈকুণ্ঠে গমন;—প্রভৃতি বিষয় পরিবর্ণিত রহিয়াছে। অধ্যাত্ম-রামায়ণে বহু দার্শনিক-তত্ত্ব বিবৃত আছে। এতদন্তর্গত রাম-গীতায় দর্শন-সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায়। দর্শন-তত্ত্বালোচনায় উপদেশ পাইয়াছিলাম,—'যেমন স্ফটিক মণি জবাদি-কুসুম-সংসর্গে তত্তদ্বস্তুর সমবর্ণ বলিয়া প্রতীত হয়; অন্নময় প্রভৃতি কোষের সংসর্গে জীবও সেইরূপ পৃথক বলিয়া অনুভূত হন। কিন্তু 'তত্ত্বমসি' বাক্য বিচার করিলে, জীব যে সংসর্গ-শূন্য, অজ ও অদ্বিতীয়,—তাহা বুঝিতে পারা যায়।' অধ্যাত্ম-রামায়ণেও সেই একই উপদেশ, একই উপমায়, পরিকল্পিত রহিয়াছে।

"কোবেষয়ং তেষু তু তত্তদাকৃতিৰিভাতি সঙ্গাৎ স্ফটিকোপলো যথা।
অসঙ্গরূপোহয়মজো যতোঽদ্বয়ো বিজ্ঞায়তেঽস্মিন্ পরিতো বিচারিতে ॥"

মুক্তি-বিষয়ে রাম-গীতায় বেদান্তের আভাস বিশদ পরিদৃশ্যমান্। ব্রহ্মে আত্মলীন হওয়া সম্বন্ধে রাম-গীতায় ভগবান বলিতেছেন,—'জীব নিজ-স্বরূপকে আমার সহিত অভিন্ন ভাবনা করিতে করিতে, সমুদ্রে জল-বিন্দুর ন্যায়, দুগ্ধরাশিতে দুগ্ধ-বিন্দুর ন্যায়, মহাকাশে খণ্ডাকাশের ন্যায়, প্রবল বায়ুতে তাল-বৃন্ত পবনের ন্যায়, আমাতে মিশ্রিত হইয়া যায়।'

"আত্মন্যভেদেন বিভাবয়ন্নিদং ভবত্যভেদেন ময়াত্মনা তদা।
যথা জলং বারিনিধৌ যথা পয়ঃ ক্ষীরে বিয়দ্ব্যোম্ন্যনলে যথানিলঃ॥"

উপপুরাণ-প্রসঙ্গ।

উপপুরাণ প্রধানতঃ অষ্টাদশ-সংখ্যক বলিয়া কীর্তিত হইলেও, উপপুরাণ অসংখ্য। মহর্ষি বেদব্যাস-প্রণীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুরাণগুলি উপপুরাণ বলিয়া অভিহিত হয়। আবার,—উশনঃ, সনৎকুমার, দুর্ব্বাসা, কপিল, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষি-প্রণীত বহু পুরাণ—উপপুরাণ নামে অভিহিত। পূর্ব্বে যে অষ্টাদশ উপপুরাণের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তদ্ব্যতীত আদি-পুরাণ, আদিত্য-পুরাণ, বৃহন্নারদীয় পুরাণ, বৃহদ্ধর্ম্ম-পুরাণ, বৃহন্নন্দীকেশ্বর-পুরাণ, বশিষ্ঠ-পুরাণ, মানব-পুরাণ প্রভৃতিও উপপুরাণের মধ্যে সবিশেষ প্রসিদ্ধ।* কালিকা-পুরাণে দেবী-মাহাত্ম্য পরিবর্ণিত এবং উহা দেবী-ভাগবতের অন্তর্ভুক্ত। দেবী-ভাগবত প্রকাণ্ড গ্রন্থ; মতান্তরে এই গ্রন্থ মহাপুরাণ বলিয়া কথিত হয়। দেবী-ভাগবত দ্বাদশ-স্কন্ধে সম্পূর্ণ। তাহারই পঞ্চম-স্কন্ধে কালিকা-পুরাণ পরিবর্ণিত। মহিষাসুর ও শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধ, সুরথ-সমাধির বৃত্তান্ত,—কালিকা-পুরাণের অন্তর্গত। দেবী-ভাগবতে মহাপুরাণের লক্ষণ বিশেষ-ভাবে বিদ্যমান। রাম-চরিত, প্রহ্লাদ চরিত, বৃত্রাসুর-বধ, হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান, বর্ষ-বিবরণ, বিবিধ-পূজা-বিধি প্রভৃতি অসংখ্য বিষয়-পরম্পরা এবং দেবী-মাহাত্ম্য—দেবী-ভাগবতের আলোচ্য। দেবী-ভাগবত—বেদব্যাস-বিরচিত সূতোক্ত পুরাণ। দেবী-ভাগবতের মতে,—বায়ু-পুরাণ অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত; শ্রীমদ্ভাগবত—উপপুরাণ-বিশেষ। এতদনুসারে বৃহন্নারদীয়-পুরাণ—মহাপুরাণান্তর্গত, এবং নারদীয়-পুরাণ—উপপুরাণ-পদ-বাচ্য।† বৃহন্নারদীয়-পুরাণের এবং আদিত্য-পুরাণের মত, বর্ত্তমান হিন্দু সমাজে অনেকাংশে পরিগৃহীত হইয়া থাকে। উদ্বাহ-তত্ত্বে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন আদিত্য-পুরাণ এবং বৃহন্নারদীয় পুরাণ হইতে শ্লোক-পরম্পরা উদ্ধার করিয়া কলি-যুগের নিষিদ্ধ-ধর্ম্ম বিশদ-ভাবে বর্ণন করিয়াছেন। বৃহন্নারদীয় পুরাণে সেই নিষিদ্ধ-ধর্ম্ম্য-কর্ম্ম-সমূহের বিস্তৃত বিবরণ এইরূপে লিখিত আছে;—

"সমুদ্রযাত্রাস্বীকারঃ কমণ্ডলুবিধারণম্। দ্বিজানামসবর্ণাসু কন্যাসূপযমস্তথা॥
দেবরেণ সুতোৎপত্তির্মধুপর্কে পশোর্ব্বধঃ। মাংসাদনং তথা শ্রাদ্ধে বানপ্রস্থাশ্রমস্তথা॥
দত্তায়াশ্চৈব কন্যায়া পুনর্দ্দানং পরস্য চ। দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং নরমেধাশ্বমেধকৌ॥
মহাপ্রস্থানগমনং গোমেধঞ্চ তথামখম্। ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্যানাহুর্ম্মনীষিণঃ॥"

সমুদ্র যাত্রা, কমণ্ডলুধারণ, দ্বিজাতির পক্ষে ভিন্নজাতীয় স্ত্রীর পাণি-গ্রহণ, দেবর দ্বারা

* বৃহদ্ধর্ম্ম-পুরাণ, পূর্ব্বখণ্ড, পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ে, আদি-পুরাণ আদিত্য-পুরাণ প্রভৃতির প্রসঙ্গ উল্লিখিত।

† দেবীভাগবতে, প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে, পুরাণ-উপপুরাণ আলোচনা দ্রষ্টব্য।

পুত্রোৎপাদন, মধুপর্কে পশুবধ, শ্রাদ্ধে মাংস ভোজন, বামপ্রস্থ ধর্ম্মের অবলম্বন, দত্তা কন্যার পুনর্দ্দান, দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য, নরমেধ-অশ্বমেধ-গোমেধ-যজ্ঞ, মহাপ্রস্থান গমন প্রভৃতি ধর্ম্ম পণ্ডিতগণ-কর্ত্তৃক কলিযুগে নিষিদ্ধ হইয়াছে।" কলিযুগের নিষিদ্ধ-ধর্ম্ম-কর্ম্ম-সম্বন্ধে আদিত্য-পুরাণেও এই মর্ম্মেরই নিষেধক বচন পরম্পরা লিপিবদ্ধ আছে;—

"দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং ধারণঞ্চ কমণ্ডলোঃ। দেবরেণ সুতোৎপত্তির্দত্তকন্যা প্রদীয়তে॥
কন্যানামসবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাতিভিঃ। আততায়িদ্বিজাগ্র্যাণাং ধর্ম্মযুদ্ধেন হিংসনম্॥
বানপ্রস্থাশ্রমস্যাপি প্রবেশো বিধিদেশিতঃ। বৃত্তস্বাধ্যায়সাপেক্ষমঘসঙ্কোচনং তথা॥
প্রায়শ্চিত্তবিধানঞ্চ বিপ্রাণাং মরণান্তিকম্। সংসর্গদোষঃ পাপেষু মধুপর্কে পশোর্ব্বধঃ॥
দত্তৌরসেতরেষাস্তু পুত্রত্বেন পরিগ্রহঃ। শূদ্রেষু দাসগোপালকুলমিত্রার্দ্ধসীরিণাম্॥
ভোজ্যান্নতা গৃহস্থস্য তীর্থসেবাতি দূরতঃ। ব্রাহ্মণাদিষু শূদ্রস্য পক্তাদিক্রিয়াপি চ॥
এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ। নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ॥"

অর্থাৎ,—'কলির আদিতে লোক-রক্ষার নিমিত্ত মহাত্মগণ নিম্ন-লিখিত কর্ম্ম-সমূহ ব্যবস্থা-পূর্ব্বক রহিত করিয়া গিয়াছেন;—দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য, কমণ্ডলু-ধারণ, দেবর-দ্বারা সুতোৎপত্তি, দত্তা-কন্যার পুনর্দ্দান, দ্বি-জাতির অসবর্ণা কন্যা বিবাহ, ধর্ম্ম-যুদ্ধে আততায়ী ব্রাহ্মণের প্রতি হিংসা, বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন, চরিত্র ও বেদাধ্যয়ন-অনুসারে অশৌচ-সঙ্কোচ, ব্রাহ্মণের মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত, সংসর্গদোষ, মধুপর্কে পশুবধ, দত্তক ও ঔরস ভিন্ন পুত্র গ্রহণ, শূদ্রের অন্নভোজন, শূদ্র-কর্ত্তৃক পাকক্রিয়া, দূরতীর্থে গমন, ইত্যাদি।' আদি-পুরাণেও এইরূপ নিষেধ-বিধি দৃষ্ট হয়,—পরাশর-ভাষ্যে তাহা উদ্ধৃত আছে। অপরাপর উপপুরাণের মধ্যে—কল্কি-পুরাণ এবং বৃহদ্ধর্ম্ম-পুরাণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদুভয় পুরাণ বেদব্যাস-বিরচিত বলিয়াই উক্ত হয়। কল্কি-পুরাণে,—কলি-ধর্ম্ম-কথন, কল্কি-অবতারের আবির্ভাব এবং ম্লেচ্ছ-নিধন-বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। এই পুরাণের মতে,—কলির শেষ-ভাগে, সম্ভল-নগরে, ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ বিষ্ণুযশার গৃহে, কল্কিরূপে ভগবান জন্মগ্রহণ করিবেন এবং তাঁহারই প্রভাবে পুনরায় সত্য-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবে। পুরাণ-পরম্পরায় ভূত-ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান-কাহিনী পরিবর্ণিত হইয়াছে দেখিয়া যাঁহারা পুরাণ-রচনার কাল-নির্ণয়-সম্বন্ধে সংশয়ান্বিত হন, কল্কি-পুরাণ-বর্ণিত কল্কি-অবতারের আবির্ভাব হইলে ঋষিগণের ত্রিকালজ্ঞতা-সম্বন্ধে তাঁহাদের সকল সংশয় দূর হইবে,—ইহাই অনেকে বিশ্বাস করেন। যেমন নারদীয়-পুরাণ দুই খানি, ধর্ম্ম-পুরাণ ও বৃহদ্ধর্ম্ম-পুরাণ-ভেদে, ধর্ম্ম-পুরাণও দুই খানি। ধর্ম্ম-পুরাণে নান্দীশোক্ত শিব-ধর্ম্ম পরিবর্ণিত। কিন্তু এই বৃহদ্ধর্ম্ম-পুরাণের মধ্য-খণ্ডে শিব-চরিত পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। তদ্ব্যতিরিক্ত ইহার পূর্ব্ব ও উত্তরখণ্ডে,—সৃষ্টি-তত্ত্ব, শ্রীরাম-চরিত, কৃষ্ণ-চরিত, বিবিধ ধর্ম্মোপদেশ ও ব্রত-বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। মধ্য-খণ্ডে,—সতী-স্বয়ম্বর, দক্ষ-যজ্ঞ, গঙ্গার উৎপত্তি, গঙ্গা-শিব-মাহাত্ম্য এবং গঙ্গার সহস্র নাম কীর্ত্তিত আছে। কাশী-খণ্ডে গঙ্গার সহস্র নাম অকারাদিক্রমে সুসম্বদ্ধ; বৃহদ্ধর্ম্ম-পুরাণে তৎসমুদায় রূপান্তরে কবিতাচ্ছন্দে গ্রথিত। প্রতি পুরাণ ও উপপুরাণে সেই সেই পুরাণ ও উপপুরাণ পাঠের ও শ্রবণের ফল-মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত আছে।

প্রত্যেক পুরাণ-উপপুরাণের বিষয় পরম্পরা ভিন্ন ভিন্ন রূপে পরিবর্ণিত হইলেও, লোক-শিক্ষা, ধর্ম্ম-শিক্ষা, আচার-প্রতিষ্ঠা, সমাজ-শৃঙ্খলা-রক্ষা—সকলেরই মুখ্য উদ্দেশ্য।

সার-মর্ম্ম ও সমন্বয়-বিধান।

সেই উদ্দেশ্য-সাধন জন্য, বিবিধ দৃষ্টান্তের উল্লেখ ব্যপদেশে—ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, ভূ-তত্ত্ব, দর্শন-তত্ত্ব, জ্যোতিষ-তত্ত্ব এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা উহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাণ-সমূহের লক্ষণ যখন অভিন্ন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তখন ভাবের অভিন্নতাই উহার মেরুদণ্ড; তাই মূলে প্রায়ই অসামঞ্জস্য দেখা যায় না। জ্ঞান-ভক্তি শিক্ষা দেওয়াই পুরাণ-পরম্পরার লক্ষীভূত;—শ্রুতি-স্মৃতি-বিহিত ধর্ম্ম-তত্ত্ব সহজবোধ্য করিবার জন্যই পুরাণ-সমূহের অবতারণা। তবে যে কোনও পুরাণে সত্ত্বের, কোনও পুরাণে রজের, কোনও পুরাণে তমের,—কোনও পুরাণে বিষ্ণুর, কোনও পুরাণে শিবের, কোনও পুরাণে ব্রহ্মের, কোনও পুরাণে পুরুষের, কোনও পুরাণে প্রকৃতির, প্রাধান্য কীর্ত্তিত হইয়াছে, সে কেবল—অধিকারিভেদে কর্ত্তব্য-তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য। সকলের ধারণা-শক্তি সমান নহে,—প্রকৃতিও বিভিন্ন; সুতরাং, সকল শক্তির, সকল প্রকৃতির উপযোগী করিয়াই পুরাণ-সমূহ রচিত হইয়াছিল। সৃষ্টি-তত্ত্ব-সম্বন্ধে দর্শন-শাস্ত্রালোচনায় যে মত প্রতিষ্ঠিত ছিল, স্মৃতি-সমূহেও যাহার সমর্থন দেখিয়া আসিয়াছি, পুরাণেও সেই মত অবিকৃত-ভাবে পরিবর্ণিত। কোনও কোনও স্থলে রূপকের আশ্রয় গৃহীত হইলেও, মূলে সেই একই তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, প্রথমে বিষ্ণু-পুরাণ হইতে সৃষ্টি-তত্ত্বের মর্ম্ম উদ্ধৃত করিতেছি। পরাশর বলিতেছেন,—"হে মৈত্রেয়! প্রলয়-কালে গুণসাম্য (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ-গুণের নিষ্ক্রিয় অবস্থা) এবং প্রকৃতি হইতে পুরুষ পৃথক-ভাবে অবস্থিত হন। সৃষ্টিকাল উপস্থিত হইলে, পরমেশ্বর আপন ইচ্ছানুসারে প্রকৃতি ও পুরুষে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে ক্ষোভিত অর্থাৎ সৃষ্টি-করণে উন্মুখ করিয়া দেন। কিন্তু তাহাতে পরমেশ্বরের কোনও ক্রিয়াবত্তা নাই। যেমন গন্ধ নিকটবর্ত্তী হইবা-মাত্র মনের চাঞ্চল্য জন্মে, সৃষ্টি-কার্য্যে পরমেশ্বরের ক্ষোভ-জনকতাও তদ্রূপ। পরে সৃষ্টি-কালে, পুরুষাধিষ্ঠিত সেই গুণসাম্য হইতে গুণব্যঞ্জন অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হয়। মহত্তত্ত্ব হইতে বৈকারিক অর্থাৎ সাত্ত্বিক, তৈজস অর্থাৎ রাজস ও ভূতাদি অর্থাৎ তামস,—এই ত্রিবিধ অহঙ্কার-তত্ত্বের উৎপত্তি। অহঙ্কার ত্রিগুণাত্মক বলিয়া ভূতেন্দ্রিয় দেবতার উদ্ভবের হেতু। যেমন প্রধান তত্ত্ব-দ্বারা মহত্তত্ত্ব আবৃত, মহত্তত্ত্ব দ্বারা অহঙ্কার-তত্ত্বও সেইরূপ আবৃত। তামস অহঙ্কার ক্ষুভিত অর্থাৎ কার্য্যোন্মুখ হইয়া শব্দ-তন্মাত্র ও শব্দ-তন্মাত্র হইতে শব্দ-গুণ-বিশিষ্ট আকাশের সৃষ্টি। তখন উভয়ে উভয়কে আবৃত করিলে, আকাশ ক্ষুভিত হইয়া স্পর্শ-তন্মাত্রের এবং তাহা হইতে স্পর্শ-গুণ-বিশিষ্ট বলবান বায়ুর উৎপত্তি হয়। এইরূপে আবার আকাশ বায়ুকে আবৃত করিলে, রূপ-তন্মাত্র ও জ্যোতিঃ উৎপন্ন হয়। অতঃপর, জ্যোতি বায়ু-দ্বারা আবৃত হইলে, জ্যোতিঃ ক্ষুভিত হওয়ায়, রস-তন্মাত্র এবং তাহা হইতে রসগুণবিশিষ্ট জলের উৎপত্তি। ঐ জল আবার জ্যোতিঃ-দ্বারা আবৃত হইলে, জল ক্ষুভিত হইয়া গন্ধ-তন্মাত্রের সৃষ্টি এবং তাহা হইতেই পৃথিবীর উৎপত্তি। ফলে, তামস অহঙ্কার হইতে এইরূপে ভূত-তন্মাত্রের সৃষ্টি হয়। দশ ইন্দ্রিয়, তৈজস অর্থাৎ রাজস

অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন; এবং দশ ইন্দ্রিয়ের দশ অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা, বৈকারিক অর্থাৎ সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন।......এইরূপে মহত্তত্ত্ব হইতে মহাভূত পর্য্যন্ত মিলিত হইয়া একটী অণ্ড (ব্রহ্মাণ্ড) উৎপাদন করে। তাহা হইতেই স-পর্ব্বত-দ্বীপ-সমুদ্র, স-দেবাসুর-মানুষ, স-জ্যোতিঃ-লোকসংগ্রহ উৎপন্ন হয়।" * শ্রীমদ্ভাগবতে বিদুরের নিকট মৈত্রেয় যে সৃষ্টি-তত্ত্ব বর্ণনা করেন, তাহারও মূল এইরূপ। মৈত্রেয় বলিতেছেন,—"সত্ত্বরজস্তমঃ এই গুণত্রয়ের স্বরূপ প্রধান বা প্রকৃতি নির্ব্বিকার হইয়া ছিল। জীবের অদৃষ্ট, প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা মহাপুরুষ এবং কাল এই তিন কারণে তাহা সংক্ষোভিত হওয়ায়, মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হয়। মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার-তত্ত্ব, তাহা হইতে পঞ্চ-তন্মাত্র, পঞ্চ-মহাভূত, জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং তাহার প্রত্যেকের পাঁচ পাচটী অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা উৎপন্ন হন। তৎপরে ভগবানের শক্তিযোগে মিলিত হইয়া ভৌতিক হৈমাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছিল। অনন্তর ভগবান সেই অণ্ড মধ্যে অধিষ্ঠিত হইলে, তাঁহার নাভি-দেশ হইতে একটী পদ্মের উৎপত্তি হয় এবং তাহা হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়া ভগবানের ইচ্ছাক্রমে সৃষ্টি-কার্য্যে প্রবৃত্ত হন।" † শিব-পুরাণের মতেও—প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চ-তন্মাত্র, পঞ্চ-তন্মাত্র হইতে পঞ্চভূত, এবং পঞ্চভূত হইতে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। প্রকৃতি ও পুরুষ ব্যতীত সকল তত্ত্বই অচেতন; প্রকৃতি ও পুরুষের সহিত যোগ করিলে সর্ব্বশুদ্ধ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব হয়।" এখানে সাঙ্খ্যের মতের সহিত অনেক অংশেই ঐক্য দেখা যায়। বরাহ-পুরাণ, প্রকৃতির পরিবর্ত্তে মায়া-নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পুরাণ-বক্তা বলেন,—মূল শক্তি মায়া; মায়া হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার; এইরূপে পর্য্যায়ক্রমে সৃষ্টি-ক্রিয়া সাধিত হইয়া থাকে। ‡ অগ্নি-পুরাণের মতে,—সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল অব্যক্ত ব্রহ্ম বিদ্যমান ছিলেন; দিন, রাত্রি, আকাশ—কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। অনন্তর পরম পুরুষ বিষ্ণু প্রকৃতিতে প্রবেশ করিয়া ক্ষোভিত করিলেন। তখন প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চ-তন্মাত্র, পঞ্চ-তন্মাত্র হইতে পঞ্চমহাভূত এবং পঞ্চমহাভূত হইতে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় প্রভৃতির উৎপত্তি হইল। সকল পুরাণ পুঙ্খানুপুঙ্খ উল্লেখের আবশ্যক নাই। ফলে, মূলে পুরাণ-সমূহের মতের যে অভিন্নতা নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। § যদি কোথাও কিছু মতান্তর দৃষ্ট হয়, সে কেবল প্রকার-ভেদ মাত্র। পুরাণ-সমূহে প্রলয়-সম্বন্ধে বিশেষ মতানৈক্য দৃষ্ট হয় না। সৃষ্ট-পদার্থ-সমূহের সংহার হইলে, সত্ত্ব আত্মায় (ঈশ্বরে) লীন হয়; প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েই সমধর্ম্মী হইয়া অবস্থান করেন। তিলে তৈল ও দুগ্ধে ঘৃত অবস্থানের ন্যায়, তমঃ ও সত্ত্ব-গুণে অব্যক্তাশ্রিত রজোগুণ অবস্থিত হয়। সৃষ্টির সূক্ষ্ম-তত্ত্ব এইরূপে পরিবর্ণিত হইলেও, স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মার উৎপত্তি মানিয়া লইয়া, তাঁহার

---

* এতৎসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা বিষ্ণু-পুরাণের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

† শ্রীমদ্ভাগবত, তৃতীয় স্কন্ধ, বিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

‡ শিবপুরাণের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এবং বরাহ-পুরাণের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই সৃষ্টি-তত্ত্ব পরিবর্ণিত।

§ অগ্নিপুরাণের সপ্তদশ অধ্যায়, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের চতুর্থ অধ্যায়, দেবী-ভাগবত সপ্তদশ স্কন্ধের দ্বাত্রিংশৎ অধ্যায়, গরুড়-পুরাণের পূর্ব্বখণ্ড চতুর্থ অধ্যায় (সামান্য প্রকার ভেদে), ইত্যাদি।

দ্বারা সৃষ্টিকার্য্য সাধিত হওয়া সম্বন্ধে সকল পুরাণেরই ঐকমত্য দেখিতে পাই। সৃষ্টিপ্রবাহ অনন্ত; প্রলয়ে তাহা সুপ্ত অবস্থায় অবস্থিত থাকে; প্রলয়ান্তে ভগবানের ইচ্ছায় ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্য্যে প্রণোদিত হন। প্রথম সৃষ্টি স্বয়ম্ভূব বা আপনাআপনিই সংসাধিত না হইলে, এবং তৎপরবর্ত্তী সৃষ্টি সেই স্বায়ম্ভূব কর্ত্তৃক সমাহিত না হইলে, পরবর্ত্তী সৃষ্টি-তত্ত্বের সামঞ্জস্য-সাধন দুরূহ হইয়া পড়ে। তদতীত সূক্ষ্মতত্ত্ব আমাদৃ অল্পবুদ্ধি মনুষ্যের ধ্যান-ধারণার অনধিগম্য হয়;—বোধ হয়, সেই জন্যই আদি-সৃষ্টি এইরূপেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। একই বিষয়ের বর্ণনায় পুরাণ-সমূহে যে অসামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়, শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিতগণ বলেন, তাহার কারণ—কল্প-বিবর্ত্তন। পুরাণ মতে,—ব্রহ্মার এক অহোরাত্রকে কল্প বলে। তদনুসারে, চারি শত বত্রিশ কোটী লৌকিক বৎসরে ব্রহ্মার এক দিন এবং ঐ পরিমাণ লৌকিক বৎসরে ব্রহ্মার এক রাত্রি হয়। দিবাভাগে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয় ও বিদ্যমান থাকে; রাত্রিকালে তাহার লয়-প্রাপ্তি ঘটে। বলা বাহুল্য, মন্বন্তর ও যুগাদি এক এক কল্পের অন্তর্ভুক্ত।* এইরূপ ত্রিশ কল্পে ব্রহ্মার এক মাস, এবং বার মাসে তাঁহার এক বৎসর। লৌকিক ত্রিশ দিনের বা মাসের মধ্যে যেরূপ অমাবস্যা-পূর্ণিমা দেখিতে পাই, ব্রহ্মার ত্রিশটী কল্প বা মাসের মধ্যেও সেইরূপ অমাবস্যা-পূর্ণিমা আছে। ব্রহ্মার ত্রিশটী কল্প বা দিবা-রাত্রির নাম,—শ্বেতবারাহ, নীল-লোহিত, বামদেব, গাথান্তর, রৌরব, প্রাণ, বৃহৎ, কন্দর্প, সত্য, ঈষাণ, ধ্যান, সারস্বত, উদান, গরুড়, কৌর্ম্ম, নারসিংহ, সমাধি, আগ্নেয়, বিষ্ণুজ, সৌর, সোম, ভাবন, সুপুমালী, বৈকুণ্ঠ, আর্চ্চিষ, বল্মী, বৈরাজ, গৌরী, মাহেশ্বর, পিতৃ। এতন্মধ্যে প্রথমোক্ত পঞ্চদশ কল্প ব্রহ্মার শুক্লপক্ষ এবং শেষোক্ত পঞ্চদশ কল্প ব্রহ্মার কৃষ্ণপক্ষ বলিয়া কথিত হয়। ব্রহ্মার আয়ু—শত বৎসর। তন্মধ্যে পঞ্চাশ বৎসর অর্থাৎ অষ্টাদশ সহস্র কল্প অতীত হইয়া গিয়াছে; এক্ষণে একপঞ্চাশৎ বৎসরের প্রথম শ্বেতবারাহ কল্প পুনরায় চলিতেছে। পুরাণ-সমূহের আলোচনায় বুঝিতে পারা যায়,—এক এক কল্পে, এক এক মন্বন্তরে, এক এক চতুর্যুগে,—চক্রনেমীর পরিবর্ত্তনের ন্যায় সৃষ্টি-প্রবাহ ঘুরিয়া ফিরিয়া পুনরায় আসিয়া উপস্থিত হয়। যে অবতার, যে শাস্ত্র, যে সৃষ্টি, যে বীজ,—পূর্ব্ব-কল্পে, পূর্ব্ব-মন্বন্তরে, বিদ্যমান ছিল; পর-কল্পে, পর মন্বন্তরে, তাহাই আবার রূপান্তরে প্রকাশমান্ হয়। সে হিসাবে, শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থ, প্রথম কল্পেও প্রচারিত ছিল, মধ্য কল্প-সমূহেও প্রচারিত হইয়াছিল, এখনও প্রচারিত আছে। সে হিসাবে, বরাহ-মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতার, দেব-দানব-গন্ধর্ব্ব-কিন্নর, পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ, স্থাবর-জঙ্গম-চরাচর, সকলই ছিল, সকলই উদ্ভূত হইয়াছিল, সকলই আছে। তবে, কর্ম্মভেদে, কালভেদে, তৎসমুদায়ের সামান্য রূপান্তর হয়,—এই মাত্র পার্থক্য। আজি যে বৃক্ষ শাখা-প্রশাখা-পত্র-ফল-পুষ্পে পরিশোভিত, অল্পদিন পরে সেই বৃক্ষের সেরূপ অস্তিত্ব লোপ পাইতে পারে। কিন্তু, তাই বলিয়া, সেই-বৃক্ষের যে ধ্বংস হইল, তাহা কোনক্রমেই বলা যায় না। দৃশ্যতঃ সেই বৃক্ষ ধ্বংস হইল বটে; কিন্তু-বীজরূপে তাহার যে অস্তিত্ব বিদ্যমান রহিল, কালে তাহাতেই আবার সেইরূপ বৃক্ষের উৎপত্তি হইতে পারে। বস্তুতঃ, দেশ-কাল পাত্র-প্রভাবে, বিকৃতি-বশতঃ, নবজাত বৃক্ষের সহিত

* মনু ও মন্বন্তর আলোচনা এই গ্রন্থের ১৬৭ ও ১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্ব-বৃক্ষের কোনও কোনও অংশের সাদৃশ্য না থাকিতে পারে; কিন্তু যে বৃক্ষের যে বীজ, তাহাতে সেইরূপ বৃক্ষই যে উৎপন্ন হইবে,—তদ্বিষয়ে সংশয় [illegible] না করি[illegible] আম্র-বৃক্ষ ধ্বংস হইলে, তাহার বীজে আম্র-বৃক্ষই উৎপন্ন হয়; নারিকেল-বৃ[illegible] [illegible] দ্বিতীয় নারিকেল-বৃক্ষেরই উৎপত্তি ঘটে। শাস্ত্রাদি-সম্বন্ধেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। [illegible]-কল্পে, যে বিষয় যে শাস্ত্রে যে ভাবে পরিবর্ণিত হইয়াছিল, পর-কল্পেও স্থূলতঃ সেই ভাবেই সেই বিষয় উদ্ভাসিত হয়। তবে, সামান্য যে পার্থক্য দৃষ্ট হয়; সে পার্থক্য—কল্প-প্রভাব মাত্র। হয় তো, কোনও কল্পের কোনও কার্য্যের সহিত পর-কল্পের কোনও কার্য্যের সামান্য বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছিল; সুতরাং, তাহার বর্ণনায়ও শাস্ত্রাদিতে সেইরূপ বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। যাঁহারা শাস্ত্রানুশাসন মান্য করেন, প্রধানতঃ তাঁহারা এইরূপেই শাস্ত্রবাক্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া থাকেন। সে হিসাবে শাস্ত্র-কথিত ঋতু-বিবর্ত্তন-দৃষ্টান্তই মনোমধ্যে উদয় হয়,—

"যথর্ত্তাবৃতুলিঙ্গানি নানারূপাণি পর্য্যয়ে। দৃশ্যন্তে তানি তান্যেব তথা ভাবা যুগাদিষু॥"

পর্য্যায়ক্রমে ঋতুর পুনরাবৃত্তি ঘটিলে, যেমন পূর্ব্ববৎ ঋতু-চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, যুগাদিতেও তদ্রূপ পূর্ব্ব-ভাব-পরম্পরার উৎপত্তি যথাযথ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পুরাণের মধ্যেই পুরাতত্ত্ব ও ইতিবৃত্ত সন্নিবিষ্ট। ভারতের অতীত-গৌরবের অতীত-ইতিহাস যদি অনুসন্ধান করিবার আবশ্যক হয়; প্রাচীন আর্য্য-হিন্দুর শৌর্য্য-বীর্য্য-বৈভবের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত যদি চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ করিতে চাও, পুরাণের অনন্ত-রত্ন-ভাণ্ডারে অনুসন্ধান কর;—দেখিবে,—স্তরে স্তরে সে রত্নরাজি সজ্জিত রহিয়াছে।

পুরাণে ইতিহাস।

কোন্ সময়ে কোন্ নৃপতি পৃথিবীতে একছত্র প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন; কোন্ সময়ে, কাহার রাজত্ব-কালে, ভারতবর্ষ কিরূপভাবে উন্নতির উচ্চতম সৌধ-শিখরে সমারূঢ় হইয়াছিল; পুরাণে, মনুষ্য-জাতির কর্ত্তব্য-নির্ণয়-ব্যপদেশে, ধর্ম্মোপদেশ প্রসঙ্গে, তাহা পরিবর্ণিত আছে। পুরাণে দেখিতে পাই,—প্রজাপালনার্থ ব্রহ্মা আপনিই আত্ম-সম্ভূত স্বায়ম্ভুব মনুরূপে আবির্ভূত হইলেন। সেই মনুর পুত্র প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ বিশেষ প্রসিদ্ধ। প্রিয়ব্রত পৃথিবীর অধীশ্বর ছিলেন। তিনি পৃথিবীকে সপ্তভাগে বিভক্ত করিয়া, আপন সাত পুত্রকে প্রদান করেন। এই বংশ বহু দিন পর্য্যন্ত পৃথিবীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই বংশের রাজা ভরত হইতেই ভারতবর্ষ নামের উৎপত্তি হয়। মনুর দ্বিতীয় পুত্র উত্তানপাদের বংশে মহামতি ধ্রুব জন্মগ্রহণ করেন। ধ্রুব-চরিত্র কে না অবগত আছেন? এই ধ্রুবের বংশে অঙ্গের ঔরসে বেণ-রাজার উৎপত্তি। বেণের অত্যাচারে তাঁহার পিতা পুরত্যাগ করিতে বাধ্য হন; প্রজাবর্গ উত্তেজিত হইয়া বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হয়। বেণের পুত্র পৃথু সদ্‌গুণসম্পন্ন ছিলেন। সুশাসন-সুপালনের গুণে তিনি সসাগরা ধরিত্রীর আধিপত্য লাভ করেন। এই পৃথু-বংশেই প্রাচীন-বর্হি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনিও পৃথিবীর একছত্র রাজ-চক্রবর্ত্তী ছিলেন। এইরূপে পর্য্যায়ক্রমে যে সকল রাজবংশ পৃথিবীতে এবং ভারতবর্ষে বহুকাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন, পুরাণ-সমুদ্র মন্থন করিলে, তাঁহাদের স্থূল স্থূল ইতিবৃত্ত সংগৃহীত হইতে পারে। পৃথিবী-বিখ্যাত চন্দ্র-বংশের এবং সূর্য্য-বংশের বৃত্তান্ত পুরাণের নানা স্থলে পরিবর্ণিত। সূর্য্য-বংশে ইক্ষ্বাকু, পুরঞ্জয়, পৃথু,

মান্ধাতা, দিলীপ, রঘু, দশরথ, রামচন্দ্র প্রভৃতি যে সকল নৃপতি জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের যশঃ-প্রভা অদ্যাপি দিগ্দিগন্তে বিচ্ছুরিত হইতেছে। চন্দ্র-বংশে পুরূরবা, নহুষ, যযাতি, যদু, পুরু, দিবোদাস, দিবোদাস, সুদাস প্রভৃতির যশোকীর্ত্তি কোথায় না পরিকীর্ত্তিত? এই চন্দ্রবংশেই পুরুবংশ, কুরুবংশ ও পাণ্ডব-বংশের উৎপত্তি। এই চন্দ্রবংশেরই যদু হইতে যদুবংশের উদ্ভব। এই চন্দ্র-বংশান্তর্গত যদুবংশেই ভগবান বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হয়। এই চন্দ্রবংশেই যুধিষ্ঠিরাদি রাজগণ জন্মগ্রহণ করেন। সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরের দূর অতীতের ইতিবৃত্ত পুরাণে যেরূপভাবে দেখিতে পাই; আবার কলির প্রথম-ভাগের ইতিবৃত্তও উহাতে সেইভাবে লিপিবদ্ধ আছে। জন্মেজয়ের বংশ হইতে নন্দ-রাজবংশ প্রভৃতির বর্ণনাও পুরাণে দৃষ্ট হয়। কোথায় কখন কোন্ রাজ-বংশের সহিত কোন্ রাজ-বংশের মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল; কোথায় কখন্ কিরূপ যুদ্ধ-বিগ্রহ উপস্থিত হইয়াছিল; কোথায় কখন কিরূপভাবে সৈন্য-সমাবেশ ও জয়-পরাজয় হয়;—তাহার বহুল বিবরণ পুরাণে পরিবর্ণিত রহিয়াছে। কোন্ সময়ে সমাজের কিরূপ অবস্থা ছিল, কোন্ সময়ে কিরূপ-ভাবে রাজকার্য্য পরিচালিত হইত, কোন্ সময়ে ধর্ম্ম-বিষয়ে কিরূপ বিচার-বিতণ্ডা উপস্থিত হইয়াছিল,—পুরাণে তাহারও উজ্জ্বল চিত্র প্রকটিত। এবম্বিধ বিবিধ বিষয়ের আলোচনায় যখন দেখিতে পাই,—ইতিহাসের উপাদানভূত সমাজ-তত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব, রাজনীতি-তত্ত্ব প্রভৃতি সকল তত্ত্বই পুরাণের অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছে; তখন পুরাণই যে প্রাচীন ইতিহাস, তাহাতে আর সংশয় আছে কি? *

পুরাণ-সমূহ কোন সময়ে রচিত হইয়াছিল, এবং তৎসমুদায়ের রচয়িতাই বা কে ছিলেন,—তদ্বিষয়ে অধুনা বিশেষ বাদানুবাদ চলিয়া থাকে। পুরাণ-সমূহ আলোড়ন করিলে,

বেদব্যাস ও পুরাণ-রচনা।

আমরা দেখিতে পাই,—কল্প-কল্পান্তর হইতে এই পুরাণ-সমূহ প্রচলিত আছে। এক এক কল্পের এক এক দ্বাপর যুগে, এক এক মহাপুরুষ বেদব্যাস রূপে অবির্ভূত হইয়া, পুরাণ-সমূহ প্রচার করিয়াছিলেন। ধর্ম্ম-রক্ষার জন্য প্রতি মন্বন্তরেরই দ্বাপর-যুগে স্বয়ং বিষ্ণু বেদব্যাসরূপে আবির্ভূত হন, এবং জগতের হিতাভিলাষে পুরাণ-সংহিতা প্রচার করেন। প্রথম দ্বাপরে ভগবান স্বয়ম্ভু, দ্বিতীয় দ্বাপরে প্রজাপতি মনু, তৃতীয় দ্বাপরে উশনঃ (শুক্র), চতুর্থ দ্বাপরে বৃহস্পতি, পঞ্চমে সবিতা (সূর্য্য), ষষ্ঠে মৃত্যু (যম), সপ্তমে ইন্দ্র, অষ্টমে বসিষ্ঠ, নবমে সারস্বত, দশমে ত্রিধামা, একাদশে ত্রিবৃষা (ত্রিবৃতা), দ্বাদশে ভরদ্বাজ, ত্রয়োদশে অন্তরীক্ষ, চতুর্দ্দশে বপ্রী (মতান্তরে ধর্ম্ম বা সুরক্ষণ), পঞ্চদশে ত্রয্যারুণ (আরুণি), ষোড়শে ধনঞ্জয় (যোসঞ্জ), সপ্তদশে কৃতঞ্জয় (মেধাতিথি), অষ্টাদশে ঋণজ্য (ঋতঞ্জয় বা ব্রতী), ঊনবিংশে ভরদ্বাজ (অত্রি), বিংশে গৌতম (বাচঃশ্রবা), একবিংশে হর্য্যাত্মা (বাচস্পতি), দ্বাবিংশে বাচঃশ্রবা বেণ (শুক্লায়ণ), ত্রয়োবিংশে তৃণবিন্দু (সোম), চতুর্ব্বিংশে ঋক্ষ বাল্মিকী (তৃণবিন্দু), পঞ্চবিংশে শক্তি (ভার্গব), ষড়্বিংশে পরাশর (মতান্তরে শক্তি), সপ্তবিংশে জাতুকর্ণ, এবং অষ্টাবিংশে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হন। ইহার পরবর্ত্তী দ্বাপর যুগে, দ্রু

* পুরাণ-বর্ণিত রাজবংশ-সমূহের আলোচনা, পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদান্তরে দ্রষ্টব্য।

ভবিষ্যতে, দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা ব্যাসরূপে জন্ম পরিগ্রহ করিবেন।* বর্ত্তমান বরাহ-কল্পের অষ্টাবিংশতিতম দ্বাপর-যুগে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বর্ত্তমান পুরাণ-সমূহ রচনা করিয়াছিলেন,—তদনুসারে ইহাই প্রতিপন্ন হয়। বেদব্যাস যে পুরাণ-সমূহ রচনা করিয়াছিলেন, সকল পুরাণে বিশেষ-ভাবে তাহার উল্লেখ নাই বটে; কিন্তু বিষ্ণু-পুরাণে দেখিতে পাই,—

"আখ্যানৈশ্চাপ্যুপাখ্যানৈর্গাথাভিঃ কল্পসিদ্ধিভিঃ। পুরাণ-সংহিতাং চক্রে পুরাণার্থবিশারদঃ॥

প্রখ্যাতো ব্যাসশিষ্যোঽভূৎ সূতো বৈ রোমহর্ষণঃ। পুরাণ-সংহিতাং তস্মৈ দদৌ ব্যাসো মহামুনিঃ॥"

অর্থাৎ, পুরাণার্থ-বিশারদ বেদব্যাস, আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা ও কল্পশুদ্ধির সহিত পুরাণ-সংহিতা রচনা করেন; রোমহর্ষণ সূত নামে তাঁহার যে বিখ্যাত শিষ্য ছিলেন, মহামুনি ব্যাস সেই শিষ্যকে পুরাণ-সমূহ অধ্যয়ন করান। দেবী-ভাগবতে স্পষ্টতঃ লিখিত আছে,—সত্যবতী-নন্দন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস অষ্টাদশ পুরাণ রচনা করিয়া, পুরাণ-পরিশিষ্ট অতুলনীয় মহাভারত প্রণয়ন করেন। বরাহ-পুরাণেও "অষ্টাদশ পুরাণানি বেদ দ্বৈপায়নো গুরুঃ", অর্থাৎ দ্বৈপায়ন অষ্টাদশ পুরাণে অভিজ্ঞ—এবম্বিধ উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে সূত বলিতেছেন,—"যাবতীয় পুরাণ ও ইতিহাসের সার-সংগ্রহ-পূর্ব্বক নিখিল-বেদ-তুল্য শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ বেদব্যাস রচনা করেন, এবং আপন পুত্র ধীমান্ শুকদেবকে তাহা অধ্যয়ন করান।" ঐ গ্রন্থেরই আবার অন্যত্র দেখিতে পাই, বেদব্যাসকে নারদ বলিতেছেন,—'আপনি সর্ব্ব-ধর্ম্ম-পূরিত মহাভারত প্রণয়ন করিয়াছেন; এখন বাসুদেব-চরিত্র বর্ণনা করুন।' কথিত হয়, নারদের সেই উক্তির ফলেই বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিয়াছিলেন। পদ্ম-পুরাণের পাতাল-খণ্ডে আছে,—"ব্যাসাদয়ো মুনিবরা যৎ প্রোচুস্তদ্ধারয়েৎ", ব্যাসাদি মুনিগণ যে পুরাণ বলিয়া গিয়াছেন, তাহাই পাঠ করিবে। ঐ পুরাণেরই স্বর্গ-খণ্ডে সূত বলিতেছেন,—'আমি প্রসঙ্গক্রমে গুরুর নিকট ইহা শুনিয়াছিলাম।' কল্কি-পুরাণেও সূতের বাক্যে প্রতিপন্ন হয়,—স্বীয় পুত্র ব্রহ্মরাতের নিকট কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কল্কি-পুরাণ-কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।† এইরূপে পুরাণ-সমূহ আলোচনা করিলে, সর্ব্বত্রই বেদব্যাসের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। কোথাও তিনি রচয়িতা, কোথাও তিনি বক্তা, কোথাও তিনি উপদেষ্টা, আবার কোথাও তিনি শিক্ষাদাতা। যে কারণেই হউক, সাধারণতঃ অষ্টাদশ-মহাপুরাণ এবং অধিকাংশ উপপুরাণ ব্যাস-বিরচিত বলিয়াই প্রচারিত। ব্যাস-বিরচিত,—সুতরাং দ্বাপরের শেষভাগে, কলির প্রারম্ভে, পঞ্চ-সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে, পুরাণ-সমূহ রচিত হইয়াছিল,—ইহাই হিন্দু-মাত্রের সাধারণ মত। পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-কল্পে কোন্ সময়ে কিরূপ-ভাবে পুরাণ-সমূহ প্রচারিত ছিল, তাহার কাল-নির্ণয়ে কল্পনাও পরাভূত হয়। যাহা হউক, সাধারণতঃ এতদ্দেশে পুরাণাদি

---

* বিষ্ণুপুরাণ, তৃতীয় অংশের তৃতীয় অধ্যায়; ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ, ত্রয়োবিংশ অধ্যায়; দেবী-ভাগবত, প্রথম স্কন্ধ, তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

† বিষ্ণু-পুরাণ, তৃতীয় অংশ, ষষ্ঠ অধ্যায়, ১৬শ শ্লোক; দেবীভাগবত, প্রথম স্কন্ধ, তৃতীয় অধ্যায়, ২১শ শ্লোক; বরাহ-পুরাণ, দ্বাদশাধিক শততম অধ্যায়, ৬৯শ শ্লোক; শ্রীমদ্ভাগবত, প্রথম স্কন্ধ, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়; পদ্মপুরাণ, পাতালখণ্ড, সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়, ৬২শ শ্লোক; ঐ স্বর্গখণ্ড, চতুস্ত্রিংশৎ অধ্যায়, ৩১শ শ্লোক; কল্কিপুরাণ, প্রথম অধ্যায়, ৯ম শ্লোক।

সম্বন্ধে এই মত প্রচলিত হইলেও, বর্ত্তমান-কালোচিত পরিমাপ-দণ্ডে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের গবেষণার ফলে, পুরাণাদির রচয়িতা ও রচনা-কাল বিষয়ে, পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে নানা মতান্তর দেখিতে পাই। তাঁহাদের মতে,—'পুরাণ-সমূহ বেদব্যাস-নামধেয় কোনও নির্দ্দিষ্ট এক ব্যক্তির রচনা হওয়া সম্ভবপর নহে। তিনি সংগ্রহকার হইতে পারেন; কিন্তু তিনি যে রচনাকার, তাহা কোনক্রমেই বুঝা যায় না। হয় তো, পূর্ব্ব-পূর্ব্ব কালে ভিন্ন ভিন্ন ঋষিগণ পুরাণ-সমূহ রচনা করিয়া গিয়াছিলেন, এবং বেদব্যাস তাহা সংগ্রহ করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। বেদ-সংগ্রহ করিয়া, বেদ-বিভাগ জন্য, তিনি যেমন বেদব্যাস নামে পরিচিত হন; পুরাণ-সমূহ সংগ্রহ করিয়াও সেইরূপ পুরাণ-প্রণেতা বলিয়া তাঁহার প্রসিদ্ধি লাভ অসম্ভব নহে। ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে, শাক্ত-শৈব-বৈষ্ণব-গাণপত্য প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইয়াছে, সুতরাং পুরাণ-পরম্পরা এক জনের রচিত বলিয়া মনে করিতে পারা যায় না। বেদব্যাসের ন্যায় পণ্ডিত ব্যক্তির মতি স্থির থাকিবে না, তিনি নানা সময়ে নানা মত প্রচার করিবেন,—ইহা কোনক্রমেই বিশ্বাস হয় না। অধিকন্তু, বেদব্যাস কর্ত্তৃক পুরাণ-সমূহ সংগৃহীত হওয়ার পরও উহাতে নানা বিষয় নূতন সংযোজিত হইয়াছে। যখনই ভারতবর্ষে যে সম্প্রদায় প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদেরই প্রতিষ্ঠা-স্থাপনের জন্য—হয় কোনও নূতন পুরাণ রচিত হইয়াছে—নচেৎ কোনও প্রাচীন পুরাণে তাঁহাদের মত-পরম্পরা তাঁহারা সন্নিবিষ্ট করিয়া গিয়াছেন।'— এইরূপ নানা যুক্তি-তর্কের পর, পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ প্রধানতঃ স্থির করিয়াছেন,—'খৃষ্ট-জন্মের বহু পরবর্ত্তি-কালে পুরাণ-সমূহ রচিত হইয়াছে।' তাঁহাদের কেহ-বলেন,—পাঁচ শত হইতে হাজার খৃষ্টাব্দের মধ্যে; কেহ বলেন,—ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে; কেহ বলেন,—মুসলমান-শাসনের পরবর্ত্তি-কালে; কেহ বলেন,—পঞ্চদশ-শতাব্দীর শেষভাগে। এইরূপ নানা-জনের নানা-মত দেখিতে পাওয়া যায়। কাহারও মতে,—'পুরাণ-মাত্রেই বুদ্ধ-দেবের বৃত্তান্ত লিখিত আছে; সুতরাং বুদ্ধ-জন্মের পরবর্ত্তি-কালে পুরাণ-সমূহ রচিত হওয়া সম্ভবপর।' কেহ বলেন,—'খৃষ্টীয় পঞ্চদশ-শতাব্দীর মধ্যভাগে বল্লভাচার্য্য বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তনা করেন; শ্রীমদ্ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের—রাধা-কৃষ্ণের—প্রাধান্য কীর্ত্তিত হইয়াছে; সুতরাং, ঐ দুই গ্রন্থ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত হইয়াছিল।' ভাগবতে ম্লেচ্ছ-রাজার অধিকার ও ম্লেচ্ছদেশ প্রভৃতির উল্লেখ দৃষ্টে এবং স্কন্দ-পুরাণে জগন্নাথ-দেবের মন্দির প্রভৃতির বর্ণনা দেখিয়া, (জগন্নাথের মন্দির খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছে, এই অনুমানে), ঐ দুই পুরাণকে তাঁহারা আধুনিক বলিয়া মনে করেন। কিন্তু যাঁহারা একটু অভিনিবেশ-সহকারে পুরাণ-সমূহ আলোচনা করিয়াছেন; যাঁহারা একটু ধৈর্য্য-সহকারে পুরাণ-সমুদ্রের গভীরতার মধ্যে অবগাহন করিতে পারিয়াছেন; কি প্রাচ্য, কি পাশ্চাত্য—যিনিই হউন না কেন, তাঁহাকে নিশ্চয়ই পুরাণের প্রাচীনত্বে বিস্মিত হইতে হইয়াছে। অনেকেই জানেন, পশ্চাত্য-পণ্ডিত-গণের মধ্যে অধ্যাপক এইচ্-এইচ্ উইলসন পুরাণ-সম্বন্ধে বিশেষরূপ আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার অনুবাদিত বিষ্ণু-পুরাণ পাশ্চাত্য-জগতে বিশেষ সমাদৃত হইয়াছে। তিনি কিন্তু পুরাণ-সমূহের কাল-নির্ণয় সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"খৃষ্ট-জন্মের তিন শত বৎসর পূর্ব্বে পুরাণ-

সমূহের বিদ্যমানতা প্রতিপন্ন তো হয়-ই ; অধিকন্তু, তৎসম্বন্ধে যে প্রমাণ-পরম্পরা দৃষ্ট হয়, তাহাতে অতীতের অধিকতর দূরে—এমন কি, প্রাচীন পৃথিবীর কোনও জাতির কল্পনাও যাহা আসিতে পারে না, তত দূরে—পুরাণ-সমূহের অস্তিত্ব নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে।" * উইল্‌সনের সিদ্ধান্তের প্রধান কারণ এই বলিয়া মনে হয়,—তিনি বিষ্ণু-পুরাণে ভবিষ্য-রাজবংশ-বর্ণনায় বুদ্ধদেবের এবং নন্দ-বংশের বিবরণ দেখিতে পাইয়াছেন। তিনি দেখিয়াছেন,—নয় জন নন্দ-বংশীয়ের উচ্ছেদের পর, চাণক্যের কৌশলে চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। † তিনি আরও দেখিয়াছেন,—তৎপরবর্ত্তী কতকগুলি রাজার বিবরণ—এমন কি, কাশ্মীর প্রভৃতি কয়েকটী দেশে ম্লেচ্ছাধিকারের উল্লেখ আছে। তাই তাঁহার মনে ঐ সময়ের ছায়া আসিয়া পতিত হইয়াছে। খৃষ্ট-জন্মের তিন শত সত্তর বৎসর পূর্ব্বে নন্দ রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পরবর্ত্তী বিষ্ণু-পুরাণোল্লিখিত রাজগণের শাসনকাল শত-বৎসরের মধ্যে পরিসমাপ্তি হইয়াছে মনে করিয়া, উইল্‌সন ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকিবেন। কিন্তু পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি,—দ্বাপরের শেষ ভাগে, কলির প্রারম্ভে, প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বিদ্যমান ছিলেন, এবং তিনিই পুরাণ-সমূহের প্রবর্ত্তক ;—সাধারণ হিন্দুমাত্রের তাহাই বিশ্বাস। পুরুষ-পরম্পরায় কিংবদন্তী-রূপে মুখে মুখে সেই মতই চলিয়া আসিতেছে। গণনায় বিশ-পঞ্চাশ বৎসর বা শতাব্দীর পার্থক্য ঘটিতে পারে ; কিন্তু তাই বলিয়া একেবারে সাড়ে-চারি-হাজার পাঁচ-হাজার বৎসরের ব্যবধান কোনক্রমেই সম্ভবপর নহে। সে হিসাবে, পুরাণ-পরম্পরার কাল-নির্দ্দেশে কোন্ মত সমীচীন বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে ? যদি পুরাণ-পরম্পরা পাঁচ-সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বেই প্রচলিত হওয়া সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে পরবর্ত্তি-কালের ঘটনাবলি উহাতে বর্ণিত রহিবে কেন ? তাহা হইলে, উহাতে জন্মেজয়-বংশের কথা, নন্দ-বংশের কথা, চাণক্য-চন্দ্রগুপ্ত-অশোকের কথাই বা সন্নিবিষ্ট দেখিব কেন ? তাহা হইলে, বেদাচার-শূন্য ম্লেচ্ছেরা, সিন্ধুতীর, চন্দ্রভাগা, কৌন্তীয় ও কাশ্মীর-মণ্ডল পালন করিবে,—এ কথাই বা লিখিত থাকিবে কেন ? তাহা হইলেই বা, ষোড়শ কল্পের পর, আট জন যবন, চৌদ্দ জন তুরস্ক, দশ জন গুরুণ্ড, এগার জন মোল, রাজা হইবে,—এ কথারই বা উল্লেখ দেখিব কেন ? ‡ আপত্তি প্রধানতঃ এইরূপই উঠিতে পারে ; উঠাও অস্বাভাবিক নহে। তবে, এবম্বিধ কতকগুলি বিষয় বিশেষ বিশেষ পুরাণে সন্নিবিষ্ট আছে বলিয়াই যে সেই সেই সময়ে বা তাহার পরবর্ত্তি-কালে পুরাণ-সমূহ বিরচিত হইয়াছিল, তাহাও মনে করা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। ভবিষ্যতে অমুক-বংশ রাজত্ব করিবে বা অমুক-ঘটনা সঙ্ঘটিত হইবে,—এই দেখিয়া যদি কাল-নির্ণয় করিতে হয়, তাহা হইলে কাল-নির্ণয়ের সময় এখনও আসিয়াছে বলিয়া মনে হয় না ; তাহা হইলে, কাল-

---

* "And the testimony that establishes their (Purans') existence three centuries before Christianity, carries it back to a much more remote antiquity—to an antiquity that is probably not surpassed by any of the prevailing fictitious institutions or beliefs of the ancient world"—Professor H. H. Wilson.

† শ্রীমদ্ভাগবত, দ্বাদশ স্কন্ধ, প্রথম অধ্যায়ের অষ্টাবিংশতি এবং সপ্তত্রিংশৎ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

‡ বিষ্ণু পুরাণ, চতুর্থাংশ, চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়, ভবিষ্য-রাজবংশ-বর্ণন প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

নির্ণয়ের জন্য এখনও প্রায় চারি লক্ষ সাতাইশ হাজার বৎসর অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে; যেহেতু, এখনও ঐ পরিমাণ বৎসর অতীত হইলে, সত্য-সন্ধি-সময়ে, কল্কি-অবতার জন্মগ্রহণ করিবেন,—সে কথা পুরাণে লিখিত আছে। তাহা হইলে, সেই সময়ের পরবর্ত্তি-কালের লোকেও এই সকল পুরাণ সেই সময়ে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে করিবে না কি? ঋষিগণ ত্রিকালজ্ঞ ছিলেন; তাঁহারা ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান—সর্ব্বকালের সমাচার ধ্যানযোগে জ্ঞান-প্রভাবে অবগত হইতে পারিতেন। সুতরাং ভবিষ্য-বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া প্রচার করায়, ভবিষ্যৎ-কালে তাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া মানিয়া লইতে পারা যায় না। আজি-কালি বিজ্ঞানোন্নতির দিনে, জ্যোতির্গণনাক্রমে আমরা স্থির করিতে পারি—কোন্ বর্ষের কোন্ সময়ে কোন্ প্রদেশে কিরূপভাবে চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্য্যগ্রহণ হইবে; পঞ্জিকাদিতেও বহুতর ভবিষ্য-ঘটনা লিপিবদ্ধ থাকে, এবং তাহা যথার্থ মিলিয়া যায়। অথচ, আমরা কখনই বলি না,—সেই জ্যোতির্গণনা বা পঞ্জিকার বিষয়-পরম্পরা, তত্তৎ ঘটনা সংঘটিত হইবার পরবর্ত্তি-কালে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহা যদি না হয়, আমাদের পঞ্জিকাদির জ্যোতির্গণনায় যদি ভবিষ্য-বিষয় নির্দ্দেশ করিতে পারি, তাহা হইলে, পরম-যোগী ঋষিগণের ভবিষ্য-সিদ্ধান্তকেই বা কেন বিশ্বাস না করিব? হইতে পারে, যে পদ্ধতি-ক্রমে, যে যোগ-সাধনার গুণে, তাঁহারা ত্রিকালের সমাচার অবগত হইতে পারিতেন; সে পদ্ধতি, সে সাধনা, এখন বিলুপ্ত-প্রায়;—অধুনা আমরা তাহার ধ্যান-ধারণা করিতেও সমর্থ নহি। কিন্তু তাই বলিয়া পুরুষ-পরম্পরা-প্রচলিত মতের একেবারে বিলোপ-সাধন সহসা কর্ত্তব্য কি? বরং বিচার করিয়া দেখা উচিত,—প্রচলিত মতের সহিত কেনই বা এরূপ অসামঞ্জস্য ঘটিতেছে। ইহারও প্রধান কারণ,—কল্প-মন্বন্তর-যুগাদির ক্রম-বিবর্ত্তন এবং তদ্বিষয়ে ধ্যান-ধারণা-অভিজ্ঞতার অভাব। পুরাণের নির্দ্দেশ অনুসারে বুঝিতে পারি,—কল্প এক নহে, মনু এক নহেন, মন্বন্তর এক নহে, বেদব্যাসও এক নহেন, রাম-কৃষ্ণাদি অবতারও এক নহেন। আবশ্যক অনুসারে কল্পে কল্পে তাঁহাদের আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়া থাকে। সে হিসাবে, আমরা দেখিতে পাই,—অগ্নি-পুরাণ ঈশান-কল্পে, ভাগবত-পুরাণ সারস্বত-কল্পে, এবং মৎস্য-পুরাণ বরাহ-কল্পে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ঐ সকল পুরাণে তত্তৎ-কল্পের ঘটনা-পরম্পরা লিপিবদ্ধ আছে। অন্যান্য পুরাণেও ঐরূপ এক এক কল্প-মন্বন্তরের পরিচয় পাওয়া যায়। যাঁহারা বলেন,—ভারতবর্ষে শৈব-মতের প্রাধান্য-কালে, অর্থাৎ বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বিলোপ-সাধনে শৈব-ধর্ম্মের প্রাবল্য হইলে, শৈব-পুরাণ-সমূহ এবং বৈষ্ণব-মতের প্রাধান্য-কালে, বিষ্ণু-মাহাত্ম্য প্রচারের সময়, বৈষ্ণব-পুরাণ-সমূহ প্রচারিত হইয়াছিল; তাঁহাদের বিশ্বাস,- খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে ঐ সকল পুরাণ রচিত হয়। কিন্তু পৌরাণিকগণের মতে,—'সেইরূপ শৈব-প্রাধান্য বা বৈষ্ণব-প্রাধান্য, সৌর-প্রাধান্য বা গাণপত্য-প্রাধান্য, কল্পে কল্পে যুগে যুগে প্রতি মন্বন্তরে হইয়া থাকে। শীতের পর যেমন শীত আসে, বর্ষার পর যেমন আবার বর্ষা আসে, গ্রীষ্মের পর যেমন আবার গ্রীষ্ম ফিরিয়া আসে; সেইরূপ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের, সত্ত্বরজস্তমের, প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠার দিনও পর্য্যায়ক্রমে সংসারে আসিয়া উপস্থিত হয়। পুরাণ-সমূহ তত্তৎ ভাবের উন্মেষ করিয়া

দেয় মাত্র। বীজরূপে পুরাণের অস্তিত্ব আছে বলিয়াই সেই ভাব জাগিয়া উঠে।' আরও এক কথা,—পুরাণ-সমূহে যে সকল আধুনিক ঘটনা পরিবর্ণিত আছে, অর্থাৎ যে সকল ঘটনা ভবিষ্য-কালে ঘটিবে বলিয়া উক্ত হইয়াছে; একটু সাধারণভাবে আলোচনা করিয়া দেখিলেও, তদ্বিষয়ে নানা কথা মনে আসিতে পারে। নন্দ-বংশের বা অশোক-চন্দ্রগুপ্তের নাম যে ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে; বুদ্ধাবতারের বিষয় যে ভাবে বর্ণিত আছে; ম্লেচ্ছ বা যবন-রাজগণের যেরূপ পরিচয় দেখা যাইতেছে;—তাহাতে তত্তদ্বিষয়ের কোনরূপ প্রাধান্য বুঝিতে পারা যায় না। সেই সমুদায় ব্যাপার যদি গ্রন্থকারের দৃষ্ট-সামগ্রী বা নিকটস্থিত অতীত ঘটনা হইত, তাহা হইলে, তৎ-সমুদায়ের বর্ণনায় উপেক্ষা করিয়া, অদৃষ্ট-বিষয়ের—দূর অতীতের ঘটনা-পরম্পরার—বর্ণনায় এতাধিক বাহুল্য দৃষ্ট হইত না। ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য বৌদ্ধগণের সহিত শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যের কি বিষম সংঘর্ষই চলিয়াছিল! যদি পুরাণ-রচনার পূর্ব্ববর্ত্তি-কালের ঘটনা হইত, পুরাণে তাহা স্থান পাইত না কি? শঙ্করাচার্য্য, ভগবানের অবতার বলিয়া কীর্ত্তিত হন; অথচ, তাঁহার নাম পুরাণ-সমূহে স্থান পাইল না,—ইহারই বা কারণ কি? তার পর, ভবিষ্য-পুরাণাদিতে আকবর প্রভৃতির নাম ও কলিকাতা রাজধানার বর্ণনা দেখিতে পাই; কিন্তু অনুক্রমণির সহিত তাহার কোনই সামঞ্জস্য নাই। দৃষ্টান্তস্থলে, বিষ্ণু-পুরাণের প্রারম্ভে ঋষিগণের প্রশ্ন উল্লেখ করিতেছি। মৈত্রেয় পরাশরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে ব্রহ্মণ! জগতের যাহা উপাদান, চরাচরের যাহা উৎপত্তি-স্থান, আকাশাদির পরিমাণ, দেবাদির উৎপত্তি, সমুদ্র-পর্ব্বত-পৃথিবীর স্থিতি, সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহের সংস্থান ও পরিমাণ, দেবতাদিগের বংশ, কল্প-কল্পান্তরের বিবরণ, দেবর্ষি ও রাজাদিগের চরিত্র, ব্রাহ্মণাদি বর্ণের আশ্রম-ধর্ম্ম, আমার নিকট বর্ণনা করুন।" এই প্রশ্নের উত্তরে, বিষ্ণু-পুরাণের প্রথম হইতে তৃতীয় অংশ, পঞ্চম অংশ ও ষষ্ঠ অংশ পরিপূর্ণ। চতুর্থ অংশেও, বংশ-বিস্তার বর্ণন-প্রসঙ্গে, বিংশ অধ্যায় পর্য্যন্ত বিশেষ কোনই অসামঞ্জস্য নাই; কেবল-মাত্র ত্রয়োবিংশ ও চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদে দুই-চারিজন ভবিষ্য-নৃপতির নামোল্লেখ আছে। কিন্তু তাহারও অধিকাংশ নাম-সম্বন্ধে সংশয়ান্বিত হইতে হয়। ভবিষ্য-রাজ-বংশ-বর্ণন সম্বন্ধে মৈত্রেয় কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন নাই। অথচ, উত্তরের সময় পরাশর কেন সে প্রসঙ্গের উত্থাপন করিলেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। অপিচ, "সিন্ধুতট, দার্ব্বী, কর্ব্বী, চন্দ্রভাগা ও কাশ্মীর প্রভৃতিকে ম্লেচ্ছ ও ব্রাত্য শূদ্রগণ ভোগ করিবে",—এতদুক্তিতেও মুসলমানের ভারতাধিকারের কোনও তথ্যেরই সন্ধান পাওয়া যায় না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—পুরাণ-সমূহ এখন যথাযথ বিদ্যমান নাই। অধুনা যাহা পুরাণ বলিয়া জন-সমাজে সমাদৃত, তাহার মধ্যে অসম্পূর্ণতা ও প্রক্ষিপ্ত-ভাব বর্ত্তমান। পুরাণের মধ্যে বেদব্যাসের রচিত, কথিত বা সংগৃহীত অংশ অনেক আছে সত্য; কিন্তু উহার সকল অংশ যে তাঁহার প্রবর্ত্তিত নহে,—নানা প্রকারে তাহা প্রতীত হয়। হইতে পারে,—বেদব্যাস পুরাণ-সমূহ শিষ্য-মণ্ডলীর নিকট বিবৃত করিয়াছিলেন; হইতে পারে,—বর্ত্তমান-প্রচলিত পুরাণ-সমূহের কোনও কোনও অংশ তিনি রচনাও করিয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু সকল অংশ বর্ত্তমান আকারে যে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল,

তাহার প্রমাণাভাব; পরন্তু, তৎসম্বন্ধে বিরুদ্ধ-ধারণই মনোমধ্যে উদয় হইতে পারে। প্রথমতঃ, পুরাণ-সমূহের বহু স্থলে বেদব্যাসের গুণানুকীর্ত্তন আছে। বেদব্যাসের ন্যায় সুপণ্ডিত মহাপুরুষ আপন মুখে আপন গ্রন্থে আপন গুণ-কীর্ত্তন করিবেন,—কোনক্রমেই তাহা বিশ্বাস হয় না। সেই সকল যশোঘোষণা অপরের মুখ দিয়া উক্ত হইয়াছে সত্য; তথাপি বেদব্যাস যদি স্বয়ং ঐ সকল গ্রন্থ রচনা করিতেন, তাহা হইলে সেরূপ প্রশংসা তিনি আপনার গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবিষ্ট রাখিতে পারিতেন না;—অন্ততঃ বর্ত্তমানকালোচিত জ্ঞান-বুদ্ধিতে তাহাই মনে হইতে পারে। বিষ্ণু-পুরাণে লিখিত আছে,—"কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে সাক্ষাৎ প্রভু নারায়ণ বলিয়া বিবেচনা করিবে;—"কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-ব্যাসং বিদ্ধি নারায়ণং প্রভুম্।" যদিও পিতা পরাশর কর্ত্তৃক এই কথা উক্ত হইয়াছে, কিন্তু বেদব্যাস স্বয়ং ঐ গ্রন্থ রচনা করিলে, আপনার মাহাত্ম্য-কথা এরূপভাবে লিপিবদ্ধ করিতে পারিতেন কি? শিবপুরাণেও এইরূপ "ব্যাসপূজনম্" নামে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় আছে। সে অধ্যায়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের গুণকীর্ত্তন-সম্বন্ধে নিম্ন-লিখিত উক্তি দেখিতে পাই,—

"আচার্য্য ত্বং মহাবিষ্ণুর্ব্যাসরূপ নমোঽস্তু তে। প্রসন্নে ত্বয়ি বিপ্রেন্দ্র প্রসন্নো মে সদাশিবঃ॥"

'হে আচার্য্য! তুমি মহাবিষ্ণু। হে ব্যাসরূপ! তোমাকে প্রণাম। হে বিপ্রেন্দ্র! তুমি প্রসন্ন হইলেই, আমার প্রতি শিব প্রসন্ন হইবেন।' শ্রীমদ্ভাগবতেও বেদব্যাসের ভূয়সী প্রশংসা আছে। কল্কি-পুরাণে আবার দেখিতে পাই,—পুরাণকার বেদব্যাসের প্রণামচ্ছলে বলিতেছেন,—

"লোমহর্ষণজং সর্ব্বপুরাণজ্ঞং সংযতব্রতম্। ব্যাসশিষ্য মুনিবরং তং সূতং প্রণমাম্যহম্॥"

সর্ব্বপুরাণজ্ঞ সংযত-ব্রত ব্যাস-শিষ্য লোমহর্ষণ-পুত্র সূতকে প্রণাম করি। বেদব্যাস যদি এই পুরাণের রচয়িতা হইতেন, তাহা হইলে শিষ্য সূতকে কি জন্য প্রণাম করিবেন? কূর্ম্ম-পুরাণের পূর্ব্ব-ভাগে পঞ্চাশৎ অধ্যায়ে বেদব্যাস বিষ্ণুর অবতার-রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। তাহাতে লিখিত আছে,—'বিষ্ণু নারায়ণ স্বয়ং শ্রীহরি স্বেচ্ছাক্রমে বিশুদ্ধান্তরাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস-রূপে জন্মগ্রহণ করেন।' বেদব্যাস স্বয়ং যদি পুরাণ-রচয়িতা হইতেন,—জানি না, তাহা হইলে আপনাকে ভগবানের অবতার বলিয়া কীর্ত্তন করিতে পারিতেন কি না! দ্বিতীয়তঃ, শ্রীমদ্ভাগবতে সূত বলিতেছেন,—নদীর মধ্যে যেমন গঙ্গা, দেবতার মধ্যে যেমন বিষ্ণু, ভক্তের মধ্যে যেমন মহাদেব, পুরাণের মধ্যেও তেমনি ভাগবত শ্রেষ্ঠ।

"নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা। বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা॥"

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে আবার দেখিতে পাই,—'নদী-নিকর মধ্যে গঙ্গা যেমন সদ্যঃ-মুক্তি-প্রদায়িনী, বর্ষ-সমূহের মধ্যে ভারতবর্ষ যেমন মঙ্গলময় ও সদ্যঃ-মুক্তি-প্রদ, পুষ্প মধ্যে যেমন পারিজাত, বৃক্ষ মধ্যে যেমন কল্প, সুরগণের মধ্যে যেমন সুরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, রাজগণ মধ্যে যেমন শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীগণের মধ্যে শ্রীরাধিকা যেমন প্রাণাধিকা, সর্ব্বোৎকৃষ্ট সেইরূপ সর্ব্ব-পুরাণ মধ্যে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।' একই বেদব্যাসের পুরাণ, একই বেদব্যাসের লেখনা হইতে এরূপ বিশেষণে কেন বিশেষিত হইল? এই সকল স্থলে, তাঁহার ন্যায় মহাপুরুষের মতের এরূপ অসামঞ্জস্য ঘটিবার কারণ কি? তৃতীয়তঃ, পুরাণ-সমূহে দেখিতে পাই, কোথাও সূত পুরাণ-বর্ণন করিতেছেন; কোথাও শুকদেব পুরাণ-বর্ণন করিতেছেন;

কোথাও পরাশর পুরাণ বর্ণনা করিতেছেন ; কোথাও বেদব্যাস আপনিই বর্ণনা করিতেছেন। প্রায় সকল পুরাণের আরম্ভেই দেখিতে পাই,—তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ঋষিগণ, কখনও বা পরাশরকে, কখনও বা সূতকে, কখনও বা সৌতিকে, নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন ; আর তাঁহারা সেই সেই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে সৌনকাদি ঋষিগণ সূতের নিকট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। ব্যাসদেব সূতকে যাহা উপদেশ দিয়াছিলেন, সূত তাহাই বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হন। পরীক্ষিতের নিকট শুকদেব আবার সেই বিষয় বর্ণন করিয়াছিলেন। পুনশ্চ, শুকদেবের কথায় প্রকাশ,—মহর্ষি ব্যাসদেব যখন সরস্বতীতীরে পরব্রহ্ম ধ্যান করিতেছিলেন, মহর্ষি নারদ সেই সময় তাঁহাকে ঐ ভাগবত বলিয়াছিলেন। অতএব সহজেই বুঝিতে পারা যায়,—কিরূপ ভাবে কাহার নিকট হইতে আসিয়া, পুরাণ-সমূহ কি আকার ধারণ করিয়া আছে। বেদব্যাসের নিকট যে সকল পুরাণ-কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তি-কালে সূত তাহাই বর্ণন করেন; পরিশেষে কিছুকাল মুখে মুখে প্রচারিত থাকিয়া, তৎসমুদায় লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। মূলে বেদব্যাসের প্রবর্ত্তনা, তাহাতে সংশয় নাই ; যেহেতু, তৎশিষ্য সূতই অধিকাংশ স্থলে বক্তা এবং ঋষিগণ শ্রোতা। অধিকন্তু, সূত-কথিত পুরাণ-সমূহই যে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, পুরাণের আলোচনায় অনেক স্থলে তাহাই প্রতিপন্ন হয়। পুরাণের লক্ষণ ও অনুক্রমণি মিলাইয়া বেদব্যাস-সদৃশ কোনও জ্ঞানবান্ ব্যক্তি আবার যদি কখনও উহার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা পান, হয় তো সারভূত পুরাণ-তত্ত্বের উদ্ধার হইতে পারে। তাহা হইলে, কোন্ পুরাণের কতটুকু ব্যাসের উক্তি, কতটুকু তাঁহার শিষ্য-পরম্পরার উক্তি, আর কতটুকুই বা লিপিকারগণের সংযোজনের ফল,—তদ্বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে।

পুরাণ-সমূহ প্রধানতঃ শ্রুতি-স্মৃতি-দর্শনের অনুসারী। পুরাণ-বর্ণিত সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্ম্ম-বিষয়ক আচার-ব্যবহার তাই অনেকাংশে শ্রুতি-স্মৃতি-দর্শনের মতানুবর্ত্তী। দর্শন-তত্ত্ব সকল পুরাণে বিশদ-ভাবে আলোচিত। স্মৃতির অনুশাসনে প্রায় সকল পুরাণই পরিচালিত। পুরাণের মধ্যে সাঙ্খ্য-বেদান্তের নিগূঢ় নিঃশ্রেয়স-তত্ত্ব আছে ; আবার, পুরাণের মধ্যে স্মৃতি-নির্দ্দিষ্ট দেব-দেবীর পূজা-পদ্ধতিরও প্রাধান্য পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, দুর্গা-কালী-লক্ষ্মী-সরস্বতী, নরসিংহ-শ্রীকৃষ্ণ-গণপতি,—প্রভৃতি বহু দেব-দেবীর পূজা-পদ্ধতি পুরাণ-সমূহে দৃষ্ট হয়। নানাবিধ প্রতিমা-পূজা, ব্রত, দান, তীর্থ-দর্শন প্রভৃতির মাহাত্ম্য—পুরাণে কি সুন্দর-ভাবেই পরিবর্ণিত আছে ! ভূমিদান, অন্নদান, জলদান—প্রভৃতি বিষয়েও মন্বাদি স্মৃতির আদেশ-পরম্পরা পুরাণে প্রকৃষ্টরূপে প্রতিপালিত। পুরাণের চিত্র-পরম্পরা দর্শন করিলে, স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়,—ধর্ম্মের দিকে, সদনুষ্ঠানের দিকে, লোকের মন তখন অনুক্ষণ প্রধাবিত ছিল ; যাঁহারা ধর্ম্ম-পথে অগ্রসর, তাঁহারা জয়যুক্ত ; আর যাহারা অধার্ম্মিক ধর্ম্মবিরোধী, পদে পদে তাহারা অধঃপতিত। অধার্ম্মিক অত্যাচারী রাজা বেণ রাজ্যভ্রষ্ট-নিরয়গামী হইতেছেন ; কিন্তু তাঁহার পুত্র পৃথু ধর্ম্ম-রক্ষায় প্রজাপালনে জয়যুক্ত হইয়া, সসাগরা ধরিত্রীর আধিপত্য লাভ করিতেছেন ; অপিচ, পিতার উদ্ধার-সাধন করিয়া আপনি স্বর্গগামী হইতেছেন।

পুরাণে বিবিধ-চিত্র।

হিরণ্যকশিপুর, রাবণের, দুর্যোধনের অধঃপতনে, প্রহ্লাদের, শ্রীরামচন্দ্রের ও যুধিষ্ঠিরাদির জয়-শ্রীলাভে—প্রতিনিয়ত চক্ষের উপর ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলাফল প্রকটিত। ব্রত-কথায়, দান-ধর্ম্ম-বর্ণনায়, জনসাধারণের চিত্ত পরহিত-ব্রতে উৎসাহিত হইতেছে; তীর্থাদির মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনে দেব-দর্শনে পুণ্যানুষ্ঠানে লোকের প্রাণে ধর্ম্মভাব জাগাইয়া তুলিতেছে। স্মৃতি-সংহিতায় যে ধর্ম্ম সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে, পুরাণে তাহাই দৃষ্টান্ত-উদাহরণাদি দ্বারা বিশদীকৃত। সেই ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-চতুষ্টয়ের কর্ম্ম-বিভাগ, সেই রাজধর্ম্ম-বর্ণন, সেই বিবাহ ও লোকাচার-পদ্ধতি, সেই শ্রাদ্ধ-প্রায়শ্চিত্ত-বিধি,—পুরাণের অস্থি-মজ্জায় সংগ্রথিত। এমন কি, পুরাণের অনেক স্থলে, শ্রুতি-স্মৃতির বাক্য-পরম্পরা পর্য্যন্ত অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে—দেখিতে পাই। দর্শন-তত্ত্বের তো কথাই নাই; কোথাও দেখি মনু হইতে, কোথাও দেখি যাজ্ঞবল্ক্য হইতে, কোথাও দেখি পরাশর হইতে, চতুরাশ্রমের বিধি-নিষেধ-সমূহ সমুদ্ধৃত হইয়াছে। স্মৃতি-সমূহে দেখিয়াছিলাম,—দান-ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ-ধর্ম্ম। পুরাণেও তাহার পুনরুদ্ধার দেখিতে পাই,—

"দানমেব পরো ধর্ম্মো দানাৎ সর্ব্বমবাপ্যতে। দানাৎ মুক্তিশ্চ রাজ্যঞ্চ দদ্যাদ্দানং ততো নরঃ॥"

'দানেই পরম ধর্ম্ম; দান হইতেই পুরুষের সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়; দানেই স্বর্গ, দানেই রাজ্য-লাভ, দানেই মুক্তি। অতএব, মনুষ্যগণ অবশ্য দানধর্ম্মাচরণ করিবে।' স্মৃতি-সংহিতায় দেখিয়া-ছিলাম,—কূপ-পুষ্করিণী-দীর্ঘিকা-খননে মহাপুণ্য সঞ্চিত হয়; পুরাণেও তাহাই দেখি;—

"কূপবাপীতড়াগাদি আরামাণি চ কারয়েৎ। ত্রিসপ্তকুলমুদ্ধৃত্য বিষ্ণুলোকে মহীয়তে॥"

'কূপ-পুষ্করিণী-দীর্ঘিকা-খনন এবং বৃক্ষাদির প্রতিষ্ঠা করিলে, ত্রি-সপ্ত কুল উদ্ধার হয়; মানুষ বিষ্ণুলোকে বাস করিতে পারেন।' বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের প্রাধান্য সকল পুরাণেই সমভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণের প্রকৃতি; ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, ক্ষত্রিয়ের প্রকৃতি; বৈশ্যের ধর্ম্ম, বৈশ্যের প্রকৃতি; শূদ্রের ধর্ম্ম, শূদ্রের প্রকৃতি;—সকল পুরাণেই সমভাবে বর্ণিত আছে। শম, দম, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, সরলতা, দয়া, সত্য, শাস্ত্রালোচনা ও ভগবদ্ভক্তিই ব্রাহ্মণের প্রকৃতি; প্রভাব, বল, ধৈর্য্য, ঔদার্য্য, ঐশ্বর্য্য, ব্রাহ্মণের হিত-সাধন,—ক্ষত্রিয়ের প্রকৃতি; আস্তিকতা, দাননিষ্ঠা, দম্ভহীনতা, ব্রাহ্মণ-সেবা ও অর্থ-বৃদ্ধির চেষ্টা,—বৈশ্যের প্রকৃতি; আর, অকপট-ভাবে ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের সেবা ও তদ্দ্বারা জীবিকার্জ্জন,—শূদ্রের প্রকৃতি। আবার সাধারণ-ভাবে, অহিংসা এবং কাম-ক্রোধ লোভ-ত্যাগ, সত্যনিষ্ঠা এবং প্রাণিগণের হিতসাধন,—সর্ব্ববর্ণেরই প্রতিপাল্য। অধিক বলিব কি, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-বিষয়ে সংহিতা-সমূহের মত-পরম্পরা পুরাণাদিতে অনেকস্থলে বর্ণে বর্ণে উদ্ধৃত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত,—যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতার প্রথম অধ্যায়ের এক-পঞ্চাশ শ্লোক হইতে পরবর্ত্তী শতাধিক শ্লোকের সহিত গরুড়-পুরাণের পঞ্চনবতিতম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক হইতে ষড়ধিক শততম অধ্যায় পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত শ্লোকের অভিন্নতা দৃষ্ট হয়। নিম্নে যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা ও গরুড়-পুরাণ হইতে যথাক্রমে চারিটী করিয়া শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে বিবাহাদি সম্বন্ধে সমাজ-বিধি তৎকালে কিরূপ প্রচলিত ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

"অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যো লক্ষণ্যাং স্ত্রিয়মুদ্বহেৎ। অনন্যপূর্ব্বিকাং কান্তামসপিণ্ডাং যবীয়সীম্।
অরোগিণীং ভ্রাতৃমতীমসমানার্ষগোত্রজাম্। পঞ্চমাৎ সপ্তমাদূর্দ্ধং মাতৃতঃ পিতৃতস্তথা॥

দশপুরুষ বিখ্যাতাচ্ছ্রোত্রিয়াণাং মহাকুলাৎ। স্ফীতাদপি ন সঞ্চারিরোগদোষসমন্বিতাৎ ॥
যদুচ্যতে দ্বিজাতীনাং শূদ্রাদ্দারোপসংগ্রহঃ। ন তন্মম মতং যস্মাত্তত্রাত্মা জায়তে স্বয়ম্।"
—যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা, প্রথম অধ্যায়—৫২শ, ৫৩শ ৫৪শ, ও ৫৬শ শ্লোক।

"অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যো লক্ষণ্যাং স্ত্রিয়মুদ্বহেৎ। অনন্যপূর্ব্বিকাং কান্তামসপিণ্ডাং যবীয়সীম্ ॥
অরোগিণীং ভ্রাতৃমতীমসমানার্ষগোত্রজাম্। পঞ্চমাৎ সপ্তমাদূর্দ্ধং মাতৃতঃ পিতৃতস্তথা ॥
দ্বিপঞ্চনববিখ্যাতাৎ শ্রোত্রিয়াণাং মহাকুলাৎ। সবর্ণঃ শ্রোত্রিয়ো বিদ্বান্ বরো দোষান্বিতো ন চ ॥
যদুচ্যতে দ্বিজাতীনাং শূদ্রাদারোপসংগ্রহঃ। ন তন্মম মতং যস্মাৎ তত্রায়ং জায়তে স্বয়ম্ ॥"
—গরুড়-পুরাণ, ৯৫শ অধ্যায়, ২য়—৫ম শ্লোক। *

উপরি-উদ্ধৃত শ্লোক-চতুষ্টয়ের অর্থ-সম্বন্ধে কোনই পার্থক্য নাই। উভয়েরই অর্থ,—'ব্রহ্মচর্য্য সমাপনান্তে সুলক্ষণা অনন্যপূর্ব্বা (যে কন্যার সহিত পূর্ব্বে অন্য কাহারও বিবাহ অবধারণ হয় নাই) কান্তিমতী, অসপিণ্ডা (পিতৃ-বন্ধু হইতে অধস্তন সপ্তম এবং মাতৃ-বন্ধু হইতে অধস্তন পঞ্চম পুরুষ পর্য্যন্ত সপিণ্ড, সুতরাং তৎপরবর্ত্তী) কন্যাকে দ্বিজাতিগণ বিবাহ করিবেন। বয়ঃ-কনিষ্ঠা, অরোগিণী, ভ্রাতৃমতী, অসমান-গোত্রা, মাতৃপক্ষ হইতে পঞ্চম এবং পিতৃপক্ষ হইতে সপ্তম পুরুষ বর্জ্জন করিয়া, সুলক্ষণা কন্যা বিবাহ করিবে। শ্রোত্রিয়-কুলোদ্ভব, সমানবর্ণ, বিদ্বান ও দোষরহিত (কুষ্ঠাদি সঞ্চারী-রোগ-মুক্ত) বরকেই বিবাহ-কার্য্যে মনোনীত করিবে। দ্বি-জাতিগণ শূদ্র-কন্যাকে বিবাহ করিতে পারেন বলিয়া, কোনও কোনও মুনি যে মত দিয়াছিলেন, তাহা আমার সম্মত নহে। কারণ, ভার্য্যাতে আত্মাই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন।' এই বলিয়া পরবর্ত্তি-শ্লোক-সমুচ্চয়ে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের কন্যা, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়ের কন্যা, বৈশ্য বৈশ্য-কন্যা, শূদ্র শূদ্র-কন্যা, বিবাহ করিবেন,—স্পষ্টতঃ তাহা লিখিত হইয়াছে। অসবর্ণ-বিবাহ যে দোষাবহ, সংহিতা ও পুরাণ—উভয়েই তাহা সমভাবে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ, পুরাকালে কোনও কোনও ঋষির মতে, কোনও কোনও প্রদেশে অসবর্ণ-বিবাহ প্রচলিত থাকিলেও, কখনও যে তাহা শ্রেষ্ঠ-বিবাহ বলিয়া গণ্য হয় নাই,—পরন্তু সর্ব্বদাই যে তাহা নিকৃষ্ট-বিবাহ মধ্যে গণ্য হইয়াছে,—শাস্ত্রাদির আলোচনায় তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। এক দিকে অসবর্ণ-বিবাহের নিষেধ-বিধি, অন্য দিকে দত্তা-কন্যার পুনর্দ্দান সম্বন্ধে কঠোর দণ্ড-ব্যবস্থা, পুরাণাদিতেও দৃষ্ট হয়। অগ্নি-পুরাণে পরাশরের "নষ্টে মৃতে" বচন উদ্ধৃত হইয়াছে বটে; কিন্তু তাহারই সঙ্গে সঙ্গে পুরাণকার বলিয়াছেন,—"সকৃৎকন্যা প্রদাতব্যা হরংস্তাং চৌরদণ্ডভাক্।" অর্থাৎ, একবার-মাত্রই কন্যাদান করা যায়; দত্তা কন্যা পুনরায় দান করিলে, দাতাকে চৌরের ন্যায় দণ্ড দেওয়া বিধেয়। বিবাহের মধ্যে ব্রাহ্ম-বিবাহ অর্থাৎ স্ব-বর্ণস্থ সৎ-পাত্রকে কন্যাদান শ্রেষ্ঠ বলিয়া আবহমান-কাল পরিকীর্ত্তিত। বিবাহে বাদ্যোদ্যম ("বাদ্যোচ্চৈঃ স্ত্রীং গৃহং নয়েৎ") সমারোহ প্রভৃতিও বহুকাল হইতে প্রচলিত ছিল। বিবাহ, গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রামণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন প্রভৃতি অষ্ট-চত্বারিংশ সংস্কার † দ্বারা ব্রহ্মলোকে গমন করিতে পারা যায়,—এইরূপ উক্তি দ্বারা, সংস্কার-কার্য্যে পুনঃপুনঃ উদ্বোধিত করা হইয়াছে। তৎকালে, যথাবিধি সংস্কার-কার্য্য বিহিত হইত,—তাহার নানা প্রমাণ বিদ্যমান আছে। সমাজ-ধর্ম্মের বিবরণ,

* লক্ষ্য করিবেন,—যাজ্ঞবল্ক্যের ৫৪শ এবং গরুড়-পুরাণের ৪র্থ শ্লোকে পাঠান্তর থাকিলেও অর্থান্তর নাই।

† অধুনা প্রধানতঃ উল্লিখিত দশবিধ সংস্কার প্রচলিত।

পুরাণাদিতে যেরূপ দৃষ্ট হয়, রাজ-ধর্ম্মও উহাতে সেইরূপ-ভাবে পরিবর্ণিত। মনুসংহিতায় যেরূপ গ্রামাধিপতির উপর দশগ্রামাধিপতির, দশগ্রামাধিপতির উপর শতগ্রামাধিপতির নিয়োগ দেখিতে পাই; মনুসংহিতায় যেরূপ কর-গ্রহণের বিধি-ব্যবস্থা বিহিত আছে; সংহিতাশাস্ত্রে যেরূপ চৌর্য্যাদির দণ্ড-বিধি বিহিত হইয়া থাকে;—পুরাণেও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, সেই সকল বিষয়ের পুনরাবৃত্তি লক্ষিত হয়। * করসংগ্রহ, ব্যবহার-বিধি, রাজ্য-রক্ষা, প্রজা-পালন প্রভৃতি বিষয়ে পুরাণ-সমূহে সংহিতা-শাস্ত্রের পূর্ণ-প্রভাব বিদ্যমান। অগ্নি-পুরাণে হিন্দুদিগের যুদ্ধ-বিদ্যার প্রসঙ্গে যে ধনুর্ব্বিদ্যার পরিচয় পাওয়া যায়, সে বিদ্যা এখন বিলুপ্তপ্রায়। দেবী-পুরাণে ব্রহ্মাস্ত্রের উল্লেখে আগ্নেয়াস্ত্রের যে পরিচয় পাওয়া যায়, সে পরিচয় এখন স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান। পদ্ম-পুরাণে, ভারতবর্ষের যে ভৌগোলিক-তত্ত্ব পরি-বর্ণিত, কালের পরিবর্ত্তনে এখন তাহার অনেক চিহ্নই সন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। গরুড়-পুরাণে—জ্যোতির্ব্বিদ্যা, সামুদ্রিক-বিদ্যা; অগ্নিপুরাণে আয়ুর্ব্বিদ্যা, চিকিৎসা-প্রকরণ; এবং ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে প্রাচীন ভারতের চিত্র-বিদ্যা শিল্পকলার কি চারু-চিত্রই অঙ্কিত রহিয়াছে! সে হিসাবে, পুরাণাদিতে একটী সমুন্নত সমাজের প্রতিকৃতি প্রতি-ফলিত। কিরূপ সমাজ-বন্ধন ছিল, কিরূপ রাজ-নীতি ছিল, কিরূপভাবে গৃহ-ধর্ম্ম নির্ব্বাহিত হইত, কিরূপ পদ্ধতিতে যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিত, কি উপায়ে রোগ-প্রতিকারের—ব্যাধি-শান্তির—চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল; শিল্পে, সাহিত্যে, কাব্যে, ব্যাকরণে, অলঙ্কারে, হিন্দুগণ কিরূপ উন্নতি-লাভ করিয়াছিলেন;—পুরাণাদিতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

পাশ্চাত্য মতালোচনা।

পুরাণ-সম্বন্ধে অধুনা প্রধানতঃ চতুর্ব্বিধ সংশয়-সন্দেহ উত্থাপিত হইয়া থাকে। প্রথম সংশয়,—পুরাণ-সমূহ অতি আধুনিক-কালে বিরচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় সংশয়,—উহার অধিকাংশই উপকথায় পরিপূর্ণ। তৃতীয় সংশয়,—পুরাণ-সমূহ বেদ-ব্যাসের বা এক ব্যক্তির রচনা হওয়া সম্ভবপর নহে। চতুর্থ সংশয়,—ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক বা অনুসারিগণ আপনাপন মত-প্রতিষ্ঠার জন্য ভিন্ন ভিন্ন পুরাণ রচনা করিয়া গিয়াছেন। পুরাণ-পরম্পরার উল্লেখ-প্রসঙ্গে আমরা প্রায় সকল সংশয়-প্রশ্নেরই আলোচনা করিয়াছি। প্রাচ্যের চক্ষে ও পাশ্চাত্যের চক্ষে কি ভাবে ঐ সমুদায় প্রতিফলিত আছে;—তাহাও বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছি। সাধারণ বুদ্ধিতে তদ্বিষয়ে যেরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সমীচীন, তাহারও আভাস দিয়াছি। দুরধিগম্য অতীত-ইতিহাস-সম্বন্ধে মনে এরূপ সংশয়-সন্দেহ উদয় হওয়া বিচিত্র নহে। পুরাণ-পরম্পরায় অতি দূর-অতীতের চিত্র অঙ্কিত আছে বলিয়াই, তত দূরে দৃষ্টি-সঞ্চালন করিতে অসমর্থ হইয়াই, উহার সম্বন্ধে চিত্ত সাধারণতঃ সংশয়ান্বিত হয়। যাহা হউক, পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-কল্পের কথা বিস্মৃতির অতল-তলে নিক্ষেপ করিয়া, পুরাণ-সমূহ যদি আলোচনা করি, তাহা হইলেই বা আমরা কি দেখিতে পাই? বলিয়াছি তো,—সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর এবং কলির প্রথমাংশের ঘটনাবলী পুরাণ-পরম্পরার অস্থি-মজ্জা-মেরুদণ্ড-স্বরূপ। যদি কোথাও আধুনিক ঘটনা-নিবহের ছায়া-সম্পাত দেখিতে পাওয়া যায়, স্বতঃই তাহা

* দৃষ্টান্ত-স্থলে, অগ্নি-পুরাণ, ২২৩শ অধ্যায়; গরুড়-পুরাণ ১১১শ অধ্যায় হইতে ১১৩শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

প্রক্ষিপ্ত বা লিপি-চাতুর্য্য বলিয়া অনুমিত হয়। অতীত ইতিহাসের অত্যদ্ভুত ঘটনা—কবে না উপকথার ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকে! প্রাচীন গ্রীসের, প্রাচীন রোমের, প্রাচীন মিশরের, ইতিহাস—এখন উপকথার মধ্যে পরিগণিত। ফিনিসীয়, কার্থেজীয়, বাইজান্‌টাইন প্রভৃতির অতীত-স্মৃতি দিন-দিন বিলুপ্ত হইতেছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সে দিনের মহারাষ্ট্র ও শিখগণের শৌর্য্য-বীর্য্য এখনই স্বপ্নের ন্যায় প্রতীত হইতেছে। এ সকলের তুলনায়, কত দূর অতীতের ঘটনাবলী উপকথার মধ্যে পর্য্যবসিত হইবে,—তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সে দিন চক্ষের উপর যাহা ঘটিতে দেখিয়াছি, তাহাই যখন আজ বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না; তখন আর অন্যে পরে কা কথা! ফলতঃ, যত দূরে চলিয়া যায়, সত্যকে ততই উপকথা বলিয়া ভ্রম হয়। পুরাণ-সমূহ যে ভাবে প্রচলিত আছে, তাহাতে সকল পুরাণের রচয়িতা বলিয়া বেদব্যাসকে নির্দ্দেশ করিতে না পারিলেও পুরাণ-সমূহের যে তিনিই—এক ব্যক্তিই প্রবর্ত্তক, অনায়াসে তাহা বুঝিতে পারা যায়। * আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি,—বেদব্যাস পুরাণ-সমূহের মর্ম্ম অর্থাৎ অতীত ঘটনা-পরম্পরা শিষ্যগণের নিকট বিবৃত করিয়াছিলেন; কিছুকাল পর্য্যন্ত মুখে-মুখেই তাহা প্রচলিত ছিল; পরিশেষে পুস্তকাকারে তৎ-সমুদায় লিপিবদ্ধ হয়। ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের, ভিন্ন ভিন্ন মতের, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের, প্রাধান্য পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে; তাহার কারণ,—মোক্ষ-লাভের দিকে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের জনগণের চিত্তাকর্ষণ; তাহার কারণ,—মনুষ্য-সমাজের রীতি-প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন পথ দিয়া তাঁহাদিগকে ভগবৎ-সমীপে উপনীত-করণ। যিনি সাত্ত্বিক-ভাবাপন্ন, তাঁহার জন্য সাত্ত্বিক ভাবে; যিনি রাজসিক-ভাবাপন্ন, তাঁহার জন্য রাজসিক ভাবে; যিনি তামসিক-ভাবাপন্ন, তাঁহার জন্য তামসিক ভাবে;—ভিন্ন ভিন্ন ভাবাপন্ন ব্যক্তির জন্য ভিন্ন ভিন্ন পথ নির্দ্দেশই পুরাণ-সমূহের লক্ষ্য বলিয়া মনে হয়। ফলতঃ, ভিন্ন ভিন্ন সমাজের, ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিগণের মনোবৃত্তি পরিচালনার জন্য, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে, একই ব্যক্তি কর্ত্তৃক, পুরাণ-সমূহ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। যদি একই ব্যক্তির প্রবর্ত্তনা না হইবে, তাহা হইলে লক্ষণ-পরম্পরা, ঘটনা-পরম্পরা, ভাব-পরম্পরা এত সাদৃশ্য-ব্যঞ্জক হইবে কেন? সূচনা, বর্ণনা, মত-প্রতিষ্ঠা, উপসংহার—সর্ব্বত্রই সৌসাদৃশ্য আছে। সকল পুরাণের আরম্ভেই মঙ্গলাচরণ, সকল পুরাণের পরিসমাপ্তিতেই ফলশ্রুতি, সকল পুরাণের লক্ষ্যই মুক্তিলাভ। যাঁহারা শৈব, তাঁহাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা হইয়াছে,—শিবই সেই পরব্রহ্ম; যাঁহারা বৈষ্ণব, তাঁহাদিগকে বুঝান হইয়াছে,—বিষ্ণুই সেই পরব্রহ্ম; যাঁহারা শাক্ত, তাঁহাদিগকে বুঝান হইয়াছে,—শক্তিই পরব্রহ্মরূপিণী। পরিশেষে আবার স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে,—শিব-শক্তি-বিষ্ণু সবই এক;—কেবল নাম-রূপের ভেদ মাত্র। মূল বিষয়ে এতাদৃশ সামঞ্জস্য সত্ত্বেও পুরাণ-সমূহ ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল,—কি প্রকারে বিশ্বাস করিতে পারি? তার পর, কোন্ পুরাণ কোন্ সময়ে রচিত

* কল্কি-পুরাণের বর্ণনায় বৌদ্ধদিগের পরাজয়ে, ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের ভাব-পরম্পরা পরিদৃশ্যমান আছে,—অনেকে এইরূপ মনে করেন। তাঁহাদের মতে, কল্কি পুরাণ ঐ সময়ে রচিত হইয়াছিল।

হয়, পুরাণের মধ্যেই তাহার উল্লেখ আছে। ব্রহ্ম-পুরাণ প্রথমে রচিত হইয়াছিল; তৎপরে পদ্ম-পুরাণ রচিত হয়; এবং পদ্ম-পুরাণের পর বেদব্যাস বিষ্ণু-পুরাণ রচনাকরেন।

"আদ্যং সর্ব্বপুরাণানাং পুরাণং ব্রাহ্মমুচ্যতে।......এতদ্বৈষ্ণবসংজ্ঞং বৈ পাদ্মস্য সমনন্তরম্॥"

—বিষ্ণু-পুরাণ, তৃতীয় অংশ, ষষ্ঠ অধ্যায়।

কূর্ম্ম-পুরাণের প্রারম্ভেও দেখিতে পাই,—প্রথমে ব্রহ্মপুরাণ, অনন্তর পদ্মপুরাণ, বিষ্ণু-পুরাণ প্রভৃতি অষ্টাদশ মহাপুরাণ কথিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ, সূত * সেখানে বলিতেছেন,—"ব্যাস কর্ত্তৃক পূর্ব্ব-কালে যে পুরাণ পরিবর্ণিত হইয়াছিল, আমি তাহারই বর্ণনা করিব।" দেবী-ভাগবতে দেখিতে পাই,—মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস ভাগবত-পুরাণের অধ্যায় এবং স্কন্ধ পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। তবে তাঁহার মুখে যেরূপ শুনিয়াছিলেন, সূত তাহাই বর্ণনা করেন;—এই কথাই দেবী-ভাগবতে উল্লিখিত আছে। মহাভারত বেদব্যাস বিরচিত। মহাভারত রচনার পর, শ্রীমদ্ভাগবত বিরচিত হইয়াছিল,—এ কথা শ্রীমদ্ভাগবতে স্পষ্টতঃ লিখিত আছে। পদ্ম-পুরাণ পাতাল-খণ্ডেও সেই পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্য-হিসাবেও পৌরাণিক-সাহিত্যের একটী যুগ আসিয়াছিল,—বলা যাইতে পারে। বৈদিক-সাহিত্যের যুগে শ্রুতি, সূত্র-সাহিত্যের যুগে দর্শন এবং পৌরাণিক-সাহিত্যের যুগে পুরাণ-পরম্পরা। সূত্রের পর যে আকারে স্মৃতির প্রাধান্য হয়,—তাহার পরিচয় পূর্ব্বেই স্মৃতি-সংহিতার আলোচনায় প্রদান করিয়াছি। ফলতঃ, শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ উপকথায় পূর্ণ নহে; অথবা কোনও সম্প্রদায়-বিশেষের কোনও নিগূঢ় উদ্দেশ্য সাধন জন্যও পুরাণ-সমূহ বিরচিত হয় নাই। পরন্তু, জীবের মোক্ষ-লাভের উপায়-পরিবর্ণন ব্যপদেশে দৃষ্টান্ত-স্বরূপ পুরাতত্ত্বের অবতারণায়, পুরাণ-সমূহ প্রচারিত হইয়াছিল। পক্ষান্তরে, পুরাণ-সমূহই হিন্দু-জাতির প্রাচীন-কালের ইতিহাস।

---

* অধিকাংশ পুরাণই সূতের মুখে ব্যক্ত হইয়াছে—দেখিতে পাই। সূত, বেদব্যাসের শিষ্য ছিলেন; তাঁহার জাতীয় ধর্ম্মই—পুরাণ ব্যাখ্যা করা। বর্ত্তমান-কালে কথকথা-ব্যবসায়ী কথক যেমন ভাগবত-পুরাণাদির বর্ণন করিয়া থাকেন; সূত সম্বন্ধেও সেইরূপ ভাব মনে আসিতে পারে। তাঁহার অপর নাম—রোমহর্ষণ (লোমহর্ষণ); তাঁহার বাক্য-পরম্পরায় শ্রোতৃবর্গের দেহ রোমাঞ্চিত হইত, সেই জন্যই তিনি রোমহর্ষণ নামে বিখ্যাত হন। তাঁহাদের বংশাবলী পুরাণ ব্যাখ্যা করিতেন,—তাঁহার পরিচয়ে স্পষ্টই উক্ত আছে। ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণের প্রথম অধ্যায়ে সূত আপনার আত্ম-পরিচয় প্রদানচ্ছলে বলিতেছেন,—পুরাণ-পাঠই আমাদের জাতীয় ধর্ম্ম; 'সূত' তাঁহার জাতীয় নাম। সূত-জাতীয় রমণীর গর্ভে সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়াই তিনি ঐ নামে অভিহিত হন। এ হিসাবে সূত অসংখ্য। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সূতের বিদ্যমানতা অসম্ভব নহে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

তন্ত্র।

[তন্ত্র-শাস্ত্র,—তন্ত্রের সংজ্ঞা,—বিবিধ তন্ত্রের পরিচয়,—তান্ত্রিক-সম্প্রদায়-মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলা-বৃদ্ধি-হেতু তন্ত্রকে 'পাষণ্ড-শাস্ত্র'-সংজ্ঞা দান ;—তন্ত্রের মূল-তত্ত্ব,—পঞ্চ-মকারের প্রকৃত অর্থ,—তন্ত্রই প্রকৃষ্ট যোগ-শাস্ত্র,—তন্ত্রে ব্যাভিচারাদির বিরুদ্ধ-বাদ,—পঞ্চ-মকারের ত্রিবিধ সাধনা ;—বিবিধ তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের পরিচয়,—অষ্টবিধ তান্ত্রিক আচার,—ভাবত্রয়,—তন্ত্রে ব্রহ্মের লক্ষণ,—বেদ পুরাণাদির সহিত ঐক্যভাব,—আগম ও নিগম শাস্ত্র,—তন্ত্র সম্বন্ধে বিবিধ বক্তব্য,—সৃষ্টি-তত্ত্ব,—মন্ত্রের স্বরূপ ও অর্থ,—গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ।]

তন্ত্র—কলিশাস্ত্র। শিব ও শক্তির প্রাধান্য-কীর্ত্তনই তন্ত্রের উদ্দেশ্য। প্রধানতঃ, পার্ব্বতীর প্রশ্নের উত্তরে সদাশিবের মুখে এই শাস্ত্র বিবৃত হইতেছে। 'কলিকালে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ আচার-শূন্য হইবে ; বেদোক্ত কর্ম্মের দ্বারা শুদ্ধি-লাভ করিতে পারিবে না ; পুরাণ-সংহিতা এবং স্মৃতি-সমূহেও মনুষ্যের ইষ্ট-সিদ্ধ হইবে না ; তখন একমাত্র তন্ত্র-শাস্ত্রই জীবের ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষের হেতুভূত হইবে।' এইরূপ ভূমিকার পর, সদাশিব তন্ত্র-শাস্ত্র বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হন। প্রসঙ্গতঃ তিনি বলেন,—"সত্যাদি যুগে সে সকল মন্ত্র ফলদানে সমর্থ ছিলেন, কলিতে তৎ-সমুদায় মৃতপ্রায় নিষ্ফল। তন্ত্রোক্ত মন্ত্র ভিন্ন অন্য মন্ত্র দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠিত হইলে এখন আর ফললাভ হয় না। তন্ত্র-নির্দ্দিষ্ট পথই এখন সুখ ও মোক্ষের হেতু।" ফলতঃ, শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ প্রভৃতিতে যে ভাবে জীবের দুঃখ-নিবৃত্তির উপায়-পরম্পরা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তন্ত্র-সমূহেও প্রকার-ভেদে সেই আলোচনাই দেখিতে পাই। এক এক পুরাণের আলোচনায় সেই সেই পুরাণের যেমন প্রাধান্য পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে ; তন্ত্র-সম্বন্ধেও সেই একই ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। সাধারণতঃ, তন্ত্র-শব্দের সজ্ঞাতেই সেই ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে,—

তন্ত্র-শাস্ত্র

"দেবীনাঞ্চ যথা দুর্গা বর্ণানাং ব্রাহ্মণো যথা। তথা সমস্ত শাস্ত্রাণাং তন্ত্রশাস্ত্রমনুত্তমম্।"

পুরাণে যেমন দেখিয়াছি, প্রায় প্রত্যেক পুরাণের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে পুরাণকার বলিয়াছেন,—নদীর মধ্যে যেমন গঙ্গা, বর্ণের মধ্যে যেমন ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ ; পুরাণের মধ্যেও তেমনি এই পুরাণ শ্রেষ্ঠ। তন্ত্রের মধ্যেও সেইরূপ দেখিতে পাই, এক এক তন্ত্রের মাহাত্ম্য ঐ ভাবেই কীর্ত্তিত হইয়াছে। মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রে একাধিক দৃষ্টান্তে তাহাই উক্ত আছে,—

"যথা নরেষু তন্ত্রজ্ঞাঃ সরিতাং জাহ্নবী যথা। যথাহং ত্রিদিবেশানামাগমানামিদং তথা॥"

"যথা নগেষু হিমবান্ তারকাসু যথা শশী। ভাস্বাংস্তেজঃসু তন্ত্রেষু তন্ত্ররাজমিদং তথা॥"

'যেমন মনুষ্যের মধ্যে তন্ত্রজ্ঞানী শ্রেষ্ঠ, যেমন নদী-সকলের মধ্যে গঙ্গা শ্রেষ্ঠা, যেমন দেবগণের মধ্যে আমি শ্রেষ্ঠ, তেমনই সমুদায় আগম-শাস্ত্রের মধ্যে এই মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রই শ্রেষ্ঠ। পর্ব্বতের মধ্যে যেমন হিমালয়, নক্ষত্রগণের মধ্যে যেমন চন্দ্র, তেজ-সমূহের মধ্যে যেমন সূর্য্য, সমুদায় তন্ত্রের মধ্যে সেইরূপ এই তন্ত্ররাজ শ্রেষ্ঠ।' শক্তি-উপাসনা—তন্ত্রের মূল লক্ষ্য। পুরাণ-উপপুরাণে যাঁহাকে ভগবান, নারায়ণ, বিষ্ণু, কৃষ্ণ প্রভৃতি নাম-বিশেষণে

বিশেষিত করা হইয়াছে; তন্ত্রে তিনি পরমা-প্রকৃতি, আদ্যাশক্তি, কালী, তারা, মহাবিদ্যা প্রভৃতি নাম-বিশেষণে বিশেষিত হইয়া আছেন। পার্থক্য-এই মাত্র; নচেৎ, মূল বিষয়ে কোনই অনৈক্য নাই। তন্ত্রের মূলও—বেদ; তন্ত্র—বেদের শাখা-বিশেষ। অথর্ব্ব-বেদে যে মন্ত্রাদি বীজরূপে পরিদৃশ্যমান ছিল, তন্ত্রে তাহাই মুকুলিত ও পল্লবিত। সৃষ্টি, প্রলয়, দেব-পূজা, মন্ত্র-নির্ণয়, আশ্রম-ধর্ম্ম, তীর্থ-মাহাত্ম্য প্রভৃতি—তন্ত্রের আলোচ্য। তন্ত্রের সংখ্যা—অসংখ্য। আগমতত্ত্ব-বিলাসে নাল, যোগিনী, ভৈরবী, কুমারী, তারিণী প্রভৃতি চতুরধিক ষষ্টিতম-সংখ্যক তন্ত্রের নাম লিখিত আছে। বারাহী-তন্ত্রের মধ্যে যোগডামর, শিবডামর, দুর্গাডামর, ব্রহ্মডামর; আদি-যামল, ব্রহ্ম-যামল, বিষ্ণু-যামল, রুদ্র-যামল; গৌতমী, আদ্যা, সরস্বতী, যোগিনী প্রভৃতি চতুরধিক পঞ্চাশৎ-সংখ্যক তন্ত্রের নাম ও সেই সেই তন্ত্রের শ্লোক-সংখ্যা উক্ত হইয়াছে। তন্ত্র-গ্রন্থের মধ্যে, আগমসার, আগমচন্দ্রিকা, জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র, শাক্তানন্দতরঙ্গিণী, জ্ঞানানন্দতরঙ্গিণী, স্বরোদয়যামল প্রভৃতি তন্ত্র প্রসিদ্ধ। নির্ব্বাণ নামধেয় তন্ত্রের মধ্যে নির্ব্বাণ-তন্ত্র, মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র, বৃহন্নির্ব্বাণ-তন্ত্র,—প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। তন্ত্রসার, তন্ত্রার্ণব, তন্ত্রকৌমুদী, উড্ডীশ, ডামর, তারারহস্য, শ্যামারহস্য, কামাখ্যা-তন্ত্র, কুলার্ণব-তন্ত্র প্রভৃতি নামেও ভিন্ন ভিন্ন তন্ত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত, বৌদ্ধদিগেরও প্রায় শত-সংখ্যক তন্ত্রের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে,—বুদ্ধকপাল, নাগার্জ্জুন, মায়াজাল, তত্ত্বজ্ঞান-সিদ্ধি, সাধক-সংগ্রহ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। তন্ত্রে প্রাতঃকৃত্য, ভূতশুদ্ধি, স্নানবিধি, প্রাণায়াম, সন্ধ্যা, জপ, নিত্যপূজা, করাঙ্গ ও পঞ্চাঙ্গ-ন্যাস, বিবিধ মুদ্রা প্রভৃতির বিষয় বিবৃত আছে। গুরুগ্রহণ, দীক্ষা, আচার, প্রায়শ্চিত্ত, মন্ত্র প্রভৃতি তন্ত্রের অঙ্গস্থানীয়। তন্ত্র-মতে,—প্রথমে গুরুগ্রহণ করিতে হইবে। গুরু যে বীজ-মন্ত্র প্রদান করিবেন, সেই মন্ত্র দ্বারা ভগবানের অর্চ্চনা করা বিধেয়। নানা তন্ত্র অনুসারে নানা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। তন্ত্র-শাস্ত্র চিরকাল গুহ্য-শাস্ত্র বলিয়া প্রচারিত ছিল; সুতরাং উহার প্রকৃত অর্থ অনেকেরই অনধিগম্য। এখন যে ভাবে তন্ত্র-শাস্ত্রের ব্যাখ্যা হইয়া থাকে, তাহা বীভৎস ও সুশিক্ষার অন্তরায়-সাধক। এমন কি, সেই সকল ব্যাখ্যায়, সময় সময় মনে হয়,—এরূপ শাস্ত্র কখনই মোক্ষ-সাধনের উপায় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। ব্যভিচার, মদ্যপান প্রভৃতির প্রাধান্য-কীর্ত্তন যদি শাস্ত্রের লক্ষণ হয়, তাহা হইলে মনুষ্যকে অধঃপতনের পথে লইয়া যাইবার জন্য যে এই শাস্ত্র রচিত হইয়াছিল, তাহাই বুঝা যায়। চার্ব্বাক-দর্শনের সূচনায় আমরা যেমন দেখিয়াছি,—দৈত্যগণকে ভ্রান্তপথে পরিচালিত করিবার জন্য, তাহাদের উচ্ছেদ-সাধন-কল্পে, দর্শন বিরচিত হয়; তন্ত্র-শাস্ত্রেরও কোনও কোনও স্থানের ব্যাখ্যা-দর্শনে আমাদের সেই কথা মনে হয়। পদ্ম-পুরাণে এবং শ্রীমদ্ভাগবতে প্রকারান্তরে লিখিত আছে,—শিব-শক্তির নাম করিয়া যাহারা সৎ-শাস্ত্রের প্রতিকূলাচারী হইবে, তাহারা পাষণ্ড। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে তন্ত্র-শাস্ত্রকে মোক্ষলাভের অন্তরায়-সাধক শাস্ত্র বলিতে হইবে। কিন্তু তন্ত্র-শাস্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য সেরূপ বলিয়া মনে হয় না। কেবল উহার অর্থ-বিকৃতির জন্যই যত কিছু অনর্থের উৎপত্তি হইয়াছে। নচেৎ, তন্ত্র-শাস্ত্র কখনই ব্যভিচারের ও মদ্যপানের প্রশ্রয় দেন নাই।

তন্ত্র-শাস্ত্রের যে মূল-তত্ত্ব পঞ্চ-মকার, যে পঞ্চ-মকারের দোহাই দিয়া লোকে নানা অপকর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়; সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে দেখিলে, সেই পঞ্চ-মকারেরই বা কি অর্থ বুঝিয়া থাকি? পঞ্চ-মকার কি সত্য-সত্যই জীবকে বিপথগামী করিবার জন্য শাস্ত্র-বাক্য-রূপে উক্ত হইয়াছে?—তাহা কখনই নহে। পরন্তু, পঞ্চ-মকারে সাধকের প্রাণে অনুপম আত্ম-তত্ত্ব উদ্ভাসিত করিয়া দেয়। সে হিসাবে, তন্ত্র-শাস্ত্র—কঠোর যোগ-শাস্ত্র; তন্ত্র-সাধনা—যোগসাধনা। তন্ত্রের যে প্রধান অঙ্গ পঞ্চ-মকার—"মদ্যং মাংসঞ্চ মৎস্যঞ্চ মুদ্রাং মৈথুনমেব চ;"—মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন, তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? কুলার্ণব-তন্ত্রে এই পঞ্চ-মকার-সম্বন্ধে কি উপদেশ-মূলক কথাই লিখিত আছে!

পঞ্চ-মকার-তত্ত্ব।

"মদ্যপানেন মনুজো যদি সিদ্ধিং লভেত বৈ। মদ্যপানরতাঃ সর্ব্বে সিদ্ধিং গচ্ছন্তু পামরাঃ॥
মাংসভক্ষণমাত্রেণ যদি পুণ্যাগতির্ভবেৎ। লোকে মাংসাশিনঃ সর্ব্বে পুণ্যভাজো ভবন্তি হি॥
স্ত্রীসম্ভোগেন দেবেশি যদি মোক্ষং ভবন্তি বৈ। সর্ব্বেঽপি জন্তবো লোকে মুক্তাঃ স্যুঃ স্ত্রীনিষেবনাৎ॥"

'মদ্যপান করিলেই মানুষ যদি সিদ্ধি-লাভ করিত, তাহা হইলে মদ্যপান-রত পাষণ্ডগণ সকলেই তো সিদ্ধি-লাভ করিয়াছে! মাংসভক্ষণ-মাত্রেই যদি সদগতি লাভ হইত, তাহা হইলে মাংসাশী ব্যক্তি-মাত্রেই তো পুণ্যভাগী হইতে পারিত! স্ত্রী-সম্ভোগেই যদি মোক্ষলাভ হইত, তাহা হইলে জগতের সকল জীব-জন্তুই তো স্ত্রী-সম্ভোগ দ্বারা মুক্তি-লাভ করিতে পারিত।' সত্যই তাই! তন্ত্রের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করিতে পারে না বলিয়াই মানুষ ভ্রান্ত-পথে প্রধাবিত হয়। নচেৎ, তন্ত্রের মধ্যে যে গভীর যোগ-তত্ত্ব নিহিত আছে, তাহার গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করিতে পারিলেই ইষ্ট-লাভে কৃতকার্য্য হওয়া যায়।* যে পঞ্চ-মকারের দোহাই দিয়া তান্ত্রিক-গণ যথেচ্ছাচারী ব্যভিচার-পরায়ণ হয়, সেই পঞ্চ-মকারের প্রকৃত অর্থ সাধক-গণ কিরূপ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন,—নিম্নে তাহার আভাস প্রদান করিতেছি। পঞ্চ-মকারের প্রথম তত্ত্ব—মদ্যপান। কিন্তু সে মদ্যপান অর্থ—সাধারণ মদ্যপান নহে। সে মদ্য,—ব্রহ্মানন্দ। ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত সহস্র-কমল-দল-বিনির্গত সুধা-ধারা-পানে সাধকের যে মত্ততা, সে মদ্যপানে সেই মত্ততাই বুঝাইয়া থাকে। 'আগমসারে' স্পষ্টতঃই লিখিত আছে,—

"সোমধারা ক্ষরেদ্‌যাতু ব্রহ্মরন্ধ্রাদ্ বরাননে। পীত্বানন্দময়ীং তাং যঃ স এব মদ্যসাধকঃ॥"

পঞ্চ-মকারের দ্বিতীয় তত্ত্ব—মাংসভোজনও সাধারণ মাংস-ভোজন নহে। তাহার গূঢ় অর্থ,—মা=রসনা+অংশ; অর্থাৎ, রসনার অংশ—বাক্য; মাংসভক্ষণ—বাক্যরোধ বা মৌনাবলম্বন।

"মা শব্দাদ্রসনা জ্ঞেয়া তদংশান্ রসনা প্রিয়ে। সদা চ ভক্ষয়েদ্দেবি স এব মাংসসাধকঃ॥"

সে হিসাবে, রসনা-ভক্ষণ বা জিহ্বা-সঙ্কোচনাদি দ্বারা সাধকের যে ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূরীভূত হয়,—মাংস-ভক্ষণ অর্থে তাহাই বুঝাইয়া থাকে। পঞ্চ-মকারের তৃতীয় তত্ত্ব—মৎস্য। সাধকের মৎস্য-ভক্ষণ অর্থ—কুম্ভক-যোগ—নিশ্বাস-প্রশ্বাস-রোধ। পঞ্চ-মকারের চতুর্থ তত্ত্ব—মুদ্রা। মুদ্রা-ভক্ষণ অর্থ—আশা, তৃষ্ণা, গ্লানি, ভয়, ঘৃণা, মান, লজ্জা, ক্রোধ—এই অষ্ট-মুদ্রাকে আয়ত্ত করা;—ব্রহ্ম-জ্ঞানাগ্নি দ্বারা তৎসমুদায়কে সুসিদ্ধ করিয়া ভক্ষণ করা। যথা,—

"আশাতৃষ্ণাজুগুপ্সাভয়বিশদঘৃণামানলজ্জাভিধাঃ। ব্রহ্মাগ্নাবষ্টমুদ্রাঃ পরসুকৃতি নঃ পচ্যমানঃ সমস্তাৎ॥"

পঞ্চ-মকারের পঞ্চম-তত্ত্ব—মৈথুন। এই মৈথুন অর্থ—রমণী-সেবা নহে, ব্যভিচার নহে,

* জ্ঞান-সঙ্কলিনী, রুদ্র-যামল প্রভৃতি তন্ত্রে পঞ্চ-মকারের ব্যাখ্যা পরিকীর্ত্তিত আছে।

উক্ত অর্থ নহে, সাধারণ স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর মিলন নহে। ইহার গূঢ় অর্থ—জ্ঞানের সহিত ভক্তির সংমিশ্রণ;—ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত সহস্রারের বিন্দুর সহিত কুণ্ডলিনী-শক্তির মিলন।

"সহস্রারোপরি বিন্দৌ কুণ্ডল্যাঃ মিলনাৎ শিবে। মৈথুনং পরমং দিব্যং যতীনং পরিকীর্ত্তিতং॥"

ইহার অধিক প্রগাঢ় যোগাভ্যাস,—ইহার অধিক প্রকৃষ্টতর চিত্ত-বৃত্তি-নিরোধ—আর কি হইতে পারে? একটু অভিনিবেশ-সহকারে তন্ত্র-শাস্ত্র আলোচনা করিলে, তন্ত্র-শাস্ত্রের আরও এক গূঢ় লক্ষ্য আছে বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। সে লক্ষ্য—পরীক্ষার তুষানল। সে লক্ষ্য—সংসারের মধ্যে প্রলোভন-পরিবৃত হইয়াও নির্লিপ্ত-ভাব শিক্ষাদান। কলিকালে পঞ্চ-মকারের প্রাধান্য-প্রাবল্য হইবে, সুতরাং সেই সময়ে তৎসমুদায়ের সাহচর্য্যে থাকিয়াও তৎপ্রতি আসক্তিশূন্য হইতে হইবে;—তন্ত্রের ইহাও সার-সঙ্কল্প নহে কি? কাল-বশে বুদ্ধি-ভ্রংশ-হেতু তন্ত্রের সে নিগূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, তন্ত্র-মতের অনুসরণে তান্ত্রিক হইতে গিয়া, মানুষ যদি মদ্যপায়ী, মাংসাশী ও ব্যভিচারী হয়—সে ত্রুটি তন্ত্রের নহে; সে ত্রুটি—অনুষ্ঠাতার বুদ্ধিভ্রংশের ও শিক্ষা-দীক্ষার বিষময় ফল। তন্ত্রে স্পষ্টতঃই লিখিত আছে,—"যাঁহারা সত্য দ্বারা পবিত্র-চিত্ত এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়া কুলাচার পালন করিবেন; যিনি দয়াশীল হইবেন; যিনি স্ব-পত্নীতে অনুরক্ত থাকিবেন;—কলি তাঁহাকে পীড়া দিতে পারিবে না।......যে সকল কন্যা ব্রাহ্ম-বিবাহ দ্বারা বা শৈব-বিবাহ দ্বারা পরিণীতা হইয়াছে, তাহারাই ভার্য্যা; তদ্ভিন্ন সমুদায়ই পর-স্ত্রী। সেরূপ স্ত্রীর প্রতি সকাম দর্শনে, সেরূপ স্ত্রীর সহিত নির্জ্জনালাপে, সেরূপ স্ত্রীর সহিত সংসর্গে নানাবিধ প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যক এবং তজ্জন্য গুরুদণ্ড প্রশস্ত। বিকৃত বা অঙ্গহীন করিয়া, রাজা ঐরূপ ব্যভিচারী ব্যক্তিদিগকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিবেন। যেখানে গমন করিতে বা যাহার সহিত কথা কহিতে নিষেধ, কোনও কুলকামিনী সেইরূপ স্থানে গমন বা সেইরূপ ব্যক্তির সহিত কথাবার্ত্তা কহিলেও, তাহার ভর্ত্তা তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন।" * যে তন্ত্রে পর-স্ত্রী ও পর-কন্যার প্রতি সকাম দর্শনও প্রায়শ্চিত্তার্হ ও দণ্ডার্হ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, সেই তন্ত্র-শাস্ত্র পঞ্চ-মকারে মানুষকে উন্মত্ত হইতে উপদেশ দিয়াছেন,—ইহা কখনই মনে করিতে পারা যায় না। কাল-বশে অর্থ-বিপর্য্যয় ঘটাইয়া, লোকে বিপথগামী হইয়া পড়িয়াছে;—তান্ত্রিকমতের ব্যভিচার ঘটাইয়াছে। ফলতঃ, প্রকারান্তরে যোগ-শিক্ষা দানই তন্ত্রের আদর্শ লক্ষ্য। নানা প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়াও নির্লিপ্ত অবস্থায় কিরূপে অবস্থিতি করিতে পারা যায়,—তাহা শিক্ষা দেওয়াই তন্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—পঞ্চ-মকারের এই ত্রিবিধ সাধনার বিষয় তন্ত্রে উল্লিখিত আছে;—সাত্ত্বিক-সাধনায় ব্রহ্মে আত্মলীন বা ব্রহ্মভাবে বিভোর; রাজসিক সাধনায় নৈবেদ্যাদি দ্বারা পূজার প্রাধান্য; এবং তামসিক সাধনায় উচ্ছৃঙ্খলার ভাব। সদ্‌গুরুর কৃপা প্রাপ্ত হইলে, তামসিক সাধনা হইতে ক্রমে ক্রমে সাত্ত্বিক সাধনার পথে মানুষ পৌঁছিতে পারে। কিন্তু এক্ষণে প্রকৃত সাধকের অভাব, প্রকৃত শিক্ষার অভাব, যথাযোগ্য শাস্ত্র-জ্ঞানেরও অভাব; সুতরাং তন্ত্রের নামে প্রায়শঃই ব্যভিচার চলিয়া থাকে।

* মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রের প্রথম ও একাদশ উল্লাস দ্রষ্টব্য।

কর্ম্মানুষ্ঠান অনুসারে তান্ত্রিকগণ ভিন্ন ভিন্ন আচারে বিভক্ত। সেই আচারের সংখ্যা কুলার্ণব-তন্ত্রের মতে—নয়টী ;—বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার, দক্ষিণাচার, সিদ্ধান্তাচার, বামাচার, অঘোরাচার, যোগাচার এবং কৌলাচার। এতন্মধ্যে বেদাচার হইতে বৈষ্ণবাচার, বৈষ্ণবাচার হইতে শৈবাচার ইত্যাদি পর্য্যায়ক্রমে শ্রেষ্ঠ বলিয়া উক্ত হয়। সে হিসাবে, কৌলাচারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

তান্ত্রিক আচার।

বেদাচার—প্রথম সোপান। নিয়মানুবর্ত্তিতাই ইহার প্রধান অঙ্গ। নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক গুরূপদেশ অনুসারে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে সাধন-পথে অগ্রসর হওয়াই—বেদাচারীর লক্ষ্য। বৈষ্ণবাচার—দ্বিতীয় সোপান। বেদাচার অনুসারে নিয়ম-তৎপর হইয়া, ভগবৎ-প্রেমে মগ্ন হওয়াই বৈষ্ণবাচারীর লক্ষ্যস্থানীয়। এই অবস্থায়, মৎস্য-মাংসাদি পঞ্চ-মকার পরিবর্জ্জনই প্রধান উদ্দেশ্য। শৈবাচার—তৃতীয় সোপান। এই অবস্থায়, বৈষ্ণবাচারের কমনীয়তার পরিবর্ত্তে রাজসিক ভাবের উদ্ভব হয়। এই তিন আচার—শূদ্র, বৈশ্য এবং ক্ষত্রিয়ের আচার বলিয়া কথিত হয়। সাধনার চতুর্থ সোপান—দক্ষিণাচার। এই অবস্থায়, সাধক আদ্যাশক্তির পূজা করিবে ;—গায়ত্রী উপাসনায় রত হইবে। ফলাকাঙ্ক্ষা-বর্জ্জনে নির্লিপ্ত-ভাবে উপাসনাই এই সাধনার লক্ষ্য। সিদ্ধান্তাচার—পঞ্চম সোপান। এই অবস্থায়, সাধক জ্ঞান-মার্গে উপনীত হন,—ক্রমে তাঁহার ভেদ-জ্ঞান দূরীভূত হইতে থাকে। ষষ্ঠ সোপান—বামাচার। এই অবস্থায়, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি লোপ ; এই অবস্থায়, কুল, শীল, লজ্জা, ভয় প্রভৃতি অষ্ট-পাশ বন্ধন মোচন ; এই অবস্থায়, বামা হইয়া পরাশক্তির পূজা করিতে হয় ;—"বামাচারো ভবেত্তত্র বামাভূত্বা যজেৎপরাং।" অঘোরাচার—সপ্তম সোপান। ইহাকে কেহ কেহ 'চীনাচার' নামেও অভিহিত করিয়া থাকেন। এই অবস্থায়, সংসারের ঘোর কাটিয়া যায় ; সাম্প্রদায়িক ভেদ দূর হয় ; ঘৃণা, লজ্জা, কুল, শীল—সকল অস্তিত্বই লোপ পায়। সাধনার অষ্টম সোপান—যোগাচার। যোগ-সাধনই এই অবস্থার প্রধান লক্ষ্য। এই অবস্থায়, শ্মশানবাসী হইয়া, মহাযোগী মহেশ্বরের ন্যায় জীব যোগমগ্ন হয়। কৌলাচার—নবম সোপান। এই অবস্থায়, সোঽহং ভাব। এখানে—দিক্-কাল নাই, নিয়ম নাই, শিষ্টাশিষ্ট নাই, মান-অপমান নাই ; এখানে সকলই অভিন্ন,—সকলই এক।

"দিক্কালনিয়মো নাস্তি তিথ্যাদিনিয়মো ন চ। নিয়মো নাস্তি দেবেশি মহামন্ত্রস্য সাধনে॥
ক্বচিৎ শিষ্টঃ ক্বচিৎ ভ্রষ্টঃ ক্বচিৎ ভূতপিশাচবৎ। নানাবেশধরা কৌলাঃ বিচরন্তি মহীতলে॥
কর্দ্দমে চন্দনেঽভিন্নং মিত্রে শত্রৌ তথা প্রিয়ে। শ্মশানে ভবনে দেবি তথৈব কাঞ্চনে তৃণে॥"

কর্দ্দম-চন্দন নাই, শত্রু-মিত্র নাই, শ্মশান-গৃহ নাই, স্বর্ণ-তৃণ নাই, কোনও ভেদই নাই। এই নবমাচারের মধ্যে বঙ্গদেশে বামাচারের প্রাধান্যই লক্ষিত হয়। তন্ত্রের মতে,—কর্ম্মঘোরে ঘুরিয়া ফিরিয়া সাধক যখন কৌলাচারের পথে উপনীত হন, তখনই তাঁহার মোক্ষ-লাভ হইয়া থাকে। আচার নয় প্রকার হইলেও, তান্ত্রিকগণের মধ্যে তিনটী ভাবের প্রাধান্য ;—পশুভাব, বীরভাব ও দিব্যভাব। ভাবত্রয়—মানসিক ধর্ম্ম। ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত মানুষের পশুভাব, পঞ্চাশ বর্ষ পর্য্যন্ত বীরভাব, তৎপরে দিব্যভাব। দিব্য-ভাবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সেই ভাবে কদাচার ত্যাগ, সেই ভাবে মোক্ষপথে অগ্রসর। দিব্যভাব—

কৌলাচারীর অঙ্গ-বিশেষ। ভাবের মধ্যে আবার অভিষেক আছে। অভিষেক অষ্টবিধ;— পূর্ণাভিষেক হইলেই মানুষ শিবসাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। * পক্ষান্তরে আবার, তন্ত্রে দ্বৈতাদ্বৈত উভয় ভাবই প্রকটিত। শিব-শক্তি সংজ্ঞা—সেই উভয় ভাবের দ্যোতক। তাই তন্ত্রে দেখিতে পাই,—কখনও শক্তির উপাসনার, কখনও শিবের উপাসনার, কখনও শক্তিরূপিণী দেবীর উপাসনার, কখনও শিবরূপী দেবদেব মহাদেবের উপাসনার, মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে; কখনও বা তন্ত্র নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন,—তিনি এক, তিনি অদ্বিতীয়, তিনি সত্য, তিনি সদ্রূপ, তিনি পরাৎপর, তিনি স্ব-প্রকাশ তিনি সর্ব্বদা পূর্ণ ও সচ্চিদানন্দস্বরূপ। †

"স এক এব সদ্রূপঃ সত্যোঽদ্বৈতঃ পরাৎপরঃ। স্বপ্রকাশঃ সদাপূর্ণঃ সচ্চিদানন্দলক্ষণঃ॥"

তবেই বুঝা যায়,—সেই বেদ, সেই উপনিষৎ, সেই দর্শন, সেই পুরাণ,—তন্ত্রের মধ্যে কেমন ওতঃপ্রোতঃ-ভাবে অবস্থিত! আগম ও নিগম-ভেদে তন্ত্র-শাস্ত্র দ্বিবিধ। দেবাদিদেব মহাদেব যে তন্ত্রের বক্তা, তাহাই আগম-শাস্ত্র নামে অভিহিত; আর, মহাদেবী ভগবতী যে তন্ত্র বিবৃত করিতেছেন, তাহাই নিগম-শাস্ত্র।

তন্ত্র-সম্বন্ধে বিবিধ বক্তব্য।

সৃষ্টি-তত্ত্ব সম্বন্ধেও দর্শনে, পুরাণে বা তন্ত্রে বিশেষ কোনই পার্থক্য দেখিতে পাই না। তন্ত্রেও সেই মহত্তত্ত্ব, তন্ত্রেও সেই পরমাণু-তত্ত্ব, তন্ত্রেও সেই পঞ্চ-মহাভূত-কথা; তন্ত্রেও সেই কর্ম্মানুসারে স্বর্গ নরক-লাভ-প্রসঙ্গ। তন্ত্রেও লিখিত আছে,—আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে সূর্য্য, সূর্য্য হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী,—এইরূপে পঞ্চভূতাত্মক ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছিল। তন্ত্রেও লিখিত আছে,—যে যেরূপ পাপ-পুণ্যের অনুষ্ঠান করে, তাহার সেইরূপ স্বর্গ-নরক ভোগ হয়। তন্ত্রেও লিখিত আছে,—জলৌকা যেমন তৃণ হইতে তৃণান্তরে গমন করে, জীবও সেইরূপ দেহ হইতে দেহান্তরে আশ্রয় লয়; সে যেমন একটী আশ্রয় প্রাপ্ত না হইলে, পূর্ব্বাশ্রয় ত্যাগ করে না, জীবও সেইরূপ দেহান্তরের আশ্রয় না পাইলে, দেহ পরিত্যাগ করে না। জন্ম-মৃত্যু-তত্ত্ব-প্রসঙ্গে দেবী চণ্ডীকার নিকট মহাদেব তাহাই বলিতেছেন;—

"ইহ যৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম তৎপরত্রোপভুজ্যতে। জীবস্তৃণজলৌকেব দেহদ্দেহান্তরং ব্রজেৎ॥
সংপ্রাপ্য চোত্তমং দেহং দেহং ত্যজতি পূর্ব্বকম্। ইতি শ্রুত্বা চ সা চণ্ডী পপ্রচ্ছ পরমেশ্বরম্॥"

প্রকৃতি হইতেই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, আবার প্রকৃতিতেই তাহার লয়,—নির্ব্বাণ-তন্ত্রে সুন্দর উপমায় তাহা এইরূপ-ভাবে তন্ত্রকার পরিবর্ণন করিয়া গিয়াছেন,—

"প্রকৃত্যা জায়তে সর্ব্বং প্রকৃত্যা সৃজ্যতে জগৎ। তোয়াত্তু বুদ্‌বুদং দেবী যথা তোয়ে বিলীয়তে॥"

'জল হইতে যেমন বুদ্‌বুদ্ উৎপন্ন হয়, আবার জলেই তাহা বিলীন হইয়া যায়, প্রকৃতি হইতে তদ্রূপ সংসারের উৎপত্তি, আবার প্রকৃতিতেই তাহার লয়।' তন্ত্র-সম্বন্ধে বলিতে গেলে, আরও অনেক কথা বলিতে হয়। চক্রশুদ্ধি, সাধক-সাধিকা, গুরু, দীক্ষা, মন্ত্র, বীজ-সঙ্কেত,—তন্ত্রের কত অঙ্গ, কত প্রক্রিয়া। এই তন্ত্র অনুসারেই অধুনা দেব-দেবীর পূজা হইয়া থাকে; এই তন্ত্র অনুসারেই হিন্দুর গৃহ-ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; এই তন্ত্র মান্য করিয়াই বাঙ্গালার ব্রাহ্মণমাত্রেই আজি পর্য্যন্ত শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া থাকেন। সংস্কার

* পূর্ণাভিষেকের বিবরণ মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র, দশম উল্লাস দ্রষ্টব্য।

† মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র, নিত্যাতন্ত্র, প্রাণতোষিণী-তন্ত্র, কুলার্ণব-তন্ত্র প্রভৃতিতে এতদ্বিষয়ে আলোচনা আছে।

প্রভৃতি নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়া-পরম্পরাও অনেক স্থলে এখনও তন্ত্র অনুসারে নির্ব্বাহিত হয়। দীক্ষায় তন্ত্রের বীজ-মন্ত্র (ক্লীং, হ্রীং, হ্রাং ইত্যাদি), গ্রহ-শান্তিতে বীজ-মন্ত্র (শাং, শ্রীং, শ্রীং ইত্যাদি), পঞ্চামৃত ভক্ষণেও বীজ-মন্ত্র (ক্লীং, শ্রীং প্রভৃতি)। প্রতি দেবতার আরাধনায়ও গূঢ়-ভাবে অন্তরে অন্তরে ঐরূপ বীজমন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়;—

"শাং শীং শূং শৈং ততঃ শৌংশঃ শুক্রমন্ত্রঃ সমীরিতঃ। হ্রাং হ্রাং হ্রীং হ্রীং সর্ব্বশত্রূন্ বিদ্রাবয় পদদ্বয়ম্॥
মার্ত্তণ্ডসূনবে পশ্চাৎ নমো মন্ত্রঃ শনৈশ্চরে॥
রাং ক্রোং ক্রৈং হ্রীং সোমশত্রো শত্রূন্ বিধ্বংসদ্বয়ম্। রাহবে নম ইত্যেষ রাহোর্ম্মন্ত্রুরুদাহৃতঃ॥"

শুক্রমন্ত্র,—শাং শীং শূং শৈং এবং শৌং শঃ; শনৈশ্চরের মন্ত্র,—'হ্রাং হ্রাং হ্রীং হ্রীং সর্ব্বশত্রূন্ বিদ্রাবয় বিদ্রাবয় মার্ত্তণ্ডসূনবে' পরে 'নমঃ' ইত্যাদি। এই বীজ-মন্ত্রের এক একটী শব্দের মন্ত্র-সঙ্কেত বা নিগূঢ় অর্থ আছে। 'হ্রীং' শব্দ ভুবনেশ্বরী-মন্ত্রের বীজ। কিন্তু ঐ বীজ-মন্ত্রের অন্তর্গত 'হ' বর্ণে নকুলীশ মহাদেব, 'র' বর্ণে অগ্নি, ঈ বর্ণে বামনেত্র, ঁ বর্ণে অর্দ্ধচন্দ্র। ফলতঃ, হ্রীং শব্দে চতুর্ব্বিধ শক্তির সমাবেশ বুঝায়। তন্ত্র-মতে, বিশুদ্ধাচারে বিধিপূর্ব্বক মন্ত্রোচ্চারণ করিলে, সর্ব্ব আপদ দূরীভূত হয়। তন্ত্র-শাস্ত্র বলেন—গুরুতর যে ব্রহ্মশাপ, 'ওঁ বাং বীঁ বূঁ বৈঁ বৌ বঃ ব্রহ্মশাপবিমোচিতায়ৈ সুধা দেব্যৈ নমঃ'—এই মন্ত্রটী তিনবার উচ্চারণ করিলে, সেই ব্রহ্মশাপ হইতেও মুক্তিলাভ করা যায়। অথর্ব্ব-সংহিতায় এবং অগ্নিপুরাণ প্রভৃতিতে এইরূপ মন্ত্র-মাহাত্ম্যের কথা লিখিত আছে। ঐ সকল মন্ত্রে প্রত্যক্ষ ফল এখন যে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তাহার কারণ, অনেকে বিশ্বাস করেন,—মন্ত্রোচ্চারণে দোষ হয়, এবং আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটে। তন্ত্র-শাস্ত্র-সমূহের রচনার কাল-সম্বন্ধে এখন সময় সময় নানা বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। তন্ত্র-শাস্ত্র-সমূহকে অনেকে নিতান্ত আধুনিক—এমন কি, ঐ সমুদায় ভারতে মুসলমান-অধিকারের সমসময়ে প্রণীত হইয়াছিল—বলিয়া উল্লেখ করেন। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। হইতে পারে,—তন্ত্র-সম্বন্ধে কোনও কোনও গ্রন্থ আধুনিক রচনা; কিন্তু উহার মূল-তত্ত্ব বহু দিন হইতেই অব্যাহত আছে। যদিও সকল 'তন্ত্র'-শব্দটীর উল্লেখ সকল প্রাচীন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু তন্ত্রান্তর্গত মন্ত্র যে প্রাচীন, তাহা বলাই বাহুল্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অথর্ব্ববেদে ঐ মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। উপনিষদের মধ্যে নৃসিংহতাপন্যুপনিষদে তান্ত্রিক মন্ত্র-সমূহ রূপান্তরে উল্লিখিত হইয়াছে। বৌদ্ধদিগের কতকগুলি তন্ত্র, খৃষ্টীয় নবম ও একাদশ শতাব্দীর মধ্যে তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। সে সকল তন্ত্র যে হিন্দু-তন্ত্র-শাস্ত্র-সমূহের অনুকরণে রচিত হয়, তাহাতে কোনই সংশয় নাই। ভৈরব-ভৈরবী, যোগিনী-ডাকিনী, চণ্ডী-তারা প্রভৃতির উপাসনা বৌদ্ধ-তন্ত্রেও দৃষ্ট হয়। সাধনার অন্যান্য প্রণালীও, অধিক কি গুহ্য-বিষয় অনধিকারীর নিকট প্রকাশ করিতে নাই—এই তত্ত্বটী পর্য্যন্ত, বৌদ্ধ-তন্ত্রে সন্নিবিষ্ট আছে। বশিষ্ঠ, জৈমিনি, যাজ্ঞবল্ক্য, শুক্র, বৃহস্পতি, নারদ, ভার্গব প্রভৃতি ঋষিগণের রচিত কতকগুলি উপতন্ত্র ছিল, তাহারও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মনুসংহিতার টীকায় কুল্লূক ভট্ট লিখিয়া গিয়াছেন,—'বেদের মন্ত্র-সমূহ প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত; বৈদিক ও তান্ত্রিক।' সুতরাং বুঝা যায়,—তন্ত্র-মত আবহমান-কাল হইতেই প্রচলিত ছিল;

পরবর্ত্তি-কালে ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতগণ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উহা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। পুরাণাদিতে যেরূপ কালবশে নানা বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, তন্ত্রেও সেইরূপ আধুনিক বিষয়-পরম্পরা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ভাষান্তরে রচিত হওয়ায়, সেইরূপ আধুনিক বিষয়-পরম্পরার সন্নিবেশ সম্ভাবনা। তন্ত্রের কদর্য্য বা পঞ্চ-মকারে ব্যাভিচারিত্বের প্রশ্রয়—বুদ্ধি-বিপর্য্যয়ের ফল ভিন্ন অন্য আর কি হইতে পারে? নিঃশ্রেয়স মুক্তিলাভ যে শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, সে শাস্ত্রে কখনই ব্যভিচার বা উচ্ছৃঙ্খলার প্রশ্রয় দেওয়া সম্ভবপর নহে। তন্ত্র-শাস্ত্র তাই পুনঃপুনঃ উপদেশ দিয়াছেন,—উপযুক্ত গুরু ভিন্ন কাহারও নিকট তন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ করিও না। সে গুরু আবার কেমন হইবেন, তন্ত্র তাহাও বলিয়া দিয়াছেন;—

"শান্তোদান্তঃ কুলীনশ্চ শুদ্ধান্তঃকরণঃ সদা। পঞ্চতত্ত্বার্চ্চকো যস্তু সদ্গুরু স প্রকীর্ত্তিতঃ॥
পরমার্থে সদা দৃষ্টিঃ পরমার্থং প্রকীর্ত্তিতম্। গুরুপাদাম্বুজে ভক্তির্যস্যৈব সদ্গুরুঃ স্মৃতঃ॥"

শিষ্যও আবার সেইরূপ হওয়া আবশ্যক। গুরু যেমন শান্ত, দান্ত, কুলীন ও শুদ্ধান্তঃকরণ হইবেন, শিষ্যকেও সেইরূপ শুদ্ধাত্মা, সৎকুলোদ্ভব, বেদপাঠরত ও পিতৃ-মাতৃ-হিতপরায়ণ হইতে হইবে। কি শাক্ত, কি শৈব, কি বৈষ্ণব,—গুরুকরণ-সম্বন্ধে সকলেরই সেই একই মত। আপনাপন উপদেষ্টা গুরুর 'প্রণাম-মন্ত্র' সকলেই সমস্বরে উচ্চারণ করিয়া থাকেন,—

"অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্। তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

তান্ত্রিক পূজা-পদ্ধতি।

তান্ত্রিক পূজা-পদ্ধতি (কালী-পূজা, জগদ্ধাত্রী, পূজা প্রভৃতি), অনেকের বিশ্বাস, অতি আধুনিক-কালে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যখন কৃষ্ণনগরের রাজ-সিংহাসনে অধিরূঢ়, তখন নবদ্বীপে তান্ত্রিক-মতাবলম্বী আগম-বাগীশ পণ্ডিতের বিশেষ প্রাদুর্ভাব। তিনি রাজ-বাটীর সভা-পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহারই প্রভাবে গৌরাঙ্গ-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-পরিপ্লাবিত নবদ্বীপে শক্তি-পূজা প্রতিষ্ঠিত হয়। দীপান্বিতা শ্যামা-পূজার এবং জগদ্ধাত্রী-পূজার তিনিই প্রবর্ত্তনা করিয়াছিলেন বলিয়া কিংবদন্তী আছে। কিন্তু, বাস্তবপক্ষে বহু-পূর্ব্ব হইতেই এদেশে শক্তি-পূজা প্রচলিত ছিল। শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধের সময় কালীমূর্ত্তির প্রাধান্য পরিকীর্ত্তিত আছে; বিশ্বামিত্র-ঋষি ব্রাহ্মণত্ব-লাভের জন্য দক্ষিণা-কালিকার বীজ-মন্ত্র জপ করিয়াছিলেন; বসিষ্ঠ-দেবের নিকট তারা-মূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়াছিল;—শাস্ত্রে এবম্বিধ উল্লেখ আছে। দক্ষিণা-কালী, সিদ্ধ-কালী, উগ্র-কালী, গুহ্য-কালী, ভদ্র-কালী, শ্মশান-কালী, মহাকালী, চামুণ্ডা-কালী—এই অষ্টবিধা কালীমূর্ত্তির ধ্যান ও বর্ণনা, তন্ত্র ও পুরাণাদিতে দৃষ্ট হয়। সুতরাং শক্তি-পূজা-পদ্ধতি বহুদিন হইতেই প্রচলিত ছিল বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। তবে যে আগম-বাগীশ বা কৃষ্ণচন্দ্রকে শ্যামা-পূজা ও জগদ্ধাত্রী-পূজার প্রবর্ত্তক বলিয়া লোকে সাধারণতঃ বিশ্বাস করিয়া থাকে; তাহার কারণ,—বৈষ্ণব-প্রাধান্যের মধ্যেও গৌরাঙ্গের জন্মভূমি নবদ্বীপে সেই সময় শক্তি-পূজা পুনঃ-প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। নাটোরের রাজ-বংশ এবং কৃষ্ণনগরের রাজ-বংশ বহুদিন হইতেই তান্ত্রিক-মতাবলম্বী ছিলেন। উত্তর-বঙ্গ ও পূর্ব্ব-বঙ্গ, নাটোর-রাজবংশের আদর্শানুসারে পরিচালিত হইত; এবং দক্ষিণ-বঙ্গ ও পশ্চিম-বঙ্গ, কৃষ্ণনগরের অনুশাসন মান্য করিয়া চলিত। যে সময়ে আগম-বাগীশ কর্ত্তৃক শক্তি-পূজা-প্রতিষ্ঠার কথা উল্লিখিত হয়, তৎকালে নাটোর-রাজ-ভবনেও শক্তি-পূজার প্রাধান্য ছিল। ঐ পূজা-পদ্ধতি পূর্ব্বকাল হইতেই প্রচলিত না থাকিলে, নাটোর যে কৃষ্ণনগরের অনুসরণ করিয়া ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিবেন,—তাহা কখনই মনে হয় না। ফলতঃ, সংসারে এক এক সময়ে যে এক এক ভাব-প্রবাহ প্রবাহিত হয়, তাহারই ফলে, মুসলমান-শাসনের সময়ে, বঙ্গদেশে একবার তান্ত্রিক-ধর্ম্ম জাগিয়া উঠিয়াছিল। পূর্ব্ব-স্মৃতি বিস্মৃত হওয়ায়, লোকে তাহাকেই আদি জাগরণ বলিয়া মনে করে মাত্র।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

রামায়ণ।

[রামায়ণ,—নারদ-বাল্মীকি সংবাদে রামায়ণের সার-মর্ম্ম;—প্রসঙ্গতঃ রঘু বংশের ও বিবিধ আচার-পদ্ধতির পরিচয়,—অযোধ্যা-রাজ্যের উন্নতির চিত্র;—রামায়ণ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থের আলোচনা;—যোগবাশিষ্ঠ, পদ্ম-পুরাণ, অধ্যাত্ম-রামায়ণ, দেবী-ভাগবত প্রভৃতিতে রামায়ণ-প্রসঙ্গ;—কৃত্তিবাস প্রভৃতির কল্পনায় রামায়ণের রূপান্তর;—রামায়ণের শিক্ষা—পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃভক্তি, সত্য-পরায়ণতা প্রভৃতির আদর্শ-চিত্র;—রামায়ণের প্রাচীনত্ব, রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত,—রামায়ণের সময়ে মহাভারতের অস্তিত্ব বিষয়ে আলোচনা,—রামায়ণ-সম্বন্ধে পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের মত খণ্ডন।]

রামায়ণের সার-মর্ম্ম।

রামায়ণ—ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের প্রধান অঙ্গ। রামায়ণে ভারতবর্ষের এক সময়ের ইতিহাস ওতঃপ্রোতঃ বিজড়িত রহিয়াছে। অযোধ্যার অধিপতি শ্রীরামচন্দ্র যৎকালে রাজ্যভার প্রাপ্ত হন, রামায়ণ সেই সময়ে রচিত হইয়াছিল। সুতরাং, রামায়ণে রাম-রাজত্বের এবং তাৎকালীন ভারতবর্ষের প্রস্ফুট চিত্র প্রকটিত রহিয়াছে। তপোনিষ্ঠ বাল্মীকি, স্বাধ্যায়নিরত মুনিশ্রেষ্ঠ বাগ্মিপ্রবর নারদকে জিজ্ঞাসা করেন,—"ভূমণ্ডলে এমন রাজা কে আছেন, যিনি গুণবান্, জ্ঞানবান্, বীর্য্যবান, সত্যনিষ্ঠ, দৃঢ়ব্রত, জিতেন্দ্রিয়, শত্রুমর্দ্দন?" মহর্ষি নারদ তদুত্তরে রাম-চরিত কীর্ত্তন করেন। ইহাই রামায়ণের মূল ভিত্তি। সেই ভিত্তি অবলম্বন করিয়াই ব্রহ্মার বরে বাল্মীকি রামায়ণ-রচনায় প্রবৃত্ত হন। কথিত হয়, তাঁহার বাক্যই প্রথম শ্লোক; এবং তাহাই সংস্কৃত-ভাষার আদি-কবিতা। সাধারণতঃ প্রচার,—রাম-জন্মের ষষ্টিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে রামায়ণ রচিত হইয়াছিল। কিন্তু রামায়ণে তাহার কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না; পরন্তু, রামায়ণের আদিকাণ্ডে বাল্মীকির উক্তিতে আমরা দেখিতে পাই,—

"প্রাপ্তরাজ্যস্য রামস্য বাল্মীকির্ভগবানৃষিঃ। চকার চরিতং কৃৎস্নং বিচিত্রপদমর্থবৎ॥"

রামচন্দ্র রাজ্যলাভ করিলে পর, মহর্ষি বাল্মীকি বিচিত্র-পদসমন্বিত রাম-চরিত বর্ণন করেন। ঐ স্থলে আরও দেখিতে পাই,—প্রথমতঃ তাঁহার রামায়ণ আদি, অযোধ্যা, অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দর ও লঙ্কা—এই ছয় কাণ্ডে পঞ্চশত সর্গে বিভক্ত ছিল; এবং চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোকে সম্পূর্ণ হইয়াছিল; পরিশেষে তিনি উত্তর-কাণ্ড লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই উত্তর-কাণ্ডের আলোচ্য বিষয় ধ্যানযোগে অবগত হইয়া ঘটনার পূর্ব্বেই মহর্ষি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন,—এরূপও প্রচার আছে। কুশী ও লবকে বাল্মীকি স্ব-রচিত রামায়ণ-গ্রন্থ শিক্ষা দিয়াছিলেন। বালক-দ্বয় মধুর স্বরে, ষড়জ মধ্যম প্রভৃতি সপ্তস্বরে, বীণালয়ে বীভৎস-শৃঙ্গার-করুণ-হাস্য-রৌদ্র-ভয়ানক-বীর প্রভৃতি রস-সংযোগে, তাহা গান করিতেন। শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞে

কুশী-লব রামায়ণ গান করিয়াছিলেন ; সেই হইতেই রামায়ণ গৃহে গৃহে প্রচারিত হয়। প্রথমে মহর্ষি নারদ বাল্মীকির নিকট সংক্ষেপে যে রামায়ণী-কথা কহিয়াছিলেন, রামায়ণের সার-মর্ম্ম কি সুন্দর-ভাবেই তাহাতে বিবৃত আছে ! মহর্ষি নারদ বাল্মীকিকে বলিতেছেন,—

"জ্যেষ্ঠং শ্রেষ্ঠগুণৈর্যুক্তং প্রিয়ং দশরথঃ সুতম্। প্রকৃতীনাং হিতৈর্যুক্তং প্রকৃতি প্রিয়কাম্যয়া ॥
যৌবরাজ্যেন সংযোক্তুমৈচ্ছৎ প্রীত্যা মহীপতিঃ। তস্যাভিষেকসম্ভারান্ দৃষ্ট্বা ভার্য্যাথ কৈকেয়ী ॥
পূর্ব্বং দত্তবরা দেবী বরমেনমযাচত। বিবাসনঞ্চ রামস্য ভরতস্যাভিষেচনম্ ॥
স সত্যবচনাদ্রাজা ধর্ম্মপাশেন সংযতঃ। বিবাসয়ামাস সুতং রামং দশরথঃ প্রিয়ম্ ॥
স জগাম বনং বীরঃ প্রতিজ্ঞামনুপালয়ন্। পিতুর্ব্বচননির্দ্দেশাৎ কৈকেয্যাঃ প্রিয়কারণাৎ ॥
তং ব্রজন্তং প্রিয়ো ভ্রাতা লক্ষ্মণোঽনুজগাম হ। স্নেহাদ্বিনয়সম্পন্নঃ সুমিত্রানন্দবর্দ্ধনঃ ॥
ভ্রাতরং দয়িতো ভ্রাতুঃ সৌভ্রাত্রমনুদর্শয়ন্। রামস্য দয়িতা ভার্য্যা নিত্যং প্রাণসমা হিতা ॥
জনকস্য কুলে জাতা দেবমায়েব নির্ম্মিতা। সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না নারীণামুত্তমা বধূঃ ॥
সীতাপ্যনুগতা রামং শশিনং রোহিণী যথা। পৌরৈরনুগতো দূরং পিত্রা দশরথেন চ ॥
শৃঙ্গবেরপুরে সূতং গঙ্গাকূলে ব্যসর্জ্জয়ৎ। গুহমাসাদ্য ধর্ম্মাত্মা নিষাদাধিপতিং প্রিয়ম্ ॥
গুহেন সহিতো রামো লক্ষ্মণেন চ সীতয়া। তে বনেন বনং গত্বা নদীস্তীর্ত্বা বহূদকাঃ ॥
চিত্রকূটমনুপ্রাপ্য ভরদ্বাজস্য শাসনাৎ। রম্যমাবসথং কৃত্বা রমমাণা বনে ত্রয়ঃ ॥
দেবগন্ধর্ব্বসঙ্কাশাস্তত্র তে ন্যবসন্ সুখম্। চিত্রকূটং গতে রামে পুত্রশোকাতুরস্তথা ॥
রাজা দশরথঃ স্বর্গং জগাম বিলপন্ সুতম্। গতে তু তস্মিন্ ভরতো বসিষ্ঠপ্রমুখৈর্দ্বিজৈঃ ॥
নিযুজ্যমানো রাজ্যায় নৈচ্ছদ্রাজ্যং মহাবলঃ। স জগাম বনং বীরো রামপাদপ্রসাদকঃ ॥
গত্বা তু স মহাত্মানং রামং সত্যপরাক্রমম্। অযাচদ্ভ্রাতরং রামমার্য্যভাবপুরস্কৃতঃ ॥
ত্বমেব রাজা ধর্ম্মজ্ঞ ইতি রামং বচোঽব্রবীৎ। রামোঽপি পরমোদারঃ সুমুখঃ সুমহাযশাঃ ॥
ন চৈচ্ছৎ পিতুরাদেশাদ্রাজ্যং রামো মহাবলঃ। পাদুকে চাস্য রাজ্যায় ন্যাসং দত্ত্বা পুনঃপুনঃ ॥
নিবর্ত্তয়ামাস ততো ভরতং ভরতাগ্রজঃ। স কামমনবাপ্যৈব রামপাদাবুপস্পৃশন্ ॥
নন্দিগ্রামেঽকরোদ্রাজ্যং রামাগমনকাঙ্ক্ষয়া। গতে তু ভরতে শ্রীমান্ সত্যসন্ধো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥
রামস্তু পুনরালক্ষ্য নাগরস্য জনস্য চ। তত্রাগমনমেকাগ্রো দণ্ডকান্ প্রবিবেশ হ ॥
প্রবিশ্য তু মহারণ্যং রামো রাজীবলোচনঃ। বিরাধং রাক্ষসং হত্বা শরভঙ্গং দদর্শ হ ॥
সুতীক্ষ্ণঞ্চাপ্যগস্ত্যঞ্চ অগস্ত্যভ্রাতরং তথা। অগস্ত্যবচনাচ্চৈব জগ্রাহৈন্দ্রং শরাসনম্ ॥
খড়্গঞ্চ পরমং প্রীতস্তূণী চাক্ষয়সায়কৌ। বসতস্তস্য রামস্য বনে বনচরৈঃ সহ ॥
ঋষয়োঽভ্যাগমন্ সর্ব্বে বধায়াসুররক্ষসাম্। স তেষাং প্রতিশুশ্রাব রাক্ষসানাং তদা বনে ॥
প্রতিজ্ঞাতশ্চ রামেণ বধঃ সংযতি রক্ষসাম্। ঋষীণামগ্নিকল্পানাং দণ্ডকারণ্যবাসিনাম্ ॥
তেন তত্রৈব বসতা জনস্থাননিবাসিনী। বিরূপিতা শূর্পণখা রাক্ষসী কামরূপিণী ॥
ততঃ শূর্পণখাবাক্যাদুদ্যুক্তান্ সর্ব্বরাক্ষসান্। খরং ত্রিশিরসঞ্চৈব দূষণঞ্চৈব রাক্ষসম্ ॥
নিজঘান রণে রামস্তেষাঞ্চৈব পদানুগান্। বনে তস্মিন্নিবসতা জনস্থাননিবাসিনাম্ ॥
রক্ষসাং নিহতান্যাসন্ সহস্রাণি চতুর্দ্দশ। ততো জ্ঞাতিবধং শ্রুত্বা রাবণঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥
সহায়ং বরয়ামাস মারীচং নাম রাক্ষসম্। বার্য্যমাণঃ সুবহুশো মারীচেন স রাবণঃ ॥
ন বিরোধো বলবতা ক্ষমো রাবণ তেন তে। অনাদৃত্য তু তদ্বাক্যং রাবণঃ কালচোদিতঃ ॥
জগাম সহমারীচস্তস্যাশ্রমপদং তদা। তেন মায়াবিনা দূরমপবাহ্য নৃপাত্মজৌ ॥
জহার ভার্য্যাং রামস্য গৃধ্রং হত্বা জটায়ুষম্। গৃধ্রঞ্চ নিহতং দৃষ্ট্বা হৃতাং শ্রুত্বা চ মৈথিলীম্ ॥

রাঘবঃ শোকসন্তপ্তো বিললাপাকুলেন্দ্রিয়ঃ। ততস্তেনৈব শোকেন গৃধ্রং দগ্ধা জটায়ুষম্॥
মার্গমাণো বনে সীতাং রাক্ষসং সন্দদর্শ হ। কবন্ধং নাম রূপেণ বিকৃতং ঘোরদর্শনম্॥
তং নিহত্য মহাবাহুর্দদাহ স্বর্গতশ্চ সঃ। স চাস্য কথয়ামাস শবরীং ধর্মচারিণীম্॥
শ্রমণীং ধর্ম্মনিপুণামভিগচ্ছেতি রাঘব। সোঽভ্যাগচ্ছন্মহাতেজাঃ শবরীং শত্রুসূদনঃ॥
শবর্য্যা পূজিতঃ সম্যক্ রামো দশরথাত্মজঃ। পম্পাতীরে হনুমতা সঙ্গতো বানরেণ হ॥
হনুমদ্বচনাচ্চৈব সুগ্রীবেণ সমাগতঃ। সুগ্রীবায় চ তৎ সর্ব্বং শংসদ্রামো মহাবলঃ॥
আদিতস্তদ্ যথাবৃত্তং সীতায়াশ্চ বিশেষতঃ। সুগ্রীবশ্চাপি তৎ সর্ব্বং শ্রুত্বা রামস্য বানরঃ॥
চকার সখ্যং রামেণ প্রীতশ্চৈবাগ্নিসাক্ষিকম্। ততো বানররাজেন বৈরানুকথনং প্রতি॥
রামায়াবেদিতং সর্ব্বং প্রণয়াদ্দুঃখিতেন চ। প্রতিজ্ঞাতঞ্চ রামেণ তদা বালিবধং প্রতি॥
বালিনশ্চ বলং তত্র কথয়ামাস বানরঃ। সুগ্রীবঃ শঙ্কিতশ্চাসীন্নিত্যং বীর্য্যেণ রাঘবে॥
রাঘবপ্রত্যয়ার্থন্তু দুন্দুভেঃ কায়মুত্তমম্। দর্শয়ামাস সুগ্রীবো মহাপর্ব্বতসন্নিভম্॥
উৎস্ময়িত্বা মহাবাহুঃ প্রেক্ষ্য চাস্থি মহাবলঃ। পাদাঙ্গুষ্ঠেন চিক্ষেপ সম্পূর্ণং দশযোজনম্॥
বিভেদ চ পুনস্তালান্ সপ্তৈকেন মহেষুণা। গিরিং রসাতলঞ্চৈব জনয়ন্ প্রত্যয়ং তদা॥
ততঃ প্রীতমনাস্তেন বিশ্বস্তঃ স মহাকপিঃ। কিষ্কিন্ধ্যাং রামসহিতো জগাম চ গুহাং তদা॥
ততোঽগর্জ্জদ্ধরিবরঃ সুগ্রীবো হেমপিঙ্গলঃ। তেন নাদেন মহতা নির্জ্জগাম হরীশ্বরঃ॥
অনুমান্য তদা তারাং সুগ্রীবেণ সমাগতঃ। নিজঘান চ তত্রৈনং শরেণৈকেন রাঘবঃ॥
ততঃ সুগ্রীববচনাদ্ধত্বা বালিনমাহবে। সুগ্রীবমেব তদ্রাজ্যে রাঘবঃ প্রত্যপাদয়ৎ॥
স চ সর্ব্বান্ সমানীয় বানরান্ বানরর্ষভঃ। দিশঃ প্রস্থাপয়ামাস দিদৃক্ষুর্জ্জনকাত্মজাম্॥
ততো গৃধ্রস্য বচনাৎ সম্পাতের্হনুমান্ বলী। শতযোজন বিস্তীর্ণং পুপ্লুবে লবণার্ণবম্॥
তত্র লঙ্কাং সমাসাদ্য পুরীং রাবণপালিতাম্। দদর্শ সীতাং ধ্যায়ন্তীমশোকবনিকাগতাম্॥
নিবেদয়িত্বাভিজ্ঞানং প্রবৃত্তিং বিনিবেদ্য চ। সমাশ্বাস্য চ বৈদেহীং মর্দ্দয়ামাস তোরণম্॥
পঞ্চ সেনাগ্রগান্ হত্বা সপ্ত মন্ত্রিসুতানপি। শূরমক্ষঞ্চ নিষ্পিষ্য গ্রহণং সমুপাগমৎ॥
অস্ত্রেণোন্মুক্তমাত্মানং জ্ঞাত্বা পৈতামহাদ্বরাৎ। মর্ষয়ন রাক্ষসান্ বীরো যন্ত্রিণস্তান যদৃচ্ছয়া॥
ততো দগ্ধ্বা পুরীং লঙ্কামৃতে সীতাঞ্চ মৈথিলীম্। রামায় প্রিয়মাখ্যাতুং পুনরায়ান্মহাকপিঃ॥
সোঽভিগম্য মহাত্মানং কৃত্বা রামং প্রদক্ষিণম্। ন্যবেদয়দমেয়াত্মা দৃষ্টা সীতেতি তত্ত্বতঃ॥
ততঃ সুগ্রীবসহিতো গত্বা তীরং মহোদধেঃ। সমুদ্রং ক্ষোভয়ামাস শরৈরাদিত্যসন্নিভৈঃ॥
দর্শয়ামাস চাত্মানং সমুদ্রঃ সরিতাং পতিঃ। সমুদ্রবচনাচ্চৈব নলং সেতুমকারয়ৎ॥
তেন গত্বা পুরীং লঙ্কাং হত্বা রাবণমাহবে। রামঃ সীতামনুপ্রাপ্য পরাং ব্রীড়ামুপাগমৎ॥
তামুবাচ ততো রামঃ পরুষং জনসংসদি। অমৃষ্যমাণা সা সীতা বিবেশ জ্বলনং সতী॥
ততোঽগ্নিবচনাৎ সীতাং জ্ঞাত্বা বিগতকল্মষাম্। বভৌ রামঃ সম্প্রহৃষ্টঃ পূজিতঃ সর্ব্বদেবতৈঃ॥
কর্ম্মণা তেন মহতা ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্। সদেবর্ষিগণং তুষ্টং রাঘবস্য মহাত্মনঃ॥
অভিষিচ্য চ লঙ্কায়াং রাক্ষসেন্দ্রং বিভীষণম্। কৃতকৃত্যস্তদা রামো বিজ্বরঃ প্রমুমোদ হ॥
দেবতাভ্যো বরং প্রাপ্য সমুত্থাপ্য চ বানরান্। অযোধ্যাং প্রস্থিতো রামঃ পুষ্পকেণ সুহৃদ্বৃতঃ॥
ভরদ্বাজাশ্রমং গত্বা রামঃ সত্যপরাক্রমঃ। ভরতস্যান্তিকে রামো হনুমন্তং ব্যসর্জ্জয়ৎ॥
পুনরাখ্যায়িকাং জল্পন্ সুগ্রীবসহিতস্তদা। পুষ্পকং তৎ সমারুহ্য নন্দিগ্রামং যযৌ তদা॥
নন্দিগ্রামে জটাং হিত্বা ভ্রাতৃভিঃ সহিতোঽনঘঃ। রামঃ সীতামনুপ্রাপ্য রাজ্যং পুনরবাপ্তবান্॥
পালয়ামাস চৈবেমাঃ পিতৃবন্মুদিতাঃ প্রজাঃ। অযোধ্যাধিপতিঃ শ্রীমান্ রামো দশরথাত্মজঃ॥" *

* রামায়ণ, আদিকাণ্ড, প্রথম অধ্যায় ২০শ হইতে ৯০শ শ্লোক।

'ইক্ষ্বাকু-বংশে সকল-গুণবিশিষ্ট রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার গুণের তুলনা নাই। তিনি সর্ব্বশুভলক্ষণান্বিত, প্রজাহিতৈষী, পবিত্রাত্মা, সর্ব্বশাস্ত্রাভিজ্ঞ, সর্ব্ব-লোকপ্রিয়, সাধু-স্বভাব, সুবিচক্ষণ ও প্রিয়দর্শন। তিনি মহীপতি দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র; কৌশল্যা-দেবীর গর্ভে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সেই সত্যব্রত পরাক্রমশালী প্রজাবর্গের হিতৈষী রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে রাজা দশরথ ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি মধ্যমা মহিষী কৈকেয়ীকে দুইটী বর দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন। রামের যৌবরাজ্যা-ভিষেকের উদ্যোগ হইতেছে দেখিয়া, অবসর বুঝিয়া, কৈকেয়ী সেই দুইটী বর চাহিয়া বসিলেন। তিনি প্রার্থনা করিলেন,—এক বরে রামের বনগমন, অন্য বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক। দশরথ ধর্ম্ম-পাশে আবদ্ধ ছিলেন; সুতরাং প্রিয়তম রামচন্দ্রকে বনবাসে প্রেরণ করিলেন। বীরবর রামচন্দ্র, দ্বিরুক্তি না করিয়া, পিতার আদেশে, কৈকেয়ীর প্রীতির নিমিত্ত, পিতৃসত্য-পালনার্থ, বনগমনে প্রস্তুত হইলেন। দশরথের কনিষ্ঠা মহিষীর জ্যেষ্ঠপুত্র রামানুগতপ্রাণ লক্ষ্মণ, ভ্রাতৃস্নেহ-প্রযুক্ত রামের সহগামী হইয়া, বনবাস-যাত্রা করিলেন। রামের প্রাণ-প্রিয়া পত্নী সীতাদেবীও, চন্দ্রের অনুগামিনী রোহিণীর ন্যায়, রামের অনুগামিনী হইলেন। সীতা ও লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে, রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া, ধর্ম্মাত্মা রাম প্রথমেই গঙ্গাতীরবর্ত্তী শৃঙ্গবের-পুরে নিষাদাধিপ গুহের সাক্ষাৎ পাইলেন। সেই স্থান হইতে সারথি সুমন্ত্র বিদায় গ্রহণ করিলেন; গুহ প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। তখন দেবগন্ধর্ব্বতুল্য সেই তিন জন, বহু নদ-নদী-বন-উপবন অতিক্রম করিয়া, চিত্রকূট পর্ব্বতে গমন করিলেন। সেখানে ভরদ্বাজ-মুনির আশ্রম ছিল; মুনির উপদেশে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া, তিন জনে বাস করিতে লাগিলেন। সেই সময় পুত্রশোকে কাতর হইয়া রাজা দশরথ প্রাণত্যাগ করিলেন; বসিষ্ঠ প্রভৃতি দ্বিজগণ ভরতকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিতে উদ্যোগী হইলেন; কিন্তু মহাবীর্য্যবান্ ভরত তাহাতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া রামের অনুসরণ করিলেন। অতঃপর, রামের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, ভরত কহিলেন,—'আপনি জ্যেষ্ঠ ধর্ম্মজ্ঞ; সুতরাং আপনিই রাজ্যলাভে অধিকারী।' কিন্তু রামচন্দ্র পিতৃ-প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ-ভয়ে রাজ্যগ্রহণে অনিচ্ছুক হইলেন। ভরত পুনঃপুনঃ তাঁহাকে রাজ্যভারগ্রহণে অনুরোধ করায়, তিনি আপন পাদুকাদ্বয় ন্যাস-স্বরূপ রক্ষা করিয়া ভরতকে রাজ্য-শাসনের নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন।" সকলকাম না হইয়া, রামচরণে প্রণতিপূর্ব্বক নন্দিগ্রামে গিয়া, রামের আগমন প্রতীক্ষায়, অগত্যা ভরত রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইলেন। ভরত প্রস্থান করিলে, আত্মীয়-স্বজনের পুনরাগমনের আশঙ্কায়, চিত্রকূট পর্ব্বত পরিত্যাগ করিয়া, শ্রীরামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যে গমন করিলেন। সেখানে বিরাধ-রাক্ষসকে হনন করিলে, শরভঙ্গ, সুতীক্ষ্ণ, অগস্ত্য ও অগস্ত্য-ভ্রাতার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। অগস্ত্য-ঋষি, রামচন্দ্রকে ঐন্দ্রধনু, অক্ষয়-শরযুক্ত তূণদ্বয় এবং উৎকৃষ্ট খড়্গ প্রদান করিলেন। তখন কিছুকাল সেই বনে মুনিগণের সহিত শ্রীরামচন্দ্র বসবাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে রাক্ষস-ভয়ভীত ঋষিগণ, রামের নিকট আসিয়া, রাক্ষস-নিধনের প্রার্থনা জানাইলেন। রামও রাক্ষসগণকে বিনাশ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।" ইহার পর লক্ষ্মণ, কামরূপিণী শূর্পণখা-রাক্ষসীর নাসাকর্ণ

ছেদন-পূর্ব্বক তাহাকে বিরূপা করিলেন। শূর্পণখার অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য, খর, দূষণ ও ত্রিশিরা নামক রাক্ষসত্রয় সসজ্জ হইয়া যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইলে, রাম তাহাদিগকে যুদ্ধে নিহত করিলেন। সেই যুদ্ধে চতুর্দ্দশ-সহস্র রাক্ষস নিধন-প্রাপ্ত হইয়াছিল। শূর্পণখার জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা লঙ্কাধিপতি রাবণ তাহাতে উত্তেজিত হইয়া, মারীচ নামক রাক্ষসকে আপনার সহায়-স্বরূপ গ্রহণ করিয়া, রামচন্দ্রের অনিষ্ট-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। মারীচ প্রথমে রাবণকে বুঝাইবার প্রয়াস পাইল; কিন্তু রাবণ মারীচের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। অতঃপর, মারীচ মায়া-মৃগরূপ ধারণে রাম-লক্ষ্মণকে কুটীর হইতে অপসারিত করিলে, জটায়ু-নামক গৃধ্রকে আহত করিয়া, রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গেলেন। সীতা-হরণের পর,—রামের বিলাপ, জটায়ুর সৎকার, কবন্ধ বধ, শবরীর নিকট পূজা-প্রাপ্তি, হনুমানের সহিত সাক্ষাৎ, সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা, বালী বধ, সুগ্রীবের রাজ্যাভিষেক এবং সুগ্রীবের সাহায্যে সীতার উদ্দেশার্থ বানরগণকে চতুর্দ্দিকে প্রেরণ। তৎপরে, সম্পাতি-নামক গৃধ্রের বাক্যে লবণ-সমুদ্র লঙ্ঘন-পূর্ব্বক লঙ্কাপুরীতে গমন করিয়া, হনুমান সীতার সাক্ষাৎ পাইল। সীতা অশোকবনে ধ্যান-পরায়ণা ছিলেন। রামের অঙ্গুরীয়-রূপ অভিজ্ঞান-প্রদানে, সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা-পূর্ব্বক, হনুমান তাঁহাকে আশ্বস্ত করিল। ইহার পর, অশোক-বন বিধ্বস্ত ও লঙ্কাপুরী অগ্নি-দগ্ধ করিয়া, হনুমান রামসমীপে সীতার সমাচার ব্যক্ত করিল। তখন সুগ্রীবের সহিত সমুদ্র-তীরে গিয়া, সেতুবন্ধন-পূর্ব্বক, তাঁহারা সাগর অতিক্রম করিলেন। লঙ্কায় উপনীত হইলে, রাবণের সহিত নর-বানরের ঘোর যুদ্ধ চলিল। যুদ্ধে পুত্রমিত্র সহ রাবণ সবংশে নিহত হইলে, সীতার উদ্ধার সাধন হইল। অনন্তর অগ্নি-পরীক্ষায় সীতা নিষ্পাপ প্রতিপন্ন হইলে, দেবগণ, মুনিগণ সকলেই তাঁহাদের যশোগান করিতে লাগিলেন। তখন বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, সুহৃদ্‌গণসহ পুষ্পক-রথে আরোহণ পূর্ব্বক, শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতি অযোধ্যা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে, ভরদ্বাজ-মুনির আশ্রম হইতে, রামের আদেশে, হনুমান ভরতের নিকট নন্দিগ্রামে যাত্রা করিল। পরিশেষে, তাঁহারা সকলেই নন্দিগ্রামে উপনীত হইলেন। সেখানে রামের রাজ্যাভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। রাজ্যলাভ করিয়া অযোধ্যাপতি রামচন্দ্র অপত্য-নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। এইরূপে লোক-রঞ্জন-পূর্ব্বক, একাদশ সহস্র বৎসর রাজ্য-ভোগ করিয়া, শ্রীরামচন্দ্র বৈকুণ্ঠ-লোকে গমন করেন।'

নারদ-বাল্মীকি-সংবাদে রামায়ণের সার-মর্ম্ম সংক্ষেপে বিবৃত হইলেও, প্রকাণ্ড রামায়ণ-গ্রন্থে আরও কত তত্ত্বই আলোচিত হইয়াছে! যে গ্রন্থে অন্যূন ত্রিংশতি সহস্র শ্লোক আছে, তদন্তর্গত সপ্ততি-সংখ্যক শ্লোকে তাহার আর কি পরিচয় সম্ভব-পর? রামায়ণে একটী যুগের ইতিবৃত্ত লিখিত আছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অযোধ্যার বর্ণনা, রাজা দশরথের রাজ্যশাসন-প্রণালী, পুত্রার্থ যজ্ঞ, রাম-লক্ষ্মণাদির বিবাহ, তাঁহাদের বনগমন, রাজ্যপ্রাপ্তি, লব-কুশের জন্ম, কুশী-লবের অভিষেক ও বংশ-পরম্পরা—রামায়ণের মেরুদণ্ড-স্বরূপ। এই সকল বিষয়ের বর্ণনা-প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস নানারূপে উত্থাপিত ও পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। সগর রাজার

অযোধ্যার বিবিধ চিত্র।

বিবরণ, অম্বরীষ রাজার বিবরণ, পরশুরামের বিবরণ, যযাতির বিবরণ, মান্ধাতার বিবরণ,—কত বিবরণই এই রামায়ণ-গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট আছে। কোন্ শ্রেণীর লোকের কিরূপ আচার-ব্যবহার ছিল, যুদ্ধক্ষেত্রে কিরূপ ভাবের কোন্ অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহৃত হইত, কোন্ প্রদেশ কোন্ রাজার শাসনাধীন ছিল, প্রজাপালনের নিমিত্ত রাজা কিরূপ আত্ম-ত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেন, কিরূপে ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের অধঃপতন সাধিত হইত,—রামায়ণে তাহার প্রস্ফুট চিত্র দেখিতে পাই। রামায়ণ-বর্ণিত অযোধ্যা-নগরীর শোভা-সমৃদ্ধির বিষয় আলোচনা করিলে, এই বিংশ-শতাব্দীর উন্নতির দিনেও, বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। অযোধ্যা-নগরী সুবিস্তৃত রাজপথে সুশোভিত ছিল; সেই রাজপথগুলি সর্ব্বদা সলিল-সিক্ত হইত এবং প্রস্ফুটিত পুষ্পে বিকীর্ণ থাকিত। সেই নগরী গভীর জলদুর্গম-পরিখা-পরিবেষ্টিত ছিল বলিয়া, শত্রুপক্ষ সহসা তাহার নিকটেই যাইতে পারিত না। নগরীর স্থানে স্থানে তোরণ-দ্বার বিদ্যমান ছিল; ধ্বজশালী উচ্চ উচ্চ অট্টালিকা, শত শত অস্ত্রাগার, শত শত উদ্যান ও আম্রকানন সেই নগরীর শোভা-বর্দ্ধন করিতেছিল। নগরের চতুর্দ্দিকে সারি সারি শাল-বৃক্ষ বিদ্যমান থাকায়, তৎসমুদায় মেখলার ন্যায় শোভা পাইতেছিল। নগরে সর্ব্বশ্রেণীর শিল্পবিদ্যাবিশারদ ব্যক্তিগণ, সূত এবং মাগধগণ, বাস করিত। স্থানে স্থানে সীমন্তিনীগণের নাট্যশালা ছিল। নানাদিগ্‌দেশাগত বণিকগণ সেই নগরে বাণিজ্য করিতে আসিত; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করদ-রাজগণ প্রায়ই নগরীতে উপস্থিত থাকিতেন। নগরে বহু-সংখ্যক গো, অশ্ব, হস্তী, উষ্ট্র ও গর্দ্দভ প্রভৃতি গৃহ-পালিত পশু, সর্ব্বদা নগরবাসীর আবশ্যক-কার্য্য সম্পাদন করিত। নগরে ধান্য ও তণ্ডুল প্রভৃতির কখনই অভাব ছিল না। নগরী ইক্ষু-রসতুল্য সুস্বাদু জলশালিনী ছিল। সেই সর্ব্বসুখময়ী অযোধ্যা-পুরীতে কোনও ব্যক্তি অল্পসঞ্চয়ী, প্রয়োজনসাধনাসমর্থ অথবা গবাশ্ব-ধন-ধান্য-বিহীন ছিল না। সকলেই ধর্ম্মশীল ও জিতেন্দ্রিয়, সকলেই দীর্ঘায়ু ও অতিথি-সেবা-নিরত, সকলেই সত্য-পরায়ণ ও শ্রীসম্পন্ন ছিল। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চতুর্ব্বর্ণ আপনাপন ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেন। ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের অনুজ্ঞাবহ, বৈশ্যগণ ক্ষত্রিয়ের আজ্ঞাবহ এবং শূদ্রগণ ত্রি-বর্ণ-সেবা-রূপ স্বকর্ম্মে নিরত ছিল। সেই দ্বাদশ যোজনায়তা নগরীর চতুর্দ্দিকে দুই যোজন পর্য্যন্ত, শত্রুগণ অযোধ্যা বলিয়া মনে করিত; অযোধ্যার সীমানায় কাহারও পদার্পণ করিবার সামর্থ্য ছিল না। এই সমৃদ্ধিশালী অযোধ্যা, রাজা দশরথের সুশাসনে, সর্ব্বদা স্বর্গসুখ উপভোগ করিত।* নক্ষত্রনিকর যেরূপ চন্দ্রের শাসনে গৌরবান্বিত হয়, প্রজাগণও দশরথের শাসনে সেইরূপ গৌরবান্বিত ছিল। শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বকালে সে গৌরব যেন অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছিল। রামায়ণের প্রারম্ভে দেবর্ষি নারদ বাল্মীকিকে বলিয়াছেন,—"রামের রাজত্বে প্রজাপুঞ্জ তুষ্ট-পুষ্ট-প্রহৃষ্ট ও সুধার্ম্মিক হইবে। সকলেই আধি-ব্যাধি-দুর্ভিক্ষ-ভয়-বিবর্জ্জিত ও নিরাময় থাকিবে; কোনও ব্যক্তিকেই কখনও পুত্রের মরণ দেখিতে হইবে না; কোনও রমণীকেই কখনও বৈধব্য-যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে না; সকল রমণীই পতিব্রতা হইবে; অগ্নি, বায়ু, ক্ষুধা, তস্কর, কি জ্বর-হেতু

* আদিকাণ্ড, ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়।

কাহারও কোন ভয় থাকিবে না; রাষ্ট্র-নগরসকল ধন-ধান্যে পূর্ণ হইবে; তিনি বহু সহস্র কোটী গো-দান ও সংখ্যাতীত ধেনু-দান করিবেন; ব্রহ্মণাদি বর্ণ-চতুষ্টয়কে স্বধর্ম্মে নিয়োগ করিয়া, শতগুণে প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিবেন;" ইত্যাদি। বস্তুতঃ, মহর্ষি যে ভবিষ্যদ্বাণী কহিয়া গিয়াছিলেন, রাম-রাজত্বে তাহাই সংঘটিত হইয়াছিল। 'রামরাজত্ব' প্রবাদ-বাক্যে আজিও সে গৌরব দেশে দেশে দিকে দিকে বিঘোষিত। তাঁহার রাজত্ব-কালে প্রজাবর্গের সুখ-সৌভাগ্যের পরিসীমা ছিল না। শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় সত্যনিষ্ঠ, স্বধর্ম্মপ্রিয়, ন্যায়-পরায়ণ নৃপতি, পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা,—সংসার এখনও তদ্বিষয়ে সংশয়ান্বিত। শ্রীরামচন্দ্র যে সময়ে রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন, তৎকালের সমারোহ ব্যাপার স্মরণ করিলে, ভারতবর্ষ সেই সময় সভ্যতার কিরূপ উচ্চ-শিখরে সমারূঢ় ছিল এবং পৃথিবীতে তিনি কিরূপ একছত্র প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন,—তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। রাজ্যাভিষেক-উৎসবের সময় নানা দেশ হইতে নিমন্ত্রিত রাজন্যবর্গ অযোধ্যায় আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সকলেরই জন্য যথাযোগ্য বাসস্থান নির্ম্মিত হইয়াছিল; সকলেরই পদোচিত সম্মানের ও সেবার বিশেষ বন্দোবস্ত বিহিত হইয়াছিল। প্রাতঃকালে সৌম্যমূর্ত্তি বন্দিগণ স্তুতিগানে তাঁহাদের নিদ্রাভঙ্গ করিত। সঙ্গীত-স্বরে জাগরিত হইয়া রাজন্যবর্গ নিত্যকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। অভিষেকের দিন বন্দিগণের স্তুতিগানে রামচন্দ্রের নিদ্রাভঙ্গ হইলে, প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে, অগ্নিতে আহুতি দান করিয়া, দেবগণের, পিতৃগণের এবং বিপ্রগণের যথাবিধি পূজা করিয়া, তিনি সভাস্থলে উপনীত হইলেন। বসিষ্ঠ প্রভৃতি পুরোহিতগণ এবং মন্ত্রিবর্গ—সকলেই পূর্ব্ব হইতে সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন; নানাদেশের রাজা ও মহাত্মা ক্ষত্রিয়গণ সভার শোভা-সম্বর্দ্ধন করিতে-ছিলেন। ঋষিগণ, মহাবীর্য্যবান রাজগণ, বানরগণ এবং রাক্ষসগণ, সভায় সমবেত হইয়া, শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন। বিদেশাগত নরপতিগণ সহস্র সহস্র হস্তী ও অশ্ব দ্বারা পৃথিবী কম্পিত করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। সেই সকল রাজন্যবর্গ ভরতের আদেশক্রমে সেনা-যান-সমন্বিত হইয়া, বহু অক্ষৌহিণী সেনার সহিত শ্রীরামচন্দ্রের সাহায্যার্থ রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন; এবং রামের কল্যাণ-কামনায় বিবিধ রত্ন-অশ্ব-যান-মণি-মুক্তা-প্রবালাদি দিব্য আভরণ, রূপবতী দাসী এবং বিবিধ রথ-সমূহ, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নকে উপহার দিয়াছিলেন। অভিষেক-সমাপনান্তে, বিদায়-দান কালে, মিথিলেশ্বর জনককে, কেকয়রাজ-পুত্র মাতুল যুধাজিতকে, বয়স্য কাশীরাজ প্রতর্দ্দনকে এবং অপরাপর রাজগণকে, শ্রীরামচন্দ্র যে ভাবে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারা যেরূপ প্রতিসম্বর্দ্ধনা জানাইয়াছিলেন,—তদ্বিবরণ উত্তর-কাণ্ডে পরিবর্ণিত আছে। তদ্দৃষ্টে দেশপতি সম্রাটের অভিষেক-উৎসবেরই পরিচয় পাওয়া যায়।* প্রজারঞ্জনের জন্য শ্রীরামচন্দ্র আত্মত্যাগের যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, জগতের ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। তিনি গুপ্তচর নিয়োগ করিয়া আপন সুশাসন-সুপালন-সম্বন্ধে প্রজার মনোভাব অবগত হইতেন। প্রসঙ্গক্রমে এক দিন তিনি গুপ্তচরকে জিজ্ঞাসা

* উত্তর-কাণ্ড, সপ্তচত্বারিংশ, অষ্টচত্বারিংশ এবং একোনপঞ্চাশৎ সর্গ।

করেন,—'রাজ্যের লোকে আমার সম্বন্ধে কোনও কথা লইয়া আন্দোলন করে কিনা?" ভদ্র তাহাতে উত্তর দেয়,—"সর্ব্ব বিষয়েই লোকে আপনার গুণগান কীর্ত্তন করিয়া থাকে। কিন্তু একটী বিষয়ে কেহ কেহ আপনার প্রতি সংশয়ান্বিত। রাবণ বল-পূর্ব্বক সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল, অথচ আপনি কি প্রকারে সীতাকে লইয়া সুখসম্ভোগ করিতেছেন;—কেহ কেহ এই কথা লইয়াই 'কাণাঘুষা' করিয়া থাকে। তাহারা বলে,—রাজা যাহা করেন, প্রজারা তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকে; সুতরাং, আমাদিগকেও স্ত্রী-দিগের দোষ সহ্য করিতে হইবে।" বলা বাহুল্য, শ্রীরামচন্দ্র ভদ্রের সেই কথায় সমস্তই বুঝিতে পারেন; এবং তাহারই ফলে, প্রজার সন্তোষ-বিধানার্থ, শ্রীরামচন্দ্র প্রিয়তমা জানকীকে বর্জ্জন করেন। এরূপ মহান্ আত্ম-ত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, কোনও দেশের কোনও ইতিহাসে আছে কি? রাজা দশরথের রাজ্যে যেরূপ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের প্রাধান্য ছিল, রাম-রাজত্বেও সেই প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। শূদ্র শম্বুক তপস্যা করিতে গিয়াছিল বলিয়া, রামচন্দ্র তাহার মস্তকচ্ছেদ করেন, এবং তাহাতে তাঁহার অজস্র প্রশংসাবাদ কীর্ত্তিত হয়।* তখন, ব্রাহ্মণের জন্য স্বতন্ত্র আসন ও যান-বাহন নির্দ্দিষ্ট ছিল; ব্রাহ্মণগণ শূদ্রকে মন্ত্রদান করিলেও পতিত হইতেন। তৎকালে স্মৃতি-শাস্ত্রের অনুশাসন সর্ব্বত্র মান্য হইত।† রামায়ণে রাজগণের বহু-বিবাহের কথা আছে; স্বয়ম্বরাদি বিবাহ-প্রথা প্রচলিত থাকিলেও, ব্রাহ্ম-বিবাহই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তিত হইত। দ্বি-জাতিগণ নিম্ন-বর্ণের কন্যা-বিবাহে অধিকারী হইলেও, সেরূপ বিবাহ কখনই শ্রেষ্ঠ-বিবাহ মধ্যে পরিগণিত হইত না। হরধনু ভঙ্গ করিয়া রামচন্দ্র যদিও সীতাকে লাভ করিবার অধিকারী হইয়াছিলেন; কিন্তু, পরিশেষে দশরথ আসিয়া যথারীতি বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া বর-বধূ গৃহে লইয়া গিয়াছিলেন। বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজের ন্যায় তৎকালে সভ্য-সমাজে অবরোধ-প্রথা প্রচলিত ছিল। অযোধ্যার রাজ-অন্তঃপুরের বর্ণনায়, বনগমনোদ্যতা সীতাকে পদব্রজে রাজপথে অগ্রসর হইতে দেখিয়া নগরবাসীদের উক্তিতে, রাবণের মৃত্যুর পর মন্দোদরীর বিলাপে, রাবণ-বধের পর রাম-সমীপে সীতার উপস্থিতি-কালে,—এই অবরোধ-প্রথার পরিচয় পাওয়া যায়। রামায়ণে দেখিতে পাই, রাজ-পুরোহিতগণের এবং একমাত্র সুমন্ত্র ভিন্ন অন্য কাহারও, রাজান্তঃপুরে প্রবেশাধিকার ছিল না। রাম ও লক্ষ্মণের সহিত সীতাকে পদব্রজে যাইতে দেখিয়া, নগরবাসীরা বলিয়াছিল,—

"যা ন শক্যা পুরা দ্রষ্টুং ভূতৈরাকাশগৈরপি। তামদ্য সীতাং পশ্যন্তি রাজমার্গগতা জনাঃ॥"

হায়, পূর্ব্বে আকাশগামী প্রাণীরাও যে সীতাদেবীকে দেখিতে সমর্থ হইত না, অদ্য রাজ-পথের পথিকেরাও তাঁহাকে দেখিতে পাইল! মৃত্যুশয্যায় শায়িত রাবণকে দেখিয়া, শ্মশানে উপস্থিত হইয়া, মন্দোদরী বিলাপ করিতে করিতে কহিতেছেন,—

"দৃষ্ট্বা ন খল্বসি ক্রুদ্ধো মামিহানবগুণ্ঠিতাম। নির্গতাং নগরদ্বারাৎ পদ্ভ্যামেবাগতাং প্রভো॥
পশ্যেষ্টদার দারাংস্তে ভ্রষ্টলজ্জাবগুণ্ঠনান্। বহির্নিষ্পতিতান্ সর্ব্বান্ কথং দৃষ্ট্বা ন কুপ্যসি॥"

'হে স্বামিন্! এই দেখ, অবগুণ্ঠন পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তোমার মহিষী আজি পদব্রজে নগর-

* উত্তর-কাণ্ড, একোন-নবতি অধ্যায়।

† সুন্দরাকাণ্ড, অষ্টাবিংশ অধ্যায়ের ৫ম শ্লোক; আদিকাণ্ড, ষষ্ঠ সর্গ, ১৯শ শ্লোক; আদিকাণ্ডে ঊনসপ্ততি সর্গের, ৪র্থ ও ৫ম শ্লোক।

দ্বার হইতে বহির্গত হইয়াছে ; ইহা দেখিয়াও কি তোমার ক্রোধের সঞ্চার হইতেছে না? এই দেখ, তোমার পত্নী লজ্জা ও অবগুণ্ঠন পরিত্যাগ করিয়া বহির্দ্দেশে আগমন করিয়াছে। ইহা দেখিয়াও তোমার ক্রোধোদয় হইতেছে না কেন?' লঙ্কা-সমর-বিজয়ের পর, বিভীষণ যখন সীতাকে রাম-সমীপে লইয়া আসিতেছিলেন, তখন বেত্রহস্ত উষ্ণীষ-ধারী কঞ্চুকিগণ বেত্রাঘাতে পুরুষগণকে অপসারিত করিতেছিল। রামচন্দ্র তাহাতে মর্ম্মাহত হইয়া কহিয়াছিলেন,—

"ব্যসনেষু ন কৃচ্ছ্রেষু ন যুদ্ধেষু স্বয়ম্বরে। ন ক্রতৌ ন বিবাহে বা দর্শনং দূষ্যতে স্ত্রিয়ঃ ॥"

ব্যসন, পীড়ন, যুদ্ধ, স্বয়ম্বর, যজ্ঞ এবং বিবাহকালে স্ত্রী-গণের জনসমাজের সম্মুখীন হওয়া দূষণীয় নহে। সুতরাং, এক্ষণে লোক অপসরণ করিবার কোনই প্রয়োজন নাই ; কেন-না,—

"সৈষা বিপদ্গতা চৈব কৃচ্ছ্রে মহতি চ স্থিতা। দর্শনে নাস্তি দোষোঽস্যা মৎসমীপে বিশেষতঃ ॥"

'জানকী এখন বিপন্না; এমন সময়ে, বিশেষতঃ আমার সমক্ষে, তাঁহার দর্শন দোষাবহ নহে।' সভ্য-সমাজে অন্তঃপুর-প্রথা পূর্ণ-মাত্রায় বিদ্যমান ছিল ;—এই সকল দৃষ্টান্তে তাহাই প্রতিপন্ন হয়। অধিক কি, কিষ্কিন্ধ্যাপুরীতে প্রবেশ-কালে লক্ষ্মণ অন্তঃপুরের যে সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা অনার্য্য-সমাজেও অন্তঃপুর-প্রথার পরিচয় পাওয়া যায়। * পুত্রবধূ শ্বশ্রূ-সেবা-পরায়ণা থাকিতেন, সীতাদেবীর নিত্যকর্ম্মে তাহার নিদর্শন আছে। বিধবাগণের পক্ষে ব্রহ্মচর্য্যের ও সহমরণের ব্যবস্থা থাকিলেও, ব্রহ্মচর্য্যই অধিকাংশ স্থলে পরিগৃহীত হইত। লঙ্কায় শ্রীরামচন্দ্রের ছিন্ন মায়া-মুণ্ড-দর্শনে সীতাদেবীর বিলাপে এবং পতিপুত্র-শোকাতুরা কৌশল্যার শোকোক্তিতে—সহমরণ-প্রথা প্রচলিত ছিল, বুঝিতে পারা যায়। মৃতের অগ্নি-সংকার আর্য্য-অনার্য্য উভয় সমাজেই প্রচলিত ছিল ; দশরথ, রাবণ, বালী প্রভৃতির সংকার-পদ্ধতিতে তাহা বিবৃত আছে। রাক্ষসগণের মধ্যে ব্যভিচার ও পরস্ত্রী-হরণ তাদৃশ দোষাবহ বলিয়া পরিগণিত না হইলেও, আর্য্য-সমাজে উহা গুরুতর পাপ বলিয়া গণ্য হইত। অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া পত্নী-লাভ, বিবাহে বাদ্যোদ্যম এবং কন্যাদিগকে যৌতুক দান,—তাৎকালীন সামাজিক-পদ্ধতির মধ্যে পরিগণিত ছিল। এই সকল ভিন্ন, রামায়ণে দার্শনিক-তত্ত্ব বীজ-রূপে অবস্থিত। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে সেই বীজ-তত্ত্ব আবার মহান্ মহীরুহে পরিণত।

বাল্মীকির রামায়ণ আলোচনা করিতে হইলে, তদীয় সপ্তকাণ্ড রামায়ণ আলোচনার সঙ্গে সঙ্গেই যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ আলোচনা করিবার প্রয়োজন হয়। যোগবাশিষ্ঠ

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ।

রামায়ণ প্রকাণ্ড গ্রন্থ। সপ্তকাণ্ড রামায়ণের শ্লোক-সংখ্যা অপেক্ষাও যোগবাশিষ্ঠের শ্লোক-সংখ্যা অধিক। অপিচ, সপ্তকাণ্ড রামায়ণের শ্লোক-সংখ্যা গণনায় মিলাইয়া পাওয়া যায় না ; কিন্তু যোগবাশিষ্ঠের শ্লোক-সংখ্যা প্রায়ই মিলাইয়া যাওয়া যায়। হিসাবে দেখিতে পাই,—সমগ্র রামায়ণে (সপ্তকাণ্ড ও যোগবাশিষ্ঠ উভয় রামায়ণে) ষট্-পঞ্চাশ সহস্র শ্লোক আছে। তাহার মধ্যে চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোক রামায়ণের (উত্তর-কাণ্ড ব্যতীত) এবং দ্বাত্রিংশৎ সহস্র শ্লোক

* আদিকাণ্ড, চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ সর্গ ; অযোধ্যাকাণ্ড, ত্রয়োস্ত্রিংশ অধ্যায়, ৮ম শ্লোক ; লঙ্কাকাণ্ড, ত্রয়োদশাধিক শততম সর্গ, ৬০শ ও ৬২শ শ্লোক ; লঙ্কাকাণ্ডের ষোড়শাধিক শততম সর্গ, ২৮শ হইতে ২৯শ শ্লোক ; কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ, ২৭শ শ্লোক।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের অন্তর্ভুক্ত। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ—সপ্তকাণ্ড রামায়ণেরই অংশ-বিশেষ। যোগবাশিষ্ঠ-পাঠ ভিন্ন রামায়ণ-পাঠ সম্পূর্ণ হয় না,—ইহাই শাস্ত্রের মত। রামায়ণে প্রধানতঃ রামের জন্ম হইতে স্বর্গারোহণ পর্য্যন্ত রামচরিত পরিবর্ণিত। কিন্তু যোগবাশিষ্ঠে রাম-লীলার সঙ্গে সঙ্গে নিগূঢ় দর্শন-তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। বৈরাগ্য-প্রকরণ, মুমুক্ষু-প্রকরণ, উৎপত্তি-প্রকরণ, স্থিতি-প্রকরণ, উপশম-প্রকরণ এবং নির্ব্বাণ-প্রকরণ (পূর্ব্ব ও উত্তর ভাগ) প্রভৃতি অংশে এই রামায়ণ বিভক্ত। মুক্তির স্বরূপ-কীর্ত্তন, মুক্তির উপায় নির্দ্দেশ, মুমুক্ষুর প্রতি উপদেশ এবং অবতার-তত্ত্ব,—যোগবাশিষ্ঠে বিশদভাবে বিবৃত; বেদান্তের গভীর-তত্ত্ব, ললিত মধুর পদবিন্যাসে অনুপম উপমা দ্বারা, যোগবাশিষ্ঠে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যোগবাশিষ্ঠের প্রধান বক্তা—বশিষ্ঠ। শ্রীরামচন্দ্র প্রশ্ন করিতেছেন, আর বশিষ্ঠ সংসার-তত্ত্ব বুঝাইয়া দিতেছেন। এই রামায়ণের অন্তর্গত শ্রীরামের উক্তিও যেরূপ উপদেশ-পূর্ণ; বশিষ্ঠের উক্তিও সেইরূপ তত্ত্ব-জ্ঞান-প্রদ। বৈরাগ্য-প্রকরণে শ্রীরামচন্দ্র, ধনৈশ্বর্য্য, আয়ু, অহঙ্কার প্রভৃতির অসারত্ব বিষয়ে উল্লেখ করিতেছেন। লক্ষ্মী (ধনই) ইহসংসারে সর্ব্বসুখ প্রদান করেন, এই বিশ্বাসে সম্বন্ধে শ্রীরাম বলিতেছেন,—"বাস্তবিকপক্ষে, লক্ষ্মী (ধনই) লোকের মোহ ও অনিষ্টের হেতু। যেমন দীপলেখা অঙ্গ-স্পর্শমাত্রেই অত্যন্ত তাপ সম্পাদন করতঃ, মধ্য হইতে কজ্জলপাতের হেতু হয়; তদ্রূপ লক্ষ্মীও কিয়দংশ স্পর্শ-মাত্রেই অত্যন্ত তাপ সম্পাদন করতঃ, মধ্য-দশাতেই সর্ব্বনাশের হেতু হইয়া থাকে।...লহরী যেমন (ভঙ্গশীলতা-প্রযুক্ত) ক্ষণকালের জন্য কোথাও একরূপে অবস্থান করে না, তদ্রূপ লক্ষ্মীও ক্ষণকালের জন্য কোথাও একরূপে থাকেন না। অসিধারার ন্যায় শীতলা হইলেও ইনি তীক্ষ্ণা।" আয়ু-সম্বন্ধে শ্রীরামচন্দ্র বলিতেছেন,—"আয়ু—পল্লবাগ্রগ্রামে লম্বমান সলিল কণার ন্যায় অস্থির। তরঙ্গ, বিদ্যুৎপুঞ্জ, চন্দ্রের প্রতিবিম্ব এবং আকাশ-কমলকে গ্রহণ করিতে আস্থা স্থাপন করিতে পারি, কিন্তু অস্থির জীবনে আস্থা স্থাপন করিতে পারি না।" এইরূপে ধন, আয়ু, স্ত্রী—সর্ব্ববিষয়ের অসারত্ব উপলব্ধি করিয়া, চিন্তাকুলিতচিত্তে শ্রীরামচন্দ্র বলিতেছেন,—"আয়ু—উচ্চপাদপপের কম্পিত-পত্রবিলম্বিত জলবিন্দুর ন্যায় পতনোন্মুখ; শরীর—হরচূড়ামণি শশিকলার ন্যায় দেখিতেই পাওয়া যায় না; এবং শালিক্ষেত্রবিহারী শব্দায়মান্ ভেককুলের স্ফীত গলনালী চর্ম্মের ন্যায় অস্থির; জীবের সুহৃৎ-স্বজন-সমাগম বাগুরাবেষ্টন-সদৃশ; বাসনারূপ সমীরণে পরিবেষ্টিত, দুরাশারূপিণী-সৌদামিনী-বিজড়িত, মোহরূপী ঘোর কুজ্ঝটিকাময় জলদাবলী নিরন্তর অশনিপাত এবং গর্জ্জন করিতেছে; লোভরূপী প্রচণ্ড উন্মত্ত ময়ূর তাণ্ডব-নৃত্য করিতেছে; অনর্থরূপী কুটজ-কুসুম-পাদপ আস্ফোট (স্পর্দ্ধা এবং কলিকাভেদ) সহকারে সুবিকশিত হইতেছে; ক্রূর কৃতান্ত-মার্জ্জার সর্ব্বভূতরূপী মূষিককুল ভক্ষণে ব্যগ্র; কোথা হইতে নিরন্তর জলস্রোতঃসম প্রাণিসংহার হইতেছে, পতনের (অধঃপতনের ও বৃষ্টির) প্রাচুর্য্য আছে;—এমন অবস্থায় আমার উপায় কি? গতি কি? আশ্রয় কি?" শ্রীরামচন্দ্রের এবম্বিধ প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি বশিষ্ঠ মুমুক্ষু-প্রকরণ বুঝাইতে আরম্ভ করেন। নানারূপ দৃষ্টান্ত-উপমার অবতারণা করিয়া, গভীর দর্শন-তত্ত্ব—কর্ম্ম, প্রাক্তন ও ব্রহ্মত্ব প্রভৃতি বুঝাইয়া, তিনি

কহিলেন,—"যেমন নব-অঙ্কুর বৃষ্টি-সলিলে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, ক্রমে ফল-সম্পদে প্রশস্ত হয়, তদ্রূপ শমদমাদি সদাচার, জ্ঞান-প্রভাবে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়া, আন্তরিক ফল—আত্মসুখ উৎপাদন করতঃ, শ্লাঘ্য হইয়া থাকে।...যেমন পদ্ম হইতে সরোবরের শ্রী-বৃদ্ধি এবং সরোবর হইতে পদ্মের শ্রী-বৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ জ্ঞান হইতে শম-দমাদির বৃদ্ধি; এবং শম-দমাদি হইতে জ্ঞানের বৃদ্ধি হয়। আবার সদাচার হইতে জ্ঞান বৃদ্ধি হয় এবং জ্ঞান হইতে সদাচারের বৃদ্ধি হয়। যে পর্য্যন্ত জ্ঞান ও সদাচার যুগপৎ অভ্যস্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত তদুভয়ের কোনটীই সম্পূর্ণ আয়ত্ত হয় না। যেমন কলম-ধান্য-রক্ষিকা কৃষক-কামিনী উচ্চ করতালি দিয়া গান করায়, কলমধান্য-ভক্ষণার্থ বিহঙ্গম-কুলের নিরাকরণ এবং সঙ্গীত-প্রমোদ উভয়ই প্রাপ্ত হইয়া থাকে; তদ্রূপ মুমুক্ষু পুরুষ কর্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ ও বিষয়-কামনা বর্জ্জন দ্বারা জ্ঞান এবং সদাচার পদ যুগপৎ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।...কার্য্যমাত্রই ভোগ্য এবং ভোগ্য-বিষয়-মাত্রই মরীচিকা সলিলের ন্যায় মিথ্যা। যেরূপ ভ্রমসলিলের আশ্রয় মরীচিকা, সেইরূপ ভোগ্য-বস্তুর আশ্রয় ব্রহ্ম। কিন্তু দৃষ্টি-শক্তির দোষে মরীচিকায় যেমন জলভ্রম হয়, অজ্ঞান-দোষে ব্রহ্মেও সেইরূপ জগদ্‌ভ্রম হয়। আশ্রয় প্রত্যক্ষ হইলে, ভ্রম অপনীত হয়; মরীচিকা প্রত্যক্ষ হইলে, তাহাতে আর জলভ্রম থাকে না; তদ্রূপ ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ হইলে, তাঁহাতে আর জগদ্‌ভ্রম থাকে না।" এইরূপে জগতের উৎপত্তি-প্রকরণ, স্থিতি-প্রকরণ এবং উপশম-প্রকরণ বর্ণনা করিয়া, মহর্ষি বশিষ্ঠ পরিশেষে নির্ব্বাণ-মোক্ষের উপায় বর্ণন করিয়াছেন। তাহাতেও সেই গভীর দর্শন-তত্ত্ব প্রকটিত। জগৎ ও ব্রহ্মের অভিন্নতা প্রতিপাদন-ব্যপদেশে মহর্ষি বশিষ্ঠ বলিতেছেন,—"দ্বিত্ব ভাবনা ছাড়; দেখিতে পাইবে,—শুধু সেই এক। দুইটী বিভিন্ন বস্তু ভাবি বলিয়াই, জল ও জলতরঙ্গ পৃথক নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কিন্তু বাস্তবিক কি উহারা স্বতন্ত্র? মনোনিবেশ-সহকারে দেখ; দেখিতে পাইবে, যেমন জল ও জলতরঙ্গ প্রকৃত একই বস্তু; তদ্বৎ জানিবে,—সংসারে জ্ঞান বলিয়াও কিছু নাই; অজ্ঞান বলিয়াও কোনও বস্তু নাই। শুধু তাহাই আছে,—যাহা জ্ঞান-অজ্ঞান পরিহার করিয়া এক অপূর্ব্ব অবস্থায় অবস্থিত থাকে।...যেমন এই মহাকাশ ঘটের অভ্যন্তরে থাকিয়া, ঘটাকাশ-রূপে পরিণত হইয়াও, বস্তুতঃ সেই মহাকাশ বলিয়া সর্ব্বদাই অবিনশ্বর ভাব; তদ্রূপ এই ব্রহ্মাণ্ডরূপে পরিণত ব্রহ্মও সেই একমাত্র তিনি বলিয়াই নিত্য।...যেমন অয়স্কান্ত মণির সন্নিধি-মাত্রেই জড় লৌহপিণ্ড আপনাপনিই চেতনের ন্যায় স্পন্দিত হয়, সেইরূপ এই অচৈতন্য শরীর-দেহ তাঁহারই সত্ত্বাবলে সচেতন হয়। পরিশেষে মহর্ষি বলিতেছেন,—"জ্ঞানের জ্ঞেয়ভাব প্রাপ্তির নাম—বন্ধন; আর, সেই জ্ঞেয়ভাবের নিবৃত্তির নাম—মুক্তি। সম্যগ্‌জ্ঞানরূপ প্রাপ্ত হইলেই, জ্ঞানের জ্ঞেয়-ভাব প্রাপ্তিরূপ ভ্রান্তি নিবৃত্ত হইয়া যায়। তখনই নিরাকার শান্ত-মূর্ত্তি আসিয়া উপস্থিত হয়।...স্বয়ং-প্রকাশ চৈতন্য সৃষ্টি-সময়ে নিজেই প্রকাশ্য (রূপ) ও প্রকাশ উভয় রূপে প্রকাশ হন। এই যে জগৎ প্রতিভাত হইতেছে, ইহা আর কিছুই নহে; আকাশ-রূপিণী চিৎ আকাশেই প্রকাশ পাইতেছেন। সেই চিতির সৃষ্টিরূপে বিকাশই সৃষ্টি; তাঁহার সৃষ্টিরূপে বিকাশের আদিও নাই, অন্তও নাই,—চিরকালই হইয়া আসিতেছে।"

এখানেও দেখিতেছি,—সেই 'জ্ঞানান্মুক্তিঃ।' যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ জ্ঞানের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া, মুক্তি-তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।

রামায়ণ বা রামচরিত সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। বাল্মীকির রামায়ণ রচনায় যে কল্প-বৃক্ষের সৃষ্টি হয়, তাহার পত্র-পুষ্পফলে এখন জগৎ পরিব্যাপ্ত। বাল্মীকির নামেই একাধিক রামায়ণ প্রচলিত। সপ্তকাণ্ড রামায়ণ ও যোগ-বাশিষ্ঠ রামায়ণের পরিচয় পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। তদ্ভিন্ন, অদ্ভুত-রামায়ণ—বাল্মীকির বিরচিত বলিয়া কথিত হয়। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসও নানারূপে রামচরিত বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অষ্টাদশ মহাপুরাণের প্রায় প্রত্যেক পুরাণেই রামচরিত পরিবর্ণিত আছে। পদ্ম-পুরাণের পাতাল-খণ্ড, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, একখানি স্বতন্ত্র রামায়ণ-বিশেষ। ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণের অন্তর্গত অধ্যাত্ম-রামায়ণ—এখন তো স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপেই প্রচারিত হইতে চলিয়াছে। মহাভারতেও রামচরিত পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন—কাব্যে, নাটকে, ইতিহাসে, যাত্রায়, পাঁচালীতে, কবির গানে,—কতরূপে রামায়ণী-কথা প্রচারিত আছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে। মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশ—রামায়ণেরই অঙ্গবিশেষ। ভর্ত্তৃহরি-বিরচিত ভট্টিকাব্য—রামায়ণেরই অনুস্মৃতি। হিন্দি-ভাষায় তুলসীদাসী রামায়ণের বিশেষ প্রচলন। ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায়ও যে রামায়ণ নানারূপে অনুদিত ও প্রচারিত,—তাহা বলাই বাহুল্য। বাঙ্গালা-ভাষায় কৃত্তিবাসী-রামায়ণ, রঘুনন্দন-কৃত রামরসায়ন এবং রামমোহনের রামায়ণ,—রামায়ণ কত আকারেই প্রচারিত। নানারূপে নানাভাবে রামায়ণী-কথা আলোচিত হওয়ায়, ভিন্ন ভিন্ন রামায়ণের মধ্যে অনেক স্থলে এখন অনেক রূপ পার্থক্য দেখিতে পাই। সে পার্থক্য কেন হইল বা কিরূপে হইল,—সকলগুলির আলোচনা করিলে, কতকটা বুঝা যাইতে পারে। বাল্মীকির রামায়ণে আমরা কতকগুলি বিষয় দেখিতে পাই না; অথচ, অন্য রামায়ণে সেই সকল বিষয় সন্নিবিষ্ট আছে,—লোকমুখেও তত্তদ্বিবরণ বিশেষ-ভাবে প্রচারিত হইতেছে। সকল রামায়ণের বা রামচরিতের সকল পরিচয়-প্রদান—কখনই সম্ভবপর নহে। তথাপি, সংক্ষেপে দুই একখানির বিষয় আলোচনার আবশ্যক অনুভূত হয়।

বিবিধ রামায়ণ-গ্রন্থ।

বাল্মীকির পরই বেদব্যাস-বিরচিত রাম-চরিতের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যাইতে পারে। সে হিসাবে, পদ্ম-পুরাণ পাতাল-খণ্ডের বিষয়ই প্রথমে উল্লেখ করিতেছি। পদ্ম-পুরাণের পাতাল-খণ্ডে যে রামচরিত দেখিতে পাই, তাহার আরম্ভ—রাবণ-বধান্তর শ্রীরামের লঙ্কা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনে। নন্দিগ্রামে গমন, রাজ্যাভিষেক, সীতা-বর্জ্জন, অশ্বমেধ-যজ্ঞ এবং তদুপলক্ষে নানা যুদ্ধ-বৃত্তান্ত তাহাতে বর্ণিত হইয়াছে। মধ্যে লোমশ মুনি-কথিত রামের জীবন-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে। সে বৃত্তান্ত—দৈনন্দিন ঘটনাবলী দিনলিপির (Diary) ন্যায় বিবৃত। লোমশ বলিতেছেন,—'পঞ্চদশ-বর্ষ বয়ঃক্রম-কালে জনক-রাজ-গৃহে হরধনু ভঙ্গ করিয়া রামচন্দ্র সীতাকে প্রাপ্ত হন; তৎপরে দ্বাদশ বৎসর-কাল পরম সুখে বাস করিয়া, সপ্তবিংশ-বর্ষ বয়ঃক্রম

পদ্ম-পুরাণে রামচরিত।

কালে, চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য, পিতৃসত্যপালনার্থ, নির্ব্বাসিত হন ; বনমধ্যে ত্রয়োদশ বর্ষ অতীত হইলে, পঞ্চবটী-বনে লক্ষ্মণ কর্তৃক শূর্পণখার নাসা-কর্ণ-ছেদ হয়। মাঘ মাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে, বিন্দু নামক মুহূর্ত্তে, রাম-লক্ষ্মণের অনুপস্থিতিকালে, দশানন সীতাকে হরণ করে। দশম মাসে, অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা নবমীতে, জটায়ুর জ্যেষ্ঠ সম্পাতি, বানরগণকে সীতার সন্ধান প্রদান করেন। একাদশীর রাত্রিতে হনুমান লঙ্কায় উপনীত হয় ; সেই দিন শেষ রাত্রে সীতার সহিত হনুমানের সাক্ষাৎ,—সপ্তমীতে রামের নিকট সীতার সংবাদ আনয়ন। পর দিবস, উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্র-যুক্ত অষ্টমী তিথিতে, সূর্য্যদেব মধ্যাকাশে উপস্থিত হইলে, বিজয় মুহূর্ত্তে শ্রীরামচন্দ্র যুদ্ধ-যাত্রা করেন। যাত্রার অব্যবহিত পরেই সুগ্রীবের সহিত তাঁহার সখ্য হয়। অষ্টমী হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত অষ্ট-দিবস শিবির-সন্নিবেশে সিন্ধুতীরে অবস্থান ; পৌষমাসের শুক্লপক্ষীয় প্রতিপদ হইতে তৃতীয়া পর্য্যন্ত অবস্থিতির পর, বিভীষণের সহিত রামচন্দ্রের সম্মিলন হয়। কয়েক দিন সমুদ্র-তীরে অবস্থানের পর, দশমীতে সেতু আরদ্ধ এবং ত্রয়োদশীতে পরিসমাপ্তি ; পৌর্ণমাসী হইতে দ্বিতীয়া পর্য্যন্ত তিন দিবসে সৈন্যগণের সাগর অতিক্রমণ। অনন্তর, মাঘমাসের শুক্ল-প্রতিপদে, শ্রীরাম-দূত অঙ্গদ রাবণ সন্নিধানে উপস্থিত হন। উক্ত মাঘ মাসের দ্বিতীয়াদি অষ্টমী পর্য্যন্ত সপ্ত দিবস রাক্ষস ও বানরগণের সঙ্কুল যুদ্ধ হয়। ফাল্গুন মাস ও চৈত্র মাস ঘোর যুদ্ধ চলে। চৈত্র মাসের শুক্ল-দ্বাদশী হইতে কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত অষ্টাদশ দিবসের বিষম সমরে, রামচন্দ্র জয়লাভ করেন। মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়াতে ঐ যুদ্ধের আরম্ভ ; আর, চৈত্র-মাসের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীতে—সপ্তাশীতি দিবসে—উহার পরিসমাপ্তি। মধ্যে পঞ্চদশ দিবস মাত্র যুদ্ধ স্থগিত ছিল ; তদ্ভিন্ন অপর দ্বি-সপ্ততি দিবস যুদ্ধ হইয়াছিল। ঐ কৃষ্ণা-চতুর্দ্দশীতেই রাবণ নিহত হন ; অমাবস্যার দিন তাঁহার সৎকার হয়।” ইহার পর, বিভীষণের রাজ্যাভিষেক হইতে রামের অযোধ্যা-প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত দৈনন্দিন ঘটনাবলীও সংক্ষেপে বর্ণিত আছে। তাহাতে আরও দেখা যায়,—‘মৈথিলী রামবিযুক্তা হইয়া, রাবণ-গৃহে একাদশ মাস ও চতুর্দ্দশ দিবস বাস করিয়াছিলেন।’ এইরূপে শ্রীরামচন্দ্র যখন রাজ্য-ভার গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম দ্বি-চত্বারিংশৎ বৎসর। তৎকালে সীতার বয়ঃক্রম ত্রয়স্ত্রিংশৎ বৎসর। রামচন্দ্র যে সময় রাজ-শাসন করিতেছেন, লোমশ মুনি সেই সময় আরণ্যক ঋষির নিকট এই সকল কথা বর্ণন করিয়াছিলেন। পদ্ম-পুরাণের পাতাল-খণ্ডে রামচন্দ্রের অশ্বমেধ-যজ্ঞ সমাপ্তি পর্য্যন্ত সমস্ত বিবরণ লিখিত আছে। কিন্তু কত বয়সে, কিরূপ ভাবে, তাঁহার দেহান্তর ঘটে,—তাহার কোনই উল্লেখ নাই। লক্ষ্মণ-বর্জ্জন, সীতার অগ্নি-পরীক্ষা, সীতার পাতাল-প্রবেশ, রাবণ-বধের নিমিত্ত রামের অকাল-বোধন প্রভৃতির কোনও উল্লেখও ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার প্রধান বর্ণনীয় বিষয়—অশ্বমেধ-যজ্ঞ। সেই যজ্ঞের ঘোটক কুশী-লব কর্তৃক আবদ্ধ হইলে, বালকদ্বয়ের সহিত শত্রুঘ্ন প্রভৃতির যুদ্ধ ও পরাজয় হয়,—তৎ-বৃত্তান্ত তাহাতে বর্ণিত আছে। সেই পরাজয়-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, শ্রীরামচন্দ্র বাল্মীকির তপোবনে গমন করেন। তৎসূত্রে রাম-সীতার মিলন হয়। রামরাজত্ব কিরূপ সুখ-সমৃদ্ধিশালী ছিল, পদ্ম-পুরাণে তাহার জীবন্ত চিত্র দেখিতে পাই।

তখন শস্য-ক্ষেত্র সর্ব্বদাই প্রচুর শস্যে পূর্ণ থাকিত; গবাদির খাদ্য-দ্রব্য প্রচুর উৎপন্ন হইত; দেশের স্বাস্থ্য সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল; গ্রাম-সকল বহুতর দেবালয়, উত্তম পুষ্পোদ্যান ও সুস্বাদু-ফলযুক্ত বৃক্ষ-শ্রেণীতে সুশোভিত ছিল; কাহারও কোনরূপ অভাব ছিল না; ধর্ম্মানুগত লোক-সকল স্ত্রী-পুত্রাদি পরিজন লইয়া সুখে জীবন-যাপন করিত;—

> "স পদ্মিনীককাসারা যত্র রাজন্তি ভূময়ঃ। সদন্তা নিম্নগা যত্র ন যত্র জনতা কচিৎ॥
> কুলান্যেব কুলীনানি বর্ণানাং ন ধনানি চ। বিভ্রমো যত্র নারীষু ন বিদ্বৎসু চ কর্হিচিৎ॥
> নদ্যঃ কুটিলগামিন্যো ন যত্র বিষয়ে প্রজাঃ। তমোযুক্তাঃ ক্ষপা যত্র বহুলেষু ন মানবাঃ॥
> রজোযুজঃ স্ত্রীয়ো যত্র ন ধর্ম্মবহুলা নরাঃ। ধনৈরনন্ধো যত্রাস্তি জনো নৈব চ ভোজনম্॥"

'বহুতর সরোবর এবং প্রত্যেক সরোবরেই পদ্মিনী শোভা পাইত। তৎকালে নদীই উদ্ধত-বেগে চলিত; কিন্তু কোনও লোক উদ্ধত-ভাবে চলিত না। লোক-সকল কুলীন (সদ্বংশজাত) ছিল; কাহারও অর্থ কুলীন (চৌরভয়ে ভূগর্ভে নিহিত) ছিল না। রমণীগণেই বিভ্রম (বিলাস) ছিল; পণ্ডিতবর্গে কখনই বিভ্রম (ভ্রান্তি) দেখা যাইত না। নদী-সকল বক্রগামী ছিল; প্রজাবর্গের মধ্যে কেহই বক্রগামী ছিল না। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রিই তমো-যুক্ত (অন্ধকারময়) হইত; কিন্তু মনুষ্যগণ তমোযুক্ত ছিল না। রমণীরাই কেবল রজো-যুক্তা (রজস্বলা) হইত; কিন্তু ধার্ম্মিক মানব কেহই তখন রজোযুক্ত (রাজসিক ভাবাপন্ন) ছিল না। মনুষ্যই কেবল ধন-সত্ত্বেও অনন্ধ (অমত্ত) ছিল; কিন্তু ভোজন-অনন্ধ (অন্ন-শূন্য) ছিল না।' এবংবিধ সুখ-সম্পৎ-পূর্ণ রাজ্য শ্রীরামচন্দ্র ধর্ম্মানুসারে একাদশ সহস্র-বৎসর পালন করিয়াছিলেন।

বেদব্যাস-বিরচিত অন্যান্য পুরাণের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণান্তর্গত অধ্যাত্ম-রামায়ণে বিশেষ-ভাবে রামচরিত বর্ণিত হইয়াছে। বাল্মীকির রামায়ণের আদিকাণ্ডে পঞ্চদশ সর্গে লিখিত আছে,—'পৃথিবীর ভার লাঘব করিবার জন্য, পদ্মপলাশলোচন ভগবান, চারি অংশে বিভক্ত হইয়া, দশরথের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন।' উক্ত রামায়ণে এই মাত্র উল্লিখিত হইলেও, বাল্মীকি শ্রীরামচন্দ্রকে আদর্শ মনুষ্যরূপেই চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু অধ্যাত্ম-রামায়ণ শ্রীরামচন্দ্রকে প্রধানতঃ পূর্ণ-ব্রহ্মরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থের স্থূল ঘটনাবলী বাল্মীকির সহিত অভিন্ন বটে; কিন্তু পার্থক্য,—প্রধানতঃ পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে। এই অধ্যাত্ম-রামায়ণে শ্রীরামের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে মহেশ্বর ও ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণ, পিতৃগণ এবং যক্ষ-গন্ধর্ব্বগণ শ্রীরাম-চন্দ্রের স্তব করিতেছেন,—দেখিতে পাই। অধিক কি, 'তুমি ঈশ্বর, তুমি চন্দ্র-সূর্য্যাগ্নির অন্তর্গত তেজ, তুমি নিখিল-শরীরিগণের চৈতন্য এবং প্রাণিগণের শৌর্য্য-ধৈর্য্য-আয়ু' ইত্যাদি বিশেষণেও শ্রীরামচন্দ্রকে বিশেষিত করা হইয়াছে। শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ংও আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া পরিচয় দিতে ত্রুটি করেন নাই। তিনি তাঁহার জননীকে পর্য্যন্ত বুঝাইতেছেন,—'যাবৎ আমাকে সর্ব্বভূতে এবং আপনাতে অবস্থিত বলিয়া জানিতে না পারিবে, তাবৎ দেবরূপী আমাকে নিজ-কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পূজা করিবে। ভক্তিযোগে আমাকে সর্ব্বান্ত-র্য্যামিরূপে বা পুত্ররূপে নিত্য স্মরণ করিলে শান্তি লাভ করিবে।' এই স্থলে আরও দেখিতে পাই,—জননী কৌশল্যা শ্রীরামচন্দ্রকে ঈশ্বর-জ্ঞানে ভক্তি-সহকারে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম

পুরাণান্তরে রামচরিত।

করিতেছেন। * বলা বাহুল্য, বাল্মীকিতে এ ভাব কোথাও পরিস্ফুট নাই। অধ্যাত্ম-রামায়ণের মতেও, শ্রীরামচন্দ্র 'দশসহস্র দশ শত' বৎসর মর্ত্ত্যভূমে বিরাজমান ছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের পর, পৃথিবী শস্যশালিনী হয়, বৃক্ষ-সকল ফলবান হয়, পুষ্প-সকল সুগন্ধপূর্ণ হয়; এবং রাজা হইয়া তিনি ত্রিংশৎ কোটী সুবর্ণ-মুদ্রা, অশ্ব, ধেনু, ভূষণ, রত্ন, বসন প্রভৃতি দান করেন। অধ্যাত্ম-রামায়ণে রাম-চরিতের যে বর্ণনা দেখা যায়, দেবীভাগবতের বর্ণনা তাহা হইতে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র। দেবীভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে, অষ্টাবিংশ, একোনত্রিংশ ও ত্রিংশ—মাত্র তিনটী অধ্যায়ে রামচরিত বর্ণিত আছে। রামের জন্ম হইতে রাবণের সহিত যুদ্ধারম্ভ পর্য্যন্ত ঘটনাবলী শতাধিক শ্লোকে বর্ণনা করিয়া, পুরাণকার তাহাতে রাবণ-বধ-ব্যাপার বিবৃত করিয়াছেন। রাবণ-বধ-চিন্তায় রাম যখন মুহ্যমান, সেই সময় দেবর্ষি নারদ তাঁহার নিকট আগমন করিয়া, তাঁহাকে রাবণ-বধের উপায় বলিয়া দিতেছেন। এই-খানেই প্রথম দেখিতে পাই, মহর্ষি বলিতেছেন,—"আপনি সংপ্রতি এই আশ্বিন মাসে, পরম শ্রদ্ধান্বিত হইয়া, সর্ব্বসিদ্ধিকর নবরাত্র ব্রত করুন। ঐ ব্রতে নবরাত্রি উপবাসী থাকিয়া, যথাবিধানে জপহোমাদি-সমন্বিত ভগবতীর অর্চ্চনা করিতে হইবে। দেবীর প্রীত্যর্থে প্রশস্ত পবিত্র পশুবলি-সমূহ প্রদান-পূর্ব্বক জপের দশাংশ হোম করিলে, আপনি রাবণ-বিনাশে সক্ষম হইবেন।" নারদের এবংবিধ উপদেশে রামচন্দ্র ব্রতানুষ্ঠানে উদ্যুক্ত হন। আশ্বিন মাস সমাগত হইলে, সর্ব্বকল্যাণকারিণী জগদম্বিকার প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া, রামচন্দ্র ব্রত আরম্ভ করেন। মহাষ্টমীর নিশীথকালে, সিংহবাহনে অবস্থান করতঃ, দেবী ভগবতী শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন দিয়া বলেন,—'তুমি লঙ্কায় বসন্ত-কালে পরম শ্রদ্ধা-সহকারে আমার আরাধনা করিও; তাহাতে পাপমতী দশাননকে সংহার করিতে পারিবে।' দেবী-ভগবতের মতেও, শ্রীরামচন্দ্র একাদশ সহস্র বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহা হইতেও আভাস পাওয়া যায়, বাসন্তী-পূজার পর রাবণ-বধ সমাহিত হইয়াছিল। শ্রীমদ্ভাগবতের নবম-স্কন্ধের দশম ও একাদশ অধ্যায়ের মাত্র একাশীতি-সংখ্যক শ্লোকে রামচরিত বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতেও দেখিতে পাই,—রামচন্দ্র সিংহাসনাধিরোহণ করিলে, ত্রেতাযুগও সত্যযুগের ন্যায় সর্ব্বসুখাবহ হইয়াছিল; রামরাজত্বে আধি-ব্যাধি-জরা-শোক-অনশন-ভয়-গ্লানি দূরে গিয়াছিল; নদ-নদী-সমুদ্র-গিরি সকলেই অভিলষিত ফল প্রদান করিতেছিল। বিষ্ণু-পুরাণের চতুর্থাংশের চতুর্থ অধ্যায়ে কয়েকটী ছত্রে, অতি সংক্ষেপে, রামচরিত বর্ণিত আছে। কূর্ম্ম-পুরাণের পূর্ব্বভাগে একবিংশ অধ্যায়ে সংক্ষিপ্ত রামচরিত-প্রসঙ্গে দৃষ্ট হয়,—লঙ্কার সেতুমধ্যে শ্রীরামচন্দ্র ঈশান-লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কল্কি-পুরাণের তৃতীয়াংশে, তৃতীয় অধ্যায়ে, সংক্ষেপে রামচরিত বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায়,—সুশাসনে পৃথিবী আনন্দপূর্ণা হইয়াছিলেন, এবং রামচন্দ্র দশ সহস্র বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। বৃহদ্ধর্ম্ম-পুরাণের পূর্ব্ব-খণ্ডে, অষ্টাদশ হইতে দ্বাবিংশ অধ্যায়ে, রামায়ণী-কথা আছে। বাল্মীকির রামায়ণের অনুসরণে বেদব্যাস যে রামচরিত বর্ণন করেন, এমন কি সেই আদর্শেই যে তাঁহার মহাভারত পর্য্যন্ত প্রণীত হয়,—এই গ্রন্থে

* অধ্যাত্ম-রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড, সপ্তম অধ্যায়।

তাহা স্পষ্টতঃ উল্লিখিত হইয়াছে। * শ্রীরামচন্দ্র-কর্তৃক ভগবতীর পূজার বিষয় এই পুরাণে যেরূপ বিশদভাবে বর্ণিত আছে, অন্য পুরাণে তাহা কচিৎ দৃষ্ট হয়। কিরূপ ভাবে বোধন আরম্ভ হইবে; কিরূপ ভাবে সপ্তমী-অষ্টমী-নবমী পূজা সমাহিত হইবে; কিরূপ ভাবে দশমীকৃত্য সম্পন্ন করিতে হইবে,—ইহাতে তাহার আভাস পাওয়া যায়। আশ্বিন মাসে আর্দ্রা-নক্ষত্র-যুক্ত কৃষ্ণ-নবমী তিথিতে বোধনারম্ভ হইতে রাবণ-বধ পর্য্যন্ত ভগবতীর পূজা চলিয়াছিল। নবমীতে রাবণ নিহত হয়; বিজয়া দশমীতে রামচন্দ্র জয়-যুক্ত হন। এই বৃহর্দ্ধর্ম্ম-পুরাণের মতে—শ্রাবণ মাসের শুক্ল-দশমী-তিথিতে রামচন্দ্র সেনাসমভিব্যাহারে যুদ্ধ-যাত্রা করেন। অহোরাত্র যোড়শ প্রহর চলিয়া, দ্বাদশীর অপরাহ্নে, তাঁহারা সমুদ্র দেখিতে পান। ত্রয়োদশীতে বিভীষণের সহিত তাঁহাদের সম্মিলন হয়; শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণা-চতুর্দ্দশীর পুষ্যা নক্ষত্রে শ্রীরামচন্দ্র সমুদ্রের দক্ষিণ পারে গিয়া উপনীত হন। বলা বাহুল্য, পদ্ম-পুরাণ পাতাল-খণ্ডের বর্ণনার সহিত এই বর্ণনার তিথি-নক্ষত্র-মাস প্রভৃতি সম্বন্ধে অসামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়। † উভয় পুরাণেই দৈনন্দিন দিনলিপির হিসাবে যুদ্ধযাত্রা বর্ণিত হইয়াছে বটে; কিন্তু সময়ের অসামঞ্জস্য কেন ঘটিল,—তাহাই তর্কের বিষয়। এইরূপ অপরাপর পুরাণেও ঘটনার কিছু তারতম্য দৃষ্ট হয়। প্রধানতঃ সকল পুরাণেই রামচন্দ্রের আখ্যান আছে; এবং তাঁহার রাজত্ব যে আদর্শ-রাজত্ব ছিল,—পুরাণ-সমূহের বর্ণনা হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়। দেবী-পুরাণে দুর্গোৎসবের বিবরণ আছে। কিন্তু তাহাতে শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসবের উল্লেখ দেখিতে পাই না।

বাল্মীকি ও কৃত্তিবাস।

রামায়ণ-বর্ণিত একই রাম-চরিত্র ক্রমশঃ কতদূর পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, অস্মদ্দেশ-প্রচলিত কৃত্তিবাস-বিরচিত রামায়ণ-প্রসঙ্গ আলোচনা করিলে, তাহা বিশদ-রূপে বুঝা যাইতে পারে। দৃষ্টান্ত-স্থলে, কয়েকটী প্রধান প্রধান ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। প্রথম,—রাবণ-বধে শ্রীরামচন্দ্রের অকাল-বোধন; দ্বিতীয়,—লব-কুশের সহিত শ্রীরামচন্দ্রের যুদ্ধ; তৃতীয়,—রাম-লক্ষ্মণকে যজ্ঞ-রক্ষার্থ বিশ্বামিত্রের সহিত প্রেরণ উপলক্ষে দশরথের ছলনা; চতুর্থ,—তরণীসেন, মহীরাবণ, অহিরাবণ প্রভৃতির বধ-প্রসঙ্গ। যে যে গ্রন্থে যে যে ভাবে রাম-চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে, মোটামুটি আমরা তাহার আভাস দিয়াছি। এক্ষণে কৃত্তিবাসী রামায়ণের সহিত বাল্মীকির রামায়ণের কি কি পার্থক্য আছে, সংক্ষেপে তাহাও আলোচনা করিতেছি। সে আলোচনায় পাঠকগণ নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন, ক্রমশঃ কি ভাবে মূল-তত্ত্ব পল্লবিত হইয়া পড়িয়াছে। বাল্মীকির ও কৃত্তিবাসের দুইখানি রামায়ণ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত মিলাইয়া দেখিলে, প্রধানতঃ দেখা যায়, বাল্মীকির রামায়ণের এক দুই বা ততোধিক অধ্যায়ের মর্ম্ম লইয়া, এক একটী 'শিরোনামায়', কৃত্তিবাস তাহা পদ্যে নিবদ্ধ করিয়াছেন। মোটা-মুটি, অনেক বিষয়ে, কৃত্তিবাসের রামায়ণকে বাল্মীকির রামায়ণের

---

* বৃহদ্ধর্ম্ম-পুরাণ, পূর্ব্ব-খণ্ড, পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ের ২১শ হইতে ৩০শ শ্লোক।

† পদ্ম-পুরাণ, পাতালখণ্ড, একত্রিংশ অধ্যায় এবং বৃহদ্ধর্ম্ম-পুরাণ পূর্ব্বখণ্ড একবিংশ অধ্যায় মিলাইয়া পাঠ করিলে, এই অসামঞ্জস্য বুঝিতে পারা যাইবে।

সংক্ষিপ্তসার বলিলেও বলা যাইতে পারে। কৃত্তিবাস স্থানে স্থানে বাল্মীকির রামায়ণকে সঙ্কোচ করিয়াছেন বটে ; কিন্তু অনেক স্থানে আবার তদতিরিক্ত শাখা-প্রশাখার অবতারণায় স্বীয় কল্পনা-লীলায় গ্রন্থ-কলেবর পল্লবিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার বর্ণিত অনেক কাহিনী বাল্মীকির রামায়ণে আদৌ নাই। কতকগুলি বিষয়-সম্পর্কে তিনি পুরাণান্তরের আশ্রয় লইয়াছেন বলিয়া জানা যায় ; কিন্তু অন্য কতকগুলির অস্তিত্বের প্রমাণ কোনও প্রধান পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায় না। জানি না,—সে সমুদায় তাঁহার স্বকপোল-কল্পিত কি না ? প্রথমতঃ, রাম ও সীতার চরিত্র-চিত্রণেই বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসে অনৈক্য। শ্রীরামচন্দ্রের দেবত্ব এবং তাঁহার উপাসনা প্রভৃতির যে ভাব কৃত্তিবাসে পরিস্ফুট, বাল্মীকিতে তাহা নাই। বাল্মীকি, রামচন্দ্রকে আদর্শ মনুষ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তাঁহার ক্রিয়া-কলাপ প্রচার করিয়াছেন। আর, কৃত্তিবাস তাঁহাতে ভগবদ্ভাবের বিকাশ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কৃত্তিবাসের রাক্ষসেরা যুদ্ধক্ষেত্রেই দেবতা-জ্ঞানে শ্রীরামের স্তব আরম্ভ করিয়া দিয়াছে ; এবং স্বয়ং কৃত্তিবাসও অবসর পাইলেই রাম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। কৃত্তিবাসের রামায়ণের বহু স্থানে কৃত্তিবাসের নিজের উক্তিতেই দেখিতে পাই,—

"শমন-দমন রাবণ রাজা রাবণ-দমন রাম। শমন-ভবন না হয় গমন যে লয় রামের নাম ॥"

কিন্তু বাল্মীকিতে এ ভাবের কোনই বিকাশ নাই। বাল্মীকির সীতা এবং কৃত্তিবাসের সীতা—এ দুই চিত্রেও অনেক স্থলে বিলক্ষণ বৈপরীত্য দৃষ্ট হয়। সীতাহরণের সময় বাল্মীকির সীতা রোষান্বিতা ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জন করিতেছেন ; আর, কৃত্তিবাসের "জানকী কাঁপেন যেন কলার বাগুড়ি।" কৃত্তিবাসের সীতা—লজ্জাবতী লতা বঙ্গ-কুলাঙ্গনা ; আর বাল্মীকির সীতা—বলদর্পিতা বীর-রমণী। বাল্মীকির সীতা রাবণকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিতেছেন,—"রে নীচকর্ম্মা রাবণ ! রাম-লক্ষ্মণ-বিহীনা আমাকে তস্করের ন্যায় অপহরণ করিয়া তুই লজ্জিত হইতেছিস্ না ! মৃত্যুকালে মনুষ্য যেমন বিপরীত কার্য্যে রত হয়, তুইও সেইরূপ বিপরীত কার্য্যে রত হইয়াছিস্। আমার মহাত্মা স্বামীর অহিতাচরণ করিয়া, কোথায় সুখলাভ করিবি ? তুই নিশ্চয় জানিস্—তোর কখনই নিস্তার নাই।"

"মুমুর্ষুনান্তু সর্ব্বেষাং যৎ পথ্যং তন্নরোচতে। পশ্যামীহহিকণ্ঠে ত্বাং কালপাশাবপাশিতং ॥"

মুমূর্ষু ব্যক্তি-মাত্রেরই হিতকর পথ্য রুচিকর হয় না, তোরও সেই অবস্থা হইয়াছে। তোর কণ্ঠদেশ কালপাশে আবদ্ধ হইল— জানিবি।" রাবণের সমক্ষে এবংবিধ গর্ব্বোক্তিকে কি কখনও 'কদলীপত্রের ন্যায় কম্পন বলা যায় ?" দ্বিতীয়তঃ,—প্রতি-কাণ্ডেই কিছু-না-কিছু পার্থক্য ! আদিকাণ্ডে দেখিতে পাই ;—গ্রন্থারম্ভেই, দুই গ্রন্থে দুই স্বতন্ত্র পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে। বাল্মীকির রামায়ণে গ্রন্থারম্ভে আছে,—বাল্মীকি নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এই ভূমণ্ডলে গুণবান্ বীর্য্যবান্ দীপ্তিমান্ ইত্যাদি গুণসম্পন্ন এমন কে আছেন, তাঁহার চরিত্র বর্ণনা করুন ; এবং মহর্ষি নারদ তদুত্তরে শ্রীরাম-চরিত কহিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু কৃত্তিবাসের রামায়ণের প্রথমেই গোলকের বর্ণনা এবং নারায়ণের চারি অংশে প্রকাশ-বিবরণ। ব্রহ্মার নিকট উপদেশ পাইয়া 'মরা মরা' বলিতে বলিতে 'রাম' নাম বলিয়া বাল্মীকি পাপে পরিত্রাণ পান,—এ কথা কৃত্তিবাসে আছে ; কিন্তু বাল্মীকির রামায়ণে

তাহা নাই। চন্দ্রবংশ ও সূর্য্যবংশের বর্ণনার * আড়ম্বর—অধিক কি 'রাজা হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান' পর্য্যন্ত—বাল্মীকির রামায়ণে নাই; কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণে আছে। কাণ্ডার মুনির বৈকুণ্ঠে গমন, সৌদাস রাজার গঙ্গাস্পর্শে মুক্তি,—এ সকল কাহিনীও বাল্মীকির রামায়ণে নাই। আর একটী প্রসিদ্ধ ঘটনা—বাঙ্গালার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মুখে মুখে যাহা প্রচারিত আছে—রাজা দশরথ তাড়কা-সংহার-কালে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে ছলনা করিয়া রাম-লক্ষ্মণের পরিবর্ত্তে প্রথমে ভরত-শত্রুঘ্নকে পাঠাইয়াছিলেন, এবং পরীক্ষায় বিশ্বামিত্র তাহা বুঝিতে পারিয়া ক্রোধান্বিত হইয়াছিলেন;—ইহাও বাল্মীকির রামায়ণে নাই। কৃত্তিবাসী রামায়ণে ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন ব্যাপারে মেড়াতলা, নবদ্বীপ, আকনা, মাহেশ প্রভৃতি যে সকল গ্রামের নাম উল্লেখ আছে,—তাহাও কৃত্তিবাসের সংযোজনা মাত্র। এই সকল তো নূতন সংযোজনা দেখা গেল! এদিকে আবার—বাল্মীকির রামায়ণের বর্ণিত কার্ত্তিকের জন্ম-বিবরণ, শবলা লইয়া বশিষ্ঠের সহিত বিশ্বামিত্রের বিরোধ, বিশ্বামিত্রের তপস্যা, বিশ্বামিত্রের তেজে ত্রিশঙ্কুর স্বর্গারোহণ, অম্বরীষের যজ্ঞ, বিশ্বামিত্রের কৃপায় শুনঃশেফের উদ্ধার প্রভৃতি বিষয় বাল্মীকির রামায়ণে বর্ণিত আছে; কিন্তু কৃত্তিবাসে নাই। তৃতীয়তঃ,—অযোধ্যা, অরণ্য এবং কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের মধ্যে তাদৃশ অসামঞ্জস্য না থাকিলেও, সুন্দরাকাণ্ডে কয়েকটী গুরুতর অসামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়। হনুমানের নিকট রাক্ষসী-রূপধারিণী লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পরাজয়ের কাহিনী বাল্মীকির রামায়ণে বর্ণিত আছে; কিন্তু কৃত্তিবাসে তাহা নাই। এদিকে আবার, হনুমানের প্রার্থনায় উগ্রচণ্ডা-দেবীর লঙ্কাত্যাগের কাহিনী এবং জয়ন্ত-কাক সীতাকে আক্রমণ করায় শ্রীরাম কর্ত্তৃক তাহার চক্ষু-বিদ্ধকরণ-বিবরণ—কৃত্তিবাসে আছে, কিন্তু বাল্মীকিতে নাই। বানরগণের সাগরপার-মন্ত্রণা এবং হনুমানের সাগর-পারোদ্যোগ প্রভৃতি অংশ—বাল্মীকির রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে আছে, কিন্তু তাহা কৃত্তিবাসের সুন্দরাকাণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে। অনেক স্থানের কথাবার্ত্তায়, কৃত্তিবাসের ও বাল্মীকির রামায়ণে পার্থক্য দৃষ্ট হয়। 'অশোকবনে সীতাদেবীর নিকট গমন' সময়ে কৃত্তিবাসে আছে—"গালাগালি পাড়ে সীতা রাবণ তা শুনে।' কিন্তু বাল্মীকির রামায়ণে আছে, ঐ সময় সীতার উক্তি শোক-তাপব্যঞ্জক; রাবণের প্রতি বিশেষ কোনও কর্কশ কথা তখন তিনি উচ্চারণ করেন নাই। রামের সহিত বিভীষণের যোগদান—বাল্মীকির রামায়ণে লঙ্কা-কাণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণে উহা সুন্দর-কাণ্ডের অন্তর্নিবিষ্ট। "বিভীষণকে রাবণের পদাঘাত" কাহিনী বাঙ্গালার নরনারী সকলেই কৃত্তিবাসের কৃপায় অবগত আছেন; কিন্তু বাল্মীকির রামায়ণে 'পদাঘাতের' কথা কোথাও নাই; তাহাতে রাবণের ভৎর্সনার অভিমানে বিভীষণ চলিয়া যান—এই মাত্র উল্লেখ আছে। চতুর্থতঃ,—লঙ্কা-কাণ্ডে কৃত্তিবাসের কল্পনা অনেক স্থলে বাল্মীকিকেও পরাভূত করিয়াছে। এক 'তরণীসেন-বধের' দৃষ্টান্তই চরম বলিয়া মনে হয়। "তরণীর কাটামুণ্ড বলে রাম রাম"—পঞ্চম-বর্ষীয় শিশুর মুখেও এ বৃত্তান্ত শুনিতে পাইবেন; কিন্তু 'তরণীসেন-বধ' কোথা হইতে আসিল—

* সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশ বর্ণনায় বাল্মীকির ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ মিলাইয়া দেখিলে, বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হইবে।

কেহ বলিতে পারেন কি? কেবল বাল্মীকির রামায়ণ কেন, প্রচলিত কোনও পুরাণে তরণীসেনের অস্তিত্ব সন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। এইরূপ, মহীরাবণ, অহিরাবণ, বীরবাহু প্রভৃতির যুদ্ধ-কাহিনীও বাল্মীকির রামায়ণে নাই।* হনুমানের বিশল্যকরণী আনিতে যাওয়ার সময়, কালনেমীর বাধা দেওয়া, সূর্য্যকে হনুমানের বগলে লওয়া, ভরতের বাঁটুলে হনুমানের পতন,—এ সকল কথাও বাল্মীকিতে নাই। শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসব, অকাল-বোধন প্রভৃতি লোক-প্রসিদ্ধ কাহিনী এবং রাবণ-বধে ভগবতীর পূজায় নীলপদ্ম আনয়ন ও একটী নীলপদ্ম কম পড়ায় শ্রীরামের চক্ষুরুৎপাটন করিতে যাওয়া,—এবংবিধ প্রসঙ্গও বাল্মীকির রামায়ণে দেখা যায় না। রাবণ-বধের পূর্ব্বে, বাল্মীকির রামায়ণে আছে—অগস্ত্য কেবল রামচন্দ্রকে আদিত্য-হৃদয়-নামক স্তব পাঠ করিতে বলেন, এবং রামচন্দ্র তদনুযায়ী সূর্য্যের স্তব ও পূজা করেন। হনুমান কর্তৃক মন্দোদরীর নিকট হইতে গণকবেশে কৌশলে রাবণের মৃত্যুবাণ আনয়ন, হনুমান কর্তৃক রাবণের চণ্ডীপাঠ অশুদ্ধি-করণ, এবং মৃত্যুকালে রাবণ কর্তৃক রামকে রাজনীতি শিক্ষাদান (স্বর্গের সিঁড়ি নির্ম্মাণ প্রভৃতি) ইত্যাদি—বাল্মীকি-রামায়ণের অন্তর্ভুক্ত নহে। লঙ্কাকাণ্ডের আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক কথা, কৃত্তিবাসের রামায়ণে পরিবর্ত্তিত। ব্রহ্মার তপস্যা করিয়া কুম্ভকর্ণ ছয় মাস নিদ্রা ও এক দিন জাগরণের বর পাইয়াছিলেন বলিয়া কৃত্তিবাসে প্রকাশ; কিন্তু বাল্মীকির রামায়ণে আছে,—কুম্ভকর্ণের জন্মের পরই তাঁহার দৌরাত্ম্যে ত্রিলোক অস্থির, ইন্দ্র পরাস্ত এবং ব্রহ্মা ত্রস্ত হন; আর সেই হেতু ব্রহ্মা তাঁহাকে উক্তরূপ নিদ্রা ও জাগরণের অভিশাপ প্রদান করেন। পঞ্চমতঃ—উত্তর-কাণ্ড। লক্ষ্মণের চতুর্দ্দশ বর্ষের ফলানয়ন-কাহিনী, গরুড়-পবনের যুদ্ধ-কথা, স্বর্গ জিনিতে রাবণের গমন-কালে কুম্ভকর্ণের গমন, চৌষট্টি যোগিনী-সহ ঘোর যুদ্ধ,—এ সকল বৃত্তান্তও বাল্মীকির রামায়ণে নাই। অধিক বলিব কি, এমন যে লব-কুশের যুদ্ধ-বৃত্তান্ত—তাহাও বাল্মীকির রামায়ণে বর্ণিত নাই। পদ্ম-পুরাণের পাতাল-খণ্ডে ঐ বিষয়ের উল্লেখ আছে বটে; কিন্তু রামের সহিত লব-কুশের সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে যে কোনও যুদ্ধ হইয়াছিল, সে উল্লেখ সেখানেও নাই। এবংবিধ ঘটনা-পরম্পরা দেখিয়া মনে হয়, বাল্মীকির রামায়ণের অনুসরণে রচিত হইলেও, কৃত্তিবাসের রামায়ণের উপকরণ অপরাপর পুরাণ-উপপুরাণ এবং জনশ্রুতি হইতেও সংগৃহীত হইয়াছিল। রামায়ণ রচনায় কৃত্তিবাস যে সকল পুরাণের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়, তন্মধ্যে—অধ্যাত্ম-রামায়ণ, অদ্ভুত রামায়ণ, দেবী-পুরাণ, দেবী-ভাগবত, কালিকাপুরাণ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। কৃত্তিবাসে প্রকাশ,—হরধনুর্ভঙ্গের পর পথিমধ্যে যখন পরশুরামের সহিত শ্রীরাম প্রভৃতির সাক্ষাৎ হয়, তখন পরশুরাম দশরথকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"মম সম করিয়া রাখিয়াছ পুত্র নাম।...জীর্ণ ধনু ভাঙ্গিয়া যে দেখাইলা গুণ॥"

* 'বাল্মীকির রামায়ণের সহিত কৃত্তিবাসের এবংবিধ পার্থক্যের কথা অনেকেই অপরিজ্ঞাত। এমন কি, 'মেঘনাদবধ'-কাব্য-রচনা-কালে মাইকেল মধুসূদনও এ সকল কথা জ্ঞাত ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। কারণ, তাহা হইলে "বীরচূড়ামণি বীরবাহুর" শোকে তিনি রাবণকে বিলাপ করিতে দেখিতেন না। প্রমীলার চিতারোহণ—মাইকেলের কল্পনা। প্রমীলার চিতারোহণ-কাহিনী—বাল্মীকির রামায়ণে নাই।

এই ভাষা-ভাবের সহিত অধ্যাত্ম-রামায়ণের ভাষা-ভাবের মিল দেখা যায়; যথা,—

"ত্বং রাম ইতি নাম্না যে চরসি ক্ষত্রিয়াধম। পুরাণং জর্জ্জরং চাপং ভঙ্‌ক্‌ত্বা ত্বং কত্থসে মুধা॥"

কিন্তু বাল্মীকির রামায়ণে এ স্থলের কথাবার্ত্তা অন্যরূপ দেখা যায়। বাল্মীকির পরশুরাম, শ্রীরামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া স্পর্দ্ধা করিয়াছিলেন; দশরথকে সম্বোধন করেন নাই। অধ্যাত্ম-রামায়ণেই শ্রীরামচন্দ্রের পূর্ণ-ব্রহ্মত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে কৃত্তিবাস, অধ্যাত্ম-রামায়ণেরই অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। অধ্যাত্ম-রামায়ণের রাবণ, শ্রীরামের পরম ভক্ত। এইরূপ, অদ্ভুত-রামায়ণেরও অনেক তত্ত্ব কৃত্তিবাসের সহিত মিশিয়া আছে। দুর্গোৎসব-তত্ত্ব—কালিকা-পুরাণের অন্তর্গত। যাহা হউক, যে গ্রন্থ হইতেই কৃত্তিবাস যে ভাব সংগ্রহ করুন না কেন, কৃত্তিবাসের প্রতিষ্ঠা,—তাঁহার কবিত্ব ও কল্পনায়;—ইহাকে অস্বীকার করিতে পারেন? হইতে পারে,—কালিকা-পুরাণ, দেবী-পুরাণ এবং দেবী-ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থোক্ত দুর্গোৎসবের বিবরণ, কৃত্তিবাস স্বীয় রামায়ণ-মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন; কিন্তু দেবী-কর্ত্তৃক নীল-পদ্ম-হরণ-ব্যপদেশে আপনার নয়ন-পদ্ম বিচ্ছিন্ন করিতে যাওয়ার দৃষ্টান্ত—বুঝি বা আর কোথাও নাই। যদি তাহাই হয়, এখানে কৃত্তিবাসের কল্পনা-কুসুম পূর্ণ-প্রস্ফুটিত নহে কি? বীর বলিয়া বাঙ্গালীর স্পর্দ্ধা করিবার পরিচয় না থাকিতে পারে, বাঙ্গালীর শৌর্য্য-বীর্য্যের কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় খুঁজিয়া পাইতে না পার; কিন্তু ভক্তির নির্ঝর বাঙ্গালা-দেশে যাহা ফুটিয়াছিল, তাহারই পূত-প্রবাহে পরিস্নাত হইয়া সমগ্র সংসার আজি পবিত্র হইতে চলিয়াছে,—এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। ভগবতীর পূজায় এই যে শ্রীরামচন্দ্রের নয়ন-পদ্ম উৎপাটনের চিত্র কবি অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, ভক্তির এমন মর্ম্মস্পর্শী চিত্র—আত্ম-সমর্পণের এমন মহান্ ছবি—আর কোথাও কেহ দেখিয়াছ কি? অন্যত্র আবার দেখুন—তরণীর চিত্র। রাক্ষস হউক, বিপক্ষ-সৈন্য হউক, কিন্তু তরণীর ভক্তিতে পাষাণ বিগলিত হয়; রণ-ক্ষেত্রে তরণীর চিত্রে—কিবা কঠোরে কোমলে, কিবা রৌদ্রে শান্তে—শক্তি ও ভক্তি সংমিশ্রণে—কবি কি অভিনব তুলিকায় চিত্ত-চমৎকারী রঙ-সমাবেশ করিয়াছেন! ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে ইহা মূল্যবান না হইলেও, ভাব-রাজ্যে ইহার সমাদর নিশ্চয়ই আছে। *

রামায়ণে শিক্ষা।

রামায়ণে শিক্ষার বিষয় অসংখ্য। হিন্দুমাত্রেই তদ্বিষয় অবগত আছেন। রামায়ণে যে উন্নতিশীল আদর্শ রাজ্যের পরিচয় পাই, আধুনিক সভ্য-জগতেও তাহা উপকথার ন্যায় আশ্চর্য্যজনক। রাজা দশরথের রাজ্যে মন্ত্রি-সভা ছিল। ধৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সুরাষ্ট্র, রাষ্ট্রবর্দ্ধন, অকোপ, ধর্ম্মপাল ও সুমন্ত্র নামক আট জন অমাত্য বিভিন্ন বিভাগের রাজ-কার্য্য পরিদর্শন করিতেন। বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, গৌতম, মার্কণ্ডেয় ও কাত্যায়ন প্রভৃতি ঋষিগণ মন্ত্রিপদে নিযুক্ত ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে আবার দুই জনকে রাজা মনোনীত করিতেন। ফলতঃ, বর্ত্তমান কালোচিত নির্ব্বাচন ও মনোনয়ন-ক্রমে তৎকালে মন্ত্রিসভা গঠিত হইত, †—আভাসে

* এই অংশ, মল্লিখিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের ভূমিকা হইতে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে গৃহীত হইল।

† বাল্মীকির রামায়ণ, আদিকাণ্ড, সপ্তম সর্গ।

তাহা বুঝিতে পারা যায়। তখন এমনই ন্যায়-বিচারের ব্যবস্থা ছিল যে, অপরাধী হইলে, পুত্রদিগের প্রতিও অপরাধ অনুসারে গুরু-লঘু দণ্ডের আদেশ প্রদান করিতে রাজা কুণ্ঠিত হইতেন না;—"প্রাপ্তকালং যথা দণ্ডং ধারয়েয়ুঃ সুতেষপি"। 'চার' দ্বারা স্বদেশের ও বিদেশের বিবরণ সংগ্রহ করা হইত। প্রজাগণের অবস্থা-বিষয়ে সম্বন্ধে বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, ঐক্যমতাবলম্বনে, সুপবিত্র চরিত্র মন্ত্রিগণ রাজ্যশাসন করিতেন। রাজনীতি ও সমাজনীতি বিষয়ে রাজ্য যেরূপ উন্নত ছিল; আত্ম-কর্ত্তব্যপালনের ব্যক্তিগত দৃষ্টান্তেও, রাজ্যের গৌরব তদনুরূপ বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়াছিল। শ্রীরামচন্দ্রের বনগমনে পিতৃভক্তি এবং সত্য-পালনের যে দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই, কোনও দেশের কোনও ইতিহাসে সে উচ্চ আদর্শ কেহ দেখিয়াছেন কি? ভ্রাতৃস্নেহেরও তাহা এক অনুপম আদর্শ! কৈকেয়ীর সেই অপ্রিয় বাণী—নির্ব্বাসন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, কিছুমাত্র ব্যথিত না হইয়া, শ্রীরামচন্দ্র বলিতেছেন,—

"হিতেন গুরুণা পিত্রা কৃতজ্ঞেন নৃপেন চ। নিযুজ্যমানো বিশ্রব্ধঃ কিং ন কুর্য্যামহং প্রিয়ম্॥"

'আমার পিতা গুরু রাজা দশরথ আমায় আদেশ করিলে, এমন কোনও কার্য্য নাই, যাহা আমি প্রীতমনে না করিতে পারি।' তিনি আমায় বলিতে সঙ্কুচিত হইতেছেন বলিয়াই বরং দুঃখ হইতেছে। বিশেষতঃ, ভরত আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা; আমি তাহার জন্য সানন্দে রাজ্য-ধন সমস্তই, এমন কি—প্রাণ পর্য্যন্ত, পরিত্যাগ করিতে পারি। তার পর, লক্ষ্মণ যে ভাবে রামের অনুগমন করিয়াছিলেন; এবং ভরত যে ভাবে চিত্রকূটে গিয়া শ্রীরামচন্দ্রকে ফিরাইতে চেষ্টান্বিত হইয়াছিলেন; অপিচ, বিফল মনোরথ হইয়া, শ্রীরামের পাদুকা ন্যাসস্বরূপ রক্ষা করিয়া, যে ভাবে তিনি রাজ্যশাসন করিতেছিলেন;—সৌভ্রাত্রের ও ভ্রাতৃ-ভক্তির সেরূপ দৃষ্টান্তই বা কোথায় আছে? সীতার পতিভক্তি, হনুমন্তের কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা, বিভীষণের ন্যায়ানুগত্য,—কত দৃষ্টান্তই, কত শিক্ষার সামগ্রীই, রামায়ণে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। জানকীর অগ্নি-পরীক্ষা, শ্রীরামচন্দ্রের লক্ষ্মণ-বর্জ্জন,—সত্যপালন ও কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার চরম চিত্র। যুদ্ধ-ক্ষেত্রে শত্রু-সৈন্যের আত্ম-সমর্পণে তাহাদের প্রতি সদ্ব্যবহারের দৃষ্টান্ত—রামায়ণে ভূয়সী বিদ্যমান। ধর্ম্মের জয় এবং অধর্ম্মের পরাজয়—রামায়ণে কি বিশদ-ভাবেই পরিবর্ণিত আছে! ফলতঃ, যে চক্ষে যে দিক দিয়াই দেখি না কেন, রামায়ণের রাম-রাজত্বের তুলনা পাই না।

অযোধ্যা ও লঙ্কা।

এক দিকে অযোধ্যার চারু-চিত্র; অন্য দিকে লঙ্কার ভীষণ মূর্ত্তি! অযোধ্যা—পুণ্যভূমি; লঙ্কায়—পাপের প্রাধান্য, ব্যভিচারের প্রবল স্রোত! অযোধ্যা—আর্য্য-সভ্যতার সৌরকিরণ-মালায় উদ্ভাসিত; লঙ্কা—অনার্য্য-তমসাশ্রিত। অযোধ্যা—মেঘমুক্ত চান্দ্রমসী রজনী; লঙ্কা—কোলাহলময় অন্ধকারাচ্ছন্ন অমানিশা। অযোধ্যা—সঙ্গীত-লয়-তান-যুক্ত আনন্দ-মুখরিত দেবতার লীলা-নিকেতন; লঙ্কা—ঘূর্ণিত-লোচন বিভ্রান্ত-দৃষ্টি বিলাসিনীগণের নাট্যশালা,—মদোন্মত্ত উদ্ভ্রান্ত রাক্ষস-রাজের ক্রীড়া-ক্ষেত্র। অযোধ্যায়—সাত্ত্বিক-রাজসিক-ভাবের মধুর মিশ্রণ; লঙ্কায়—রাজসিক ও তামসিক-ভাবের প্রবল প্রবাহ। অযোধ্যার সহিত লঙ্কার আরও পার্থক্য,—অযোধ্যার ফল-শস্য-ধন-ধান্যের এবং যাগ-যজ্ঞাদির প্রাচুর্য্য; লঙ্কায় মৃগ-মহিষ

বরাহ প্রভৃতির মাংস এবং অক্ষক্রীড়া মদ্যপানাদির প্রাবল্য। অযোধ্যার নরনারী শ্রীসম্পন্ন; লঙ্কার ব্যক্তি-মাত্রেই বিকলাঙ্গ বিকটাকার। তবে, বাহ্য-ঐশ্বর্য্যে লঙ্কা যে অযোধ্যার অপেক্ষা হীনপ্রভ, তাহা বলিতে পারি না। অযোধ্যার ন্যায় রাজধানী লঙ্কারও 'চতুর্দ্দিকে মীন-সেবিত ভীষণ নক্র-সমাকুল বহুল শীতল-জল-পরিপূর্ণ অগাধ পরিখা বিদ্যমান।' সেই পরিখা পার হইবার জন্য নগরীর চারি ধারে চারিটী প্রশস্ত সেতুপথ। সেই সেতুপথ-সমূহ আবার প্রাকারোপরিস্থিত যন্ত্রাদি দ্বারা সুরক্ষিত। শতঘ্নী এবং বহু প্রকার যন্ত্র সেই লঙ্কা-পুরীকে রক্ষা করিতেছিল। পূর্ব্ব-দ্বারে দশ সহস্র, দক্ষিণ-দ্বারে এক লক্ষ, পশ্চিম-দ্বারে দশ লক্ষ আর উত্তর দ্বারে এক কোটী সৈন্য অবস্থিত থাকিয়া লঙ্কাপুরী রক্ষা করিত। যুদ্ধাস্ত্রের ব্যবহার-সম্বন্ধে উভয়ত্রই সমবিধ অস্ত্রাদি প্রচলিত থাকিলেও, অযোধ্যায় তাহার কিছু উৎকর্ষ দৃষ্ট হয়। পরিঘ, পট্টিশ, শূল, পাশ, শক্তি, কুঠার, ধনু, খড়্গ প্রভৃতি যুদ্ধাস্ত্রই তৎকালে প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইত। শতঘ্নী, ব্রহ্মাস্ত্র প্রভৃতির পরিচয়ে আগ্নেয়াস্ত্রাদি ব্যবহারের বিষয়ও জানিতে পারা যায়। সেই সকল অস্ত্রের বর্ণনা দেখিয়া, বিশেষতঃ লঙ্কাপুরীর চতুর্দ্দিক শতঘ্নী-যন্ত্র দ্বারা সুরক্ষিত থাকার পরিচয়ে, আধুনিক-কালোচিত বৈদ্যুতিক আগ্নেয়াস্ত্রাদির প্রচলন ছিল বলিয়া মনে হয়। লঙ্কাকাণ্ডের ত্রয়োদশ সর্গে দেখিতে পাই, রাবণ ক্রোধান্বিত হইয়া বলিতেছেন,—"উল্কা-সমূহ দ্বারা কুঞ্জর যেরূপ ভস্মীভূত হয়, আমার কার্ম্মুক-নির্ম্মুক্ত বজ্রতুল্য শরজালে রামকেও আমি সেইরূপ ভস্মীভূত করিব।" মূলে, "উল্কাভিরিব আদীপয়িষ্যামি".- এইরূপ উক্তি আছে। যে অস্ত্রে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিবে,—আগ্নেয়াস্ত্র ভিন্ন তাহা আর কি হইতে পারে? লঙ্কার ঐশ্বর্য্য-সম্বন্ধে আরও দেখিতে পাওয়া যায়,—উহার সিংহদ্বার, কণকময়; বেদিকা-সকল, স্ফটিক-মণিমুক্তা-বৈদুর্য্যমণি প্রভৃতি রত্ন-সমূহে নির্ম্মিত; কুট্টিমসকল, মণিময়। রাবণের অন্তঃপুর আবার ততোধিক ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন ছিল, এবং তজ্জন্যই বোধ হয় তাঁহার রাজধানী স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী বলিয়া অভিহিত হইত। কিষ্কিন্ধ্যায় এইরূপ আর এক নব-ভাবের বিকাশ দেখিতে পাই। লঙ্কা ও কিষ্কিন্ধ্যা—দুই-ই অনার্য্যভাবাপন্ন। অথচ, কিষ্কিন্ধ্যায় কিয়ৎ-পরিমাণে ধর্ম্মভাব পরিস্ফুট। তিন দিকে তিন চিত্র,—কি সুন্দর-ভাবেই রামায়ণে প্রতি-ফলিত রহিয়াছে!

রামায়ণের প্রাচীনত্ব।

রামায়ণ বা রামায়ণ-বর্ণিত রাম-রাজত্ব কতকাল পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত ছিল, বাল্মীকিই-বা কোন্ সময়ে বিদ্যমান ছিলেন, আর শ্রীরামচন্দ্রই বা কোন্ সময়ে আবির্ভূত হইয়া-ছিলেন?—সীমাবদ্ধ মনুষ্য-কল্পনায় এখন তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। রামায়ণে দেখিতে পাই,—মহর্ষি বাল্মীকিই সংসারে কবিতাচ্ছন্দের প্রবর্ত্তক। ব্যাধ-নিহত ক্রৌঞ্চকে বিলুণ্ঠিত হইতে দেখিয়া, ক্রৌঞ্চী যখন করুণ-স্বরে বিলাপ করিতেছিল, সেই সময়ে বাল্মীকির মুখ হইতে যে প্রথম বাণী বহির্গত হয়, তাহাই কবিতাচ্ছন্দের আদি। রামায়ণে স্পষ্টতঃই লিখিত আছে,—'মহর্ষি বাল্মীকি উৎকট শোকের সময় সমাক্ষর চতুষ্পাদ-যুক্ত যে বিপুল শোক-বাক্য গান করিয়া-ছেন, তাহাই শ্লোক হইয়াছে।' ব্যাকরণ-শাস্ত্রের অনুমোদিত, প্রতিপাদে সমান অক্ষর

ও মাধুর্য্য-গুণ-যুক্ত, কবিতার ইহাই প্রবর্ত্তনা।* তাহা হইলেই বুঝিতে পারা যায় না কি,—রামায়ণ কতকাল পূর্ব্বে বিরচিত হইয়াছে? সেই কল্পনাতীত কাল—শাস্ত্রে ত্রেতাযুগ বলিয়া অভিহিত। ত্রেতাযুগে রাম-রাজত্ব—ত্রেতাযুগে রামায়ণ-রচনা। শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি শাস্ত্রের সহিত তুলনায় আলোচনা করিলেও দেখিতে পাই,—রামায়ণের প্রতিষ্ঠা—কত পূর্ব্বের! প্রায় প্রত্যেক পুরাণেই, দেখাইয়াছি, রাম-চরিত পরিবর্ণিত আছে;—বাল্মীকির রামায়ণ-রচনার বিষয়ও উল্লিখিত হইয়াছে। মহাভারতে রামায়ণের ঘটনাবলী এবং বাল্মীকির রামায়ণ-রচনার প্রসঙ্গ দেখিতে পাই। অথচ, রামায়ণে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস অথবা তাঁহার পুরাণ-সমূহের নামোল্লেখ নাই; মহাভারতের বর্ণিত কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ-বৃত্তান্তও রামায়ণে দৃষ্ট হয় না। সুতরাং, স্থূল-দৃষ্টিতেই বুঝিতে পারি,—রামায়ণ বেদব্যাসের বা তদীয় গ্রন্থাবলীর বহু পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। বেদ-বিভাগ করিয়াছিলেন বলিয়া, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন 'বেদব্যাস'-নামে পরিচিত। তাঁহার মহাভারত এবং পুরাণাদিতে তাই চতুর্ব্বেদের পরিচয় পাই। কিন্তু সমগ্র রামায়ণ-গ্রন্থ আলোড়ন করিলেও, বেদ-বিভাগের বা চতুর্ব্বেদের কোনই প্রসঙ্গ দেখিতে পাই না। রাম-রাজত্বের সময়ে 'ত্রয়ী' অর্থাৎ ত্রিবেদ প্রচলিত ছিল,—ইহার অবশ্য প্রমাণ পাওয়া যায়;—

"নানৃগ্বেদবিনীতস্য নাযজুর্ব্বেদধারিণঃ। নাসামবেদবিদুষঃ শক্যমেবং বিভাষিতম্॥"

'ঋগ্বেদজ্ঞ, যজুর্ব্বেদজ্ঞ বা সামবেদজ্ঞ পুরুষ ভিন্ন অন্য কেহ ঈদৃশ-বাক্য প্রয়োগ করিতে পারে না।' তৎকালে ব্যাকরণাদি ষড়বেদাঙ্গ প্রচলিত ছিল, শ্রুতি-স্মৃতির অনুশাসন মান্য হইত,—এ সকল কথা পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। অথচ, চতুর্ব্বেদের প্রসঙ্গ-মাত্র উত্থাপিত হয় নাই। এ দিকে মহাভারতে, একাধিক স্থলে, চতুর্ব্বেদের উল্লেখ আছে; ইতিহাস, বেদাঙ্গ, কাব্য, নাটক, আখ্যায়িকা পর্য্যন্তেরও প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে; ন্যায়, দর্শন, উপনিষৎ—কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের বিরচিত মহাভারতে কিছুরই অসদ্ভাব দেখিতে পাই না;—

"চতুর্ব্বেদা কলাস্তথা।" ... "ঋগ্বেদঃ সামবেদশ্চ যজুর্ব্বেদশ্চ পাণ্ডব। অথর্ব্ববেদশ্চ তথা সর্ব্বশাস্ত্রাণি চৈব হি॥ ইতিহাসোপবেদাশ্চ বেদাঙ্গানি চ সর্ব্বশঃ।" ... "নাটকা বিবিধা কাব্যাঃ কথাখ্যায়িক-কারিকাঃ।" ... "সাঙ্গোপনিষদান্ বেদান্ চতুরাখ্যান পঞ্চমান্।" ... "বেদোপনিষদাং বেত্তা ঋষিঃ সুরগণার্চ্চিতঃ। ইতিহাসপুরাণজ্ঞঃ পুরাকল্পবিশেষবিৎ॥ ন্যায়বিৎ ধর্ম্ম-তত্ত্বজ্ঞ ষড়ঙ্গবিদমুত্তমঃ।"

অন্যপক্ষে, সাংখ্য-দর্শন, ন্যায়-দর্শন প্রভৃতিরও ভূয়সী আলোচনা—মহাভারতেও পুরাণাদিতে দেখিতে পাই; কিন্তু রামায়ণে তাহার অসদ্ভাব। সে হিসাবে, কেহ কেহ এমনও বলেন,—সাংখ্যাদি দর্শন রচিত হইবার পূর্ব্বে রামায়ণ বিরচিত হইয়াছিল। শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিতগণ পাশ্চাত্য-দৃষ্টিতে দর্শন করিয়াও, পাশ্চাত্যের পরিমাণ-দণ্ডের সাহায্য লইয়াও, রামায়ণকে মহাভারত-পুরাণাদির পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ বলিয়া প্রতিপন্ন করেন। তাঁহারা বলেন,—'শাস্ত্র চতুর্ব্বিধ; কর্ম্ম-শাস্ত্র, যোগ-শাস্ত্র, জ্ঞান-শাস্ত্র ও ভক্তি-শাস্ত্র। বৈদিক-কালে প্রথমে কর্ম্ম-শাস্ত্র, তৎপরে যোগ-শাস্ত্র, তৎপরে জ্ঞান-শাস্ত্রের প্রচলন হয়। ভক্তি-শাস্ত্র—তাহারও পরবর্ত্তি-কালের। যজ্ঞ-পূজাদি—কর্ম্ম-শাস্ত্রের লক্ষণ; চিত্ত-বৃত্তি আয়ত্তাধীন করা—মনের উপর প্রভুত্ব-স্থাপন—যোগ-শাস্ত্রের পরিচায়ক; জ্ঞান-লাভেই যে মুক্তিলাভ—

* আদিপর্ব্ব, দ্বিতীয় অধ্যায়, ৪০ শ্লোক।
* মহাভারত, সভাপর্ব্ব, একাদশ ও পঞ্চম অধ্যায়।

কর্ম্ম বা যোগ কেহই যে মুক্তিদানে সমর্থ নহে,—জ্ঞান-শাস্ত্রের তাহাই উপদেশ। ভক্তি ভিন্ন মুক্তি নাই;—ভক্তির কাছে সকলই তুচ্ছ;—ভক্তি-শাস্ত্রের তাহাই প্রতিপাদ্য। এই চতুর্ব্বিধ শাস্ত্র পর্য্যায়-ক্রমে পর-পর রচিত হইয়াছে,—পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে তাহাই প্রতিপন্ন হয়। যদি তাহাই হয়, তাহাতেও দেখিতে পাই,—পুরাণাদির পূর্ব্বে রামায়ণ বিরচিত; অর্থাৎ, রামায়ণ—আদি কাব্য-গ্রন্থ। রামায়ণে কর্ম্ম ও যোগের প্রাধান্য আছে; কিন্তু জ্ঞান বা ভক্তির প্রাধান্য কীর্ত্তিত হয় নাই। সুতরাং বুঝিতে পারা যায়,—ভক্তি-শাস্ত্র-রচনার পূর্ব্ববর্ত্তি-কালে বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। এ ক্ষেত্রে, আপত্তি-স্থলে, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের প্রসঙ্গ উঠিতে পারে। যেহেতু, যোগবাশিষ্ঠ—জ্ঞান-শাস্ত্র-বিশেষ। তাহাতে জ্ঞান-কাণ্ডের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত,—তাহাতে সাংখ্য-বেদান্তাদি দর্শনের জটিল-তত্ত্ব-সমূহ উদ্ঘাটিত। এ সম্বন্ধে অবশ্য নানা মতান্তর আছে। কেহ কেহ বলেন,—রাম-রাজত্ব দীর্ঘ-কাল স্থায়ী হইয়াছিল; বাল্মীকির রামায়ণের প্রথম ছয় কাণ্ডে প্রধানতঃ তাঁহার রাজ্য-লাভের পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাবলী বিবৃত আছে। হয় তো, তখন জ্ঞান-শাস্ত্র তাদৃশ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই; তাঁহার রাজত্বের শেষ-ভাগে জ্ঞান-শাস্ত্র আপন আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। জ্ঞান-শাস্ত্রের পরে যে ভক্তি-শাস্ত্র, ইহাতে তাহাও প্রতিপন্ন হয়; যেহেতু, বাল্মীকির সপ্তকাণ্ড রামায়ণে কর্ম্মের ও যোগের প্রাধান্য পরিকীর্ত্তিত আছে; কিন্তু জ্ঞানের প্রাধান্য কীর্ত্তিত হয় নাই। পরন্তু, রামের রাজ্য-শাসনের শেষ-সময়ে যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে সেই জ্ঞান-তত্ত্ব প্রস্ফুট হইতেছে। তবে, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে যে বেদব্যাসের নামোল্লেখ আছে, পণ্ডিতগণের মতে, তাহা পরবর্ত্তি-কালের সংযোজনা; অথবা পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের স্মৃতির আবৃত্তি মাত্র। তার পর, রামায়ণের ও মহাভারতের ঋষি-মণ্ডলী! রামায়ণের সমসাময়িক ঋষিগণের গুণগাথা প্রায়ই মহাভারতে স্থান পাইয়াছে; কিন্তু মহাভারতের সমসাময়িক ঋষিগণের নাম রামায়ণে নাই। শ্রীরামের রাজত্ব-কালে রামায়ণ রচনা হয়,—ইহা স্পষ্টতঃ লিখিত আছে; অথচ, মহাভারত পাণ্ডবগণের মহা-প্রস্থানের পরে, জন্মেজয়ের যজ্ঞারম্ভের পূর্ব্বে, বিরচিত হইয়াছিল,—বুঝিতে পারা যায়; কেন-না, জন্মেজয়ের যজ্ঞারম্ভের পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাবলী মহাভারতে অতীত ঘটনা-রূপে পরিবর্ণিত হইয়াছে। যুধিষ্ঠিরাদি রাজগণ যে শ্রীরামচন্দ্রের জন্মগ্রহণের বহু পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বংশ-তালিকার আলোচনা করিলেও, তাহা প্রতিপন্ন হয়।* রামায়ণের আদর্শে বেদব্যাস-পুরাণ রচনা করিয়াছিলেন,—তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। অতএব, মহাভারত ও পুরাণাদির পূর্ব্বে রামায়ণ রচিত হইয়াছিল,—এ বিষয়ে কোনই সংশয় থাকিতেছে না। সুতরাং, মহাভারতের সময় নির্দ্দেশ করিতে পারিলেই, রামায়ণের প্রাচীনত্ব কতকাংশে উপলব্ধি হইতে পারিবে।† শাস্ত্রানুসারে, ত্রেতাযুগে, ত্রয়োদশ লক্ষ এক সহস্র দশ বৎসর (দ্বাপর যুগের বার লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার বৎসর + কলিযুগের গত পাঁচ সহস্র দশ বৎসর) পূর্ব্বে, রাম-রাজত্বে রামায়ণ বিরচিত হইয়াছিল।

---

* পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদান্তরে বংশ-তালিকায় চন্দ্র ও সূর্য্য-বংশের বংশক্রম দ্রষ্টব্য।

† এই গ্রন্থের বিংশ পরিচ্ছেদের শেষ ভাগে সেই আলোচনা দ্রষ্টব্য।

তথাপি, রামায়ণ পূর্ব্বে, কি মহাভারত পূর্ব্বে,—এই এক সংশয়-প্রশ্নে অনেকের মন আন্দোলিত। রামায়ণ ও মহাভারতের বিষয় পূর্ব্বোক্তরূপে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচিত হওয়ার পরও, ঐরূপ সংশয় কি কারণে উপস্থিত হয়, অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাউক। রামায়ণের সময়ে, বিশুদ্ধ নীতি, বিশুদ্ধ চরিত্র, বিশুদ্ধ সমাজ, বিশুদ্ধ কর্ম্ম-পদ্ধতি বিদ্যমান ছিল; কিন্তু মহাভারতের সময় সে বিশুদ্ধতা দৃষ্ট হয় না। মহাভারতের যাঁহারা প্রধান নায়ক, তাঁহাদেরই পূর্ব্ব-বিবরণ নানা কলুষ-কল্পনায় কলুষিত। কিন্তু রামায়ণে সেরূপ চিত্র বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মহাভারতের সময়ে বিবাহের ও পুত্রোৎপাদনের যে সকল পদ্ধতি বর্ণিত আছে, 'আদিম' অর্দ্ধ-সভ্য সমাজের পদ্ধতি বলিয়া তাহা মনে হয়। দিন দিন সংসার যেরূপ ভাবস্রোতে ভাসমান, মনুষ্য যেরূপ নীতি-পরম্পরার অনুবর্ত্তী হইতে চলিয়াছে, তাহাতে মহাভারতের পরে রামায়ণ রচিত হওয়াই সম্ভবপর। ইহাই পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের মত। অপিচ, রামায়ণের উত্তর-কাণ্ডে নির্ব্বাণ-প্রসঙ্গ এবং মহাভারতের সম-সাময়িক দুর্ব্বাসা প্রভৃতি ঋষিগণের নামোল্লেখ আছে। তাহাতেও রামায়ণকে মহাভারতের পরিবর্ত্তী বলিয়া বিশ্বাস হইতে পারে। এ বিষয়ে পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের মত যাহাই হউক না কেন, শাস্ত্রানুশাসন-পরায়ণ পণ্ডিত-গণের মত কিন্তু স্বতন্ত্র। শাস্ত্র-মতে,—পৃথিবীতে দিন দিনই পাপের অঙ্গ বৃদ্ধি পাইতেছে। সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি যুগ-চতুষ্টয়ে পর্য্যায়ক্রমে সংসার উন্নতি হইতে অবনতির পথে প্রধাবিত হয়। সত্যযুগে যে বিশুদ্ধ-ধর্ম্ম ও বিশুদ্ধ-সমাজ-পদ্ধতি ছিল, দিন-দিনই তাহার বিকৃতি ঘটিতেছে। সুতরাং, রামায়ণের পরবর্ত্তি-কালে, মহাভারতের সম-সাময়িক সমাজে, সামাজিক অবস্থার বিকৃতি ঘটিয়াছিল। স্বতন্ত্র শিক্ষার ফলে, দৃষ্টি-শক্তির স্বাতন্ত্র্য-হেতু, মানুষ একই জিনিষ এইরূপ বিভিন্ন-ভাবে দেখিয়া থাকে। কিন্তু তাহা হইলেও, যাহারা পুরুষ-পরম্পরা-ক্রমে দেখিয়া আসিতেছে, তাহাদের দৃষ্টি অভ্রান্ত;—কিংবা, যাহারা হঠাৎ আসিয়া দেখিল, তাহাদের দৃষ্টি অভ্রান্ত? স্থূল দৃষ্টিতেও প্রতিপন্ন হয়,—সংসারের আধি-ব্যাধি-শোক-তাপ দিন-দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে; পাপের ভারও দিন দিন গুরু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দুই দশ বৎসরের বা দুই এক শতাব্দীর বা দুই এক সপ্তাহের ইতিহাস আলোচনা করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। বিশেষতঃ, যে যে বিষয় আধুনিক, যাহার জন্য রামায়ণকে পরবর্ত্তি-কালের রচনা বলিয়া মনে হয়, মূল বিষয়ের সহিত তাহার বিশেষ অসামঞ্জস্য দেখিতে পাই। প্রধানতঃ উত্তরকাণ্ডেই সে অসামঞ্জস্য বিশেষ পরিস্ফুট এবং সেই জন্য উত্তরকাণ্ডকে অনেকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করেন। সমগ্র উত্তরকাণ্ড প্রক্ষিপ্ত না হউক, উহার মধ্যে যে কতক কতক বিষয় পরবর্ত্তি-কালের সংযোজনা,—তাহাতে সন্দেহ নাই। দুর্ব্বাসা প্রভৃতি ঋষির নাম—যে সকল ঋষি মহাভারতের ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট—উত্তর-কাণ্ডেই আছে; অথচ, তাঁহাদের সহিত রামায়ণের মূল বিষয়ের বিশেষ কোনও সংস্রব নাই। এইরূপে, যে দিক দিয়াই দেখি, রামায়ণের প্রাচীনত্ব অবিসংবাদিত; শাস্ত্রদর্শী হিন্দুর মনে তদ্বিষয়ে কোনও প্রকারের দ্বিধা থাকিতে পারে না। সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে দেখিলে, সকলেই তাহা বুঝিতে পারেন।

রামায়ণ বা মহাভারত?

রামায়ণের প্রাচীনত্ব-সম্বন্ধে পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের সংশয়-পরম্পরা, কেবল যে শাস্ত্রজ্ঞ হিন্দু-পণ্ডিতগণ কর্তৃক খণ্ডিত হইয়াছে, তাহা নহে; যে সকল পাশ্চাত্য-পণ্ডিত ধীর-স্থির ভাবে রামায়ণের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাও রামায়ণের প্রাচীনত্ব অস্বীকার করিতে পারেন নাই। ইউরোপের আদি মহাকাব্য —হোমারের 'ইলিয়ড্'। কিন্তু সেই 'ইলিয়ড্'-কাব্যের ভাব-পরম্পরা, রামায়ণ হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে,—অধ্যাপক হীরেণ-প্রমুখ পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের আলোচনাতেই তাহা প্রতিপন্ন হয়। তাঁহাদের মতে,—রামায়ণের আদর্শ অবলম্বনে, গ্রীস-দেশের স্থানীয় অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, হোমারের 'ইলিয়ড্' গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছিল। রামায়ণ-বর্ণিত লঙ্কা-সমরের সহিত 'ইলিয়ড্'-বর্ণিত 'ট্রয়'-যুদ্ধের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। মূল ঘটনা—উভয় গ্রন্থেরই একরূপ। লঙ্কার পরিবর্তে 'ট্রয়', অযোধ্যার পরিবর্তে 'স্পার্টা', রামের পরিবর্তে 'মেনেলাস', রাবণের পরিবর্তে 'পারিস', ইন্দ্রজিতের পরিবর্তে 'হেক্টর', সীতার পরিবর্তে 'হেলেন', সুগ্রীবের পরিবর্তে 'আগামেম্নন', লক্ষ্মণের পরিবর্তে 'পেট্রোক্লাস', হনুমানের পরিবর্তে 'নেষ্টর',—রামায়ণের সহিত 'ইলিয়ডের' এতই সামঞ্জস্য আছে! ইলিয়ডের 'একিলিসেও' লক্ষ্মণের আভাস পাওয়া যায়; পরন্তু, উহাতে ভীমার্জ্জুনেরও ছায়াপাত হইয়াছে। ফলে, রামায়ণ ও মহাভারত রচনার বহু পরে, হোমারের 'ইলিয়ড্'-গ্রন্থ বিরচিত হয়,—তাহাতে আর কোনই সংশয় নাই। 'কাউণ্ট জোরন্‌স্‌জারণা' বলেন,—"রাবণ-কর্তৃক স্বর্গরাজ্য অধিকার—'টিটান' কর্তৃক স্বর্গরাজ্য বিধ্বংসের মূল।" ফরাসী-ভাষায় রামায়ণের অনুবাদ করিয়া, রামায়ণের আলোচনা উপলক্ষে ফরাসী-গ্রন্থকার 'মুসে হিপোলাইট ফাসে' লিখিয়া গিয়াছেন,—"হোমারের কাব্যের অনেক পূর্ব্বে রামায়ণ রচিত হইয়াছিল, এবং রামায়ণ হইতেই হোমার আপন কাব্যের ভাব-পরম্পরা গ্রহণ করিয়াছিলেন।" অধ্যাপক 'মনিয়র উইলিয়মস্' আবার বলেন,— "হোমারে রামায়ণের ভাব-পরম্পরা গৃহীত হইয়াছিল; অথচ, হোমারের স্পার্টা এবং ট্রয়, সভ্যতায় ও ঐশ্বর্য্যে কখনই অযোধ্যা ও লঙ্কার সমকক্ষতা লাভ করিতে পারে নাই।" যাহা হউক, হোমারের পূর্ব্বে গ্রীক-ভাষার অস্তিত্বই ছিল না, আবার গ্রীক-ভাষাই ইউরোপীয় ভাষার আদিভূত। সেই গ্রীকভাষার সেই আদি-গ্রন্থ—রামায়ণের অনুসরণে রচিত হইয়াছিল,—ইহাতে সেই সময়ে ইউরোপে পর্য্যন্ত রামায়ণের প্রভাব বিস্তৃত ছিল বুঝা যায় না কি? পাশ্চাত্য-জাতির চক্ষেও রামায়ণ যে দূর অতীতের স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া আছে, রামায়ণ ভারতের যে দূর অতীতের ইতিহাস নয়নপটে প্রতিফলিত করিতেছে,—কোন্ জাতির কোন্ গ্রন্থ তাহার সহিত সমকক্ষতা প্রদর্শন করিতে পারে? অমর বাল্মীকির, অমর রামায়ণ-মহাকাব্যে, অমর রাম-রাজত্বের, যে অমর চিত্র অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে; যুগ-যুগান্তর ধরিয়া জগতের নরনারী তাহাতে ভারতের দূর-অতীতের ইতিবৃত্ত প্রত্যক্ষ করিবে; আর দিন দিনই অধিকতর বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিবে,— 'এই হিন্দুই কি সেই হিন্দু!'

পাশ্চাত্যের তুলনা।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

মহাভারত।

[মহাভারত-পরিচয় ;—কুরু-পাণ্ডবের বিবরণ,—মহাভারতের সার-মর্ম্ম ;—কুরুক্ষেত্রের মহা-সমর,—সংক্ষেপে যুদ্ধ-বর্ণনা ;—ধৃতরাষ্ট্রের ভবিষ্য-দর্শন,—চতুঃষষ্টি শ্লোকে মহাভারত-তত্ত্ব ;—ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে মহাভারতের আলোচনা ;—পুরাণাদি শাস্ত্রে কুরু-পাণ্ডবের উপাখ্যান ;—মহাভারতের প্রক্ষিপ্ত-বিচার,—আবশ্যকানুরূপ মহাভারত সৃষ্টি ;—মহাভারতে শিক্ষা,—মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র ;—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা,—জ্ঞান ও কর্ম্ম ;—মহাভারতের ঐতিহাসিকতা,—সম-সাময়িক চিত্র ;—মহাভারতের প্রাচীনত্ব,—কাল-নির্ণয় ;—মহাভারত-পরিশিষ্ট হরিবংশ ;—মহাভারত-সম্বন্ধে বিবিধ মত,—উপসংহার ।]

ভারতবর্ষের আর এক ইতিহাস—মহাভারত মহাকাব্য। কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধের পর, পরাশর-নন্দন মহর্ষি বেদব্যাস এই মহাভারত মহাকাব্য রচনা করেন। প্রধানতঃ প্রচার,—মহাভারত লক্ষ-শ্লোকাত্মক। আদিপর্ব্বের প্রথম অধ্যায়ে এই বিষয় এই ভাবে লিখিত আছে,—'প্রথমতঃ উপাখ্যান-ভাগ পরিত্যাগ করিয়া চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোকে বেদব্যাস ভারত-সংহিতা রচনা করিয়াছিলেন। পণ্ডিতেরা সেই চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোককেই ভারত বলিয়া থাকেন। অতঃপর, সমুদায় পর্ব্ব-বৃত্তান্তের সার-সংগ্রহ-পূর্ব্বক সার্দ্ধশত শ্লোকে তিনি অনুক্রমণিকা অধ্যায় রচনা করেন। প্রথমতঃ আপন পুত্র শুকদেবকে এবং পরিশেষে উপযুক্ত শিষ্যগণকে বেদব্যাস সেই ভারত-সংহিতা প্রদান করিয়াছিলেন। সেই সংহিতা-রচনার পর, তিনি ষষ্টি-লক্ষ-শ্লোকময়ী অপর এক সংহিতা প্রণয়ন করেন ; তাহার ত্রিংশৎ লক্ষ শ্লোক দেবলোকে, পঞ্চদশ লক্ষ শ্লোক পিতৃলোকে, চতুর্দ্দশ লক্ষ শ্লোক গন্ধর্ব্বলোকে এবং এক লক্ষ মর্ত্ত্যলোকে প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যাস-শিষ্য বৈশম্পায়ন জন্মেজয়ের সর্প-সত্রে সেই লক্ষ-শ্লোকাত্মক ভারত-সংহিতা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাহাই এখন মহাভারত নামে প্রসিদ্ধ।' এই মহাভারত অষ্টাদশ পর্ব্বে বিভক্ত ;—আদি, সভা, বন, বিরাট, উদ্যোগ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, সৌপ্তিক, স্ত্রী, শান্তি, অনুশাসন, আশ্বমেধিক, আশ্রম-বাসিক, মৌষল, মহাপ্রস্থানিক, স্বর্গারোহণ। এই পর্ব্ব-সমূহ আবার এক শত উপপর্ব্বে বিভক্ত। আদিপর্ব্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ে, পর্ব্বসংগ্রহ পর্ব্বে, পর্ব্ব-উপপর্ব্ব-সমূহের বিবরণ এবং কোন্ পর্ব্বে কি বিষয় লিখিত আছে,—তাহা সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। প্রতি পর্ব্বের শ্লোক-সংখ্যা এবং সংক্ষিপ্ত-সার, সেই পর্ব্বসংগ্রহ-পর্ব্বাধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায়। কয়েকখানি মহাপুরাণের পূর্ব্বে এবং কয়েকখানি মহাপুরাণের পরে যে মহাভারত বিরচিত হইয়াছিল, পুরাণাদির সহিত মহাভারতের আলোচনায় তাহা বোধ-গম্য হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে (প্রথম ও তৃতীয় অধ্যায়ে) স্পষ্টই লিখিত আছে, মহাভারত রচনার পর বেদ-ব্যাস শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেন। পদ্ম-পুরাণ পাতাল খণ্ডে (সপ্ততিতম অধ্যায়ে) দেখিতে

মহাভারত।

পাই,—"পুরা ব্যাসেন মুনিনা ত্রিবর্ষাদ্বৎ কৃতং শুভম্!" অর্থাৎ, পুরাকালে মুনিবর ব্যাসদেব তিন বৎসরে শুভ মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে পদ্ম-পুরাণাদির পূর্ব্বে এবং তিন বৎসরে মহাভারত রচিত হইয়াছিল,—বুঝা যায় না কি? * যাহা হউক, কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ এবং তদানুষঙ্গিক ঘটনা-পরম্পরাই—এই মহাভারতের প্রাণ-স্বরূপ। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-রূপে ইহাতে সমাজ-তত্ত্ব, ধর্ম্ম-তত্ত্ব, দর্শন-তত্ত্ব, রাজনীতি, ইতিহাস, সাহিত্য, এবং বিবিধ রাজবংশের পরিচয় বিবৃত আছে। এক কথায়, মহাভারত কল্প-বৃক্ষ-স্বরূপ। যে বিষয়ের যে তত্ত্ব অবগত হইবার প্রয়োজন, মহাভারতে তাহা সকলই আছে; তাই প্রবাদ বাক্য,—"যা নাই ভারতে, তা নাই ভূ-ভারতে!"

বিরাট মহাভারত মহাকাব্যের প্রকৃষ্ট পরিচয় এই ক্ষুদ্র প্রসঙ্গে কোনক্রমেই সম্ভবপর নহে। তথাপি বর্ণিতব্য বিষয়ের সঙ্গতি-রক্ষা-হেতু স্থূলভাবে মহাভারতের মূল বিবরণ, এস্থলে প্রকাশ করা, বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সে বিবরণ,—

কুরু-পাণ্ডবের বিবরণ।

'চন্দ্রবংশ-সম্ভূত কুরুর বংশে মহারাজ শান্তনু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার দুই পুত্র—ভীষ্ম এবং বিচিত্রবীর্য্য ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধ। ভীষ্ম, চিরকৌমার্য্য অবলম্বন করিয়া, রাজ্যলাভে বীতস্পৃহ ছিলেন। সুতরাং কনিষ্ঠ বিচিত্রবীর্য্য, পিতা শান্তনুর মৃত্যুর পর, রাজ্য প্রাপ্ত হন। বিচিত্রবীর্য্যের তিন পুত্র,—ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর। কনিষ্ঠ বিদুর, হরিপরায়ণ হইয়া, রাজ্যলিপ্সা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া রাজ্যলাভে অশক্ত হন। সুতরাং প্রথমে পাণ্ডুই রাজ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু পাণ্ডু অধিক দিন রাজ্যভোগ করিতে পারেন নাই। অকালে তাঁহার মৃত্যু হইলে, তাঁহার পুত্রগণের অভিভাবক-রূপে ধৃতরাষ্ট্রই রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হন। সেই সময় ভীষ্ম প্রধান পরামর্শদাতার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পাণ্ডুর পাঁচ পুত্র,—যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব; পাণ্ডব নামে ইঁহারা পরিচিত হন। ধৃতরাষ্ট্রের এক শত পুত্র;—দুর্য্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি; তাঁহারা কৌরব নামে অভিহিত। আচার্য্য দ্রোণ—ব্রাহ্মণ হইয়াও যুদ্ধ-বিদ্যা-বিশারদ ছিলেন; তিনি রাজকুমারগণের শিক্ষক-পদে ব্রতী হন। জ্যেষ্ঠ-পাণ্ডব যুধিষ্ঠির যুদ্ধ-বিদ্যায় তাদৃশ পারদর্শী হইতে পারেন নাই; তিনি ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়নে ধর্ম্মপ্রাণতা লাভ করিয়াছিলেন। দেহায়তনে এবং পরাক্রমে ভীমের প্রসিদ্ধি; তিনি গদাযুদ্ধে অদ্বিতীয় ছিলেন। সকল রাজকুমারগণ অপেক্ষা অর্জ্জুন রণকুশল হইয়াছিলেন। তজ্জন্য ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ বালক-বয়স হইতেই তাঁহার প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত হন। নকুল অশ্বপালনে এবং সহদেব জ্যোতির্বিদ্যায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ-পুত্র দুর্য্যোধন, গদাযুদ্ধে পারদর্শিতা লাভ করিয়া, ভীমের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। কুমারগণের যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষার পর, এক দিন এক প্রশস্ত প্রাঙ্গণে, তাঁহাদের বিদ্যার পরীক্ষা গৃহীত হয়। অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র এবং তাঁহার পত্নী রাণী গান্ধারী

* এ বিষয়ে যে মতান্তর নাই,—তাহা নহে। দেবী-ভাগবতে (প্রথম স্কন্ধে, তৃতীয় অধ্যায়ে, ১৬শ শ্লোকে) লিখিত আছে,—অষ্টাদশ পুরাণ রচনা করিয়া, বেদব্যাস পুরাণ-পরিশিষ্ট মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন।

সেই পরীক্ষা-ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন; পাণ্ডু-মহিষী (যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুনের জননী) কুন্তী-দেবীও সেই ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া, পুত্রগণের রণকৌশল দর্শন করিতেছিলেন। তীর, তরবারি, গদা ও বর্শা প্রভৃতি লইয়া পরীক্ষা চলিতেছিল। প্রথমতঃ, ভীমের সহিত দুর্য্যোধনের গদাযুদ্ধ উপস্থিত হয়। সেই যুদ্ধে, ভীমের কৃতিত্ব-কৌশলে দুর্য্যোধনের ক্রোধ-সঞ্চারে, রক্ত-পাতের সম্ভাবনা হইয়াছিল; সুতরাং ভবিষ্য-ফল আশঙ্কাপ্রদ মনে করিয়া, আচার্য্য দ্রোণ উভয়কেই প্রতিনিবৃত্ত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহার পর, অর্জ্জুন লক্ষ্য-ভেদে এবং তরবারি-ক্রীড়ায় বিশেষ যশোভাজন হন; তাঁহার জয়ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত হইয়া উঠে। এই পরীক্ষার পরিণামে কুমারগণের মধ্যে মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। দুর্য্যোধন-প্রমুখ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ, পাণ্ডবগণের প্রতিদ্বন্দ্বিতাচরণে প্রবৃত্ত হন। কুরু-পাণ্ডবের ঘোর সমরের বিষ-বীজ রোপিত হয়। অতঃপর, সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচনের সময় আসিল। যুধিষ্ঠির—পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠপুত্র; তিনিই রাজ্যের ন্যায্য উত্তরাধিকারী; সুতরাং ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকেই যৌবরাজ্যে মনোনীত করিলেন। অভিমানী দুর্য্যোধনের হৃদয় ক্রোধানলে জ্বলিয়া উঠিল। তিনি পিতার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধনকে প্রতিনিবৃত্ত করা অসম্ভব বুঝিয়া, দুর্য্যোধনের মন্ত্রণায়, ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডুপুত্রগণকে বারণাবতে প্রেরণ করিলেন। দুর্য্যোধনের ঈর্ষ্যানল তাহাতেও কিন্তু নিবৃত্ত হইল না। সেখানে যতুগৃহ দাহ করিয়া, পাণ্ডবগণকে ভস্মীভূত করিবার জন্য, তিনি চেষ্টা পাইলেন। যাহা হউক, দৈবের কৃপায় সে যাত্রা পাণ্ডবগণ এবং তাঁহাদের জননী সুরঙ্গ-পথে পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন। সেই হইতে বহুকাল পর্য্যন্ত ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের বেশে তাঁহাদিগকে একচক্রা নগরীতে অজ্ঞাত-বাসে অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল। এই সময়ে দ্রুপদ-রাজনন্দিনীর স্বয়ংবর-বার্ত্তা বিঘোষিত হইল। ব্রাহ্মণ-প্রমুখাৎ দ্রৌপদীর স্বয়ংবর-শ্রবণে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, ব্যাসের আদেশ-অনুসারে পাণ্ডবগণ দ্রৌপদী-প্রার্থনায় স্বয়ংবর দর্শনার্থ পাঞ্চাল-দেশাভিমুখে গমন করিলেন। তথায় সমস্ত রাজগণ সমক্ষে লক্ষ্য ভেদ করিয়া, অর্জ্জুন দ্রৌপদী-লাভে সমর্থ হইলেন। তাহাতে অন্যান্য ভূপতিগণের সহিত তাঁহাদের যুদ্ধ উপস্থিত হইল। সে যুদ্ধে সকলেই পরাজিত হইলে, পাণ্ডবদিগের পরিচয় ক্রমশঃ প্রকাশ হইয়া পড়িল। অতঃপর, মাতৃ আদেশে, পঞ্চ-ভ্রাতা দ্রৌপদীকে বিবাহ করিলেন। এই সময় পাণ্ডবগণ পাঞ্চাল-রাজের সহায়তা পাওয়ায়, ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদিগকে অৰ্দ্ধেক রাজত্ব প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। অৰ্দ্ধেক রাজ্য কৌরবগণের এবং অৰ্দ্ধেক রাজ্য পাণ্ডবগণের মধ্যে ভাগ হইবার বন্দোবস্ত হইল। সমভাগে রাজ্য বিভক্ত হইবে—স্থির হইল বটে; কিন্তু তাহাতেও ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষিত হইল না। গঙ্গা এবং যমুনার মধ্যবর্ত্তী উর্ব্বর প্রদেশ, ধৃতরাষ্ট্র আপন পুত্র-গণের জন্য নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন; এবং খাণ্ডবপ্রস্থের বন্য-প্রদেশ মাত্র পাণ্ডবগণ প্রাপ্ত হইলেন। যাহা হউক, পাণ্ডবেরা তাহাতেও দ্বিরুক্তি করিলেন না; অগ্নি-সংযোগে বন ভস্মী-ভূত করিয়া, তাঁহারা সুমনোহর ইন্দ্রপ্রস্থ নগর প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই সময়ে বাহুবলেও বহু রাজ্য পাণ্ডবগণ আপনাদের অধিকারে আনিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অতঃপর, যখন রাজসূয় যজ্ঞে যুধিষ্ঠিরের অভিষেক-উৎসব সম্পূর্ণ হইবার আয়োজন হইল, কৌরব-পাণ্ডবের

বিবাদ-বহ্নি আবার জ্বলিয়া উঠিল। অভিষেক-উপলক্ষে নানা স্থানের রাজন্যবর্গ নিমন্ত্রিত হইলেন; হস্তিনাপুর হইতে দুর্য্যোধনাদিও নিমন্ত্রিত হইয়া আসিলেন। যদুবংশাবতংস শ্রীকৃষ্ণ সেই রাজ্যাভিষেক-সভায় প্রধান সম্মান প্রাপ্ত হইলেন। সেই সূত্রে বাদানুবাদ উপস্থিত হওয়ায়, চেদিরাজ শিশুপালের সহিত শ্রীকৃষ্ণের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল; ফলে, শ্রীকৃষ্ণের হস্তে শিশুপাল নিহত হইলেন। মহা-সমারোহে অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। কিন্তু রাজসূয়-যজ্ঞের ঐশ্বর্য্য-দর্শনে দুর্য্যোধন অসূয়ায় জ্বলিয়া উঠিলেন। অল্প দিন পরেই দ্যূত-ক্রীড়ার আয়োজন হইল; ধূর্ত্ত শকুনির কৌশলে যুধিষ্ঠির পরাজিত হইলেন। পাণ্ডবগণের রাজৈশ্বর্য্য পুনরায় দুর্য্যোধনের অধিকার-ভুক্ত হইল। কেবল রাজৈশ্বর্য্য বলিয়া নহে; এই দ্যূত-ক্রীড়ার পরিণামে পাণ্ডবগণ দুর্য্যোধনের ক্রীতদাস-রূপে পরিণত এবং তাঁহাদের পত্নী দ্রৌপদী পর্য্যন্ত দুর্য্যোধনের নিকট বিক্রীত হইলেন। কিন্তু দ্রৌপদী দুর্য্যোধনের বশ্যতা-স্বীকারে অসম্মত হওয়ায়, দুঃশাসন দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ-পূর্ব্বক, রাজ-সভায় লইয়া গেলেন। ইহার পর, দ্রৌপদীর বস্ত্র-হরণে দুঃশাসনের উদ্যোগ, দ্রৌপদীর খেদ, দ্রৌপদীর প্রতি দুর্য্যোধনের উরু-প্রদর্শন এবং দুঃশাসনের রক্তপানে ও দুর্য্যোধনের উরু-ভঙ্গে ভীমের প্রতিজ্ঞা। বিবাদ-বহ্নি যখন এইরূপ-ভাবে জ্বলিয়া উঠিয়াছে, সহসা ধৃতরাষ্ট্র সভাস্থলে আগমন করিলেন; দুর্য্যোধনাদি পুত্রগণকে বুঝাইয়া, পাণ্ডবগণের সহিত বিবাদ-ভঞ্জন করিয়া দিলেন। স্থির হইল,—পাণ্ডবগণ দ্বাদশ বৎসর বনে বাস করিবেন এবং তৎপরে এক বৎসর অজ্ঞাত-বাসে তাঁহাদিগকে কালাতিপাত করিতে হইবে। সেই অজ্ঞাত-বাসের সময় ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ যদি কোনরূপে তাঁহাদের সন্ধান পান, তাহা হইলে, পাণ্ডবগণের নির্ব্বাসন-দণ্ড আরও বৃদ্ধি পাইবে। দ্যূত-ক্রীড়ার ফলে, এইরূপ সর্ত্তে, পাণ্ডবগণ আবার নির্ব্বাসিত হইলেন। দ্বাদশ বৎসর কাল দেশে দেশে বনে বনে পরিভ্রমণ করিয়া, ত্রয়োদশ বর্ষের সময়, তাঁহারা ছদ্মবেশে বিরাট-রাজ-গৃহে কার্য্য গ্রহণ করিলেন। এ সময়, তাঁহাদের নাম পরিবর্ত্তিত; পরিচয় লুক্কায়িত। যুধিষ্ঠির, বিরাট-রাজকে দ্যূত-ক্রীড়া শিক্ষাদানে নিযুক্ত হইলেন; ভীম, রন্ধন-শালার প্রধান সূপকারের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন; অর্জ্জুন, বিরাট-রাজের কন্যাকে নৃত্যগীত শিক্ষা দিতে লাগিলেন; নকুল, ঘোটক-পরিচর্য্যায় অশ্বশালায় এবং সহদেব গো-পরিচর্য্যায় গো-শালায় কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। দ্রৌপদী, বিরাট-রাজ-মহিষীর পরিচারিকার কার্য্যে ব্রতী রহিলেন। দ্রৌপদী তখন সৌরিন্ধ্রী নামে পরিচিতা হন। এইরূপে বিরাট-রাজ-গৃহে অবস্থিতি-কালে, রাজ-শ্যালক কীচক, দ্রৌপদীর রূপে মুগ্ধ হইয়া, দ্রৌপদীর প্রতি অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হয়; আতঙ্কে রাজ-সভায় পলায়ন করিলে, কীচক দ্রৌপদীকে পদাঘাত করে। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া, ভীম গুপ্তভাবে কীচকের সংহার-সাধন করেন। কীচক-বধের পর, হস্তিনাপুরে পাণ্ডবগণের সম্বন্ধে সন্দেহ-আন্দোলন উপস্থিত হয়। পাণ্ডবান্বেষণে বহির্গত হইয়া, দুর্য্যোধন প্রভৃতি বিরাট-রাজ্যে গমন করেন। সুশর্ম্মা কর্ত্তৃক বিরাটের গো-হরণ হইলে, গোপগণ-মুখে সেই সংবাদ অবগত হইয়া, বিরাট-রাজ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হন। সেই যুদ্ধে ছদ্মবেশী অর্জ্জুন বিরাট-রাজের সারথির কার্য্য করেন। বিরাট-পক্ষে অর্জ্জুন

অস্ত্র-চালনা করায়, কৌরবগণ পরাজিত হয়। ইহার পর, বিরাট-রাজ, অর্জ্জুনের নিকট পাণ্ডবগণের পরিচয় প্রাপ্ত হন; সঙ্গে সঙ্গে বিরাট-রাজ-সভায় রাজগণ-সমীপে যুধিষ্ঠিরের রাজ্য-প্রাপ্তি বিষয়ে বাসুদেব প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তখন, পাণ্ডবগণ আপনাদের রাজ্য পুনঃ-প্রাপ্ত হইবার জন্য হস্তিনাপুরে দূত প্রেরণ করিলেন। কিন্তু দুর্য্যোধনের তাহাতে আপত্তি হইল; দুর্য্যোধন বলিলেন,—'অজ্ঞাত-বাস পূর্ণ হইয়াছে কি না, তাহা প্রমাণ হয় নাই; সুতরাং আমি এক বিন্দু রাজ্য প্রদান করিব না।' শ্রীকৃষ্ণ এবং পিতামহ ভীষ্ম মধ্যস্থ হইয়া, বিবাদ মীমাংসার জন্য চেষ্টা পাইলেন; পাণ্ডবগণের পরাক্রম উল্লেখ পূর্ব্বক ভীষ্ম ও দ্রোণ উভয়েই দুর্য্যোধনকে সন্ধি-বিষয়ক উপদেশ দিলেন। কিন্তু দুর্য্যোধন কাহারও কথায় কর্ণপাত করিলেন না। মাতা গান্ধারী এবং পিতা ধৃতরাষ্ট্রের উপদেশ পর্য্যন্তও দুর্য্যোধন অগ্রাহ্য করিলেন। এই গৃহ-বিবাদই কুরু-পাণ্ডব-যুদ্ধের সূত্রপাত। এই গৃহ-বিবাদই—ভারতের অধঃপতনের মূল।

কুরুক্ষেত্রের মহা-সমর।

অতঃপর যুদ্ধের আয়োজন চলিল। ভারতবর্ষের রাজন্যবর্গ, কেহ বা দুর্য্যোধনের পক্ষে, কেহ বা যুধিষ্ঠিরের পক্ষে, রণ-সজ্জায় সজ্জিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ—পাণ্ডবগণের পক্ষে যোগদান করিলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, শল্য, জয়দ্রথ প্রভৃতি প্রধান প্রধান যোদ্ধৃবর্গ দুর্য্যোধনের পক্ষ-ভুক্ত হইলেন। বিপুল উৎসাহে যুদ্ধায়োজন চলিতে লাগিল। কুরুক্ষেত্রের বিস্তৃত সমতল-ক্ষেত্রে এই যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কৌরব-পক্ষে অদ্বিতীয় বীর ভীষ্ম সেনাপতির পদ গ্রহণ করিলেন। প্রথম দিনের যুদ্ধ-প্রারম্ভেই—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সৃষ্টি। ঐ দিন, আত্মীয়-স্বজনের নিধন-আশঙ্কায় শোকে মুহ্যমান হইয়া, অর্জ্জুন যুদ্ধে প্রতি-নিবৃত্ত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন; আর, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নিগূঢ় সংসার-তত্ত্ব বুঝাইয়া উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। এদিকে, ধৃতরাষ্ট্র সর্ব্বদর্শী সঞ্জয়ের নিকট যুদ্ধক্ষেত্রের ঘটনাবলী অবগত হইতে চাহিলেন; আর সঞ্জয়, সাধনার ফলে, যুদ্ধ-ক্ষেত্রের সমস্ত ঘটনা মানস-চক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া, একে একে ধৃতরাষ্ট্রকে শুনাইতে লাগিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্ন এবং সঞ্জয়ের উত্তর—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার আরম্ভ; অর্জ্জুনের বৈরাগ্য এবং শ্রীকৃষ্ণের উদ্দীপনা,—উহার মেদ-মজ্জা-অস্থি; আত্মার অবিনশ্বরত্ব এবং নিষ্কাম-কর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব—উহার প্রাণ-স্থানীয়। অষ্টাদশ দিবস এই যুদ্ধ চলিয়াছিল। দশম দিবসের যুদ্ধে মহামতি ভীষ্ম, অর্জ্জুনের হস্তে প্রাণদান করেন। রণক্ষেত্রে বহুল প্রাণী নিহত করিয়া, দেহ-রক্ষণে নির্ব্বেদ উপস্থিত হওয়ায়, ভীষ্ম আপন মৃত্যুর উপায় যুধিষ্ঠিরকে বলিয়া দেন। তদনুসারে শিখণ্ডীকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া, চেদি ও পাঞ্চালগণ সমভিব্যাহারে, অর্জ্জুন ভীষ্মের অভিমুখে ধাবমান হন। তাহার পর, ভীষ্মের প্রতি শিখণ্ডীর প্রহার, অর্জ্জুন কর্তৃক ভীষ্মের ধনুঃকর্ত্তন, অর্জ্জুনের প্রতি ভীষ্মের অপ্রহার, রথ হইতে ভীষ্মের পতন। ভীষ্মের শর-শয্যায় শয়ন, তাঁহার ইচ্ছা-মৃত্যু,—ইতিহাসে অপূর্ব্ব ঘটনা। ভীষ্মের মৃত্যুর পর, কুরু-পক্ষে দ্রোণাচার্য্য সেনাপতি-পদে অভিষিক্ত হন। তিনি যুধিষ্ঠিরকে ধরিয়া আনিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। তাঁহারই সেনাপতিত্ব-কালে, জয়দ্রথের চক্রান্তে, সপ্তরথী পরিবেষ্টিত হইয়া, অর্জ্জুন-পুত্র অভিমন্যু নিহত হন। পুত্র

অভিমন্যু নিহত হইলে, ক্রোধাভিভূত অর্জ্জুন, প্রতিজ্ঞা করিয়া, সূর্য্যাস্তের মধ্যে সপ্ত-অক্ষৌহিণী সৈন্য বধ পূর্ব্বক, মদ্ররাজ জয়দ্রথের সংহার-সাধন করেন। এই যুদ্ধ-ক্ষেত্রে দ্রোণ-হস্তে দ্রুপদ-রাজ নিহত হইলে, দ্রুপদ-পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণ-বধে তাহার প্রতিশোধ লন। এই দ্রোণ-বধও এক বিচিত্র ব্যাপার। দ্রোণের প্রতিজ্ঞা ছিল,—পুত্র অশ্বত্থামা নিহত হইলে, তিনি অস্ত্রত্যাগ করিবেন। তিনি অস্ত্র-ত্যাগ না করিলে, তাঁহাকে পরাজিত করা,—কাহারও সাধ্যায়ত্ত ছিল না। দ্রোণ-বধ অনায়াস-সাধ্য নহে—মনে করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ যে কৌশল অবলম্বন করেন,—তাহাতে চির-সত্য-নিষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে প্রকারান্তরে মিথ্যা কথা কহিতে হয়। অশ্বত্থামা নামক একটি হস্তী নিহত হইলে, 'অশ্বত্থামা হত হইয়াছে'—পাণ্ডব-পক্ষ হইতে এই রব উত্থিত হয়। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের মুখে সে কথা না শুনিলে, দ্রোণাচার্য্য প্রত্যয় করিতে চাহেন না। শ্রীকৃষ্ণের প্ররোচনায়, 'অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছে,'—যুধিষ্ঠির এই কথা বলিয়াই অস্পষ্ট স্বরে 'কুঞ্জর' শব্দ উচ্চারণ করেন। ফলে, যুধিষ্ঠিরের সত্য-নিষ্ঠায় বিশ্বাস করিয়া, দ্রোণ অস্ত্র-ত্যাগ করিলে, ধৃষ্টদ্যুম্ন খড়্গাঘাতে তাঁহার শিরশ্ছেদন করেন। দ্রোণের মৃত্যুর পর, কর্ণ সেনাপতি-পদে বরিত হন। সেই সময় ভীম-হস্তে দুঃশাসন নিহত হয়; দুঃশাসনের রক্তপান করিয়া, ভীম দ্রৌপদীর অপমান-জনিত ক্ষোভের নিবৃত্তি করেন। অবশেষে কর্ণের সহিত অর্জ্জুনের ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। দুই জনেই সমান যোদ্ধা; দুই জনেই সমান বীর। সঙ্কুল যুদ্ধের সময় কর্ণের রথচক্র মৃত্তিকা-প্রোথিত হইলে, কর্ণ মুহূর্ত্ত কাল অবসর প্রার্থনা করেন; কিন্তু কৃষ্ণের উপদেশে অর্জ্জুন সে প্রার্থনায় কর্ণপাত করেন না। বিপাকে পড়িয়া, অর্জ্জুনের হস্তে কর্ণ প্রাণদান করেন। কর্ণ-বধ হইলে, মদ্রেশ্বর শল্য সেনাপতি পদ প্রাপ্ত হন। যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক শল্য বধ সমাহিত হইলে, দুর্য্যোধন পলায়ন করেন। তিনি যখন হ্রদ-প্রদেশে জলস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া, লুক্কায়িত-ভাবে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে ব্যাধগণ ভীমের নিকট দুর্য্যোধনের সংবাদ প্রদান করে। তখন, ধর্ম্মরাজের তীব্র তিরস্কার-বাক্যে হ্রদ-মধ্য হইতে দুর্য্যোধন উঠিয়া আসেন। ভীমের সহিত দুর্য্যোধনের তুমুল গদাযুদ্ধ আরম্ভ হয়। সেই সময়, দ্রৌপদীর অপমান-জনিত আপন প্রতিজ্ঞা-রক্ষার্থ, শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতে, ন্যায়-যুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া, ভীম অন্যায়রূপে দুর্য্যোধনের ঊরুদ্বয় ভঙ্গ করিয়া দেন। সেই ভাবে কিছুকাল অবস্থিতি করিয়া, দুর্য্যোধন ইহলীলা সংবরণ করেন। এইরূপে যে অষ্টাদশ দিবস যুদ্ধ চলিয়াছিল, তাহার প্রথম দশ দিবস পরম শাস্ত্রবেত্তা ভীম যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন; তৎপরে পঞ্চ দিবস দ্রোণাচার্য্য কুরু-সৈন্য রক্ষা করিয়াছিলেন; শত্রু-সৈন্য-বিনাশক কর্ণ দুই দিন; শল্য অর্দ্ধ দিবস; আর, শেষ অর্দ্ধ দিবস ভীম ও দুর্য্যোধনে গদা-যুদ্ধ চলিয়াছিল। শেষ দিবস রজনীতে অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য—তিন জনে মিলিত হইয়া, যুধিষ্ঠিরের বিশ্বস্ত নিদ্রিত সৈন্য-সকলকে আক্রমণ করেন। তাঁহারা যখন রাজা দুর্য্যোধনকে ভগ্নোরু এবং সর্ব্বাঙ্গে রুধিরোক্ষিত রণভূমিতে নিপতিত দেখেন, ক্রোধে তাঁহাদের হৃদয় জ্বলিয়া উঠে। অশ্বত্থামা প্রতিজ্ঞা করেন,—ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাঞ্চালগণকে এবং অমাত্যসমেত পাণ্ডবগণকে বিনাশ না করিয়া তনুত্রাণ বিমোচন করিবেন না। ইহার পর, অশ্বত্থামা-হস্তে পাঞ্চালগণ নিহত হন; এবং পঞ্চ-পাণ্ডব-ভয়ে

দ্রৌপদীর পঞ্চ-পুত্রকে অশ্বত্থামা সংহার করেন। দ্রৌপদী পুত্রশোকার্ত্তা ও পিতৃবধে কাতরা হইয়া, অনশনে প্রাণত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ বুঝাইয়া তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করেন। অবশেষে, হস্তিনা-রাজ্য অধিকার করিয়া, যুধিষ্ঠির একছত্র-প্রভাব-বিস্তারে রাজ্য-শাসন করিতে প্রবৃত্ত হন। অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়। অশ্বমেধ-যজ্ঞের পর, আশ্রমবাস-পর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্র-বিদুর প্রভৃতির অরণ্যে গমন; মৌষল-পর্ব্বে যদুবংশ-ধ্বংসের বিবরণ; মহাপ্রস্থানিক পর্ব্বে—পাণ্ডবগণের মহা-প্রস্থান-গমন; এবং স্বর্গারোহণ-পর্ব্বে—যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ-প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। যুধিষ্ঠিরের স্বর্গলাভ-বিবরণ—বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। জীবনে একবার মিথ্যা কথা কহিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহাকে নরক-দর্শন করিতে হইয়াছিল। তদ্বিষয় এবং তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের কর্ম্মানুসারে ফল ভোগ,—এই, স্বর্গারোহণ পর্ব্বে পরিদৃশ্যমান। গৃহ-বিবাদে, অন্তর্ব্বিপ্লবের পরিণামে, দেশ যে কিরূপ অধঃপতনের পথে অগ্রসর হয়, কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধে, মহাভারতে, তাহা বিশদীকৃত হইয়াছে। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ অবসানের পর, পাণ্ডবেরা রাজ্যলাভ করিয়াছেন শুনিয়া, ধৃতরাষ্ট্র তাই আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন,—'হায়, কি কষ্ট! যখন শুনিলাম,—কুরু-পাণ্ডবের এই যুদ্ধের পর, অস্মদ-পক্ষের তিন জন, পাণ্ডব পক্ষের সাত জন,—সমুদায়ে এই দশ জন মাত্র জীবিত আছে; আর, এই ভয়ানক সংগ্রামে ক্ষত্রিয়গণের অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী * বিনষ্ট হইয়াছে, তখন হইতেই আমি চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতেছি, মোহে অভিভূত হইয়াছি, আমার চৈতন্য লোপ পাইয়াছে, মন অতিশয় বিকল হইয়াছে।"

এই কুরু-পাণ্ডব যুদ্ধের পরিণাম,—কি দাঁড়াইবে, দূরদর্শী ধৃতরাষ্ট্র পূর্ব্ব হইতেই তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। যদিও পুত্র-স্নেহ-বশতঃ, বাধ্য হইয়া, সময় সময় তিনি পাণ্ডব-দিগের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সঞ্জয়ের নিকট তাঁহার উক্তিতে যে ক্ষোভ, যে পরিণাম-চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়, মহাভারতে তাহা উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত আছে। ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে বলিতেছেন,—'সঞ্জয়! তুমি শাস্ত্রজ্ঞ মেধাবী; বুদ্ধিমান ও মহামান্য; অতএব আমার উপর মিথ্যা দোষারোপ করিও না। দেখ, বিগ্রহে আমার মত ছিল না; এবং কুলক্ষয় হইলে আমি যে সন্তুষ্ট হই,—এমন নহে। আমার পুত্র এবং পাণ্ডু-পুত্রে কিছুমাত্র বিশেষ নাই। ঈর্ষ্যাপরবশ পুত্রেরা আমাকে বৃদ্ধ বলিয়া অগ্রাহ্য করে। আমি নেত্রহীন ও দীন; সুতরাং পুত্রস্নেহে আমি সমুদায় সহ্য করি। রাজসূয়-যজ্ঞে যুধিষ্ঠিরের অতুল ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া, দুর্য্যোধন সহ্য করিতে পারে নাই। সংগ্রামে পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিতে অসমর্থ, রাজলক্ষ্মী-প্রাপ্তি বিষয়ে নিরুৎসাহ, দ্যূতক্রীড়ায় মন্ত্রণা,—দুর্য্যোধনের এবংবিধ কার্য্য-পরম্পরা দেখিয়াই আমি হতাশ হইয়াছিলাম।" এই বলিয়া ধৃতরাষ্ট্র একে একে যুদ্ধ-পরাজয়ের কারণ সমূহ বিবৃত করেন। তাঁহার সেই উক্তির মধ্যে অল্প কথায়

ধৃতরাষ্ট্রের ভবিষ্য-দর্শন।

* ১ লক্ষ ৯ হাজার ৩৫০ পদাতি, ৬৫ হাজার ৬১০ অশ্বারোহী, ২১ হাজার ৮৭০ গজারোহী, এবং ২১ হাজার ৮৭০ রথারোহী,—সমুদায়ে ২ লক্ষ ১৮ হাজার ৭০০ শত সৈন্যে এক অক্ষৌহিণী হয়। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে এইরূপ আঠার অক্ষৌহিণী অর্থাৎ ৩৯ লক্ষ ৩৬ হাজার ৬০০ শত সৈন্য নিহত হইয়াছিল।

মহাভারতের সার-মর্ম্ম কি সুন্দর পরিস্ফুট হইয়াছে। মহাভারত পাঠ করিতে হইলে, সঞ্জয়ের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের সেই উক্তি প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে বলিতেছেন,—

যদাশ্রৌষং ধনুরায়ম্য চিত্রং বিদ্ধং লক্ষ্যং পাতিতং বৈ পৃথিব্যাম্।
কৃষ্ণাং হৃতাং প্রেক্ষতাং সর্ব্বরাজ্ঞাং তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়॥

যখন শুনিলাম,—অর্জ্জুন বিচিত্র শরাসন আকর্ষণ-পূর্ব্বক লক্ষ্য-ভেদ করিয়া ভূতলে পাতিত করিয়াছে; আর, সমুদায় ক্ষত্রিয় রাজগণের সমক্ষে অর্জ্জুন সদম্ভে দ্রৌপদীকে হরণ করিয়া আনিয়াছে; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদাশ্রৌষং দ্বারকায়াং সুভদ্রাং প্রসহ্যোঢ়াং মাধবীমর্জ্জুনেন।
ইন্দ্রপ্রস্থং বৃষ্ণিবীরৌ চ যাতৌ তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়॥

যখন শুনিলাম,—অর্জ্জুন দ্বারকায় গমন করিয়া, মাধবানুজা সুভদ্রাকে বলপূর্ব্বক বিবাহ করিয়াছে; অথচ, বৃষ্ণিবংশাবতংস কৃষ্ণ-বলরাম তাহাতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া পরম সখ্য-ভাবে ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করিয়াছেন; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদাশ্রৌষং দেবরাজং প্রবৃষ্টং শরৈর্দিব্যৈর্বারিতঞ্চার্জ্জুনেন।
অগ্নিং তথা তর্পিতং খাণ্ডবে চ তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়॥

যখন শুনিলাম,—খাণ্ডবদাহে দেবরাজ ইন্দ্র মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেও, অর্জ্জুন তাহাতে কিছুমাত্র শঙ্কিত না হইয়া, দিব্য শরজাল বিস্তার করিয়া, বৃষ্টি নিবারণ পূর্ব্বক, অগ্নিকে পরিতৃপ্ত করিয়াছে; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদাশ্রৌষং জাতুষাদ্বেশ্মনস্তান মুক্তান্ পার্থান্ পঞ্চ কুন্ত্যা সমেতান্।
যুক্তঞ্চৈষাং বিদুরং স্বার্থসিদ্ধৌ তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়॥

যখন শুনিলাম,—কুন্তীর সহিত পাণ্ডবগণ জতুগৃহ-দাহ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে, এবং বিদুর তাহাদিগের মঙ্গল-চেষ্টা করিতেছে; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদাশ্রৌষং দ্রৌপদীং রঙ্গমধ্যে লক্ষ্যং ভিত্ত্বা নির্জ্জিতামর্জ্জুনেন।
শূরান্ পাঞ্চালান্ পাণ্ডবেয়াংশ্চ যুক্তাংস্তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়॥

যখন শুনিলাম,—অর্জ্জুন রঙ্গমধ্যে লক্ষ্য-ভেদ করিয়া দ্রৌপদীকে লাভ করায়, মহাবল পাঞ্চাল ও পাণ্ডবে মিলন হইয়াছে; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদাশ্রৌষং মাগধানাং বরিষ্ঠং জরাসন্ধং ক্ষত্রমধ্যে জ্বলন্তম্।
দোর্ভ্যাং হতং ভীমসেনেন গত্বা তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়॥

যখন শুনিলাম,—ভীমসেন, ক্ষত্রিয়-মধ্যে তেজস্বী মগধাধিপতি জরাসন্ধকে আপনার বাহুবলে বিনাশ করিয়াছে; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদাশ্রৌষং দিগ্‌জয়ে পাণ্ডুপুত্রৈর্বশীকৃতান্ ভূমিপালান্ প্রসহ্য।
মহাক্রতুং রাজসূয়ং কৃতঞ্চ তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়॥

যখন শুনিলাম,—পাণ্ডুপুত্রেরা দিগ্বিজয়ে সমুদায় ভূপালকে বলপূর্ব্বক বশীভূত করিয়া, রাজসূয় মহা-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছে; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদাশ্রৌষং দ্রৌপদীমশ্রুকণ্ঠীং সভাং নীতাং দুঃখিতামেকবস্ত্রাম্।
রজস্বলাং নাথবতীমনাথবৎ তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়॥

যখন শুনিলাম,—রোরুদ্যমানা, একবসনা, দুঃখিতা, রজস্বলা, সনাথা দ্রৌপদী, অনাথার ন্যায় সভামধ্যে আনীতা হইয়াছে; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদাশ্রৌষং বাসসাং তত্র রাশিং সমাক্ষিপৎ কিতবো মন্দবুদ্ধিঃ।

দুঃশাসনো গতবান্নৈব চান্তং তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়॥

যখন শুনিলাম,—দুর্ব্বুদ্ধি ধূর্ত্ত দুঃশাসন, সেই সভামধ্যে দ্রৌপদীর অঙ্গ হইতে তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র আকর্ষণ করিতেছে; অথচ, দ্রৌপদীর পরিধেয় বস্ত্রের শেষ করিতে পারে নাই, দুঃশাসনও বিনষ্ট হয় নাই; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদাশ্রৌষং হৃতরাজ্যং যুধিষ্ঠিরং পরাজিতং সৌবলেনাক্ষবত্যাম্।

অন্বাগতং ভ্রাতৃভিরপ্রমেয়ৈস্তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়॥

যখন শুনিলাম,—শকুনি অক্ষ-ক্রীড়াতে যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করিয়া রাজ্য হরণ করিলেও, মহাপ্রভাবশালী সহোদরেরা যুধিষ্ঠিরের অনুগত হইয়া আছে; অপিচ, কেহই তাহার বিরুদ্ধাচরণ করে নাই; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদাশ্রৌষং বিবিধাস্তত্র চেষ্টা ধর্ম্মাত্মনাং প্রস্থিতানাং বনায়।

জ্যেষ্ঠপ্রীত্যা ক্লিশ্যতাং পাণ্ডবানাং তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়॥

যখন শুনিলাম,—ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডবগণ বনঃ-প্রস্থান করিয়া, জ্যেষ্ঠের সন্তোষার্থ বিবিধ ক্লেশে বিবিধ চেষ্টা করিতেছে; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদাশ্রৌষং স্নাতকানাং সহস্রৈরন্বাগতং ধর্ম্মরাজং বনস্থং।

ভিক্ষাভুজাং ব্রাহ্মণানাং মহাত্মনাং তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়॥

যখন শুনিলাম,—সহস্র সহস্র মহানুভব স্নাতক ও ভিক্ষুক ব্রাহ্মণগণ, বনবাসী ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অনুগত হইয়াছেন; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদাশ্রৌষমর্জ্জুনং দেবদেবং কিরাতরূপং ত্র্যম্বকং তোষ্য যুদ্ধে।

অবাপ্তবন্তং পাশুপতং মহাস্ত্রং তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়॥

যখন শুনিলাম,—অর্জ্জুন কিরাতরূপী দেবদেব মহাদেবকে সংগ্রামে পরিতুষ্ট করিয়া পাশুপত মহাস্ত্র লাভ করিয়াছে; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদাশ্রৌষং ত্রিদিবস্থং ধনঞ্জয়ং শক্রাৎ সাক্ষাদ্দিব্যমস্ত্রং যথাবৎ।

অধীয়ানং শংসিতং সত্যসন্ধং তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়॥

যখন শুনিলাম,—সত্যসন্ধ ধনঞ্জয় দেবলোকে গমন করিয়া, স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট যথাবিধানে দিব্যাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছে; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদাশ্রৌষং কালকেয়াস্ততস্তে পৌলোমানো বরদানাচ্চ দৃপ্তাঃ।

দেবৈরজেয়া নির্জ্জিতাস্তার্জ্জুনেন তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়॥

যখন শুনিলাম,—বরদানগর্ব্বিত, দেবতাদিগেরও অজেয়, পুলমানন্দন কালকেয় নামক অসুরদিগকে অর্জ্জুন পরাজয় করিয়াছে; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদাশ্রৌষমসুরাণাং বধার্থে কিরীটিনং যান্তমমিত্রকর্শনম্।

কৃতার্থঞ্চাপ্যাগতং শক্রলোকাৎ তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়॥

যখন শুনিলাম,—শত্রুনাশক কিরীটি অসুরবধার্থ ইন্দ্র-লোকে গমন করিয়া, কৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাগত হইয়াছে; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই

যদাশ্রৌষং বৈশ্রবণেন সার্দ্ধং সমাগতং ভীমমন্যাংশ্চ পার্থান্‌।
তস্মিন্‌ দেশে মানুষাণামগম্যে তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়॥

যখন শুনিলাম,—ভীম ও পাণ্ডবেরা মনুষ্যের অগম্য দেশে গমন করিয়া, বৈশ্রবণ কুবেরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছে; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদাশ্রৌষং ঘোষযাত্রাগতানাং বন্ধং গন্ধর্ব্বৈর্মোক্ষণঞ্চার্জ্জুনেন।
স্বেষাং সুতানাং কর্ণবুদ্ধৌ রতানাং তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়॥

যখন শুনিলাম,—কর্ণমতানুযায়ী মৎপুত্রেরা, ঘোষযাত্রায় গমন করতঃ গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক বদ্ধ হইয়াও, অর্জ্জুন কর্ত্তৃক মুক্ত হইয়াছে; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদাশ্রৌষং যক্ষরূপেণ ধর্ম্মং সমাগতং ধর্ম্মরাজেন সূত।
প্রশ্নান্‌ কাংশ্চিদ্বিব্রুবাণঞ্চ সম্যক্‌ তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়॥

যখন শুনিলাম,—ধর্ম্ম, যক্ষরূপে যুধিষ্ঠিরের সন্নিধানে আসিয়া কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, যুধিষ্ঠির যথাযথ উত্তর দিয়াছে; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদাশ্রৌষং ন বিদুর্ম্মামকাস্তান্‌ প্রচ্ছন্নরূপান্‌ বসতঃ পাণ্ডবেয়ান্‌।
বিরাটরাষ্ট্রে সহ কৃষ্ণয়া চ তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়॥

যখন শুনিলাম,—পাণ্ডবগণ পাঞ্চাল-দুহিতা দ্রৌপদীর সহিত বিরাট-রাজ্যে প্রচ্ছন্ন-ভাবে অবস্থিতি করিতেছে; অথচ, আমাদের পক্ষীয় অনুসন্ধানকারী কোনও লোক কোনক্রমেই তাহাদের সন্ধান পায় নাই; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদাশ্রৌষং মামকানাং বরিষ্ঠান্‌ ধনঞ্জয়েনৈকরথেন ভগ্নান্‌।
বিরাটরাষ্ট্রে বসতা মহাত্মনা তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়॥

যখন শুনিলাম,—পাণ্ডবগণের বিরাট নগরে বাস কালে একরথ ধনঞ্জয়, অস্মৎপক্ষীয় শ্রেষ্ঠ যোদ্ধগণকে পরাস্ত করিয়াছে; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদাশ্রৌষং সৎকৃতাং মৎস্যরাজ্ঞা সুতাং দত্তামুত্তরামর্জ্জুনায়।
তাঞ্চার্জ্জুনঃ প্রত্যগৃহ্লাৎ সুতার্থে তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়॥

যখন শুনিলাম,—মৎস্যরাজ আপন কন্যা উত্তরাকে প্রদান করিলে, অর্জ্জুন নিজ পুত্র অভিমন্যুর জন্য ঐ কন্যা গ্রহণ করিয়াছে; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদাশ্রৌষং নির্জ্জিতস্যাধনস্য প্রব্রাজিতস্য স্বজনাৎ প্রচ্যুতস্য।
অক্ষৌহিণীঃ সপ্ত যুধিষ্ঠিরস্য তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়॥

যখন শুনিলাম,—নির্জিত, নির্দ্ধন, নির্ব্বাসিত ও স্বজন-রহিত হইয়াও, যুধিষ্ঠির সপ্ত অক্ষৌহিণী সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছে; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদাশ্রৌষং মাধবং বাসুদেবং সর্ব্বাত্মনা পাণ্ডবার্থে নিবিষ্টম্‌।
যস্যেমাং গাং বিক্রমমেকমাহুস্তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়॥

যখন শুনিলাম,—ভূর্লোক যাঁহার একপদ পরিমিত হইয়াছিল, সেই বাসুদেব সর্ব্বতোভাবে পাণ্ডবগণের হিতসাধন করিতেছেন; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদাশ্রৌষং নরনারায়ণৌ তৌ কৃষ্ণার্জ্জুনৌ বদতো নারদস্য।
অহং দ্রষ্টা ব্রহ্মলোকে চ সম্যক্‌ তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়॥

যখন শুনিলাম,—নারদ বলিলেন, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন নর-নারায়ণের অবতার, তাঁহাদিগকে তিনি ব্রহ্মলোকে দেখিয়াছেন; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদাশ্রৌষং লোকহিতায় কৃষ্ণং শমার্থিনমুপযাতং কুরূণাম্।
শমং কুর্ব্বাণমকৃতার্থঞ্চ যাতং তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়॥

যখন শুনিলাম,—কৃষ্ণ, লোকহিতার্থ সন্ধি-স্থাপন জন্য দুর্য্যোধনের নিকট আসিয়া, কৃতকার্য্য না হইয়া, প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদাশ্রৌষং কর্ণদুর্য্যোধনাভ্যাং বুদ্ধিং কৃতাং নিগ্রহে কেশবস্য।
তঞ্চাত্মানং বহুধা দর্শয়ানং তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়॥

যখন শুনিলাম,—কর্ণ ও দুর্য্যোধন কৃষ্ণের নিগ্রহ চেষ্টা করাতে, তিনি তাহাদিগকে আপনার বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়াছেন; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদাশ্রৌষং বাসুদেবে প্রয়াতে রথস্যৈকামগ্রতস্তিষ্ঠমানাম্।
আর্ত্তাং পৃথাং সান্ত্বিতাং কেশবেন তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়॥

যখন শুনিলাম,—বাসুদেবের গমন-কালে কাতরা কুন্তী একাকিনী তাঁহার রথের সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিলে, কৃষ্ণ তাঁহাকে অশেষ প্রকারে সান্ত্বনা করিয়া প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছেন; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদাশ্রৌষং মন্ত্রিণং বাসুদেবং তথা ভীষ্মং শান্তনবঞ্চ তেষাম্।
ভারদ্বাজঞ্চাশিষোঽনুব্রুবাণং তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়॥

যখন শুনিলাম,—বাসুদেব ও ভীষ্ম উভয়ে পাণ্ডবদিগের মন্ত্রী হইয়াছেন; এবং ভারদ্বাজ দ্রোণ তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদাশ্রৌষং কর্ণ উবাচ বাক্যং নাহং যোৎস্যে যুধ্যমানে ত্বয়ীতি।
হিত্বা সেনামপচক্রাম চাপি তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়॥

যখন শুনিলাম,—'তুমি যুদ্ধ করিলে আমি যুদ্ধ করিব না'—ভীষ্মকে এই কথা বলিয়া কর্ণ সৈন্যদল পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদাশ্রৌষং বাসুদেবার্জ্জুনৌ তৌ তথা ধনুর্গাণ্ডীবমপ্রমেয়ম্।
ত্রীণ্যুগ্রবীর্য্যাণি সমাগতানি তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়॥

যখন শুনিলাম,—বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও অপ্রমেয় গাণ্ডীব ধনু,—এই তিন উগ্রবীর্য্য পদার্থ একত্র মিলিত হইয়াছে; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদাশ্রৌষং কশ্মলেনাভিপন্নে রথোপস্থে সীদমানেঽর্জ্জুনে বৈ।
কৃষ্ণং লোকান্ দর্শয়ানং শরীরে তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়॥

যখন শুনিলাম,—রথস্থ অর্জ্জুন মোহাভিভূত অবসন্ন হইলে, কৃষ্ণ তাহাকে স্ব-শরীরে চতুর্দ্দশ ভুবন দর্শন করাইয়াছেন; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদাশ্রৌষং ভীষ্মমমিত্রকর্শনং নিঘ্নন্তমাজাবযুতং রথানাম্।
নৈষাং কশ্চিদ্বধ্যতে খ্যাতরূপস্তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়॥

যখন শুনিলাম,—অমিত্র-নাশক ধার্ম্মিক-প্রবর ভীষ্ম, রণস্থলে প্রতিদিন অযুত রথী বিনাশ করিতেছেন; অথচ, তিনি সেই দুর্দ্ধর্ষ পাণ্ডবপক্ষের কোনও এক বিখ্যাত ব্যক্তির বিনাশ সাধন করিতে সমর্থ হন নাই; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদাশ্রৌষঞ্চাপগেয়েন সংখ্যে স্বয়ং মৃত্যুং বিহিতং ধার্ম্মিকেণ।
তচ্চাকার্ষুঃ পাণ্ডবেয়াঃ প্রহৃষ্টাস্তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়॥

যখন শুনিলাম,—ধার্ম্মিক-প্রবর ভীষ্ম যুদ্ধস্থলে বিহিত ভাবে আপনার মৃত্যুর উপায় আপনিই পাণ্ডবগণকে বলিয়া দিলেন, এবং পাণ্ডবগণ হৃষ্টান্তঃকরণে ভীষ্ম-বধে সেই উপায় অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হইল; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদাশ্রৌষং ভীষ্মমত্যন্তশূরং হতং পার্থেনাহবেষ্বপ্রধৃষ্যম্।
শিখণ্ডিনং পুরতঃ স্থাপয়িত্বা তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥

যখন শুনিলাম,—অর্জ্জুন, শিখণ্ডীকে সম্মুখে স্থাপন করিয়া, রণ-দুর্দ্ধর্ষ মহাবীর ভীষ্মকে নিস্তেজ ও আহত করিয়াছে; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদাশ্রৌষং শরতল্পে শয়ানং বৃদ্ধং বীরং সাদিতং চিত্রপুঙ্খৈঃ।
ভীষ্মং কৃত্বা সোমকানল্পশেষাংস্তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥

যখন শুনিলাম,—সোমক সৈন্য অল্পাবশিষ্ট করিয়া, স্বয়ং শিলীমুখ-সমূহে ক্ষতবিক্ষত হইয়া, ভীষ্মদেব শর-শয্যায় শয়ন করিয়াছেন; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদাশ্রৌষং শান্তনবে শয়ানে পানীয়ার্থে চোদিতেনার্জ্জুনেন।
ভূমিং ভিত্ত্বা তর্পিতং তত্র ভীষ্মং তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥

যখন শুনিলাম,—মহাবীর ভীষ্ম, শর-তল্পে শয়ন করিয়া, পিপাসা-নিবারণার্থ অর্জ্জুনকে জল আনয়নের জন্য আজ্ঞা করিলেন; এবং অর্জ্জুন ভূমিতল ভেদ করিয়া, জল দ্বারা তাঁহার পরিতৃপ্তি-সাধন করিল; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদা বায়ুশ্চন্দ্রসূর্য্যৌ চ যুক্তৌ কৌন্তেয়ানামনুলোমা জয়ায়।
নিত্যাং ক্রান্তান শ্বাপদা ভীষয়ন্তি তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥

যখন শুনিলাম,—বায়ু, ইন্দ্র ও সূর্য্য পাণ্ডবদিগের জয়ের নিমিত্ত অনুকূল এবং শ্বাপদগণ নিত্য আমাদিগকে বিভীষিকা দেখাইতেছে; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদা দ্রোণো বিবিধানস্ত্রমার্গান্ নিদর্শয়ন্ সমরে চিত্রযোধী।
ন পাণ্ডবান্ শ্রেষ্ঠতরান্নিহন্তি তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥

যখন শুনিলাম,—বিচিত্রবীর্য্য রণ-বিশারদ দ্রোণাচার্য্য, সমর-ভূমিতে নানাবিধ অস্ত্র-প্রয়োগ-কৌশল প্রদর্শন করিয়াও, পাণ্ডবপক্ষীয় শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তিদিগকে আদৌ বিনাশ করিতে সমর্থ হন নাই; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদাশ্রৌষং চাস্মদীয়ান্মহারথান্ ব্যবস্থিতানর্জ্জুনস্যান্তকায়।
সংশপ্তকান্নিহতানর্জ্জুনেন তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥

যখন শুনিলাম,—অস্মৎ-পক্ষীয় সংশপ্তক নামক সৈন্যগণ অর্জ্জুন-বধের নিমিত্ত ব্যূহ রচনা করিয়া, আপনারাই নিহত হইয়াছে; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদাশ্রৌষং ব্যূহমভেদ্যমন্যৈর্ভারদ্বাজেনাত্তশস্ত্রেণ গুপ্তম্।
ভিত্ত্বা সৌভদ্রং বীরমেকং প্রবিষ্টং তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥

যখন শুনিলাম,—অদ্বিতীয় বীর অভিমন্যু, দ্রোণাচার্য্য-পরিরক্ষিত এবং অন্যের অভেদ্য চক্রব্যূহ ভেদ করিয়া, তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদাভিমন্যুং পরিবার্য্য বালং সর্ব্বে হত্বা হৃষ্টরূপা বভূবুঃ।
মহারথাঃ পার্থমশক্নুবন্তস্তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥

যখন শুনিলাম,—মহারথ যোদ্ধৃগণ, অর্জ্জুনকে বধ করিতে না পারিয়া, বালক অভিমন্যুকে বধ করিয়া, প্রফুল্ল-হৃদয় হইয়াছে; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদাশ্রৌষমভিমন্যুং নিহত্য হর্ষান্মূঢ়ান্ ক্রোশতো ধার্ত্তরাষ্ট্রান্।
ক্রোধাদুক্তং সৈন্ধবে চার্জ্জুনেন তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়॥

যখন শুনিলাম,—অভিমন্যুকে বধ করিয়া বীরগণ হর্ষ-বিমূঢ় হইলে, অর্জ্জুন ক্রোধাভিভূত হইয়া, জয়দ্রথ-বধে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে; হে সঞ্জয় আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদাশ্রৌষং সৈন্ধবার্থে প্রতিজ্ঞাং প্রতিজ্ঞাতাং তদ্বধায়ার্জ্জুনেন।
সত্যাং তীর্ণাং শত্রুমধ্যে চ তেন তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়॥

যখন শুনিলাম,—অর্জ্জুন, জয়দ্রথ-বধের নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা করিয়া, শত্রুমধ্যে সেই সত্য-প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছে; হে সঞ্জয় আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদাশ্রৌষং শ্রান্তহয়ে ধনঞ্জয়ে মুক্ত্বা হয়ান্ পায়য়িত্বোপবৃত্তান।
পুনর্যুক্ত্বা বাসুদেবং প্রয়াতং তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়॥

যখন শুনিলাম,—ধনঞ্জয়ের অশ্বগণ শ্রান্ত হইলে, কৃষ্ণ তাহাদিগের বন্ধন-মুক্ত করিয়া, জল পান করাইয়া, পুনর্ব্বার রথযোজনা করেন; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই॥

যদাশ্রৌষং বাহনেষক্ষমেষু রথোপস্থে তিষ্ঠতা পাণ্ডবেন।
সর্ব্বান যোধান্ বারিতানর্জ্জুনেন তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়॥

যখন শুনিলাম,—অশ্বগণ অক্ষম হইলে, অর্জ্জুন একাকী রথোপরি থাকিয়া, অস্মৎ-পক্ষীয় সমুদায় বীরগণকে পরাভূত করিয়াছে; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই॥

যদাশ্রৌষং নাগবলৈঃ সুদুঃসহং দ্রোণানীকং যুযুধানং প্রমথ্য।
যাতং বার্ষ্ণেয়ং যত্র তৌ কৃষ্ণপার্থৌ তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়॥

যখন শুনিলাম,—বৃষ্ণিবংশোদ্ভব সাত্যকি, হস্ত্যারূঢ় সৈন্য দ্বারা দ্রোণ-সৈন্য ভেদ করিয়া, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের নিকট গিয়াছে; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদাশ্রৌষং কর্ণমাসাদ্য মুক্তং বধাদ্ভীমং কুৎসয়িত্বা বচোভিঃ।
ধনুষ্কোট্যাতুদ্য কর্ণেন বীরং তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়॥

যখন শুনিলাম,—কর্ণ, ভীমকে বধ না করিয়া ধনুঃ-কোটি দ্বারা পীড়িত করতঃ, 'মূর্খ ও ঔদরিক" ইত্যাদি বাক্যে তিরস্কার পূর্ব্বক ছাড়িয়া দিয়াছে, এবং ভীম অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়া আপনার প্রাণ-রক্ষা করিয়াছে; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই॥

যদা দ্রোণঃ কৃতবর্ম্মা কৃপশ্চ কর্ণো দ্রৌণির্মদ্ররাজশ্চ শূরঃ।
অমর্ষয়ন্ সৈন্ধবং বধ্যমানং তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়॥

যখন শুনিলাম,—দ্রোণ, কৃতবর্ম্মা, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা ও বীরবর মদ্ররাজ প্রতিকার করিতে না পারিয়া, জয়দ্রথ-বধ সহ্য করিয়াছেন; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদাশ্রৌষং দেবরাজেন দত্তাং দিব্যাং শক্তিং ব্যংসিতাং মাধবেন।
ঘটোৎকচে রাক্ষসে ঘোররূপে তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়॥

যখন শুনিলাম,—মাধব, ইন্দ্রদত্ত দিব্যশক্তি, ঘোররূপী ঘটোৎকচ রাক্ষসের বধ-নিমিত্ত প্রযুক্ত করাইয়া ব্যর্থ করিয়াছেন; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদাশ্রৌষং কর্ণঘটোৎকচাভ্যাং যুদ্ধে মুক্তাং সূতপুত্রেণ শক্তিম্।
যস্যা বধ্যঃ সমরে সব্যসাচী নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥

যখন শুনিলাম,—কর্ণ, অর্জ্জুন-বধের নিমিত্ত সংগৃহীত সেই সংহারক দিব্য-শক্তি ঘটোৎকচের যুদ্ধে প্রয়োগ করিয়াছে; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদাশ্রৌষং দ্রোণমাচার্য্যমেকং ধৃষ্টদ্যুম্নেনাভ্যতিক্রম্য ধর্ম্মম্।
রথোপস্থে প্রায়গতং বিশস্তং তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥

যখন শুনিলাম,—দ্রোণ, রথোপরি অস্ত্রত্যাগে প্রায়োপবিষ্ট হইলে, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া, তাঁহাকে বিনষ্ট করিয়াছে; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদাশ্রৌষং দ্রৌণিনা দ্বৈরথস্থং মাদ্রীসুতং নকুলং লোকমধ্যে।
সমং যুদ্ধে মণ্ডলেভ্যশ্চরন্তং তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥

যখন শুনিলাম,—মাদ্রী-তনয় নকুল, যুদ্ধ-মণ্ডলে ভ্রমণ করতঃ, অশ্বত্থামার সহিত সমানরূপে দ্বৈরথ যুদ্ধ করিয়াছে; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদা দ্রোণে নিহতে দ্রোণপুত্রো নারায়ণং দিব্যমস্ত্রং বিকুর্ব্বন্।
নৈষামন্তং গতবান্ পাণ্ডবানাং তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥

যখন শুনিলাম,—দ্রোণাচার্য্য হত হইলে, অশ্বত্থামা নারায়ণী অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াও, পাণ্ডবদিগকে বিনাশ করিতে পারে নাই; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদাশ্রৌষং ভীমসেনেন পীতং রক্তং ভ্রাতুর্যুধি দুঃশাসনস্য।
নিবারিতং নান্যতমেন ভীমং তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥

যখন শুনিলাম,—রণস্থলে ভীমসেন, দুঃশাসনের শোণিত পান করিয়াছে, এবং তাহাকে অন্য কেহই নিবারণ করিতে পারেন নাই; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদাশ্রৌষং কর্ণমত্যন্তশূরং হতং পার্থেনাহবেষ্বপ্রধৃষ্যম্।
তস্মিন্ ভ্রাতৄণাং বিগ্রহে দেবগুহ্যে তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥

যখন শুনিলাম,—সেই দৈব-নিয়োজিত ভ্রাতৃ-যুদ্ধে, অর্জ্জুন অস্মৎ-পক্ষীয় রণ-দুর্দ্ধর্ষ মহাবীর কর্ণের বিনাশ-সাধন করিয়াছে; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদাশ্রৌষং দ্রোণপুত্রঞ্চ শূরং দুঃশাসনং কৃতবর্ম্মাণমুগ্রম্।
যুধিষ্ঠিরং ধর্ম্মরাজং জয়ন্তং তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥

যখন শুনিলাম,—ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, বীরবর দ্রোণপুত্র ও দুঃশাসন এবং উগ্রস্বভাব কৃতবর্ম্মাকে জয় করিয়াছেন; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদাশ্রৌষং নিহতং মদ্ররাজং রণে শূরং ধর্ম্মরাজেন সূত।
সদা সংগ্রামে স্পর্দ্ধতে যস্তু কৃষ্ণং তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥

যখন শুনিলাম,—যে মদ্ররাজ, কৃষ্ণের সহিত সংগ্রাম করিতে স্পর্দ্ধা করিতেন, সেই রণবীর মদ্ররাজ যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদাশ্রৌষং কলহদ্যূতমূলং মায়াবলং সৌবলং পাণ্ডবেন।
হতং সংগ্রামে সহদেবেন পাপং তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥

যখন শুনিলাম,—পাণ্ডু-পুত্র সহদেব, অক্ষক্রীড়া ও কলহের প্রধান কারণ পাপিষ্ঠ মায়াবী শকুনিকে সংগ্রামে সংহার করিয়াছে; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদাশ্রৌষং শ্রান্তমেকং শয়ানং হ্রদং গত্বা স্তম্ভয়িত্বা তদম্ভঃ।
দুর্য্যোধনং বিরথং ভগ্নশক্তিং তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়॥

যখন শুনিলাম,—হতসৈন্য সহায়-শূন্য হইয়া, হীনবল বিরথ শ্রান্ত দুর্য্যোধন হ্রদে গিয়া জলস্তম্ভ করিয়া একাকী রহিয়াছে; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদাশ্রৌষং পাণ্ডবাংস্তিষ্ঠমানান্ গত্বা হ্রদে বাসুদেবেন সার্দ্ধং।
অমর্ষণং ধর্ষয়তঃ সুতং মে তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়॥

যখন শুনিলাম,—কৃষ্ণের সহিত হ্রদ-সমীপে গমন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া, পাণ্ডবগণ মৎপুত্র দুর্য্যোধনকে তিরস্কার করিতেছে; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদাশ্রৌষং বিবিধাংশ্চিত্রমার্গান্ গদাযুদ্ধে মণ্ডলশশ্চরন্তম্।
মিথ্যাহতং বাসুদেবস্য বুদ্ধ্যা তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়॥

যখন শুনিলাম,—গদাযুদ্ধে সুকৌশলী দুর্য্যোধন, মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতে করিতে, বাসুদেবের পরামর্শে অন্যায়রূপে আহত হইয়াছে; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদাশ্রৌষং দ্রোণপুত্রাদিভিস্তৈর্হতান্ পঞ্চালান্ দ্রৌপদেয়াংশ্চ সুপ্তান্।
কৃতং বীভৎসময়শস্যঞ্চ কর্ম্ম তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়॥

যখন শুনিলাম,—অশ্বত্থামা প্রভৃতি কতিপয় বীরপুরুষেরা সমবেত হইয়া, রজনীতে নিদ্রিত পাঞ্চালগণকে ও দ্রৌপদীর প্রসুপ্ত পুত্রদিগকে বিনাশ করিয়া, অতি ঘৃণিত ও অযশস্কর বীভৎস কর্ম্ম করিয়াছে; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদাশ্রৌষং ভীমসেনানুযাতেনাশ্বত্থাম্না পরমাস্ত্রং প্রযুক্তম্।
ক্রুদ্ধেনৈষীকমবধীদ্‌যেন গর্ভং তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়॥

যখন শুনিলাম,—মহাপরাক্রম ভীম, পুত্রবধে ক্রোধান্ধ হইয়া, দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার অনুসরণ করিয়াছে, এবং অশ্বত্থামা মন্ত্রঃপূত ঐষীক নামক পরমাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া উত্তরার গর্ভ বিনাশ করিয়াছে; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদাশ্রৌষং ব্রহ্মশিরোঽর্জ্জুনেন স্বস্তীত্যুক্ত্বাস্ত্রমস্ত্রেণ শান্তম্।
অশ্বত্থাম্না মণিরত্নঞ্চ দত্তং তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়॥

যখন শুনিলাম,—অশ্বত্থামা, অর্জ্জুন-বধার্থ ব্রহ্মশিরো নামক অব্যর্থ অস্ত্র প্রয়োগ করিলে, অর্জ্জুন 'স্বস্তি' এই বলিয়া আপনার অস্ত্র দ্বারা সেই অস্ত্র নিবারণ করিয়াছে, এবং অশ্বত্থামা মনি-রত্ন দান করিয়াছে; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে মহাভারত।

রামায়ণের ন্যায়, মহাভারতের প্রসঙ্গও ভিন্ন ভিন্ন পুরাণোপপুরাণে দৃষ্ট হয়; অপিচ, মহাভারত অবলম্বনেও যে অসংখ্য গ্রন্থ—কাব্য, নাটক, উপাখ্যান প্রভৃতি—রচিত হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য; তবে, সর্ব্বত্র যে ধারাবাহিক-রূপে মহাভারতের কথা পরিবর্ণিত হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। শ্রীমদ্ভাগবতে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যলাভ-প্রসঙ্গে একটী মাত্র অধ্যায় দেখিতে পাই; এবং অশ্বত্থামার দণ্ড-কথা ও কুন্তী-স্তব অধ্যায়-দ্বয়ে সংক্ষেপে মহাভারতের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। দেবী-ভাগবতের চারিটী অধ্যায় মহাভারত-প্রসঙ্গে নিয়োজিত। তাহাতে ভীষ্ম, কর্ণ, ও পরীক্ষিতের উৎপত্তি এবং পাণ্ডবগণের বনবাস-কালে জয়দ্রথ কর্তৃক দ্রৌপদী-

স্মরণ প্রসঙ্গ লিখিত আছে। অগ্নি-পুরাণের তিনটী মাত্র অধ্যায়ে, একোনসপ্ততি শ্লোকে, আদিপর্ব্ব হইতে স্বর্গারোহণ পর্ব্ব পর্য্যন্ত অষ্টাদশ পর্ব্ব বিবৃত। শিব-পুরাণের চারিটী অধ্যায়ে মহাভারত-কথা আছে; কিন্তু মূল মহাভারতের সহিত তাহার ঘটনাবলীর ধারাবাহিক সম্বন্ধ নাই। দুর্ব্বাসার পারণ, ইন্দ্রকিল পর্ব্বতে অর্জ্জুনের তপস্যা ও ইন্দ্র-সমাগম, ভিল্লরূপী শিবের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ ও শিবের বরদান,—শিব-পুরাণে মহাভারত-সংক্রান্ত এই কয়েকটী মাত্র প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয়। মহাভারত-বর্ণিত কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধের মূল ঘটনা—পুরাণাদিতে অন্যত্র আর বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে, মহাভারতে প্রসঙ্গতঃ যে সকল উপাখ্যান উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা প্রায় সকল পুরাণেই দেখিতে পাই। সাবিত্রী-সত্যবানের, নল-দময়ন্তীর, হরিশ্চন্দ্রের, শ্রীবৎস্যের এবং শকুন্তলার উপাখ্যান—মহাভারতে এবং অন্যান্য পুরাণে কতকটা অভিন্ন-ভাবেই প্রকটিত আছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে কুরু-পাণ্ডবের মূল ঘটনা বর্ণিত নাই বটে; কিন্তু মহাভরতের আদি পর্ব্বে জন্মেজয়ের সর্প-যজ্ঞ ও জরৎকারুর উপাখ্যান যাহা দেখিতে পাই, তাহাই পল্লবিত হইয়া সেখানে বিরাজ করিতেছে। বামন-পুরাণে চিত্রাঙ্গদা নাম্নী এক গন্ধর্ব্ব কন্যার বিবাহ-বিবরণ বর্ণিত আছে বটে; কিন্তু সে বিবরণের সহিত মহাভারতের চিত্রাঙ্গদার কোনই সাদৃশ দেখা যায় না। মহাভারতোক্ত চিত্রাঙ্গদা—মণিপুর-রাজকন্যা; অর্জ্জুনের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। কিন্তু বামন-পুরাণের চিত্রাঙ্গদা আপনাকে বিশ্বকর্ম্মার কন্যা বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, এবং সুরথের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। এইরূপ নামের মিল আছে, অথচ ঘটনার মিল নাই;—এমন অনেক বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়। মহাকবি কালিদাসের অধিকাংশ কাব্যের মূল—মহাভারত। শ্রীহর্ষ, ভারবী, মাঘ প্রভৃতি ভারতের বরেণ্য কোবিদগণ—কে না মহাভারতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন? মহাভারতের অনুসরণে, ভারত-সংহিতা নামে, মহর্ষি জৈমিনি এক মহাভারত প্রণয়ন করিয়াছিলেন। জৈমিনি-ভারত নামে তাহা প্রসিদ্ধ। সেই মহাভারতের সকল অংশ এখন পাওয়া যায় না; জৈমিনি-ভারত বলিয়া এখন যাহা প্রচারিত, তাহাতে মহাভারতের অশ্বমেধ-পর্ব্ব সমধিক বিস্তৃত ভাবে, নুতন নুতন ঘটনাবলীর সমাবেশে, লিখিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় এখন অবশ্য গদ্যে পদ্যে নানা আকারেই মহাভারত প্রচারিত; কিন্তু অনধিক তিন শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে যাহা মহাভারত নামে বঙ্গদেশে প্রচারিত আছে, এবং পূর্ব্বে যাহা বহু গৃহে সমাদরে সম্পূজিত হইত, সে মহাভারত—কাশীরাম দাসের মহাভারত। এক দিকে যেমন কৃত্তিবাসের রামায়ণ, অন্য দিকে তেমনি কাশীরাম দাসের মহাভারত,—বাঙ্গালা-ভাষার এই দুই অতুল অক্ষয় সম্পৎ। কাশীরাম দাসের মহাভারত বেদব্যাস-প্রণীত অষ্টাদশ-পর্ব্বাত্মক মহাভারতেরই অনুসরণে লিখিত হয়। বাল্মীকির রামায়ণের সহিত কৃত্তিবাসের রামায়ণের যতটা অসামঞ্জস্য দেখিয়াছিলাম, বেদব্যাসের মহাভারতের সহিত কাশীরাম দাসের মহাভারতের তাদৃশ অসামঞ্জস্য দেখা যায় না; পরন্তু, অনেক স্থলে মূল সংস্কৃতের সহিত কাশীরামের পয়ারাদির ভাব ও ভাষার অভিন্নতাই দৃষ্ট হয়। তবে, কাশীরামের মহাভারত, বেদব্যাসের মহাভারত হইতে যে সংক্ষিপ্ত, তাহা বলাই বাহুল্য। উভয় গ্রন্থের অসামঞ্জস্য—প্রধানতঃ পর্ব্ব-বিভাগে। প্রথম নয় পর্ব্বের নাম—

বেদব্যাসে ও কাশীদাসে একই দৃষ্ট হয়। বেদব্যাসের দশম পর্ব্বের নাম—সৌপ্তিক; কাশীদাসের দশম পর্ব্ব—গদা, একাদশ—সৌপ্তিক। বেদব্যাসের একাদশ পর্ব্বের নাম—স্ত্রী; কাশীরামের ত্রয়োদশে—নারী। বেদব্যাসের দ্বাদশে শান্তি, ত্রয়োদশে অনুশাসন, চতুর্দ্দশে অশ্বমেধ, পঞ্চদশে আশ্রমবাসিক, ষোড়শে মৌষল, সপ্তদশে মহাপ্রস্থানিক, অষ্টাদশে স্বর্গা-রোহণ। কাশীরামের দ্বাদশে ঐষীক, চতুর্দ্দশে শান্তি, পঞ্চদশে অশ্বমেধ, ষোড়শে আশ্রমিক, সপ্তদশে মুষল এবং অষ্টাদশে স্বর্গারোহণ। বেদব্যাসের অনুশাসন এবং মহাপ্রস্থানিক পর্ব্বের নাম—কাশীরাম-দাসের মহাভারতে নাই; অথচ গদা ও ঐষীক পর্ব্ব, যাহা বেদব্যাসে নাই, কাশীরাম দাসে আছে। মোটের উপর কাশীরামের মহাভারত—বেদব্যাসের মহা-ভারতের সংক্ষিপ্তসার, তাহাতে সন্দেহ নাই; অথচ, অনেক বিষয় বেদব্যাসে নাই, কিন্তু কাশীরাম দেখিতে পাই; আবার অনেক বিষয় বেদব্যাসে আছে, কিন্তু কাশীরামে নাই। ভীষ্ম-পর্ব্বান্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পর্ব্বাধ্যায় প্রায় দেড় শত ছত্রের মধ্যে (প্রায় ৭৫টী পয়ারে) কাশীরাম শেষ করিয়াছেন; অথচ, বিরাট গৃহে গোধন-রক্ষার্থ অর্জ্জুন ও দুর্য্যোধনের যুদ্ধের সময়, কাশীরাম রণভূমে চামুণ্ডার আবির্ভাব করাইয়াছেন, কিন্তু বেদব্যাসে তাহার নাম-গন্ধও নাই। কাশীরাম লিখিয়াছেন,—"রণ দেখি কৌতুকে কালীর আগুসার।

> ···আইল চামুণ্ডা, করে খর খাণ্ডা, গলে দোলে মুণ্ডমালা।
> লহ-লহ জিহ্বা, বিদ্যুতের প্রভা, ঘন করাল বদনা॥
> ···খর্পর ভরিয়া, উদর পূরিয়া, করিয়া শোণিত পান।
> অর্জ্জুনে কল্যাণ, করি নিজস্থান, কালী করিল পয়ান॥"

এইরূপ, আরম্ভে, মধ্যে এবং শেষে—যেখানেই মিলাইয়া দেখিবেন, অনেক স্থলেই অমিল দেখিতে পাওয়া যাইবে। কোন কোনও স্থলে আবার বেদব্যাসের মহাভারতের সহিত কাশীরামের মহাভারতের অপূর্ব্ব সামঞ্জস্যও দৃষ্ট হয়। এমন কি, তত্তৎ স্থলে মূল মহাভারত সম্মুখে রাখিয়া কাশীরাম তাহার অনুবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। বেদব্যাসের আদি-পর্ব্বের অন্তর্গত সম্ভব-পর্ব্বাধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্রকে বিদুর বলিতেছেন,—

> "ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ। গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ॥
> স তথা বিদুরেণোক্তস্তৈশ্চ সর্ব্বৈর্দ্বিজোত্তমৈঃ। ন চকার তথা রাজা পুত্রস্নেহসমন্বিতঃ॥"

কাশীরাম দাসের মহাভারতে এই শ্লোক দুইটী পয়ার-ছন্দে এইরূপে লিখিত হইয়াছে,—

> কুলের কারণ রাজা ত্যজি একজন। কুলত্যাগ করি রাজা গ্রামের কারণ॥
> গ্রাম ত্যজি শুন রাজা জনপদ হিতে। পৃথিবীকে ত্যজি রাজা আপনা রাখিতে॥
> হেন নীতি আছে রাজা কহে পূর্ব্বাপর। জ্যেষ্ঠ পুত্র মারি বংশ রাখ নৃপবর॥
> এতেক বচন যদি বিদুর বলিল। পুত্রস্নেহে ধৃতরাষ্ট্র শুনি না শুনিল॥

উদ্ধৃত পয়ারের "হেন নীতি" হইতে "নৃপবর" পর্য্যন্ত অংশ মূলে নাই। তদ্ভিন্ন অপরাংশে মিল দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ, অন্যান্য স্থানেও অনেক সামঞ্জস্য আছে। কাশীরাম ভিন্ন, বঙ্গদেশে বঙ্গভাষায় আরও বহু কবি মহাভারত অনুবাদের চেষ্টা পাইয়াছিলেন। বিজয় পণ্ডিত, সঞ্জয়, কবিচন্দ্র, পরিশেষে কবি রাজকৃষ্ণ রায়, মহাভারতের পদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন। মুসলমান লেখকগণের মধ্যেও মহাভারতের অনুবাদ-কর্ত্তার নাম দৃষ্ট হয়।

বাঙ্গালা দেশ ভিন্ন, ভারতের অন্যান্য স্থানেও মহাভারত নানা আকারে নানা ভাষায় গদ্যে পদ্যে প্রচারিত আছে।

মহাভারতের এবং পুরাণ-সমূহের এক এক অংশের বর্ণিত বিষয়ের সহিত অনেক সময় অপর অংশের অসামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়। প্রধানতঃ, সেই কারণে প্রক্ষিপ্ত-প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়া থাকে। প্রতি পুরাণোপপুরাণের প্রক্ষিপ্ত-তত্ত্ব আলোচনা করা এস্থলে সম্ভবপর নহে; মহাভারতের ন্যায় বিরাট্ গ্রন্থের প্রক্ষিপ্ত-তত্ত্ব আলোচনাও এই ক্ষুদ্র প্রসঙ্গের আয়ত্তাধীন নহে। তথাপি, কি কারণে প্রক্ষিপ্ত-প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়, এবং সাধারণতঃ মহাভারতের কোন্ কোন্ অংশকে পণ্ডিতগণ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন,—এস্থলে তাহারই একটু আভাস প্রদান করিব। মহাভারতের প্রক্ষিপ্ত-সম্বন্ধে প্রধানতঃ চারিটি কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। প্রথম,—মহাভারতের আদিপর্ব্বে পর্ব্বাধ্যায়-পর্ব্ব-সংগ্রহে মহাভারতের বর্ণিতব্য বিষয়-সমূহের যে অনুক্রমণি বা সূচীপত্র আছে, তাহার সহিত কোনও কোনও স্থলের বর্ণিত বিষয়ের মিল নাই। পর্ব্বাধ্যায়-সংগ্রহে অনুগীতা ও ব্রাহ্মণ-গীতার নাম নাই; কিন্তু আশ্বমেধিক পর্ব্বে ঐ দুই গীতায় ছত্রিশটি অধ্যায় অধিকার করিয়া আছে। এতাদৃশ সুবৃহৎ দুইটী বিষয় অনুক্রমণিকায় উল্লিখিত হইল না কেন,—তাহার কি কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারি? দ্বিতীয়,—শ্লোক-সংখ্যা। লিখিত আছে,—জন্মেজয়ের সর্পসত্রে পঠিত মহাভারত লক্ষ-শ্লোকাত্মক এবং সেই মহাভারতই এখন প্রচলিত। বলা বাহুল্য, কোন্ পর্ব্বে কত শ্লোক আছে, পর্ব্বাধ্যায়-সংগ্রহে তাহা উক্ত হইয়াছে। কিন্তু তদনুসারে গণনায় লক্ষ শ্লোক পাওয়া যায় না; তাহাতে শ্লোক-সংখ্যা দাঁড়ায়,—৮৪ হাজার ৮ শত ৩৬টি মাত্র। ইহাতে লক্ষ শ্লোক পূরিল না বটে; কিন্তু ইহার পর, হরিবংশের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়। পর্ব্বাধ্যায়-সংগ্রহেই প্রকারান্তরে লিখিত আছে,—হরিবংশের দ্বাদশ-সহস্র শ্লোক মহাভারতেরই অন্তর্ভুক্ত। যাহা হউক, তাহাতেও শ্লোক-সংখ্যা পূর্ণ হয় না। অথচ, অধুনা-প্রচলিত মহাভারতের শ্লোক-সংখ্যা গণনা করিয়া, পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করেন, —হরিবংশ সহ মহাভারতের শ্লোক-সংখ্যা এখন ১ লক্ষ ৭ হাজার ৩ শত ৯০টী। এইরূপ অনুক্রমণিকা অধ্যায় দেড় শত শ্লোকে সম্পূর্ণ হইয়াছিল বলিয়া মহাভারতে উক্ত আছে; অথচ, গণনায় দুই শত বায়াত্তর শ্লোক বিদ্যমান। তাহা হইলেই বুঝা যায় না কি,—পরবর্ত্তি-কালে কিছু-না-কিছু নূতন সংযোগ-বিয়োগ ঘটিয়াছে? তৃতীয়,—মহাভারতের সকল অংশ যে বেদব্যাসের রচনা নহে, আদিপর্ব্বের প্রথম কয়েকটী অধ্যায় হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। নৈমিষারণ্যে সৌনকাদি ঋষিগণের প্রশ্নের উত্তরে লোমহর্ষণ-পুত্র সূত-কুল-নন্দন উগ্রশ্রবা মহাভারত বর্ণন করিতেছেন,—এইরূপ লিখিত আছে। সে স্থলে আরও দৃষ্ট হয়, প্রশ্নকর্ত্তা মহর্ষিগণ বলিতেছেন,—"মহর্ষি দ্বৈপায়ন যে পুরাণ রচনা করিয়াছিলেন, সর্পসত্র-কালে মহারাজ জন্মেজয়ের নিকট বৈশম্পায়ন মুনি যে মহাভারত কীর্ত্তন করেন,—বেদব্যাস-প্রণীত সেই ভারত-সংহিতা আমরা শ্রবণ করিতে বাসনা করি।" এইরূপে মহাভারতের নানা স্থানে সূত, সৌনক, উগ্রশ্রবা, জন্মেজয় প্রভৃতির যে প্রশ্নোত্তর দৃষ্ট হয়, তত্তাবৎ বেদব্যাসের রচনা বলিয়া মনে হইতে পারে না। চতুর্থ,—চরিত্রগত

অসঙ্গতি। বেদব্যাসের ন্যায় সুকবি আপন গ্রন্থবর্ণিত চরিত্র-সমূহের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারিবেন না—ইহা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিতে পারি? যুধিষ্ঠিরকে তিনি সত্যনিষ্ঠার আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তাঁহার মুখ দিয়া গুরুহত্যা-মূলক মিথ্যা-বাক্য উচ্চারণ করাইয়াছেন। ইহাতে চরিত্রের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই। এইরূপে মহাভারতের মধ্যে অনেক অংশ পরিবর্ত্তি-কালে সংযোজিত হইয়াছে, এবং তাহাতে মহাভারতের বর্ণিতব্য মূল বিষয়—কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ-কাহিনী—নানারূপে পল্লবিত হইয়া পড়িয়াছে। আধুনিক পণ্ডিতগণের ইহাই সিদ্ধান্ত। মহাভারত বা পুরাণাদিতে, প্রক্ষিপ্ত বা বেদব্যাসের পরবর্ত্তি-কালের রচনা যে নাই—এমন কথা আমরাও অবশ্য বলি না। তবে, প্রক্ষিপ্ত-বিচারে সচরাচর যেভাবে চতুর্ব্বিধ যুক্তির অবতারণা হয়, তদ্বিষয়ে আমাদের মতান্তর আছে। দ্রোণ-বধে মিথ্যা কথা বলায়, যুধিষ্ঠিরের চরিত্রে দোষ বর্ত্তিয়াছে; সুতরাং উহা প্রক্ষিপ্ত,—এবংবিধ উক্তির সহিত আমরা কখনই একমত হইতে পারি না। এ বিষয়ে দ্বিবিধ উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। প্রথমতঃ, মহাভারতের ঐতিহাসিকত্ব যদি স্বীকার করি, তাহা হইলে, যাহা ঘটিয়াছিল—মহাভারতকার তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন মানিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। সেরূপ ক্ষেত্রে, ঐ অংশ বাদ দিলে ইতিহাসে ভুল থাকিয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, ঐ অংশে কবি-প্রতিভার খর্ব্ব হওয়া দূরে থাক, বরং ঔজ্জ্বল্যই বৃদ্ধি পাইয়াছে। 'যুধিষ্ঠির চির-সত্যবাদী, তিনি কখনও মিথ্যা কথা কহেন নাই'—কেবল এই মাত্র দেখাইয়া গেলে, তাঁহার সে সত্যবাদিত্ব যতটা প্রাণস্পর্শী হইত; দ্রোণ-বধ-প্রসঙ্গে জীবনে একবার মাত্র মিথ্যা বলাইয়া, তাহার পরিণাম-চিত্র অঙ্কিত করায়, সত্যের জ্যোতিঃ অধিকতর ঔজ্জ্বল্যসম্পন্ন হইয়াছে। যে অবস্থায়, যে ঘটনা-স্রোতে ফেলিয়া, যুধিষ্ঠিরের মুখ দিয়া কবি অশ্বত্থামা-বধ-বার্ত্তা প্রচার করাইয়াছেন, যদি কল্পনা বলিতে চাও, তাহাও উচ্চ কবি-কল্পনারই পরিচায়ক। এই ঘটনায় যুধিষ্ঠিরের চিত্রও যেরূপ প্রস্ফুট হইয়াছে, লোক-শিক্ষার পক্ষেও উহা তদনুরূপ সহায়তা করিতেছে। তার পর, যুধিষ্ঠির মনুষ্য; কবি সেই মনুষ্য-চিত্রই অঙ্কিত করিয়াছেন! মনুষ্য-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন বলিয়াও তিনি দেখাইয়াছেন, যুধিষ্ঠিরের ন্যায় জিতেন্দ্রিয় সত্যনিষ্ঠ মনুষ্যকেও কিরূপ-ভাবে অবস্থার দাস হইতে হয়। তাহা দেখিয়া, অপরে সাবধান হইতে পারিবে—ইহাও হয় তো কবির লক্ষ্য। তার পর, ঐ অংশের সহিত মহাভারতের সম্বন্ধ ওতঃপ্রোত বিজড়িত। উহাকে বাদ দিতে হইলে, মহাভারতের সারভূত অনেক অংশ বাদ দিতে হয়। সুতরাং

"তম তথা ভয়ে মগ্নো জয়ে শক্তো যুধিষ্ঠিরঃ। অব্যক্তমব্রবীদ্রাজন্ হতঃ কুঞ্জর ইত্যুত॥"

এ অংশ কখনই মিথ্যা বা প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে না। অবশেষে, শ্লোক-সংখ্যা বিষয়ক সন্দেহ। এ বিষয়েও নানা কথা আছে। প্রথমতঃ শ্লোক-গণনায় নানা পদ্ধতি অবলম্বিত হয়। কেহ "জন্মেজয় উবাচ" এই বাক্যটীকেও একটী শ্লোক বলিয়া গণনা করেন; কেহ বা দুই ছত্র কবিতা ভিন্ন অন্য কথাকে শ্লোক বলিয়া মানিতে সম্মত হন না। সুতরাং মহা-ভারতের শ্লোকসংখ্যা প্রথম গণনার সময় কোন্ মতে উহা গণনা করা হইয়াছিল, কে বলিতে পারিবেন? মহাভারতের আদি-পর্ব্বে লিখিত আছে,—"কেচ নারায়ণং নমস্কৃত্য

—এই মন্ত্র হইতে, কেহ বা আস্তিক পর্ব্ব হইতে, কেহ বা উপরিচর রাজার উপাখ্যান হইতে মহাভারতের আরম্ভ মনে করিয়া অধ্যয়ন করেন।" যদি তাহাই হয়, এখন আর মন-গড়া হিসাব করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। তার পর, শ্লোক-সংখ্যা কম বলিয়া যাঁহারা নির্দ্দেশ করেন, তাঁহারা কোন্ প্রদেশ প্রচলিত মহাভারতের শ্লোক-সংখ্যা গণনা করিয়াছেন, বলিতে পারি না। গৌড়ীয় মহাভারত, বোম্বাই প্রদেশীয় মহাভারত এবং পশ্চিমাঞ্চলে প্রচলিত মহাভারত,—এই ত্রিবিধ মহাভারত যদি আমরা মিলাইয়া দেখি তাহাতে অনেক শ্লোকের কমিবেশী দেখিতে পাই। দৃষ্টান্ত কত উল্লেখ করিব? ভীষ্ম-পর্ব্বে যেখানে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পরিসমাপ্তি হইয়াছে, তাহার পরবর্ত্তী বৈশম্পায়নোক্ত সার্দ্ধ পঞ্চ শ্লোক গৌড়ীয় মহাভারতে নাই। বর্দ্ধমান রাজবাটীর অনুবাদিত মহাভারতে এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতে সেই শ্লোক-কয়েকটীর অনুবাদও দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু নীলকণ্ঠ-কৃত টীকায় দেখিতে পাই,—"গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা ইত্যাদয়ঃ সার্দ্ধাঃ পঞ্চশ্লোকাঃ গৌড়ৈর্ন পঠন্তে।" এইরূপ গৌড়দেশে কর্ণ-পর্ব্বের ষষ্ঠতম অধ্যায়ের যে পাঠ প্রচলিত আছে, বোম্বাই প্রদেশে তদপেক্ষা দুইটী শ্লোক বেশী দেখিতে পাওয়া যায়; পশ্চিমাঞ্চলে তদধিক আরও দুইটী শ্লোক প্রচলিত আছে। দ্রোণ-পর্ব্বান্তর্গত জয়দ্রথ-বধ পর্ব্বাধ্যায়ে এক-নবতিতম অধ্যায়ের একটী শ্লোক, পঞ্চত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়ে পাঁচটী শ্লোক, সপ্তত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়ে দশটী শ্লোক,—বোম্বাই প্রদেশের পুস্তকে অতিরিক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ, আরও অনেক পর্ব্বের অনেক শ্লোক, অন্য দেশে প্রচলিত আছে; কিন্তু এতদ্দেশে প্রচলিত নাই। পুঁথি নকল করিবার সময় ঐ সকল শ্লোক বাদ পড়িয়া যাওয়াও অসম্ভব নহে। এদেশেও বর্দ্ধমান রাজবাটীর মহাভারতের এবং কালী-প্রসন্ন সিংহের মহাভারতের অনুবাদে যে কমিবেশী দেখা যায়, তাহারও কারণ—পুঁথির গোলযোগ। যাঁহারা যেরূপ পুঁথি পাইয়াছিলেন, সেইরূপ পুঁথিই মিলাইয়া অনুবাদ করাইয়া গিয়াছিলেন; কাজেই সামান্য সামান্য তারতম্য ঘটিয়াছে। যাহা হউক, অন্য প্রদেশে প্রচলিত মহাভারতের অতিরিক্ত শ্লোক-গুলি গণনা করিয়াও, বর্ত্তমান গণনা-প্রণালী অনুসারে, লক্ষ শ্লোক গণিয়া পাওয়া যায় না। তাহাতে মনে হয়,—যে সময় শ্লোক-সংখ্যা গণনা করা হইয়াছিল, তাহার পরবর্ত্তি-কালে লিপিকারগণের ত্রুটিতে কিছু কিছু শ্লোক বাদ পড়িয়া গিয়াছে। আরও, 'লক্ষ-শ্লোকাত্মক মহাভারত'—এই পরিচয়ে, গণিয়া ঠিক লক্ষটি শ্লোকই হইবে, দুই একটী কমিবেশী হইবে না,—ইহাও মনে করা যুক্তি-যুক্ত নহে। তবে যে প্রক্ষিপ্ত বা সংযোজনার কথা স্বীকার করিতে হয়, তাহার কারণ অন্যরূপ; সে কারণ আমরা পুরাণ-প্রসঙ্গে নির্দ্দেশ করিয়াছি। * কিন্তু তাই বলিয়া, পরিবর্জ্জন করিয়া, আবশ্যকানুরূপ মহাভারত সৃষ্টি করিবার কোনই প্রয়োজন দেখা যায় না। মহাভারতের মূল ঘটনা, মহাভারত পাঠ করিলেই প্রতীত হইতে পারে। আনুষঙ্গিক যে সকল প্রসঙ্গ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা যে সুশিক্ষা ও সদুপদেশের উদ্দেশ্যে অবতারিত হইয়াছিল,—সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

* এই গ্রন্থের ২০০শ পৃষ্ঠায় এই প্রক্ষিপ্ত-তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে।

মহাভারতে সকল সম্প্রদায়ের সকল অবস্থার চিত্র প্রতিফলিত। সুতরাং সকল অবস্থায় সকলেরই উহা শিক্ষাপ্রদ। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, পাপ ও পুণ্য, আলোক ও আঁধার,— মহাভারতে সংসারের দুই দিক—দুই চিত্র দেদীপ্যমান। এক দিকে, ভ্রাতৃবাৎসল্য, মাতৃভক্তি, সত্যনিষ্ঠা; অন্য দিকে, দ্বেষ, হিংসা, অসূয়া, গুরুবাক্য লঙ্ঘন। এক দিকে, সত্য-রক্ষার জন্য যুধিষ্ঠিরাদি বনবাসী হইতেছেন; অন্য দিকে, দুর্য্যোধন, পিতা ধৃতরাষ্ট্রের উপদেশ অবহেলা করিয়া, বনবাসী পঞ্চ-পাণ্ডবের নির্য্যাতনের জন্য প্রয়াস পাইতেছেন। পুঙ্খানুপুঙ্খ কত বলিব? ভীষ্মের ন্যায় মহান্ চরিত্র, ধৃতরাষ্ট্রের ন্যায় প্রজ্ঞা-বুদ্ধি,—কোন্ দেশের কোন্ ইতিহাসে দেখিতে পাই? দ্রোণ, ভীম, অর্জ্জুন, যুধিষ্ঠির, দুর্য্যোধন, শকুনি, অশ্বত্থামা,—এক এক চরিত্রে এক এক ভাবের পূর্ণ বিকাশ। আবার, সকল শিক্ষার পূর্ণ বিকাশ—মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রে। মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ—দেবতা-রূপে চিত্রিত নহেন; তিনি আদর্শ মনুষ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত। মনুষ্য কতদূর উন্নত হইতে পারে,—বল-বুদ্ধি-জ্ঞান সর্ব্ববিষয়ে কিরূপ উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে, মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণে—যেন সকল বৃত্তির স্ফূর্ত্তি! শ্রীকৃষ্ণ—পূর্ণ মনুষ্য। পূর্ণত্ব লাভ করিতে হইলে, মনুষ্যের কোন্ আদর্শ অনুসরণ করা কর্ত্তব্য, মহাকবি বেদব্যাস, শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রে তাহা পরিস্ফুট করিয়াছেন। মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ—জ্ঞানের অবতার; মহাভারতে—তাঁহার প্রবীণত্বের পরিচয়। শ্রীমদ্ভাগবতে ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে—তাঁহার বাল্য ও যৌবনের চিত্র দেখিতে পাই। তাহাতে তাঁহার শারীরিক বলের ও রণ-নৈপুণ্যের বিকাশ। তাঁহার বলবত্তা ও দৃঢ়তার পরিচয়,— গোকুলে, বৃন্দাবনে, মথুরায় পূর্ণ প্রকটিত। আর মহাভারতেও তাহা আছে বটে; কিন্তু তাঁহার জ্ঞানের চরম স্ফূর্ত্তি—এই মহাভারতে। আমাদের মনে হয়,—শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রের প্রধান প্রতিষ্ঠা—তৎ-প্রচারিত ধর্ম্ম-তত্ত্বে। সেই ধর্ম্ম-তত্ত্বের মূল আবার—ধর্ম্ম-মীমাংসায়। সে মীমাংসা—বিশেষ অভিনবত্ব-ব্যঞ্জক। তাঁহার নিকট—অহিংসাও ধর্ম্ম, আবার হিংসাও ধর্ম্ম; সত্যও ধর্ম্ম, আবার অসত্যও ধর্ম্ম; কামনাও ধর্ম্ম, আবার নিষ্কামও ধর্ম্ম। কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ এবং সমস্যার মীমাংসা—শ্রীকৃষ্ণের নীতির যেন প্রধান অঙ্গ। মহাভারতের কর্ণ-পর্ব্বে, কর্ণ জীবিত আছেন শুনিয়া, অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া, যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনের প্রতি ভর্ৎসনা করেন;—অন্য-কোনও সমর্থ ব্যক্তির হস্তে গাণ্ডীব প্রদান করিতে বলেন। অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা ছিল, তাঁহাকে কেহ গাণ্ডীব পরিত্যাগ করিতে বলিলে, তিনি যিনিই হউন, অর্জ্জুন তাঁহার সংহার-সাধন করিবেন। সুতরাং, যুধিষ্ঠিরের বাক্য শুনিয়া উত্তেজিত হইয়া, অর্জ্জুন তাঁহার যথার্থ খড়্গ উত্তোলন করেন। সেই সময়ে অর্জ্জুনকে সান্ত্বনা করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ যে নীতি-তত্ত্ব বিবৃত করিয়াছিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ-কথিত ধর্ম্মতত্ত্ব তাহাতে বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যায়। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—"তুমি কার্য্যাকার্য্য বিনিশ্চয়ে বিমূঢ় হইতেছ। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করা কোনক্রমেই অনায়াস-সাধ্য নহে। শাস্ত্র-জ্ঞান দ্বারা তৎ-সমুদায় জানা যাইতে পারে। কিন্তু তুমি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইতেছ না। তুমি যে ধর্ম্মবেত্তা হইয়া ধর্ম্ম রক্ষা করিতেছ, তাহা অবিজ্ঞান-প্রযুক্তই

মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র।

করিতেছ। কেন-না, ধার্ম্মিক হইয়া প্রাণিগণের বধে কত অধর্ম্ম হয়, তাহা বুঝিতেছ না। আমার মতে,—প্রাণিগণের বধ না করাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বরং মিথ্যা কথা কহিবে, তথাপি কোনপ্রকারে কাহারও হিংসা করিবে না। ধর্ম্মের সূক্ষ্ম-তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা কর।

প্রাণিনামবধস্তাত সর্ব্বজ্যায়ান্মতো মম। অনৃতাং বা বদেদ্বাচং নতু হিংস্যাৎ কথঞ্চন॥

সত্যের কথনই সাধু; সত্য হইতে আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই; পরন্তু সত্যই যাহার অনুষ্ঠানের বিষয় হয়, সত্যের যথার্থ-তত্ত্ব তাহার সুদুর্জ্ঞেয় হইয়া থাকে। যে স্থলে মিথ্যা সত্যস্বরূপ এবং সত্য মিথ্যাস্বরূপ হয়, সে স্থলে সত্য বক্তব্য না হইয়া মিথ্যাই বক্তব্য হইবে। প্রাণবিনাশে ও বিবাহে মিথ্যা বক্তব্য হইবে; এবং সর্ব্বস্বের অপহরণেও মিথ্যা বক্তব্য হইতে পারিবে। বিবাহ-কালে, রতিক্রীড়া সময়ে, প্রাণবিনাশ-স্থলে, সর্ব্ব-ধনাপহরণে এবং ব্রাহ্মণের নিমিত্ত মিথ্যা কহিবে; এই পঞ্চবিধ মিথ্যাকে পণ্ডিতেরা পাতকশূন্য কহিয়াছেন। সেই সেই স্থলে মিথ্যাও সত্য হইবে এবং সত্যও মিথ্যা-স্বরূপ হইবে। যে নিরবচ্ছিন্ন সত্যের অনুষ্ঠানে কৃত-সঙ্কল্প হয়, সেই অনভিজ্ঞ ব্যক্তি কেবল সত্যকেই সত্য মনে করে। ফলতঃ, ধর্ম্মজ্ঞানী হওয়া সহজ নহে; সত্য ও মিথ্যার স্বরূপ যথার্থ অবধারণ করিয়া, পরে ধর্ম্মজ্ঞ হও।

তত্রানৃতং ভবেৎ সত্যং সত্যঞাপ্যনৃতং ভবেৎ।...সত্যানৃতে বিনিশ্চিত্য ততো ভবতি ধর্ম্মবিৎ॥"

সত্য-মিথ্যার মীমাংসা-সম্বন্ধে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ দৃষ্টান্তস্থলে বলাক ব্যাধের এবং কৌশিক মুনির উপাখ্যান বর্ণন করেন। ঐ দুই উপাখ্যানে হিংসা ও অহিংসার এবং সত্য ও মিথ্যার বিচার হইয়াছে। 'ব্যাধ বলাক স্ত্রী-পুত্রাদি পরিবার প্রতিপালনের নিমিত্ত মৃগ-হনন করিত। স্বধর্ম্মে নিরত সত্যবাদী অসূয়া-শূন্য হইয়া, বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে এবং অন্যান্য আশ্রিত-জনগণকে প্রতিপালন করিবার জন্য মৃগানু-সন্ধানে গমন করিয়া, এক দিন সেই ব্যাধ কোথাও মৃগের সন্ধান পাইল না। পরিশেষে দেখিল,—একটী অন্ধ শ্বাপদ জল পান করিতেছে। সে যদিও তাদৃশ জীবকে পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই; তথাপি তাহাকে নিহত করিল। প্রাণী-হিংসা হইলেও, হিংস্র জন্তু বধ করিয়াছিল বলিয়া, এই শ্বাপদ-সংহারে ব্যাধের স্বর্গলাভ হইয়াছিল।' হিংস্র জন্তু-বধ—লোক-হিতকর। সুতরাং এই উপাখ্যানের অবতারণায় শ্রীকৃষ্ণ বুঝাইলেন,—যুধিষ্ঠিরের অবধ-রূপ অহিংসাই যেমন ধর্ম্ম; লোক-হিতার্থে হিংস্র-জন্তুর প্রতি হিংসাও সেইরূপ ধর্ম্ম। ফলে, মীমাংসাই ধর্ম্ম; ধর্ম্মাধর্ম্ম—হিংসা ও অহিংসা, দুই-ই মীমাংসার উপর নির্ভর করে। এইরূপ, কৌশিকের গল্পে তিনি বলিতেছেন,—"কৌশিক নামে এক তপস্বী ব্রাহ্মণ ছিলেন। 'আমি সর্ব্বদা সত্য কথা কহিব'—ইহাই তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল। কিন্তু শাস্ত্রে তাঁহার অধিক জ্ঞান ছিল না। এক দিন, দস্যুভয়ে ভীত হইয়া, কতিপয় লোক তাঁহার অরণ্যে প্রবেশ করে। দস্যুগণ সেই লোকদিগের অনুসরণ করিয়া, কৌশিকের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করে,—'কয়েকটী লোক এই পথ দিয়া গিয়াছে কি? যদি দেখিয়া থাকেন, সত্য করিয়া বলুন।' কৌশিক বুঝিলেন,—দস্যুগণ সেই পলায়িত ব্যক্তিদের সন্ধান লইতেছে; তাহাদিগকে ধরিতে পারিলে, নিশ্চয়ই বিনষ্ট করিবে। তথাপি সত্য-রক্ষার জন্য কৌশিক বলিলেন,—'তাহারা ঐ তরু-গুল্ম-সমাচ্ছন্ন অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছে।'

কৌশিকের নির্দেশানুসারে ক্রূর দস্যুগণ পলায়িত লোকদিগকে আক্রমণ করিয়া বিনষ্ট করিয়াছিল। আর, সত্যবাদী হইয়াও, সূক্ষ্ম-ধর্ম্ম নির্ণয় করিতে সমর্থ না হওয়ায়, কৌশিক নিরয়গামী হইয়াছিলেন।" এই দৃষ্টান্তে, শ্রীকৃষ্ণ বুঝাইলেন,—সত্যও যেরূপ ধর্ম্ম, অসত্যও সেইরূপ ধর্ম্ম। বুঝাইলেন,—মীমাংসার উপরেই ধর্ম্ম-তত্ত্ব নির্ভর করিতেছে। তিনি বলিলেন—"দেখ, প্রাণিবর্গের মঙ্গল উদ্দেশ্যেই ধর্ম্মের লক্ষণ করা হইয়াছে;—যাহাতে প্রাণিগণের হিংসা না হয়, তন্নিমিত্তই ধর্ম্মের লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে; অতএব সিদ্ধান্ত এই, যাহা অহিংসা-যুক্ত, তাহাই ধর্ম্ম। ধর্ম্ম, প্রজা সকলকে ধারণ অর্থাৎ রক্ষা করেন; এই ধারণা-প্রযুক্তই পণ্ডিতেরা ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অতএব,—যাহা ধারণ-সংযুক্ত, তাহাই ধর্ম্ম।

যৎ স্যাদহিংসাসংযুক্তং স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ। অহিংসার্থায় ভূতানাং ধর্ম্মপ্রবচনং কৃতম্॥

ধারণাদ্ধর্ম্মমিত্যাহুর্দ্ধর্ম্মো ধারয়তে প্রজাঃ। যৎ স্যাদ্ধারণসংযুক্তং স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ॥

যাহারা তর্ক দ্বারা হরণেচ্ছু হইয়া, কদাচিৎ ধর্ম্ম ইচ্ছা করে; যদি কোনও কথা না বলিয়া তাহাদের নিকট নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, তবে কোনক্রমেই বাক্যালাপ করিবে না। যদি অবশ্যই আলাপ করিতে হয়, অথবা কিছু না বলিলে যদি শঙ্কা করে, সে স্থলে মিথ্যা বলাই শ্রেয়ঃ; সেই মিথ্যা নিঃসন্দেহ সত্য হইবে। প্রাণ-বিনাশ, বিবাহ, সমুদায় জ্ঞাতিগণের বধ বা বিপদ এবং সর্ব্বতোভাবে আরব্ধ কর্ম্ম,—এই সকল স্থলে মিথ্যা কথিত হইলেও, তাহা মিথ্যা হইবে না। শপথ দ্বারাও তস্করদিগের সংসর্গ হইতে যে মুক্ত হয়, ইহাতে ধর্ম্ম-তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতেরা অধর্ম্ম জ্ঞান করেন না। সে স্থলে, মিথ্যা বলাই শ্রেয়ঃ; তাহা নিঃসন্দেহ সত্য হয়। সাধ্য-সত্ত্বে তাহাদিগকে ধন দেওয়া কর্ত্তব্য নহে; কেন-না, পাপাত্মা লোক-দিগকে যে ধন প্রদত্ত হয়, তাহা দাতাকেও পীড়িত অর্থাৎ নরকগ্রস্ত করে। অতএব, ধর্ম্মের নিমিত্ত মিথ্যা বলিলে, মিথ্যাবাদী হইতে হয় না;—তস্মাদ্ধর্ম্মার্থমনৃতেমুক্তো নানৃত বাগ্‌ভবেৎ।" তবেই বুঝা গেল, সত্য ও মিথ্যার কিরূপ সংজ্ঞা—শ্রীকৃষ্ণ নির্দ্ধারণ করিলেন। তবেই বুঝা গেল,—কেমন-ভাবে মীমাংসার উপরই ধর্ম্মাধর্ম্ম অবস্থিত রহিয়াছে। বলা বাহুল্য, এ মীমাংসার ক্ষমতা—যাহার তাহার সম্ভবপর নহে। শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় পুরুষ-প্রধান ব্যক্তিই এরূপ মীমাংসার অধিকারী। এক স্থলে নহে; শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রে মহাভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থলে, এই মীমাংসা-তত্ত্বেরই প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধের পূর্ব্বে, বিরাট-রাজ-গৃহে যখন মন্ত্রণা-সভা বসিয়াছিল, রাজ্য-প্রাপ্তি-বিষয়ে পাণ্ডবদিগের কি করা কর্ত্তব্য—যখন তাহার পরামর্শ চলিতেছিল;—সেখানেও এই মীমাংসা-তত্ত্বের পরিচয় পাই। তিনি যুদ্ধ করিতেও বলিতেছেন না; তিনি ক্ষমারও সমর্থন করিতেছেন না। অথচ, কৌশলে—অদ্বিতীয় রাজ-নীতিজ্ঞের ন্যায়, ইঙ্গিতে কর্ত্তব্য-পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন। কুরু-পাণ্ডবের মনান্তর-সংক্রান্ত আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া, উভয় পক্ষের দোষাদোষ নিরপেক্ষ-ভাবে আলোচনা করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—"এরূপ অবস্থায় যুধিষ্ঠিরের ও দুর্য্যোধনের যাহা হিতকর, এবং কুরু-পাণ্ডব উভয়-পক্ষেরই ধর্ম্মাবহ, ন্যায্য ও যশস্কর হয়, আপনারা তাহা চিন্তা করুন। অধর্ম্মাচরণ দ্বারা যদি দেবতাদিগের রাজ্যও প্রাপ্ত হইতে পারেন, যুধিষ্ঠির তাহাতে অভিলাষ করেন না; পরন্তু, একখানি সামান্য

গ্রামের উপরেও ধর্ম্মার্থ-যুক্ত আধিপত্য-লাভ করিতে ইচ্ছা করেন।" এখানে, শ্রীকৃষ্ণ কাহাকেও বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে উৎসাহিত করিলেন না; অথচ, আবশ্যক হইলে, তাহাতে বিরত হইতেও বলিলেন না। উপেক্ষা বা বল-প্রয়োগ—আবশ্যকানুসারে বিধেয়, এখানে সেই আভাসই তিনি প্রদান করিলেন। কৌরব-পক্ষ হইতে সঞ্জয় আসিয়া যেদিন যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, যুদ্ধ অপকর্ম্ম ইত্যাদি বাক্যে যুদ্ধ না করায় উৎসাহ দিতেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ সেদিন সঞ্জয়ের বাক্যের যে উত্তর প্রদান করেন, তাহা কর্ত্তব্য-কর্ম্ম-বিষয়ক উপদেশে পরিপূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—"হে সঞ্জয়! আমি এই পাণ্ডবদিগের যেমন অবিনাশ কল্যাণ ইচ্ছা করি, সেইরূপ বহু-পুত্রশালী রাজা ধৃতরাষ্ট্রেরও সমৃদ্ধির আশা করি। তোমরা সমর-প্রবৃত্তি পরিহার-পূর্ব্বক শান্তি-মার্গ অবলম্বন কর,—এতদ্ব্যতীত আর কোনও কথা বলাই আমার অভিপ্রেত নহে।" এই কথা বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ বুঝাইতে লাগিলেন,—"রাজ্যের নিমিত্ত শান্তি হওয়া নিতান্ত সুদুষ্কর; যেহেতু, যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয়; তাঁহার ধর্ম্ম—রাজ্য-রক্ষা। অথচ, ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ তৎপক্ষে প্রতিবাদী। এ ক্ষেত্রে যুধিষ্ঠিরের কর্ম্ম্য কি? কেবল-মাত্র ত্যাগ-স্বীকারই কি তাঁহার কর্ম্ম্য ও ধর্ম্ম্য?" শ্রীকৃষ্ণ বলিতে আরম্ভ করিলেন—"কেহ কেহ বলেন, কর্ম্ম-দ্বারা পরলোকে সিদ্ধি-লাভ হয়; আবার, অন্য কোনও পণ্ডিতেরা নির্দ্দেশ করেন যে, কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুদ্ধ বিজ্ঞান দ্বারা সিদ্ধি হয়। কিন্তু বিজ্ঞানবান হইয়াও ভক্ষ্যভোজ্যের ভোগ ব্যতীত কোনও ব্যক্তিই তৃপ্ত হইতে পারেন না। যে সকল বিদ্যা ইহলোকে কর্ম্ম-সাধিকা হয়, তাহাদেরই ফল আছে; তদ্ভিন্ন অন্য বিদ্যার ফল নাই। কর্ম্মের ফল যে প্রত্যক্ষ, তাহাতে আর কেহই আপত্তি করিতে পারে না। দেখ, তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি জলপান করিলেই তাহার পিপাসার শান্তি হয়। ফলতঃ, শাস্ত্রে কর্ম্মের সহিত মিলিত হইয়াই জ্ঞানের বিধি বিহিত হইয়াছে। অতএব, হে সঞ্জয়! সেই সিদ্ধি-বিষয়ে কর্ম্মের সাধনতা বিদ্যমান আছে; তাহাতে যে ব্যক্তি কর্ম্মের প্রতি অনাদর করিয়া, শুদ্ধ বিজ্ঞান-মাত্রেরই প্রশংসা করে, তাহার কেবল বৃথা বাগাড়ম্বর মাত্র প্রকাশ পায়।" এখানেও সেই সামঞ্জস্য নীতি—জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়েরই আবশ্যকতা প্রতিপাদন। ইহার পর, চাতুর্ব্বর্ণের কোন্ বর্ণের কি কর্ম্ম্য, শ্রীকৃষ্ণ তাহা বিবৃত করেন। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম—প্রজাপালন, রাজ্য-রক্ষা প্রভৃতি নির্দ্দেশ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—"ক্রূরমতি পাপাত্মা মনুষ্য বিধি-বৈগুণ্য-প্রযুক্ত বলাশ্রয় করিয়া, পরের সম্পত্তিতে লোভ করিতে পারে, সেই নিমিত্ত রাজগণ-মধ্যে যুদ্ধ-ব্যাপারের সৃষ্টি হইয়াছে; এবং যুদ্ধের নিমিত্তই বর্ম্ম, শস্ত্র ও ধনুকের উৎপত্তি হইয়াছে।···হে সঞ্জয়! চৌর্য্য-বৃত্তি-অবলম্বন পূর্ব্বক যে ব্যক্তি অদৃষ্টচর হইয়া, পরধন হরণ করে; অথবা যে দুরাত্মা প্রকাশ্য-রূপে বল-পূর্ব্বক তাহা লুণ্ঠিত করিয়া লয়, তাদৃশ উভয় প্রকার দস্যুই যে নিন্দনীয়, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।···দুর্য্যোধন বিনা কারণে পাণ্ডবদিগের ধর্ম্মানুগত পৈতৃক রাজ্য অপহরণ করতঃ, পুরাতন রাজধর্ম্ম অবলম্বনে অন্ধ হইয়াছেন। পাণ্ডবদিগের যে ন্যায্য অংশ, সেই অবশ্য-প্রাপ্য অংশের নিমিত্ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, তাঁহাদিগকে যদি কালগ্রাসে পতিত হইতে হয়, তাহাও শ্লাঘ্য। পররাজ্য অপেক্ষা ইহাদের পৈতৃক

রাজা যে শ্রেষ্ঠ, তাহাতে আর সন্দেহ কি?" যুদ্ধ না হয়—শ্রীকৃষ্ণ সে ইচ্ছাও প্রকাশ করিলেন; আবার আবশ্যক বিষয়ে যুদ্ধ অনিবার্য্য—তাহাও বুঝাইলেন। যাহা কর্ত্তব্য, তাহাই করিতে হইবে—ইহাই তাঁহার নীতি। শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনা-যাত্রার সময়, তাঁহার সহিত পাণ্ডবগণের যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, সেখানেও এই ভাব। দ্রৌপদী বলিতেছেন,—

যথাবধ্যে বধ্যমানে ভবেদ্দোষো জনার্দ্দনঃ। স বধ্যস্যাবধে দৃষ্ট ইতি ধর্ম্মো বিদো বিদুঃ॥

"হে জনার্দ্দন! অবধ্যকে বধ করিলে, যাদৃশ দোষের সম্ভাবনা; বধ্যের অবধেও যে তাদৃশ দোষের আস্পদ হইতে হয়, তাহা ধর্ম্মজ্ঞ পণ্ডিতেরা স্পষ্টই ব্যক্ত করিয়াছেন।" বলা বাহুল্য, শ্রীকৃষ্ণ, দ্রৌপদীর এই উক্তির অনমুমোদন করেন নাই। পরন্তু, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে পদে পদে এই নীতির সার্থকতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। এইরূপ, দৈব ও পুরুষকারের বিচারেও শ্রীকৃষ্ণ উভয়েরই সার্থকতা স্বীকার করিয়াছেন। সন্ধির জন্য কৌরবগণের নিকট গমন উপলক্ষে, অর্জ্জুনের কথার উত্তরে, শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—"হে অর্জ্জুন! আমি কৌরব ও পাণ্ডব উভয় পক্ষেরই কল্যাণ-প্রতিপাদনে সমুৎসুক হইব। কিন্তু দৈব ও পুরুষকার উভয়ের সংযোগ না হইলে, কোনই শুভ-ফলের আশা করা যায় না। দেখ, মানুষ-কর্ম্ম সহকারে ক্ষেত্র সকল রসবৎ ও পরিশোধিত হইলেও, অর্থাৎ উর্ব্বর ক্ষেত্রে যথানিয়মে হল-চালন বীজ-বপনাদি করিলেও, দৈবকৃত বর্ষণ ব্যতীত কদাপি ফল-নিস্পত্তি হয় না। তদ্বিষয়ে কেহ কেহ যন্ত্র-সম্পাদিত বারিসেক পর্য্যন্ত পৌরুষের কথা বলিতে পারেন; কিন্তু জল-সেচন করিলেও, দৈব-বিড়ম্বনায় শুষ্ক হওয়াও নিঃসন্দেহ দেখিতে পান। অতএব, পণ্ডিতগণ দৈব-কর্ম্ম ও মানুষ-কর্ম্ম উভয়েই লোকহিতকর কার্য্য সংযুক্ত রহিয়াছে বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। পুরুষকারে যতদূর হইতে পারে, আমিও তাহা করিব। কিন্তু প্রাক্তন-কর্ম্মের খণ্ডন করিতে কোনক্রমেই সমর্থ হইব না।" স্থূলতঃ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—"দৈবে চ মানুষে চৈব সংযুক্তং লোককারণং।" এই উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণ যে কর্ত্তব্য-তত্ত্বের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাও পরম শিক্ষাপ্রদ। কুরু-পাণ্ডবে সন্ধি হইবে না,—শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্ব হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন; তথাপি তিনি সন্ধির জন্য কৌরব-সভায় গমন করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিতে হইবে, তাহাতে ফল হউক বা না হউক,—ইহাই তাঁহার মূল মন্ত্র ছিল; তাই তিনি সন্ধি-প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হইতে সঙ্কুচিত হন নাই। তাঁহার শিক্ষাই এই। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় তাই তিনি পুনঃপুনঃ নিষ্কাম কর্ম্মের প্রাধান্য কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। অর্জ্জুনকে তিনি বুঝাইয়াছেন,—

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্ম্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥
যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়। সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥

'হে অর্জ্জুন! তোমার কর্ম্মেতে কামনা হউক; কিন্তু সংসার-বন্ধ-হেতু যে কর্ম্মফল, তাহাতে যেন কামনা না থাকে। অর্থাৎ, ফলের নিমিত্ত কর্ম্ম করিতে যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়। হে ধনঞ্জয়! তুমি আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করিবে; সিদ্ধি হউক কিংবা নাই হউক, উভয়েতেই সমদর্শী হইয়া কর্ম্ম করিবে। যেহেতু, সমভাবই যোগ বলিয়া কথিত হয়।'

এই নিষ্কাম-কর্ম্মের শিক্ষায়—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষৎ, দর্শন,—সর্ব্ব-শাস্ত্রের সার-সমন্বয়ে—এই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। মহাভারতের অন্তর্গত এই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাংশ অষ্টাদশ অধ্যায়ে, সপ্তশত পঞ্চচত্বারিংশ শ্লোকে সম্পূর্ণ। তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ ষট্‌শত বিংশ সংখ্যক শ্লোক, অর্জ্জুন সপ্তপঞ্চাশৎ শ্লোক, সঞ্জয় সপ্তষষ্টি শ্লোক এবং ধৃতরাষ্ট্র একটী মাত্র শ্লোক উচ্চারণ করিয়াছেন। * শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রথম অধ্যায়ের সপ্তবিংশতি শ্লোক—ধৃতরাষ্ট্র-সঞ্জয় সংবাদ নামে অভিহিত। তাহাতে ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নে সঞ্জয় যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন। ঐ অধ্যায়ের শেষাংশ এবং পরবর্ত্তী অধ্যায়ের দশম শ্লোক পর্য্যন্ত অর্জ্জুন-বিষাদ-যোগ নামে কথিত হয়। তাহাতে আত্মীয়-স্বজন-বিনাশে কুলক্ষয়ের সম্ভাবনায়, শোক ও ঔদাসীন্য প্রকাশে, অর্জ্জুন বলিতেছেন,—

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্। সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে। গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক চৈব পরিদহ্যতে ॥

'হে কৃষ্ণ! এই সকল যুযুৎসু স্বজনগণকে সমবস্থিত দেখিয়া, আমার গাত্র অবসন্ন, মুখ শুষ্ক, শরীর কম্প, লোমহর্ষণ, হস্ত হইতে গাণ্ডীব স্রস্ত এবং মন বিঘূর্ণিত হইতেছে। আমি আর দাঁড়াইতে পারিতেছি না। আমি সংগ্রামে স্বজন হনন করিয়া শ্রেয়ঃ দেখিতেছি না। যদি আমি শস্ত্রহীন ও প্রতিকার-চেষ্টা রহিত হই, ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রেরা শস্ত্র-হস্ত হইয়া রণস্থলে আমাকে বিনাশ করে, তাহা হইলেও আমার পক্ষে কল্যাণতর হয়।' দ্বিতীয় অধ্যায়—একাদশ শ্লোক হইতে শেষ পর্য্যন্ত সাঙ্খ্যযোগ-বর্ণনে নিয়োজিত। ঐ অংশে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বুঝাইতেছেন,—আত্মার বিনাশ নাই। জীর্ণ বাস পরিত্যাগ করিয়া, মানুষ নূতন বাস গ্রহণ করেন; আত্মাও পুরাতন শরীর পরিত্যাগ করিয়া, নূতন শরীর গ্রহণ করেন।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥
বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥

এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ বুঝাইলেন,—'বিষয়-চিন্তা হইতেই মানুষের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়; বিষয়-চিন্তাই আসক্তির মূল; আসক্তি হইতেই তীব্র অভিলাষ; তৎপরে, ক্রমে ক্রমে ক্রোধ, বিবেক-নাশ প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হয়। যিনি সর্ব্বপ্রকার বাসনা পরিত্যাগ করিয়া, জীবনের প্রতিও নিস্পৃহ হন, অহং-মদীয়ত্ব-ভাব বিসর্জ্জন দেন, তিনিই মুক্তি-লাভের অধিকারী।' ইহার পর, তৃতীয় অধ্যায়ে—কর্ম্মযোগ। পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানোপদেশ শ্রবণ করিয়া, অর্জ্জুন যখন জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তবে আর কর্ম্মের প্রয়োজন কি?' শ্রীকৃষ্ণ তখন আবার

---

* মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বের ৪৩শ অধ্যায়ে শ্লোক-সংখ্যা এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—"ষট্‌শতানি সবিংশানি শ্লোকানাং প্রাহ কেশব। অর্জ্জুনঃ সপ্ত-পঞ্চাশৎ সপ্ত-ষষ্টিং তু সঞ্জয়। ধৃতরাষ্ট্রঃ শ্লোকমেকং গীতায়ামান-মুচ্যতে।" কিন্তু অস্মদ্দেশ-প্রচলিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-সমূহে ঐরূপ শ্লোক-সংখ্যা মিলাইয়া পাওয়া যায় না। সঞ্জয় উবাচ, ধনঞ্জয় উবাচ,—ইত্যাদি বাক্যকেও এক একটী শ্লোক ধরিলে, শ্লোক-সংখ্যা হয়—৭৬৭টী। তদ্ভিন্ন, শ্লোক-সংখ্যা দেখিতে পাই—মাত্র ৭০৯টী। মূল মহাভারতের সহিত মিলাইতে গেলে, আরও দুইটী বাড়িতে পারে। কিন্তু প্রচলিত পুস্তকে তাহা নাই।

কর্ম্মযোগ-তত্ত্ব বিবৃত করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন,—"জ্ঞান ও কর্ম্ম পৃথকৃভাবে মোক্ষদানে সমর্থ নহে। কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতিরেকে পুরুষ জ্ঞান লাভ করিতে পারে না; এবং কর্ম্মজনিত চিত্তশুদ্ধি বিনা, কেবল সন্ন্যাস-মাত্র দ্বারা, মোক্ষ লাভে অধিকারী হয় না। কি জ্ঞানী, কি অজ্ঞানী, কেহই কোনও অবস্থাতেই ক্ষণমাত্র কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। যেহেতু সকলেই স্বভাবজাত রাগদ্বেষাদি গুণের পরতন্ত্র হইয়া, কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। অতএব, এ স্থলে কর্ম্মে যে আসক্তি না থাকা, তাহাকেই সন্ন্যাস বলিয়া জ্ঞাত হইবে। ঈশ্বরারাধনার্থক কর্ম্ম-মাত্রেই লোকের বন্ধন কারণ হয়। অতএব, তুমি নিষ্কাম হইয়া, ঈশ্বরারাধনার্থ কর্ম্মাচরণ কর।" উপসংহারে শ্রীকৃষ্ণ বুঝাইলেন,—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ। স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥

চতুর্থ অধ্যায়ে,—যজ্ঞবিভাগ-যোগ বা জ্ঞান-কর্ম্মন্যাস-যোগ। জ্ঞান ও কর্ম্মের ফলাফল দেখাইয়া, শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—"যাঁহার আত্মজ্ঞান লাভ হইয়াছে, তিনিই মোক্ষ-লাভের অধিকারী। কর্ম্মযোগ ও সমাধিযোগে আত্মজ্ঞান লাভ হয়। জ্বলন্ত অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠকে ভস্মসাৎ করে, আত্মজ্ঞানরূপ অগ্নি সেইরূপ প্রারব্ধ কর্ম্ম ভিন্ন সকল কর্ম্মকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলে। যাঁহার কর্ম্ম-সকল পরমেশ্বরের আরাধনারূপ যোগদ্বারা পরমেশ্বরে সমর্পিত হয়, তাঁহাকে সেই কর্ম্ম-সকল ফলদ্বারা আবদ্ধ করিতে পারে না। সুতরাং জ্ঞান-রূপ খড়্গ দ্বারা সংশয়কে ছেদন করিয়া, কর্ম্মযোগ আশ্রয় কর।" এখানেও সেই নিষ্কাম কর্ম্মের প্রাধান্য। পঞ্চম অধ্যায়ে—আবার অর্জ্জুন সংশয়ান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—"আপনি কর্ম্ম-সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ, এতদুভয়কেই জ্ঞানের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু উহাদের মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠতর?" তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ সন্ন্যাস-যোগ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া কহিতেছেন—"অধিকারিভেদে কর্ম্ম-সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ এতদুভয়ে জ্ঞানোৎপত্তি দ্বারা মোক্ষ সাধন করে। যিনি সুখ দুঃখ বা তৎসাধনে দ্বেষ বা আকাঙ্ক্ষা করেন, তিনি পরমেশ্বর-প্রীতি নিমিত্ত কর্ম্মানুষ্ঠায়ী হইলেও, তাঁহাকে নিত্য সন্ন্যাসী বলিয়া জানিবে। যেহেতু নির্দ্বন্দ্ব পুরুষ নিষ্কাম-কর্ম্ম জন্য চিত্তশুদ্ধি দ্বারা অনায়াসেই সংসার হইতেই মুক্ত হইতে পারেন।" ষষ্ঠ অধ্যায়ে—অধ্যাত্ম-যোগ। এ অধ্যায়েও শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বুঝাইতেছেন,—"যিনি কর্ম্মফলে নিরপেক্ষ হইয়া, অবশ্য-কর্ত্তব্য-বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি কর্ম্মী হইলেও এক প্রকার সন্ন্যাসী; তিনিই কর্ম্মযোগী। যিনি আপনাকে বশীভূত করিতে পারিয়াছেন, যিনি জীবাত্মা, শীতোষ্ণ-শোক-দুঃখে যাঁহার সমভাব, যিনি সর্ব্বতোভাবে অবিচলিত, তিনিই যোগিশ্রেষ্ঠ।" এই বলিয়া প্রকারান্তরে তিনি অর্জ্জুনকে তদ্ভাবে অনুপ্রাণিত করিলেন। সপ্তম অধ্যায়ে—জ্ঞানযোগ। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—"সহস্র যত্নকারীর মধ্যে কেহ আত্মজ্ঞান লাভ করেন, এবং সহস্র আত্মজ্ঞানীর মধ্যে কেহ, পরমাত্মা যে আমি, আমাকে স্বরূপতঃ জানিতে পারেন। আমার প্রকৃতি—মায়া, জড়রূপ শক্তি,—ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার,—এই অষ্ট প্রকারে বিভিন্ন হইয়াছে। এই অষ্ট প্রকার প্রকৃতি, যাহা উক্ত হইল, ইহা নিকৃষ্ট; যেহেতু, ইহা সংসার-বন্ধন-স্বরূপ। ইহা ব্যতীত জীব-স্বরূপ আমার অপর প্রকৃতিকেই

উৎকৃষ্ট বলিয়া জানিবে। সেই চেতনরূপ প্রকৃতি কর্তৃক স্বকর্ম দ্বারা ইহ-সংসার চলিতেছে।

বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্। বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ॥

দেহ উৎপন্ন হইলে, তাহার অনুকূল বিষয়ে ইচ্ছা ও প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ—এই উভয় দ্বারা উৎপন্ন যে দ্বন্দ্ব-মোহ অর্থাৎ শীতোষ্ণ-সুখ-দুঃখাদি-দ্বন্দ্ব-জনিত মোহ—বিবেক-ভ্রংশ, তদ্দ্বারা সমস্ত প্রাণী মোহ প্রাপ্ত হয়; অর্থাৎ, আমি সুখী, আমি দুঃখী,—এইরূপে গাঢ়তর অভিনিবেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং আমাকে ভজনা করে না।" অর্জ্জুনকে এই কথা বলিয়া, তিনি ভবদাসক্ত-চিত্তে কর্ম্ম করিতে উপদেশ দেন। অষ্টম অধ্যায়ে—ব্রহ্মাদি-স্বরূপ প্রসঙ্গ উত্থাপিত। অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে,—ব্রহ্ম কি, অধ্যাত্ম কি, কর্ম্ম কি, অধিভূত কি, এবং অধিদৈব কি, শ্রীকৃষ্ণ তাহা বুঝাইয়া দিতেছেন। ইহাতেও শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বুঝাইয়াছেন,—সকাম যজ্ঞাদি কর্ম্মে স্বর্গাদি লাভ হইলেও, কর্ম্মফল-ভোগাবসানে পুনরায় সংসারে আসিতে হয়; কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্মে জীব সর্ব্ব বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। নবম অধ্যায়ে—রাজবিদ্যাযোগ বিবৃত; যজ্ঞাদি দ্বারা সুরলোক-গমন এবং অনন্যকাম হইয়া উপাসনায় আত্মজ্ঞান লাভে পরমানন্দ প্রাপ্তির বিষয় কথিত হইয়াছে। দশম অধ্যায়ে—বিভূতি যোগ। শ্রীকৃষ্ণ বুঝাইতেছেন,—"বিভূতির অন্ত নাই। আমার সকল বিভূতি পৃথক পৃথক জানিবার প্রয়োজন নাই। সমুদায় জগতেই আমি স্বকীয় একাংশ মাত্রে ব্যাপিয়া আছি। আমা ব্যতিরিক্ত কোনও বস্তুই নাই।" একাদশ অধ্যায়ে,—বিশ্বরূপ দর্শন। অর্জ্জুন দেখিতেছেন,—সেই অব্যয়, অক্ষয়, অনন্ত রূপ। দেখিয়া, অর্জ্জুন বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিতেছেন,—

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসংঘান্।...
ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।...
অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্যমনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্।...
নমো নমোস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে।

এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ আপনার বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়া, অর্জ্জুনকে বলিলেন,—"যিনি আমার নিমিত্ত কর্ম্ম করেন, আমারই আশ্রিত, এবং যাঁহার আমাতেই পুরুষার্থ জ্ঞান, পুত্রাদিতে আসক্তি-রাহিত্য ও সর্ব্বভূতে নির্ব্বৈর ভাব, তিনিই আমাকে প্রাপ্ত হন।" দ্বাদশ অধ্যায়ে—ভক্তিযোগ। এখানেও সেই আসক্তি-নিবৃত্তির উপদেশ। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—"প্রিয়-বস্তু প্রাপ্ত না হইয়া সন্তুষ্ট না হন, অপ্রিয় বস্তু প্রাপ্ত হইলেও তাহাতে দ্বেষযুক্ত না হন, ইষ্ট-বিষয়বিনাশে শোক না করেন এবং অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা না করেন,—এইরূপ নির্ম্মম, নিরহঙ্কার সুখ-দুঃখে সম-ভাবাপন্ন মদ্ভক্ত যিনি, তিনিই আমার প্রিয়।

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ। শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ। অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান মে প্রিয়ো নরঃ॥"

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে—প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক। এই অধ্যায়ে সাঙ্খ্যোক্ত প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্ব সংক্ষেপে পরিবর্ণিত। সাঙ্খ্যের প্রকৃতি ও পুরুষ, এস্থলে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ নামে অভিহিত। যাঁহারা বিবেক-জ্ঞান-চক্ষু-দ্বারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের প্রভেদ অবগত হন, তাঁহারাই পরমার্থ-তত্ত্ব ব্রহ্ম লাভ করেন। চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে—গুণত্রয় বিভাগ। ইহাতে সত্ত্বরজস্তম—এই ত্রিগুণ-তত্ত্ব আলোচিত। পঞ্চদশ অধ্যায়ে—পুরুষোত্তমযোগ। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,—

"আমারই অংশ অবিদ্যাবশতঃ সর্ব্বদা সংসারী ও জীবরূপে প্রসিদ্ধ। আমি যে পুরুষোত্তম, আমাকে যিনি জানেন, তিনিই নিত্য মুক্ত।' ষোড়শ অধ্যায়—দেবাসুর-সম্পত্তি-বিভাগ যোগ-কথনে নিয়োজিত। যাঁহারা সত্ত্বাদি গুণসম্পন্ন, তাঁহারা দৈবীভাবপ্রাপ্ত; আর যাহারা অনৃতাদি দোষসংযুক্ত, তাহারা আসুরীভাবাপন্ন। শাস্ত্রানুশাসন-পরায়ণ ব্যক্তিই দৈবীভাব প্রাপ্ত হইয়া, মোক্ষলাভের অধিকারী হয়। সপ্তদশ অধ্যায়—শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগ নামে অভিহিত। সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী—এই ত্রিবিধা শ্রদ্ধা কর্তৃক আত্মা কিরূপভাবে কোন্ পথে পরিচালিত হয়,—এই অধ্যায়ে তাহাই আলোচ্য। অষ্টাদশ অধ্যায়ে—মোক্ষ-সন্ন্যাস উপদেশ। এখানে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বকর্ম্মের ফলত্যাগ—সন্ন্যাস বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন; বুঝাইয়াছেন,—"চাতুর্ব্বর্ণের নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মই শ্রেয়ঃ-ধর্ম্ম। ভগবদ্ভক্তি প্রণোদিত হইয়া, শুভাশুভ ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া, যিনি অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম সম্পন্ন করিবেন, তিনিই মোক্ষ লাভের অধিকারী হইবেন।" শ্রীকৃষ্ণের নিকট এবংবিধ উপদেশ শ্রবণানন্তর অর্জ্জুনের মোহ দূর হয়। অর্জ্জুন কুরুক্ষেত্রের ধর্ম্ম-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ইহাই সার মর্ম্ম। তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিয়া, কিরূপে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়,—জ্ঞান ও কর্ম্মের সেই স্বরূপ-তত্ত্ব—গীতায় পরিবর্ণিত হইয়াছে। সাঙ্খ্য-বেদান্তাদি দর্শনের গভীর-তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, মনুষ্য-সমাজ যখন পরমাত্মার প্রাধান্য বিস্মৃত হইতে বসিয়াছিল, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সেই সময়ে তাঁহাদিগকে যথার্থ পথ নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। এ পর্য্যন্ত গীতার বহু ভাষ্য, বহু টীকা, লিখিত ও প্রচারিত হইয়াছে। গীতা এমনই গভীর সার্ব্বজনীন ভাবপূর্ণ যে, যিনি যে চক্ষে দেখিবেন, গীতা সেইরূপ-ভাবেই তাঁহার নিকট প্রকাশমান হইবে।

মহাভারতের ঐতিহাসিকতা।

যে ঘটনা যত দূরে সরিয়া যায়, অতীতের অন্ধতম গর্ভে তাহার স্মৃতি ততই বিলীন হয়। তখন আর সত্যকেও সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। আমাদের এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে—বাল্যে, কৈশোরে, যৌবনে, বার্দ্ধক্যে—এমন কত কত ঘটনা সংঘটিত হইয়া গিয়াছে, অন্তরের অন্তস্তল অনুসন্ধান করিলেও এখন তাহার স্মৃতি-চিহ্ন মাত্র খুঁজিয়া পাই না। যদি কখনও কোনও বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াও রাখি, সময় সময় তাহার সত্যতা সম্বন্ধেও সন্দেহ জন্মে। অনন্ত কাল-সাগরের ক্ষুদ্র-জলবিম্ব-প্রায় ক্ষণস্থায়ী এই জীবনের মধ্যেই এতাদৃশ বিস্মৃতি!—অনন্ত কাল-প্রবাহের ধারাবাহিক গতি-তত্ত্ব কে নির্ণয় করিয়া রাখিতে পারে? শত বর্ষ পূর্ব্বে সংঘটিত ঘটনাবলী সম্বন্ধেই ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতান্তর দেখিতে পাই; সুতরাং কোন্ স্মরণাতীত কালের হিন্দু-জাতির ইতিহাস-সম্বন্ধে সদাই সংশয়-সন্দেহের উদয় হইবে, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? হিন্দু-জাতির গৌরব-গরিমার ইতিবৃত্ত-তত্ত্ব আলোচনা করিতে হইলে, সৌভাগ্যই বল—আর দুর্ভাগ্যই বল, পাঁচ-সহস্র বৎসরাধিক কালের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের চিত্রপট সাধারণের সমক্ষে উপস্থাপিত করিতে হইবেই হইবে। সেই চিত্র-পট—মহাভারত। ভারতবর্ষ গৌরবের যে উচ্চ-চূড়ায় আরোহণ করিয়া ছিল, মহাভারত পরিবর্ণিত কুরু-পাণ্ডব-সমরের ভূকম্পনে বা দুর্দ্দম-বাত্যায়, সে চূড়া স্খলিত হইয়া

যায়। সুতরাং মহাভারত—ভারতবর্ষের হিন্দুজাতির ইতিহাসের এক সীমা-নির্ণায়ক খণ্ড-বিশেষ। আমরা মনে করি, ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক খণ্ড, যত সংক্ষিপ্তভাবেই হউক, সেইখানেই শেষ হওয়া বিধেয়। তাহার পূর্ব্বের ইতিবৃত্ত, বলিয়াছি তো, এক্ষণে ধ্যান-ধারণা-কল্পনার অতীত হইয়া পড়িয়াছে। সে দিনের ভারতীয় হিন্দু-জাতির গৌরবের ইতিহাসের শেষ পরিচ্ছেদের সেই বিষয়-পরম্পরাও এখন ভ্রান্তির ও অবিশ্বাসের কুজ্ঝটিকায় ঘেরিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং দুর্ভাগ্য আমাদের—আমাদিগকে এখন অনুসন্ধান করিতে হইতেছে,—মহাভারতের কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কি না! ইতিহাসের স্বরূপ-তত্ত্ব আমরা পূর্ব্বেই বিবৃত করিয়াছি। * এখন দেখা যাউক, মহাভারতের ঐতিহাসিকত্ব কোথায়? চতুর্ব্বিধ কারণে বিষয়-বিশেষের ঐতিহাসিকত্ব সপ্রমাণ হয়। প্রথম,—কিংবদন্তী; দ্বিতীয়,—পুঁথিপত্র; তৃতীয়,—বংশানুচরিত; চতুর্থ,—দেশ-কাল-পাত্রের সামঞ্জস্য। এতদ্ভিন্ন, কোনও বিষয়ের ঐতিহাসিকত্ব প্রমাণে, অন্য উপায় দেখিতে পাই না। মহাভারতের কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ-কাহিনী, ভারতবর্ষে—কেবল ভারতবর্ষেই বা বলি কেন—পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই, কিংবদন্তী-রূপে প্রচারিত। আমাদের ঘরে ঘরে, পুরুষ-পরম্পরাক্রমে উহা প্রচলিত; আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই উহা অবগত। বিশেষতঃ, সকলেই উহাকে সত্য ঘটনা বলিয়া বিশ্বাস করে; কেহই উহাকে উপকথা বলিয়া মনে করে না। সুতরাং কিংবদন্তী হিসাবে মহাভারতের ঐতিহাসিকত্ব সম্পূর্ণরূপে অবিসংবাদিত। পুঁথি-পত্রে বা প্রাচীন গ্রন্থাদিতে-কুরু-পাণ্ডব-সমরের বিবরণ যে নানা আকারে নানারূপে লিখিত আছে, তাহা বলাই বাহুল্য। কোন্ কোন্ পুরাণে ঐ আখ্যায়িকা পরিবর্ণিত আছে, পূর্ব্বেই আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি। † কোনও পুরাণেই ঐ ঘটনাকে কল্পিত উপাখ্যান বলিয়া উল্লিখিত হয় নাই। পরন্তু, বংশ-পর্য্যায়াদির আলোচনায় উহার ঐতিহাসিকত্বই প্রতিপন্ন হইয়াছে। বিষ্ণু-পুরাণে, শ্রীমদ্ভাগবতে, স্কন্দ-পুরাণে এবং বায়ু-পুরাণে, যুধিষ্ঠিরাদির আবির্ভাবের সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বৃহৎ-সংহিতার বচনান্তরে যুধিষ্ঠির-প্রবর্ত্তিত এক শকাব্দের পর্য্যন্ত পরিচয় পাওয়া যায়। কহ্লণ মিশ্রের রাজতরঙ্গিণী, ইতিহাসের একটী শিরোমণি বলিয়া, পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের নিকট সমাদৃত হয়; সেই রাজ-তরঙ্গিণীতেও কুরু-পাণ্ডবেরা কোন্ সময়ে বিদ্যমান ছিলেন, তাহা লিখিত আছে। পাণিনির অষ্টাধ্যায় সূত্রে, গোত্রের উদাহরণে, যুধিষ্ঠিরাদির নাম দৃষ্ট হওয়ায় এবং অন্যান্য পাণ্ডব-গণের উল্লেখ থাকায়, অনেকে মহাভারতোক্ত ঘটনাকে তৎ-পূর্ব্ববর্ত্তী কালের ইতিহাস বলিয়া মনে করেন। জ্যোতির্ব্বিদাভরণ প্রভৃতি নানা জ্যোতিষ-গ্রন্থে মহাভারতোক্ত কুরু-পাণ্ডব-যুদ্ধের কালনির্ণয় সংক্রান্ত গণনা দেখিতে পাওয়া যায়। কোলব্রুক, উইলসন, এলফিন্‌ষ্টোন, মনিয়ার উইলিয়মস্, লাসেন, ম্যাক্সমুলার প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ, যদিও সময়ের বা ঘটনার তারতম্য দেখিতে পান, তথাপি মহাভারতের ঐতিহাসিকতা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং পুঁথি-পত্রের এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সমর্থন হিসাবেও

* এই গ্রন্থের চতুর্থ পরিচ্ছেদের ৪১শ—৪২শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† ইতিপূর্ব্বে ২০৪ ও ২০৬ পৃষ্ঠায় "ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে মহাভারত প্রসঙ্গ" আলোচিত হইয়াছে।

মহাভারতের ঐতিহাসিকত্ব প্রমাণিত হয়। বংশানুচরিত-সম্বন্ধে তো কথাই নাই। আজিও ভারতবর্ষের বহু প্রসিদ্ধ বংশ, কুরু-পাণ্ডবের বংশধর বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দিয়া থাকেন। এক এক বংশের পরবর্ত্তী কত শত পুরুষের তালিকা নানা গ্রন্থে দেখিতে পাই। রাজপুতনার বহু রাজ-বংশ আপনাদিগকে চন্দ্রবংশ বা সূর্য্যবংশ-সম্ভূত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। কেবল পরিচয় প্রদান নহে; তাঁহাদের বংশ-তালিকা দৃষ্টেও তাহা প্রতীত হয়। মনুষ্য হয়তো অন্য পরিচয় বাড়াইয়া কমাইয়া প্রকাশ করিতে পারে; কিন্তু পিতৃ-পরিচয় পরিবর্ত্তন করিতে—মিথ্যা বলিতে—প্রায়ই দেখা যায় না; বিশেষতঃ, ভারতবাসী হিন্দু-জাতির পক্ষে সেরূপ কল্পনাও অপবিত্র ও পাপ-মূলক। সহস্র সহস্র বৎসর হইতে এতদ্দেশে যে বংশানুচরিত চলিয়া আসিতেছে, কোনক্রমেই তাহা উড়াইয়া দেওয়া যায় না।* মহাভারতে যে বংশানুচরিত আছে, তাহার সহিত অন্যান্য গ্রন্থান্তর্গত বংশানুচরিতের প্রায়ই অনৈক্য নাই। সুতরাং, বংশানুচরিত হিসাবেও মহাভারতের ঐতিহাসিকত্ব অস্বীকার করা যায় না। দেশ-কাল-পাত্র-বিষয়ক আলোচনাতেই বা কি বুঝিতে পারি? সেই কুরুক্ষেত্র, সেই ইন্দ্রপ্রস্থ, সেই সমরাঙ্গন—কত কাল হইতে লোকে নির্দ্দেশ করিয়া আসিতেছে, কে তাহার নির্ণয় করিতে পারে? আজিও সেই স্থান-সমূহ দর্শন করিয়া, লোকে কুরু-পাণ্ডবের লীলা-ক্ষেত্র বলিয়া মনে করে; আজিও সেই সকল স্থানে গমন করিলে, সেই যুধিষ্ঠির-ভীমার্জ্জুন প্রভৃতির শ্রীকৃষ্ণ-দুর্য্যোধনাদির স্মৃতি মানস-পটে প্রতিভাত হয়। ঘটনার যদি ঐতিহাসিকত্ব না থাকিত, তাহা হইলে একই স্থানে এমন-ভাবে এত দিন সে স্মৃতি কখনও উজ্জ্বল থাকিতে পারিত কি? সমাজ-গতি যেরূপ-ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে, হিন্দু-জাতির গর্ব্ব দিন দিন যেরূপ খর্ব্ব হইয়া আসিতেছে; তাহার তুলনা করিলেও, কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধের ন্যায় বিপ্লব-স্রোত এক সময়ে ভারতবর্ষে প্রবাহিত হইয়াছিল এবং সে স্রোতে হিন্দু-জাতির প্রতিষ্ঠার ভিত্তি-ভূমি ভাসিয়া গিয়াছিল, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। হিন্দুদিগের শাস্ত্রানুসারে সমাজ-নীতি দিন দিন শিথিল হইয়া আসিতেছে, পুণ্যের স্থান পাপে আসিয়া অধিকার করিতেছে, উন্নতির পরিবর্ত্তে মানব-সমাজ অধোগতির পথে প্রধাবিত হইতেছে। আমরা প্রতিপন্ন করিয়াছি,—রামায়ণ-বর্ণিত ঘটনা-সমূহ মহাভারতের পূর্ব্ববর্ত্তি-কালে সংঘটিত হইয়াছিল।† এদিকেও দেখিতে পাই,—রামায়ণে যে বিশুদ্ধ সমাজ, যে বিশুদ্ধ নীতি, যে গৌরবান্বিত রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল, মহাভারতে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। কাল-ধর্ম্মে ধীরে ধীরে সমাজের যে অবনতি হয়, রামায়ণের ও মহাভারতের চরিত্র-চিত্রে তাহা দেখিতে পাই। সেই হিসাবে ক্রমালোচনা করিয়া আসিলে, মহাভারতের সময় অপেক্ষা বর্ত্তমান সময়ের সমাজ-ধর্ম্ম নানা বিষয়ে কলুষিত বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং দেশ-কাল-পাত্রের বিবেচনায় মহাভারতের ঐতিহাসিকত্ব আপনিই প্রতিপন্ন হয়। এইরূপে, যে দিক দিয়াই দেখি না কেন, যে ভাবেই আলোচনা করি না কেন, মহাভারতের ঐতিহাসিকতায় কোনক্রমেই সন্দিহান হওয়া যায়

* পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদান্তরে হিন্দুরাজগণের বংশ-তালিকা দ্রষ্টব্য।

† এই গ্রন্থের ২২৮ হইতে ২২৯ পৃষ্ঠায় রামায়ণের প্রাচীনত্ব দ্রষ্টব্য।

না। মহাভারতের ঐতিহাসিকত্ব অবিসংবাদিতরূপে প্রতিপন্ন হইলেও, আশ্চর্য্যের বিষয়, কোনও কোনও মহাপুরুষ মহাভারতকে রূপক বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা পান। পাশ্চাত্য-দেশের গবেষণাই, অনেক স্থলে, এইরূপ রূপকের সৃষ্টিকর্ত্তা। এ সম্বন্ধে লাসেন-প্রমুখ ঐতিহাসিকগণের সিদ্ধান্তের প্রত্যুত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন, তাহা বড়ই কৌতুক-প্রদ। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি,—"তিনি (লাসেন) বলেন,—অর্জ্জুনাদি সব রূপক মাত্র। যথা—অর্জ্জুন অর্থ শ্বেতবর্ণ; এজন্য যাহা আলোকময়, তাহাই অর্জ্জুন। যিনি অন্ধকার, তিনি কৃষ্ণ। কৃষ্ণাও তদ্রূপ। পাণ্ডবদিগের অনবস্থান-কালে যিনি রাজ্য ধারণ করিয়াছিলেন, তিনি ধৃতরাষ্ট্র। পঞ্চ-পাণ্ডব—পাঞ্চালের পাঁচটী জাতি, এবং পাঞ্চালীর সহিত তাঁহাদের বিবাহ—ঐ পঞ্চ জাতির একীকরণ সূচক মাত্র। যিনি ভদ্র অর্থাৎ মঙ্গল আনয়ন করেন, তিনি সুভদ্রা। অর্জ্জুনের সঙ্গে যাদবদিগের সৌহার্দ্দই এই সুভদ্রা, ইত্যাদি-ইত্যাদি।...সংস্কৃত সাহিত্যে বা শাস্ত্রে যাহা কিছু আছে, তাহা রূপক হউক বা না হউক, রূপক বলিয়া উড়াইয়া দিতে অনেকেই ভালবাসেন। রামের নামের ভিতর 'রম্' ধাতু পাওয়া যায়, এবং সীতার নামের ভিতর 'সি' ধাতু পাওয়া যায়, এই জন্য রামায়ণ কৃষিকার্য্যের রূপকে পরিণত হইয়াছে। জর্ম্মাণ-পণ্ডিতেরা এমনই দুই চারিটী ধাতু আশ্রয় করিয়া, ঋগ্বেদের সকল সূক্তগুলিকে সূর্য্য ও মেঘের রূপক করিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। চেষ্টা করিলে, বোধ করি পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, তাহা এইরূপে উড়াইয়া দেওয়া যায়। আমাদিগের মনে পড়ে, এক সময়ে রহস্যচ্ছলে আমরা বিখ্যাত নবদ্বিপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রকে এইরূপ রূপক করিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলাম। তোমরা বলিবে, তিনি সে দিনের মনুষ্য—তাঁহার রাজধানী, রাজপুরী, রাজবংশ, সকলই আজিও বিদ্যমান আছে, তিনিও ইতিহাসে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। তাহার উত্তরে বলা যায় যে, কৃষ্ণ অর্থে অন্ধকার, তমোরূপী। কৃষ্ণনগরে অর্থাৎ অন্ধকার-পূর্ণ স্থানে তাঁহার রাজধানী। তাঁহার ছয় পুত্র, অর্থাৎ তমোগুণ হইতেই ছয় রিপুর উৎপত্তি। একজন বালক পলাসি-যুদ্ধ সম্বন্ধে এইরূপ রূপক করিয়াছিল যে, পল মাত্র উদ্ভাসিত যে অসি, তাহা ক্লীব-গুণ-যুক্ত ক্লৈব (Clive) কর্তৃক প্রযুক্ত হওয়ায়, সুরাজা অর্থাৎ যিনি উত্তম রাজা ছিলেন, তিনি পরাভূত হইয়াছিলেন। অতএব রূপকের অভাব নাই। আর এই বালক-রচিত রূপকের সঙ্গে লাসেন-রচিত রূপকের বিশেষ প্রভেদ দেখা যায় না। আমরা ইচ্ছা করিলে, 'লস্' ধাতু খোদ লাসেন সাহেবের নামে ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ করিয়া, তাঁহার ঐতিহাসিক গবেষণা ক্রীড়াকৌতুক বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি।" বোধ হয়, এতদ্বিষয়ে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। অনেকে হয় তো জানেন, আর্চ্চ-বিশপ হোয়েটলি আপনার 'লজিক'-গ্রন্থে তর্ক দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন—পৃথিবীতে বীরবর নেপোলিয়নের অস্তিত্ব ছিল না। ইহার অধিক হাস্যকর ব্যাপার আর কি হইতে পারে? ফলতঃ, তর্কের সাহায্যে সত্য উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে; কিন্তু উহাকে বাতুলতা ভিন্ন আর কি বলিতে পারি? কেহ কেহ আবার বলেন,—মহাবীর আলেক-জাণ্ডারের দূতরূপে মেগাস্থিনীস ভারতবর্ষে আগমন করিয়া, ভারতবর্ষের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে কুরু-পাণ্ডব-যুদ্ধের প্রসঙ্গ লিখিত হয় নাই; সুতরাং

কুরু-পাণ্ডবদিগের যুদ্ধের ঐতিহাসিকতা স্বীকার করা যায় না। এরূপ সিদ্ধান্তও বাতুলতা মাত্র। এরূপ সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে হইলে, নিশ্চয়ই বলিতে হয়,—ভারতবর্ষের বহু গ্রন্থে যখন মেগাস্থিনীস বা আলেকজাণ্ডারের নামোল্লেখ নাই, তখন মেগাস্থিনীস বা আলেকজাণ্ডারের অস্তিত্বও সম্ভবপর নহে।

সমসাময়িক চিত্র।

কুরু-পাণ্ডবগণের যুদ্ধের সমসময়ে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল, মহাভারতের নানা স্থানে তাহার আভাস পাওয়া যায়। "পূর্ণ-শশধর-সদৃশ নির্ম্মল ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি প্রজাদিগের নয়ন ও মন উভয়ই তুল্যরূপে অনুরক্ত হইয়াছিল। প্রজাগণ তাঁহাকে রাজা বলিয়াই যে তাঁহাতে অনুরক্ত ছিল, এমন নহে; পরন্তু যে কার্য্যে প্রজাদিগের চিত্ত সন্তোষ হয়, তিনি সেই কার্য্যেই রত হইতেন। তিনি আপনার এবং অন্য সমস্ত লোকের হিতসাধনে সমভাবে নিযুক্ত থাকিয়া, পরম সুখে কালযাপন করিতেছিলেন।" * যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব-সম্বন্ধে মহাভারতে এইরূপ উক্তি আছে। রাজা কিরূপভাবে রাজ-কার্য্য পরিচালনা করিবেন; কিরূপ কার্য্যে ইহলোকে ও পরলোকে তাঁহার মঙ্গল সাধিত হইবে; কিরূপভাবে প্রজাপালন করিলে, নৃপতিকে আধিরূপ বন্ধে আবদ্ধ হইতে হইবে না;—মহাভারতের শান্তি-পর্ব্বে, যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে, ভীষ্ম তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। মন্বাদি সংহিতায় যে উচ্চ রাজনীতির পরিচয় পাই, ভীষ্ম-মুখে অবিকল সেই সকল উপদেশ বিবৃত হইয়াছে। সেই একই উপদেশ!—মোহবশতঃ অশাস্ত্রীয় কর গ্রহণ করিয়া, প্রকৃতি-পুঞ্জকে পীড়া দিয়া, নৃপতি আপনার বিনাশের পথ আপনিই প্রশস্ত করিয়া থাকেন। "যেরূপ ক্ষীরার্থী-ব্যক্তি ঊধশ্ছেদন করিলে দুগ্ধলাভ করিতে পারে না, তদ্রূপ অসদুপায় অবলম্বন করিয়া রাজ্যকে পীড়িত করিলে তাহা কখনই পরিবর্দ্ধিত হয় না। যেরূপ যে ব্যক্তি নিয়ত পয়স্বিনী গাভীর সেবা করে, সেই দুগ্ধ লাভ করে; তদ্রূপ নরপতি উপায়ানুসারে রাজ্য-পালন করিলে সুখ লাভ করিয়া থাকেন। যদ্রূপ মাতা শিশুকে স্তন্য দান করেন, তদ্রূপ বসুমতী নরপতি কর্তৃক সুরক্ষিতা হইয়া, দোগ্ধ্রীর ন্যায়, সকলকেই ধান্য-হিরণ্যাদি প্রদান করিয়া থাকেন। মহারাজ! তুমি আঙ্গারিকের ন্যায় মূলোৎপাটনকারী না হইয়া, প্রসূন-সঞ্চয়-কারী মালাকরের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া, রাজ্য রক্ষা করিবে; তাহা হইলেই চিরকাল বসুন্ধরাকে ভোগ করিতে সমর্থ হইবে।" মনু-সংহিতায় অল্প কথায় এবং গরুড়-পুরাণে প্রায় একই ভাষায় এই উপদেশ দেখিতে পাই। † প্রজাগণের প্রতি রাজার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে মনু ও উশনার আদেশ এবং শঙ্খ-লিখিত-অঙ্গিরার উপদেশ প্রতিপালিত হইত, প্রমাণ দেখিতে পাই। রাজকার্য্য পরিচালনে যে কিরূপ অভিজ্ঞতা প্রয়োজন,—শান্তি-পর্ব্বে যুধিষ্ঠির ও ভীষ্মের প্রশ্নোত্তরে তাহা বিবৃত আছে। সমাজ-সম্বন্ধে চাতুর্ব্বর্ণের কর্ম্ম-বিভাগ, ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব, তখনও পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান ছিল। পরন্তু, এই সময়ে বর্ণ-সঙ্কর উৎপত্তিরও বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বাদশ প্রকার পুত্র এবং অষ্ট-বিধ বিবাহ,—এই সময় প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল।

* আদি-পর্ব্বের ২২৩শ অধ্যায়; শান্তি-পর্ব্বের ৭১শ অধ্যায়।

† এই গ্রন্থের ১৬২শ এবং ১৭৮শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

দ্বিজাতিগণের ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার, ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদ-গ্রহণ পূর্ব্বক রাজার রাজভবনে প্রবেশ, বিপ্রগণকে গো-ভূমি-হিরণ্যাদি দান—এ সকল তখনও কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হইত।* সতীদাহ-প্রথা, মৃতের সৎকার, প্রেত-তর্পণ, শ্রাদ্ধ-বিধি, সর্ব্ববিধ সংস্কার-কার্য্য এবং তীর্থ-দর্শনের প্রাধান্যও তখন পরিলক্ষিত হয়। পাণ্ডু-রাজার পরলোক-প্রাপ্তিতে মাদ্রীর সহগমন এবং যুধিষ্ঠিরের গঙ্গাসাগরাদি তীর্থ-দর্শন—এতৎ-প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ‡ যাগ-যজ্ঞেরও তখন বিশেষ প্রচলন ছিল। পুত্র-কামনায় যজ্ঞ সর্ব্বদাই বিহিত হইত। কন্যা-বিবাহে পণ-গ্রহণ প্রভৃতি অপকর্ম্ম এই সময় হইতেই প্রবর্ত্তিত অথচ নিন্দনীয় হইয়াছিল। ব্রাহ্মণগণ এই সময় হইতেই ব্রতলোপী হইতে আরম্ভ করেন। তাঁহাদের অধঃপতনের পথ দিন দিন প্রশস্ত হইয়া আসে। কোনও কোনও সমাজে পুরুষের এবং স্ত্রীলোকের পর্য্যন্ত বহু-বিবাহ প্রচলিত হওয়ায়, তত্তৎ সমাজ কলুষিত হইয়াছিল। ফলতঃ, মহাভারতের সময়ে সমাজের বিবিধ অঙ্গ প্রকাশ পাইয়াছিল। এক দিকের সমাজ-শরীর পবিত্র ছিল; অন্য দিকের সমাজ-শরীর কলুষিত হইতে বসিয়াছিল। বর্ত্তমান কালে হিন্দু-সমাজ যে অবস্থায় উপনীত, তদ্বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিলে, মহাভারতের সমাজের আভাস আপনিই মনোমধ্যে উদয় হইতে পারে। তৎকালে শিল্প-বিজ্ঞানাদি কিরূপ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, ময়-দানব নির্ম্মিত যুধিষ্ঠিরের রাজ-সভার এবং যুদ্ধের অস্ত্র প্রভৃতির বিবরণে তাহা বুঝিতে পারা যায়। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞোপলক্ষে ময় যে সভাগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা হয় না। সেই সভায় তিনি "একটী অপ্রতিম সরোবর নির্ম্মাণ করেন। ঐ সরোবরে মণিময় মৃণাল ও বৈদূর্য্যময় পত্রযুক্ত শত শত শতপত্র ও কাঞ্চনময় কহ্লার-কদম্ব সুশোভিত ছিল; এবং বহুতর বিহঙ্গমগণ কেলি করিতেছিল। প্রফুল্ল পঙ্কজ এবং সুবর্ণ-নির্ম্মিত মৎস্য-কূর্ম্মাদি-বিচিত্রিতা, চিত্রস্ফটিক সোপানবদ্ধা, মন্দমন্দ সমীরণ দ্বারা আন্দোলিতা, মুক্তাবিন্দুনিচয়ে খচিতা, মহামণি-শিলাপট্ট দ্বারা চতুর্দ্দিকে বদ্ধ-বেদিকা, মণি-রত্নে বিভূষিতা, ঐ নির্ম্মল সরসী দৃষ্টি করিয়া, কোনও কোনও রাজপুরুষেরাও ভ্রমক্রমে উহাতে পতিত হইয়াছিলেন। ঐ সভার চতুর্দ্দিকে পুষ্পিত নীলবর্ণ শীতলচ্ছায়া-যুক্ত, নানাবিধ মনোহর মহাবৃক্ষসমূহ ও সুগন্ধি কানন এবং হংস-কারণ্ডব-চক্রবাকাদি সমাকীর্ণ পুষ্করিণী-সকল ইতস্ততঃ সুশোভিত ছিল। গন্ধবহ সর্ব্বত্র হইতে স্থলজ ও জলজ কমল সকলের সুগন্ধ বহন করিয়া, পাণ্ডবদিগের সেবা করিত।" এরূপ কারুকার্য্যের পরিচয়—বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীতেও বিরল নহে কি? তার পর, জতুগৃহ-দাহের সময় পাণ্ডবগণ যে সুরঙ্গপথে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করেন, তাহাও সুচতুর শিল্পীর অপূর্ব্ব শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় ভিন্ন—অন্য আর কি বলিতে পারি? যুধিষ্ঠিরের সেই রাজসভায় যে সকল ঋষিগণ, যে সকল পরাক্রান্ত রাজগণ এবং যে সকল ক্ষত্রিয় বীরগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের পরিচয়ে বুঝিতে পারা যায়,—ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সকল দেশের সকল প্রধান ব্যক্তিরই তথায় শুভাগমন হইয়াছিল। কত দেশের কত নৃপতি—অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ,

* শান্তিপর্ব্ব, ৭৬শ এবং ৭৮শ অধ্যায়ে এই সকল বিষয় বর্ণিত আছে।

‡ আদিপর্ব্ব, ১২৬শ অধ্যায় এবং বনপর্ব্ব, ১২৪শ অধ্যায়।

উড্র, মগধ, বিদেহ, মদ্র, কেকয় প্রভৃতি দেশের হিন্দুরাজগণ এবং কিরাত-রাজ পুলিন্দ, যবনাধিপতি চানুর প্রভৃতিও সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন।* সেই রাজসভায় সমাগত ঋষিগণের এবং রাজন্যবর্গের বিবরণ পাঠ করিলে, তৎকালের সম-সাময়িক চিত্র হৃদয়ঙ্গম হয়। ঐ অংশ পাঠ করিলে আরও বুঝা যায়,—ভারতবর্ষের বহির্দেশেও পাণ্ডবগণের গতিবিধি ছিল। অর্ণব-যান দ্বারা বিস্তৃত সমুদ্র পার হওয়া, সাগর-প্রবাহে নৌ-পরিচালনা,—এ সকল উপমা দেখিয়া, সেই কথাই মনে হইতে পারে।† অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় ত্রিগর্ত্ত দেশ, প্রাগ্‌জ্যোতিষ দেশ, সিন্ধুদেশ, মগধ দেশ, মণিপুর রাজ্য প্রভৃতি জয়ের বিবরণ দেখিতে পাই; আর দেখিতে পাই,—ধনঞ্জয় সমুদ্র তীর দিয়া গমন পূর্ব্বক অঙ্গ প্রভৃতি দেশ জয় করিয়া 'দশার্ণ' দেশ এবং 'গান্ধার' দেশ অধিকার করেন। ইহাতে, ভারতের সুদূর দক্ষিণ প্রান্ত হইতে কান্দাহার, আফগানিস্থান প্রভৃতি দেশ পাণ্ডবগণের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল—বুঝিতে পারা যায়। যুদ্ধাস্ত্রের কিরূপ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধে তাহার কতই পরিচয় পাই! বিনা অগ্নিতে রথ ভস্মীভূত হইয়াছিল,—ইহার অপেক্ষা অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক ক্রিয়ার পরিচয় আর কি হইতে পারে? বলিতে গেলে, আরও কত কথাই বলিতে হয়! দেখিতে গেলে, আরও কত পরিচয়ই দেখিতে পাই! যুধিষ্ঠিরের রাজ-সভায় উপনীত হইয়া, নারদ যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহাতে দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার কি সুন্দর চিত্রই প্রকটিত! নারদ জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—"তোমার অর্থ সমস্ত সঞ্চিত ও বিহিত কার্য্যে ব্যয়িত হইতেছে তো? তোমার মন ধর্ম্মে রত আছে তো? তুমি যথাকাল বিভাগ করিয়া, সমভাবে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম সেবা করিয়া থাক তো? তুমি আপনার ও পরের অবস্থা জানিয়া শুনিয়া কর্ম্ম করিয়া থাক তো? পরিশুদ্ধ, কার্য্যাকার্য্য-বোধনে সমর্থ, পরের অনুরক্ত, আত্ম-সদৃশ, সৎকুল-সম্ভূত বৃদ্ধদিগকে মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিয়াছ তো? বিশ্বস্ত, নির্লোভ, পুরাতন কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক তোমার রাজকার্য্য-সমূহ অনুষ্ঠিত হয় তো? বিনয়-সম্পন্ন, সদ্বংশজাত, বহুশ্রুত, অসূয়াশূন্য, মহানুভব পুরোহিতকে তুমি সতত সৎকার করিয়া থাক তো? গুরু, বৃদ্ধ, বণিক্, শিল্পজীবী, আশ্রিত ও দুর্দ্দশাপন্ন ব্যক্তিদিগকে ধন-ধান্য দিয়া অনুগ্রহ করিয়া থাক তো? আয়-ব্যয় নিযুক্ত গণক ও লেখকেরা প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্ণে তোমার আয়-ব্যয় নিরূপণ করে তো? উত্তম, মধ্যম ও অধম লোকদিগকে বিশেষরূপে জানিয়া অনুরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া থাক তো? চৌর, লুব্ধ, বৈরী, কি বালকগণ তোমার কার্য্য নির্ব্বাহে তো নিযুক্ত হয় না? তোমার রাজ্যের কৃষাণেরা তো সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকে? বৃহৎ বৃহৎ তড়াগ সকল জলপূর্ণ হইয়া বিভাগানুসারে স্থানে স্থানে স্থাপিত আছে তো? কৃষিকার্য্যে বৃষ্টির নিতান্ত আবশ্যকতা নাই তো? তোমার কৃষি, বাণিজ্য, পশু-পালন ও ঋণদান—এই চতুর্ব্বিধা বার্ত্তা সচ্চরিত্র মানবগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয় তো? বাদি-প্রতিবাদিগণ উপস্থিত হইলে, তাহাদের সুবিচারে শৈথিল্য প্রকাশ কর না তো?" এইরূপ কত কথাই আছে! সভ্য-সমুন্নত সমাজের যাহা প্রাণ-স্থানীয়, এই সকল প্রশ্ন তাহারই পরিচায়ক নহে কি?

* সভাপর্ব্ব, চতুর্থ অধ্যায়ে রাজগণের নাম দ্রষ্টব্য।

† আদি-পর্ব্বের দ্বিতীয় অধ্যায় এবং উদ্যোগ-পর্ব্বের ২৯শ অধ্যায়।

যাহা হউক, মহাভারতের ঐতিহাসিকত্ব অবিসংবাদিত হইলেও, উহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কিন্তু অনেকেই সন্দিহান। কেবল ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বলিয়া নহেন; অস্মদ্দেশীয় পণ্ডিতগণেরও অনেকেই মহাভারতের ঘটনাবলীকে আধুনিক বলিয়া প্রচার করেন। অধিক বলিব কি,—যে বঙ্কিমচন্দ্র মহাভারতের ঐতিহাসিকত্ব লইয়া, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের প্রতি তীব্র ব্যঙ্গোক্তি করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, তিনিও বলেন,—মহাভারতের কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ ১৪৩০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হইয়াছিল। 'বিষ্ণুপুরাণ হইতে যে খৃঃ পূঃ ১৪৩০ পাওয়া গিয়াছে, তাহাই ঠিক বোধ হয়।' যথাসম্ভব প্রমাণ-পরম্পরার অবতারণা করিয়া, বঙ্কিমচন্দ্র উপসংহারে বলিয়াছেন,—"ভরসা করি, এই সকল প্রমাণের পর, আর কেহ বলিবেন না যে, মহাভারতের যুদ্ধ দ্বাপরের শেষে, পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল।" ইউরোপীয় পণ্ডিতগণও অনেকেই প্রায় এই মতাবলম্বী। তবে তাঁহাদের সিদ্ধান্তে বিশ পঞ্চাশ বৎসর বা শতাব্দীর পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। কোলব্রুক, উইলসন, এলফিন্‌ষ্টোন—খৃষ্ট-পূর্ব্ব চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উইলফোর্ডের মতে—১৩৭০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে। প্রাট্‌—দ্বাদশ খৃষ্ট-পূর্ব্ব শতাব্দীতে, বুকানন—ত্রয়োদশ খৃষ্ট পূর্ব্ব শতাব্দীতে, এবং আমাদিগের রমেশচন্দ্র দত্ত—১২৫০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে, কুরু-পাণ্ডব-যুদ্ধের কাল নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। অথচ, যে দেশের ঘটনা, সে দেশে প্রচার—অনূ্যন পাঁচ সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে, দ্বাপর-কলির সন্ধিস্থলে, কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। ব্যবধান—দুই দশ বৎসরের নহে—দুই এক শতাব্দীর নহে—প্রায় দেড় হাজার দুই হাজার বৎসরের। কেন এমন হয়? নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকগণ ইচ্ছা করিয়া যে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা কোনক্রমেই স্বীকার করিতে পারি না। অথচ, দেশ-প্রচলিত যে প্রবাদ-বাক্য, পুরাণে—শাস্ত্রে ভূয়োভূয়ঃ যাহার প্রতিষ্ঠা, তাহাই বা কি প্রকারে ভ্রম-প্রমাদপূর্ণ বলিতে পারি? তবে কেন এমন হয়! আমরা যতদূর আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে কোন-না-কোনও পক্ষের গণনায় ভুল ঘটিয়াছে বলিয়াই বুঝিতে পারিয়াছি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—এই উভয় মতের গণনায় আলোচনা করিয়া দেখিলে, কোথায় ভ্রম হইয়াছে, উপলব্ধি হওয়া সম্ভবপর। সুতরাং প্রথমে আমরা তাহাই দেখিবার চেষ্টা পাইতেছি। যে সকল গ্রন্থের যে সকল প্রবচন-পরম্পরার উপর নির্ভর করিয়া পণ্ডিতগণ কাল-নির্ণয়ের সিদ্ধান্তে উপনীত হন, প্রথমতঃ আমরা তৎসংক্রান্ত কয়েকটী পুরাণ-প্রবচন এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি।

মহাভারতের প্রাচীনত্ব।

যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্। এতদ্বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্॥
সপ্তর্ষীণাঞ্চ যৌ পূর্ব্বৌ দৃশ্যতে উদিতৌ দিবি। তয়োস্তু মধ্যনক্ষত্রং দৃশ্যতে যৎ সমং নিশি॥
তেন সপ্তর্ষয়ো যুক্তাস্তিষ্ঠন্ত্যব্দশতং নৃণাম্॥
তে তু পরীক্ষিতে কালে মঘাস্বাসন্ দ্বিজোত্তম। তদা প্রবৃত্তশ্চ কলির্দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ॥
প্রয়াস্যন্তি যদা চৈতে পূর্ব্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ। তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলির্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি॥

—বিষ্ণু-পুরাণ, চতুর্থাংশ, ২৪শ অধ্যায়, ৩২শ—৩৪শ এবং ৩৯শ শ্লোক।

'পরীক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দের অভিষেক পর্য্যন্ত কালের পরিমাণ—পঞ্চ-দশাধিক সহস্র বৎসর। আকাশে সপ্তর্ষিগণের মধ্যে প্রথমোদিত যে নক্ষত্রদ্বয় আছে, সেই নক্ষত্রদ্বয়ের এবং তৎ-পূর্ব্ববর্ত্তী

নক্ষত্রদ্বয়ের মধ্যে, সমদেশাবস্থিত যে একটি করিয়া নক্ষত্র দৃষ্ট হয়, ঐ এক একটি নক্ষত্রের সহিত যুক্ত হইয়া, সপ্তর্ষিগণ এক শত বৎসর কাল অবস্থিতি করেন। হে দ্বিজোত্তম! সপ্তর্ষিগণ পরীক্ষিতের রাজ্য-কালে মঘাবর্ত্তী মঘানক্ষত্রে ছিলেন। সেই সময় কলির দ্বাদশ শত বৎসর পরিমিত-কাল প্রবৃত্ত হয়।...এই মহর্ষিগণ যৎকালে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে গমন করিবেন, সেই সময় নন্দের রাজাকাল হইতেই কলি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে।'

আরভ্য ভবতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্। এতদ্বর্ষসহস্রন্তু শতং পঞ্চদশোত্তরম্॥
সপ্তর্ষীনাস্তু যৌ পূর্ব্বৌ দৃশ্যেতে উদিতৌ দিবি। তয়োস্তু মধ্যে নক্ষত্রং দৃশ্যতে যৎ সমং নিশি॥
তেনৈব ঋষয়ো যুক্তাস্তিষ্ঠন্ত্যব্দশতং নৃণাম্। তে ত্বদীয়ে দ্বিজাঃ কাল অধুনা চাশ্রিতা মঘাঃ॥
যদা দেবর্ষয়ঃ সপ্ত মঘাসু বিচরন্তি হি। তদা প্রবৃত্তস্তু কলির্দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ॥
যদা মঘাভ্যো যাস্যন্তি পূর্ব্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ। তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলির্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি॥

—শ্রীমদ্ভাগবত, দ্বাদশ স্কন্ধ, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৬শ-২৮শ এবং ৩১শ-৩২শ শ্লোক।

শুকদেব পরীক্ষিতকে বলিতেছেন,—'তোমার জন্মাবধি নন্দের অভিষেক-কাল পর্য্যন্ত এই এক সহস্র এক শত পঞ্চদশ বৎসর। গগনমণ্ডলে উদয়-কালে সপ্তর্ষিগণের মধ্যে যে দুই ঋষিকে প্রথমে উঠিতে দেখা যায়, সেই দুই ঋষির মধ্যে আবার নিশাকালে (অশ্বিনী প্রভৃতির মধ্যে) যে নক্ষত্রকে সমদেশে অবস্থিত দেখ, ঋষিগণ মনুষ্যদিগের পরিমাণে এক শত বৎসর সেই নক্ষত্রে অবস্থিতি করেন। তোমার সময়ে এখন সেই ঋষিরা মঘা-নক্ষত্রকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন।......যখন সপ্ত-দেবর্ষি মঘা আশ্রয় করেন, তখনই দ্বাদশ-শত-বর্ষাত্মক কলি প্রবেশ করে। যখন মহর্ষিগণ মঘা হইতে পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে গমন করিবেন, তখন নন্দরাজ্য-কালাবধি কলির বিক্রম বাড়িতে থাকিবে।'

মহানন্দিসুতঃ শূদ্রাগর্ভোদ্ভবোঽতিলুব্ধো মহাপদ্মানন্দঃ পরশুরাম ইবাপরোঽখিলক্ষত্রান্তকারী ভবিতা।...
মহাপদ্মঃ, তৎ-পুত্রাশ্চ একং বর্ষশতমবনীপতয়ো ভবিষ্যন্তি। নবৈব তান্ নন্দান্ কৌটিল্যো ব্রাহ্মণ সমুদ্ধরিষ্যতি। তেষামভাবে মৌর্য্যাশ্চ পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি। কৌটিল্য এব চন্দ্রগুপ্তং রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি॥

—বিষ্ণু-পুরাণ, চতুর্থাংশ, চতুর্বিংশাধ্যায়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ, ৭ম শ্লোক।

'মহানন্দীর শূদ্রাগর্ভজাত অতিলোভী মহাপদ্মা-নন্দনামা এক পুত্র হইবে। এই ব্যক্তি দ্বিতীয় পরশুরামের ন্যায় অখিল ক্ষত্রিয়-কুলের বিনাশ করিবে।...মহাপদ্ম এবং তৎ-পুত্রগণের রাজ্য-ভোগ-কাল—এক শত বৎসর। কৌটিল্য ব্রাহ্মণ (চাণক্য) নয়জন নন্দ-বংশীয়কে উচ্ছেদ করিবেন। নন্দ-বংশীয়গণের উচ্ছেদের পর, মৌর্য্য শূদ্র-রাজগণ পৃথিবী ভোগ করিবে। কৌটিল্য, মৌর্য্য-বংশীয় চন্দ্রগুপ্তকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন।'

মহানন্দিসুতো রাজন্ শূদ্রাগর্ভোদ্ভবো বলী॥ মহাপদ্মপতিঃ কশ্চিন্নন্দঃ ক্ষত্রবিনাশকৃৎ।
তস্য চাষ্টৌ ভবিষ্যন্তি সুমাল্যপ্রমুখাঃ সুতাঃ। য ইমাং ভোক্ষ্যন্তি মহীং রাজানশ্চ শতং সমাঃ॥
নব নন্দান্ দ্বিজঃ কশ্চিৎ প্রপন্নানুদ্ধরিষ্যতি। তেষামভাবে জগতীং মৌর্য্যা ভোক্ষ্যন্তি বৈ কলৌ॥
স এব চন্দ্রগুপ্তং বৈ দ্বিজো রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতে॥

—শ্রীমদ্ভাগবত, দ্বাদশ স্কন্ধ, প্রথম অধ্যায়।

'হে রাজন্! মহানন্দীর পুত্র শূদ্রা-গর্ভজাত বল-সম্পন্ন ক্ষত্রিয়দিগের হন্তা নন্দ নামে এক রাজা জন্মিবে। তাঁহার নামান্তর—মহাপদ্ম।...তাঁহার সুমাল্য প্রভৃতি অষ্ট পুত্র উৎপন্ন হইবেন। সেই পুত্রগণ শত বৎসর পৃথিবী-পতি হইবে। চাণক্য নামে কোনও ব্রাহ্মণ

অনুগত ও বিখ্যাত নন্দরাজা এবং তাঁহার আট পুত্রকে বিনাশ করিবেন। তাঁহাদিগের অভাবে মৌর্য্যেরা কলিযুগে পৃথিবী পালন করিবেন। চাণক্য কর্ত্তৃক চন্দ্রগুপ্ত রাজ্যাভিষিক্ত হইবেন।'

আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ। ষড়্‌দ্বিকপঞ্চদ্বিযুতঃ শককালস্তস্য রাজ্ঞশ্চ ॥
—বরাহ-মিহির কৃত বৃহৎ-সংহিতা, ১৩শ অধ্যায়ঃ।

'রাজা যুধিষ্ঠির যে সময়ে রাজ্য-শাসন করিয়াছিলেন, মঘা-নক্ষত্রে তখন সপ্তর্ষি নক্ষত্র-মণ্ডল অবস্থিতি করিতেছিলেন। সে হিসাবে, এক্ষণে যুধিষ্ঠিরের শকাব্দ—২৫২৬ হইতে পারে।' ইহা হইতে বুঝা যায়,—বৃহৎ-সংহিতা রচনার সময়ে ২৫২৬ যুধিষ্ঠিরাব্দ ছিল।

"শতেষু ষট্‌সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে। কলের্গতেষু বর্ষাণামভবন্ কুরু-পাণ্ডবাঃ ॥"—রাজ-তরঙ্গিণী।

কলির ছয় শত তিপ্পান্ন বৎসর গত হইলেও কুরু-পাণ্ডবগণ বিদ্যমান ছিলেন। রাজ-তরঙ্গিণী-প্রণেতা আরও বলেন,—"কাশ্মীরের রাজা গোনর্দ্দ, যুধিষ্ঠিরের সম-সাময়িক।"

অন্তরে চৈব সম্প্রাপ্তে কলিদ্বাপরয়োরভূৎ। স্যমন্তপঞ্চকে যুদ্ধং কুরুপাণ্ডব সেনয়োঃ ॥
—মহাভারত, আদি-পর্ব্ব, প্রথম অধ্যায়।

এই সকল ভিত্তির উপর বিবিধ তর্ক-যুক্তির অবতারণায়, বুধ-মণ্ডলী নানারূপ কাল-নির্ণয় সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মধ্যে বেণ্টরি, হিন্দু-জ্যোতিষ-শাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনায়, ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কার করিতে গিয়া, সপ্তর্ষি-মণ্ডলীর ধাঁধায় পড়িয়া, ৫৭৫ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের অধিক পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরাদির কাল-কল্পনা মনোমধ্যে স্থান দিতে পারেন নাই। তদ্ব্যতীত, অধিকাংশ পণ্ডিতই খৃষ্ট-পূর্ব্ব ত্রয়োদশ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীতেই কুরু-ক্ষেত্রের মহা-সমর সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সকলেই প্রায় একই-রূপ যুক্তির অনুসরণকারী। সকলেরই সিদ্ধান্তের মূলে—মৌর্য্য-বংশীয় রাজা চন্দ্র-গুপ্তের রাজ্য-প্রাপ্তির উল্লেখ। চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব-কালে গ্রীক-বীর আলেকজাণ্ডার ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন;—সে ঘটনার বিবরণ পাশ্চাত্য-দেশের ইতিহাসে বিশেষরূপেই লিখিত আছে। ৩১৫ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন; আর, ৩২৫ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে আলেকজাণ্ডার ভারতে আসিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য বুধ-মণ্ডলী সেই ঘটনাকে ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটা সীমা বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন। * সুতরাং ঐ সময়কে কেন্দ্ররূপে গ্রহণ করিয়া, অনেকেই তৎপূর্ব্ব ও তৎপরবর্ত্তী ইতিহাসের আলোচনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন,—'চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য-প্রাপ্তির অব্দ—বর্ত্তমান খৃষ্টাব্দ হইতে (১৯০৯+৩১৫) দুই হাজার দুই শত চব্বিশ বৎসর। তৎপূর্ব্বে নন্দ-বংশের রাজত্ব এক শত বৎসর। নন্দ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা নন্দ রাজত্ব পাইয়াছিলেন—পরীক্ষিতের জন্মের এক হাজার পনের বৎসর পরে। সুতরাং পরীক্ষিৎ হইতে আরম্ভ করিয়া, চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য-প্রাপ্তি পর্য্যন্ত ব্যবধান কাল—(১০১৫+১০০) এগার শত পনের বৎসর। তাহা হইলে, পরীক্ষিৎ হইতে বর্ত্তমান-কালের ব্যবধান—(১০১৫+১০০+৩১৫+১৯০৯=৩৩৩৯) তিন হাজার তিন শত উনচল্লিশ বৎসর। এ হিসাবে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ঘটিয়াছিল—১৪৩০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে। এ সিদ্ধান্ত বোধ হয়, সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে। রাজ-তরঙ্গিণীর গণনাক্রমে কাশ্মীর-রাজ গোনর্দ্দ যুধিষ্ঠিরের সম-সাময়িক হইলে, এবং কলির ৬৫৩ বৎসর গতে গোনর্দ্দের

* এই ঘটনাকে ম্যাক্সমুলার "The sheet anchor of Indian chronology" বলেন।

রাজ্যকাল মানিয়া লইতে হইলে, (৫০১০—৬৫৩) ৪৩৫৭ বৎসর পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের বিদ্যমানতা সপ্রমাণ হয়। তাহা হইলে, (৪৩৫৭—১৯০৯) ২৪৪৮ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব-কাল ছিল—নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। বলা বাহুল্য, দুই গণনায় অন্যূন সহস্র বৎসরের পার্থক্য! এদিকে, দেশ-প্রচলিত মতের আলোচনা করিলে, দ্বাপর-কলির সন্ধি-স্থলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল স্বীকার করিতে গেলে, ব্যবধান আরও বাড়িয়া যায়। তাহাতে, অন্ততঃ (কলিগতাব্দ ৫০১০—বর্ত্তমান খৃষ্টাব্দ ১৯০৯) ৩ হাজার ১০১ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ মানিয়া লইতে হয়। এখানে আরও প্রায় এক হাজার বৎসরের পার্থক্য।

এখন কোন্ মত মানিব? কেহ বলেন—৫৭৫ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে, কেহ বলেন—১৪৩০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে, কেহ বলেন—১২৫০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে, কেহ বলেন—১১৭৬ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে, কেহ বলেন,—২৪৪৮ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে; কিন্তু লোক-প্রচলিত মত—৩১০১ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে। এতাদৃশ মতবৈষম্য-স্থলে, কোন্ মত মান্য করিব? কাজেই আমাদিগকে এ বিষয়ে আরও একটু বিস্তৃত-ভাবে আলোচনা করিতে হইতেছে।

মহাভারতের কাল-নির্ণয়।

পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, এ পর্য্যন্ত যাঁহারা এ বিষয় আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই শাখা হইতে কাণ্ডের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন। কেহই মূল হইতে উর্দ্ধভাগে উঠিবার প্রয়াস পান নাই। যদি মাকিদনের বীর আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষে না আসিতেন, যদি তাঁহার দূত মেগাস্থিনীস ভারতবর্ষের বিবরণ বিবৃত না করিতেন, তবে তো দেখিতেছি,—কুরু-পাণ্ডবের কাল-নির্ণয় কদাচ সম্ভবপর হইত না! আমরা নিম্নে জ্যোতির্ব্বিদাভরণ হইতে একটী অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। দেখা যাউক,—তাহাতে যুধিষ্ঠিরাদির কাল-নির্ণয় হয় কি না! রাজা বিক্রমাদিত্যের সভাসদ বিশ্ববিশ্রুত কবি-কেশরী কালিদাস জ্যোতির্ব্বিদাভরণ গ্রন্থ রচনা করেন।* বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় সেই গ্রন্থের বিশেষ সমাদর হইয়াছিল। সেই জ্যোতির্ব্বিদাভরণ জ্যোতিষ গ্রন্থ রচনা করিয়া, কবি তন্মধ্যে যুধিষ্ঠিরের সময় নির্দ্দেশ করিয়া যান। তাহা কি এ বিষয়ে অধিকতর প্রামাণ্য নহে? জ্যোতির্ব্বিদাভরণ গ্রন্থ কোন্ সময় বিরচিত হয়, কবি কালিদাসের ঐ গ্রন্থেই তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

বর্ষে সিন্দুর দর্শনাম্বরগুণৈর্য্যাতে কলেঃ সংমিতে মাসে মাধবসংজ্ঞিতেহত্র বিহিতো গ্রন্থক্রিয়োপক্রমঃ।

ইহাতে স্পষ্টই জানিতে পারা যায়,—কলির ৩০৬৭ বৎসর গত হইলে, মধু মাসে, কালিদাস জ্যোতির্ব্বিদাভরণ গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করেন। ঐ জ্যোতির্ব্বিদাভরণ গ্রন্থে দৃষ্ট হয়,—

যুধিষ্ঠিরো বিক্রম-শালিবাহনৌ নরাধিনাথৌ বিজয়াভিনন্দনঃ।
ইমেহনু নাগার্জ্জুনমেদিনীবিভুর্বলিঃ ক্রমাৎ ষট্ শককারকা নৃপাঃ॥ †
যুধিষ্ঠিরাব্দেদযুগাম্বরাগ্নয়ঃ ৩০৪৪ কলাম্বরিখে ১৩৫ হুত্রখখাষ্টভূময় ১৮০০০।
ততোহযুতং ১০০০০ লক্ষ চতুষ্টয়ং ৪০০০০০ ক্রমাৎ ধরাদৃগষ্টা ৮২১ বিতি শাকবৎসরাঃ॥

—জ্যোতির্ব্বিদাভরণ, দশম অধ্যায়।

* মহাকবি কালিদাস যে এই গ্রন্থ রচনা করেন, স্বীয় গ্রন্থের ভণিতাতেই তাহা প্রকাশমান,—
"জ্যোতির্ব্বিদাভরণকালবিধানশাস্ত্রং। শ্রীকালিদাসকবিতো হি ততো বভুব॥"

† এই শ্লোকের নিম্নলিখিত পাঠান্তর আছে,—
"যুধিষ্ঠিরাবিক্রমশালিবাহনৌ ততো নৃপঃ স্যাদ্বিজয়াভিনন্দনঃ।
ততস্তু নাগার্জ্জুন ভূপতিঃ কলৌ কল্কি ষড়েতে শককারকা নৃপাঃ॥"

যুধিষ্ঠির, বিক্রমাদিত্য, শালিবাহন, বিজয়াভিনন্দন, নাগার্জ্জুন এবং বলি—এই ছয় জন নৃপতি শকাব্দ স্থাপন করেন। তন্মধ্যে ৩০৪৪ বৎসর যুধিষ্ঠিরের শকাব্দ। তাহার পর, ১৩৫ বৎসর বিক্রমাদিত্যের শকাব্দ। তৎপরে, ১৮ সহস্র বৎসর শালিবাহনের, তৎপরে ১০ সহস্র বৎসর বিজয়াভিনন্দনের, তৎপরে ৪ লক্ষ বৎসর নাগার্জ্জুনের, তৎপরে ৮২১ বৎসর বলির শকাব্দ। বলা বাহুল্য, যুধিষ্ঠিরের শকাব্দ অতীত হইলে, বিক্রমাদিত্যের শকাব্দ আরম্ভ হয়; অর্থাৎ মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রভাবে যুধিষ্ঠিরের শকাব্দ অপ্রচলিত হইয়া আসে। বিক্রমাদিত্যের শকাব্দ ১৩৫ বৎসর কাল অক্ষুন্ন ছিল। তৎপরে শালিবাহনের শকাব্দ আরম্ভ হয়। জ্যোতিষ-গণনাদিতে সেই শকাব্দ আজিও ব্যবহৃত হয়। বোম্বাই-প্রদেশে আজিও ইহার প্রচলন আছে। শালিবাহনের শকাব্দা—এখন ১৮৩০। সুতরাং ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায়,—যুধিষ্ঠিরাদি কত বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। যুধিষ্ঠিরের প্রবর্ত্তিত শকাব্দ, বিক্রমাদিত্যের শকাব্দ এবং শালিবাহনের প্রবর্ত্তিত শকাব্দের বিগত বর্ষ-সমূহ যোগ করিলে (৩০৪৪ + ১৩৫ + ১৮৩০ = ৫০০৯) পাঁচ হাজার নয় বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে,—বুঝিতে পারা যায় না কি? এতাদৃশ সামঞ্জস্য সত্ত্বে, পুরুষ-পরম্পরা প্রচলিত মতের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন,—সমীচীন কি? তবে এ সম্বন্ধে একটী আপত্তির কথা উঠিতে পারে। কেহ কেহ বলিতে পারেন,—'কালিদাস ভবিষ্য ঘটনা কি করিয়া লিপিবদ্ধ করিলেন? তাঁহাকে ত্রিকালজ্ঞ ঋষি বলিয়া তো মানিতে পারি না।' এ ক্ষেত্রে সেরূপ আস্থা-স্থাপনের আবশ্যকতাও উপস্থিত হয় নাই। তবে বিগত ঘটনা তিনি যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, যুধিষ্ঠিরাব্দের ৩০৪৪ বৎসর পরে বিক্রম সংবৎ প্রবর্ত্তিত হয়,—তাঁহার এ কথায় কোনই সংশয় জন্মিতে পারে না। তার পর, কালিদাসের ভবিষ্যতোক্তিতে যদি আস্থা স্থাপন করিবার প্রবৃত্তি না হয়; কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তি-কালে ভাস্করাচার্য্য এবং মকরন্দকর প্রমুখ জ্যোতির্ব্বিদগণ শালিবাহনের শকাব্দ সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা তো কোনক্রমেই উপেক্ষা করা যায় না। তাঁহারা বলেন—

"নন্দাদ্রীন্দুগুণাস্তথা শকনৃপস্যান্তে কলের্ব্বৎসরাঃ।"—ভাস্করাচার্য্য।

"শাকো নবাগেন্দুকৃশানুযুক্তকলের্ভবত্যব্দগণো যুগস্য।"—মকরন্দকর।

এতদুভয় শ্লোকের মর্ম্ম,—"৩১৭৯ তিন হাজার এক শত উনাশী কলির্গতাব্দে শকাব্দ আরম্ভ।" ইহাতেও বুঝা যাইতেছে,—বিক্রম-সংবতের পরে (যুধিষ্ঠির-প্রবর্ত্তিত শকাব্দের পরে তো বটেই) শালিবাহনের শকাব্দ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। তাহার সহিত বর্ত্তমান শালিবাহন শকাব্দের বিগত ১৮৩০ বৎসর যোগ করিলেও অভীপ্সিত গণনায় উপনীত হওয়া যায়। কালিদাসের জ্যোতির্ব্বিদাভরণে যাহার প্রমাণ পাইলাম, ভাস্করাচার্য্য এবং মকরন্দকর তাহার সমর্থন করিলেন। ইহার উপর আর কি সংশয় থাকিতে পারে? কলির ৩০৪৪ বৎসর গত হইলে, বিক্রমাদিত্য সিংহাসনে আরোহণ করেন; সেই হইতেই সংবতের প্রবর্ত্তনা। এই বিক্রমাদিত্যের রাজ্যাধিকার-লাভ সম্বন্ধে "রাজাবলী" গ্রন্থে যাহা লিখিত আছে, তাহাও পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থক বলিয়া মনে করি। "রাজাবলীতে" লিখিত হইয়াছে,—"কলির আরম্ভ অবধি ৪২৬১ বৎসর পর্য্যন্ত ১১৯ জন নানা জাতীয় হিন্দু দিল্লীর সম্রাট হন।

ইহার বিবরণ—রাজা যুধিষ্ঠির অবধি ক্ষেমক পর্য্যন্ত ২৮ জন ক্ষত্রিয়-জাতির পুরুষেতে ১৮১২ বৎসর। এই পর্য্যন্ত কলিতে বাস্তব ক্ষত্রিয় জাতির বিরাম হইল। তাহার পর, মহানন্দী নামে ক্ষত্রিয়ের ঔরসেতে শূদ্রার গর্ভজাত নন্দের বংশজ বিশারদ অবধি বোধমল্ল পর্য্যন্ত ১৪ জনেতে ৫০০ বৎসর। এই নন্দ অবধি রাজপুত জাতির সৃষ্টি হয়। তাহার পর, গৌতম বংশজাত বীরবাহু অবধি আদিত্য পর্য্যন্ত নাস্তিক-মতাবলম্বী ১৫ জনেতে ৪০০ বৎসর। এই সময়ে নাস্তিক মতের অত্যন্ত প্রচার হওয়াতে বৈদিক-ধর্ম্ম উচ্ছিন্ন-প্রায় হইয়াছিল। তাহার পর 'ময়ূর' বংশীয় ধুরন্ধর অবধি রাজপাল পর্য্যন্ত ৯ জনেতে ৩১৮ বৎসর। তাহার পর, শকাদিত্য নামে পার্ব্বতীয় রাজা এক জনেতে ১৪ বৎসর। এইরূপে কলির প্রথম অবধি ৩০৪৪ বৎসর গত হইল এবং মহারাজাধিরাজ যুধিষ্ঠিরের শকেরও নিবৃত্তি ঘটিল। তাহার পর, বিক্রমাদিত্যের সংবতের আরম্ভ হইল। এই সংবতের আরম্ভ অবধি বিক্রমাদিত্যেরা পিতা-পুত্রে দুই জনেতে ৯৩ বৎসর।" বিক্রমাদিত্য-প্রবর্ত্তিত সংবৎ এখনও পঞ্জিকাদিতে অপ্রচলিত নহে। অধুনা বিক্রমাদিত্যের ১৯৬৬-৬৭ সংবৎ চলিতেছে। তাহার সহিত যুধিষ্ঠিরাব্দ যোগ দিলেও, যুধিষ্ঠিরাদির কাল-নির্ণয় সুগম হইয়া আসে। প্রাচীন শিলালিপি প্রভৃতি দৃষ্টেও কুরুক্ষেত্র মহাসমরের কাল-নির্ণয় হইতে পারে। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে গুজরাটে 'চালুক্য' বংশের রাজা পুলিকেশি কুরুক্ষেত্র মহাসমরের কাল-নির্ণয় করিয়াছিলেন। রবিকীর্ত্তি-নামক জনৈক কবি তদুপলক্ষে যে কবিতা প্রণয়ন করেন, রাজা পুলিকেশি শিলাফলকে তাহা খোদিত করিয়া যান। শিলাফলকে সংস্কৃত-ভাষায় অনেকগুলি শ্লোক লিখিত হইয়াছিল। পুলিকেশির সেই শিলাফলকের দুইটী শ্লোক এই,—

"ত্রিংশৎসু ত্রিসহস্রেষু ভারতাদাহবাদিতঃ। সপ্তাব্দ শতযুক্তেষু গতেষব্দেষু পঞ্চসু চ॥
পঞ্চাশৎসু কলৌকালে ষটসু পঞ্চাশতাসু চ। সমাসু সমতীতাসু শকানামপি ভূভুজাম॥"

অর্থাৎ,—'৫৫৬ শকে এই শিলাফলক উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ইহার ৩৭৩৫ বৎসর পূর্ব্বে কুরু-পাণ্ডবের মহাসমর সংঘটিত হয়।' চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলিকেশি ৬১০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তখন কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের প্রায় ৩৭১০ বৎসর অতীত হইয়াছিল। এ হিসাবে বেশ প্রতিপন্ন হয়, কলির পূর্ব্বে, দ্বাপরের শেষ-ভাগে, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ সংঘটিত হয়। রাজা দ্বিতীয় পুলিকেশি ৫৩১ হইতে ৫৫৬ শক পর্য্যন্ত ২৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন; আর তাঁহার রাজত্বের শেষ-বর্ষে ঐ শিলাফলক খোদিত হইয়াছিল। তাহা হইলে বুঝা যায়,—(৬১০+২৫) ৬৩৫ খৃষ্টাব্দে ঐ শিলাফলক প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন ১৯০৯ খৃষ্টাব্দ। সুতরাং বর্ত্তমান খৃষ্টাব্দের ১২৭৪ বৎসর পূর্ব্বে ঐ শিলাফলক উৎকীর্ণ হইয়াছিল। তাহা হইলে, বর্ত্তমান বর্ষের ৫০০৯ বৎসর (৩৭৩৫+১২৭৪) পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ সংঘটিত হয়,—তাহাই প্রতিপন্ন হইতে পারে। ১২৭৪ বৎসর পূর্ব্বে এক জন হিন্দু-নৃপতি বিশেষ-রূপ বিচার করিয়া, যে সময় নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, এবং যে নির্দ্ধারণে সর্ব্বত্রই সামঞ্জস্য লক্ষিত হইতেছে, তৎপ্রতি কোনক্রমেই উপেক্ষা প্রদর্শন করা যাইতে পারে না। অতএব কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ দ্বাপরের শেষ-ভাগে, পঞ্চ সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল, স্বীকার করিতে হয়।

এতৎপ্রসঙ্গে আরও একটী গুরুতর বিষয়ের অবতারণা করা যাইতে পারে। কুরু-পাণ্ডব-যুদ্ধের কাল-নির্ণয় করিতে হইলে, তৎপ্রতি কোনক্রমেই উপেক্ষা করা যায় না। সে বিষয়টী—

কালনির্ণয়ে শ্রীকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ।

শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গ-গমন। শ্রীকৃষ্ণ কোন্ সময় স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন, নানা পুরাণে তাঁহার উল্লেখ দেখিতে পাই। শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গ-গমন সম্বন্ধে পুরাণের মত আলোচনা করিলে, যুধিষ্ঠিরাদির এবং কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের সময় আরও দূরে পিছাইয়া পড়ে। বিষ্ণুপুরাণের একাধিক স্থলে এবং শ্রীমদ্ভাগবতের একাধিক স্থানে শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গারোহণের সময় বিশেষ-ভাবে লিখিত হইয়াছে। যথা,—

যদৈব ভগবদ্বিষ্ণোরংশো যাতো দিবং দ্বিজ। বসুদেব কুলোদ্ভূতস্তদৈব কলিরাগতঃ॥
যস্মিন্ কৃষ্ণো দিবং যাতস্তস্মিন্নেব তদাহনি। প্রতিপন্নং কলিযুগং তস্য সংখ্যাং নিবোধ মে॥

—বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্থাংশ, ২৪শ অধ্যায়, ৬৫শ এবং ৪০শ শ্লোক।

'যে সময় ভগবান্ বিষ্ণুর অংশ বাসুদেব স্বর্গ-গমন করেন, সেই সময়েই কলি আগমন করিয়াছে।...কৃষ্ণ যে দিন স্বর্গে গমন করেন, সেই দিনই কলি উপস্থিত হইয়াছে।'

কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ। কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ॥...
যস্মিন্নহনি যর্হ্যেব ভগবানুৎসসর্জ্জগাম। তদৈবেহানুবৃত্তোঽসাধর্ম্মপ্রভবঃ কলিঃ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত, প্রথম স্কন্ধ, ৩য় অধ্যায়, ৪৫ শ্লোক এবং ১৮শ অধ্যায়, ৬ষ্ঠ শ্লোক।

'কলি-যুগের সঞ্চার হইবা-মাত্রেই শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান ও ধর্ম্ম লইয়া নিজধামে প্রস্থান করেন। তখন লোক-সকল অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন হয়। সেই অজ্ঞানান্ধকার দূর করিবার জন্য ভাগবত-সূর্য্য সমুদিত।...ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে দিন এবং যে ক্ষণে এই পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়াছেন, অধর্ম্মের উৎপত্তি-স্থান-ভূত কলি সেই দিনে সেই ক্ষণে পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়াছে।'

বিষ্ণোর্ভগবতো ভানুঃ কৃষ্ণাখ্যোঽসৌ দিবং গতঃ। তদাবিশৎ কলির্লোকং পাপে যদ্রমতে জনঃ॥
যস্মিন্ কৃষ্ণো দিবং যাতস্তস্মিন্নেব তদাহনি। প্রতিপন্নং কলিযুগমিতি প্রাহুঃ পুরাবিদঃ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত, দ্বাদশ স্কন্ধ, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৯শ ও ৩৩শ শ্লোক।

'ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দেহ যখন স্বর্গে গিয়াছেন, তখনই কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছে। এই কলিযুগে লোক পাপরত হইয়া থাকে।..যে দিন শ্রীকৃষ্ণ মর্ত্ত্যধাম পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গিয়াছেন, সেই দিনে তখনই কলিযুগ দেখা দিয়াছে, পূর্ব্ব পণ্ডিতেরা ইহা বলিয়া থাকেন।'

যস্মিন দিনে হরির্যাতো দিবং সন্ত্যজ্য মেদিনীম্। তস্মিন দিনেঽবতীর্ণোঽয়ং কালকায়ঃ কলিঃ কিল॥

—ব্রহ্মপুরাণ, দ্বাদশাধিক দ্বিশততমোঽধ্যায়, ৮৫শ শ্লোকঃ।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে দিন মর্ত্ত্যধাম পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করেন, এই কালকায় কলি সেই দিন হইতেই, তাঁহার স্বর্গ-গমনের সঙ্গে-সঙ্গেই, এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

"গতে কৃষ্ণে স্বনিলয়ং প্রাদুর্ভূতো যথা কলিঃ॥"—কল্কিপুরাণ, প্রথম অধ্যায়, ১৩শ শ্লোক।

'ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠ-ধামে গমন করিলে, পৃথিবীতে কলির প্রাদুর্ভাব হয়।' ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, শ্রীকৃষ্ণ কুরু-পাণ্ডব-যুদ্ধে নেতৃপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন; অথচ, তিনি মর্ত্ত্যধাম পরিত্যাগ করিলে, কলিকাল প্রবৃত্ত হয়; সুতরাং কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ কলিকাল প্রবর্ত্তনার পূর্ব্বেই সংঘটিত হইয়াছিল,—তৎসম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে না। তাহা হইলে যুধিষ্ঠিরাব্দ, যুধিষ্ঠিরের রাজ্য-প্রাপ্তির পর, শেষ রাজসূয়-যজ্ঞের সময়, অথবা তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল বলিয়াও মনে হইতে পারে। অতএব কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ, কলির

প্রারম্ভে, পাঁচ হাজার বৎসরের পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল,—তাহাতে কোনই সংশয় থাকিতে পারে না। বরং এ হিসাবে উহা আরও কিছু পূর্ব্ববর্ত্তি কালের ঘটনা বলিয়া মনে হয়। তার পর, মহাভারতে দেখিতে পাই,—দ্বাপর ও কলির সন্ধিকালে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। সন্ধিকাল অর্থে—একের শেষ ও অন্যের আরম্ভ। সে হিসাবে, দ্বাপর যুগের শেষ বর্ষসমূহ এবং কলিযুগের প্রথম বর্ষসমূহ সন্ধিকাল মধ্যে গণ্য। একটা স্থূল দৃষ্টান্তে এ বিষয়ের মীমাংসা হইতে পারে;—যেমন, দুর্গোৎসবের সন্ধি পূজা। ১৩১৫ সালে ১৭ই আশ্বিন শনিবার ৩২ দণ্ড ৪৭ পল অর্থাৎ রাত্রি ৭টা ২ মিনিট পর্য্যন্ত অষ্টমী তিথি ছিল; তৎপরে নবমী তিথি আরম্ভ হয়। এতদুভয়ের সন্ধিকালে সন্ধি-পূজার ব্যবস্থা; কিন্তু পূজা আরম্ভ হয়—রাত্রি ৬টা ৩৮ মিনিটের সময়; অর্থাৎ, ২৪ মিনিট (এক দণ্ড) অষ্টমী থাকিতে। এইরূপ পূজা শেষ হয়—নবমীর এক দণ্ডের মধ্যে। সুতরাং এক তিথির শেষ এবং অন্য তিথির প্রথম যখন সন্ধিকাল হইল, তখন দ্বাপরের ও কলির সন্ধিকাল অর্থে—নিশ্চয়ই দ্বাপরের শেষাংশ এবং কলির প্রথমাংশকে বুঝায়। বিশেষতঃ যখন দেখিতে পাই,—কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের মেরুদণ্ড-স্থানীয় শ্রীকৃষ্ণ কলি-প্রবর্ত্তনার পূর্ব্বেই অন্তর্হিত হন; তখন কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ যে দ্বাপরের শেষ-ভাগেই সংঘটিত হইয়াছিল,—তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। এই স্থলে কেহ কেহ একটী আপত্তির কথা তুলিতে পারেন। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন আপন "তিথিতত্ত্ব" গ্রন্থে ব্রহ্মপুরাণ হইতে একটী বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিথিতত্ত্ব গ্রন্থের সেই বচনটী এই,—

"অথ ভাদ্রপদে মাসি কৃষ্ণাষ্টম্যাং কলৌ যুগে। অষ্টাবিংশতিমে জাতঃ কৃষ্ণোঽসৌ দেবকীসুতঃ॥"

কেহ কেহ এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন,—"ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমীতে অষ্টাবিংশতিতম কলিযুগে দেবকীর পুত্র শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।" ব্রহ্মপুরাণোক্ত শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া, তার্কিকগণ বলেন,—যখন কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইল, তখন দ্বাপরে তাঁহার উপস্থিতি কি প্রকারে সম্ভবপর? এই ব্রহ্মপুরাণোক্ত অপর শ্লোকে আবার দেখিয়াছি,—'শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গারোহণের অব্যবহিত পরেই কলির প্রবর্ত্তনা হয়।' তাহা হইলে, একই পুরাণের দুই শ্লোকে ঘোর অসামঞ্জস্য! কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস কি এমনই পরস্পর-বিরোধী মত প্রকাশ করিবেন? অন্যে বিশ্বাস করেন, করুন; কিন্তু শাস্ত্রদর্শী হিন্দু কোন-ক্রমেই তাহা বিশ্বাস করিতে পারেন না। তবে কেন এমন হইল? এমন হইল—প্রকৃত তাৎপর্য্যের অনুপলব্ধি নিবন্ধন। ব্রহ্মপুরাণোক্ত তিথিতত্ত্বোদ্ধৃত বচনের "কলৌ" শব্দের অর্থ অন্যরূপ। উহাতে বুঝা যায়,—"কলাবিতি নিমিত্ত সপ্তমী কলিপাপধ্বংসার্থং আবির্ভূব।" এস্থলে "কলৌ" শব্দে নিমিত্তার্থে সপ্তমী হইয়াছে; অর্থ,—কলি-পাপ-ধ্বংসার্থ শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কলিকালে লোক পাপরত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন-পূর্ব্বক পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবে,—এই নিমিত্তই তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ,—"কেচিৎ তু কলৌ ভাবিনী সতি ইত্যর্থমাহুঃ।" কেহ কেহ আবার "কলি হইবে" (দ্বাপর শেষে) এই অর্থেও "কলৌ" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া থাকেন। তৃতীয়তঃ,—"মন্বন্তরে অষ্টাবিংশতিমে অষ্টাবিংশতিপূরণে এতত্তু দিব্য সংখ্যায়া জ্ঞেয়ং"—এই অর্থও সিদ্ধ করেন। তাঁহারা বলেন,—শাস্ত্রমতে লৌকিক চতুর্যুগে এক দিব্য-যুগ হয়। সে হিসাবে, দেবতাদিগের সপ্তবিংশ দিব্য-

যুগ অতীত হইয়া অষ্টাবিংশতি দিব্যযুগান্তর্গত কলিতে (লৌকিক দ্বাপর যুগে) শ্রীকৃষ্ণ জন্ম গ্রহণ করেন; "অষ্টাবিংশতিমে কলৌ যুগে" শব্দদ্বয়ে সে অর্থও সঙ্গত হইতে পারে। ফলতঃ, এই ত্রিবিধ প্রকারে অর্থসঙ্গতি দ্বারা অসামঞ্জস্য দূরীভূত হয়। সুতরাং বুঝিয়া দেখুন,—বেদব্যাস কখনই পরস্পর-বিরোধী মত প্রকাশ করেন নাই। বিশেষতঃ, স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ব্রহ্মপুরাণের ঐ বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি তো উহার কোনও অর্থই করেন নাই! তবে কেন কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইয়াছিল মানিয়া লইব? তার পর, বৃহদ্ধর্ম্ম-পুরাণে ঐ একই শ্লোক রূপান্তরে দেখিতে পাই। তাহাতে কলির কোনই উল্লেখ নাই। পরন্তু বুঝা যায়,—ভাদ্রমাসের কৃষ্ণ-পক্ষের অষ্টমী তিথিতেই শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইয়াছিল।

"অথ ভাদ্রপদে মাসি কৃষ্ণাষ্টম্যার্দ্ধরাত্রকে। বভূব কৃষ্ণঃ কৃষ্ণায়া কান্তচারুচতুর্ভুজঃ॥"

রঘুনন্দনোদ্ধৃত ব্রহ্মপুরাণের বচনের অন্তর্গত 'কলৌযুগে' শব্দের পরিবর্ত্তে 'ত্রেতাযুগে' অথবা বৃহদ্ধর্ম্ম-পুরাণের 'কৃষ্ণাষ্টম্যর্দ্ধরাত্রকে' পাঠ নির্দ্দিষ্ট করিয়াও কেহ কেহ পুরাণ-প্রবচন-সমূহের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া থাকেন। যাহা হউক, কলির পূর্ব্বে, দ্বাপরের শেষ ভাগে, শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যমান ছিলেন এবং তখনই কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল,—এই সকল বচন-পরম্পরার আলোচনায় তাহাই সপ্রমাণ হয়।

এই কাল-নির্ণয়-সম্বন্ধে যে কয়েকটী আপত্তির কথা আছে, এইবার তাহার আলোচনা করা যাউক। প্রথম কথা,—পুরাণাদিতে দেখিতে পাই, সপ্তর্ষিগণ যখন মঘা-নক্ষত্রে অবস্থিত ছিলেন, তখন যুধিষ্ঠির রাজ্য-শাসন করিতেন; সপ্তর্ষিগণ যখন মঘা-নক্ষত্রে অবস্থিত, তখন পরীক্ষিৎ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত; আবার সপ্তর্ষিগণ যখন পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে গমন করেন, তখন নন্দের অভিষেক হইয়াছিল।*

আপত্তির কথা।

এস্থলে একটী ঘোর আপত্তির কথা উঠে। সে আপত্তি—"সপ্তর্ষি-মণ্ডল কতকগুলি স্থির নক্ষত্র; উহার বিলাতী নাম Great Bear (গ্রেট বিয়ার) বা Ursa Major (উরসা মেজর)। মঘা নক্ষত্র কতকগুলি স্থির তারা। সকলেই জানেন স্থির তারার গতি নাই। তবে বিষুবের একটু সামান্য গতি আছে,—ইংরেজ-জ্যোতির্ব্বিদেরা বলেন, Precession of the equinoxes (অয়ন চলন)। এই গতি হিন্দুমতে প্রতি বৎসর ৫৪ বিকলা। এক এক নক্ষত্রে ১৩ একের তিন অংশ। এ হিসাবে কোনও স্থির তারার এক নক্ষত্র পরিভ্রমণ করিতে সহস্র বৎসর লাগে—শত বৎসর লাগে না। তাহা ছাড়া, সপ্তর্ষি মণ্ডল কখনও মঘা নক্ষত্রে থাকিতে পারে না। কারণ, মঘা নক্ষত্র সিংহ রাশিতে। দ্বাদশ রাশি—রাশি-চক্রের ভিতর। সপ্তর্ষি-মণ্ডল রাশি-চক্রের বাহিরে। যেমন ইংলণ্ড ভারতবর্ষে কখনও থাকিতে পারে না, তেমন সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘা নক্ষত্রে থাকিতে পারে না।" এ সিদ্ধান্ত নানা কারণে মানিতে পারা যায় না। প্রথমতঃ, পুরাণকার যাহাকে সপ্তর্ষি বলিয়াছেন, তাহা Great Bear বা Ursa Major কি না,—কে বলিতে পারে! তার পর, পুরাণকার স্পষ্ট করিয়া যখন বলিয়া গিয়াছেন,—'ঋষিগণ মনুষ্যদিগের পরিমাণে এক শত বৎসর

* এই গ্রন্থের ২৭৬শ ও ২৭৭শ পৃষ্ঠায় বিষ্ণু পুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবতোদ্ধৃত শ্লোক দ্রষ্টব্য।

এক এক নক্ষত্রে অবস্থিতি করেন; তখন আর সে সম্বন্ধে কোনও তর্কের কথাই উঠিতে পারে না। সপ্তর্ষির মঘা নক্ষত্রে অবস্থান—সম্ভব হউক বা অসম্ভব হউক, যখন শত বর্ষ করিয়া এক এক নক্ষত্রে তাঁহাদের অবস্থিতির সময় স্পষ্টতঃ নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, তখন আর অবান্তর আলোচনার প্রয়োজন কি? দ্বিতীয় কথা,—"তদা প্রবৃত্তস্তু কলির্দ্বাদশাব্দ শতাত্মকঃ"—এই বাক্যের অর্থে আধুনিক পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করেন,—'ইহাতে বুঝা যাইতেছে, কলির দ্বাদশ শতাব্দী প্রবৃত্ত হইলে, পরীক্ষিৎ বিদ্যমান ছিলেন।' এতদ্দ্বারা তাঁহারা প্রমাণ করিবার চেষ্টা পান,—অভিমন্যু-পুত্র পরীক্ষিৎ কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই যখন জন্মগ্রহণ করেন। এবং তিনি যখন কলির দ্বাদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন, তখন তাঁহার জন্মের অর্থাৎ কলির দ্বাদশ শতাব্দীর অব্যবহিত পূর্ব্বেই কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ সংঘটিত হওয়া সম্ভবপর। এরূপ অর্থও মানিয়া লইতে হইলে, আবার পুরাণকারের পরস্পর-বিরোধী মতের অবতারণা করা হয়। সুতরাং এখানেও অর্থান্তর ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে। ভাগবতের টীকায় শ্রীধর স্বামীও তাহাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই "দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ" শব্দের টীকায় তিনি লিখিয়াছেন,—"দ্বাদশাব্দশতাত্মক ইতি। দিব্যেন মানেন সন্ধ্যাসন্ধ্যাংশাভ্যাং সহ যে দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ স কলিস্তদা সন্ধ্যামতিক্রম্য প্রবিষ্ট ইত্যর্থঃ।" অর্থাৎ 'সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ-সমেত কলি-যুগের পরিমাণ—দেবতাদিগের পরিমাণে দ্বাদশ শত বৎসর।' তাহা হইলে, দিব্য-পরিমাণের দ্বাদশ-শতাব্দ-যুক্ত কলি পরীক্ষিতের শাসন-সময়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। পরীক্ষিতের শাসন-সময়েই যে কলির আবির্ভাব হয়, তাহারও প্রমাণ শাস্ত্রে ভূয়োভূয়ঃ বিদ্যমান। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে, সপ্তদশ অধ্যায়ে, পরীক্ষিৎ কলিকে বলিতেছেন,—

"যস্ত্বং কৃষ্ণে গতে দূরং সহ গাণ্ডীবধন্বনা। শোচ্যোঽস্যশোচ্যান্ রহসি প্রহরন্ বধমর্হসি॥"

'শ্রীকৃষ্ণ এবং গাণ্ডীব-ধন্বা অর্জ্জুন ইহ-সংসার পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়াই কি তুই নিরপরাধ প্রাণীর প্রতি হিংসা করিতে সাহসী হইয়াছিস্।' সর্ব্ব-সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইলে, "কলির্দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ" শব্দ-সমূহের শ্রীধরস্বামিকৃত ব্যাখ্যাই ঠিক বলিয়া মনে হয় না কি? তার পর, 'কলির্দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ' পর্য্যন্ত শব্দে কলির দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত পরীক্ষিতের বিদ্যমানতা যদি স্বীকার করিতে হয়, তাহাতেই বা আপত্তি কি? তিনি দ্বাদশ শত বৎসর জীবিত ছিলেন,—ইহাও তো মনে হইতে পারে! আরও আমরা দেখিতে পাই,—একাধিক নন্দ একই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; এবং নন্দ-নামে বহু নৃপতি প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়াছিলেন। নন্দ-নামে ধৃতরাষ্ট্রের এক পুত্র ছিল; বসুদেবের এক পুত্রও নন্দ-নামে অভিহিত হইতেন। গোপরাজ নন্দের পরিচয়—কে না অবগত আছেন? রাজা শুদ্ধোধনেরও এক পুত্রের নাম নন্দ ছিল; তিনি গৌতম-বুদ্ধের বৈমাত্র ভ্রাতা। নন্দ-নামে নয় জন বিখ্যাত নৃপতি পাটলিপুত্রের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। মহাপদ্মানন্দকে মহানন্দীর পুত্র বলিয়া জৈন ও বৌদ্ধ-গ্রন্থকারগণ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন,—দিবাকীর্ত্তির ঔরসে গণিকার গর্ভে নন্দের জন্ম হয়। রাজা উদায়ীর হত্যার পর, ৪৬৪ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে, সেই নন্দ রাজা হইয়াছিলেন। আপন

আচার্য্যের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়; বিবাহের শোভাযাত্রার সময় রাজহস্তী তাঁহাকে স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছিল বলিয়া তিনি রাজ্যপাট প্রাপ্ত হন। এই নন্দের বংশে সাত জন নন্দ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পর্য্যায়ক্রমে তাঁহারা রাজা হইয়াছিলেন। গ্রন্থান্তরে আবার প্রকাশ,—বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ-লাভের এক শত বৎসর পরে কালাশোকের মৃত্যু হয়। তাঁহার নয় পুত্র তখন রাজ্য করেন। তাহাদের গৃহ-বিবাদে রাজ্যে অরাজকতা উপস্থিত হয়। সেই সময়ে দস্যুদলপতি নন্দ সিংহাসন লাভ করেন। বহু দিন তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন, তৎপরে তাঁহার ভ্রাতৃগণ ২৮ বৎসর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অবশেষে নবম নন্দ রাজ্য পান। তাঁহার নাম—ধননন্দ। তিনি চাণক্য কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। সন্ধান করিলে, এইরূপ আরও কত নন্দের পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। সুতরাং পরীক্ষিতের জন্ম-কাল হইতে কোন্ নন্দের অভিষেক-কালের উল্লেখ হইয়াছে, সে বিষয়ে ঘোর সংশয় বিদ্যমান। বংশ-তালিকার আলোচনায় আমরা দেখিতে পাই, সকল পুরাণে সকল বংশের সকল ব্যক্তির নাম উল্লিখিত হয় নাই। সুতরাং মহাপদ্মা-নামক নন্দের পূর্ব্বে, পূর্ব্ববর্ত্তী অপর নন্দের অভিষেকের বিষয় উহাতে যে বুঝায় না, তাহাই বা কি প্রকারে বলিতে পারি? হইতে পারে, পরীক্ষিৎ দ্বাদশ শত বৎসর জীবিত ছিলেন; না হয়,—মহাপদ্মানন্দের পূর্ব্ববর্ত্তি-কালে অন্য নন্দের আবির্ভাব হইয়াছিল। এরূপ সিদ্ধান্ত ভিন্ন, অন্য কোনও প্রকারেই পুরাণ-প্রবচন-পরম্পরার সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায় না। তার পর, শ্লোক-সমূহের পাঠগত এবং অর্থগত পার্থক্যের বিষয় আলোচনা করিলেও দেখা যায়,—পরবর্ত্তি-কালে লিপিকার-প্রমাদ-হেতু পাঠের অনেক রূপান্তর ঘটিয়াছে। বিষ্ণু-পুরাণ ও ভাগবত প্রভৃতির শ্লোক মিলাইয়া দেখিলে এ কথার সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়। কোথাও আছে,—"এতদ্বর্ষ সহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্"; কোথাও আছে—"এতদ্বর্ষ সহস্রন্তু শতং পঞ্চদশোত্তরম্।" এই দুই পাঠান্তরে পাঁচ শত বৎসরের তফাৎ হইয়া যায়। ফলে, যত গণ্ডগোল—নন্দের অভিষেক-কাল লইয়া। এ সম্বন্ধে ত্রিবিধ বিপত্তি উপস্থিত;—(১) শ্লোকের পাঠান্তর, (২) শ্লোকের অর্থান্তর, (৩) নন্দের পরিচয়। বিষ্ণু-পুরাণের পাঠ,—"এতদ্বর্ষ সহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্"; ভাগবতের পাঠ,—"এতদ্বর্ষ সহস্রন্তু শতং পঞ্চদশোত্তরম্।" দুই পাঠের কখনই এক অর্থ হইতে পারে না। সুতরাং, ইহার একটীকে অবশ্যই লিপিকার-প্রমাদ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। অর্থও—প্রচলিত অনুবাদ-গ্রন্থ-সমূহে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার দৃষ্ট হয়। 'এতদ্বর্ষ সহস্রন্তু শতং পঞ্চদশোত্তরম্"—ইহার অর্থ, কেহ করিয়াছেন—এক হাজার পনের বৎসর; কেহ করিয়াছেন,—এক হাজার এক শত পঞ্চদশ বৎসর; কেহ করিয়াছেন,—এক হাজার পাঁচ শত দশ বৎসর! আবার সপ্তর্ষিগণ শত বৎসরে এক নক্ষত্রে গমন করেন,—এ হিসাবে, ব্যবধান এক হাজার বৎসরের মধ্যে হওয়াই সম্ভবপর। কারণ, মঘা হইতে পূর্ব্বাষাঢ়া নয়টী নক্ষত্রের ব্যবধান; মঘা হইতে পূর্ব্বাষাঢ়া একাদশ স্থানে অবস্থিত। তাহাতে বরং 'এক হাজার পনের বৎসর'—এই অর্থ উপলব্ধি হইতে পারে; কিন্তু এগার শত বা পনের শত বৎসর অর্থ কখনই হইতে পারে না। তাহা হইলে, পরীক্ষিতের জন্মের এবং নন্দের অভিষেকের ব্যবধান-কাল কখনই সহস্র বৎসরের অধিক

হয় না। তাহা হইলে, নিশ্চয়ই মহাপদ্মা নন্দের পূর্ব্বে অপর কোনও নন্দ রাজা হইয়াছিলেন, বুঝিতে পারা যায়। বিশেষতঃ, পরীক্ষিৎ হইতে যে নন্দের ব্যবধান-কাল সহস্রাধিক বৎসর, তিনি যে মগধাধিপতি নন্দ, তাহারও কোনও উল্লেখ নাই। অপিচ, "নবনন্দান্" শব্দে মগধের নন্দকে 'নূতন নন্দ' বলিয়াই বা না বুঝিব কেন? উহাতে পূর্ব্বে এক জন নন্দ ছিলেন, আর পরে নূতন এক জন নন্দ হইলেন—এই অর্থ-সঙ্গতিও হইতে পারে না কি? শ্রীধরস্বামী যদিও টীকায় "নবনন্দান" শব্দের—"নবনন্দান্ নন্দঞ্চ তৎ পুত্রাংশ্চেত্যেবাং নব"—এইরূপ অর্থ করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু 'নব' শব্দের 'নূতন' অর্থও কোনও কোনও পণ্ডিত করিয়া থাকেন। ফলতঃ, পরীক্ষিতের জন্মের সহিত নন্দাভিষেক-কালের ব্যবধান সহস্রাধিক বৎসর ধরিতে হইলে, মগধবংশীয় মহাপদ্মা নন্দ ভিন্ন তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অপর এক জন নন্দের অস্তিত্ব ও বিদ্যমানতা স্বীকার করিতে হইবেই হইবে। যদি মহাপদ্মা নন্দকেই নন্দ বলিয়া মানিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে আর একটী কথা মনে আসিতে পারে। শ্লোক-সমূহের আলোচনায় দেখিতে পাই,—পরীক্ষিতের শাসন-সময়ে সপ্তর্ষিগণ মঘানক্ষত্রে অধিষ্ঠিত ছিলেন; এবং নন্দের রাজ্যকালে তাঁহারা পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে বিরাজ করিতেছিলেন। ইহাতে মঘা নক্ষত্রের অব্যবহিত পরবর্ত্তী পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রও না বুঝাইতে পারে। পরীক্ষিতের রাজ্যকালে যে মঘা নক্ষত্রে সপ্তর্ষিগণ অবস্থিত ছিলেন, তাঁহারা ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার সেই মঘা নক্ষত্রে আসিয়াছিলেন; এবং তাহার পর তাঁহারা যখন পূর্ব্বাষাঢ়ায় গিয়াছিলেন, সেই সময়ে নন্দের রাজ্যাভিষেক হইয়াছিল। তাহা হইলে পরীক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দের অভিষেক-কালের ব্যবধান—প্রায় তিন হাজার সাত শত বা আট শত বৎসরে দাঁড়াইতে পারে। যদি তাহাই হয়, সকল পুরাণের মধ্যে অনেকটা সামঞ্জস্য সম্ভবপর। তাহা হইলে, দ্বাপরের শেষ ভাগে, কলির সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল—সপ্রমাণ হয়। কিন্তু এরূপ অর্থ করিতে গেলে, "এতদ্বর্ষ সহস্রন্তু শতং (জ্ঞেয়ং) পঞ্চদশোত্তরম্"—এই বাক্যের সহিত ঘোর অসামঞ্জস্য হইয়া পড়ে। সুতরাং নন্দকে অপর নন্দ বলা ভিন্ন গত্যন্তর দেখিতে পাই না। পরন্তু এরূপ ক্ষেত্রেও "এতদ্বর্ষ সহস্রন্তু শতং পঞ্চদশাত্মকং" পাঠান্তরের অবতারণা করিয়া, কেহ কেহ পরীক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দের অভিষেক-কালের ব্যবধান—আড়াই হাজার বৎসর নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সে হিসাবেও অনেকটা সামঞ্জস্য রক্ষা হইতে পারে। ফলতঃ, হয় পাঠান্তর ঘটিয়াছে; নয়, মহাপদ্মা নন্দ ভিন্ন অন্য নন্দের সহিত কাল-ব্যবধান উল্লিখিত হইয়াছে; এতদুভয়ের একটী সিদ্ধান্ত না মানিলে, কোনও মতেই শাস্ত্র-বাক্যের সামঞ্জস্য রক্ষা হয় না। উপসংহারে—রাজতরঙ্গিণীর সিদ্ধান্ত। রাজতরঙ্গিণীকার বলেন,—"কলির ছয় শত তিপ্পান্ন বৎসর গত হইলে, কুরু-পাণ্ডবগণ প্রাদুর্ভূত হন, এবং কাশ্মীর-রাজ গোনর্দ্দ, যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক।" বলা বাহুল্য, রাজতরঙ্গিণী আলোড়ন করিলেই এ সিদ্ধান্তের অযৌক্তিকতা উপলব্ধি হইতে পারে। প্রথমতঃ, কহ্লণ মিশ্র যখন 'রাজতরঙ্গিণী' প্রণয়ন করেন, তখনও প্রচার ছিল,—ভারত-যুদ্ধ দ্বাপরান্তে সংঘটিত হয়; তখনও কেহ কেহ হিসাব করিতেন,—কুরু-পাণ্ডবের সময় হইতে ৫২ জন নৃপতি ২২৬৮ বৎসর

কাল রাজত্ব করিলে, তৃতীয় গোনৰ্দ্দ কাশ্মীরের সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজতরঙ্গিণী-প্রণেতা ঐ প্রচলিত-মতের প্রতিবাদ করিতে গিয়া, যত গণ্ডগোল বাধাইয়া বসিয়াছেন। রাজতরঙ্গিণীর প্রথম তরঙ্গ পাঠ করিলে, তাঁহার ভ্রম সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে। রাজতরঙ্গিণীতেই লিখিত আছে,—"পঞ্চত্রিংশৎ রাজানঃ মগ্না বিস্মৃতি-সাগরে। তদ্রাজ্যে গত বর্ষাণি ১২৬৬।" অর্থাৎ, পঁয়ত্রিশ জন রাজার নাম বিস্মৃতি-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছে এবং তাঁহাদের রাজ্যকাল—১২৬৬ বৎসর। অথচ, পঁয়ত্রিশ জনের স্থলে রাজতরঙ্গিণীকার ৫২ জন নৃপতির রাজত্বকাল—১২৬৬ বৎসর নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রচলিত মত অনুসারে ঐ ৫২ জনের রাজ্যভোগ-কাল—২২৬৮ বৎসর হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু তাহা না করিয়া, তিনি ১২৬৫ বৎসর ধরিয়াছেন। তাঁহার এই ভ্রমের প্রতি দৃষ্টি পড়িলে, যুধিষ্ঠিরাদির কাল-নির্ণয়ে কোনই গোল থাকিতে পারে না। হইতে পারে, গোনৰ্দ্দ যুধিষ্ঠিরাদির সমসাময়িক; কিন্তু কলির ৬৫৩ বৎসরে তাঁহার বিদ্যমানতায় সংশয়ান্বিত হইতে হয়। আর এক কথা, কাশ্মীরের প্রকৃত ইতিহাস গোনৰ্দ্দের শাসন-কালে আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া বুঝা যায়; গোনৰ্দ্দের পূর্ব্ববর্ত্তি-কালের কোনই পরিচয় রাজতরঙ্গিণীতে নাই। রাজতরঙ্গিণীকার গোনৰ্দ্দকেই আদি বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। সকল দেশের সকল ইতিহাসই আদি-নির্ণয়ে অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। অনুমান সকল স্থলে অভ্রান্ত নহে। গোনৰ্দ্দের কাল-নির্ণয়ে রাজতরঙ্গিণীকারের সিদ্ধান্তও অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। বিশেষতঃ, বর্ণনার মধ্যে যখন মতদ্বৈধ ঘটিয়াছে, তখন কি করিয়াই বা তাঁহার সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত বলিতে পারি? তার পর গোনৰ্দ্দ যদি যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক প্রবল-পরাক্রান্ত নৃপতি হইতেন এবং শ্রীকৃষ্ণের হস্তে তাঁহার সংহার-সাধন হইত, তাহা হইলে মহাভারতে ও পুরাণাদিতে কোনও-না-কোনও প্রসঙ্গে নিশ্চয়ই গোনৰ্দ্দের নাম দেখিতে পাইতাম। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ-যজ্ঞে সকল দেশের সকল নৃপতিই উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু কাশ্মীরাধিপতি গোনৰ্দ্দের নামমাত্রও সে স্থলে উল্লেখ হয় নাই। সুতরাং গোনৰ্দ্দ যে যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন,—তাহা কোনক্রমেই স্বীকার করিতে পারি না। উপসংহারে বক্তব্য,—পুরাণাদিতে যে সকল ভবিষ্যদুক্তি আছে, অনেকে তাহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করেন। যাঁহারা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই পরীক্ষিতের রাজত্ব-কাল হইতে নন্দের অভিষেক-কাল লইয়া বিচার-বিতণ্ডার প্রয়োজন অনুভব করিবেন না। প্রক্ষিপ্ত বা পরবর্ত্তি-কালের সংযোজনা হইলে, বলিতে হয়—পুরাণের সহিত তাহার সম্বন্ধই নাই। যে চন্দ্রগুপ্ত, যে আলেকজাণ্ডার বা যে নন্দ লইয়া বিচার-বিতণ্ডা, তাঁহাদের সম্বন্ধেই কত মতান্তর দেখিতে পাই। কেহ বলেন,—চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন; কেহ বলেন,—চন্দ্রগুপ্তের সহায়তায় তিনি নন্দকে পরাজিত করিয়াছিলেন; কেহ বলেন,—আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি সেলিউকসকে চন্দ্রগুপ্ত ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করেন। কেহ বলেন,—আলেকজাণ্ডার ৩২৫ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে ভারতে আসিয়াছিলেন; কেহ বলেন, আলেকজাণ্ডার

৩২৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে ভারতে আসিয়াছিলেন। কেহ বলেন,—৩১২ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে চন্দ্রগুপ্ত রাজ-সিংহাসন লাভ করেন; কেহ বলেন,—৩১৫ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে চন্দ্রগুপ্ত রাজ্যভার প্রাপ্ত হন। যে বিষয়টী বিচার্য্যের মূল ঘটনা, সেই সম্বন্ধেই এতাদৃশ মতদ্বৈধ রহিয়া গিয়াছে। সুতরাং তাহার কত সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বের কুরুক্ষেত্র-সমর সম্বন্ধে যে মতান্তর ঘটিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ফলতঃ, দুই মত এখন প্রচলিত। এক পক্ষ বলেন,—কলির কয়েক শতাব্দী গত হইলে, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল; অপর পক্ষ বলেন,—দ্বাপরের শেষ-ভাগে কুরু-পাণ্ডবের মহাসমর সংঘটিত হয়। আমরা সকল পক্ষের সকল মতই যথাসাধ্য আলোচনা করিয়াছি। যে বিষয়ে আমাদের যাহা বক্তব্য, তাহাও বলিবার চেষ্টা পাইয়াছি। যিনি যে মতেই আস্থা স্থাপন করুন না কেন, পৃথিবীর অন্যান্য জাতির গৌরব-গরিমা-প্রতিষ্ঠার অনেক পূর্ব্বে কুরু-পাণ্ডবের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। রামায়ণাদির প্রাচীনত্ব, সে হিসাবে, আরও কত দূরবর্ত্তী—সহজেই অনুমিত হয়। *

হরিবংশ।

হরিবংশ—মহাভারতের পরিশিষ্ট বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু মহাভারতের পরবর্ত্তী ঘটনাবলীই যে ইহাতে লিখিত হইয়াছে, তাহা নহে। হরিবংশে প্রধানতঃ শ্রীকৃষ্ণের জীবন-কথা পরিবর্ণিত রহিয়াছে। প্রসঙ্গতঃ, কুরুবংশ, যদুবংশ, ইক্ষ্বাকু-বংশ ও আয়ুবংশ প্রভৃতির বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। কৃষ্ণ-বলরামের বাল্যজীবন—ব্রজলীলা, মাথুর—কংসাদিবধ এবং দ্বারকা-গমন বৃত্তান্ত—হরিবংশের প্রধান আলোচ্য। শ্রীকৃষ্ণের সহিত দৈত্য ও অসুরগণের যুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ, দ্বারকায় পুরী নির্ম্মাণ, শ্রীকৃষ্ণের প্রধানা মহিষীগণ, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নানা দেশ পরিভ্রমণ প্রভৃতির বিবরণ হরিবংশে দেখিতে পাওয়া যায়। হরিবংশে কি কি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, উহার অষ্টপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়ে তাহার নির্ঘণ্ট দেখিতে পাই। উদ্বৃত্ত ভবিষ্য-পর্ব্ব নামে হরিবংশে একোনষষ্টিতম অধ্যায় আছে। সে অধ্যায় কয়টী সকল পুঁথিতে পাওয়া যায় না; নীলকণ্ঠও তাহার টীকা করিয়া যান নাই; সুতরাং কেহ কেহ ঐ অংশকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করেন। হরিবংশ বেদব্যাসের রচিত বলিয়া পরিচিত। কিন্তু ইহার প্রথম অধ্যায়ে, সৌনকাদি ঋষির প্রশ্নে, উগ্রশ্রবা সৌতি এই হরিবংশ পুরাণ বর্ণন করিতেছেন, লিখিত আছে। তাহাতে স্পষ্টতঃ উক্ত হইয়াছে,—"ব্যাসদেবের শিষ্য ধর্ম্মজ্ঞ বৈশম্পায়নকে জনমেজয় নৃপতি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি আপনার নিকট সেই বৃষ্ণিগণের জন্ম-বিবরণ প্রথম হইতেই কহিতেছি।" তবেই বুঝা যায়,—জনমেজয়ের সর্পসত্রে যাহা পঠিত হইয়াছিল, পরবর্ত্তী-কালে উগ্রশ্রবা সৌতি, শৌনক প্রভৃতি ঋষিদিগের নিকট যাহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, হরিবংশে তাহাই লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। বিশেষতঃ, এই হরিবংশের প্রথমেই দেখিতে পাই, পুরাণকার বলিতেছেন,—"যাঁহাকে পিতামহ হইতে ষষ্ঠ কহে, যিনি অক্ষয় বিভূতিযুক্ত মহর্ষি এবং নারায়ণের অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, একমাত্র শুকদেব

* অন্যত্রও এতদ্বিষয় আলোচিত হইবে; নির্ঘণ্টানুসরণে তাহা দ্রষ্টব্য।

যাঁহার পুত্র, সেই দ্বৈপায়নকে আমি ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞান করি।” স্বয়ং বেদব্যাস যদি এই গ্রন্থের রচয়িতা হইতেন, এরূপভাবে আত্ম-পরিচয় প্রদান করিতেন কি? সুতরাং পুরাণাদির রচনা-সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, হরিবংশ-রচনা সম্বন্ধেও প্রধানতঃ তাহাই বলিতে পারা যায়; অর্থাৎ; বেদব্যাস যাহা বলিয়া গিয়াছিলেন, তাহা অবলম্বন করিয়া পরবর্ত্তি-কালে এই হরিবংশ লিপিবদ্ধ হইয়াছিল।

উপসংহার।

পূর্ব্বেও বলিয়াছি, উপসংহারেও বলিতেছি,—অন্য কোনও দেশের কোনও ভাষায় মহাভারতের সমকক্ষ গ্রন্থ দ্বিতীয় নাই। রামায়ণ ও মহাভারতের তুলনায় কেহ কেহ পাশ্চাত্য-দেশের হোমারের 'ইলিয়ড' এবং ভার্জ্জিলের 'ইনিড' প্রভৃতির নাম উল্লেখ করেন; কিন্তু সে তুলনা—তুলনাই নয়! প্রথমতঃ, আকারের পরিমাণ যদি তুলনা করিতে যাই, দেখিতে পাই,—মহাভারতে অন্যূন দুই লক্ষ বিংশ সহস্র পংক্তি এবং রামায়ণে অন্যূন অষ্টচত্বারিংশ সহস্র পংক্তি বিদ্যমান। কিন্তু হোমারের 'ইলিয়ডে' পনের সহস্র ছয় শত তিরানব্বইটী এবং ভার্জ্জিলের 'ইনিডে' নয় সহস্র আট শত আটষট্টিটী মাত্র পংক্তি বিদ্যমান। 'ইলিয়ড' ও 'ওডেসি'—এই উভয় গ্রন্থের পংক্তি-সংখ্যা একত্র করিলেও ত্রিশ সহস্রের অধিক হয় না। আকারে এই; বিষয়ের গুরুত্বও যে আরও কত অধিক, তাহা কি বলিব? যে কোনও সমাজের, যে কোনও ধর্ম্মের, যে কোনও নীতির যদি মূল তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে চান, মহাভারতে তাহা খুঁজিয়া পাইবেন। বিশাল মহাভারত গ্রন্থের এক একটী অংশ লইয়াই কত পণ্ডিতের মস্তিষ্ক কত প্রকারে বিঘূর্ণিত হইয়াছে! মহাভারতের টীকাকারগণের মধ্যে বৈশম্পায়ন, নীলকণ্ঠ অর্জ্জুন মিশ্র, চতুর্ভুজ মিশ্র, জনার্দ্দন ভট্ট, শ্রীনিবাস আচার্য্য, আনন্দপূর্ণ মুনি বিদ্যাসাগর প্রভৃতি সবিশেষ প্রসিদ্ধ। স্বয়ং শঙ্করাচার্য্য মহাভারতের অন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার টীকা করিয়াছেন; শ্রীধরস্বামী, রামানুজ, বল্লভাচার্য্য, মাধবাচার্য্য, বলদেব বিদ্যাভূষণ, আনন্দতীর্থ, বিজ্ঞানভিক্ষু, দত্তাত্রেয়,—কত নাম করিব?—গীতার ভাষ্যকার ও টীকাকার অসংখ্য। পাশ্চাত্য-দেশে গ্রীক-ভাষায় 'গালেনাস ডেমিত্রিয়াস' প্রথমে গীতার অনুবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়। কাশীতে আসিয়া, সংস্কৃত-ভাষা শিখিয়া, তিনি গীতার অনুবাদ করিয়াছিলেন। কাশীতেই তাঁহার লোকান্তর হয়; তৎপরে তাঁহার অনুবাদিত গ্রন্থ তাঁহার এক বন্ধু এথেন্সে লইয়া গিয়া মুদ্রিত করিয়াছিলেন। ইংরেজের মধ্যে চালস উইলকিন্স ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে গীতার অনুবাদ করেন। সেই গীতা, ওয়ারেণ হেষ্টিংসের উদ্যোগে, ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। প্রসিদ্ধ জর্ম্মণ পণ্ডিত শ্লেজেল ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে লাটিন-ভাষায় গীতার অনুবাদ প্রকাশ করেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে এক্ষণে পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষায় গীতার অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে, তাঁহারই আদেশ অনুসারে, পারস্য-ভাষায় মহাভারতের অনুবাদ হয়। কত বলিব? মহাভারতের মহিমার কি অন্ত আছে? মহাভারতের মাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে মহাভারতকার সত্যই বলিয়া গিয়াছেন,—

"যথা সমুদ্রো ভগবান্ যথাহি হিমবান্ গিরিঃ। খ্যাতা বুভৌরত্ননিধী তথা ভারতমুচ্যতে।"

সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী সমুদ্র ও হিমবান্ শৈল যেমন রত্ননিধি বলিয়া বিখ্যাত, ভারতও তদ্রূপ।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

সূর্য্যবংশ।

শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিলে, দেখিতে পাই,—প্রাচীন কালে দুইটী প্রধান রাজবংশ ভারতবর্ষের শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। সেই দুই রাজবংশের নাম—সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশ। রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণাদি গ্রন্থে সেই সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশের বিবরণ পরিবর্ণিত আছে। সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশ হইতে যে সকল শাখা-প্রশাখা দেশে বিদেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, পুরাণাদিতে তাহারও আভাস পাওয়া যায়। তবে স্থূল দৃষ্টিতে দেখিলে, রামায়ণে, মহাভারতে এবং পুরাণ-পরম্পরায় লিখিত বংশ-তালিকার মধ্যে অনেকস্থলে অমিল দেখিয়া অনেকে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে পারেন। কোনও পুরাণে পুরুরবার পাঁচপুত্র, কোন পুরাণে আট পুত্র, কোন পুরাণে সাত পুত্রের বিষয় লিখিত আছে। কোনও পুরাণে জহ্নুর পুত্র সুজহ্নু, কোনও পুরাণে জহ্নুর পুত্র পুরু, কোনও পুরাণে জহ্নুর পুত্র সুনহ দৃষ্ট হয়। সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিতে, এ সকল বড়ই বিসদৃশ বলিয়া মনে হয় না কি? কিন্তু বাস্তব ইহার কারণ—অন্যরূপ। প্রথমতঃ,—কত কোটী কল্প কালের কত কোটী কল্প লোকের কত জনের পরিচয় সম্ভবপর? সম্ভবপর নহে বলিয়াই পুরাণকার আবশ্যকানুসারে বিশেষ বিশেষ বংশের বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিগণের নামোল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাই দেখিতে পাই,—কোথাও 'পুত্র' বলিয়া উল্লেখ আছে, কোথাও 'বংশসম্ভূত' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যেখানে "অনমিত্রস্যোবান্বয়ে পৃশ্নি তস্মাচ্চশ্বফল্কঃ" এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়, সেখানে অনমিত্রের বংশে পৃশ্নি জন্মগ্রহণ করেন এবং পৃশ্নির পুত্র শ্বফল্ক ইহাই বুঝিতে পারা যায়। দ্বিতীয়তঃ,—লিপিকার-প্রমাদ বশেও অনেক নামের পাঠান্তর ঘটিয়াছে। পুরুরবার এক পুত্রের নাম—কোনও গ্রন্থে 'শতায়ু' আছে, কোনও গ্রন্থে 'সত্যায়ু' আছে; আর এক পুত্রের নাম—কোনও গ্রন্থে 'রয়' আছে, কোনও গ্রন্থে 'বয়' আছে। জহ্নুর পুত্রের নাম—কোনও গ্রন্থে সুজহ্নু, কোনও গ্রন্থে সুনহ দৃষ্ট হয়। এরূপ নামান্তর হওয়ার কারণ—লিপিকর-প্রমাদ ভিন্ন অন্য আর কি বলিতে পারি? যাহা হউক, প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের নাম-সম্বন্ধে কিন্তু প্রায়ই অনৈক্য দেখা যায় না। দশরথের পুত্রের নাম রামচন্দ্র কিংবা পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির,—এরূপ প্রসিদ্ধ বাক্যে কোথাও অসামঞ্জস্য নাই। আমরা রামায়ণ, মহাভারত এবং অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও উপপুরাণ সমূহ আলোড়ন করিয়া, সকল পুরাণের বংশপর্য্যায় প্রকাশ করিতেছি। তৎসমুদায় মিলাইয়া দেখিলে, যদিও স্থানে স্থানে পার্থক্য দৃষ্ট হইবে, কিন্তু মূল বিষয় সম্বন্ধে কখনই মতান্তর ঘটিবে না, পরন্তু বংশ-তালিকার সঙ্গে সঙ্গে তদুল্লিখিত প্রধান প্রধান রাজন্য-বর্গের পরিচয় আপনিই অধিগত হইবে।

প্রাচীন রাজবংশ।

প্রথমে সূর্য্যবংশের বিবরণ প্রকাশ করিতেছি। এই সূর্য্যবংশে—ইক্ষ্বাকু, পুরূরবা, পৃথু, মান্ধাতা, সগর, ভরত, দিলীপ, ককুৎস, রঘু, শ্রীরাম, কুশ, নিমি, অম্বরীষ, প্রভৃতি বহু প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; এবং তাঁহাদের সন্তান-সন্ততি-ক্রমে সহস্র সহস্র মহীপতির আবির্ভাব হইয়াছিল। সকল পুরাণে সকল বংশের সকল ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে যে যে গ্রন্থে যে যে ভাবে যে যে বংশের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, আমরা একে একে তাহাই উল্লেখ করিতেছি। প্রথমতঃ রামায়ণে সূর্য্যবংশের যে পরিচয় পাওয়া যায়, পাঠক তৎপ্রতি লক্ষ্য করুন। তার পর, বিষ্ণু-পুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ এবং ভাগবত প্রভৃতিতে সেই সেই বংশ কিরূপভাবে পরিবর্ণিত হইয়াছে, তৎপ্রতি দৃষ্টি করুন। তাহাতে, কোন্ গ্রন্থের সহিত কোন্ গ্রন্থের কোথায় কিরূপ অসামঞ্জস্য আছে, তাহাও বুঝিতে পারিবেন; অপিচ, সে অসামঞ্জস্যের কারণও কতকটা উপলব্ধি হইবে।

সূর্য্যবংশ।

রামায়ণে—সূর্য্যবংশ।

১। ব্রহ্মা
- মরীচি
- কশ্যপ
- সূর্য্য (বিবস্বান্)
- মনু (বৈবস্বত)

৬। ইক্ষ্বাকু
- কুক্ষি
- বিকুক্ষি
- বাণ
- অনরণ্য

১১। পৃথু
- ত্রিশঙ্কু
- ধুন্ধুমার
- যুবনাশ্ব

১৫। মান্ধাতা
- সুসন্ধি
  - ধ্রুবসন্ধি
  - প্রসেনজিৎ

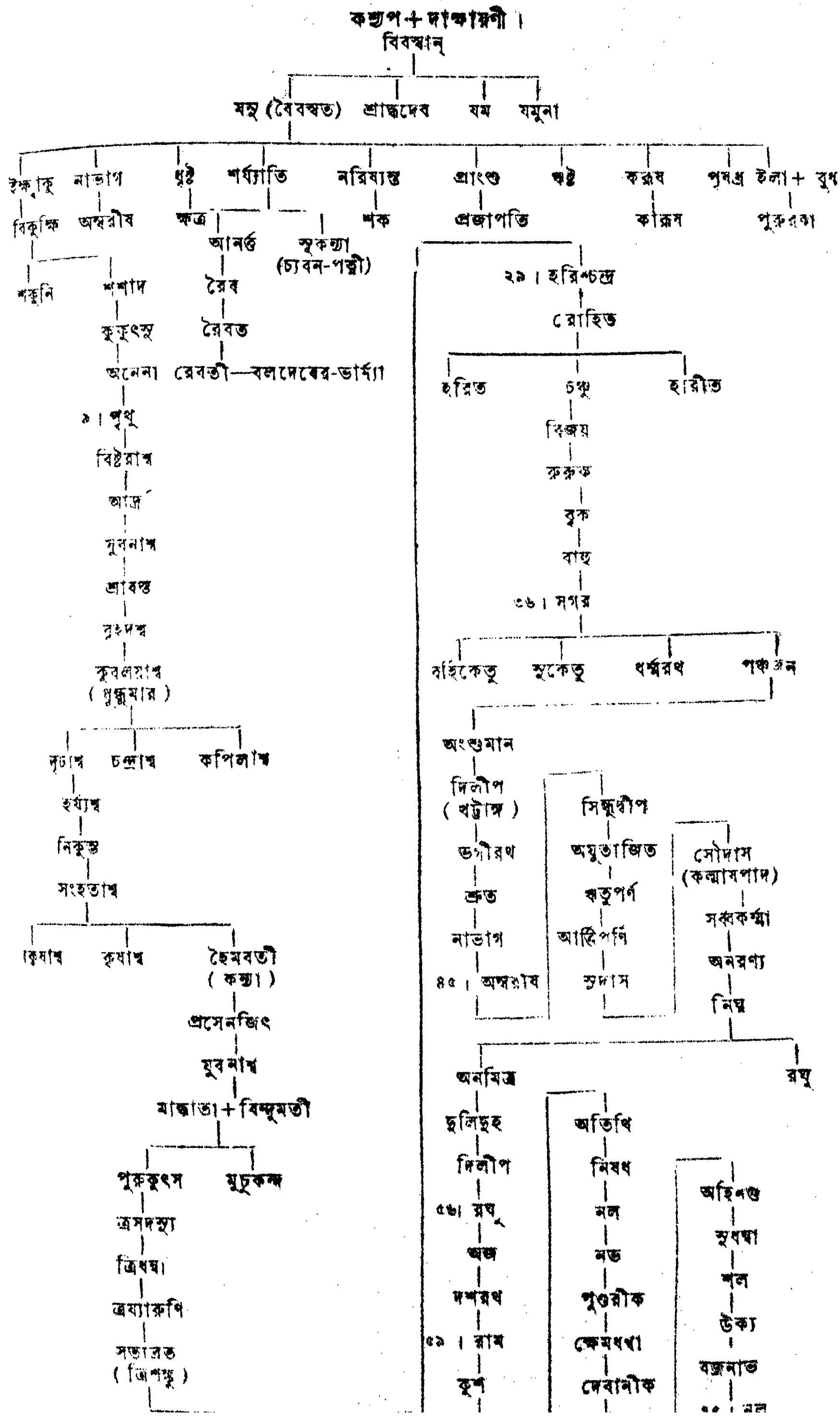
১৮। ভরত (ধ্রুবসন্ধির পুত্র)
- অসিত

২০। সগর
- অসমঞ্জ
- অংশুমান
- দিলীপ

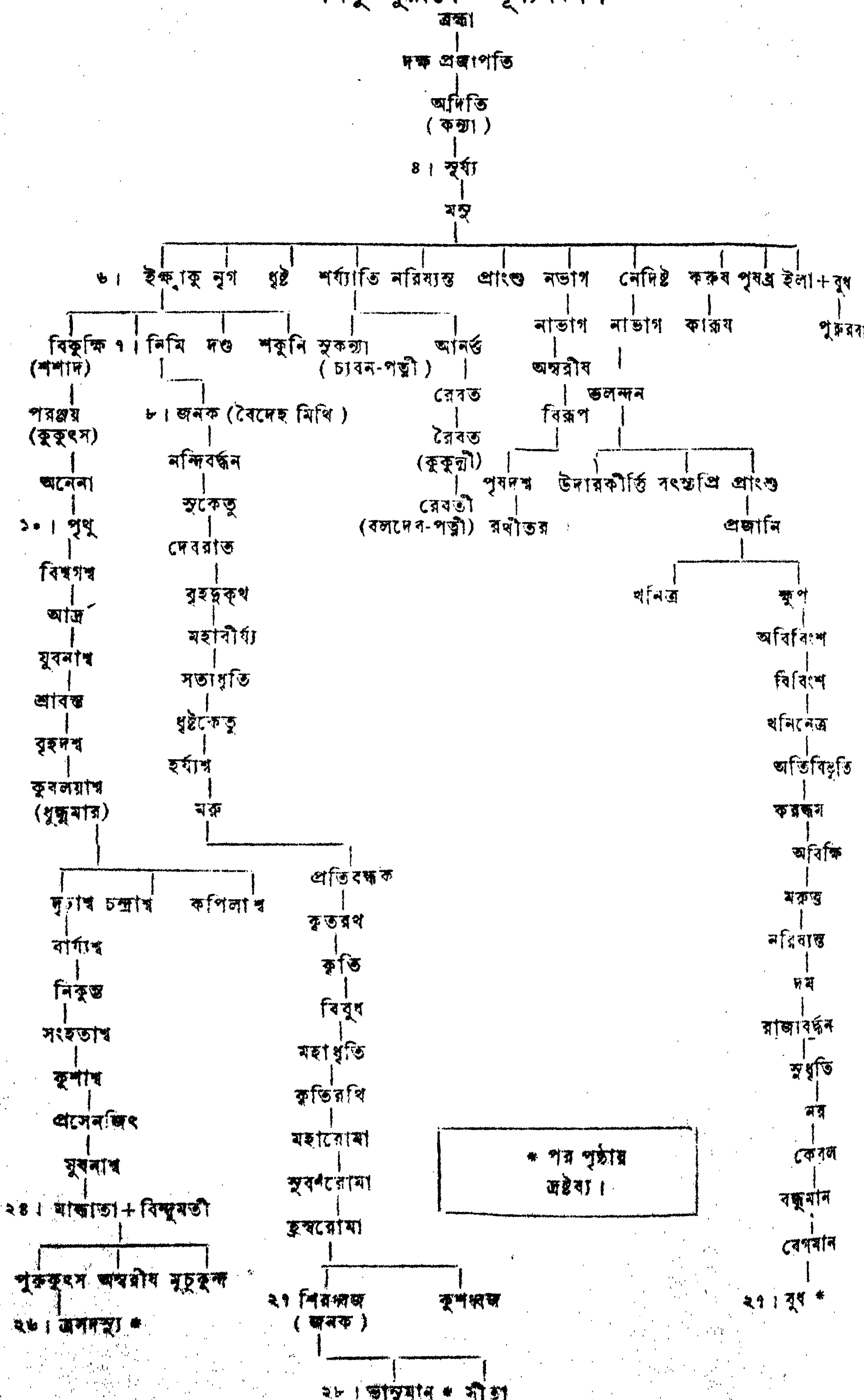
২৪। রঘু
- সৌদাস (কল্মাষপাদ)
- শঙ্খন
  - পুত্র
  - সুদর্শন
- অগ্নিবর্ণ
- শীঘ্রগ
- মরু
- প্রশুশ্রুব

৩২। অম্বরীষ

৩৩। নহুষ
- নাভাগ
  - অজ
  - সুব্রত
- দশরথ
  - রাম
  - লক্ষ্মণ
  - ভরত
  - শত্রুঘ্ন
- রাম
  - লব
  - ৩৮। কুশ


কশ্যপ + দাক্ষায়ণী।
বিবস্বান্
মনু (বৈবস্বত)
শ্রাদ্ধদেব
যম
যমুনা
ইক্ষ্বাকু
নাভাগ
ধৃষ্ট
শর্য্যাতি
নরিষ্যন্ত
প্রাংশু
পৃষধ্র
করূষ
পৃষধ্র
ইলা + বুধ
বিকুক্ষি
অম্বরীষ
ক্ষত্র
আনর্ত্ত
সুকন্যা
(চ্যবন-পত্নী)
শক
প্রজাপতি
কারূষ
পুরূরবা
শকুনি
শশাদ
রৈব
রৈবত
কুকুৎস্থ
অনেনা
রেবতী—বলদেবের-ভার্য্যা
৯। পৃথু
বিষ্টরাশ্ব
আর্দ্র
যুবনাশ্ব
শ্রাবস্ত
বৃহদশ্ব
কুবলয়াশ্ব
(ধুন্ধুমার)
দৃঢ়াশ্ব
চন্দ্রাশ্ব
কপিলাশ্ব
হর্য্যশ্ব
নিকুম্ভ
সংহতাশ্ব
কৃষাশ্ব
কৃষাশ্ব
হৈমবতী
(কন্যা)
প্রসেনজিৎ
যুবনাশ্ব
মান্ধাতা + বিন্দুমতী
পুরুকুৎস
মুচুকুন্দ
ত্রসদস্যু
ত্রিধন্বা
ত্রয্যারুণি
সত্যব্রত
(ত্রিশঙ্কু)
২৯। হরিশ্চন্দ্র
রোহিত
হরিত
চঞ্চু
হারীত
বিজয়
রুরুক
বৃক
বাহু
৩৬। সগর
বর্হিকেতু
সুকেতু
ধর্ম্মরথ
পঞ্চজন
অংশুমান
দিলীপ
(খট্টাঙ্গ)
ভগীরথ
শ্রুত
নাভাগ
৪৫। অম্বরীষ
সিন্ধুদ্বীপ
অযুতাজিত
ঋতুপর্ণ
আর্ত্তিপর্ণি
সুদাস
সৌদাস
(কল্মাষপাদ)
সর্ব্বকর্ম্মা
অনরণ্য
নিঘ্ন
অনমিত্র
রঘু
দুলিদুহ
দিলীপ
৫৬। রঘু
অজ
দশরথ
৫৯। রাম
কুশ
অতিথি
নিষধ
নল
নভ
পুণ্ডরীক
ক্ষেমধন্বা
দেবানীক
অহীনগু
সুধন্বা
শল
উক্য
বজ্রনাভ

বিষ্ণু-পুরাণে—সূর্য্যবংশ।



৮। ত্রসদস্যু (পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর।)
সম্ভূত
নরণ্য
ষদশ্ব
র্য্যশ্ব
মন্ত্র
ব্রধশ্বা
্যারুণ
ত্যব্রত
ত্রিশঙ্কু)
রিশ্চন্দ্র
রাহিতাশ্ব
হরিত
চঞ্চু
জয় — বসুদেব
রুক
বৃক
বহু
১। সগর
অসমঞ্জা
অংশুমান
দিলীপ
৭। ভগীরথ
শ্রুত
নাভাগ
অম্বরীষ
সিন্ধুদ্বীপ
অযুতাশ্ব
ঋতুপর্ণ
সর্ব্বকাম
সুদাস
সৌদাস
কল্মাষপাদ)
অশ্মক
মূলক
দশরথ
ইলিবিলি
বিশ্বসহ
দলীপ
(খট্বাঙ্গ)
দীর্ঘবাহু
৬৫। রঘু *

২৮। ভানুমান
শতদ্যুম্ন
শুচি
উর্দ্ধবহ
সত্যধ্বজ
কুনি
অঞ্জন
ঋতুজিৎ
অরিষ্টনেমি
শ্রুতায়ু
সূর্য্যাশ্ব
সঞ্জয়
ক্ষেমারি
অনেনা
মীনরথ
সত্যরথ
সাত্যরথি
উপগু
শ্রুত
শাশ্বত
সুধন্বা
সুভাষ
সুশ্রুত
জয়
বিজয়
ঋত
সুনয়
বীতহব্য
সঞ্জয়
ক্ষেমাশ্ব
ধৃতি
বহুলাশ্ব
৬০। কৃতি

২৭। বুধ
তৃণবিন্দু
বিশ্ববল — ইলিলি (কন্যা)
হেমচন্দ্র
সুচন্দ্র
ধূম্রাশ্ব
সৃঞ্জয়
সহদেব
কৃশাশ্ব
সোমদত্ত
জনমেজয়
২৮। সুমতি

* রঘু-বংশের অন্য বিবরণ পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

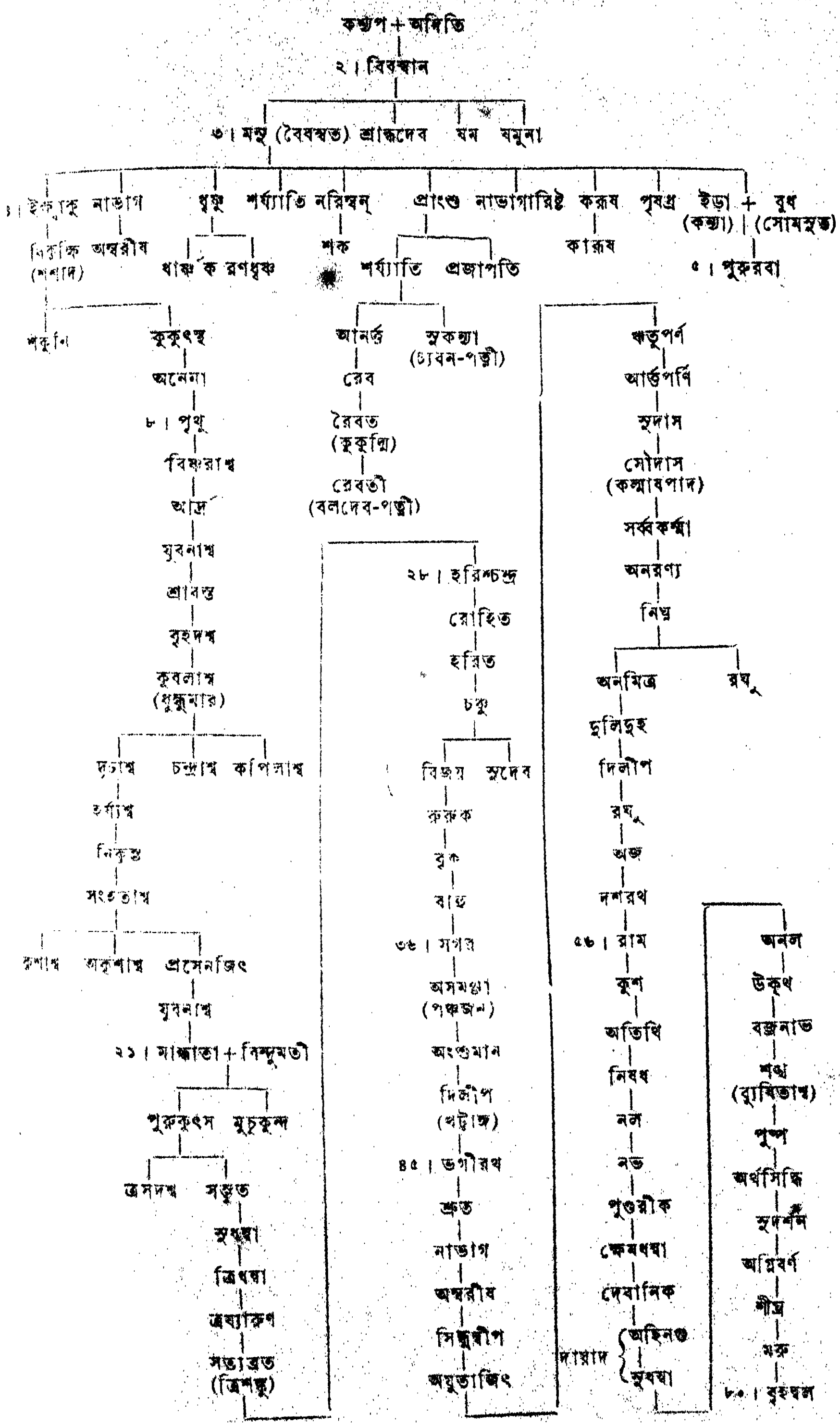
৬৫। রঘু (পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর।)
|
অজ
|
দশরথ

৬৮। রাম | লক্ষ্মণ | ভরত | শত্রুঘ্ন

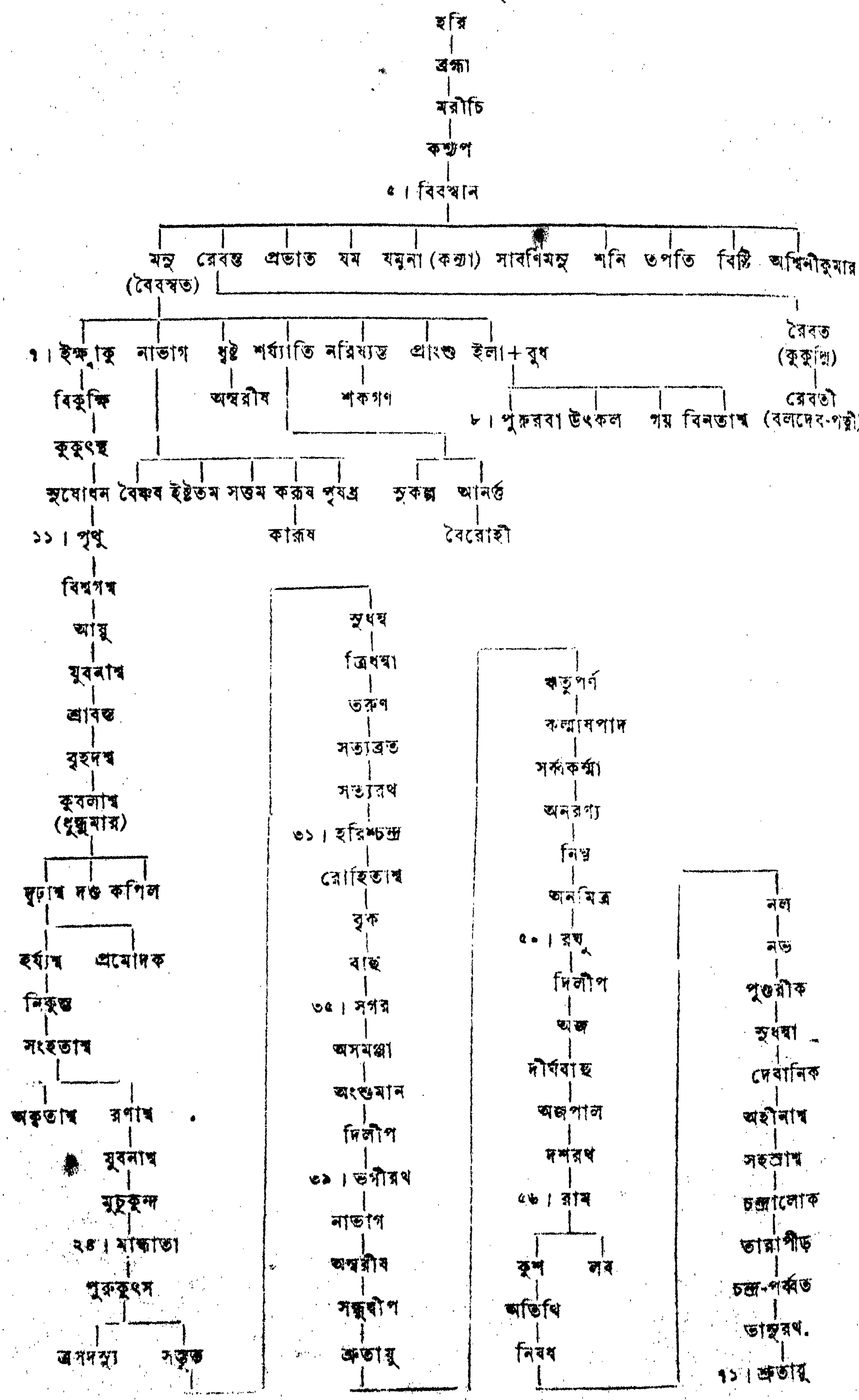
রাম — কুশ, লব
লক্ষ্মণ — অঙ্গদ, চন্দ্রকেতু
ভরত — তক্ষ, পুষ্কর
শত্রুঘ্ন — সুবাহু, শূরসেন

কুশ
অতিথি
নিষধ
৭২। নল
নভ
পুণ্ডরীক
ক্ষেমধন্বা
দেবানীক
অহিনগু
রূপ
রুরু
পারিপাত্র
দল
ছল
উক্থ
বজ্রনাভ
শঙ্খনাভ
ব্যুত্থিতাশ্ব
বিশ্বসহ
হিরণ্যাভ
পুষ্য
ধ্রুবসন্ধি
সুদর্শন
অগ্নিবর্ণ
শীঘ্র
মরু
প্রসুশ্রুত
সুগন্ধি
অমর্ষ
মহস্বান্
বিশ্রুতবান্
১০০। বৃহদ্বল
বৃহৎক্ষণ
গুরুক্ষেপ
বৎস
বৎসব্যূহ
প্রতিব্যোম
দিবাকর
সহদেব
বৃহদশ্ব
ভানুরথ
সুপ্রতীক
মরুদেব
সুনক্ষত্র
কিন্নর
অন্তরিক্ষ
সুবর্ণ
অমিত্রজিৎ
বৃহদ্রাজ
ধর্ম্মী
কৃতঞ্জয়
রণঞ্জয়
সঞ্জয়
শাক্য
শুদ্ধোদন
রাতুল
প্রসেনজিৎ
ক্ষুদ্রক
কুণ্ডক
সুরথ
১২৯। সুমিত্র

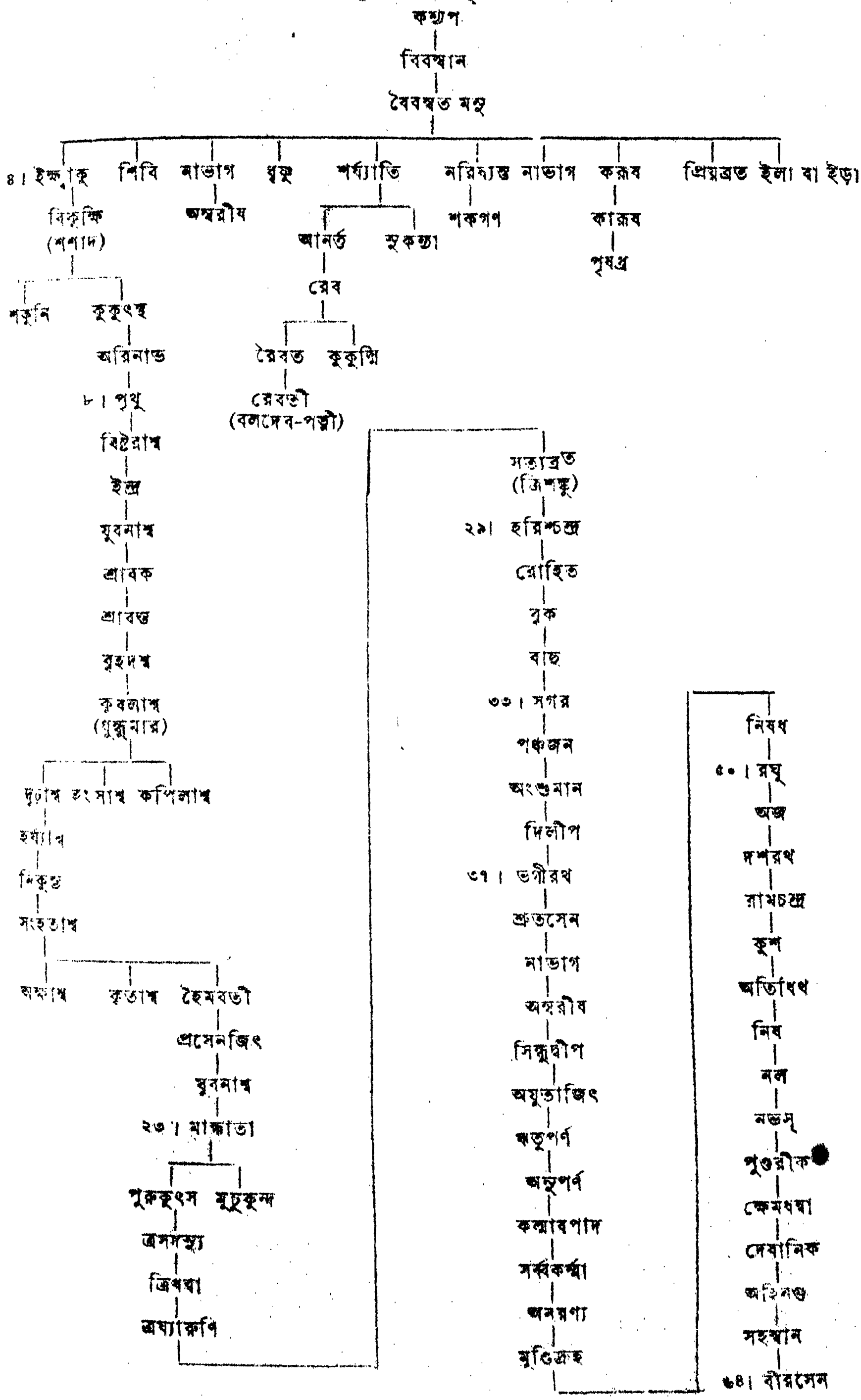
> ১০০ বৃহদ্বল হইতে "ভবিষ্যদ্রাজগণ" নামে উক্ত হইয়াছে।


কশ্যপ + অদিতি
২। বিবস্বান
৩। মনু (বৈবস্বত) শ্রাদ্ধদেব যম যমুনা
৪। ইক্ষ্বাকু নাভাগ ধৃষ্ণু শর্য্যাতি নরিষ্যন্ প্রাংশু নাভাগারিষ্ট করূষ পৃষধ্র ইড়া + বুধ
(কন্যা) (সোমসুত)
বিকুক্ষি (শশাদ) অম্বরীষ
ধার্ষ্ণক রণধৃষ্ণ
শক
শর্য্যাতি প্রজাপতি
কারূষ
৫। পুরূরবা
শকুনি
কুকুৎস্থ
অনেনা
৮। পৃথু
বিষ্টরাশ্ব
আর্দ্র
যুবনাশ্ব
শ্রাবস্ত
বৃহদশ্ব
কুবলাশ্ব (ধুন্ধুমার)
দৃঢ়াশ্ব চন্দ্রাশ্ব কপিলাশ্ব
হর্য্যশ্ব
নিকুম্ভ
সংহতাশ্ব
কৃশাশ্ব অকৃশাশ্ব প্রসেনজিৎ
যুবনাশ্ব
২১। মান্ধাতা + বিন্দুমতী
পুরুকুৎস মুচকুন্দ
ত্রসদশ্ব সম্ভূত
সুধন্বা
ত্রিধন্বা
ত্রয্যারুণ
সত্যব্রত (ত্রিশঙ্কু)
আনর্ত্ত সুকন্যা (চ্যবন-পত্নী)
রেব
রৈবত (ককুদ্মি)
রেবতী (বলদেব-পত্নী)
২৮। হরিশ্চন্দ্র
রোহিত
হরিত
চঞ্চু
বিজয় সুদেব
রুরুক
বৃক
বাহু
৩৬। সগর
অসমঞ্জা (পঞ্চজন)
অংশুমান
দিলীপ (খট্টাঙ্গ)
৪৫। ভগীরথ
শ্রুত
নাভাগ
অম্বরীষ
সিন্ধুদ্বীপ
অযুতাজিৎ
ঋতুপর্ণ
আর্ত্তপর্ণি
সুদাস
সৌদাস (কল্মাষপাদ)
সর্ব্বকর্ম্মা
অনরণ্য
নিঘ্ন
অনমিত্র রঘু
দুলিদুহ
দিলীপ
রঘু
অজ
দশরথ
৫৬। রাম
কুশ
অতিথি
নিষধ
নল
নভ
পুণ্ডরীক
ক্ষেমধন্বা
দেবানিক
দায়াদ অহিনগু সুধন্বা
অনল
উক্‌থ
বজ্রনাভ
শঙ্খ (ব্যুষিতাশ্ব)
পুষ্প
অর্থসিদ্ধি
সুদর্শন
অগ্নিবর্ণ
শীঘ্র
মরু
৮০। বৃহদ্বল

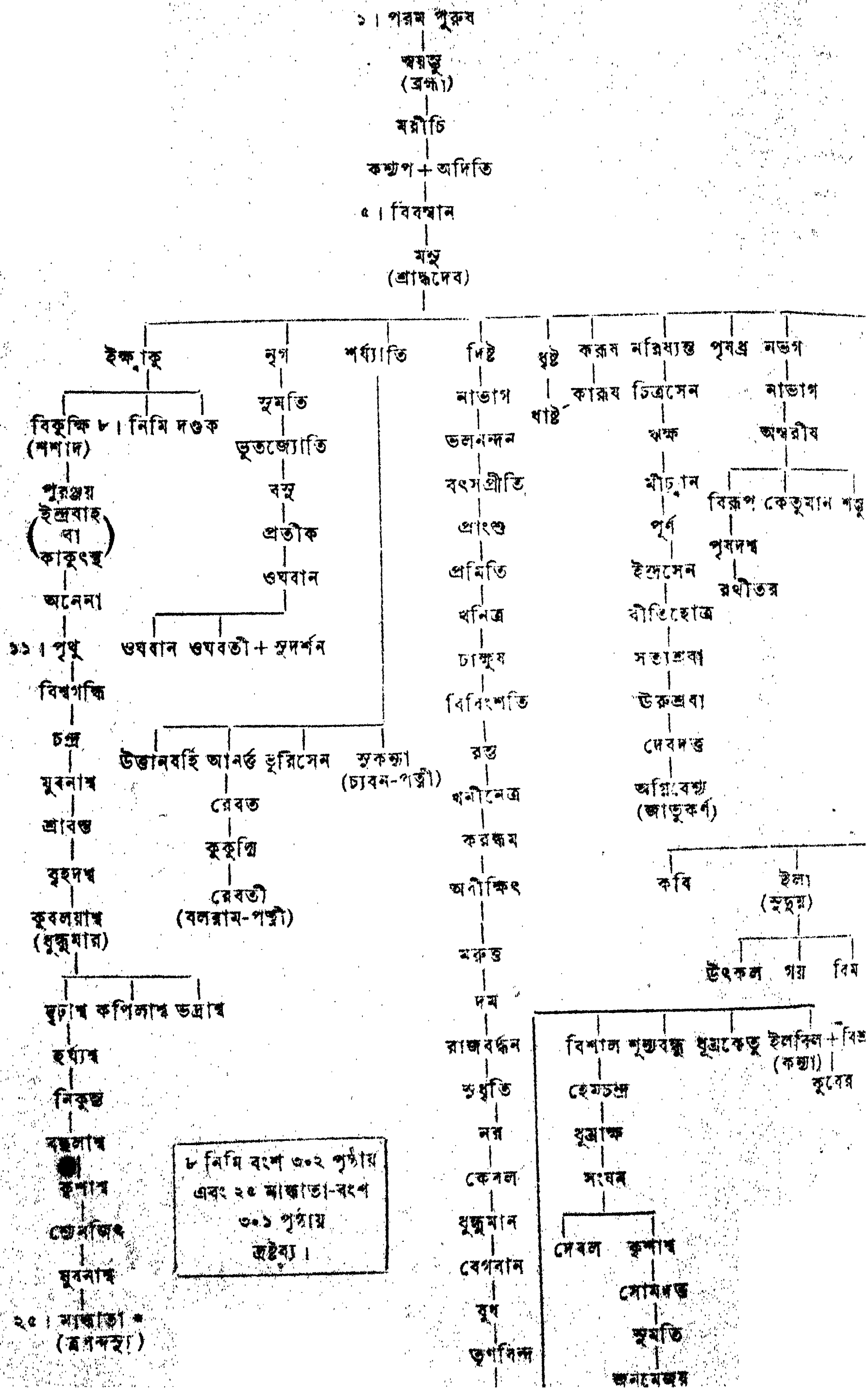
অগ্নিপুরাণে—সূর্য্যবংশ।



শিবপুরাণে—সূর্য্যবংশ।



শ্রীমদ্ভাগবতে—সূর্য্যবংশ।



২৫। মান্ধাতা (ত্রসদ্দস্যু) (পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর।)

- পুরুকুৎস
  - ত্রসদ্দস্যু
  - অনরণ্য
  - হর্য্যশ্ব
  - প্রারুণ
  - ত্রিবন্ধন
  - সত্যব্রত (ত্রিশঙ্কু)
  - ৩১। হরিশ্চন্দ্র
  - রোহিত
  - হরিত
  - চম্প
  - সুদেব
  - বিজয়
  - ভরুক
  - বৃক
  - বাহুক
  - ৪২। সগর
  - অসমঞ্জস
  - অংশুমান
  - দিলীপ
  - ৪৬। ভগীরথ
  - শ্রুত
  - নাভ
  - সিন্ধুদ্বীপ
  - অযুতায়ু
  - ঋতুপর্ণ
  - সর্ব্বকাম
  - সুদাস
  - সৌদাস (কল্মাষপাদ)
  - অশ্মক
  - বালিক (মূলক)
  - দশরথ
  - ঐড়বিড়ি
  - বিশ্বসহ
  - খট্টাঙ্গ
  - দীর্ঘবাহু
  - ৬২। রঘু
  - অজ
  - দশরথ
    - ৬৮। রাম
      - কুশ
        - অতিথি
        - নিষধ
        - নভ
        - পুণ্ডরীক
        - ক্ষেমধন্বা
        - দেবানীক
        - হীন
        - পারিযাত্র
        - বলস্থল
        - বজ্রনাভ
        - সগণ
        - বিধৃতি
        - হিরণ্যনাভ
        - পুষ্য
        - ধ্রুবসন্ধি
        - সুদর্শন
        - অগ্নিবর্ণ
        - শীঘ্র
        - মরু
        - প্রসুশ্রুত
        - সন্ধি
        - অমর্ষণ
        - মহস্বান্
        - বিশ্বাবসু
        - প্রসেনজিৎ
        - তক্ষক
        - ৯২। বৃহদ্বল
        - বৃহদ্রণ
        - বৎসবৃদ্ধ
        - প্রতিব্যোম
        - ভানু
        - দিবাকর
        - সহদেব
        - বৃহদশ্ব
        - ভানুমান
        - প্রতীকাশ্ব
        - সুপ্রতীক
        - মরুদেব
        - সুনক্ষত্র
        - পুষ্কর
        - অন্তরীক্ষ
        - সুতপা
        - অমিত্রজিৎ
        - বৃহদ্রাজ
        - বর্হি
        - কৃতঞ্জয়
        - রণঞ্জয়
        - সঞ্জয়
        - শাক্য
        - শুদ্ধোদ
        - লাঙ্গল
        - প্রসেনজিৎ
        - ক্ষুদ্রক
        - ১১৯। সুমিত্র
      - লব
    - লক্ষ্মণ
      - অঙ্গদ
      - চিত্রকেতু
    - ভরত
      - তক্ষ
      - পুষ্কল
    - শত্রুঘ্ন
      - সুবাহু
      - শত্রুসেন
- অম্বরীষ
  - যুবনাশ্ব
  - হারীত
- মুচুকুন্দ

ইক্ষ্বাকু-তনয় নিমির বংশ।

(৩০০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

৮। নিমি
- জনক (বৈদেহ ও মিথিল)
- উদাবসু
- নন্দীবর্দ্ধন
- সুকেতু
- দেবরাত
- বৃহদ্রথ
- মহাবীর্য্য
- সুধৃত
- ধৃষ্টকেতু
- হর্য্যশ্ব
- মরু
- প্রতীপ
- কৃতরথ
- দেবমীঢ়
- বিশ্রুত
- মহাধৃতি
- কৃতিরাত
- মহারমা
- স্বর্ণরোমা
- হ্রস্বরোমা
- শীরধ্বজ
  - সীতা (কন্যা)
  - কুশ
    - ধর্ম্মধ্বজ
      - কৃতধ্বজ
        - কেশিধ্বজ
      - মৃতধ্বজ
        - খাণ্ডিক্য
- ভানুমান (কেশিধ্বজের পুত্র)
- শতদ্যুম্ন
- শুচি
- সনদ্বাজ
- উর্জ্জকেতু
- পুরুজিত
- অরিষ্টনেমী
- শ্রুতায়ু
- সুপার্শ্ব
- চিত্ররথ
- ক্ষেমাধি
- সমরথ
- সত্যরথ
- উপগুরু
- উপগুপ্ত
- বস্বনন্ত
- যজুর্ব্বাণ
- শুভাষণ
- শ্রুত
- জয়
- বিজয়
- ঋত
- শুনক
- বীতহব্য
- ধৃতি
- বহুলাশ্ব
- কৃতি

মহাভারতে—সূর্য্যবংশ। *

১। প্রচেতা
- দক্ষ (প্রজাপতি)
- অদিতি (কন্যা) + কশ্যপ
- সূর্য্য (বিবস্বান)
  - মনু
    - বেণ
    - ধৃষ্ণু
    - নরিষ্যন্ত
    - নাভাগ
    - ইক্ষ্বাকু
    - কারূষ
    - শর্য্যাতি
    - পৃষধ্র
    - নাভাগারিষ্ট
    - ইলা
  - যম

* মহাভারতে অন্যান্য স্থলেও বিচ্ছিন্নভাবে সূর্য্য-বংশের বিবরণ আছে। কিন্তু তদনুসরণে ক্রমপর্য্যায় নির্দ্ধারণ দুরূহ।

দেবীভাগবতে—সূর্য্যবংশ।

১। ব্রহ্মা → মরীচি → কশ্যপ → ৪। বিবস্বান → বৈবস্বত মনু

বৈবস্বত মনুর পুত্রগণ: ৬। ইক্ষ্বাকু, নাভাগ, ধৃষ্ট, শর্য্যাতি, নরিষ্যন্ত, প্রাংশু, নৃগ, করূষ, পৃষধ্র

- নাভাগ → অম্বরীষ
- ধৃষ্ট → ধার্ষ্টক
- শর্য্যাতি → আনর্ত্ত, সুকন্যা (চ্যবন-পত্নী)
  - আনর্ত্ত → রেবত → কুকুদ্মি, রেবতী
- ইক্ষ্বাকু → বিকুক্ষি (শশাদ) → কুকুৎস্থ → কাকুৎস্থ → ৯। পৃথু → বিশ্বরন্ধি → চন্দ্র → যুবনাশ্ব → শাবস্ত → বৃহদশ্ব → কুবলয়াশ্ব (ধুন্ধুমার) → দৃঢ়াশ্ব → নিকুম্ভ → বর্হণাশ্ব → কৃশাশ্ব → প্রসেনজিৎ → যৌবনাশ্ব → মান্ধাতা + বিন্দুমতী (ত্রসদস্যু)
  - মান্ধাতা → পুরুকুৎস, মুচুকুন্দ
  - পুরুকুৎস → অনরণ্য → বৃহদশ্ব → হর্য্যশ্ব → ত্রিধন্বা → অরুণ → সত্যব্রত (ত্রিশঙ্কু) → ৩০। হরিশ্চন্দ্র → রোহিত

বৃহদ্ধর্ম্ম-পুরাণে সূর্য্যবংশ।

১। বিষ্ণু → ব্রহ্মা → মরীচি → কশ্যপ → ৫। সূর্য্য → শ্রাদ্ধদেব → ৭। ইক্ষ্বাকু, নৃগ

ইক্ষ্বাকু → শশাদ → পুরঞ্জয় → ১০। পৃথু → বিশ্বগন্ধি → চন্দ্র → যুবনাশ্ব → শ্রাবস্ত → বৃহদশ্ব → কুবলয়াশ্ব → দৃঢ়াশ্ব → হর্য্যশ্ব → নিকুম্ভ → বহুলাশ্ব → কৃশাশ্ব → শ্যেনজিৎ → যুবনাশ্ব → ২৪। মান্ধাতা → অম্বরীষ → বন্ধাতা → যৌবনাশ্ব → নিষধ → বাহুক → ৩০। সগর → অসমঞ্জ → অংশুমান → দিলীপ → ৩৪। ভগীরথ → ভীম → সত্য → দিলীপ → ৩৮। রঘু → অজ → দশরথ

দশরথ → শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

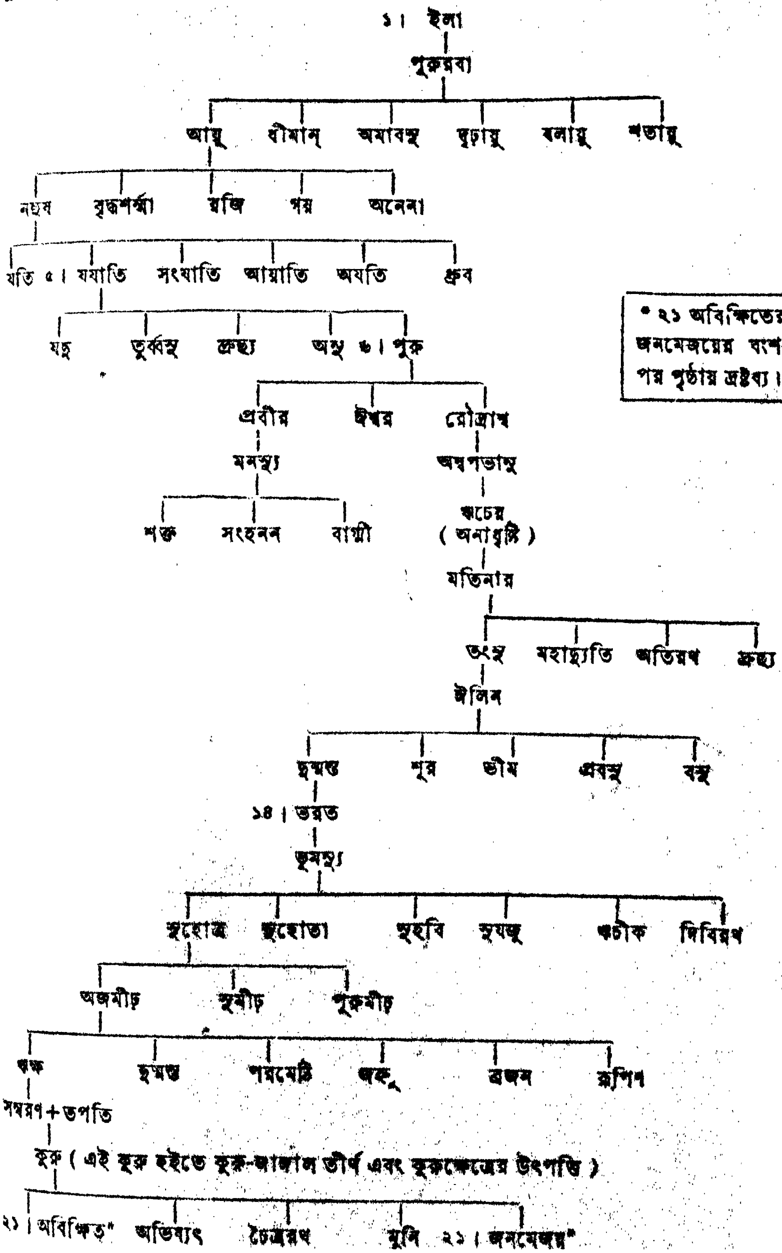
চন্দ্রবংশ।

সূর্য্যবংশের সহিত চন্দ্রবংশের সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন। সূর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠা-পরিচয় স্মরণ করিতে করিতে চন্দ্রবংশের প্রতিষ্ঠা-পরিচয় আপনাপনিই মনোমধ্যে উদয় হয়। যে বৈবস্বত মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি নৃপতি হইতে সূর্য্যবংশের উৎপত্তি, সেই বৈবস্বত মনুর কন্যা ইলা (ইড়া) হইতে চন্দ্রবংশের উদ্ভব। কোনও কোনও পুরাণের মতে সোম (চন্দ্র) ইলাকে বিবাহ করেন; এবং তাঁহা হইতে চন্দ্রবংশের সৃষ্টি হয়। আবার কোনও কোনও পুরাণে দেখিতে পাই,—চন্দ্র-পুত্র বুধের সহিত ইলার বিবাহ হইয়াছিল; এবং বুধের পিতা চন্দ্রের নামানুসারে বুধবংশ, চন্দ্রবংশ নামে অভিহিত হয়। পুরাণ-সমূহের মধ্যে এইরূপ বিষম মতভেদের কারণ কি, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। লিপিকার-প্রমাদ-বশেই যে এরূপ ঘটিয়াছে, স্বতঃই তাহা মনে হয়। এই চন্দ্রবংশে পুরূরবা, নহুষ, যযাতি, যদু, ভরত, পুরু, কুরু, শান্তনু, ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু, যুধিষ্ঠির, দুর্য্যোধন প্রভৃতি বিখ্যাত নৃপতিগণ জন্মগ্রহণ করেন; এবং এই বংশেই শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম, জমদগ্নি ও পরশুরাম প্রভৃতিও অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ধন্বন্তরি, বিশ্বামিত্র, বৃষ্ণি, মধু, বেণ, বসুদেব, কংস প্রভৃতিও এই বংশেরই অন্তর্ভুক্ত। ত্রেতাযুগে সূর্য্যবংশের প্রাধান্যের বিষয় যেরূপ রামায়ণে পরিকীর্ত্তিত আছে; দ্বাপরযুগে চন্দ্রবংশের প্রাধান্যের পরিচয় সেইরূপ মহাভারতে পরিদৃষ্ট হয়। সে হিসাবে, ঐ দুই গ্রন্থ, উভয় বংশের প্রতিষ্ঠা-পরিচয়ের ইতিহাস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রামায়ণ ও মহাভারত ভিন্ন অন্যান্য গ্রন্থেও সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশের বিবরণ নানারূপে লিপিবদ্ধ আছে। তবে আশ্চর্য্যের বিষয়, সূর্য্যবংশের ন্যায় চন্দ্রবংশের বংশ-তালিকায়ও ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারতে, বিষ্ণুপুরাণে, হরিবংশে, ভাগবতে, অগ্নিপুরাণে ও গরুড়পুরাণে চন্দ্রবংশের বংশ-তালিকায় যে ইতর-বিশেষ দৃষ্ট হয়, সূর্য্যবংশের সূচনায় যাহা বলিয়াছি, এতদ্বিষয়েও তাহা বলা যাইতে পারে। এক এক বংশে সহস্র সহস্র ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের সকলের নাম ও পরিচয় পুরাণ-সমূহে স্থান পায় নাই; আবশ্যক অনুসারে এক এক বংশের বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির পরিচয়ই পুরাণ-পরম্পরায় প্রদত্ত হইয়াছে। কয়েকখানি বিশেষ বিশেষ পুরাণ হইতে আমরা চন্দ্রবংশের বংশ-তালিকা প্রকাশ করিতেছি। তাহাতে কোন্ পুরাণের সহিত কোন্ পুরাণের বংশ-তালিকার কিরূপ অসামঞ্জস্য আছে, সহজেই প্রতীত হইবে। যুগযুগান্তর পূর্ব্বের ঘটনাবলী বহুকাল মুখে মুখে প্রচলিত ছিল; সুতরাং অনেক স্থলের অনেক বিষয় বিস্মৃতি-সাগরে বিলীন হওয়াই সম্ভবপর। যাহা হউক, এখনও যাহা পাওয়া যাইতেছে, স্থূলভাবে তাহাই প্রদত্ত হইল। তত্তদ্বিষয়ে যাহা বক্তব্য, স্থানান্তরে তাহাও আলোচিত হইবে।

চন্দ্রবংশ।

মহাভারতে—চন্দ্রবংশ।

ইলার পুত্র পুরুরবা হইতে মহাভারতে চন্দ্রবংশের বংশ-পর্য্যায় লিখিত আছে। তাহাতে চন্দ্রের সহিত ইলার বা পুরুরবার কোনও সম্বন্ধের পরিচয় নাই। তবে হরিবংশ প্রভৃতিতে দেখিতে পাই,—পুরুরবা চন্দ্রবংশ-সম্ভূত। ব্রহ্মার পুত্র অত্রি, অত্রির পুত্র চন্দ্র, চন্দ্রের পুত্র বুধ, বুধের পুত্র পুরুরবা ইত্যাদি। কিন্তু মহাভারতে আছে,—

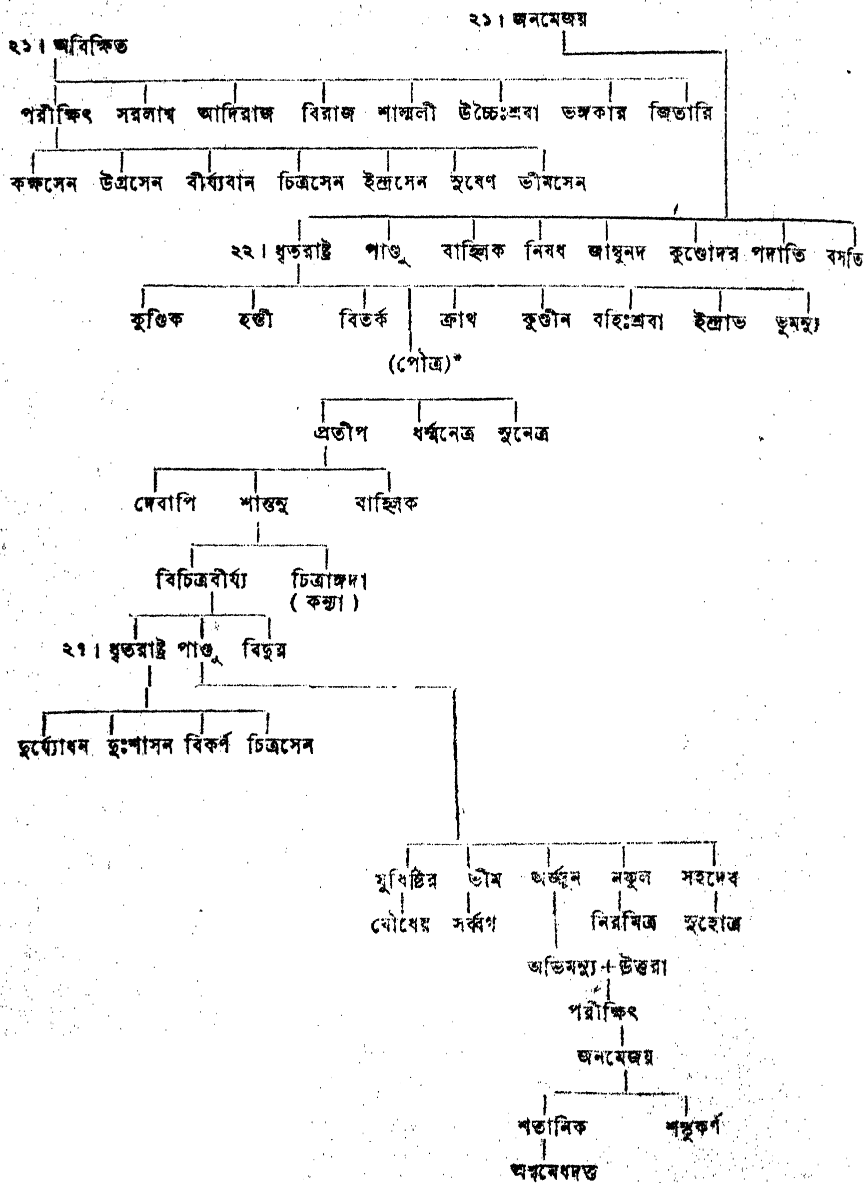


* ২১ অবিক্ষিতের ও ২১ জনমেজয়ের বংশ-পর্য্যায় পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহাভারতে—চন্দ্রবংশ।

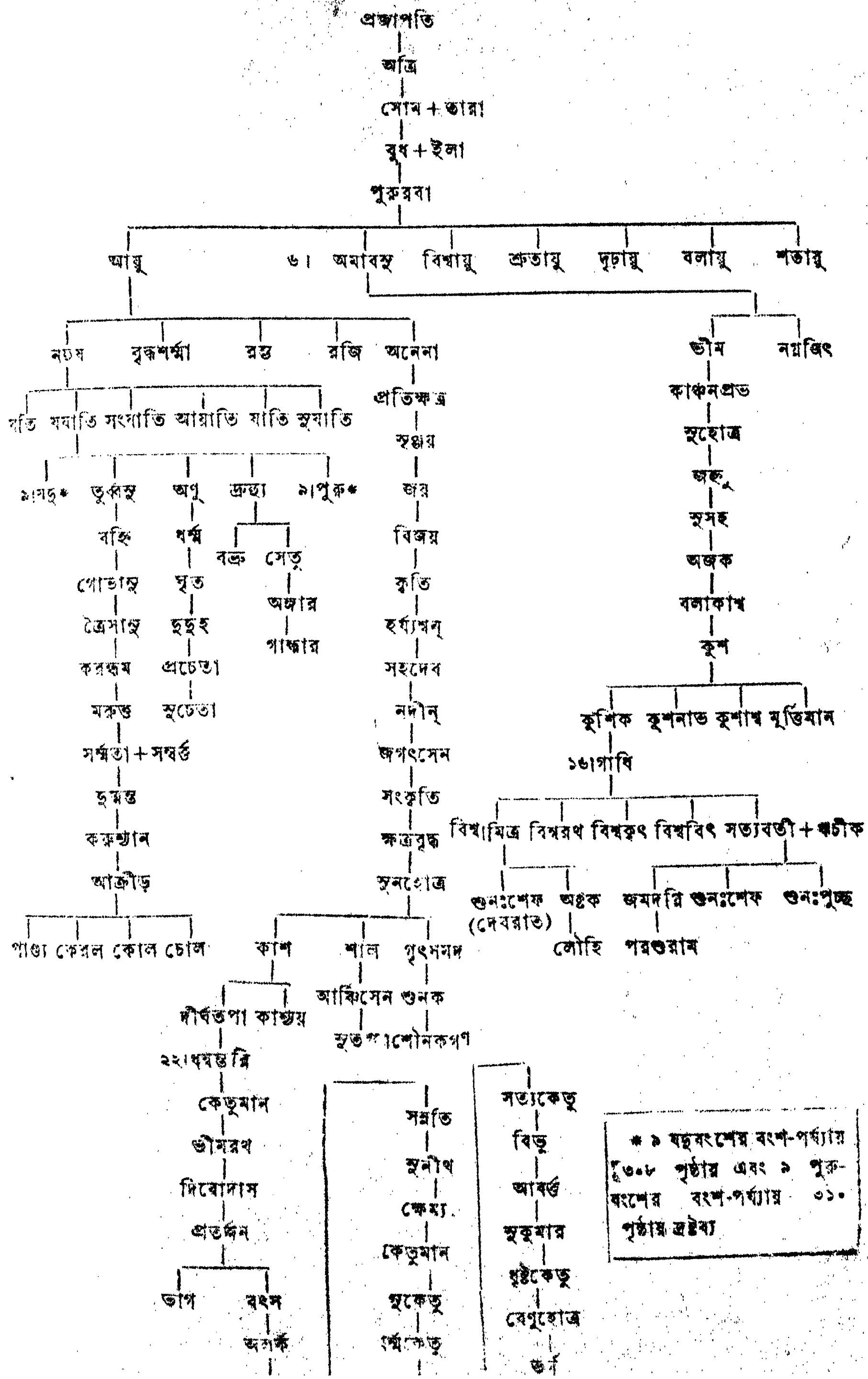
কুরুবংশান্তর্গত অবিক্ষিতের ও জনমেজয়ের বংশ।

(পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর)



* এই তালিকায় ২২শ ও ২৭শ পর্য্যায়ে দুইবার ধৃতরাষ্ট্র ও দুইবার পাণ্ডুর নাম দৃষ্ট হয়। ২১শ ও ৩১শ পর্য্যায়ে জনমেজয়ও দুইবার আছে। অধিকন্তু ২২শ পর্য্যায়ের ধৃতরাষ্ট্রের পৌত্র বলিয়া প্রতীপ প্রভৃতি উক্ত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা কোন পুত্রের পুত্র, তাহার উল্লেখ নাই।

হরিবংশে—চন্দ্রবংশ।

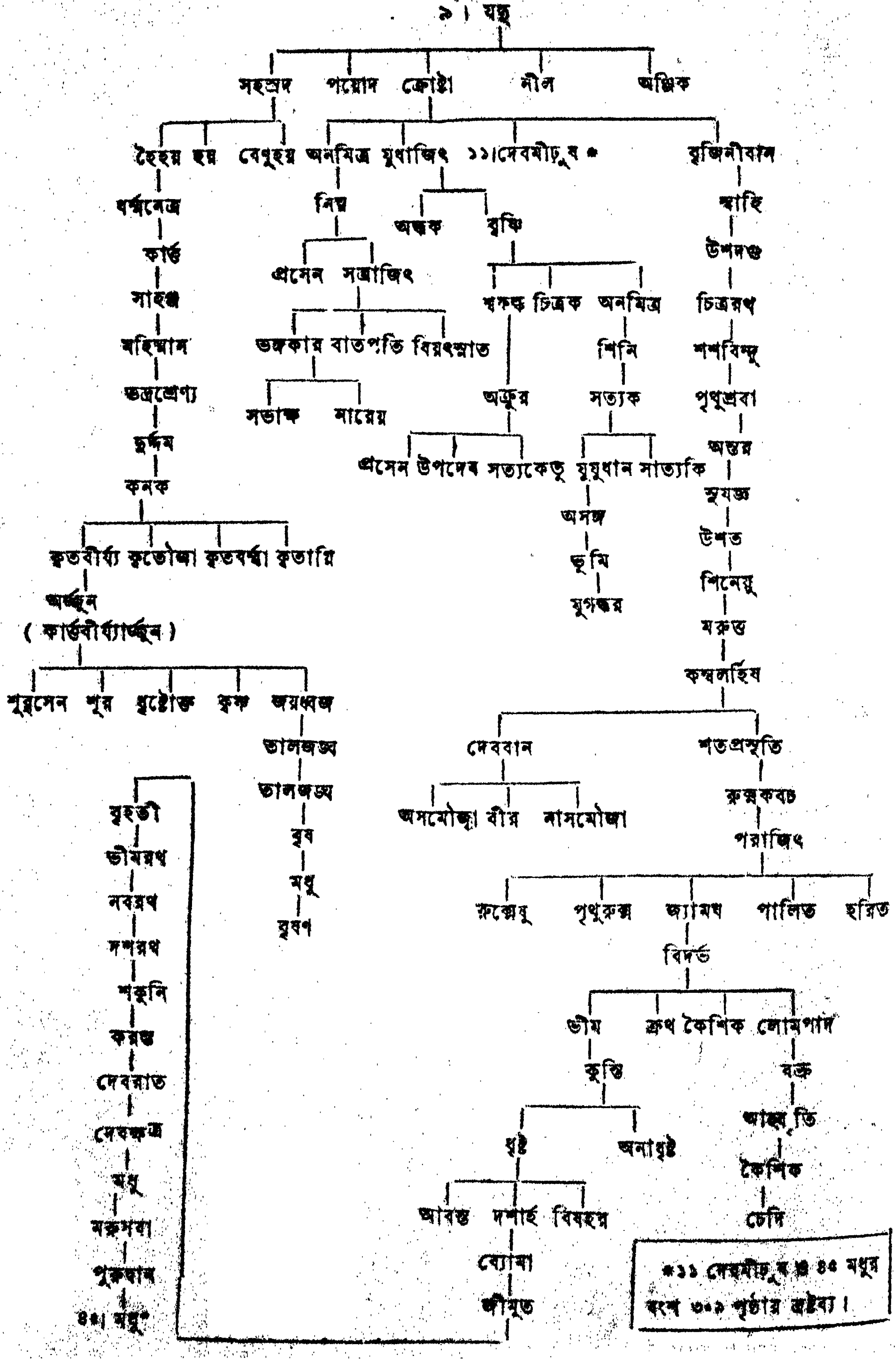


* ৯ যদুবংশের বংশ-পর্য্যায় ৩০৮ পৃষ্ঠায় এবং ৯ পুরু-বংশের বংশ-পর্য্যায় ৩১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হরিবংশে—চন্দ্রবংশ।

যদুবংশ।

(৩০৭ পৃষ্ঠার পর।)



*১১ দেবমীঢ়ুষ ও ৪৫ মধুর বংশ ৩০৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হরিবংশে—চন্দ্রবংশ।

যদুবংশান্তর্গত দেবমীঢ়ুষের ও মধুর বংশ।

(৩০৮ পৃষ্ঠার পর)

১১। দেবমীঢ়ুষ।

- বসুদেব
  - ...ম, শারণ, শঠ, দুর্দ্দম, দমন, শুভ্র, পিণ্ডারক, উশীনর, চিত্রা (সুভদ্রা), শৌরি, ভোজ, বিজয়, বৃকদেব, গদ, শ্রীকৃষ্ণ
    - চিত্রা (সুভদ্রা)
      - অভিমন্যু (অর্জ্জুনপুত্র)
- দেবভাগ
  - উদ্ধব
- দেবশ্রবা
  - একলব্য (নৈষাদি)
- অনাধৃষ্টি
  - নিবর্ত্তশত্রু
- কনবক
  - তন্ত্রিজ
  - তন্ত্রিপাল
- বৎসবান
  - কৌশিক
- গৃঞ্জিম
  - বীর
  - অশ্বহনু
- শ্যাম
  - সুমিত্র
  - শমীক
- শমীক
- গণ্ডূষ
  - চারুদেষ্ণ
  - সুচারু
  - পাঞ্চাল
  - কৃতলক্ষ

৪৫। মধু

- সত্বান
  - ভজমান
    - ...মি, ক্রমিণ, ধৃষ্ট, শূর, পুরঞ্জয়, অযুতাজিৎ, সহস্রাজিৎ, শতাজিৎ, দাসক
  - দেবাবৃধ
    - বভ্রু
  - অন্ধক
    - কুকুর
      - ধৃষ্ণু
        - কপোতরোমা
          - তিত্তিরি
            - পুনর্ব্বসু
              - অভিজিৎ
                - আহুক
                  - দেবক
                    - দেববান
                    - উপদেব
                    - সুদেব
                    - দেবরক্ষিত
                  - উগ্রসেন
                    - কংস, ন্যগ্রোধ, সুনামা, কঙ্ক, শঙ্কু, সুভুমপি, রাষ্ট্রপাল, সুতনু, অনাধৃষ্টি, পুষ্টিমান
                - আহুকী
    - ভজমান
      - বিদূরথ
        - রাজাধিদেব
          - দত্ত, অতিদত্ত, শোণাশ্ব, শ্বেতবাহন, দন্তশত্রু, দণ্ডশর্ম্মা, শমী, শত্রুজিৎ
            - শমী
              - প্রতিক্ষত্র
                - স্বয়ংভোজ
                  - হৃদিক
                    - কৃতবর্ম্মা
                    - শতধন্বা
    - শম
    - কম্বলবর্হিষ
  - বৃষ্ণি

হরিবংশে—চন্দ্রবংশ।

পুরুবংশ।

(৩০৭ পৃষ্ঠার পর)

> * এতদন্তর্গত ৩৫ চিত্ররথ, ৩২ প্রতর্দ্দন, ৩১ গাধি এবং ৩০ বাহ্যাশ্বের বংশ-পর্য্যায় ৩১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

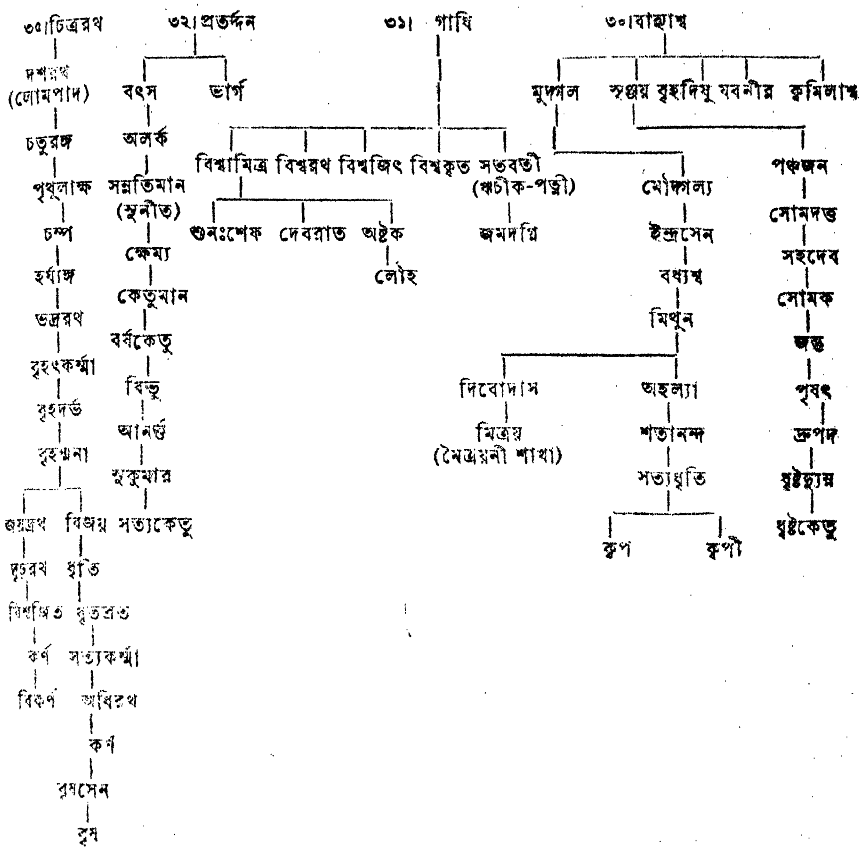
> * এতদন্তর্গত ৩০ পর্য্যায়-ভুক্ত 'কুরু' বংশের বিবরণ ৩১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

- ৯। পুরু
  - মহাবীর্য্য
    - প্রচিন্বান্
      - প্রবীর
        - মনস্যু
          - অভয়দ
            - সুধন্বা
              - সুবাহু
                - ১৭। রৌদ্রাশ্ব
                  - দশার্ণেয়ু
                  - কিকনেয়ু
                  - কক্ষেয়ু
                    - চাক্ষুষ
                    - পরমেক্ষু
                    - সভানর
                      - কালানল
                        - সৃঞ্জয়
                          - পুরঞ্জয়
                            - জনমেজয়
                              - মহাশাল
                                - মহামনা
                                  - উশীনর
                                    - নৃগ
                                      - যৌধেয়গণ
                                    - কৃমি
                                      - কৃমিলা
                                    - নব
                                      - নবরাষ্ট্র
                                    - সুব্রত
                                      - অম্বষ্ঠ
                                    - শিবি
                                      - বৃশদর্ভ
                                      - সুবীর
                                      - কৈকয়
                                      - মদ্রপ
                                  - তিতিক্ষু
                                    - উশদ্রথ
                                      - ফেন
                                        - সুতপা
                                          - বলি
                                            - অঙ্গ
                                              - দধিবাহন
                                                - দিবিরথ
                                                  - ধর্ম্মরথ
                                                    - ৩৫। চিত্ররথ *
                                            - বঙ্গ
                                            - কলিঙ্গ
                                            - সুহ্ম
                                            - পুণ্ড্র
                  - স্থণ্ডিলেয়ু
                  - সন্নতেয়ু
                  - ঋচেয়ু
                    - মতিনার
                      - তংসু
                        - সুরোধ
                          - দুষ্মন্ত
                            - ২৩। ভরত
                              - বীতথ
                                - সুহোত্র
                                  - কাশিক
                                    - কাশেয়
                                    - দীর্ঘতপা
                                      - ২৮। ধন্বন্তরি
                                        - কেতুমান
                                          - ভীমরথ
                                            - দিবোদাস
                                              - ৩২। প্রতর্দ্দন *
                                  - গৃৎসমতি
                                  - বৃহৎ
                                    - অজমীঢ়
                                      - জহ্নু
                                        - অজক
                                          - বলাকাশ্ব
                                            - ৩১। গাধি *
                                      - সুশান্তি
                                        - পুরুজাতি
                                          - ৩০। বাহ্যাশ্ব *
                                      - ঋক্ষ
                                        - সম্বরণ
                                          - ৩০। কুরু *
                                    - দ্বিমীঢ়
                                    - পুরুমীঢ়
                                - সুহোতা
                                - গয়
                                - গর্গ
                                - কপিল
                          - সুষ্মন্ত
                          - প্রবীর
                          - অনঘ
                      - প্রতিরথ
                        - কণ্ব
                          - মেধাতিথি
                      - সুবাহু
                      - গৌরী (কন্যা)
                  - স্থলেয়ু
                  - জলেয়ু
                  - ধনেয়ু
                  - বনেয়ু

হরিবংশে—চন্দ্রবংশ।

পুরুবংশান্তর্গত চিত্ররথ, প্রতর্দ্দন, গাধি, বাহ্যাশ্ব প্রভৃতির বংশ-পর্য্যায়।

(পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর)

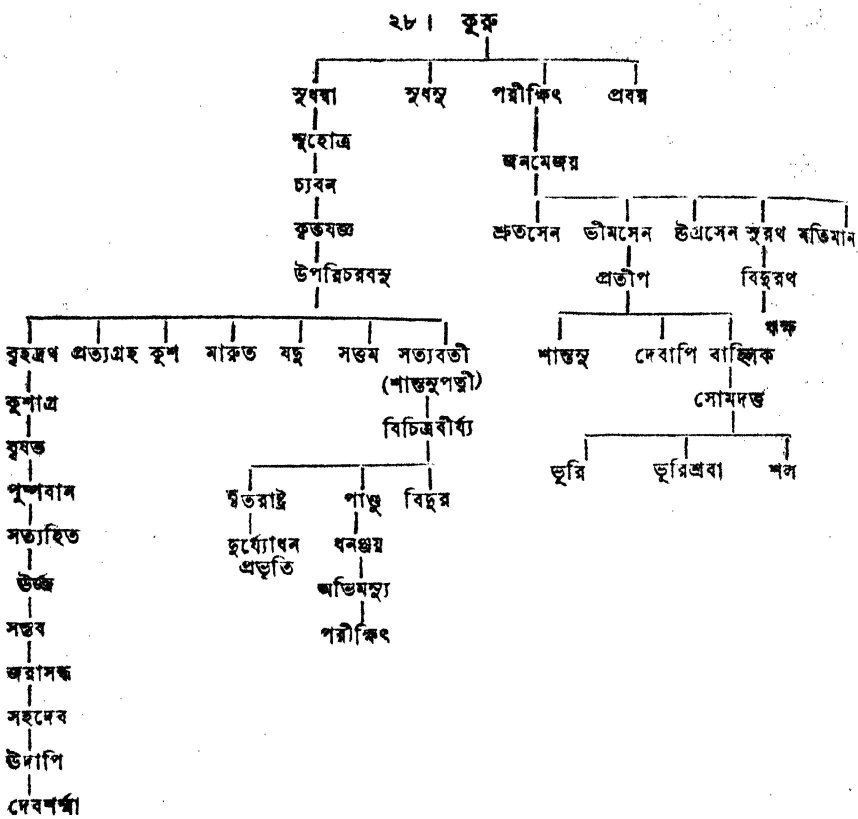


⁂ হরিবংশের মতে,—শ্রীকৃষ্ণের বহু সহস্র পত্নীর মধ্যে আটজন প্রধানা মহিষী ছিলেন। তন্মধ্যে রুক্মিণীর গর্ভে প্রদ্যুম্ন, চারুদেষ্ণ, চারুভদ্র, চারুগর্ভ, সুদংষ্ট্র, দ্রুম, সুষেণ, চারুগুপ্ত, চারুবাহু নামক পুত্র এবং চারুমতী নাম্নী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় মহিষী সত্যভামা। তাঁহার গর্ভে—ভানু, ভীমরথ, ক্ষুপ, রোহিত, দীপ্তিমান, তাম্রজাক্ষ, জলান্তক নামক সাত পুত্র এবং চারি কন্যা; তৃতীয় মহিষী, জাম্ববতীর গর্ভে—সমরশোভন শাম্ব, মিত্রবান, মিত্রবিন্দ, মিত্রবাহু ও সুনীথ নামক পাঁচ পুত্র ও এক কন্যা; চতুর্থ মহিষী নাগ্নজিতীর গর্ভে,—ভদ্রকার, ও ভদ্রবিন্দ নামক দুই পুত্র ও এক কন্যা; পঞ্চম মহিষী শৈব্যা হইতে সংগ্রামজিৎ, সত্যজিৎ, সেনজিৎ, শূর ও সপত্নীজিৎ নামক পুত্র; ষষ্ঠ মহিষী মাদ্রী হইতে বৃকাশ্ব, বৃকনিবৃত্তি ও বৃকদীপ্তি প্রভৃতি পুত্র; সপ্তম মহিষী লক্ষণা হইতে গাত্রবান, গাত্রগুপ্ত, গাত্রবিন্দ প্রভৃতি পুত্র; এবং অষ্টম মহিষী কালিন্দী হইতে শ্রুত-সম্মত ও অশ্রুত নামক পুত্র উৎপন্ন হয়। এতদ্ভিন্ন তাঁহার অন্যান্য মহিষীর গর্ভেও অসংখ্য পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। কৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্নের অনিরুদ্ধ নামে পুত্র জন্মে। অনিরুদ্ধের দুই পুত্র সাহু ও বজ্র; বজ্র হইতে প্রতিরথ এবং প্রতিরথ হইতে সুচারু উদ্ভূত হন। বলদেবের সন্তান-সন্ততির মধ্যে দেখিতে পাই, তাঁহার রেবতী নাম্নী পত্নীর গর্ভে—নিশঠ ও উল্মুক নামে দুই পুত্র জন্মিয়াছিল।

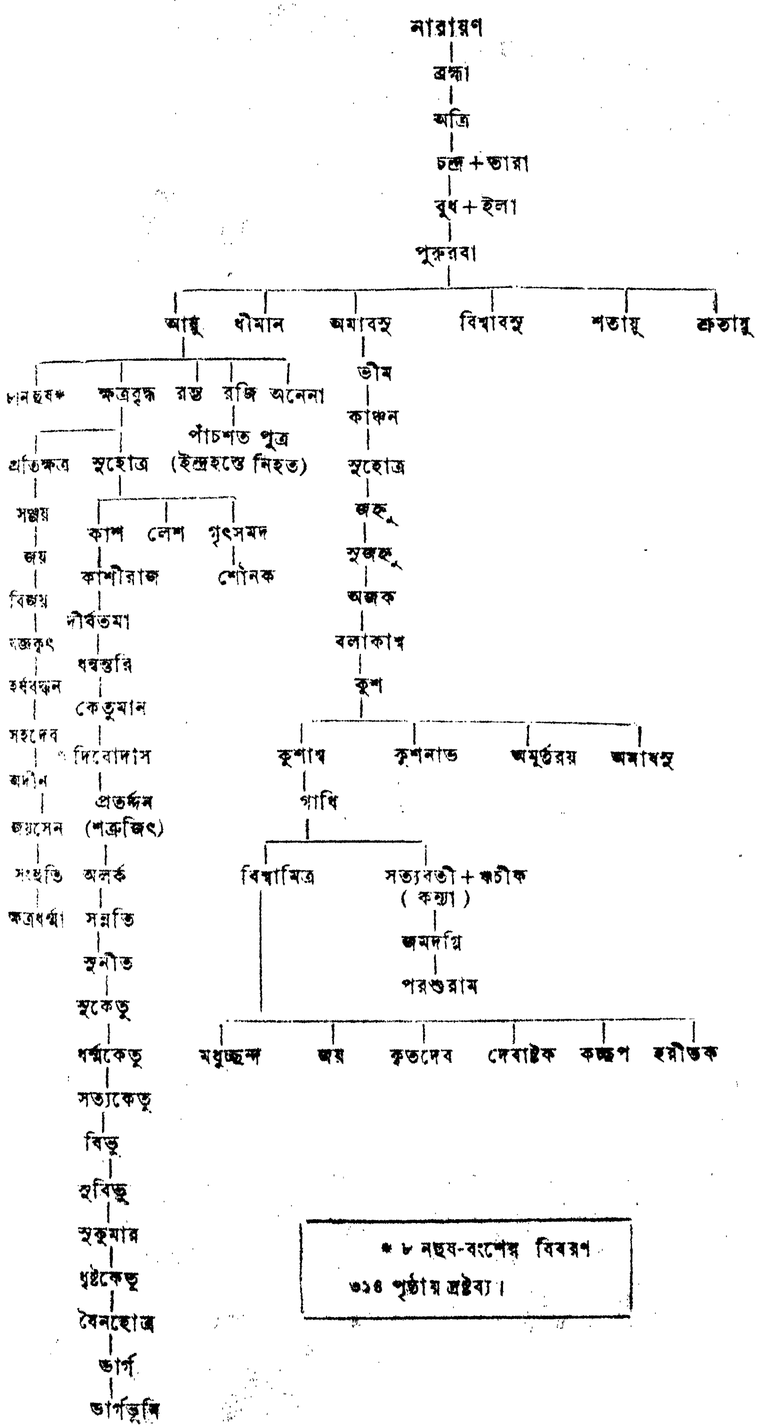
হরিবংশে—চন্দ্রবংশ।

পুরুবংশান্তর্গত কুরুর বংশ।

(৩১০ পৃষ্ঠার পর)



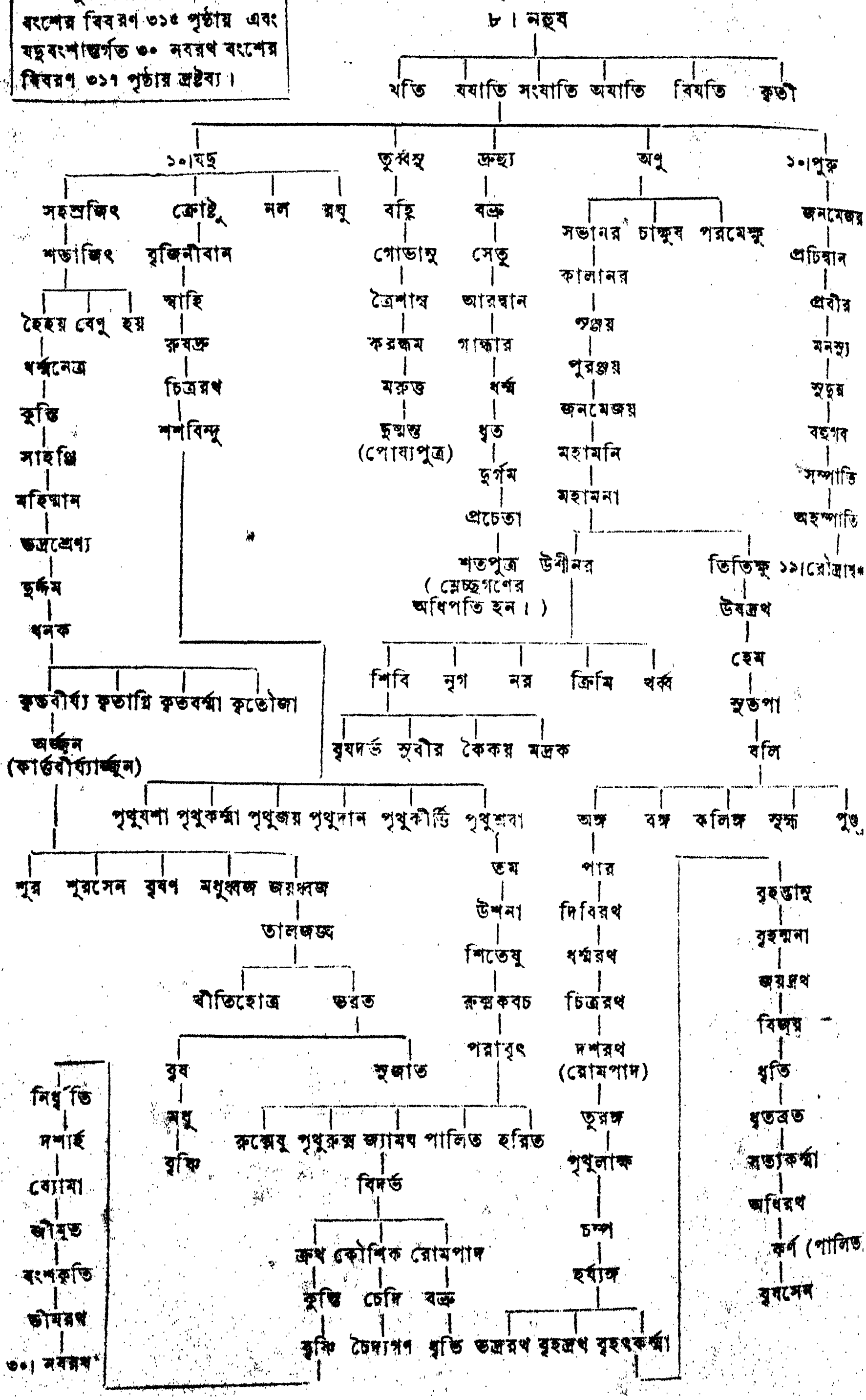
. হরিবংশে চন্দ্রবংশের যে বংশপর্য্যায় দৃষ্ট হয়, তাহার অনেক স্থলে অনেক অসামঞ্জস্য আছে। প্রথমতঃ দেখিতে পাই—৬ষ্ঠ অমাবসু হইতে ১৭শ পর্য্যায়ে গাধি-তনয় বিশ্বামিত্র এবং তাঁহার ভগ্নী সত্যবতীর পৌত্র পরশুরাম (৩০৭ পৃষ্ঠায় বংশপর্য্যায় দ্রষ্টব্য)। কিন্তু অন্যত্র আবার দেখিতে পাই,—অমাবসুর জ্যেষ্ঠ আয়ুর বংশে ৩২শ পর্য্যায়ে গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র বিদ্যমান, এবং সেই বিশ্বামিত্রের ভগ্নী সত্যবতীর গর্ভে জমদগ্নির উৎপত্তি (৩১১ পৃষ্ঠায় বংশপর্য্যায় দ্রষ্টব্য)। উভয় তালিকায় কি আকাশ পাতাল পার্থক্য! উভয় বিশ্বামিত্রেরই পুত্র পৌত্রের নামে মিল আছে। এখন বিচার্য্য—দুই বিশ্বামিত্র একই ব্যক্তি কিনা এবং কালবশে লিপিকার-প্রমাদে এরূপ ঘটিয়াছে কিনা। দ্বিতীয়তঃ, আয়ুর কনিষ্ঠ পুত্র অনেনার বংশে ২২শ পর্য্যায়ে আয়ুর্ব্বেদ-প্রবর্ত্তক ধন্বন্তরির (৩০৭ পৃষ্ঠায় বংশপর্য্যায় দ্রষ্টব্য) নাম দেখিতে পাই। তিনি কাশীর অধিপতি ছিলেন এবং তাঁহার বংশে সুপ্রসিদ্ধ দিবোদাস জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু অন্যত্র আবার দৃষ্ট হয়,—আয়ুর জ্যেষ্ঠ পুত্র নহুষের পৌত্র পুরুর বংশে ২৮শ পর্য্যায়ে ধন্বন্তরি (৩১০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) বিদ্যমান আছেন। উভয় ধন্বন্তরির পিতার নামই দীর্ঘতপা। অধিকন্তু কাশীনরেশ দিবোদাস উভয় ধন্বন্তরিরই প্রপৌত্র (৩০৭ পৃষ্ঠার ও ৩১০ পৃষ্ঠায় বংশ-পর্য্যায় দ্রষ্টব্য)। এইরূপ পরীক্ষিৎ, জনমেজয়, বৃষ্ণি, মধু, অন্ধক, কুরু প্রভৃতি নামের একাধিক বার উল্লেখ আছে। তাহাতেও অনেক স্থলে গণ্ডগোল ঘটিয়া থাকে। কত কাল পূর্ব্বের ঘটনাবলী, কত পরিবর্ত্তন-প্রবাহের মধ্য দিয়া চলিয়া আসিয়াছে, তাই এরূপ ঘটিয়াছে;—ইহাই সম্ভব। ইহাতে ভারতের ও ভারতীয় হিন্দুর প্রাচীনত্ব ভিন্ন অন্য আর কি মনে হইতে পারে?



* ৮ নহুষ-বংশের বিবরণ
৩১৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

নহুষ-বংশ।
(৩১৩ পৃষ্ঠার পর)

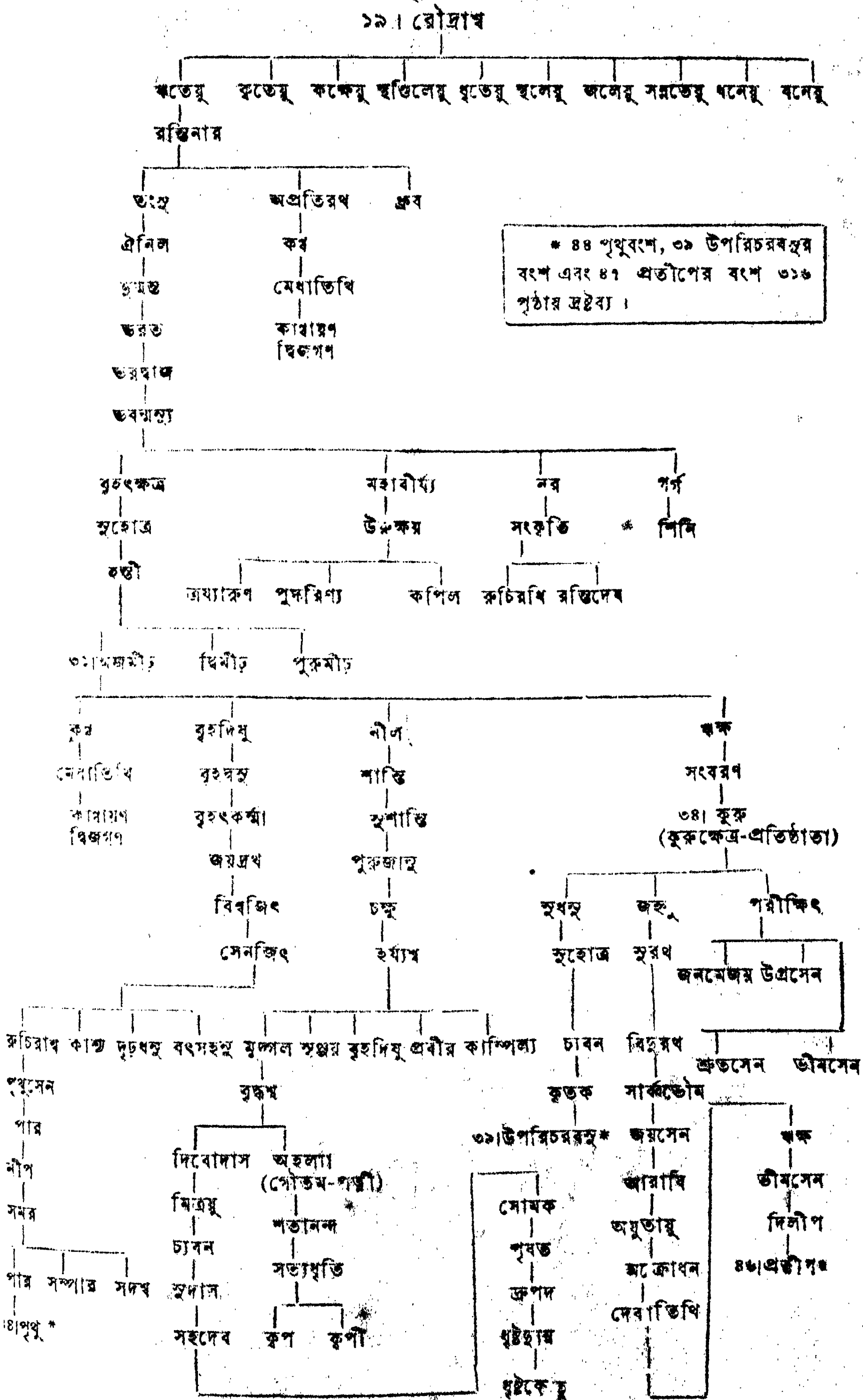
* পুরুবংশান্তর্গত ১৯ রৌদ্রাশ্ব বংশের বিবরণ ৩১৫ পৃষ্ঠায় এবং যদুবংশান্তর্গত ৩০ নবরথ বংশের বিবরণ ৩১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।



বিষ্ণু-পুরাণে—চন্দ্রবংশ।

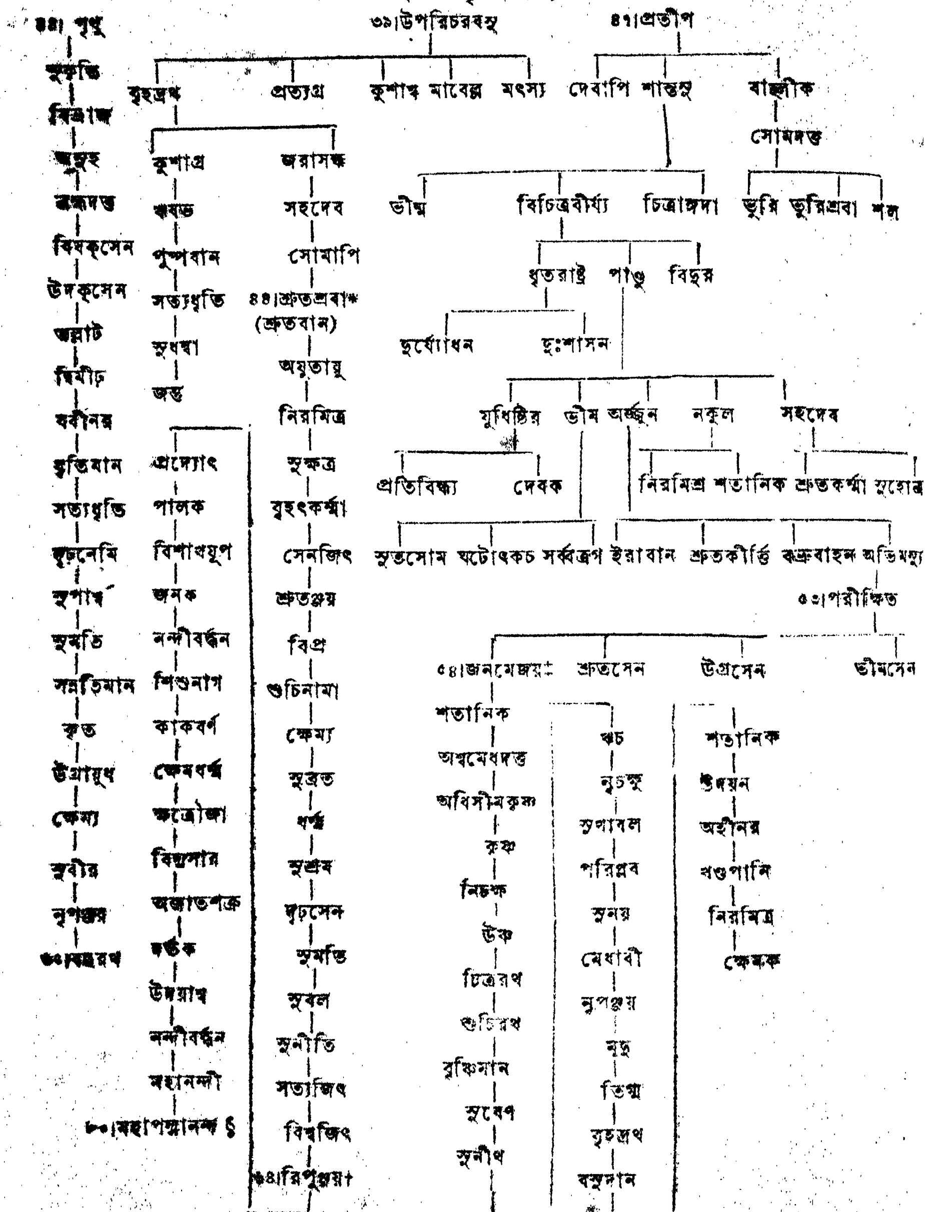
পুরুবংশান্তর্গত রৌদ্রাশ্বের বংশ।

(৩১২ পৃষ্ঠার পর)



পুরুবংশান্তর্গত পৃথুর, উপরিচরবসুর এবং প্রতীপের বংশ।

(৩১৫ পৃষ্ঠার পর)



* ৪৪ শ্রুতবান হইতে পরবর্ত্তী রাজগণ মাগধ-বংশীয় ভবিষ্য নৃপতি নামে অভিহিত হন।

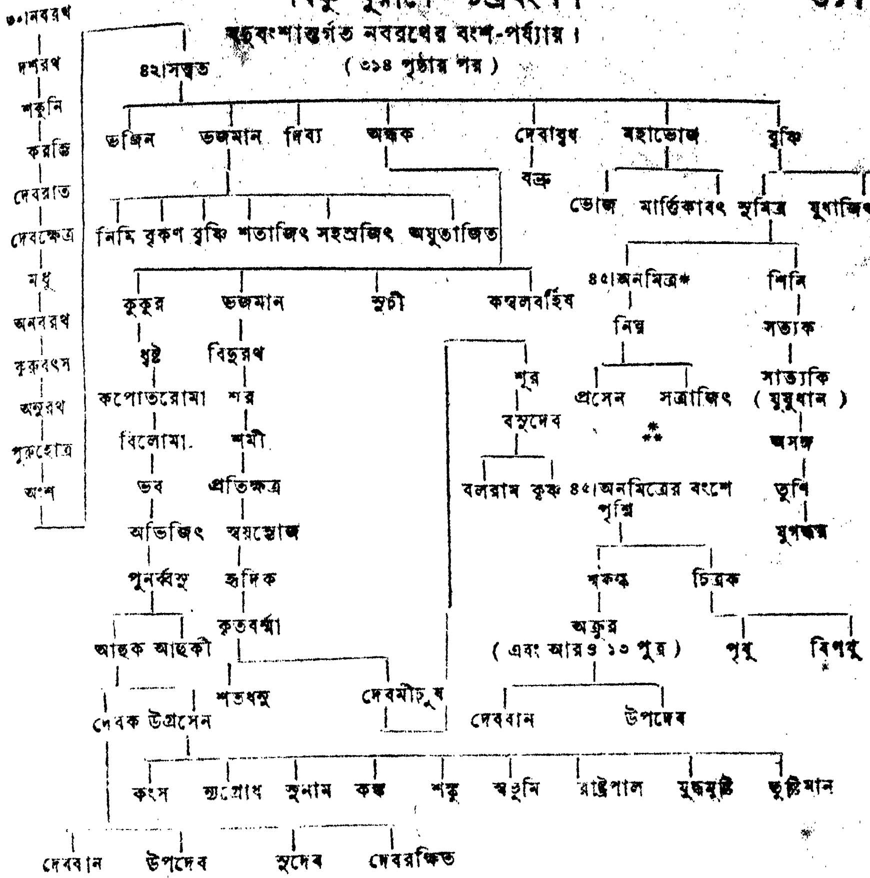
† ৬৪ রিপুঞ্জয়কে হত্যা করিয়া তাঁহার মন্ত্রী সুনিক আপন পুত্র প্রদ্যোৎকে রাজা করেন।

‡ ৫৪ জনমেজয় হইতে পরবর্ত্তী রাজগণ, ভবিষ্য রাজ বলিয়া অভিহিত। কলিযুগে ক্ষেমক রাজায় ঐ বংশের পরিসমাপ্তি।

§ ৮০ মহাপদ্মানন্দ ও তাঁহার আট পুত্রের এক শত বৎসর রাজত্বের পর, কৌটিল্য ব্রাহ্মণের চক্রান্তে মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তৎপরবর্ত্তী বিবরণ ৩১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

যদুবংশান্তর্গত নবরথের বংশ-পর্য্যায়।

(৩১৪ পৃষ্ঠার পর)



ভবিষ্য-রাজগণ।

(৩১৬ পৃষ্ঠার পর)

মৌর্য্য-বংশ।
(নন্দ-বংশের পর।)

৯৩।চন্দ্রগুপ্ত
বিন্দুসার
অশোকবর্দ্ধন
সুযশা
দশরথ
সঙ্গত
শালিশুক
সোমশর্ম্মা
শতধন্বা
১০২।বৃহদ্রথ*

শুঙ্গ-বংশ।
(মৌর্য্য-বংশের পর।)

১০৩।পুষ্পমিত্র
অগ্নিমিত্র
সুজ্যেষ্ঠ
বসুমিত্র
আর্দ্রক
পুলিন্দক
ঘোষবসু
বজ্রমিত্র
ভাগবত
১১২।দেবভূতি

কণ্ব-বংশ।
(শুঙ্গ-বংশের পর।)

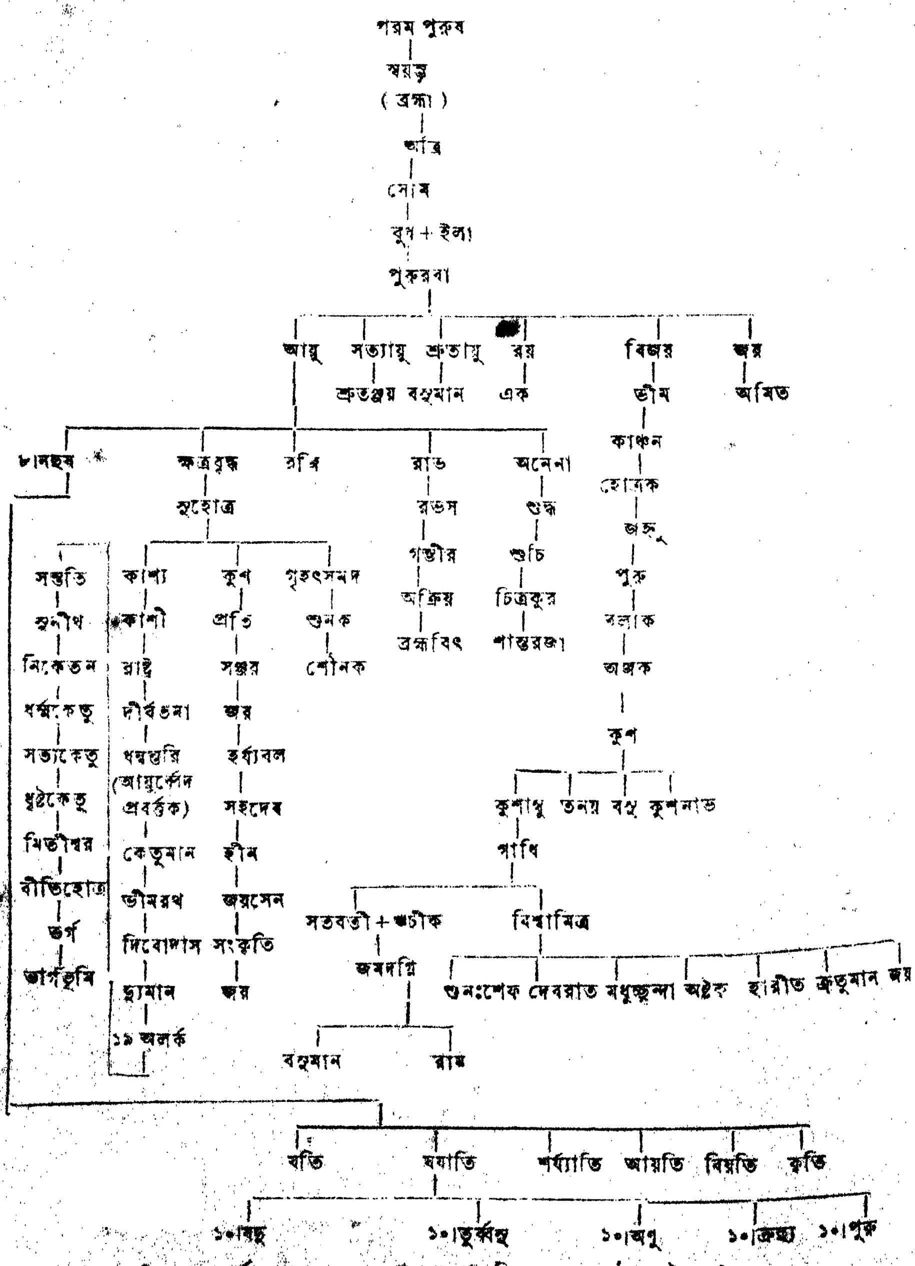
১১৩।দেবভূতি
ভূমিমিত্র
নারায়ণ
১১৬।সুশর্ম্মা

অন্ধ্র-বংশ।
(কণ্ববংশের পর।)

১১৭।শিপ্রক
কৃষ্ণ
(শিপ্রকের ভ্রাতা)
শ্রীশাতকর্ণি
পূর্ণোৎসঙ্গ
শাতকর্ণি
লম্বোদর
দিবিলক
মেঘস্বাতি
পটুমান
অরিষ্টকর্ম্মা
হাল
পুত্তলক
প্রবিল্লসেন
সুন্দরশাতকর্ণি
চকোরশাতকর্ণি
শিবস্বাতি
গোতমীপুত্র
পুলিমান
শাতকর্ণিশিবশ্রী
শিবস্কন্ধ
যজ্ঞশ্রী
বিজয়
চন্দ্রশ্রী
১৪০।পুলোমার্চ্চি

[** বিষ্ণুপুরাণের মতে,—প্রদ্যোৎবংশীয় পাঁচ জন নৃপতি ১৩৮ বর্ষ, তৎপরে শিশুনাগবংশীয় দশ জন নৃপতি ৩৬২ বৎসর, তৎপরে নন্দবংশীয় নয় জন নৃপতি ১০০ বৎসর রাজত্ব করিলে, মৌর্য্যবংশ সিংহাসন প্রাপ্ত হন। সেই বংশের দশ জন নৃপতির রাজ্যকাল—১৩৭ বৎসর। তৎপরে, শুঙ্গবংশ ১১২ বৎসর, কণ্ব-বংশ ৪৫ বৎসর, অন্ধ্র বংশ ৪৫৬ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরবর্ত্তী বিবরণ পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদান্তরে দ্রষ্টব্য।]

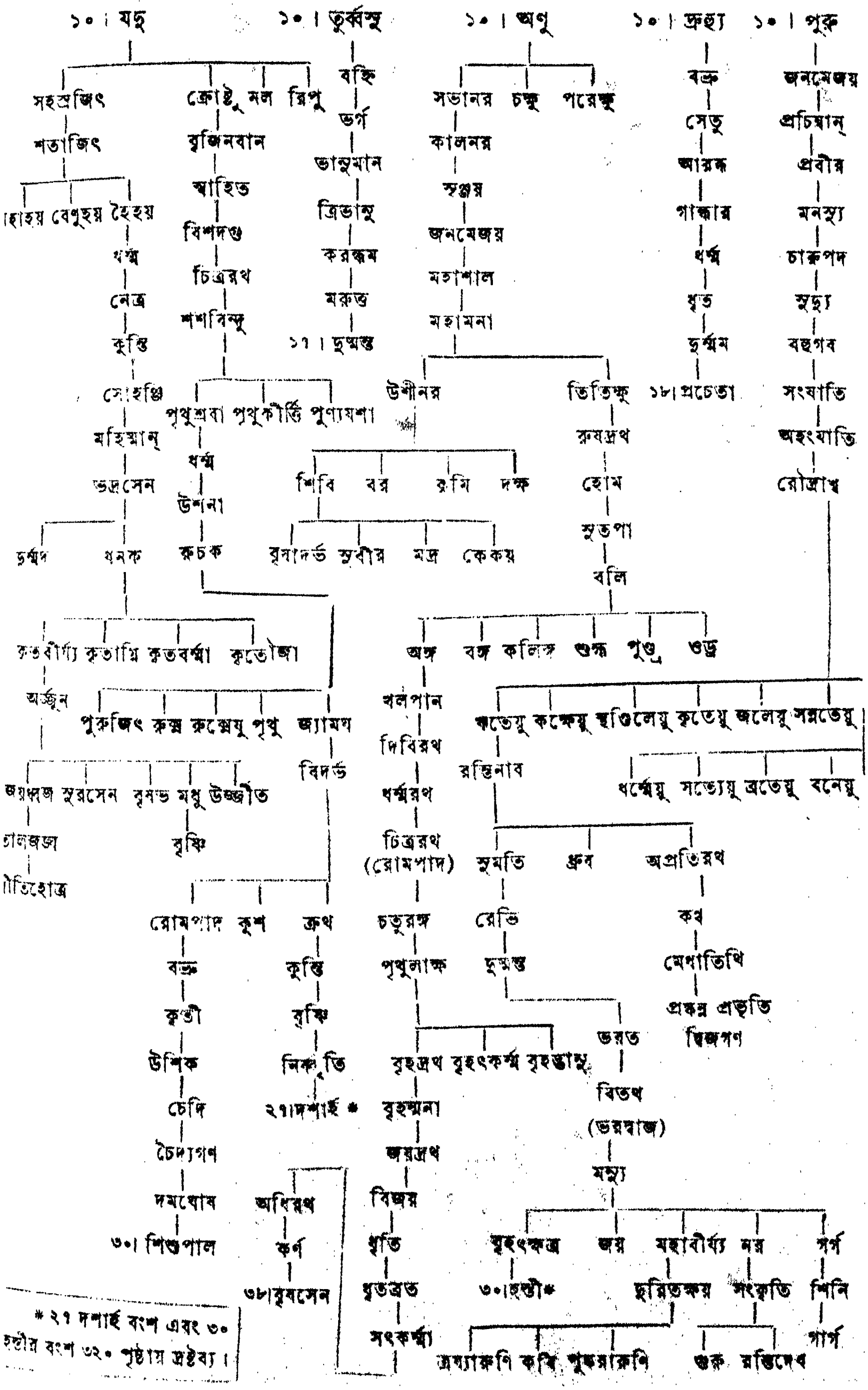
শ্রীমদ্ভাগবতে—চন্দ্রবংশ।



[১০ যদু, তুর্ব্বসু, অণু, দ্রুহ্য ও পুরু বংশের বিবরণ ৩১৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।]

যদু, তুর্ব্বসু, অণু, দ্রুহ্যু ও পুরুর বংশাবলী।

(৩১৮ পৃষ্ঠার পর।)



* ২৭ দশার্হ বংশ এবং ৩০ হস্তীর বংশ ৩২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে—চন্দ্রবংশ।

পুরুবংশান্তর্গত হস্তীর এবং যদুবংশান্তর্গত দশার্হের বংশ-পরিচয়।

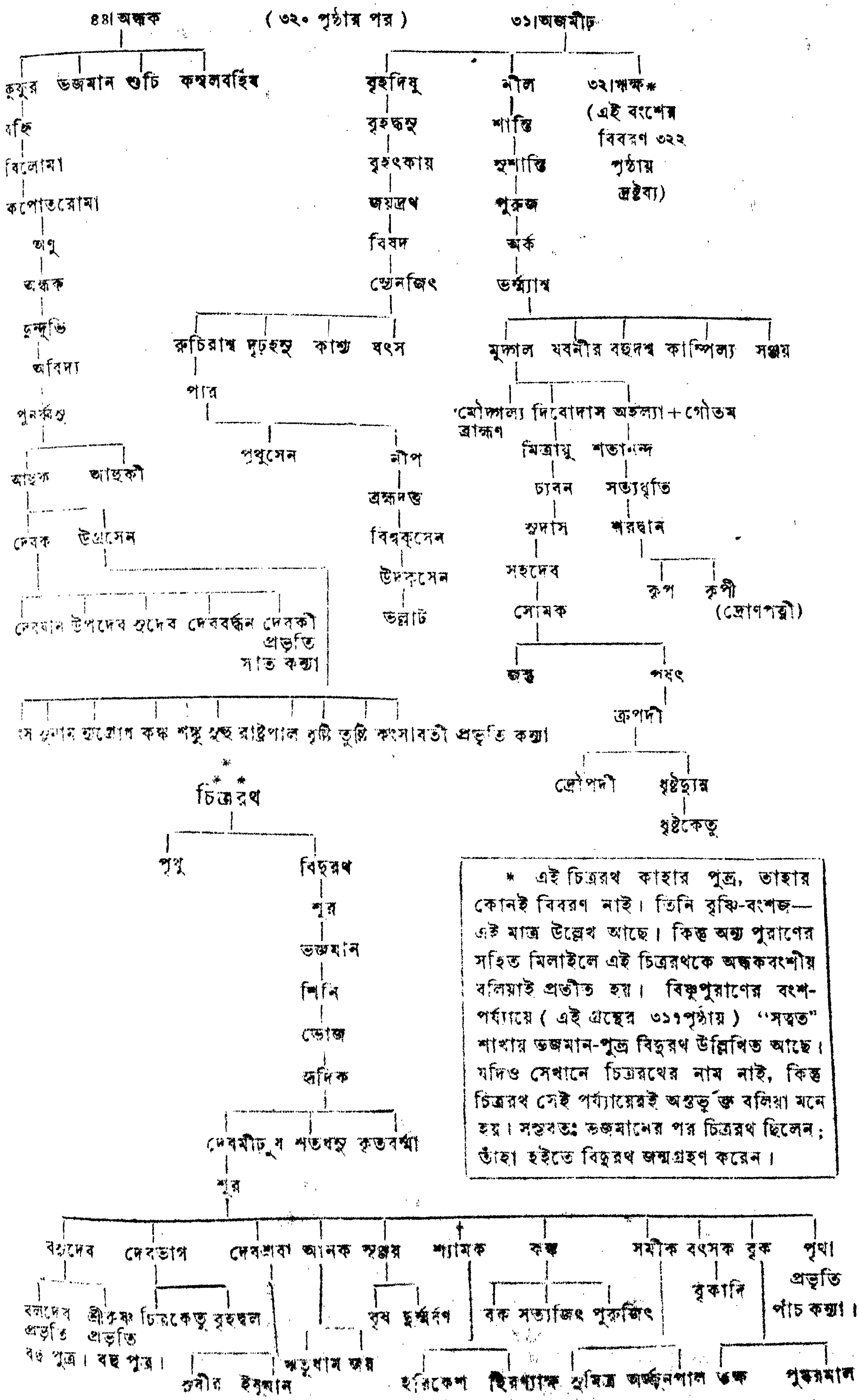
(৩১৯ পৃষ্ঠার পর।)

- ২৭। দশার্হ
  - ব্যোম
    - জীমূত
      - বিকৃতি
        - ভীমরথ
          - নবরথ
            - দশরথ
              - শকুনি
                - করম্ভি
                  - দেবরাত
                    - দেবক্ষত্র
                      - মধু
                        - কুরুবংশ
                          - অনু
                            - পুরুহোত্র
                              - আয়ু
                                - ৪০। সাত্বত
                                  - ভজমান
                                    - ছয়পুত্র (নিম্লোচি, কিঙ্কণ, ধৃষ্টি, শতাজিৎ, সহস্রাজিৎ, অযুতাজিৎ।)
                                  - ভজি
                                  - দিব্য
                                  - বৃষ্ণি
                                    - সুমিত্র
                                    - যুধাজিৎ
                                      - শিনি
                                      - অনমিত্র
                                        - শিনি
                                          - সত্যক
                                            - যুযুধান
                                              - জয়
                                                - কুনি
                                                  - যুগন্ধর
                                        - নিঘ্ন
                                          - সত্রাজিৎ
                                          - প্রসেন
                                        - বৃষ্ণি
                                          - শ্বফল্ক
                                            - অক্রূর
                                              - দেববান
                                              - উপদেব
                                  - দেবাবৃধ
                                    - বভ্রু
                                  - ৪৪। অন্ধক*
                                  - মহাভোজ

- ৩০। হস্তী
  - ৩১। অজমীঢ়*
    - প্রিয়মেধাদি দ্বিজগণ
    - বৃহদিষু
    - নীল
    - ঋক্ষ
  - দ্বিমীঢ়
    - যবীনর
      - কৃতিমান
        - সত্যধৃতি
          - দৃঢ়নেমি
            - সুপার্শ্ব
              - সুমতি
                - সন্নতিমান
                  - কৃতি
                    - উগ্রায়ুধ
                      - ক্ষেম্য
                        - সুবীর
                          - রিপুঞ্জয়
                            - বহুরথ
  - পুরুমীঢ়

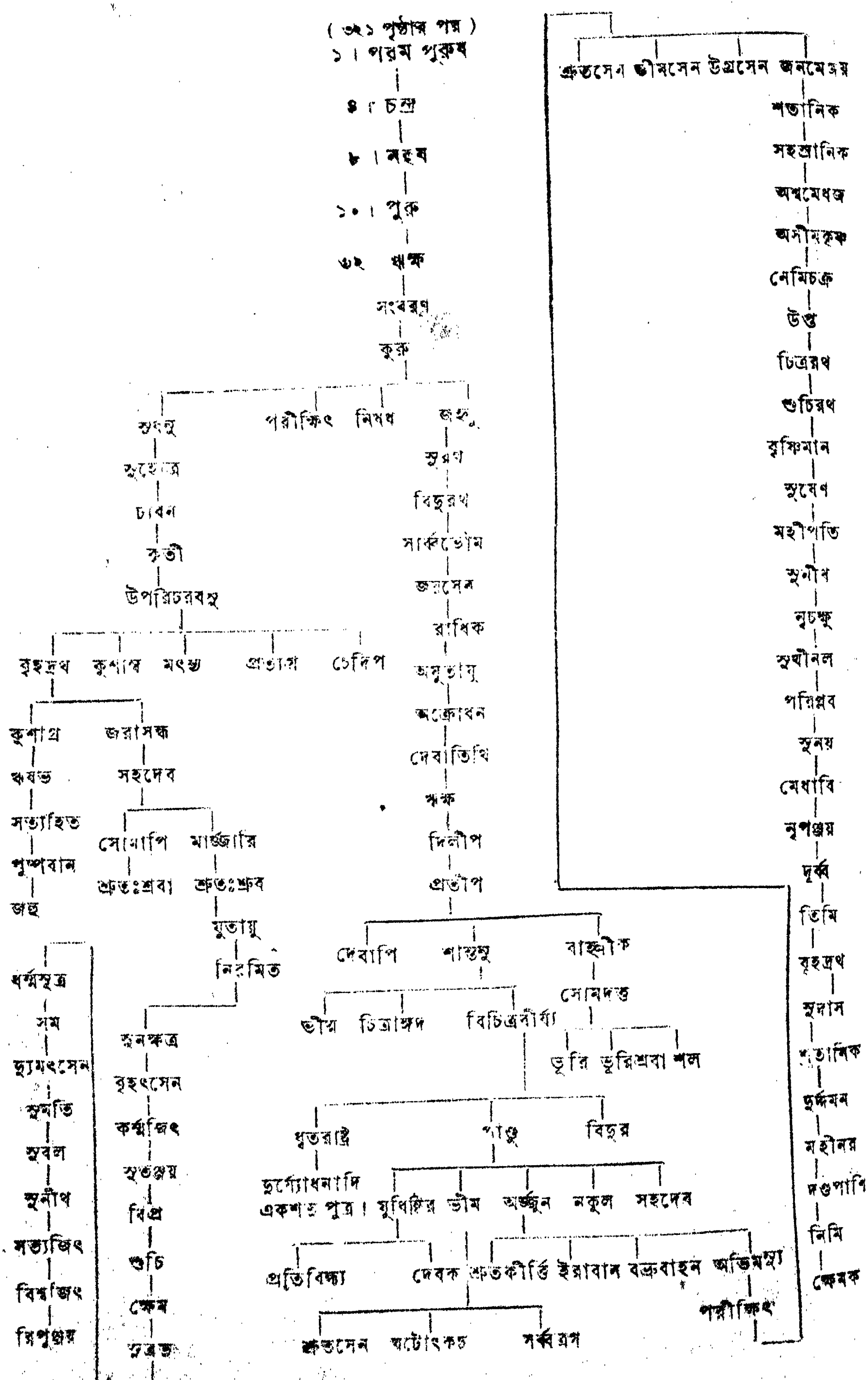
* যদুবংশান্তর্গত ৪৪. অন্ধক-বংশ এবং পুরুবংশান্তর্গত ৩১ অজমীঢ়বংশ ৩২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

যদুবংশান্তর্গত অন্ধক-বংশ এবং পুরুবংশান্তর্গত অজমীঢ়-বংশ।

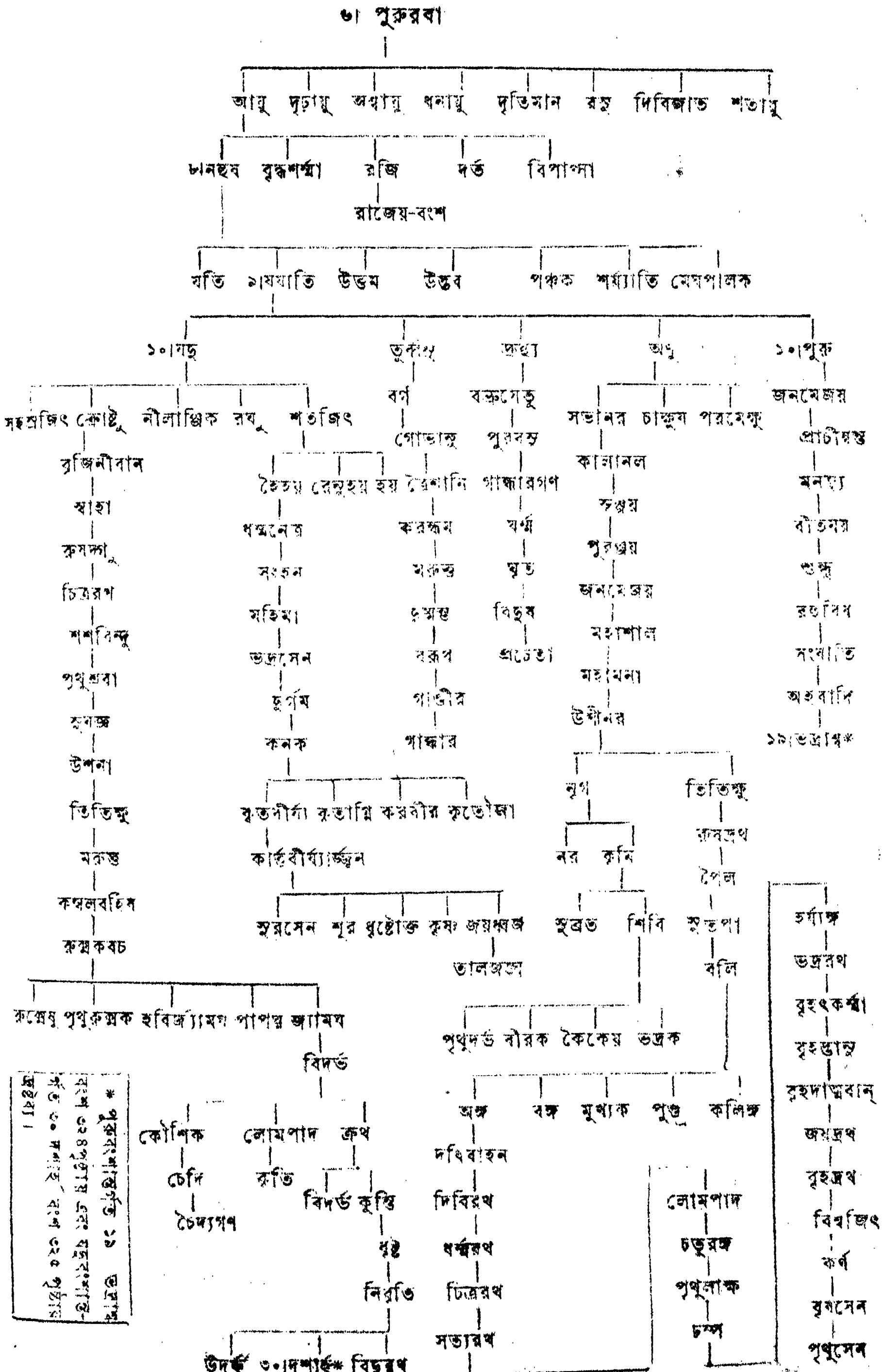


* এই চিত্ররথ কাহার পুত্র, তাহার কোনই বিবরণ নাই। তিনি বৃষ্ণি-বংশজ—এই মাত্র উল্লেখ আছে। কিন্তু অন্য পুরাণের সহিত মিলাইলে এই চিত্ররথকে অন্ধকবংশীয় বলিয়াই প্রতীত হয়। বিষ্ণুপুরাণের বংশ-পর্য্যায়ে (এই গ্রন্থের ৩১৭পৃষ্ঠায়) "সত্বত" শাখায় ভজমান-পুত্র বিদূরথ উল্লিখিত আছে। যদিও সেখানে চিত্ররথের নাম নাই, কিন্তু চিত্ররথ সেই পর্য্যায়েরই অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে হয়। সম্ভবতঃ ভজমানের পর চিত্ররথ ছিলেন; তাঁহা হইতে বিদূরথ জন্মগ্রহণ করেন।

পুরুবংশান্তর্গত ঋক্ষ-বংশ।

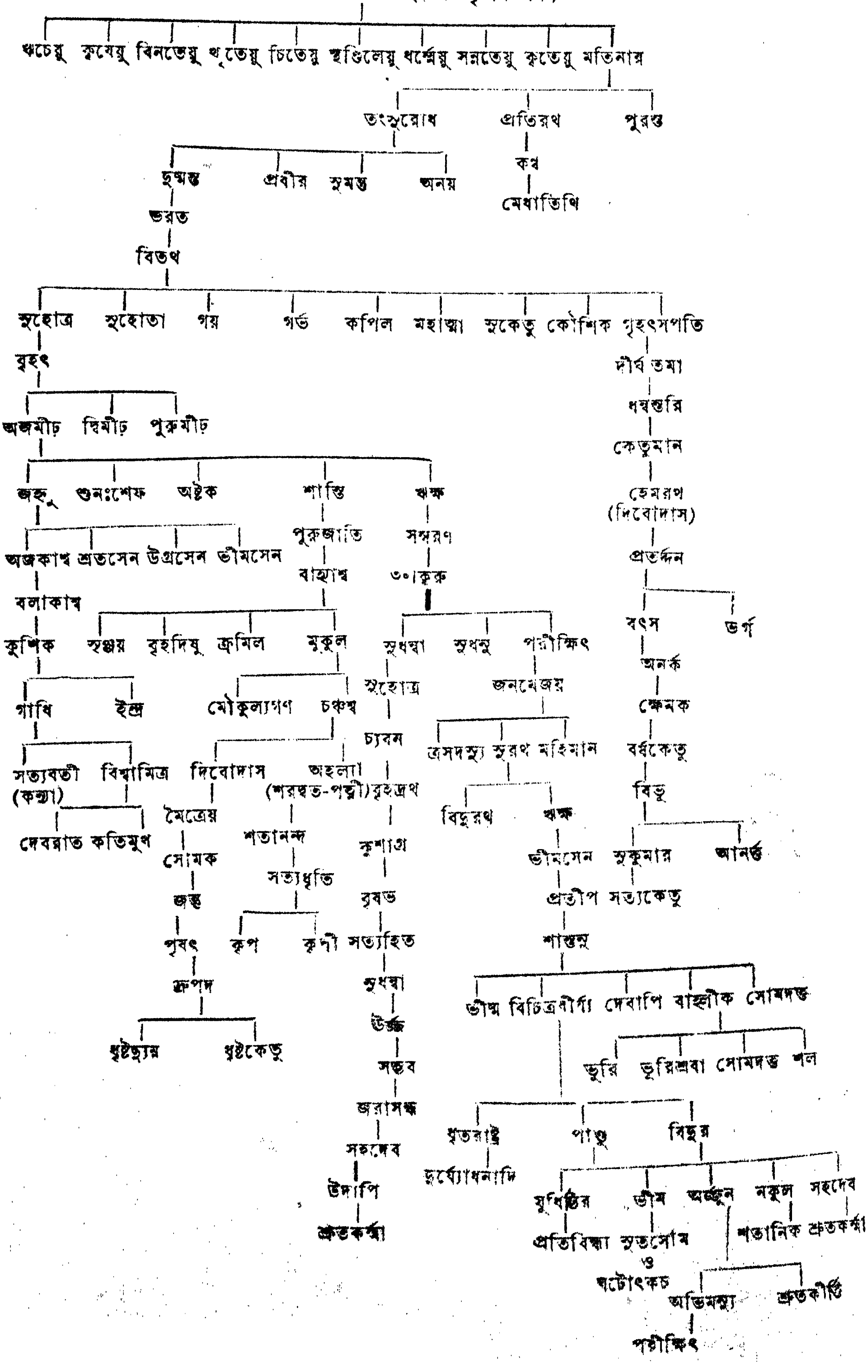


বিষ্ণু হইতে ব্রহ্মা, ব্রহ্মা হইতে অত্রি, অত্রি হইতে সোম, সোম হইতে বুধ, বুধ হইতে—



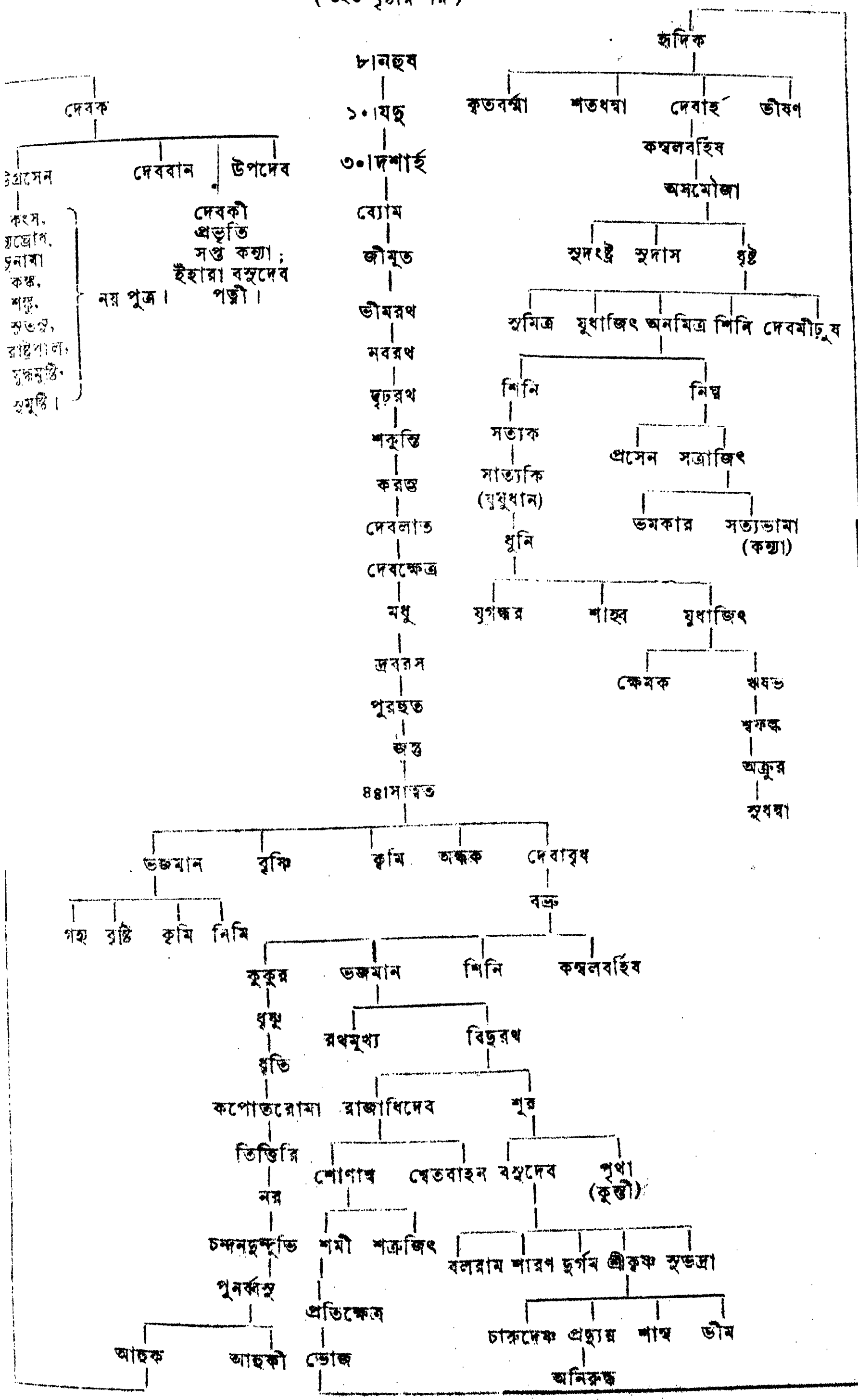
পুরুবংশান্তর্গত ভদ্রাশ্বের বংশ পর্য্যায়।

১৯। ভদ্রাশ্ব (৩২৩ পৃষ্ঠার পর)

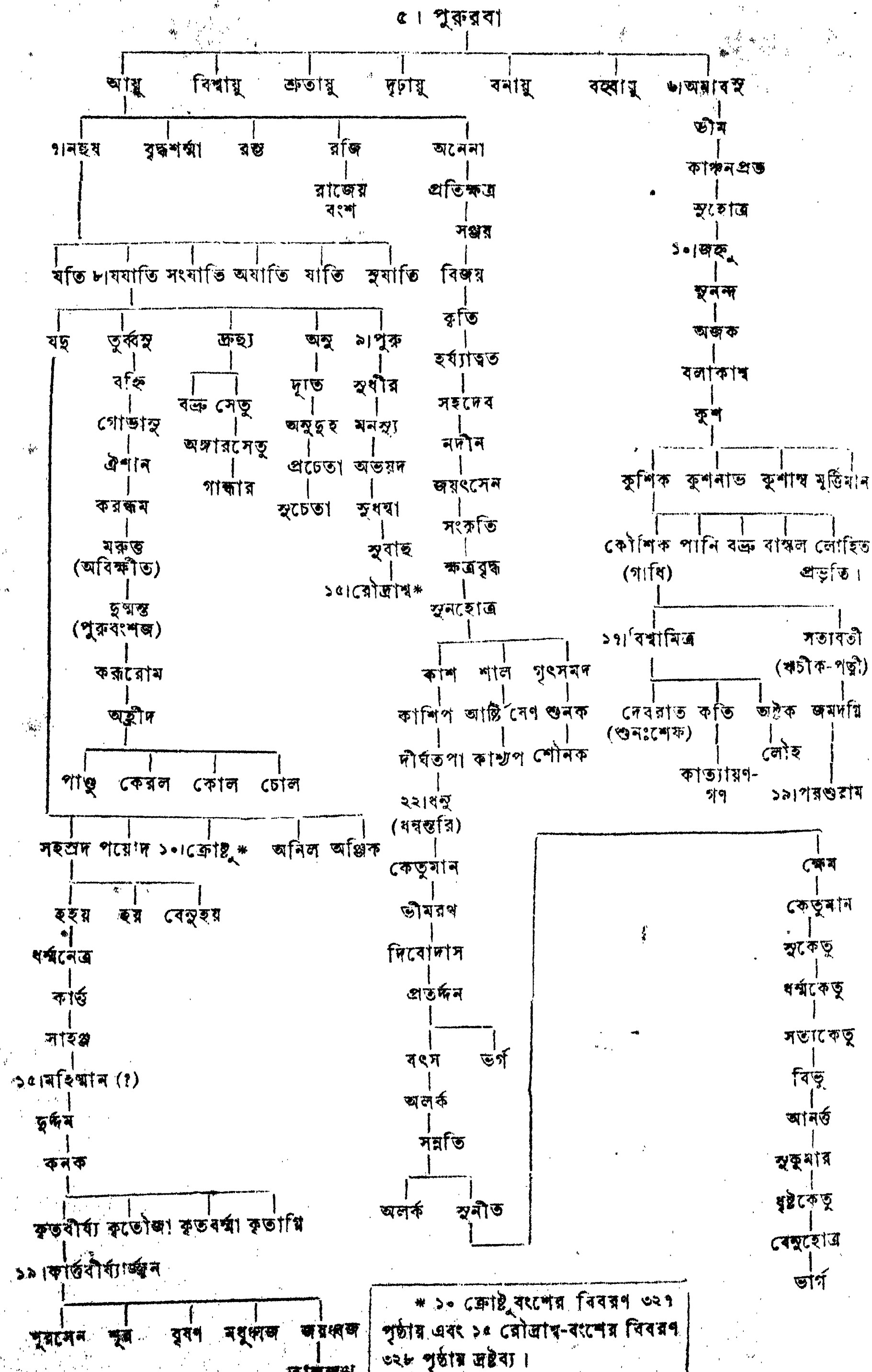


যদুবংশান্তর্গত দশার্হের বংশ পর্য্যায়।

(৩২৩ পৃষ্ঠার পর)



ব্রহ্মা হইতে অত্রি, অত্রি হইতে সোম, সোম হইতে বুধ, বুধ হইতে—.



* ১০ ক্রোষ্টু বংশের বিবরণ ৩২৭ পৃষ্ঠায় এবং ১৫ রৌদ্রাশ্ব-বংশের বিবরণ ৩২৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

যদুপুত্র ক্রোষ্টুর বংশ।

(৩২৬ পৃষ্ঠার পর)

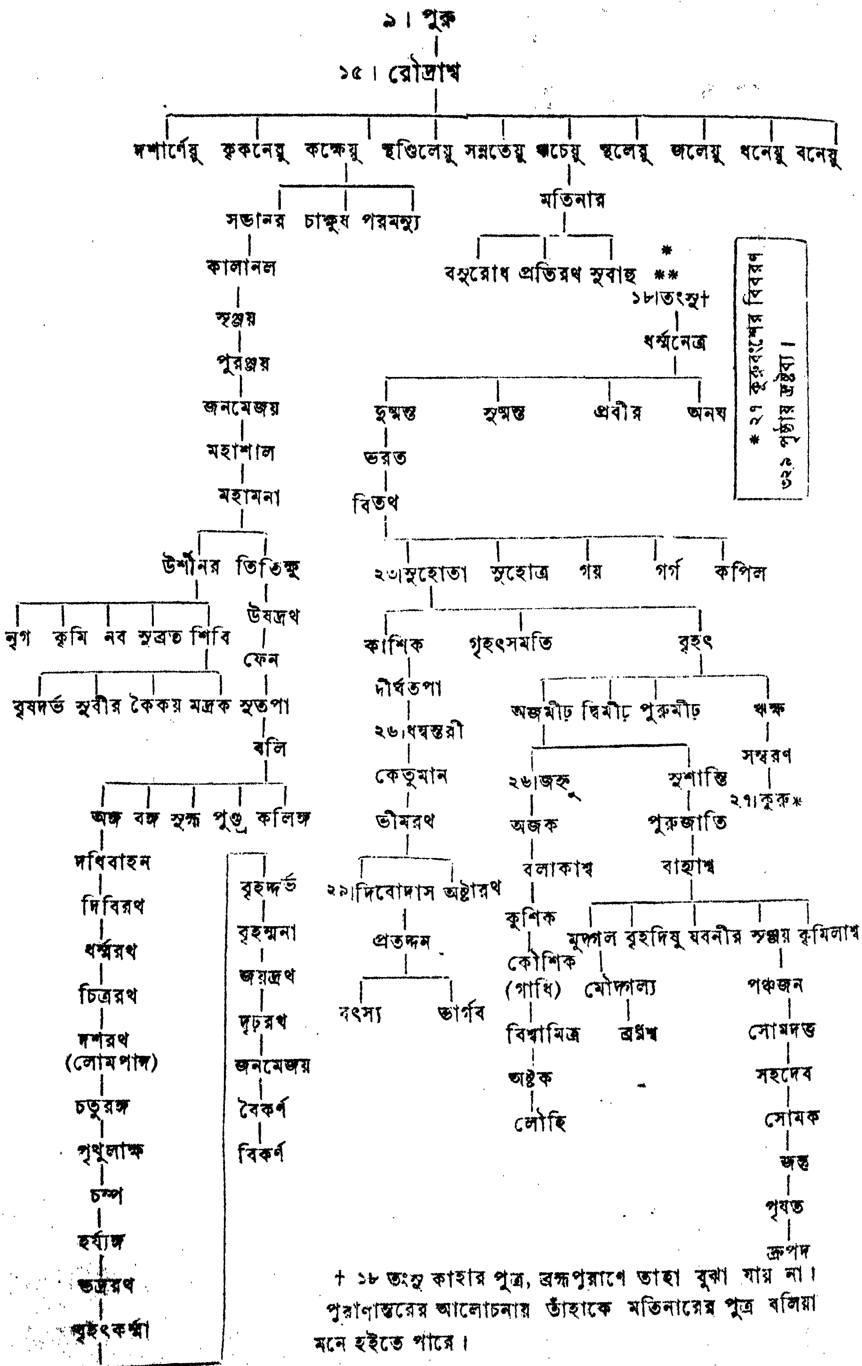
১০। ক্রোষ্টু

- বৃজিনীবান
  - স্বাহি
    - উশদ্গু
      - চিত্ররথ
        - শশবিন্দু
          - পৃথুশ্রবা
            - সুযজ্ঞ
              - উশত
                - শিনেয়ু
                  - মরুত্ত
                    - কম্বলবর্হিষ
                      - রুক্মকবচ
                        - পরাজিৎ
                          - রুক্মেষু
                          - পৃথুরুক্ম
                          - জ্যামঘ
                            - বিদর্ভ
                              - ক্রথ
                              - কৌশিক
                              - ভীম
                                - কুন্তী
                                  - ধৃষ্ট
                                    - আবর্ত্ত
                                    - দশার্হ
                                      - ব্যোমা
                                        - জীমূত
                                          - বিকৃতি
                                            - ভীমরথ
                                              - নবরথ
                                                - দশরথ
                                                  - শকুনি
                                                    - করম্ভ
                                                      - দেবরাত
                                                        - দেবক্ষত্র
                                                          - বৃদ্ধক্ষত্র
                                                            - মধু
                                                              - পুরুদ্বান
                                                              - সত্বান
                                                                - ভাগিন
                                                                - ভজমান
                                                                  - ক্রিমি, ক্রমণ, ধৃষ্ট, শূর, পুরঞ্জয়, অযুতাজিৎ, সহস্রাজিৎ, শতাজিৎ, দাসক প্রভৃতি পুত্র।
                                                                - দিব্য
                                                                - দেবাবৃধ
                                                                  - বভ্রু
                                                                - অন্ধক
                                                                  - কুকুর
                                                                    - বৃষ্ণি
                                                                      - কপোতরোমা
                                                                        - তিত্তিরি
                                                                          - পুনর্ব্বসু
                                                                            - অভিজিৎ
                                                                              - আহুক
                                                                                - দেবক
                                                                                  - দেববান, উপদেব, সংদেব, দেবরক্ষিত, প্রভৃতি পুত্র; এবং দেবকী প্রভৃতি সাত কন্যা।
                                                                                - উগ্রসেন
                                                                                  - কংস, ন্যগ্রোধ, সুনামা, কঙ্ক, সুভূষণ, রাষ্ট্রপাল, সুতনু, পুষ্টিমান।
                                                                              - শ্রাহক
                                                                  - মসক
                                                                  - ভজমান
                                                                    - বিদূরথ
                                                                      - রাজাধিদেব ‡
                                                                        - শমী
                                                                          - প্রতিক্ষত্র
                                                                            - স্বয়ম্ভোজ
                                                                              - ভদিক §
                                                                                - দেবান্ত
                                                                                  - কম্বলবর্হিষ
                                                                                    - অসমৌজা
                                                                                      - সুদংষ্ট্র
                                                                                      - সুচারু
                                                                                      - কৃষ্ণ
                                                                                    - নাসমৌজা
                                                                  - বলবর্হিষ
                                                                - বৃষ্ণি
                                    - বিষহর
                          - পালিত
                          - হরি
- অনমিত্র
  - নিঘ্ন
    - প্রসেন
    - সত্রাজিৎ
      - ভঙ্গকারী
      - বাতপতি
      - বসুদেব
      - সত্যভামা
- যুধাজিৎ
  - দেবমীঢ়ুষ
- দেবমীঢ়ুষ
  - শূর
    - বসুদেব
      - রাম
      - শরণ্য
      - শঠ
      - দুর্দ্দম
      - দমন
      - শুভ্র
      - পিণ্ডারক
      - উশীনর
      - চিত্রা (সুভদ্রা)
      - ভোজ
      - বিজয়
      - বৃকদেব
      - শ্রীকৃষ্ণ
    - দেবভাগ
      - উদ্ধব
    - দেবশ্রবা
    - অনাধৃষ্টি
      - অশ্মক
    - কণবক
      - তন্ত্রিজিৎ
      - তন্ত্রিপাল
    - বৎসবান
    - গৃঞ্জিম
    - শমীক
    - গণ্ডুষ
    - শ্যাম
      - শমীক
        - অজাতশত্রু
- বৃষ্ণি
  - শ্বফল্ক
    - অক্রূর
      - সত্যকেতু
      - প্রসেন
      - উপদেব
  - চিত্রক†
  - অনমিত্র
    - শিনি
      - সাত্যকি (যুযুধান)
- অন্ধক*

[এই পৃষ্ঠার *, †, ‡, প্রভৃতি চিহ্নিত বংশের বিবরণ ৩২৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।]

পুরুবংশান্তর্গত রৌদ্রাশ্বের বংশ-পর্য্যায়।

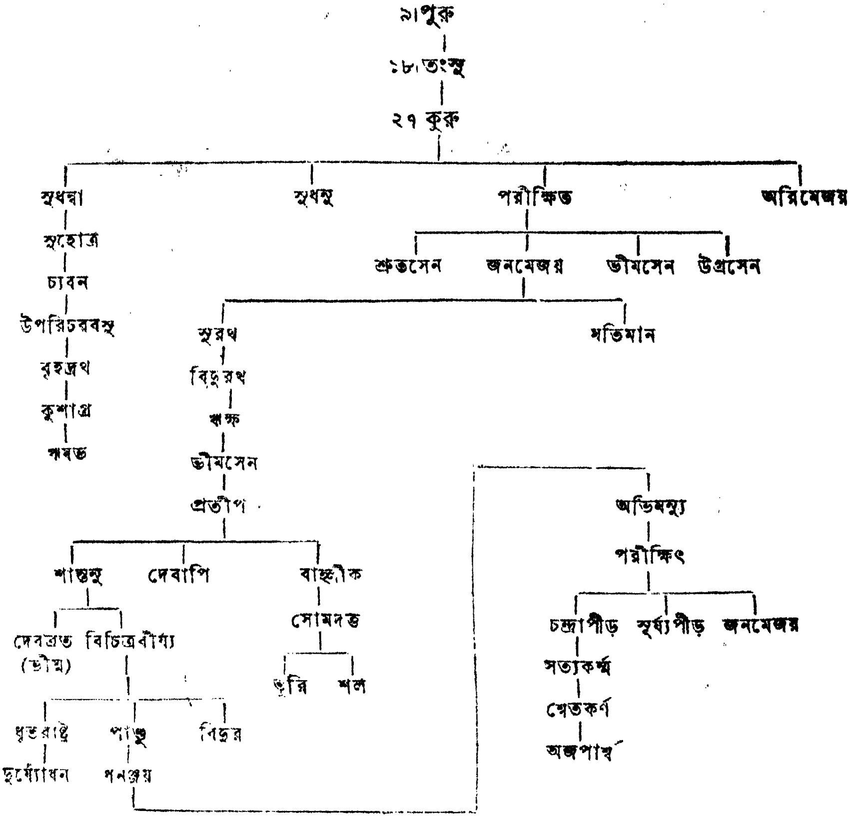
(৩২৬ পৃষ্ঠার পর)



+ ১৮ তংসু কাহার পুত্র, ব্রহ্মপুরাণে তাহা বুঝা যায় না। পুরাণান্তরের আলোচনায় তাঁহাকে মতিনারের পুত্র বলিয়া মনে হইতে পারে।

পুরুবংশান্তর্গত কুরু-বংশের বংশপর্য্যায়।

(৩২৮ পৃষ্ঠার পর।)



*** হরিবংশের ন্যায় (৩১২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য), এই ব্রহ্মপুরাণেও বিশ্বামিত্র এবং ধন্বন্তরি সম্বন্ধে গণ্ডগোল আছে। তাহাতে দেখিতে পাই,—অমাবসুর-বংশে ১৭শ পর্য্যায়ে বিশ্বামিত্র এবং আয়ু-বংশে ২২শ পর্য্যায়ে ধন্বন্তরি বিদ্যমান (৩২৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। আবার অন্যত্র দেখিতে পাই,—তংসু-বংশের ২৬শ পর্য্যায়ে ধন্বন্তরি এবং ৩১শ পর্য্যায়ে বিশ্বামিত্র আছেন। কিন্তু শেষোক্ত স্থলে বিশ্বামিত্রের ভগ্নী সত্যবতী বা তাঁহার পৌত্র পরশুরামের নামোল্লেখ নাই। দুই বংশেরই একজন পূর্ব্ব-পুরুষের নাম জহ্নু। সেই জহ্নুর পুত্র-পৌত্রাদির নামের মধ্যেও ঐক্য দৃষ্ট হয়। এইরূপ যদু-পুত্র সহস্রদের বংশে মহিষ্মান্ রাজার নাম বংশ-তালিকায় (৩২৬ পৃষ্ঠায়) দৃষ্ট হইবে। কিন্তু সেই মহিষ্মান্ রাজা যে কাহার পুত্র ছিলেন, ব্রহ্মপুরাণে তাহার উল্লেখ নাই। পুরাণান্তরের বংশ-পর্য্যায় দৃষ্টে আমরা মহিষ্মান্‌কে যদুবংশের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছি।

[৩২৭ পৃষ্ঠার নোট,—

* অক্রূরের উপমদ্গু, মদ্গু, মেদুর, অরিমেজয়, অবিক্ষীত, অক্ষেপ, শত্রুঘ্ন, অরিমর্দ্দন, ধর্ম্মধৃক, যতিধর্ম্মা, ধর্ম্মোক্ষন, অন্ধকরু, আবহ ও প্রতিবাহ প্রভৃতি পুত্র ও সুন্দরী নামে কন্যা হয়।

† চিত্রকের পৃথু, বিপৃথু, অশ্বগ্রীব, অশ্ববাহু, স্বপার্শক, গবেষণ, অরিষ্টনেমি, অশ্ব, সুধর্ম্মা, ধর্ম্মভৃত, সুবাহু ও বহুবাহু প্রভৃতি পুত্র ও দুই কন্যা।

‡ রাজাধিদেবের শমী ব্যতীত দত্ত, অতিদত্ত, শোণাশ্ব, শ্বেতবাহন, দণ্ডশর্ম্মা, প্রভৃতি পুত্র ও দুই কন্যা।

§ ভদিকের দেবান্ত ব্যতীত কৃতবর্ম্মা, শতধন্বা নরান্ত, ভীষক, বৈতরণ, সুদান্ত, অতিদান্ত, নিকাশ ও কাণদন্ত প্রভৃতি পুত্র ছিলেন। ¶ ভঙ্গকারের সভাজ ও নারের নামে দুই পুত্র।]

☞ সূর্য্যবংশের এবং চন্দ্রবংশের বংশপর্য্যায়-সমালোচনা সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

মনু ও মনু-পুত্রগণ।

[মনু ও মন্বন্তর,—স্বায়ম্ভুব মনু,—ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে তাঁহার বংশ-বিবরণ;—উত্তানপাদ ও প্রিয়ব্রতের পরিচয়;—প্রিয়ব্রতের পুত্রগণ,—পুরাণান্তরে মতভেদ,—প্রিয়ব্রতের রাজ্যাধিকার,—প্রিয়ব্রত কর্তৃক পৃথিবীর সপ্তধা বিভাগ,—প্রিয়ব্রতের যশোগৌরব;—আগ্নীধ্রাদি নয় পুত্র মধ্যে জম্বুদ্বীপ বিভাগ,—জম্বুদ্বীপ ও ভারতবর্ষ প্রসঙ্গ;—স্বায়ম্ভুব মনুর বংশলতা (শ্রীমদ্ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতির অনুসরণে);—ঋষভ ও ভরত প্রভৃতির বৃত্তান্ত;—উত্তানপাদ-বংশে ধ্রুব, পৃথু, বেণ প্রভৃতি;—অপরাপর মনু ও তাঁহাদিগের পুত্রগণ।]

সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশই যে পৃথিবীর আদিভূত, ভারবর্ষের পুরাতত্ত্ব আলোচনা করিলে, তাহাও বলিতে পারা যায় না। কারণ, পুরাণাদি শাস্ত্রে আমরা দেখিতে পাই,—সূর্য্যবংশের ও চন্দ্রবংশের রাজগণ বৈবস্বত মন্বন্তরে বিদ্যমান ছিলেন, এবং তাঁহাদের পূর্ব্বে স্বায়ম্ভুব-স্বারোচিষাদি আরও ছয়টী মন্বন্তর অতীত হইয়া গিয়াছিল। সেই সকল মন্বন্তরেও কত কত মহাবল-পরাক্রান্ত নৃপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; কত কত মনীষি ঋষি-মহর্ষির আবির্ভাব হইয়াছিল। পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি,—এক সপ্ততি যুগে এক এক মন্বন্তর হয়। * সেইরূপ ছয় মন্বন্তরে চারি শত চব্বিশ যুগ অতীত হওয়ার পর, বৈবস্বত মন্বন্তর আরম্ভ হইয়াছে, এবং শাস্ত্রানুসারে এখনও সেই মন্বন্তরই চলিতেছে। † সে হিসাবে, প্রথমে স্বায়ম্ভুব মনুর রাজত্বকাল চলিয়া গিয়াছে; তৎপরে যথাক্রমে দ্বিতীয় স্বারোচিষ মনুর, তৃতীয় ঔত্তমি (উত্তম) মনুর, চতুর্থ তামস মনুর, পঞ্চম রৈবত মনুর এবং ষষ্ঠ চাক্ষুষ মনুর বংশধরগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন। এক বৈবস্বত মন্বন্তরের ইতিহাস উদ্ধার করাই দুঃসাধ্য; সে ক্ষেত্রে, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী মন্বন্তর-সমূহের—দূর অতীতের—বিবরণ কি প্রকারে সংগ্রহ হইতে পারে? শাস্ত্রকারগণই বলিয়া গিয়াছেন,—সমস্ত মন্বন্তরের বৃত্তান্ত, শত বর্ষেও বর্ণন করিতে পারা যায় না;—"ন শক্যো বিস্তরো বিপ্রা বক্তুং বর্ষশতৈরপি।" তবে, পুরাণাদি শাস্ত্রে তত্তৎ-মন্বন্তরের যৎকিঞ্চিৎ যে আভাস পাওয়া যায়, আমরা সংক্ষেপে তাহা উল্লেখ করিতেছি। সে সম্বন্ধে অবশ্য নানা পুরাণে নানা মত দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম স্বায়ম্ভুব মনু;—তাঁহার বংশ-সম্বন্ধেই কত মত-পার্থক্য বিদ্যমান! বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে,—'স্বায়ম্ভুব মনুর দুই পুত্র,—প্রিয়ব্রত এবং উত্তানপাদ। তন্মধ্যে প্রিয়ব্রতের আগ্নীধ্র, অগ্নিবাহু প্রভৃতি দশ পুত্র; এবং উত্তানপাদের উত্তম ও ধ্রুব নামে দুই পুত্র। সেই ধ্রুবের বংশে বেণ, পৃথু প্রভৃতি প্রবল-পরাক্রান্ত নৃপতিগণ জন্মগ্রহণ করেন।' ব্রহ্মপুরাণের মতে,—'প্রিয়ব্রত এবং উত্তানপাদ ব্যতীত স্বায়ম্ভুব মনুর বহু পুত্র; অগ্নিধ্র, অগ্নিবাহু প্রভৃতিও তাঁহার পুত্র মধ্যে পরিগণিত।' বেণ, পৃথু প্রভৃতি সম্বন্ধে ব্রহ্মপুরাণে ও বিষ্ণুপুরাণে বিশেষ মতান্তর নাই। শিবপুরাণের মতে,—'প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ প্রভৃতি মনুর বহু পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।' এই পুরাণে ধ্রুব-বংশের পরিচয়

স্বায়ম্ভুব মনু।

---

* এই গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে নবম ও ষোড়শ পৃষ্ঠার 'নোট' দ্রষ্টব্য।

† বিষ্ণুপুরাণ, তৃতীয় অংশ, প্রথম অধ্যায়, ৩১শ শ্লোক; শিবপুরাণ, ধর্ম্মসংহিতা, ৫৮শ অধ্যায়, ৪র্থ শ্লোক; শ্রীমদ্ভাগবত, অষ্টম স্কন্ধ, চতুর্থ অধ্যায়, ২য় শ্লোক, এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়, ২য় শ্লোক; হরিবংশ, সপ্তম অধ্যায়।

পাওয়া যায় বটে ; কিন্তু আগ্নীধ্র প্রভৃতি কাহার পুত্র,—তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। গরুড়-পুরাণে উক্ত হইয়াছে,—'স্বায়ম্ভুব মনুর অগ্নিধ্র প্রভৃতি পুত্র হয় ;—মনুঃ স্বায়ম্ভুবঃ পূর্ব্ব-মগ্নীধ্রাদাংশ্চ তৎসুতাঃ। গরুড়-পুরাণে ধ্রুব-বংশের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায় না। হরিবংশে দেখিতে পাই,—'অগ্নিধ্র, অগ্নিবাহু প্রভৃতি স্বায়ম্ভুব মনুর দশ পুত্র।' আবার শ্রীমদ্ভাগবতে আছে,—'স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ, এবং সেই প্রিয়ব্রত হইতে আগ্নীধ্র প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন।' সে হিসাবে, ধ্রুব, বেণ, পৃথু—মনু-পুত্র উত্তানপাদের বংশ-সমুদ্ভূত। অগ্নিপুরাণের মতে,—'স্বায়ম্ভুব মনুর দুই পুত্র ও এক কন্যা। পুত্র—প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ ; এবং কন্যার নাম—কাম্যা।' ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে দৃষ্ট হয়,—'স্বায়ম্ভুব মনুর অপর নাম—বৈরাজ মনু। তাঁহার শতরূপা-নাম্নী পত্নীর গর্ভে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামক দুইটী পুত্র-রত্ন জন্মগ্রহণ করেন। এই মনুর আরও অসংখ্য পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল।' বরাহ-পুরাণেও প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ, স্বায়ম্ভুব-মনুর পুল বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। কিন্তু উহাতে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদের বংশ-বিষয়ে অধিক কিছু লিখিত নাই। দেবী-ভাগবতে লিখিত আছে,—'স্বায়ম্ভুব-মনুর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিয়ব্রত ;' ইত্যাদি।* এইরূপ পুরাণ-সমূহের মধ্যে মতান্তর থাকিলেও, একটু অনুসন্ধান করিলেই বুঝিতে পারা যায়,—প্রিয়ব্রত, উত্তানপাদ প্রভৃতি স্বায়ম্ভুব-মনুর পুত্র এবং আগ্নীধ্র প্রভৃতি তাঁহার পৌত্র।

প্রিয়ব্রত ও তৎপুত্রগণ।

স্বায়ম্ভুব-মনুর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিয়ব্রত, প্রজাপতি বিশ্বকর্ম্মার কন্যা বর্হিষ্মতীকে বিবাহ করেন। সেই স্ত্রীর গর্ভে আগ্নীধ্র প্রভৃতি তাঁহার দশ পুত্রের উৎপত্তি হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে এই মত ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু বিষ্ণু-পুরাণের মতে,—প্রিয়ব্রত, কর্দ্দমের ঔরস-জাত কন্যাকে বিবাহ করেন, এবং তাঁহার সম্রাট ও কুক্ষি নাম্নী দুই কন্যা ও দশ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। প্রিয়ব্রতের সেই দশ পুত্রের নাম সম্বন্ধে সকল পুরাণ এক মত নহেন। ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে, ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে, প্রিয়ব্রতের দশ পুত্রের নাম ও পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। তাঁহাদের সেই নাম সম্বন্ধে কোন্ পুরাণের সহিত কোন্ পুরাণের কিরূপ অসামঞ্জস্য বিদ্যমান, নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে ;—

বিষ্ণুপুরাণে।	শ্রীমদ্ভাগবতে।	গরুড়পুরাণে।	দেবীভাগবতে।
আগ্নীধ্র,	আগ্নীধ্র,	আগ্নীধ্র,	আগ্নীধ্র,
অগ্নিবাহু,	ইধ্মজিহ্ব,	অগ্নিবাহু,	ইধ্মজিহ্ব,
বপুষ্মান্,	যজ্ঞবাহু,	বপুষ্মান্,	যজ্ঞবাহু,
দ্যুতিমান,	মহাবীর,	দ্যুতিমান,	হিরণ্যরেতা,
মেধা,	হিরণ্যরেতা,	মেধক,	ঘৃতপৃষ্ঠ,
মেধাতিথি,	ঘৃতপৃষ্ঠ,	মেধাতিথি,	মেধাতিথি-
ভব্য,	সবন,	ভব্য,	বীতিহোত্র,
সবন,	মেধাতিথি,	সবল,	মহাবীর,
পুত্র,	বীতিহোত্র,	পুত্র,	রুক্মশুক্র,
জ্যোতিষ্মান্।	কবি।	জ্যোতিষ্মান।	সবন ও কবি।

* বিষ্ণুপুরাণ, প্রথমাংশ, সপ্তম অধ্যায় এবং দ্বিতীয়াংশ প্রথম অধ্যায় ; ব্রহ্মপুরাণ, দ্বিতীয় ও পঞ্চম অধ্যায় ; শিবপুরাণ, ধর্ম্মসংহিতা, দ্বি-পঞ্চাশৎ অধ্যায় ; হরিবংশ, সপ্তম অধ্যায় ; শ্রীমদ্ভাগবত, চতুর্থ স্কন্ধ একত্রিংশ অধ্যায় ; অগ্নিপুরাণ, অষ্টাদশ অধ্যায় ; বরাহপুরাণ, দ্বিতীয় অধ্যায় ; দেবীভাগবত, অষ্টম স্কন্ধ, চতুর্থ অধ্যায় ; ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, দশম অধ্যায়।

উল্লিখিত দশ পুত্র ব্যতীত প্রিয়ব্রতের অপর এক ভার্য্যার গর্ভে উত্তম, তামস ও রৈবত নামে তিন পুত্র উৎপন্ন হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের মতে,—সেই তিন পুত্র পরবর্ত্তি-কালে মন্বন্তরাধিপতি হইয়াছিলেন। যাহা হউক, প্রিয়ব্রতের প্রথমোক্ত দশ পুত্রের মধ্যে তিন পুত্র সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন। অবশিষ্ট সাত পুত্র রাজ্যাধিকার লাভ করিয়াছিলেন। প্রিয়ব্রত সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর ছিলেন। তিনি পৃথিবীকে সপ্ত ভাগে বিভক্ত করিয়া, আপনার সপ্ত পুত্রকে তাহা প্রদান করেন। তিনি যে সাত ভাগে পৃথিবীকে বিভাগ করিয়াছিলেন, সেই সাত ভাগের নাম,—জম্বু-দ্বীপ, প্লক্ষ-দ্বীপ, শাল্মলী-দ্বীপ, কুশ-দ্বীপ, ক্রৌঞ্চ-দ্বীপ, শাক-দ্বীপ, পুষ্কর-দ্বীপ। * ঐ দ্বীপ-সমূহের চতুর্দ্দিকে লবণ-সমুদ্র, ইক্ষু-সমুদ্র, সুরা-সমুদ্র, ঘৃত-সমুদ্র, ক্ষীর-সমুদ্র, দধি-সমুদ্র ও জল-সমুদ্র নামে সাতটী সমুদ্র বিদ্যমান ছিল। পূর্ব্বোক্ত সপ্ত-দ্বীপের মধ্যে, রাজা প্রিয়ব্রত আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র আগ্নীধ্রকে জম্বুদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি ইধ্মজিহ্বকে প্লক্ষ-দ্বীপ, যজ্ঞবাহুকে শাল্মলী-দ্বীপ, হিরণ্যরেতাকে কুশ-দ্বীপ, ধৃতপৃষ্ঠকে (ঘৃতপৃষ্ঠ) ক্রৌঞ্চ-দ্বীপ, মেধাতিথিকে শাক-দ্বীপ এবং বীতিহোত্রকে পুষ্কর-দ্বীপ প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ সপ্ত-দ্বীপে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে, বর্ত্তমান পৃথিবীর যে সাতটী অংশকে বুঝাইয়া থাকে, পূর্ব্বেই আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি। † ফলতঃ, পাশ্চাত্য-মতের নূতন ও প্রাচীন ভূ-গোলার্দ্ধ, উভয়ই ঐ সপ্ত-দ্বীপের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পৃথিবীকে সপ্তধা বিভক্ত করিয়া, প্রিয়ব্রত কোন্ পুত্রকে কোন্ ভাগ প্রদান করেন,—তদ্বিষয়ে দেবী-ভাগবত ও শ্রীমদ্ভাগবত এক মত হইলেও, বিষ্ণুপুরাণে পার্থক্য দৃষ্ট হয়। বিষ্ণুপুরাণের মতে,—'প্রিয়ব্রতের দশ পুত্রের মধ্যে মেধা, অগ্নিবাহু ও পুত্র (শ্রীমদ্ভাগবতের ও দেবী-ভাগবতের মতে, কবি, মহাবীর ও সবন) —এই তিন জন ঊর্দ্ধরেতা, সংসার-ত্যাগী, যোগপরায়ণ হন। প্রিয়ব্রত পৃথিবীকে সপ্তভাগে বিভক্ত করিয়া, আগ্নীধ্রকে জম্বু-দ্বীপ, মেধাতিথিকে প্লক্ষ-দ্বীপ, বপুষ্মান্‌কে শাল্মলী-দ্বীপ, জ্যোতিষ্মান্‌কে কুশ-দ্বীপ, দ্যুতিমান্‌কে ক্রৌঞ্চ-দ্বীপ, ভব্যকে শাক-দ্বীপ এবং সবনকে পুষ্কর-দ্বীপ অর্পণ করেন।' ‡ প্রিয়ব্রত সর্ব্ববিষয়েই পুরুষ-শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। শ্রীমদ্ভাগবতের মতে,—'তিনি একাদশ অর্ব্বুদ বৎসর পৃথিবী ভোগ করেন। তিনি অখণ্ডনীয় বলপূর্ণ বাহু-যুগলে ধনুকের গুণ আকর্ষণ করিয়া টঙ্কার দিলে, বিনা যুদ্ধেই আতঙ্কে প্রতিপক্ষগণ নিরস্ত হইত।' প্রিয়ব্রতের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া, বহু গাথা প্রচলিত আছে। অর্দ্ধ-পৃথিবী অন্ধকারে আবৃত হয়, এবং অর্দ্ধ-পৃথিবী আলোকে উদ্ভাসিত থাকে,—আপন সাম্রাজ্য মধ্যে এইরূপ প্রাকৃতিক ভাব-বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিয়া, রাজা প্রিয়ব্রত অন্ধকার দূর করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন,—"আমি স্বকীয় তেজে রজনীকেও দিন করিব।" অতঃপর বেগবান্ জ্যোতির্ম্ময় রথে আরোহণ করিয়া, দ্বিতীয় ভাস্করের ন্যায়, তিনি সূর্য্যের অনুসরণ করেন। তাঁহার সেই অনুসরণ-কালে রথচক্রে যে সাতটী খাত

* শ্রীমদ্ভাগবত, পঞ্চম স্কন্ধ, প্রথম অধ্যায়; দেবীভাগবত, অষ্টম স্কন্ধ, চতুর্থ অধ্যায়; গরুড়পুরাণ, পূর্ব্ব-খণ্ড, চতুঃপঞ্চাশৎ অধ্যায়।

† এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়, ষোড়শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

‡ বিষ্ণুপুরাণ, দ্বিতীয়াংশ, প্রথম অধ্যায়; শ্রীমদ্ভাগবত, পঞ্চম স্কন্ধ, প্রথম অধ্যায়; দেবীভাগবত, অষ্টম স্কন্ধ, চতুর্থ অধ্যায়।

হইয়াছিল, তাহাই সপ্ত-সমুদ্র; এবং সেই খাত-পরিবেষ্টিত ভূমিখণ্ড-সমূহ সপ্ত-দ্বীপ নামে অভিহিত। প্রিয়ব্রত-মহিমা-কীর্ত্তনে যে গাথা পুরাণাদি শাস্ত্রে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম এই,—"ঈশ্বর ব্যতীত কোন্ ব্যক্তি প্রিয়ব্রত-কৃত কার্য্য করিতে পারে?" শেষ বয়সে রাজচক্রবর্ত্তী প্রিয়ব্রত, আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া, মোক্ষপদের অধিকারী হইয়াছিলেন।

প্রিয়ব্রতের পুত্রগণের মধ্যে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র, জম্বুদ্বীপের অধিকারী আগ্নীধ্র, বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাঁহার বংশ হইতেই ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধি। রাজা আগ্নীধ্র, পিতা প্রিয়ব্রতের অনুশাসন-ক্রমে, ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, জম্বুদ্বীপ-নিবাসী প্রজা-পুঞ্জকে পুত্র-সদৃশ প্রতিপালন করিয়াছিলেন। তিনি বহু অযুত বৎসর জম্বু-দ্বীপে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রাজর্ষি আগ্নীধ্রের নয় পুত্র। পুত্রগণের নাম—নাভি, কিম্পুরুষ, হরি, ইলাবৃত, রম্যক, কুরু, হিরণ্ময় (হিরণ্বান্), ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল। রাজা আগ্নীধ্র আপনার নয় পুত্রকে জম্বুদ্বীপ নয় ভাগে ভাগ করিয়া দেন। সেই এক এক ভাগ, এক এক বর্ষ নামে অভিহিত হয়;—নাভি-বর্ষ, কিম্পুরুষ-বর্ষ, হরি-বর্ষ, ইলাবৃত-বর্ষ, রম্যক-বর্ষ, কুরু-বর্ষ, ভদ্রাশ্ব-বর্ষ, কেতুমাল-বর্ষ। জম্বুদ্বীপের কোন্ অংশে কোন্ বর্ষ অবস্থিত, বিষ্ণুপুরাণের বর্ণনায় তাহার আভাস পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—তিনি নাভিকে দক্ষিণ হিমবর্ষ, অর্থাৎ হিমালয়ের দক্ষিণে অবস্থিত দেশ, কিম্পুরুষকে হেমকূটবর্ষ, হরিবর্ষকে নৈষধ-বর্ষ, ইলাবৃতকে মেরুর চতুর্দ্দিকবর্ত্তী স্থান, রম্যকে নীলাচলের আশ্রিত বর্ষ, হিরণ্বান্‌কে তদু-ত্তরবর্ত্তী শ্বেতবর্ষ, কুরুকে শৃঙ্গবান পর্ব্বতের উত্তরস্থ শৃঙ্গবৎবর্ষ, ভদ্রাশ্বকে মেরুর পূর্ব্বভাগ এবং কেতুমালকে গন্ধমাদনবর্ষ দান করেন। আগ্নীধ্রের জ্যেষ্ঠ-পুত্র নাভি—যিনি হিমালয়ের দক্ষিণাংশ প্রাপ্ত হন, তিনিই—ভারতবর্ষের অধিপতি হইয়াছিলেন বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার পুত্র ঋষভ এবং ঋষভ হইতে ভরত জন্মগ্রহণ করেন। ঋষভের শত-পুত্রের মধ্যে ভরত জ্যেষ্ঠ; তাঁহার নামানুসারেই 'ভারতবর্ষ' নামের উৎপত্তি। পণ্ডিতগণ অনেকেই জম্বুদ্বীপকে ভারতবর্ষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু প্রিয়ব্রতের পৃথিবী বিভাগ এবং আগ্নীধ্রের জম্বুদ্বীপ ভাগ প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করিলে, জম্বুদ্বীপকে একমাত্র ভারতবর্ষ বলিয়া মনে হয় না। দেবী-ভাগবতের বর্ণনায় প্রকাশ,—'জম্বুদ্বীপ, পদ্মের কর্ণিকার ন্যায়, গোলাকারে অবস্থিত। উহা বহু যোজন বিস্তৃত; উহাতে আটটী বৃহদাকার পর্ব্বত এবং বহু নদ-নদী বিদ্যমান আছে।' অন্যান্য পুরাণেও জম্বুদ্বীপের আকারের, বিভাগের এবং নদ-নদী প্রভৃতির যে পরিচয় আছে, তাহাতেও উহাকে ভারতবর্ষ বলিয়া বুঝা যায় না। পরন্তু, তাহাতে জম্বু-দ্বীপ অর্থে—সমগ্র প্রাচীন গোলার্দ্ধকেই বুঝাইয়া থাকে। জম্বুদ্বীপ যেরূপ-ভাবে নয় বর্ষে বিভক্ত হইয়াছিল,—বিষ্ণুপুরাণে, শ্রীমদ্ভাগবতে, দেবীভাগবতে, গরুড়পুরাণে, ব্রহ্মপুরাণে তাহা পরি-বর্ণিত হইয়াছে।* ভারতবর্ষ যে জম্বুদ্বীপের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ, ব্রহ্মপুরাণে তাহা বিশদভাবে লিখিত আছে। এমন কি, ব্রহ্মপুরাণ স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন,—"সমুদ্রের উত্তরে এবং

আগ্নীধ্রাদি প্রিয়ব্রত বংশ।

* বিষ্ণুপুরাণ, দ্বিতীয় অংশ, দ্বিতীয় অধ্যায়; শ্রীমদ্ভাগবত, পঞ্চম স্কন্ধ, ষোড়শ অধ্যায়; দেবীভাগবত, অষ্টম স্কন্ধ, চতুর্থ ও অষ্টম অধ্যায়; গরুড়পুরাণ, পূর্ব্বখণ্ড, ৫৪শ অধ্যায়; বরাহ-পুরাণ, পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়; ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ, পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়; ব্রহ্ম-পুরাণ, অষ্টাদশ অধ্যায়।

হিমাচলের দক্ষিণে যে বর্ষ বিদ্যমান, তাহার নাম ভারতবর্ষ।...ভারতবর্ষের পূর্ব্ব দিকে কিরাত এবং পশ্চিমে যবনগণের বাস। এই বর্ষমধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ যথাযথ বিভাগ-ক্রমে অবস্থিত। জম্বুদ্বীপান্তর্গত ভারতে যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণু সর্ব্বদাই পূজিত হন; জম্বুদ্বীপের মধ্যে ভারতবর্ষই প্রধান।" * পুরাণাদির মতে, ভারতবর্ষের বিস্তার পরিমাণ—নব সহস্র যোজন।

ঋষভ ও ভরত প্রভৃতি।

রাজা প্রিয়ব্রতের বৃদ্ধ-প্রপৌত্র যে ভরত হইতে ভারতবর্ষ নামের উৎপত্তি হয়, তিনি পরম ভাগবত বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভরতের পিতা ঋষভ দেব আপন পুত্রগণকে ধর্ম্মপরায়ণ ও সদ্‌গুণান্বিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রদিগের মধ্যে, ভরত এবং কুশাবর্ত্ত প্রমুখ নয় পুত্র ব্যতীত, কবি, হরি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রবীড়, চমস এবং করভাজন প্রভৃতি পুত্রগণ ভাগবদ্ধর্ম্ম-প্রদর্শক পরম-ভাগবত বলিয়া প্রসিদ্ধ। রাজাধিরাজ ঋষভ-দেব ব্রাহ্মণদিগের প্রদর্শিত পথানুসারী হইয়া, সামাদি উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক, প্রজাপালনে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে অন্যের দ্রব্যের প্রতি কেহ দৃষ্টিপাতও করে নাই। প্রজারা তাঁহার নিকট অনুক্ষণ-বর্দ্ধমান স্নেহাতিশয় ভিন্ন আর কিছুই কামনা করিত না। ঋষভের পুত্র ভরত, পৃথিবী-পতি নামে পরিচিত হইয়া, পিতৃ-পিতামহের ন্যায় প্রজাবাৎসল্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। পিতৃ-পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণে তিনি ধর্ম্ম-কর্ম্ম যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠানে রত ছিলেন। সহস্র অযুত বৎসর রাজ্যভোগের পর, পুলস্ত্য আশ্রমে হরিক্ষেত্রে গিয়া, তিনি সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। কিন্তু তখনও তিনি মায়া পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। সুতরাং পরীক্ষার বিষম পাকে পড়িয়া, তাঁহাকে মোক্ষের পথ হইতে পিছাইয়া আসিতে হয়। একদিন তিনি মহানদী গণ্ডকীতে স্নান করিতে গিয়া প্রণব-জপে মগ্ন ছিলেন; এমন সময় একটী তৃষ্ণাতুরা হরিণী জল পান করিতে আসে। সেই সময় সহসা সিংহের গর্জ্জন শুনিয়া, উল্লম্ফনে নদী পার হইতে গিয়া, হরিণীর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে সে এক শিশু-সন্তান প্রসব করে কিন্তু হরিণীর মৃত্যু হইলে, তাহার সঙ্গিগণ সকলেই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়; তাহার সদ্যোজাত শিশু মুমূর্ষু অবস্থায় নদীর স্রোতে ভাসমান হয়। সেই সময়, স্নেহপরবশ হইয়া, ভরত সেই মৃগশিশুটীকে পালন করিতে প্রবৃত্ত হন। অবশেষে সেই মৃগ-শিশুর বিষয় চিন্তা করিতে করিতেই তাঁহার দেহান্তর ঘটে। ফলে, তিনি মৃগত্ব প্রাপ্ত হন। তাহার পর, জন্ম-জন্মান্তরে জড়ভরত-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া, তিনি আত্মজ্ঞান লাভ করেন এবং পরিশেষে তাঁহার মুক্তিলাভ হয়। † প্রিয়ব্রত-বংশের অন্যান্য নৃপতিগণের মধ্যে গয়, বিরজ ও শতজিৎ বিশেষ প্রসিদ্ধ। গয়—রাজর্ষি নামে পরিচিত ছিলেন; তাঁহার সম্বন্ধে বহু গাথা প্রচলিত আছে। তিনি প্রজাপুঞ্জের লালন-পালন, পোষণ, প্রীণন ও শাসনাদিরূপ ধর্ম্মাচরণে এবং যাগ-যজ্ঞাদি ক্রিয়া-কর্ম্মের অনুষ্ঠানে বিশেষ

* ব্রহ্মপুরাণ ঊনবিংশ অধ্যায়ে,—

"উত্তরেণ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণে। বর্ষ তদ্ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততি ॥"

† শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধে, সপ্তম হইতে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে, রাজা ভরতের এই কৌতূহলোদ্দীপক চরিত্র-চিত্র চিত্রিত আছে।

যশস্বী হইয়াছিলেন। প্রচলিত গাথা-সমূহে উক্ত আছে,—'তিনি মনস্বী, বহুজ্ঞ, ধর্ম্মরক্ষক ও সাধুদিগের সেবক ছিলেন। ভগবানের অংশ ভিন্ন অন্য কোন্ ব্যক্তি কর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে অনুকরণ করিতে পারেন?' মহাত্মা বিরজ ও শতজিতের গুণ-কীর্ত্তন করিয়াও নানা শ্লোক প্রচলিত আছে। একটী শ্লোকের মর্ম্ম এই,—'ভগবান বিষ্ণু যেমন দেবগণকে অলঙ্কৃত করেন, প্রিয়ব্রতের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া মহাত্মা বিরজ এবং শতজিৎ উভয়েই আপনাপন গুণ ও কীর্ত্তি দ্বারা ঐ বংশকে সেইরূপ ভূষিত করিয়াছেন।'

স্বায়ম্ভুব মনুর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিয়ব্রতের বংশধরগণ বরাহ-কল্পে এই পৃথিবীর অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহাদের আধিপত্যকাল—'স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

উত্তানপাদের বংশ।

তদনন্তর স্বারোচিষ মন্বন্তর; এই মন্বন্তরে পৃথিবীতে উত্তানপাদ রাজার বংশধরগণের আধিপত্য বিস্তৃত হয়। * রাজা উত্তানপাদের দুই মহিষী ছিলেন। মহিষীদ্বয়ের নাম—সুনীতি (ব্রহ্মপুরাণের মতে সুনৃতা) ও সুরুচি। সুরুচির গর্ভে উত্তম এবং সুনীতির গর্ভে ধ্রুব জন্মগ্রহণ করেন। রাজা উত্তানপাদ সুরুচিতে অনুরক্ত হইয়া, ধ্রুবের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করায়, পঞ্চমবর্ষীয় শিশু ধ্রুব দুরূহ তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তপস্যার ফলে, সিদ্ধকাম হইয়া, তিনি সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হন এবং ধ্রুবলোক লাভ করেন। ধ্রুবের ভ্রাতা উত্তমকে যক্ষগণ নিহত করিয়াছিল। তাহাদিগকে শাস্তিদানের জন্য, ধ্রুব যক্ষদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। ধ্রুব যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে, তাঁহার বাণাঘাতে যক্ষগণ বহুধা ছিন্ন ভিন্ন হয়; সিংহ কর্ত্তৃক বিদারিত হইয়া গজেন্দ্র যেমন পলায়ন করে, ধ্রুবের অস্ত্রে আহত হইয়া যক্ষগণও সেইরূপ পলায়নপর হয়। পরিশেষে যক্ষগণ মায়াজাল বিস্তার করিলে, পিতামহ স্বায়ম্ভুব মনু আবির্ভূত হইয়া, তত্ত্বোপদেশ দ্বারা ধ্রুবের ক্রোধ নিবৃত্তি করেন। মহামতি ধ্রুব যজ্ঞানুষ্ঠানে ভগবানের তুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন। তিনি আপনার আত্মাতে এবং যাবতীয় প্রাণীর শরীরে, ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রজাবাৎসল্য প্রভাবে প্রজাগণ তাঁহাকে পিতার ন্যায় জ্ঞান করিত। ভোগ দ্বারা পুণ্যক্ষয় এবং যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা পাপনাশ করিয়া, ধ্রুব ষট্‌ত্রিংশ সহস্র বৎসর পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন। † এই ধ্রুবের বংশে অঙ্গ রাজা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া, আপনার প্রাধান্য-প্রভাব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অঙ্গের ঔরসে উগ্রস্বভাব বেণ উদ্ভূত হন। পুত্র বেণের দৌরাত্ম্যে অঙ্গ পুরত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি প্রব্রজ্যায় গমন করিলে, ভৃগু প্রভৃতি মুনিগণ বেণকে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। বেণ বাল্যকাল হইতেই দুর্দ্ধর্ষ ও নির্দ্দয়-স্বভাব ছিলেন। বেণের নির্দ্দয়তার পরিচয় সম্বন্ধে লিখিত আছে,—'বাল্যকালে বয়স্যগণ সঙ্গে খেলা করিতে করিতে সেই নির্দ্দয়-স্বভাব রাজকুমার তাহাদিগকে পশুর ন্যায় মারিয়া ফেলিতেন।' সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, ঐশ্বর্য্যমদে অন্ধ ও গর্ব্বিত হইয়া, বেণ বিষম

---

* বিষ্ণুপুরাণ, দ্বিতীয় অংশ, প্রথম অধ্যায়।

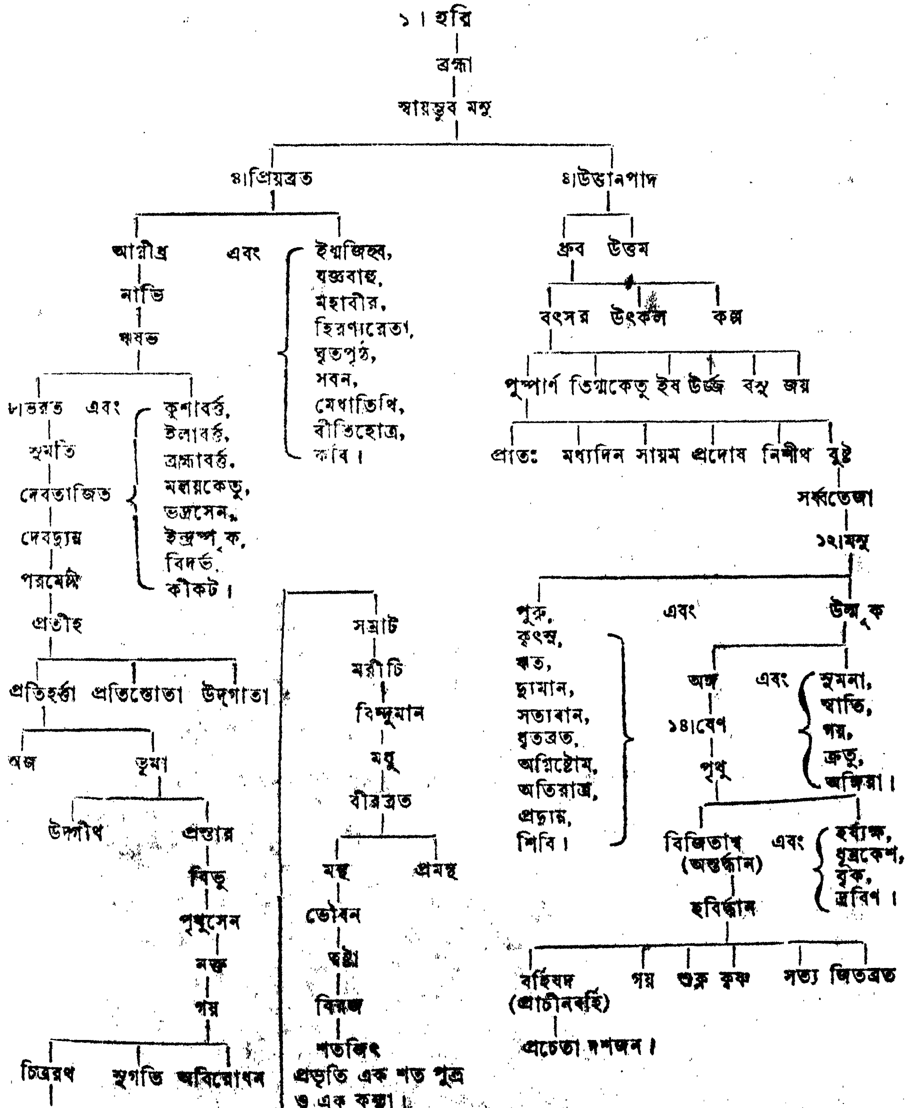
† শ্রীমদ্ভাগবত, চতুর্থ স্কন্ধ, অষ্টম হইতে দ্বাদশ অধ্যায়; বিষ্ণুপুরাণ, প্রথম অংশ, একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায়; এবং অন্যান্য পুরাণেও ধ্রুব-চরিত্র বিশদরূপে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।

অত্যাচার আরম্ভ করেন। ধর্ম্ম-কর্ম্ম লোপ পায়; লোক-সকলের মহা বিপদ উপস্থিত হয়; ব্রাহ্মণদিগকে ধরিয়া আনিয়া তিনি আপন শিবিকাবাহক নিযুক্ত করেন। ফলে, দেশমধ্যে অরাজকতা উপস্থিত হয়। তখন প্রজাবর্গ এক মত হইয়া, বেণের প্রাণসংহার করে। সেই সময় আবার কিছুকাল অশান্তি-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। রাজার মরণে দস্যুগণ নির্ভয় হয়; প্রজার ধন-লুণ্ঠন ও যথেচ্ছভাবে নরহত্যা চলিতে থাকে। তখন আবার ব্রাহ্মণগণ চিন্তিত হইয়া পড়েন। তাঁহারা একমত হইয়া বেণ-পুত্র পৃথুকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। পৃথুর অভিষেক-উৎসবে আনন্দের কল-কল্লোল উত্থিত হইয়াছিল; দেব-গন্ধর্ব্ব সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। অভিষেক-উৎসবের সময় বন্দিগণ ও মাগধগণ তাঁহার স্তব উচ্চারণ করিলে, তিনি সঙ্কুচিত হইয়া বলিয়াছিলেন,—"আমি এখনও কোনও কার্য্য করি নাই। তবে কেন আপনারা মিথ্যাবাক্য উচ্চারণ করিয়া, আমার গুণগান করিতেছেন?" রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়া, রাজরাজ পৃথু রাজ্যমধ্যে একাধিপত্য বিস্তার করেন। সমগ্র পৃথিবী তাঁহার করতলগত হইয়াছিল। তিনি বহুতর পর্ব্বতশৃঙ্গ ভঙ্গ করিয়া, তদুপরি জনস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; তাঁহার রাজত্বকালে নূতন নূতন গ্রাম, পুর, পত্তন, দুর্গ, ব্রজ, শিবির, আকর প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাঁহার কীর্ত্তি-কলাপ—তাঁহার যশোরাশি, এতদূর বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল যে, শাস্ত্রকারগণ বলিয়া গিয়াছেন,—"পৃথুর পূর্ব্বে ধরণীমণ্ডলে এ প্রকার পুর-গ্রামাদি ছিল না; তাঁহার রাজত্বে গৃহাদি প্রাপ্ত হইয়া, প্রজাসকল নির্ভয়ে স্ব স্ব স্থানে পরম সুখে বাস করিয়াছিল। সূর্য্য যেমন রশ্মিযোগে পৃথিবীর রস আকর্ষণ করিয়া, পুনর্ব্বার বর্ষণ দ্বারা তাহা ত্যাগ করিয়া থাকেন; পৃথু সেইরূপ প্রজাবর্গের নিকট কররূপে ধনগ্রহণ করিয়া, উপযুক্তকালে তাহা প্রত্যর্পণ করিতেন। তিনি প্রজাবাৎসল্যে মনুর তুল্য, প্রভুত্বে ব্রহ্মার সদৃশ, বেদবাদে বৃহস্পতির সমান এবং সাক্ষাৎ বিষ্ণুর ন্যায় জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। গো, ব্রাহ্মণ, গুরু ও বিষ্ণুভক্তজনের প্রতি তাঁহার ভক্তি, লজ্জা, বিনয় ও শীল ছিল। পরকার্য্যসাধনে তাঁহার উপমাস্থান ছিল না; ত্রৈলোক্যের সর্ব্বস্থানে সকল পুরুষই তাঁহার কীর্ত্তি গান করিত।" ধরণীর অধীশ্বর পৃথু দোহন (করগ্রহণ) করিতেন বলিয়া, ধরণীর নাম 'পৃথ্বী' বা 'পৃথিবী' হইয়াছিল,—পুরাণ-পরম্পরার ইহাই অভিমত। অগ্নি-পুরাণের মতে,—'পৃথুর রাজত্বকালেই প্রথমে সূত ও মাগধ প্রমুখ স্তুতিবাদকগণের উৎপত্তি হইয়াছিল।' শ্রীমদ্ভাগবতের মতে,—পৃথুর মহিষী সাধ্বী অর্চ্চি পৃথুর সহমৃতা হইয়াছিলেন।* পৃথুর স্বর্গলাভ হইলে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিজিতাশ্ব ধরণীর অধীশ্বর হন। স্নেহবশতঃ তিনি তাঁহার চারি ভ্রাতাকে চারিদিকের অধিকার প্রদান করেন। রাজা বিজিতাশ্ব (অন্তর্দ্ধান) কিছু দিন রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া, মনে মনে চিন্তা করিলেন,—'কর আদায়, দণ্ডদান প্রভৃতি রাজবৃত্তি নিদারুণ পীড়াদায়ক। এতদ্দ্বারা যে অর্থ সঞ্চিত হইয়াছে, তাহা সদনুষ্ঠানে ব্যয় করা কর্ত্তব্য।' এই মনে করিয়া, দীর্ঘকাল-সাধ্য যজ্ঞ ও দানাদিতে তিনি সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন।

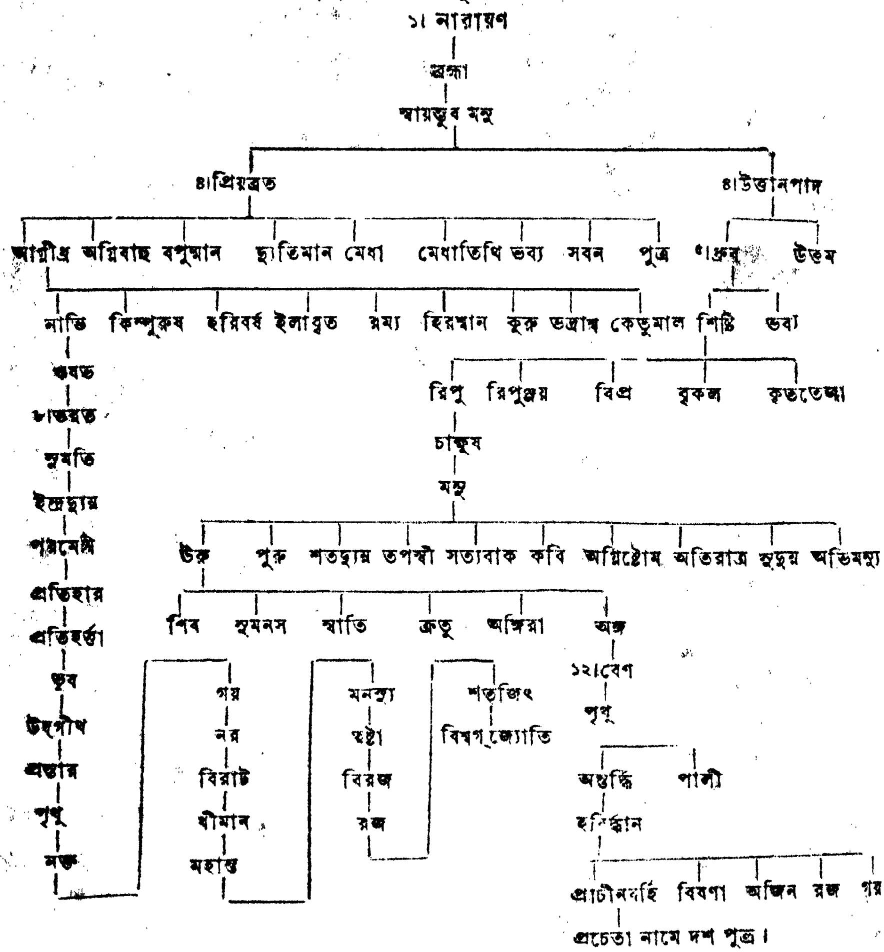
* শ্রীমদ্ভাগবত, চতুর্থ স্কন্ধ, পঞ্চদশ হইতে ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে; বিষ্ণুপুরাণ, প্রথমাংশ, ত্রয়োদশ অধ্যায়ে; শিবপুরাণ, ধর্ম্মসংহিতা, ৫৩শ-৫৭শ অধ্যায়ে; হরিবংশ, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে; ব্রহ্মপুরাণ, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে;—বেণ, পৃথু প্রভৃতি উত্তানপাদ-বংশীয় নৃপতিগণের বিবরণ দ্রষ্টব্য।

বিজিতাশ্বের পৌত্র প্রাচীনবর্হি (বর্হিষদ) যজ্ঞ ও ক্রিয়াকাণ্ডে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। তদীয় যজ্ঞকুশ দ্বারা ধরণীতল আচ্ছন্ন হইয়াছিল, এবং বসুধাকে তিনি যজ্ঞবেদীময় করিয়াছিলেন। অতঃপর প্রচেতাগণের মুক্তিলাভের সঙ্গে-সঙ্গেই উত্তানপাদ-বংশের অবসান হয়। নিম্নে স্বায়ম্ভুব মনুর বংশলতা প্রকটিত হইল। তাহাতে ভরত প্রভৃতি প্রিয়ব্রতের বংশধরগণের এবং ধ্রুব-পৃথু-প্রমুখ উত্তানপাদের বংশধরগণের সম্বন্ধ-পরিচয় বুঝা যাইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে—স্বায়ম্ভুব মনুর বংশ।



বিষ্ণুপুরাণে—স্বায়ম্ভুব মনুর বংশ।



** শ্রীমদ্ভাগবত এবং বিষ্ণুপুরাণের বংশ-পর্য্যায়ের অসামঞ্জস্য, দুই পৃষ্ঠার বংশলতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই উপলব্ধি হইবে। অন্যান্য পুরাণের মধ্যে গরুড়পুরাণে ভরতের পৌত্র তৈজস, তৎপরে পর্য্যায়-ক্রমে ইন্দ্রদ্যুম্ন, পরমেষ্ঠী, প্রতিহার, প্রতিহর্ত্তা, প্রস্তার, বিভু, পৃথু, নক্ত, গয়, নর, বুদ্ধিরাট, ভৌবন, ত্বষ্টা, বিরজা, রজস, শতজিৎ ও বিষ্বগ্‌জ্যোতি নাম দৃষ্ট হয়। ঐ পুরাণের মতে,—প্রিয়ব্রত-পুত্র বপুষ্মানের শ্বেত, হরিত, জীমূত, রোহিত, বৈদ্যুত, মানস এবং সুপ্রভ নামে পুত্র ছিল। দ্যুতিমানের কুশল, মনুগ, উষ্ণ, পীবর, অন্ধকারক, মণি ও দুন্দুভি নামে সন্তান জন্মিয়াছিল; মেধাতিথির শান্তভব, শিশির, সুখোদয়, নন্দ, শিব, ক্ষেমক ও ধ্রুব নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ভব্যের জলদ, কুমার, সুকুমার, মুনিচক, কুসুমোদ, মোদাকি, মহাদ্রোণ প্রভৃতি পুত্র; সবলের (সবন?) মহাবীর ও ধাতকী নামে পুত্রদ্বয় এবং জ্যোতি-ষ্মানের উদ্ভিদ, বেণুমান, বৈরথ, লম্বন, ধৃতি, প্রভাকর ও কপিল নামে পুত্র বিদ্যমান ছিল। ব্রহ্মপুরাণের সহিত ইহার সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়। অগ্নিপুরাণে প্রিয়ব্রত-বংশের বিবরণ বিশেষ কিছুই উল্লিখিত হয় নাই; কিন্তু উত্তানপাদের বংশে ধ্রুবের তিন পুত্রের উল্লেখ আছে—শিষ্টি, ভব্য ও শম্ভু। শিষ্টির পাঁচ পুত্রের (বিষ্ণুপুরাণের অনুরূপ) মধ্যে রিপুর পুত্র—চাক্ষুষ মনু। সেই মনুর দশ পুত্রের মধ্যে অগ্নিষ্টোম স্থলে আদিত্য এবং ছয় পৌত্রের মধ্যে শিব স্থলে গয় নাম দৃষ্ট হয়। ঐ পুরাণে পৃথুর পুত্র অন্তর্দ্ধান এবং অন্তর্দ্ধানের ছয় পৌত্রের মধ্যে রজের পরিবর্ত্তে ব্রজ এবং বিষণার পরিবর্ত্তে কৃষ্ণ নাম লিখিত আছে। এইরূপ আলোচনা করিলে, অন্যান্য পুরাণের সহিতও অল্প-বিস্তর পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় বটে; কিন্তু মূল বিষয়ে, বংশের প্রধান প্রধান ব্যক্তির সম্বন্ধে, প্রায়ই মতানৈক্য নাই। বাহুল্য বিধায় তত্তাবৎ স্বতন্ত্র ভাবে আলোচিত হইল না।

স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকারের পর, স্বরোচিষ মনুর অধিকার-কাল উপস্থিত হয়। স্বরোচিষ মনুর দশ পুত্র;—হবিধ্র (হবিধ্র), সুকৃতি, জ্যোতি, আপমূর্ত্তি, প্রতীত (অয়প্রথিত), নভস্য, নভ ও উর্জ্জ। ব্রহ্মপুরাণ ও হরিবংশে এ বিষয়ে সামান্য পার্থক্য আছে বটে; কিন্তু গরুড়পুরাণের সহিত পার্থক্য কিছু বেশী। গরুড়পুরাণ প্রায় স্থলেই বহু পুত্র বলিয়া তাঁহাদের কয়েক জনের মাত্র নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতে ব্রহ্মপুরাণ বা হরিবংশোক্ত দশ পুত্রের নাম বাদ পড়িতে পারে। যাহা হউক, গরুড়পুরাণের মতে, স্বরোচিষ মনুর পুত্রগণের নাম,—বিনত, কর্ণান্ত, বিদ্যুত, রবি, বৃহদ্গণ ও নভ। এই স্বারোচিষ মনুর বংশধরগণ সকলেই প্রবল-পরাক্রান্ত ছিলেন। এই বংশের অধিকারান্তে ঔত্তম মনুর অধিকার-কাল। তাঁহারও দশ পুত্র;—ইষ (ঈশ), উর্জ্জ, তনূর্জ্জ, মধু, মাধব, শুচি, শুক্র, সহ, নভস্য, নভ। কিন্তু গরুড়পুরাণের মতে ঔত্তমি মনুর পুত্রগণের নাম,—অজ, পরশু, বিনীত, সুকেতু, সুমিত্র, সবল, শুচি, দেব, দেবাবৃধ, মহোৎসাহ, অজিত প্রভৃতি। তৎপরে তামস মনুর আবির্ভাব। তাঁহারও বহু পুত্রের মধ্যে দশ জন বিখ্যাত;—দ্যুতি, তপস্য, সুতপা, তপোমূল, সনাতন (তপোশন), তপোরতি, কল্মাষ (অকল্মাষ), তন্বী, ধন্বী ও পরন্তপ। কিন্তু গরুড়পুরাণের মতে তামস মনুর পুত্রগণের নাম—জানু, জরুঘ, নর, খ্যাতি, নয়, প্রিয়ভৃত্য, পৃথু, কাব্য, চরিত্র প্রভৃতি। তৎপরে পঞ্চম রৈবত মনু। রৈবত মনুর পুত্রগণের মধ্যেও দশ পুত্র প্রসিদ্ধ। তাঁহাদের নাম,—ধৃতিমান, অব্যয়, যুক্ত, তত্ত্বদর্শী, নিরুৎসুক, অরণ্য, প্রকাশ, সত্যবাক্, কৃতী (কবি)। কিন্তু গরুড়পুরাণের মতে, রৈবত মনুর বহুসংখ্যক পুত্রের মধ্যে—মহাপ্রাণ, সাধক, বলবন্ধু, নিরমিত্র, প্রত্যঙ্গ, পরহা, শুচি, দৃঢ়ব্রত ও কেতুশৃঙ্গ প্রধান। অতঃপর চাক্ষুষ মনু। তাঁহার নড্বলা নাম্নী পত্নীর গর্ভে রুরু (উরু) প্রমুখ দশ পুত্র উৎপন্ন হয়। গরুড়পুরাণ বলেন,—চাক্ষুষ মনুর পুত্রগণের মধ্যে উরু, পুরু, মহাবল, শতদ্যুম্ন, তপস্বী, সত্যবাক্য, কৃতী, অগ্নিষ্টুম প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। ইহার পর, সপ্তম বৈবস্বত মন্বন্তর। এই সপ্তম মন্বন্তরই এখন চলিতেছে। এই মন্বন্তরের মনুপুত্রগণের—চন্দ্রবংশের ও সূর্য্যবংশের—বংশ-পর্য্যায় পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। * তবে এখন যে সপ্তম মন্বন্তর চলিতেছে, তাহা শ্বেতবরাহ কল্পের বৈবস্বত মন্বন্তর। বৈবস্বত মন্বন্তরের পর, সাবর্ণি মন্বন্তর। সাবর্ণি মনু পাঁচ জন। অষ্টম যে ভবিষ্য সাবর্ণি মনু, তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে—বিরজা, অর্ব্বরীবান ও নির্ম্মোহাদি রাজা হইবেন। নবম ভবিষ্য মনু—দক্ষ সাবর্ণি নামে অভিহিত। ধৃতকেতু, দীপ্তিকেতু, পঞ্চহস্ত, নিরাময় ও পৃথুশ্রবা প্রভৃতি তাঁহার পুত্রগণ রাজ-পদ লাভ করিবেন। দশম ভবিষ্য মনু—ব্রহ্মসাবর্ণি। তাঁহার পুত্রগণের নাম,—হবিষ্মান, সুকৃতি, সত্য, অপানমূর্ত্তি, নাভাগ, অপ্রতিমৌজা, সত্যকেতু, সুক্ষেত্র, উত্তমৌজা, হরিসেন প্রভৃতি। ব্রহ্ম-সাবর্ণি মন্বন্তরে ইঁহারা এবং ইঁহাদেরই বংশধরগণ পৃথিবীপতি হইবেন। এই দশম মনুর পুত্রগণের নাম সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতির সহিত গরুড়পুরাণ প্রভৃতির কিঞ্চিৎ অনৈক্য দৃষ্ট হয়। সে হিসাবে দশম মনুর পুত্রগণের নাম—সুক্ষেত্র, উত্তমৌজা, ভূরিশ্রেষ্ঠা, বীর্য্যবান, শতানিক, নিরমিত্র

অপরাপর মনু ও মনুপুত্রগণ।

* এই গ্রন্থের ২৯১ ও ৩০৪ পৃষ্ঠায় সূর্য্যবংশের ও চন্দ্রবংশের বংশ-বিবরণ দ্রষ্টব্য।

বৃষসেন, জয়দ্রথ, ভুবিদ্যুম্ন, সুবর্চ্চা, শান্তি ও ইন্দ্র। একাদশ ভবিষ্য-মনু—ধর্ম্মসাবর্ণি। সর্ব্বগ, সর্ব্বধর্ম্মা ও দেবানিক প্রভৃতি এই মনুর পুত্রগণ রাজা হইবেন। দ্বাদশ ভবিষ্য-মনু—রুদ্র-সাবর্ণি। দেববান, উপদেব, দেবশ্রেষ্ঠ প্রভৃতি উক্ত মনুর মহাবলশালী পুত্রগণ এই মন্বন্তরে রাজ্যৈশ্বর্য্য লাভ করিবেন। ত্রয়োদশ ভবিষ্য-মনু—দেব-সাবর্ণি। ইনি রৌচ্য মনু নামে অভিহিত। এই মনুর পুত্রগণের নাম—চিত্রসেন, বিচিত্র প্রভৃতি। ত্রয়োদশ মন্বন্তরে ইঁহারা সকলেই পৃথিবীপতি হইবেন। চতুর্দ্দশ ভবিষ্য-মনু—ইন্দ্র-সাবর্ণি। ইনি ভৌত্য মনু নামে পরিচিত। উরু, গভীর, ব্রধ্ন, প্রভৃতি এই মনুর পুত্রগণ পৃথিবী পালন করিবেন। এইরূপে চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে প্রায় সহস্র চতুর্যুগ অতীত হইলে, একটী কল্প পূর্ণ হয়। অনন্তর ঐ কল্প পরিমিত রাত্রি। তার পর, পুনরায় নূতন কল্পের নূতন মন্বন্তরের সূত্রপাত। এইরূপ চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে কর্ম্মফলে পর্য্যায়ক্রমে কেহ দেবতারূপে, কেহ ইন্দ্ররূপে, কেহ সপ্তর্ষিরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। সেই যে দেববাঞ্ছিত ইন্দ্রত্ব-পদ— চতুর্থ মন্বন্তরে শিবি নামে কোনও ঋষি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পঞ্চম মন্বন্তরে ইন্দ্রত্ব পাইয়াছিলেন—বিভু নামা এক সিদ্ধপুরুষ। ষষ্ঠ মন্বন্তরে ইন্দ্রত্ব পাইয়াছিলেন—মহাশাল নামে এক জন দৈত্য। এইরূপ সপ্তম বৈবস্বত মন্বন্তরে পুরন্দর দেবগণের অধিপতি হন। অষ্টম মন্বন্তরে বলিরাজ ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইবেন। নবম মন্বন্তরে অদ্ভুত নামা মহাবীর্য্য ইন্দ্রত্ব লাভ করিবেন; সপ্তম মন্বন্তরের তিনিই ষড়ানন কার্ত্তিকেয়। দশম মন্বন্তরে শান্তি নামক জনৈক মহাবল ইন্দ্রত্ব লাভ করিবেন। একাদশ মন্বন্তরে বৃষ নামে ইন্দ্র উৎপন্ন হইবেন। দ্বাদশ রুদ্র সাবর্ণি মন্বন্তরে ঋতধামা ইন্দ্র-রূপে জন্মগ্রহণ করিবেন। ত্রয়োদশ মন্বন্তরে দিবস্পতি ইন্দ্র হইবেন। চতুর্দ্দশ ইন্দ্র সাবর্ণি মন্বন্তরে শুচি নামে ইন্দ্র দেবাধিপতিত্ব লাভ করিবেন। এইরূপ কোন্ মন্বন্তরে কে সপ্তর্ষি হন, তৎসম্বন্ধে দৃষ্ট হয়;—স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে সপ্তর্ষি হইয়াছিলেন—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ; স্বারোচিষ মন্বন্তরে—ঊর্জ্জ, স্তম্ব, প্রাণ, ঋষভ, নিশ্চল, দত্তলি, অর্ব্বরীবান; ঔত্তম মন্বন্তরে—রজৌজা, ঊর্দ্ধবাহু, শরণ, অনঘ, মুনি, সুতপা ও শঙ্কু; তামস মন্বন্তরে—কৃত, জ্যোতির্দ্ধামা, পৃথু, কাব্য, চৈত্র, শ্বেতাগ্নি ও হেমক; রৈবত মন্বন্তরে—দেবশ্রী, দেববাহু, ঊর্দ্ধবাহু, হিরণ্যরোমা, পর্জ্জন্য, সত্য ও সুধামা; চাক্ষুষ মন্বন্তরে—উত্তম, শ্রীমান্, সুধামা, বিরজ, অভিমান, সহিষ্ণু ও মধুশ্রী; এবং বর্ত্তমান বৈবস্বত মন্বন্তরে—অত্রি, বশিষ্ঠ, জমদগ্নি, কশ্যপ, গৌতম, ভরদ্বাজ ও বিশ্বামিত্র সপ্তর্ষি হইয়াছেন। এতদ্বিবরণ এবং ভবিষ্য মন্বন্তর-সমূহে যাঁহারা সপ্তর্ষি বা দেবতাদি হইবেন। তদ্বিষয় প্রায় প্রতি পুরাণেই লিখিত আছে।* এই চতুর্দ্দশ মনু ও মন্বন্তরের নাম এবং তাঁহাদের বংশধরগণের পরিচয় সম্বন্ধেও অনেক মতান্তর দৃষ্ট হয়। তদ্বিষয়ে অধিক আলোচনা বাহুল্য মাত্র।

* অতীত ও অনাগত মন্বন্তর ও কল্পাদি সম্বন্ধে—ব্রহ্মপুরাণ, পঞ্চম অধ্যায়; বিষ্ণু-পুরাণ, তৃতীয় অংশ, প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়; গরুড়পুরাণ, সপ্তাশীতিতম অধ্যায়; হরিবংশ, সপ্তম অধ্যায়; শ্রীমদ্ভাগবত, তৃতীয় স্কন্ধ, একাদশ অধ্যায় এবং অষ্টম স্কন্ধ প্রথম অধ্যায়; দেবী-ভাগবত, দশম স্কন্ধ, প্রথম, দ্বিতীয়, অষ্টম, নবম ও ত্রয়োদশ অধ্যায়; শিবপুরাণ, ধর্ম্মসংহিতা, অষ্টপঞ্চাশৎ অধ্যায়; এবং মার্কণ্ডেয়-পুরাণ, ৫৩ম, ৭৩ম—৭৭ম, ৮০ম, ৯৪ম অধ্যায়-সমূহ দ্রষ্টব্য। এই গ্রন্থের ৯ম, ১৬শ ও ১৯২শ পৃষ্ঠায়ও কল্প-মন্বন্তরাদির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

সূর্য্যবংশীয় নৃপতিগণ।

[সূর্য্য-বংশের নৃপতিগণ,—ইক্ষ্বাকু, বিকুক্ষি, কুবলয়াশ্ব, মান্ধাতা, ককুৎস্থ, ত্রিশঙ্কু প্রভৃতি ;—হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান ;—অযোধ্যার অন্যান্য নৃপতিগণ—সগর, ভগীরথ, কল্মাষপাদ, সৌদাস, অম্বরীষ, দশরথ, শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতি,—পরশুরাম প্রসঙ্গ,—নিঃক্ষত্রিয়া পৃথিবীতে ক্ষত্র-বংশের মূল—মূলক রাজা,—নরমেধ-যজ্ঞে হরিশ্চন্দ্রের ও অম্বরীষের ইতিহাসে সামঞ্জস্য ;—মিথিলার রাজ-বংশ,—জনক ও সীতা প্রভৃতির কাহিনী ;—মনুর অন্যান্য বংশধরগণ,—সুকন্যার পতিভক্তি,—চ্যবনের যৌবন-প্রাপ্তি,—বলদেব ও রেবতীর বিবাহ,—ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ-বংশের উৎপত্তি।]

প্রজাপতি কশ্যপের পৌত্র বিবস্বান্ সূর্য্য হইতেই সূর্য্য-বংশের উৎপত্তি। সূর্য্য-বংশের প্রথম রাজার নাম—ইক্ষ্বাকু। তিনি বৈবস্বত মনুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। পুরাণের রূপকে প্রকাশ,—হাঁচিবার সময় মনুর ঘ্রাণেন্দ্রিয় হইতে তাঁহার উৎপত্তি হয় বলিয়া তিনি ইক্ষ্বাকু নামে পরিচিত। ইক্ষ্বাকু অযোধ্যার সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তিনিই অযোধ্যার প্রথম ক্ষত্রিয় রাজা বলিয়া অভিহিত হন। ইক্ষ্বাকুর এক শত পুত্রের মধ্যে তিন পুত্র প্রধান ;—বিকুক্ষি, নিমি ও দণ্ড। বিকুক্ষি অযোধ্যার এবং নিমি মিথিলার রাজা হইয়াছিলেন। বিকুক্ষির বংশে দশরথ, রামচন্দ্রাদি এবং নিমির বংশে জনকাদি জন্মগ্রহণ করেন। শশক-মাংস ভক্ষণ করিয়া, বিকুক্ষি গুরু কর্তৃক 'শশাদ' নামে অভিহিত ও পিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত হন। যাহা হউক, পরিশেষে ইক্ষ্বাকুর মৃত্যু হইলে, তিনিই অযোধ্যার সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইক্ষ্বাকুর অপরাপর পুত্রগণ আর্য্যাবর্ত্তের ভিন্ন ভিন্ন ভাগের আধিপত্য লাভ করেন। বিকুক্ষির পুত্র পুরঞ্জয় (রাজর্ষি পুরঞ্জয়) বিশেষ প্রসিদ্ধ। দেবাসুরের যুদ্ধে বৃষভরূপধারী ইন্দ্রের 'ককুৎ' অর্থাৎ স্কন্ধদেশে অবস্থিত ছিলেন বলিয়া, তিনি 'ককুৎস্থ' (কাকুৎস্থ) নামে পরিচিত হন। ইন্দ্র কর্তৃক সংবাহিত হইয়াছিলেন বলিয়া, 'ইন্দ্রবাহ' নামেও তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। দানব-সমরে জয়লাভ করিয়া, তিনি দানবদিগের ধনরাশি বজ্রপাণি ইন্দ্রকে প্রদান করিয়াছিলেন ; তাঁহার পুরঞ্জয় নামের সার্থকতা তাহাতেই উপলব্ধি হইয়াছিল। এই বংশের শ্রাবস্ত নামক নরপতি 'শ্রাবস্তি' নাম্নী পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। শ্রাবস্তের পৌত্র রাজা কুবলয়াশ্ব, ধুন্ধু নামক অসুরকে বিনাশ করিয়া 'ধুন্ধুমার' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। ধুন্ধু অসুর, মহর্ষি উতঙ্কের যজ্ঞ-কার্য্যের অনিষ্ট সাধন করিত। সেই জন্য মহর্ষির হিতসাধন অভিপ্রায়ে কুবলয়াশ্ব অসুরকে বধ করিয়াছিলেন। কুবলয়াশ্বের একবিংশতি সহস্র পুত্র ছিল। কিন্তু তাঁহার তিন পুত্র ভিন্ন সকলেই অসুরের নিশ্বাস-সম্ভূত অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া বিনষ্ট হয়। অতঃপর যুবনাশ্বের পুত্র—মান্ধাতা। এই মান্ধাতার উৎপত্তি-বিবরণ অলৌকিক রহস্য-পরিপূর্ণ। পুরাণে প্রকাশ,—অপুত্রত্ব-নিবন্ধন নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া, যুবনাশ্ব ঋষিগণের আশ্রমে বসতি করিতেছিলেন। ঋষিগণ কৃপা-পরবশ হইয়া, যুবনাশ্বের জন্য পুত্রেষ্টি-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। মধ্য-রাত্রে যজ্ঞ শেষ হইলে, মন্ত্রপূত জল যুবনাশ্বের মহিষীর জন্য রাখিয়া

দেওয়া হয়। সেই জল পান করিলে মহিষীর গর্ভে প্রবল-পরাক্রান্ত পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করিবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু মুনিগণ নিদ্রিত হইলে ভ্রমক্রমে যুবনাশ্ব মন্ত্রপূত জল পান করিয়া ফেলেন। তাহাতে যুবনাশ্বেরই গর্ভ হয়। সেই গর্ভে মান্ধাতা জন্মগ্রহণ করেন। কুক্ষি বিদীর্ণ করিয়া, সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। কিন্তু যুবনাশ্বের তাহাতেও মৃত্যু হয় নাই। যাহা হউক, চক্রবর্ত্তী-লক্ষণাক্রান্ত সেই পুত্র স্তন্য-পানার্থ রোদন করিলে, দেবরাজ ইন্দ্র তাহার রোদন নিবারণ জন্য 'মাং ধাতা' অর্থাৎ 'আমাকে পান করিবে' বলিয়া আপন তর্জ্জনী অর্পণ করিয়াছিলেন। তাহাতেই যুবনাশ্বের পুত্র 'মান্ধাতা' নামে পরিচিত। দস্যুগণ রাজা মান্ধাতার প্রতাপে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকিত বলিয়া, তিনি 'ত্রসদ্দস্যু' নামেও অভিহিত হইয়াছিলেন। তিনি সম্রাট নামে পরিচিত হইয়া, অচ্যুতের তেজে সপ্তদ্বীপা পৃথিবী শাসন করিয়াছিলেন। যজ্ঞ দ্বারা তিনি দেবগণকে পরিতুষ্ট রাখিয়াছিলেন। সুশাসন-সুপালনের জন্য তাঁহার প্রসিদ্ধি চির-বিশ্রুত। তাঁহার রাজ্যের বিস্তৃতি সম্বন্ধে পুরাণাদি শাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে,—"যাবৎ সূর্য্য উদেতি স্ম যাবচ্চ প্রতিতিষ্ঠতি। সর্ব্বং তদ্‌যৌবনাশ্বস্য মান্ধাতুঃ ক্ষেত্রমুচ্যতে॥" অর্থাৎ, যেখান হইতে সূর্য্য উদয় হন এবং যেখানে গিয়া অস্ত যান, সেই সমস্ত ক্ষেত্রই যুবনাশ্ব-বংশীয় রাজা মান্ধাতার রাজ্য বলিয়া পরিকীর্ত্তিত আছে। সম্রাট মান্ধাতা, রাজা শশবিন্দুর দুহিতা ইন্দুমতীকে বিবাহ করেন। তাঁহার তিন পুত্র ও পঞ্চাশৎ কন্যা উৎপন্ন হয়। ঋষি সৌভরি সেই কন্যাগণকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই মান্ধাতার দ্বিতীয় পুত্র অম্বরীষের পৌত্র হারীত হইতে 'আঙ্গিরস' নামে ক্ষত্রিয়-কুল প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। মান্ধাতার জ্যেষ্ঠ পুত্র পুরুকুৎস রসাতলে গমন করিয়া, গন্ধর্ব্বগণকে হনন পূর্ব্বক, আপন প্রাণান্তের পরিচয় দিয়াছিলেন। পুরুকুৎসের বংশে অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষে সত্যব্রত জন্মগ্রহণ করেন। পরিণীয়মানা ব্রাহ্মণ-কন্যাকে অপহরণ করায়, পিতৃ-শাপে তিনি চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হন। তদবধি তিনি 'ত্রিশঙ্কু' নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।* তাঁহার সেই পাপে তাঁহার রাজ্যে দ্বাদশ বৎসর অনাবৃষ্টি হয়। প্রজাকুল দুর্ভিক্ষে আকুল হইয়া পড়ে। যথারীতি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া, বিশ্বামিত্র ঋষির অনুকম্পায়, চণ্ডালত্ব হইতে মুক্তিলাভের পর, তিনি স্বর্গে গমন করেন।

ত্রিশঙ্কুর পুত্র—লোক-বিশ্রুত হরিশ্চন্দ্র। অলৌকিক তাঁহার চরিত্র-কাহিনী! রাজ্যাধিকার লাভ করিয়া কিছুকাল অপত্য-নির্ব্বিশেষে প্রজা-পালনের পর, অপুত্রত্ব-নিবন্ধন হরিশ্চন্দ্র বড়ই ক্ষুণ্ন হন। দেবর্ষি নারদ, মহারাজ হরিশ্চন্দ্রকে পুত্রলাভ-কামনায় বরুণদেবের উপাসনা করিতে পরামর্শ দেন। তাহাতে হরিশ্চন্দ্র বরুণদেবের শরণাপন্ন হইয়া, বর প্রার্থনা করেন। কিন্তু বর-প্রদান-কালে বরুণদেব বলেন,—"যদি তুমি তোমার প্রথম পুত্রকে যজ্ঞে বলি দান করিতে পার, তোমার বন্ধ্যাত্ব বিদূরিত হইবে।" হরিশ্চন্দ্র তাহাতেই সম্মত হন। তাঁহার মনে হয়,—"আমার

হরিশ্চন্দ্র।

* বিষ্ণুপুরাণে ও শ্রীমদ্ভাগবতে পিতৃ-শাপে ত্রিশঙ্কুর চণ্ডালত্ব-প্রাপ্তির বিষয় আছে বটে; কিন্তু দেবীভাগবতের মতে,—বশিষ্ঠের দুগ্ধবতী গাভীকে হত্যা করায়, রাজা সত্যব্রত চণ্ডালাকৃতি প্রাপ্ত ও 'ত্রিশঙ্কু' নামে অভিহিত হন।

বন্ধ্যাত্ব দূর হইলে, একাধিক পুত্র জন্মিবার সম্ভাবনা। সুতরাং একটী পুত্র নরমেধ-যজ্ঞে প্রদান করিব, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?" তখন আর তিনি ভাবিয়া দেখিবার অবসর পান না—যূপকাষ্ঠে পুত্রের বলিদান পিতামাতার পক্ষে কিরূপ হৃদয়-বিদারক ব্যাপার! যাহা হউক, যথাসময়ে রোহিত নামে তাঁহার এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিলে, বরুণদেব যজ্ঞের জন্য সেই পুত্র চাহিয়া বসিলেন। কিন্তু পুত্র পরিত্যাগ করিতে পিতার প্রাণ বিদীর্ণ হইতে লাগিল। হরিশ্চন্দ্র প্রথমে নানারূপ ছলনা করিয়া, দিনক্ষয় করিতে লাগিলেন। পরিশেষে পুত্রকে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার অছিলায় অরণ্যে গুরু-গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিত অনেক দিন পর্য্যন্ত প্রত্যাবৃত্ত হইলেন না। ক্রোধ-পরবশ হইয়া, বরুণদেব তখন হরিশ্চন্দ্রকে অভিসম্পাত করিলেন। অভিসম্পাতে উদরী-রোগে আক্রান্ত হইয়া, হরিশ্চন্দ্র অশেষ কষ্ট ভোগ করিতে লাগিলেন। তখন, কি প্রকারে রাজার রোগ-মুক্তি হইতে পারে,—তদ্বিষয়ে ব্যবস্থা গৃহীত হইতে লাগিল। ব্রহ্মাপুত্র কুলগুরু বশিষ্ঠ ব্যবস্থা দিলেন,—'মূল্যপ্রদানে ক্রীতপুত্র দ্বারা নরমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও শাপ মুক্তি হইতে পারে।" অতঃপর কোনও দরিদ্র ব্রাহ্মণের পুত্রকে ক্রয় করিবার জন্য চেষ্টা চলিতে লাগিল। ভূপতির রাজ্য-মধ্যে অজিগর্ত্ত নামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার শুনঃপুচ্ছ, শুনঃশেফ ও শুনঃলাঙ্গুল নামে তিন পুত্র ছিল। দরিদ্র ব্রাহ্মণের অতি কষ্টে দিনপাত হয়; ব্রাহ্মণ কোনক্রমেই আপনার ও পুত্রগণের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করিতে পারেন না। পুত্রের বিনিময়ে, শত গো-দানের প্রলোভনে, ব্রাহ্মণকে প্রলুব্ধ করিয়া, রাজ-মন্ত্রী তাঁহার মধ্যম পুত্র শুনঃশেফকে ক্রয় করিয়া আনিলেন। অতঃপর নরমেধ-যজ্ঞের আয়োজন হইল। কিন্তু বলিদানের পূর্ব্বে বালক ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। বালকের ক্রন্দনে ছেদক যূপকাষ্ঠ-বদ্ধ বালককে ছেদন করিতে পরাঙ্মুখ হইল। কিন্তু বালকের পিতা অজিগর্ত্ত অধিকতর অর্থলোভে স্বয়ং পুত্রকে কাটিতে উদ্যত হইলেন। বালক শুনঃশেফের ক্রন্দনে তখন দিগ্দিগন্ত কাঁপিয়া উঠিল। কৌশিক-নন্দন বিশ্বামিত্র দয়া-পরবশ হইয়া, রাজার নিকট শুনঃশেফের প্রাণ ভিক্ষা চাহিলেন। কিন্তু মহারাজ হরিশ্চন্দ্র, আত্ম-পুত্রের প্রাণরক্ষা এবং আপনার রোগ-মুক্তি উভয় বিষয় চিন্তা করিয়া, বিশ্বামিত্রের প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন না। বিশ্বামিত্র দুঃখিত হইয়া দয়ার্দ্র-হৃদয়ে বালককে বরুণ-মন্ত্র শিখাইয়া দিলেন। তাহাতে, বালকের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া, বরুণদেব রাজার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিলেন; রাজা রোগমুক্ত হইলেন। মহর্ষি বিশ্বামিত্র শুনঃশেফকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিলেন। ইহার পর, রাজসূয়-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া, এক মায়াবী বরাহের অনুসরণে মহারাজ হরিশ্চন্দ্র বনমধ্যে পথভ্রষ্ট হন। সেই সময় বিশ্বামিত্রের সহিত আবার তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি বিশ্বামিত্রকে বলেন,—"আমি অযোধ্যাধিপতি মহারাজ হরিশ্চন্দ্র; আমায় পথ প্রদর্শন করুন।" কথায় কথায় আরও প্রকাশ করেন,— "আমি রাজসূয়-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি; কল্পতরু হইয়াছি; আপনার যদি কিছু প্রয়োজন হয়, আমার নিকট প্রার্থনা করিলেই প্রাপ্ত হইবেন।" অনন্তর মহারাজ হরিশ্চন্দ্র যজ্ঞবেদী-মধ্যে সমাসীন হইলে, বিশ্বামিত্র আসিয়া আপন প্রার্থনা জানাইলেন;

বলিলেন,—"গজ-অশ্ব-রথ-রত্নাদি-সমন্বিত আপনার সমগ্র রাজ্য আমায় দান করুন।" হরিশ্চন্দ্র, মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিতে পারিলেন না। পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়াই কহিলেন,—"ভাল, আপনার প্রার্থনা পূর্ণ করিলাম।" ইহার পর, হরিশ্চন্দ্র রাজ্যভ্রষ্ট হন; বিশ্বামিত্রের দক্ষিণার ঋণ পরিশোধের জন্য মহিষী শৈব্যাকে বিক্রয় করেন; এবং আপনিও চণ্ডালের দাসত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। হরিশ্চন্দ্রের পরীক্ষার ইহাই শেষ নহে। ব্রাহ্মণ-গৃহে মহিষী শৈব্যার দাসী-বৃত্তি, রোহিতের সর্প-দংশনে মৃত্যু, চণ্ডালবেশী হরিশ্চন্দ্রের নিকট মৃত পুত্রের দাহের জন্য শৈব্যার গঙ্গা-তীরে গমন, পরিশেষে চরম-পরীক্ষায় তাঁহাদের মুক্তিলাভ,—হরিশ্চন্দ্রের ইতিহাসের ইহাই সারভূত। পুত্র রোহিতকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, মহারাজ হরিশ্চন্দ্র স্বর্গে গমন করেন। তাঁহার অলৌকিক আখ্যান শ্রবণ করিলে অশেষ পুণ্য লাভ হয়।

হরিশ্চন্দ্রের পৌত্র, রোহিতের পুত্র, হরিত হইতে চম্পের উৎপত্তি। তিনি চম্পাপুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই বংশের বাহুক (বাহু), হৈহয় ও তালজঙ্ঘ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ কর্তৃক হৃতরাজ্য হইয়া, বনে গমন করেন। সেই স্থানেই তাঁহার আয়ুঃশেষ হয়। তাঁহার মৃত্যুকালে তাঁহার মহিষী সহমরণে কৃতসঙ্কল্পা হইয়াছিলেন। কিন্তু গর্ভবতী জানিয়া, মহর্ষি ঔর্ব্ব তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করেন। সপত্নীগণ, বাহুর গর্ভবতী মহিষীকে অন্নের সহিত 'গর' (বিষ) প্রদান করিয়াছিলেন। 'গর' সহিত জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া, সেই পুত্র 'সগর' নামে অভিহিত হন। সগরের উপনয়নের পর, মহর্ষি ঔর্ব্ব তাঁহাকে বেদাদি শাস্ত্র ও আগ্নেয়াস্ত্র শিক্ষা দেন। পরিপক্ক-বুদ্ধি হইয়া, সগর যখন জানিতে পারেন,—তাঁহার পিতা বাহুক, তালজঙ্ঘ-হৈহয় প্রভৃতি কর্তৃক হৃতরাজ্য হইয়া, বনবাসী হইয়াছিলেন; তখন তিনি তাহাদিগের প্রতি প্রতিহিংসা-পরায়ণ হন। তিনি হৈহয়-তালজঙ্ঘাদি পিতৃশত্রুগণের অনেককেই বিনষ্ট করেন। শক, যবন, কম্বোজ, পারদ, পহ্লবগণ—সগর কর্তৃক আহত হয়। পরিশেষে ঐ সকল জাতি বশিষ্ঠের শরণাপন্ন ও সগরের অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়াছিল। অনন্তর কুলগুরু বশিষ্ঠের পরামর্শ অনুসারে, সগর সেই জীবিত শত্রুগণকে ব্রাহ্মণাদির সংসর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করেন। তাঁহার আদেশে যবনগণের মস্তক মুণ্ডিত হয়। শকগণ অর্দ্ধ-মুণ্ডিত, পারদগণ প্রলম্বমান কেশযুক্ত এবং পহ্লবগণ শ্মশ্রুধারী হইয়াছিল। এই হইতেই উহাদের বংশধরেরা নিজ ধর্ম্ম পরিত্যাগে বাধ্য হইয়া ম্লেচ্ছত্ব লাভ করে। এইরূপে শত্রুগণের সংহার-সাধন করিয়া, অপ্রতিহত সৈন্যগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া, মহারাজ সগর পৃথিবীপতি বলিয়া পরিচিত হন। কশ্যপ-দুহিতা সুমতি এবং বিদর্ভরাজ-তনয়া কেশিনী—মহারাজ সগরের দুই মহিষী ছিলেন। কেশিনীর একমাত্র পুত্র এবং সুমতির ষষ্টি সহস্র পুত্র জন্মগ্রহণ করে। দুর্ভাগ্য-ক্রমে সগরের পুত্রগণ চরিত্রহীন হইয়াছিল। তাহারা যজ্ঞাদিতে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এই সময়ে সগর রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তাঁহার পুত্রগণ সেই অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বের রক্ষক ছিল। এক চোর সেই অশ্ব চুরি করিয়া পাতালে লইয়া যায়। তাহাতে সগর-পুত্রগণ ক্রোধান্ধ হইয়া, ভূপৃষ্ঠ খনন করিতে করিতে, পাতালে গমন করে। তাহাদের সেই খাত হইতেই সাগরের উৎপত্তি। যাহা হউক, সগর-পুত্রগণ পাতালে গমন

অযোধ্যার অন্যান্য নৃপতিগণ।

করিয়া দেখে—তাহাদের অনতিদূরে মহর্ষি কপিল যোগমগ্ন। তখন, মহর্ষি কপিলকেই চোর মনে করিয়া, তাহারা এক যোগে তাঁহাকে হনন করিতে উদ্যত হয়। মহর্ষি কপিল তাহাদিগের প্রতি কোপনয়নে চাহিয়া দেখেন। মহর্ষির নয়ন হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়। সেই অগ্নিতে সগরের ষষ্টি সহস্র পুত্র ভস্মীভূত হইয়া যায়। * এই ঘটনা জানিতে পারিয়া, মহারাজ সগর আপন পৌত্র অংশুমানকে কপিলদেবের ক্রোধ-শান্তির জন্ম প্রেরণ করেন। অংশুমানের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া, কপিলদেব তাঁহাকে বর দেন,—"তোমার পৌত্র ভগীরথ মর্ত্ত্যধামে গঙ্গা আনয়ন করিয়া, এই ব্রহ্মদণ্ডহত সগর-পুত্রগণের উদ্ধার-সাধন করিবে।" মহর্ষির তুষ্টি-সম্পাদনানন্তর অংশুমান পাতাল হইতে অশ্ব আনয়ন পূর্ব্বক, পিতামহের যজ্ঞ সমাপন করেন। অতঃপর অংশুমানের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া, মহর্ষি ঔর্ব্বের উপদেশানুসারে সংসার-বন্ধন মুক্ত হইয়া, মহারাজ সগর দিব্যধামে গমন করেন। অংশুমান আপন পুত্র দিলীপের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া, মর্ত্ত্যে গঙ্গা আনয়নের জন্ম তপস্যা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কৃতকার্য্য হন নাই। তাঁহার পুত্র দিলীপও পিতৃ-পদাঙ্ক অনুসরণে গঙ্গা আনয়নের চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তিনিও অসমর্থ হইয়া কালগ্রাসে পতিত হন। অবশেষে দিলীপের পুত্র ভগীরথ স্বর্গ হইতে ভূতলে গঙ্গা আনয়নে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহাতে, গঙ্গাবারি স্পর্শে, ব্রহ্মশাপহত সগর-তনয়গণ মুক্তিলাভ করিয়াছিল। রাজর্ষি ভগীরথের পুণ্য-কাহিনী সংসারে চিরদিন কীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। ভগীরথের বংশে ঋতুপর্ণ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি অক্ষক্রীড়ায় পারদর্শী ছিলেন। মহারাজ নলের সখা বলিয়া ইঁহার প্রসিদ্ধি আছে। ইনি নলকে অক্ষক্রীড়া শিক্ষা দিয়া তাঁহার নিকট হইতে অশ্ববিদ্যা লাভ করেন। ঋতুপর্ণের প্রপৌত্র—সৌদাস। ইনি 'মিত্রসহ' ও 'কল্মাষপাদ' নামেও পরিচিত। ইনি মৃগয়া করিতে গিয়া, ব্যাঘ্ররূপী দুই রাক্ষস-ভ্রাতার জ্যেষ্ঠকে হনন করিয়া, কনিষ্ঠকে ছাড়িয়া দেন। কনিষ্ঠ নিশাচর ভ্রাতৃ-হত্যার প্রতিশোধ-গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হয়; পাচকরূপ ধারণ করিয়া, মহর্ষি বশিষ্ঠকে সে নরমাংস ভোজন করাইবার চেষ্টা করে। তাহাতে মহর্ষি বশিষ্ঠ রাজার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া, 'রাক্ষস হও' বলিয়া রাজাকে অভিশপ্ত করেন। রাজাও তখন বশিষ্ঠকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হন; কিন্তু মহিষী মদয়ন্তীর অনুরোধে, কুলগুরু বশিষ্ঠকে শাপ দেওয়া অবৈধ বোধে, তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয়। তখন অঞ্জলিস্থিত শাপ-জল পৃথিবীতে বা আকাশে নিক্ষেপ করিলে অনিষ্টের সম্ভাবনা বুঝিয়া, রাজা তাহা আপন চরণদ্বয়ে সেচন করেন। ক্রোধাগ্নি-তপ্ত জল-সংস্পর্শে চরণদ্বয় 'কল্মাষ' বা কৃষ্ণ-পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করে; এবং তাহাতেই রাজা সৌদাস 'কল্মাষপাদ' নামে অভিহিত হন। দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলে, রাজা শাপ-মুক্ত হইয়াছিলেন। তাহার সাত বৎসর পরে তাঁহার মৃত্যু হয়। মহিষী মদয়ন্তী তখন গর্ভবতী ছিলেন। সেই গর্ভে সৌদাস-পুত্র অশ্মক জন্মগ্রহণ করেন। অশ্মকের পুত্র—

মতে,—কপিল-কোপে সগর-তনয়গণ দগ্ধ হইয়াছিল—এ কথা ঠিক নহে। মহৎ ব্যক্তিকে অপমান করায়, তাহাদের দেহোত্থিত অনল তাহাদিগকে আপনা-আপনিই পুড়াইয়া মারিয়াছিল,—ইহাই সত্য। শুদ্ধ-সত্ত্ব-মূর্ত্তি সাংখ্যতত্ত্ব-প্রবর্ত্তক মহর্ষি কপিল কি কখনও তমোগুণ-সম্পন্ন হইতে পারেন?—শ্রীমদ্ভাগবত, নবম স্কন্ধ, অষ্টম অধ্যায়।

বালিক। তাঁহার অপর নাম মূলক। তাঁহার মূলক নাম সম্বন্ধে একটু ইতিহাস আছে;—'যে সময়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, সেই সময়ে পরশুরাম পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সকল ক্ষত্রিয় বিনষ্ট হইলে, বিবস্ত্রা স্ত্রীলোকগণ বালককে বেষ্টন করিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন। সুতরাং পৃথ্বী নিঃক্ষত্রা হইলে, তিনিই ক্ষত্র-বংশের মূল। তাঁহার মূলক নামেরও তাহাই সার্থকতা। নারীগণ কর্তৃক রক্ষিত হইয়াছিলেন বলিয়া, তিনি 'নারীকবচ' নামেও অভিহিত হন। এই বংশের খট্টাঙ্গ (দিলীপ) দেবাসুর-সংগ্রামে অসুরগণকে বিনাশ করিয়া, দেবতাদিগের প্রীতিভাজন হন। দেবতাগণ তাঁহাকে বর দিতে চাহিলে, তিনি অন্য বর প্রার্থনা না করিয়া, আপনার আয়ু-পরিমাণ জানিতে চাহেন। তাহাতে দেবগণ উত্তর দেন,—"আপনার পরমায়ু মুহূর্ত্তমাত্র অবশিষ্ট আছে।" সম্রাট খট্টাঙ্গ দিলীপ তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ না হইয়া, তদ্দণ্ডেই ভগবচ্চিন্তায় আত্মসমর্পণ করেন। এইজন্য তাঁহার সম্বন্ধে বহু প্রশংসাবাদ দৃষ্ট হয়। এই বংশের অম্বরীষ রাজাও বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার যজ্ঞীয় পশু অপহৃত হইলে, তাঁহার পুরোহিত তাঁহাকে যজ্ঞে মানুষ বলি প্রদান করিতে পরামর্শ দেন। ঋচীক ঋষির মধ্যম পুত্র শুনঃশেফ সেই যজ্ঞের বলি-রূপে রাজার নিকট বিক্রীত হন। কিন্তু বিশ্বামিত্রের অনুগ্রহে শুনঃশেফ মুক্তিলাভ করেন। হরিশ্চন্দ্র রাজার নরমেধ-যজ্ঞ-প্রসঙ্গে, ভাগবতাদি গ্রন্থে, অজিগর্ত্ত-পুত্র শুনঃশেফের কাহিনী দৃষ্ট হয়। উভয় ঘটনাই প্রায় একরূপ। তবে শেষোক্ত শুনঃশেফ যজ্ঞক্ষেত্রে প্রাণদানে কাতরতা প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু এই শুনঃশেফ আপনিই যজ্ঞে প্রাণদানে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। বাল্মীকির রামায়ণের আদিকাণ্ডে অম্বরীষ রাজার এই যজ্ঞ-বিবরণ বর্ণিত আছে; কিন্তু হরিশ্চন্দ্রের যজ্ঞ-বিবরণের কোনও উল্লেখ নাই। এই সূর্য্যবংশের আর এক প্রসিদ্ধ নৃপতি—রঘু। তাঁহার দিগ্বিজয়-কাহিনী বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাঁহারই নামানুসারে রঘু-বংশের প্রসিদ্ধি। রঘুর পৌত্র দশরথ। তৎপুত্র—রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন। দশরথ ও রামচন্দ্রের রাজত্বকালে অযোধ্যার গৌরব কতদূর পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল, রামায়ণ-প্রসঙ্গে পূর্ব্বেই তাহা বিবৃত হইয়াছে। * মহারাজ দশরথ যে ভারতবর্ষের সার্ব্বভৌম সম্রাট ছিলেন; কেবল ভারতবর্ষ বলিয়া নহে,—সমগ্র বসুধা যে তাঁহার করতলগত ছিল;—নানা স্থানে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। রামের রাজ্যাভিষেক-সংবাদ অবগত হইয়া, অভিমানিনী কৈকেয়ী যখন মহারাজ দশরথকে তাঁহার পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুতি স্মরণ করাইয়া দেন, বরলাভের জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করেন; কৈকেয়ীকে সান্ত্বনা করিবার জন্য—অন্য বর চাহিবার জন্য—মহারাজ দশরথ তখন বলিয়াছিলেন;—

> "করিষ্যামি তব প্রীতিং সুকৃতেনাপি তে শপে। যাবদাবর্ত্ততে চক্রং তাবতী মে বসুন্ধরা॥
> দ্রাবিড়াঃ সিন্ধুসৌবীরাঃ সৌরাষ্ট্রা দক্ষিণাপথাঃ। বঙ্গাঙ্গমাগধা মৎস্যাঃ সমৃদ্ধাঃ কাশিকোশলাঃ।
> তত্র জাতং বহু দ্রব্যং ধনধান্যমজাবিকম্। ততো বৃণীষ কৈকেয়ি যদ্‌যত্ত্বং মনসেচ্ছসি।"

'আমি নিজপুণ্য শপথ করিয়া বলিতেছি,—তোমার প্রীতির জন্য তোমার প্রিয়-কার্য্য সম্পাদন করিব। সূর্য্য যত দূর কিরণ বিস্তার করিয়া থাকেন, তত দূর পর্য্যন্ত পৃথিবী আমার অধিকারভুক্ত। ঐ যে সমৃদ্ধ দ্রাবিড়, সিন্ধু, সৌবীর, সৌরাষ্ট্র, দক্ষিণদেশীয় রাজ্য-সমূহ,

---

* এই গ্রন্থের ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ, ২১৫ পৃষ্ঠা হইতে ২৪০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এবং বঙ্গ, অঙ্গ, মগধ, মৎস্য, কাশী, কোশল প্রভৃতি—সমুদায় রাজ্য আমার শাসনাধীন। ঐ সকল জনপদে ধন-ধান্য, ছাগ-মেষ,—যে কিছু সামগ্রী আছে, সকলই আমার অধিকার-ভুক্ত। তুমি সেই সকল দ্রব্যের যাহা কিছু লইতে ইচ্ছা কর, আমি তাহাই তোমাকে প্রদান করিব। তুমি তোমার প্রার্থনা পরিবর্ত্তন কর।' ইহাতে বুঝিতে পারা যায়, তখন কোন্ কোন্ দেশের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল এবং কোন্ কোন্ দেশ দশরথের প্রাধান্য মান্য করিত। শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বকালে, দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া, ভরত কোটী কোটী গন্ধর্ব্বকে নিহত করিয়া, গন্ধর্ব্বরাজ্যে আপন বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন। শত্রুঘ্নও সেই সময়ে মধু-পুত্র প্রবল-পরাক্রান্ত লবণ-দৈত্যকে সংহার করিয়া, মধুবনে মথুরাপুরী প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীরাম-তনয় কুশ-বংশের হিরণ্যনাভ, জৈমিনি ঋষির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া, যোগশিক্ষায় যোগাচার্য্য হইয়াছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি ইঁহারই নিকট অধ্যাত্ম-যোগ শিক্ষা করেন। এই বংশের মরু, বেদব্যাসের পুরাণ-রচনার সমসময়ে 'কলাপ' গ্রামে যোগাশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। পরবর্ত্তী যুগে ইনি সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের প্রবর্ত্তয়িতা। এই বংশের রাজা বৃহদ্বল ভারত-যুদ্ধে অর্জ্জুন-পুত্র অভিমন্যুর হস্তে নিহত হন। বৃহদ্বলের পরবর্ত্তী সূর্য্যবংশীয় নৃপতিগণ ভবিষ্য-রাজ বলিয়া অভিহিত। শাস্ত্রানুসারে, সুমিত্র রাজা হইলে, কলিযুগে ইক্ষ্বাকু-বংশ ধ্বংস হয়।

মিথিলার রাজ-বংশ।

ইক্ষ্বাকুর দ্বিতীয় পুত্র—নিমি। তাঁহার বিবরণ বৈচিত্র্যময়। পুরাণে দৃষ্ট হয়,—তিনি সহস্র-বর্ষ-ব্যাপী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া, কুলগুরু বশিষ্ঠকে হোতৃত্বে বরণ করেন। কিন্তু ইন্দ্রের পঞ্চশতবর্ষব্যাপী যজ্ঞে ব্যাপৃত থাকায় বশিষ্ঠ, ইন্দ্রের যজ্ঞ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত, নিমিকে প্রতীক্ষা করিতে বলেন। নিমি তাহাতে কোনই উত্তর প্রদান করেন না। ফলে, বশিষ্ঠ 'মৌনং সম্মতি লক্ষণং' মনে করিয়া, ইন্দ্রের যজ্ঞ সম্পাদনে ব্রতী হন। এদিকে নিমি, গৌতমাদি ঋষিকে হোতৃ-পদে বরণ করিয়া যজ্ঞ আরম্ভ করেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বশিষ্ঠ নিদ্রাগত রাজাকে অভিশাপ দেন। তাহার ফলে, রাজার দেহ নাশ হয়। কিন্তু বশিষ্ঠ শাপ-প্রদান করিলে, রাজাও তাঁহাকে অভিশপ্ত করিয়াছিলেন। তাহাতে বশিষ্ঠও অপর দেহ লাভ করেন। তৈল-গন্ধাদির অনুলেপনে রাজার দেহ সদ্যোমৃতের ন্যায় অবিকৃত রাখিয়া যজ্ঞ সমাপন করা হয়। রাজা নিমির কোনও পুত্র ছিল না বলিয়া, অরাজকতা ভয়ে ভীত হইয়া, মুনিগণ অগ্ন্যুৎপাদক অরণীতে নিমির দেহ মন্থন করেন। তাহাতে রাজার মৃত দেহ হইতে একটি কুমার উৎপন্ন হয়। মৃত দেহ হইতে জন্ম-হেতু ঐ পুত্রের নাম—জনক; এবং পিতার বিদেহ অবস্থায় জন্ম-হেতু তাঁহার নাম—'বৈদেহ' হয়। মন্থন (মথন) দ্বারা জাত-হেতু 'মিথি' (মিথিল) নামেও ঐ পুত্র পরিচিত হইয়াছিল। এই জনকই মিথিলাপুরী নির্ম্মাণ করেন। এই বংশের সপ্তবিংশতি পর্য্যায়ে শীরধ্বজ জনকের আবির্ভাব হয়। তাঁহার কন্যার নাম—সীতা। শীরধ্বজ রাজা যজ্ঞার্থ ভূমি-কর্ষণ করিবার সময় শীর (সীর) অর্থাৎ লাঙ্গল-পদ্ধতির অগ্রভাগ হইতে ঐ কন্যা উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া তাহার সীতা নাম হয়। শীর হইতেই কীর্ত্তির সূচনা; এই জন্য রাজার নামও শীরধ্বজ হইয়াছিল। শীরধ্বজের পর এই বংশে

আরও বহু নৃপতি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা সকলেই মিথিলার মুখ উজ্জল করিয়াছিলেন। এই বংশের মহীপালগণের অনেকেই আত্মবিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন। যোগীশ্বরদিগের অনুকম্পায় তাঁহারা প্রাসাদবাসী হইয়াও সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বনির্ম্মুক্ত হইয়াছিলেন। যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য এই মৈথিল রাজবংশের জনক প্রভৃতি রাজন্যবর্গের যে কীর্ত্তি-কাহিনী প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহা চির-সমুজ্জ্বল হইয়া আছে। জনক-রাজবংশের জ্ঞান-গরিমা, প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার পরিচয়—শাস্ত্রের অনেক স্থলে দৃষ্ট হয়।

বৈবস্বত মনুর অন্যান্য পুত্রের মধ্যে পৃষধ্র, ব্যাঘ্র-ভ্রমে গো-বধ করিয়াছিলেন বলিয়া, শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন। পরিশেষে, অনুশোচনার দাবাগ্নিতে দগ্ধদেহ হইয়া, পরব্রহ্মে লীন হন।

বৈবস্বত মনুর অন্যান্য বংশধরগণ।

মনুপুত্র করূষ হইতে 'কারূষ' ক্ষত্রিয়গণের উৎপত্তি হয়। এই কারূষ ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম-বৎসল উত্তরাপথ রক্ষক ছিলেন। নেদিষ্টের (ভাগবতের মতে—দিষ্টের) পুত্র নাভাগ কর্ম্মবশে বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হন। তাঁহার বৈশ্যত্ব-প্রাপ্তির পূর্ব্বে ভলন্দন নামে তাঁহার যে পুত্র জন্মে, সেই পুত্রের বংশে মহাবল-শালী মরুত্ত জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন। অঙ্গিরার পুত্র মহাযোগী সম্বর্ত্ত তাঁহার যজ্ঞকার্য্য সম্পন্ন করাইয়াছিলেন। মরুত্তের যজ্ঞ সম্বন্ধে গাথা প্রচলিত আছে,—'তেমন যজ্ঞ ভুবনে আর কোথায় হইয়াছে? সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞীয় বস্তুই সুবর্ণময় ছিল।' এই বংশের বিশাল—'বৈশালী' নগর নির্ম্মাণ করেন। সোমদত্ত বহু অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া যশস্বী হন। বিশাল-বংশীয় নৃপতিগণ দীর্ঘায়ু, বীর্য্যবান ও ধার্ম্মিক ছিলেন। মনু-তনয় শর্য্যাতির কন্যা—সুকন্যা। মহর্ষি চ্যবনের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। সে বিবাহ—এক অপূর্ব্ব ঘটনা। সুকন্যা সখীগণ পরিবৃতা হইয়া, উদ্যানে ফল-পুষ্প চয়ন করিতে-ছিলেন। সম্মুখে একটী বল্মীক দেখিতে পাইয়া, ক্রীড়াচ্ছলে কণ্টক দ্বারা তাহা বিদ্ধ করেন। সেই বল্মীকের মধ্যে মহর্ষি চ্যবন সমাহিত অবস্থায় অবস্থান করিতেছিলেন। কণ্টকে মহর্ষির চক্ষু বিদ্ধ হওয়ায়, রক্তধারা বিনির্গত হইতে থাকে। সুকন্যা সন্ত্রস্ত হইয়া, পিতার নিকট সেই কথা জ্ঞাপন করেন। এদিকে মহর্ষির যোগভঙ্গ-হেতু রাজা শর্য্যাতির সৈন্য-সমূহের মলমূত্র রোধ হয়। সৈন্যগণের অবস্থা অবলোকন করিয়া আতঙ্কে রাজা শর্য্যাতি, মহর্ষি চ্যবনের নিকট ক্ষমা-প্রার্থী হন। কিন্তু মহর্ষি, সুকন্যাকে বিবাহ করিতে চাহেন। বৃদ্ধ জরাগ্রস্ত ঋষির হস্তে প্রিয়তমা কন্যাকে রাজা কোন প্রাণে অর্পণ করিবেন? কিন্তু ঋষির আদেশ—উপায়ান্তর নাই! অগত্যা সেই বৃদ্ধ চ্যবন ঋষির হস্তেই রাজা সুকন্যাকে অর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। পতি বৃদ্ধ হইলেও সুকন্যা কিন্তু ক্ষুব্ধ হইলেন না। তিনি নিরন্তর পতিসেবায় জীবন-মন সমর্পণ করিলেন। অনন্তর সুকন্যার পাতিব্রত্য ধর্ম্মে সন্তুষ্ট হইয়া, দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমার-দ্বয় সুকন্যাকে বর দিলেন। সেই বরে মহর্ষি চ্যবন চির-যৌবন লাভ করেন। রাজা শর্য্যাতির আনর্ত্ত নামে এক পরম ধার্ম্মিক পুত্র ছিলেন। আনর্ত্তের পুত্র রেবত সাগরাভ্যন্তরে 'কুশস্থলী' নগরী নির্ম্মাণ করেন। তিনি আনর্ত্তাদি দেশ শাসন করিতেন। রেবতের এক শত পুত্রের মধ্যে রৈবত (কুকুদ্মি) বিশেষ প্রসিদ্ধ। কন্যা রেবতীর বর অন্বেষণের জন্য ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া, গন্ধর্ব্বগণের সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া, ইনি তথায় বহু যুগ

অবস্থান করিয়াছিলেন। সপ্তবিংশতি চতুর্যুগ অতীত হইলে, ব্রহ্মার আদেশে, ইনি মর্ত্ত্যলোকে আগমন করেন। অতঃপর অষ্টাবিংশতিতম চতুর্যুগান্তর্গত দ্বাপর যুগে বসুদেব-পুত্র বলদেবের সহিত তাঁহার কন্যা রেবতীর উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। কন্যা সম্প্রদান পূর্ব্বক রাজা কুকুদ্মি তপস্যার্থ নারায়ণাশ্রমে গমন করেন। এই রৈবত রাজাই 'বৈরতক' নামে প্রসিদ্ধ। ইহাঁর রাজধানী কুশস্থলী, পরবর্ত্তিকালে 'দ্বারকাপুরী' নামে অভিহিত হইয়াছে। রৈবত রাজার ব্রহ্মলোকে অবস্থান কালে পুণ্যজন নামা দস্যুগণ তাঁহার কুশস্থলী পুরী অধিকার করিয়া ছিল। তাহাতে রৈবতের ভ্রাতৃশতক দিগ্বিদিকে পলায়ন করিয়া, ক্ষত্রিয়-বংশের বিস্তার করিয়াছিলেন। বৈবস্বত মনুর পৌত্র নাভাগ, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে গুরুকুলে বাস করিলে, তাঁহার ভ্রাতৃগণ বিষয় বণ্টন করিয়া লন। তিনি গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাগত হইলেও ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে বিষয় প্রদানে সম্মত হন না। পরন্তু, পিতাকেই 'দায়' বলিয়া তাহারা তাঁহার অংশ নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। যাহা হউক, পিতার পরামর্শে, আঙ্গিরস মুনিগণের অনুগ্রহে, নাভাগ বহু ধন প্রাপ্ত হন। তাঁহার পুত্র অম্বরীষ আপন কর্ম্মবলে সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াছিলেন। মহারাজ অম্বরীষ ভগবদ্ভক্ত ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তাঁহার ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহার রক্ষার জন্য, বিষ্ণু তাঁহাকে আপনার চক্র প্রদান করিয়াছিলেন। বিপৎকালে সেই চক্র অম্বরীষের সহায় ছিল। একদা কার্ত্তিক মাসের দ্বাদশীর দিনে দুর্ব্বাসা-ঋষি অম্বরীষ-গৃহে ব্রত-পারণ করিতে আসেন। অম্বরীষ যথাযোগ্য অভ্যর্থনায় আতিথ্য-সৎকারে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু স্নান করিতে গিয়া, দুর্ব্বাসার প্রত্যাগমন করিতে বিলম্ব হইল। তখন, অতিথির জন্য অধিকক্ষণ প্রতীক্ষা করিতে না পারিয়া, ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হইয়া, পুরোহিতের অনুমতিক্রমে রাজা অম্বরীষ ভোজন করিলেন।* প্রত্যাগত হইয়া, দুর্ব্বাসা তাহাতে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। মহর্ষির জটা হইতে উগ্র-দেবতার সৃষ্টি হইল। সেই উগ্রদেবতা মহারাজকে বধ করিতে অগ্রসর হইলে, বিষ্ণুর সুদর্শন-চক্র আসিয়া মহারাজকে রক্ষা করিল। উগ্রদেবতা বিনষ্ট হইল। দুর্ব্বাসা, অম্বরীষের শরণাপন্ন হইলেন। তখন আবার অম্বরীষকেই দুর্ব্বাসার প্রাণ রক্ষা করিতে হইল। এইরূপে মহর্ষি দুর্ব্বাসার প্রাণ রক্ষা করিয়া, তিনি অশেষ যশোভাজন হন। এই বংশের রথীতর রাজার পুত্র-সন্তান না হওয়ায়, মহর্ষি অঙ্গিরা কর্তৃক তাঁহার ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই হইতেই এই বংশ যথাক্রমে 'আঙ্গিরস' এবং 'ক্ষত্রোপেত' ব্রাহ্মণ-বংশ বলিয়া পরিচিত। মনু-পুত্র নৃগের বংশের ওঘবতী কন্যা, সুদর্শন রাজার সহিত পরিণীতা হন। নৃগের ভ্রাতা নরিষ্যন্তের বংশে 'অগ্নিবেশ্য' নামক মহর্ষির উৎপত্তি হয়। তিনি কানীন ও জাতুকর্ণ নামে বিখ্যাত। তাঁহা হইতে 'অগ্নি-বেশ্যায়ন' ব্রাহ্মণবংশের উৎপত্তি হইয়াছিল। সূর্য্যবংশীয় প্রধান প্রধান নৃপতিগণের ইহাই সংক্ষিপ্ত পরিচয়। পুরাণ-সমূহে, কোথাও বিস্তৃত-ভাবে, কোথাও বা সংক্ষেপে, এতদ্বিবরণ পরিবর্ণিত আছে।

---

* অম্বরীষ নামে কত নৃপতির পরিচয় পাওয়া যায়;—মহারাজ মান্ধাতার দ্বিতীয় পুত্রের নামও অম্বরীষ। তিনি ধর্ম্মসেন নামেও পরিচিত। আবার সুক্রকের পুত্র বলিয়াও অপর এক অম্বরীষের পরিচয় পাওয়া যায়। সেই অম্বরীষের যজ্ঞানুষ্ঠানের সময় ইন্দ্র-কর্তৃক তাঁহার যজ্ঞ-পশু অপহৃত হইয়াছিল। সেই যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য ঋচীক মুনির পুত্র শুনঃশেফকে তিনি ক্রয় করিয়া আনিয়াছিলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

চন্দ্রবংশীয় নৃপতিগণ।

[চন্দ্রবংশান্তর্গত আয়ু ও অমাবসুর প্রসঙ্গ,—আয়ু-পুত্র রজির বৃত্তান্ত,—অমাবসু-বংশের জহ্নু, বিশ্বামিত্র, পরশুরাম প্রভৃতির প্রসঙ্গ;—নহুষ-পুত্র যতি ও যযাতি,—যযাতির জরাগ্রহণে পুরুর মহত্ত্ব;—যদুবংশের বিবরণ,—ক্রোষ্টু, সহস্রজিৎ ও কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের প্রসিদ্ধি,—জ্যামঘ, বভ্রু ও বিদর্ভ,—সাত্বত-পুত্র বৃষ্ণির বংশে প্রসেন ও সত্রাজিৎ,—স্যমন্তক মণির উপাখ্যান,—বসুদেব, কুন্তী, উগ্রসেন, কংস, শ্রীকৃষ্ণ ও যাদবগণ;—পুরুবংশের বিবরণ,—দুষ্মন্ত-শকুন্তলার প্রসঙ্গ,—ভরত ও রন্তিদেবের মাহাত্ম্য,—ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তি,—জরাসন্ধ ও জরা রাক্ষসীর উপাখ্যান,—প্রতীপ, শান্তনু, ভীষ্ম, পাণ্ডব, ধার্ত্তরাষ্ট্র প্রভৃতি,—দ্রুহ্য, তুর্ব্বসু ও অনুর বংশ,—রোমপাদ প্রসঙ্গ,—দাতাকর্ণের উপাখ্যান।]

আয়ু ও অমাবসুর প্রসঙ্গ।

প্রজাপতি অত্রির অংশে চন্দ্রের উদ্ভব। সেই চন্দ্র হইতেই চন্দ্রবংশ। পুরাণে প্রকাশ,—দেবগুরু বৃহস্পতির পত্নী তারাকে চন্দ্র অপহরণ করিয়াছিলেন। তারার গর্ভে তাঁহার এক পুত্র-সন্তান জন্মে। বালকের বুদ্ধির গাম্ভীর্য্য দেখিয়া তাঁহার 'বুধ' নাম রাখা হইয়াছিল। সূর্য্যবংশীয় বৈবস্বত মনুর কন্যা ইলার (ইড়ার) সহিত বুধের পরিণয় হয়। বুধের ঔরসে ইলার গর্ভে পুরুরবা জন্মগ্রহণ করেন। পুরুরবা যেমন রূপবান, তেমনই গুণবান ছিলেন। তিনি তেজস্বী, বিদ্বান, দানশীল, যাজ্ঞিক ও ব্রহ্মবাদী বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার ন্যায় পরাক্রমশালী ও যশস্বী ব্যক্তি সে সময়ে কেহই ছিলেন না। পুরুরবা প্রয়াগ-প্রদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। পুরুরবার রূপ-গুণের বিষয় অবগত হইয়া অপ্সরা উর্ব্বশী তাঁহাতে আসক্ত হন। তাঁহার গর্ভে পুরুরবার আয়ু-প্রমুখ পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন। আয়ুর পুত্র রজির বংশ—সাধারণতঃ 'রাজেয়' ক্ষত্রিয়-বংশ নামে প্রসিদ্ধ। রজি চন্দ্রবংশের ধুরন্ধর নৃপতি ছিলেন। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে, বিপক্ষ-পক্ষ আতঙ্কে কম্পিত হইত। দেব-দানবের যুদ্ধে দানবগণকে পরাজিত করিয়া, তিনি দেবগণের প্রণষ্ট-জয়শ্রীর পুনরুদ্ধার-সাধন করেন। তাঁহার বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার পুত্রত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। রজির পাঁচ শত পুত্র জন্মে। তাহারা মোহাচ্ছন্ন ও ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য হইয়াছিল। সুতরাং তাহাদের রাজৈশ্বর্য্য সমস্তই লোপ পায়। রজিনন্দনগণ ইন্দ্রত্ব-লাভে প্রয়াসী হইয়া, সকলেই ইন্দ্রহস্তে নিহত হয়। পুরুরবার দ্বিতীয় পুত্র অমাবসুর বংশে জহ্নু নরপতি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'সর্ব্বমেধ' নামক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞক্ষেত্র গঙ্গাস্রোতে প্লাবিত হয়। রাজর্ষি জহ্নু তাহাতে কুপিত হইয়া, গঙ্গাকে এক গণ্ডূষে পান করিয়াছিলেন। যজ্ঞকার্য্যে ব্রতী ঋত্বিক মহর্ষিগণ জহ্নুকে শান্ত করিয়া, গঙ্গাকে কন্যারূপে গ্রহণ করিতে পরামর্শ দেন। সেই হইতে গঙ্গা 'জাহ্নবী বা জহ্নু-কন্যা' নামে পরিচিতা হন। ইনি সূর্য্যবংশীয় যুবনাশ্বের কন্যা কাবেরীকে বিবাহ করেন। তাঁহার সুসহ নামে এক পুত্র জন্মে। এই জহ্নু-বংশের কুশিক, পুরুকুৎসের কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার পুত্র—গাধি। গাধির পুত্র—মহাত্মা বিশ্বামিত্র। তিনি ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব

লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব-প্রাপ্তি-সম্বন্ধে পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে ;—গাধির সত্যবতী নাম্নী এক কন্যা ছিলেন। ভার্গব ঋচীক সহস্র শ্বেত অশ্বের বিনিময়ে তাঁহাকে বিবাহ করেন। সত্যবতী এবং তাঁহার মাতা, পুত্র-কামনা করিয়া, মহর্ষি ঋচীককে যজ্ঞ করিতে বলেন। সেই যজ্ঞে দুই প্রকার চরু প্রস্তুত হয়। পত্নী সত্যবতীর নিমিত্ত ব্রহ্ম-মন্ত্রে এবং শ্বশ্রূর নিমিত্ত ক্ষত্র-মন্ত্রে ঋচীক সেই চরু প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাহাতে সত্যবতীর গর্ভে ব্রাহ্মণ এবং তাঁহার মাতার গর্ভে ক্ষত্রিয় পুত্র উৎপত্তির সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু চরু প্রস্তুত করিয়া মহর্ষি স্নান করিতে গেলে, কন্যা ও মাতা ভ্রমক্রমে একের চরু অন্যে ভক্ষণ করেন। প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ঋচীক জানিতে পারেন, চরু-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। তাহাতে তিনি সত্যবতীকে বলেন,—"চরু-বিপর্য্যয়ে দুই গর্ভে দুই বিপরীত প্রকৃতির সন্তান জন্মিবে। তোমার পুত্র ক্ষত্রিয়-প্রকৃতি হইবে, এবং তোমার ভ্রাতা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইবেন।" সত্যবতী তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইলে, সত্যবতীর অনুনয়ে, ঋচীক কহিলেন,—"তোমার পুত্র ক্ষত্রিয়-ভাবাপন্ন হইবে না বটে ; কিন্তু তোমার পৌত্র রুদ্র-ভাবাপন্ন হইবে।" তদনুসারে সত্যবতীর গর্ভে জমদগ্নি এবং তাঁহার মাতার গর্ভে বিশ্বামিত্র জন্মগ্রহণ করেন। চরু-বিপর্য্যয়ে এইরূপে বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়, এবং জমদগ্নি-পুত্র পরশুরাম প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় সংহারমূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। * বিশ্বামিত্র কর্ম্মফলে তপঃপ্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন,—পুরাণান্তরে এবম্বিধ উক্তিও দৃষ্ট হয়। পরশুরাম একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয় বীর কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের ইনিই সংহার-সাধন করেন। পিত্রাজ্ঞায় পরশুরাম মাতৃহত্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতা—প্রসেনজিৎ রাজার কন্যা—রেণুকা। জমদগ্নি রেণুকাকে ব্যাভিচার-দোষ-দুষ্টা বলিয়া সন্দেহ করেন। সেই সন্দেহ-বশে তিনি পুত্রকে মাতৃ-বধে আদেশ দিয়াছিলেন। কুঠারাঘাতে মাতৃ-বধ করিয়া, পিতার সন্তোষ-বিধান-পূর্ব্বক,জামদগ্নি পিতার নিকট বর প্রাপ্ত হন। সেই বরে রেণুকা পাপ-মুক্তা হইয়া পুনর্জ্জীবন লাভ করেন এবং পরশুরাম অজেয় হন। শ্রীরামচন্দ্রের নিকট হরধনুর্ভঙ্গে পরশুরামের দর্প চূর্ণ হয়। পরশুরাম ভগবানের ষষ্ঠাবতার এবং অমর বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। পরশুরামের আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা শাস্ত্রাদিতে দৃষ্ট হয় ;—

"নীলমেঘনিভং প্রাংশুং জটামণ্ডলমণ্ডিতং। ধনুঃপরশুপাণিঞ্চ সাক্ষাৎ কালমিবান্তকং॥"

পরশু, কুঠার এবং ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া, পরশুরাম যে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে পৃথিবী সন্ত্রস্তা হইয়াছিলেন। † সেরূপ বীর ভূমণ্ডলে অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অধিকাংশ পুরাণেই পুরূরবার পুত্র অমাবসুর বংশে বিশ্বামিত্র ও পরশুরাম প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ আছে। কিন্তু অগ্নিপুরাণে আয়ুর বংশে দ্বাত্রিংশ পর্য্যায়ে এবং শ্রীমদ্ভাগবতে পুরূরবার পুত্র বিজয়ের বংশে ষোড়শ পর্য্যায়ে বিশ্বামিত্র ও সত্যবতীর নাম দৃষ্ট হয়। অগ্নিপুরাণে এবং শ্রীমদ্ভাগবতে পুরূরবার পুত্রের মধ্যে অমাবসুর নাম আদৌ দৃষ্টিগোচর হয় না।

---

* বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্থ অংশ, সপ্তম অধ্যায় ; শ্রীমদ্ভাগবত, নবম স্কন্ধ, পঞ্চদশ অধ্যায় ; হরিবংশ, সপ্তবিংশ অধ্যায় ; ব্রহ্মপুরাণ, দশম অধ্যায় ; এবং মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

† মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ষট্‌সপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

পুরুরবার জ্যেষ্ঠ পুত্র আয়ু, স্বর্ভানু-নন্দিনী প্রভাকে (বিষ্ণুপুরাণের মতে—রাহুর কন্যাকে) বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে নহুষ প্রসিদ্ধ। তিনিই ভ্রাতৃগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ এবং রাজ্য প্রাপ্ত হন। তাঁহার বংশ—বহু-বিস্তৃত। নহুষের ছয় পুত্র। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ যতি, ধনৈশ্বর্য্যের অসারত্ব উপলব্ধি করিয়া, সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করেন। সুতরাং যযাতি রাজ-সিংহাসন প্রাপ্ত হন। যযাতি আপন বাহুবলে পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার দুই ভার্য্যা—শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানি এবং বৃষপর্ব্বা অসুরের কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা। দেবযানির গর্ভে যদু ও তুর্ব্বসু এবং শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্যু, অণু ও পুরু জন্মগ্রহণ করেন। এই যদু ও পুরু হইতেই পুরাণ-প্রসিদ্ধ যদুবংশের ও পুরুবংশের উৎপত্তি।

নহুষ-পুত্র যতি ও যযাতি।

যযাতি অতিশয় স্ত্রৈণ ছিলেন। শুক্রাচার্য্যের রোষে তিনি জরাগ্রস্ত হন। দেবযানির সহিত যযাতির বিবাহের সময় কথা হইয়াছিল,—দেবযানি ভিন্ন অন্য পত্নীতে রাজা আসক্ত হইতে পারিবেন না। সুতরাং শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে যখন তাঁহার পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করিল, দেবযানি তখন ক্রুদ্ধা হইয়া, পিতা শুক্রাচার্য্যের নিকট সমস্ত বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। কন্যার বাক্য-শ্রবণে, ক্রুদ্ধ হইয়া, শুক্রাচার্য্য রাজা যযাতিকে অভিসম্পাত করেন। তাহাতে রাজা যযাতি জরাগ্রস্ত হন। জরাগ্রস্ত হইয়া, রাজা যযাতি শুক্রাচার্য্যের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। শরণাপন্ন হইয়া, তিনি শুক্রাচার্য্যের নিকট জরামুক্তির জন্য স্তব-স্তুতি করিলে, শুক্রাচার্য্য আদেশ করেন,—"যদি কেহ তোমার জরা গ্রহণ করিয়া, তাহার যৌবন তোমাকে প্রদান করিতে সম্মত হয়, তুমি জরা বিনিময় করিয়া জরামুক্ত হইতে পারিবে।" জ্যেষ্ঠাদিক্রমে আপন পুত্রগণের নিকট যযাতি জরা-বিনিময়ের বাসনা জ্ঞাপন করেন। জ্যেষ্ঠ-পুত্র যদু কিছুতেই পিতার জরা গ্রহণে সম্মত হন না। যযাতি তাঁহাকে অভিসম্পাত দেন,—"তোমার বংশের কেহই রাজ্যার্হ হইবে না।" এইরূপ একে একে দ্রুহ্যু, তুর্ব্বসু ও অণুর নিকট প্রার্থনা জানাইয়াও যযাতি বিফল-মনোরথ হন। তিনি তখন তাহাদিগকেও পূর্ব্বোক্তরূপে অভিশপ্ত করেন। অবশেষে কনিষ্ঠ পুরুর নিকট সেই প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। পুরু কিন্তু হৃষ্টচিত্তে পিতার জরা-গ্রহণে সম্মত হন; তিনি বলেন,—"আমার উপর আপনার মহান্ অনুগ্রহ। আপনার অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিলেই আমি কৃতকৃতার্থ হইব।" অতঃপর পুত্রের সহিত যৌবন বিনিময় করিয়া, নবযৌবন প্রাপ্ত হইয়া, রাজা যযাতি ভোগ-বিলাসে মত্ত হন। কিন্তু যতই তিনি কামনাবশে উন্মত্ত হইলেন, ততই তাঁহার ভোগ-বাসনা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে একদিন বিবেক-বুদ্ধির উদয় হইল। রাজা বুঝিলেন,—"বিষয়-ভোগে কামনার নিবৃত্তি অসম্ভব। বরং তাহাতে, ঘৃতাহুতি-প্রাপ্ত অগ্নির ন্যায়, কামনা বৃদ্ধিই পাইয়া থাকে।" তখন, অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া, রাজা যযাতি ভোগ-তৃষ্ণা পরিহার-পূর্ব্বক পরব্রহ্মের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন; পুরুর নিকট হইতে জরা প্রতিগ্রহণ করিয়া, তাঁহাকে যৌবন প্রত্যর্পণ-পূর্ব্বক, তপস্যার জন্য বনে গমন করিলেন। পক্ষদ্বয় উৎপন্ন হইলে পক্ষিশাবক যেমন নীড় পরিত্যাগ করে, জ্ঞানোদয় হওয়াতে যযাতিও তদ্রূপ সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বন-গমনের পূর্ব্বে, রাজা যযাতি, তুর্ব্বসুকে দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে, দ্রুহ্যুকে পশ্চিম দিকে, যদুকে দক্ষিণাপথে, অণুকে উত্তর দিকে খণ্ড খণ্ড

* বাল্মীকির রামায়ণ, আদিকাণ্ড, ৭৪শ অধ্যায় হইতে ৭৭শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

রাজ্য প্রদান করিয়া, পুরুকে সর্ব্ব-পৃথ্বী-পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। * এই পুরুর বংশেই কুরুক্ষেত্র মহা-সমরের প্রধান অভিনেতৃগণ—কৌরব ও পাণ্ডবগণ—জন্মগ্রহণ করেন। যযাতির পুত্র-পঞ্চকের প্রত্যেকেরই বংশ বহু-বিস্তৃত।

যদুর পুত্রগণের মধ্যে ক্রোষ্টুর এবং সহস্রজিতের (সহস্রদের) বংশ বিশেষ প্রসিদ্ধ। সহস্রজিতের পুত্র—হৈহয়। তাঁহার পরবর্ত্তী দশম পর্য্যায়ে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন জন্মগ্রহণ করেন।

যদুবংশ।

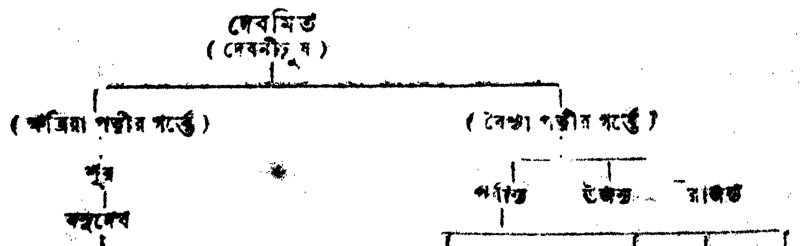
দত্তাত্রেয়ের আরাধনা করিয়া, ইনি বর প্রাপ্ত হন। দত্তাত্রেয় পুরাণ-বিশেষে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। দত্তাত্রেয়ের নিকট ইনি অধর্ম্ম-সেবা-নিবারণ, ধর্ম্মদ্বারা পৃথিবী জয় ও পৃথিবী পালন, শত্রুর নিকট অপরাজয়, অখিল ব্রহ্মাণ্ড বিখ্যাত পুরুষের হস্তে মরণ এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সহস্র বাহু প্রাপ্তি প্রভৃতির বর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন দশ সহস্র যজ্ঞ সমাপন করিয়া, সপ্তদ্বীপা বসুমতীকে সর্ব্বপ্রকারে বশীভূত করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যে কাহারও দ্রব্য অপহৃত হইত না; কেহই শোক ও বিভ্রমে সন্তপ্ত ও বিভ্রান্ত হইত না। তিনি ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতেন। একদা তিনি নর্ম্মদায় জলকেলি করিতেছিলেন; ইত্যবসরে লঙ্কাধিপতি রাক্ষসরাজ রাবণ তাঁহার পুরী আক্রমণ করেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া, তিনি রাবণকে পশুর ন্যায় বন্ধন করিয়া রাখিয়াছিলেন। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন কর্কোটক-নন্দন নাগদিগকে পরাজিত করিয়া 'মাহিষ্মতী' পুরী প্রতিষ্ঠা করেন। পঞ্চাশীতি সহস্র বৎসর রাজত্বের পর, জামদগ্নি পরশুরামের হস্তে তিনি নিহত হন। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের শত পুত্রের (মতান্তরে সহস্র পুত্রের) মধ্যে জয়ধ্বজ প্রভৃতি পঞ্চ পুত্র জীবিত ছিলেন। জয়ধ্বজ অবন্তী-দেশে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার তালজঙ্ঘ নামে এক পুত্র হয়। সেই তালজঙ্ঘের এক শত পুত্র ছিল। তাহারাও তালজঙ্ঘ নামে বিখ্যাত। তাহাদের অনেকে সগর হস্তে নিহত হইলে, ভরত রাজ্য প্রাপ্ত হন। ভরতের পুত্র—বৃষ; বৃষের পুত্র—মধু; মধুর বৃষ্ণি-প্রমুখ এক শত পুত্র জন্মে। এই বংশ,—যদু হইতে যদুকুল বা যাদব সংজ্ঞা; মধু হইতে মধু-বংশ বা মাধব সংজ্ঞা; এবং বৃষ্ণি হইতে বৃষ্ণি-বংশ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই বংশে অর্থাৎ হৈহয়দিগের বংশে বীতিহোত্র, সুব্রত, ভোজ, অবন্তী, তৌণ্ডিকেয়, তালজঙ্ঘ, ভরত ও সুজাত প্রভৃতি বহু শাখার উৎপত্তি হইয়াছিল। যদুর অপর পুত্র ক্রোষ্টুর গান্ধারী ও মাদ্রী নাম্নী দুই ভার্য্যা ছিলেন। ক্রোষ্টুর পুত্রগণের মধ্যে অনমিত্র, যুধাজিৎ, দেবমীঢুষ (দেবমিত্র) ও বৃজিনীবান প্রসিদ্ধ। বৃজিনীবানের বংশের শশবিন্দু চতুর্দ্দশ মহারত্নের স্বামী ও রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন। তাঁহার দশ সহস্র পত্নী এবং প্রত্যেক পত্নীতে এক এক লক্ষ সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। শশবিন্দুর প্রপৌত্র উশনা এক শত অশ্বমেধ-যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। উশনার পৌত্র জ্যামঘ অত্যন্ত স্ত্রৈণ ছিলেন। তাঁহার ভার্য্যার নাম—শৈব্যা। জ্যামঘ নিঃসন্তান হইলেও, ভার্য্যার ভয়ে অন্য দার পরিগ্রহ করিতে পারেন নাই। জগতে স্ত্রীর বশীভূত ব্যক্তির নাম উচ্চারণ করিতে হইলে, তৎকালে জ্যামঘের নাম সর্ব্বাগ্রে উচ্চারিত হইত। একদা জ্যামঘ শত্রু-সেনার সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে এক নগর আক্রমণ করেন। সেই নগরের অধিবাসিগণ হতাহত বা পলায়নপর হয়। একটী সুন্দরী

* বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্থাংশ, দশম অধ্যায়; ব্রহ্মপুরাণ, দ্বাদশ অধ্যায়।

রাজকন্যা কোনও প্রকারেই পলায়ন করিতে পারে না। জ্যামঘ তাহাকে বিবাহ করিবেন বলিয়া গৃহে লইয়া আসেন। কিন্তু রাণী শৈব্যা সেই কন্যাকে দেখিয়া, ভ্রূকুটি-ভঙ্গি করিবা-মাত্র, জ্যামঘ আপন অভিপ্রায় গোপন করেন; রাণী শৈব্যাকে বলেন,—"এই কন্যাকে আমার পুত্রবধূ করিব বলিয়া আনিয়াছি।" বলা বাহুল্য, তখনও রাজা অপুত্রক ছিলেন। সুতরাং রাণীর তীব্র বিদ্রূপ-বাণে তিনি বিদ্ধ হইয়াছিলেন। যাহা হউক, শৈব্যার পুত্র-সন্তান জন্মিলে, সেই পুত্রই ঐ রাজ-কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল। জ্যামঘের সেই পুত্রের নাম—বিদর্ভ। বিদর্ভ অল্পবয়স্ক হইলেও, পিতৃ-আদেশে, বয়োজ্যেষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই বংশে সাত্বত জন্মগ্রহণ করেন। সাত্বতের সাত পুত্র। তন্মধ্যে ভজমান, বৃষ্ণি, অন্ধক, দেবাবৃধ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। দেবাবৃধ এবং তৎপুত্র বভ্রু সম্বন্ধে প্রশংসা-গীতি দৃষ্ট হয়। তাঁহাদের প্রসঙ্গে পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন,—"বভ্রুঃ শ্রেষ্ঠো মনুষ্যানাং দেবৈর্দেবাবৃধঃ সমঃ।" বভ্রু—মনুষ্যগণের শ্রেষ্ঠ; এবং দেবাবৃধ—দেবগণের তুল্য। এই বভ্রু ও দেবাবৃধের উপদেশে ষট্ সহস্র ত্রিসপ্ততি সংখ্যক পুরুষ মোক্ষ লাভ করিয়াছিলেন। বিদর্ভের আর এক পুত্রের নাম—লোমপাদ। ইনি অঙ্গ-দেশের অধিপতি ছিলেন। সূর্য্যবংশীয় রাজা দশরথের সহিত ইঁহার সখ্যতা ছিল। লোমপাদের পাপে রাজ্যে দ্বাদশবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি-নিবন্ধন দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। অবশেষে বিভাণ্ডক মুনির পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে বেশ্যা দ্বারা প্রলোভিত করিয়া তিনি স্বীয় রাজ্যে লইয়া যান। তাহাতে রাজ্যে সুবৃষ্টি হয়। দশরথ-প্রদত্ত শান্তা নাম্নী কন্যার সহিত লোমপাদ ঋষ্যশৃঙ্গের বিবাহ দিয়াছিলেন। সাত্বতের অপর পুত্র মহাভোজও অতি ধর্ম্মাত্মা ছিলেন। তাঁহার বংশে ভোজরাজগণের উৎপত্তি হয়। এই বংশে সুপ্রসিদ্ধ রাজা শ্বফল্ক জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যেখানে অবস্থান করিতেন, সেখানে ব্যাধি বা অনাবৃষ্টি ভয় থাকিত না। একদা কাশী-রাজ্যমধ্যে তিন বর্ষ কাল অনাবৃষ্টি হইয়াছিল। কাশীরাজ, শ্বফল্ককে স্বীয় রাজ্যে লইয়া যান। শ্বফল্কের আগমনে কাশীরাজ্যে প্রচুর বারি বর্ষণ হয়। কাশীরাজ-নন্দিনী গান্দিনীর (গান্ধিনীর) সহিত শ্বফল্কের বিবাহ হইয়াছিল। সেই গান্দিনীর গর্ভে অক্রূরের জন্ম হয়। সাত্বত-পুত্র বৃষ্ণির বংশে প্রসেন ও সত্রাজিৎ জন্মগ্রহণ করেন। প্রসেন ও সত্রাজিৎ—স্যমন্তক মণির প্রসঙ্গে পুরাণ-পাঠকমাত্রেরই পরিচিত আছেন। সূর্য্যের উপাসনা করিয়া, সত্রাজিৎ সূর্য্যপ্রদত্ত স্যমন্তক মণি প্রাপ্ত হন। সেই মণি কণ্ঠে ধারণ করিয়া, দ্বারকাপুরে প্রবেশ করিলে, যাদবগণ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন। রাজা উগ্রসেনের কণ্ঠেই সে মণি শোভা পায়,—শ্রীকৃষ্ণ তদ্রূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। তখন অনেককেই লোভপরবশ দেখিয়া, বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণ প্রার্থনা করিলে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিব না মনে করিয়া, সত্রাজিৎ সেই মণি কনিষ্ঠ প্রসেনজিৎকে প্রদান করেন। শুদ্ধভাবে যত্নে রক্ষিত হইলে, স্যমন্তক মণি প্রতিদিন আট ভার সুবর্ণ প্রসব করিত এবং সেই মণির প্রভাবে রাজ্যের সমুদায় বিঘ্ন-বিপত্তি দূরীভূত হইত। কিন্তু অশুচি অবস্থায় সেই মণি ধারণ করিলে, ধারণ-কর্ত্তার প্রাণহানি ঘটিত। প্রসেনজিৎ এক দিন অশুচি অবস্থায় সেই মণি ধারণ করিয়া মৃগয়ায় গিয়াছিলেন। সেখানে সিংহ কর্তৃক তিনি নিহত হন। সিংহ আবার জাম্ববান কর্তৃক নিহত হইয়াছিল। এইরূপে স্যমন্তক মণি সত্রাজিৎ হইতে জাম্ববানের অধিকারে আসিয়াছিল। দ্বারকাবাসীরা কেহই

কিন্তু সে সংবাদ জানিতে পারে নাই। পরন্তু দ্বারকায় মণি-সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের কলঙ্ক-রটনা হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ কৌশলে প্রসেনজিৎকে হত্যা করিয়া, সেই মণি অপহরণ করিয়াছেন,—এইরূপই জনসাধারণের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। এইরূপে মিথ্যা-কলঙ্ক প্রচারিত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ মণির সন্ধানে বহির্গত হন। তিনি প্রথমে প্রসেনজিতের, তৎপরে সিংহের, পরিশেষে জাম্ববানের অনুসরণ করেন। সেখানে জাম্ববানের সহিত শ্রীকৃষ্ণের একবিংশতি দিবস মল্লযুদ্ধ হয়। যুদ্ধে জাম্ববান পরাজিত হইলে, স্যমন্তক মণি শ্রীকৃষ্ণের অধিকারে আসে। অধিকন্তু জাম্ববান শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইয়া, আপন কন্যা জাম্ববতীকে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে সমর্পণ করেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যাবর্তনে বিলম্ব দেখিয়া, দ্বারকাবাসিগণ তাঁহার প্রাণহানির আশঙ্কা করিয়াছিল। কিন্তু স্যমন্তক মণি ও জাম্ববতীকে সঙ্গে লইয়া তিনি যখন দ্বারকাপুরীতে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার জয়ধ্বনিতে দিগ্দিগন্ত নিনাদিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ মণিহরণের কলঙ্ক হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। সত্রাজিৎ, শ্রীকৃষ্ণের নামে কলঙ্ক রটনা করিয়াছিলেন; তিনি, লজ্জিত হইয়া, অপরাধ-স্খালনের জন্য, আপন কন্যা সত্যভামাকে শ্রীকৃষ্ণের করে সমর্পণ করিলেন। স্যমন্তক মণি পুনরায় সত্রাজিতের অধিকারে আসিল। সত্যভামাকে বিবাহ করিবার জন্য পূর্ব্বে শতধন্বা, কৃতবর্ম্মা ও অক্রূর চেষ্টা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সহিত সত্যভামার বিবাহে তাঁহারা অপমান বোধ করিলেন। সেই অপমানের প্রতিশোধ স্বরূপ শতধন্বা, সত্রাজিতকে নিহত করেন। তখন মণিরত্ন সত্রাজিতের হস্ত হইতে শতধন্বার হস্তে পতিত হয়। এই সময়ে পাণ্ডবগণের জতু-গৃহ-দাহ উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণ বারণাবতে গমন করিয়াছিলেন। সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে গমন করিয়া, পিতৃহত্যা ও স্যমন্তক মণি অপহরণের বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করেন। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ, শতধন্বার অনুসরণ করিয়া, তাঁহার সংহার-সাধন করিলেন। কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে শতধন্বা মণিরত্ন অক্রূরের নিকট লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া, পরিশেষে অক্রূর সেই মণি শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করেন। কিন্তু সেই মণির প্রতি অনেকেরই লোভ দেখিয়া, শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরের নিকট তাহা রক্ষা করিলেন; বলিয়া দিলেন,—"রাজ্যের উপকারার্থ আপনিই ইহা রক্ষা করুন।" ইহাই স্যমন্তক মণির উপাখ্যান। এই উপাখ্যান শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিলে, মিথ্যাপবাদ দূরীভূত হয়। ক্রোষ্টু-বংশধর সাত্বত-পুত্র অন্ধকের—কুকুর, ভজমান প্রভৃতি পুত্র জন্মে। কুকুর হইতে উগ্রসেন ও তৎপুত্র কংস। ভজমান হইতে দেবমীঢ়ুষ। দেবমীঢ়ুষের শূর নামে পুত্র হয়। শূরের পত্নী—মারিষা। মারিষার গর্ভে বসুদেব প্রমুখ দশ তনয় এবং পৃথা, শ্রুতদেবা প্রভৃতি পাঁচ কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। বসুদেবের পিতা শূরের সখা কুন্তীভোজ অপুত্রক ছিলেন। শূর, কুন্তীভোজকে কন্যারূপে পৃথাকে প্রদান করেন। সেই হইতে পৃথা—কুন্তী নামে পরিচিতা। পাণ্ডুর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। পৃথার যুধিষ্ঠিরাদি তিন পুত্র। বসুদেবের অপর চারি ভগ্নীর মধ্যে শ্রুতদেবাকে কারূষ-বৃদ্ধশর্ম্মা বিবাহ করেন। তৎপুত্র দন্তবক্র ও মহাশূর। শ্রুতকীর্ত্তিকে কেকয়রাজ বিবাহ করেন; তাহাতে সন্তর্দন প্রমুখ কেকয়াখ্য পাঁচ পুত্রের উৎপত্তি হয়। রাজাধিদেবীকে অবন্তীরাজ বিবাহ করেন; তাঁহার বিন্দু ও অনুবিন্দু নামে দুই পুত্র। শ্রুতশ্রবাকে চেদীরাজ দমঘোষ বিবাহ করেন; তাহাতে শিশুপালের উৎপত্তি হয়। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে এই শিশুপাল

শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। দেবকী প্রভৃতি কংসের সাত ভগ্নীকে বসুদেব বিবাহ করেন। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম—এই বসুদেবেরই পুত্র। রোহিণীর গর্ভে বলরাম এবং দেবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। কংস-কারাগারে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়। কংস জানিতে পারিয়াছিলেন ;—'দেবকীর অষ্টম-গর্ভজাত পুত্র শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সংহার-সাধন করিবেন।' সুতরাং তিনি বসুদেব ও দেবকীকে কারাগারে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সন্তান-সন্ততি জন্মিবামাত্র তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিতেছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের জন্মের সময় দৈববশে কংসের প্রহরিগণ মোহাচ্ছন্ন হয়। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-মাত্র বসুদেব তাঁহাকে গোকুলে নন্দালয়ে রাখিয়া আসেন। ঘটনাক্রমে সেই দিন নন্দের এক কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। পুত্র বিনিময়ে কন্যা গ্রহণ করিয়া, বসুদেব কংস-কারাগারে মথুরায় প্রত্যাবৃত্ত হন। সেই কন্যা—যোগমায়া। কংস যোগমায়ার সংহার-সাধনে উদ্যোগী হইয়া, তাঁহাকে শিলায় নিক্ষেপ করিলে, যোগমায়া আকাশে অন্তর্হিত হন। তিনি বলিয়া যান,—"তোমার সংহার-কর্ত্তা গোকুলে নন্দালয়ে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে।" সেই হইতে নন্দের প্রতিপালিত শ্রীকৃষ্ণের বধ-কামনায় কংস পুনঃপুনঃ চেষ্টা করিতে থাকেন। কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হন না। পরিশেষে যোগমায়ার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় ; শ্রীকৃষ্ণ-হস্তে কংস নিধনপ্রাপ্ত হন। গোপরাজ নন্দ, শ্রীকৃষ্ণকে পালন করিয়াছিলেন। বসুদেবের সহিত তিনি একবারে যে নিঃসম্পর্ক ছিলেন, তাহা নহে। কোনও কোনও পুরাণে আমরা দেখিতে পাই,—যদুপুত্র ক্রোষ্টুর বংশে দেবমীঢ়ুষ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার অপর নাম—দেবমিত্র। দেবমিত্রের দুইটী স্ত্রী। প্রথমা—ক্ষত্রিয়া ; দ্বিতীয়—বৈশ্যা। তাঁহার ক্ষত্রিয়া স্ত্রীর গর্ভে শূরের উৎপত্তি হয়। সেই শূর হইতে বসুদেব প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। আর, তাঁহার বৈশ্যা স্ত্রীর গর্ভে পর্য্যন্যের উৎপত্তি হয়। সেই পর্য্যন্য হইতেই নন্দ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। নিম্নে বংশলতা প্রদত্ত হইল। তাহাতেই নন্দ ও বসুদেবের বংশের সম্বন্ধ-তত্ত্ব উপলব্ধি হইতে পারিবে ;—



ইহাতে বুঝা যায়,—এক হিসাবে শ্রীনন্দ ও বসুদেবে ভ্রাতৃ-সম্বন্ধ। শ্রীকৃষ্ণ আপন খুল্লতাতের পালক-পুত্ররূপে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। নন্দালয়ে প্রতিপালিত হইয়া, কংসের ধনুর্যজ্ঞে গিয়া, তিনি কংসের সংহার-সাধন করেন। আপন পিতা উগ্রসেনকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া, কংস মথুরার সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। কংসের অত্যাচারে শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেব ও জননী দেবকী কারারুদ্ধ হইয়া, অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করেন। কংসের ধনুর্যজ্ঞ-উপলক্ষে রঙ্গক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া, শ্রীকৃষ্ণ কংসের বিনাশ-সাধন করিয়াছিলেন। তাহাতে উগ্রসেন

সিংহাসনে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হন। বসুদেব ও দেবকী মুক্তিলাভ করেন। মাতুল কংসের সংহার সাধন করিয়া, মাতামহ উগ্রসেনকে সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা-ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণ অশেষ শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি কংসের কুবলয়পীড় নামক মত্ত-হস্তীকে এবং চানুর-মুষ্টিক প্রভৃতি মল্লগণকে সংহার করিয়াছিলেন। কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণে জ্ঞান-গবেষণার পূর্ণ স্ফূর্ত্তি; কংসাগারে এবং গোকুলে তাঁহাতে বীর্য্যবত্তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র এক শত পত্নী ছিল। তন্মধ্যে রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী, জালহাসিনী প্রভৃতি অষ্ট মহিষী প্রধানা। শ্রীকৃষ্ণের আট অযুত আট লক্ষ পুত্র-সন্তান জন্মে। সেই সকল পুত্রাদির বংশ-বৃদ্ধিতে যদুবংশে অসংখ্য লোক-সৃষ্টি হইয়াছিল। সে সম্বন্ধে একটী প্রাচীন শ্লোক প্রচলিত আছে; তাহার মর্ম্ম ;—"সেই যদু-কুমারগণকে চাপ-শিক্ষা প্রদানের জন্য তিন কোটী অষ্ট শত সহস্র সংখ্যক গৃহাচার্য্যগণ সর্ব্বদা রত থাকিতেন। যদুবংশের লোক-সংখ্যা গণনা করা যায় না।" যদুকুমারগণ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া, আত্মদ্রোহে ব্রহ্মশাপে, ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

যযাতির কনিষ্ঠ পুত্র পুরু পিতার নিকট অখিল ভূমণ্ডলের আধিপত্য প্রাপ্ত হন। এই পুরু-রাজার বংশেই কুরু-পাণ্ডবগণের জন্ম হয়। পুরুর অধস্তন ত্রয়োদশ বা চতুর্দ্দশ পর্য্যায়ে (ভিন্ন ভিন্ন পুরাণের ভিন্ন ভিন্ন মত) দুষ্মন্ত জন্মগ্রহণ করেন। দুষ্মন্তের সম-পর্য্যায়ে (প্রতিরথাত্মজ কণ্বের পুত্র) মেধাতিথি হইতে প্রস্কন্ন প্রভৃতি 'কাণ্বায়ন' দ্বিজগণের উৎপত্তি হয়। যাহা হউক, রাজা দুষ্মন্তের বংশই ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। শকুন্তলার সহিত তাঁহার বিবাহ এবং ভরতের উৎপত্তি-কাহিনী কৌতূহলোদ্দীপক। শকুন্তলার সহিত দুষ্মন্তের গন্ধর্ব্ব-বিধি অনুসারে বিবাহ হয়। রাজা দুষ্মন্ত, মৃগয়ায় গমন করিয়া, এক দিন অরণ্য মধ্যে মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে উপনীত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে মহর্ষি কণ্বের কন্যা অনিন্দ্যসুন্দরী শকুন্তলাকে দেখিয়া, তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। এক দিন মাত্র ঋষির আশ্রমে অবস্থান করিয়া, শকুন্তলাকে সেইখানেই রাখিয়া, রাজা রাজধানীতে প্রত্যাগত হন। তাহার পর তিনি আর শকুন্তলার কোনই সন্ধান লন না। ইতিমধ্যে শকুন্তলা এক পুত্র-সন্তান প্রসব করেন। মহর্ষি কণ্ব বনমধ্যেই কুমারের জাত-কর্ম্মাদি সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সেই বালক সিংহ ধরিয়া তাহার সহিত ক্রীড়া করিত। বালক সকল প্রাণীকেই দমন করিতে পারে দেখিয়া, মুনিগণ তাহার নাম রাখিয়াছিলেন,—'সর্ব্বদমন।' কিছু দিন পরে, পুত্র লইয়া শকুন্তলা রাজ-সন্নিধানে উপনীত হইলেন। কিন্তু রাজা তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলেন না। দুষ্মন্ত কর্ত্তৃক শকুন্তলা প্রত্যাখ্যাত হইলে, রাজার প্রতি দৈববাণী হইল। দৈববাণী শকুন্তলাকে অবমাননা করিতে নিষেধ করিলেন। তাহাতে রাজা দুষ্মন্ত পুত্র-কলত্রকে গ্রহণ করেন। রাজপুত্র ভরত নামে অভিহিত হন। "তুমি পুত্রকে ভরণ কর"—দৈববাণীতে এই কথা উক্ত হইয়াছিল বলিয়া, শকুন্তলার পুত্র সর্ব্বদমন, 'ভরত' নামে অভিহিত হন। ভরত রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন। ব্রহ্ম-পুরাণের মতে,—এই ভরতের নাম অনুসারেই 'ভারতবর্ষ' নামের উৎপত্তি হইয়াছে। তিনি গঙ্গাকূলে পঞ্চ-পঞ্চাশৎ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি যমুনা-তীরে অষ্টসপ্ততি অশ্বমেধীয় অশ্ব বন্ধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া, কিরাত, হূণ, যবন, পৌণ্ড্র, কঙ্ক,

পুরুবংশ।

খস, শক এবং অন্যান্য অব্রাহ্মণ্য নৃপতিকে ও সমস্ত ম্লেচ্ছ-জাতিকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে যে সকল দানব জয়লাভ করিয়া, দেব-মহিলাগণকে রসাতলে লইয়া গিয়াছিল, ভরত তাঁহাদিগের উদ্ধার-সাধন করেন। তাঁহার রাজত্বকালে প্রজাকুলের সর্ব্ব অভিলাষ পূর্ণ হইত। তিনি সপ্তবিংশতি সহস্র সংবৎসর রাজত্ব করিয়া, দিকে দিকে আপন প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিয়াছিলেন। বিদর্ভ-দেশীয়া তাঁহার তিনটী মহিষী ছিলেন। তাঁহাদের গর্ভে ভরতের নয়টী পুত্র-সন্তান জন্মে। কিন্তু পুত্রগণ ভরতের অনুরূপ না হওয়ায়, স্বামী ব্যভিচারিণী ভাবিবেন মনে করিয়া, রাণীরা স্ব স্ব সন্তান বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন। পুত্র-জন্মের বৈফল্য-হেতু মরুস্তোম যজ্ঞ করিয়া, ভরত এক পুত্র প্রাপ্ত হন। বৃহস্পতির ঔরসে, উতথ্য-পত্নী মমতার গর্ভে, সেই পুত্রের উৎপত্তি হইয়াছিল। "এই দ্বিজকে ভরণ কর"—এই বলিয়া পুত্রের মাতা-পিতা অন্তর্দ্ধান হওয়ায়, সেই পুত্র 'ভরদ্বাজ' নামে বিখ্যাত হন। ভরত-বংশ 'বিতথ' (নিষ্ফল) হইবার উপক্রম হইলে, ভরদ্বাজকে পালক-পুত্ররূপে গ্রহণ করা হইয়াছিল; তাই ভরদ্বাজের অপর নাম,—'বিতথ'। এই বিতথের বংশে গার্গ্য ও শৈন্য নামধেয় 'ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণগণের' উৎপত্তি হয়। বিতথের পুত্র মন্যুর (ভবমন্যুর) বংশে রন্তিদেব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মহিমা সর্ব্বলোকে গীত হইত। তিনি আপনি অনাহারে থাকিয়াও বুভুক্ষিত জনের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেন। তাঁহার দানের অবধি ছিল না। সমুদায় সম্পত্তি দান করিয়া, নির্ধন হইয়া, তিনি সপরিবারে আটচল্লিশ দিন অনাহারে ছিলেন। সেই সময়ে জল মাত্র পান করিতে পান নাই। ঊনপঞ্চাশৎ দিবসের প্রাতঃকালে তাঁহার আহারের আয়োজন হয়। তিনি আহারে বসিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই এক অভুক্ত ব্রাহ্মণ আসিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। তখন রন্তিদেব সাদরে ব্রাহ্মণকে সেই আহারীয় দ্রব্য ধরিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ ভোজনান্তে প্রস্থান করিলে, অবশিষ্ট আহারীয় দ্রব্য পরিবারদিগকে বণ্টন করিয়া দিয়া আপনি ভক্ষণ করিবার মনস্থ করিলেন। ইতি-মধ্যে এক জন শূদ্র আসিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিল। তখন, ভগবানকে স্মরণ করিয়া, আপন আহারীয় দ্রব্যে রন্তিদেব সেই শূদ্র অতিথিকেও পরিতুষ্ট করিলেন। তখনও যাহা অবশিষ্ট রহিল, তিনি আহার করিতে পারিতেন। কিন্তু আহারে বসিবার পূর্ব্বেই বহুতর কুকুর সহ এক ব্যক্তি আসিয়া অতিথি হইল। তখন সেই কুকুরদিগকে এবং অতিথিকে আহার করাইতে সকল দ্রব্যই ফুরাইয়া গেল। যখন পানীয় জলমাত্র অবশিষ্ট, রন্তিদেব তাহা পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণে উদ্যত, এমন সময়ে এক পুক্কশ (চণ্ডাল) আসিয়া সকরুণ বচনে তৃষ্ণা-কাতরতা প্রকাশ করিল। তখন রন্তিদেব সেই জলগ্রাস পর্য্যন্ত অতিথিকে প্রদান করেন। পরীক্ষার চরম হইলে, রন্তিদেব ভগবৎ-কৃপা লাভ করিলেন। তাঁহার মুক্তিলাভ ঘটিল। বিতথের প্রপৌত্র দুরিতক্ষয় তিন পুত্র লাভ করেন;—ত্রয্যারুণি, কবি ও পুষ্করারুণি। তাঁহারা তিন জনই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। বিতথের অপর পৌত্র বৃহৎক্ষত্রের বংশে হস্তী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'হস্তিনাপুরী' নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। হস্তীর তিন পুত্র;—অজমীঢ়, দ্বিমীঢ় ও পুরুমীঢ়। এতন্মধ্যে পুরুমীঢ় নিঃসন্তান ছিলেন। অজমীঢ়ের নাম অনুসারেই 'আজমীঢ়' নগরের প্রতিষ্ঠা। অজমীঢ়ের বহু পুত্র। তাঁহার

পুত্র কণ্বের বংশে,—মেধাতিথি, এবং মেধাতিথি হইতে কাণ্বায়ন ও প্রিয়মেধাদি দ্বিজগণ উৎপন্ন হন। * অজমীঢ়ের অপর পুত্র বৃহদিষুর বংশের যোগী ব্রহ্মদত্ত হইতে বিম্বক্‌সেন জন্মগ্রহণ করেন। ঋষি জৈগীষব্যের উপদেশে তিনি যোগ-শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। অজমীঢ়ের নলিনী নামে এক ভার্য্যা ছিল। সেই ভার্য্যা হইতে নীলের উৎপত্তি। নীলের বংশে হর্য্যশ্ব (ভর্ম্ম্যাশ্ব) জন্মগ্রহণ করেন। হর্য্যশ্বের পাঁচ পুত্র,—মুদ্গল, সৃঞ্জয় (সঞ্জয়), বৃহদিষু (বৃহদশ্ব), কাম্পিল্য, প্রবীর (যবীনর)। সেই পাঁচ পুত্র বিষয়-রক্ষণে সমর্থ-হেতু "পাঞ্চাল" নামে অভিহিত হন। তাঁহাদের শাসনাধীন পঞ্চ-প্রদেশ—"পাঞ্চাল" সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিল। মুদ্গল হইতে জাত ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। সেই ব্রাহ্মণগণের 'মৌদ্গল্য গোত্র' হয়। এই মুদ্গলের কন্যা অহল্যা—গৌতম ঋষির পত্নী। অহল্যার পৌত্র সত্যধৃতি ধনুর্ব্বেদে সুপণ্ডিত ছিলেন। কন্যা অহল্যা ব্যতীত মুদ্গলের দিবোদাস নামে এক পুত্র ছিল। সেই দিবোদাসের বংশে দ্রুপদ, তৎপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং কন্যা দ্রৌপদী প্রভৃতির জন্ম হয়। এই বংশ পাঞ্চাল-বংশ নামে অভিহিত। অজমীঢ়ের ঋক্ষ নামে আর এক পুত্র ছিল। সেই ঋক্ষের পৌত্র—কুরু। সূর্য্য-কন্যা তপতির গর্ভে সম্বরণের ঔরসে তাঁহার জন্ম হয়। ইনিই ধার্ত্তরাষ্ট্র ও পাণ্ডবগণের আদি-পুরুষ। ইনিই 'কুরুক্ষেত্র' ও 'কুরুজাঙ্গাল' তীর্থের প্রতিষ্ঠাতা। কুরুক্ষেত্রে দেহত্যাগ করিলে, স্বর্গলাভ হইবে,—এই সঙ্কল্প করিয়া, রাজর্ষি কুরু, কুরুক্ষেত্র কর্ষণ করিয়াছিলেন। ইন্দ্রের বরে, কুরুক্ষেত্র-প্রতিষ্ঠায় কুরুরাজের অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছিল। † সুধনু ও জহ্নু প্রমুখ কুরুর অনেকগুলি পুত্র হয়। সুধনুর বংশে উপরিচরবসু জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চেদী-নামক রমণীয় দেশ অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি সম্রাট নামে অভিহিত হন। বসুরাজার পাঁচ পুত্র ;—প্রত্যগ্র (প্রত্যগ্রহ), কুশাম্ব, বৃহদ্রথ, মাবেল্ল (চেদিপ), মৎস্য (যদু)। তিনি পাঁচ পুত্রকে আপন অধিকৃত রাজ্য বিভাগ করিয়া দেন। বৃহদ্রথ—মগধ দেশের রাজা হইয়াছিলেন ; অপরাপর পুত্রের মধ্যে, মৎস্য—মৎস্য-দেশের অধিপতি হন। এইরূপে বসু-রাজার পাঁচ পুত্র হইতে পাঁচটী স্বতন্ত্র রাজ-বংশের সৃষ্টি হয়। রাজকুমার যদু কখনও শত্রু-হস্তে পরাজিত হন নাই। বৃহদ্রথের দুই পুত্রের মধ্যে জরাসন্ধ মগধের সিংহাসন লাভ করেন। তাঁহার জন্ম সম্বন্ধে এক অলৌকিক উপাখ্যান প্রচলিত আছে ;—জন্মকালে এই পুত্র দুই খণ্ডে বিভক্ত ছিল। জননী সেই দুই খণ্ডকে বাহিরে ফেলিয়া দেন। জরা-নাম্নী রাক্ষসী তাহা দেখিতে পাইয়া, ক্রীড়া করিতে করিতে, দুই খণ্ডকে মিলাইয়া দেয় ; 'জীবিত হও'

* শ্রীমদ্ভাগবত, নবম স্কন্ধ, বিংশ অধ্যায়ে, অপ্রতিরথের পুত্র কণ্ব এবং তৎপুত্র মেধাতিথি হইতে প্রস্কণ্ব প্রভৃতি দ্বিজগণের উৎপত্তির বিষয় লিখিত আছে। আবার ঐ ভাগবতেরই উক্ত স্কন্ধের একবিংশ অধ্যায়ে, অজমীঢ়-বংশে প্রিয়মেধাদি দ্বিজগণের উৎপত্তি-বিবরণ দৃষ্ট হয়। কিন্তু বিষ্ণু-পুরাণের চতুর্থ অংশের একই অধ্যায়ে (উনবিংশ অধ্যায়ে) অপ্রতিরথের পুত্র কণ্ব ও তৎপুত্র মেধাতিথি হইতেও কাণ্বায়ন-দ্বিজগণের উৎপত্তি-বিবরণ লিখিত আছে ; আবার সেখানে অজমীঢ়ের বংশেও কাণ্বায়ণ দ্বিজগণের উৎপত্তি বিবরণ দেখিতে পাই।

† মহাভারত, শল্য পর্ব্ব, ত্রিপঞ্চাশৎ অধ্যায় ; শ্রীমদ্ভাগবত, নবম স্কন্ধ, দ্বাবিংশ অধ্যায় ; বিষ্ণু-পুরাণ, চতুর্থাংশ, বিংশ অধ্যায়।

'জীবিত হও' বলিতে বলিতে, সেই যুগ্ম-দেহে প্রাণ-সঞ্চার হয়। জরা রাক্ষসী কর্ত্তৃক সন্ধিত অর্থাৎ খণ্ডদ্বয় একত্রিত ও জীবন-প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া, ঐ পুত্র 'জরাসন্ধ' নামে অভিহিত। জরাসন্ধ বীর ও বিক্রমশালী ছিলেন। তাঁহার অস্তি ও প্রাপ্তি নাম্নী কন্যা-দ্বয়কে তিনি মথুরাধিপতি কংসের হস্তে সম্প্রদান করিয়াছিলেন। ধনুর্যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণ কংসকে বিনাশ করিলে, জামাতৃ-বধে ক্রুদ্ধ হইয়া, জরাসন্ধ অষ্টাদশ বার মথুরা আক্রমণ করিয়া-ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বধ-কামনায় তিনি একোনশতবার গদা চালনা করেন। মথুরার সন্নিকটে যেখানে সেই গদা পতিত হইয়াছিল, তাহা 'গদাবসান ক্ষেত্র' নামে পরিচিত। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে জরাসন্ধকে পরাস্ত করিবার জন্য যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইয়া-ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের কৌশলে ভীমের হস্তে জরাসন্ধ নিহত হন। অতঃপর জরাসন্ধের পুত্র সহদেবকে মগধের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ ও ভীমার্জ্জুন জয়োল্লাসে হস্তিনাপুরে প্রত্যাবৃত্ত হন। * কুরু-বংশের প্রতীপ সর্ব্বভূতহিত-রত প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র,—দেবাপি, শান্তনু ও বাহ্লীক। জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবাপি অল্প বয়সেই অরণ্যে গমন করেন। মধ্যম শান্তনু রাজা হন। ইনি কর দ্বারা কোন জরাগ্রস্ত পুরুষকে স্পর্শ করিলে, সেই ব্যক্তি নবযৌবন প্রাপ্ত হইয়া শান্তি লাভ করিত। সেই জন্যই ইনি 'শান্তনু' নামে অভিহিত হন। পুরাণাদি পাঠে জানা যায়,—পূর্ব্ব জন্মে ইনি ইক্ষ্বাকু-বংশে 'মহাভিষ' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। শান্তনুর রাজ্যে দ্বাদশ বৎসর বৃষ্টি হয় নাই; দুর্ভিক্ষে অশেষ রাষ্ট্রের বিনাশ হইয়াছিল; রাজা শান্তনু উদ্বিগ্ন হইয়া ব্রাহ্মণদিগের নিকট কারণ জিজ্ঞাসা করেন। ব্রাহ্মণেরা উত্তর দেন,—"অগ্রজ বিদ্যমানে রাজ্যভোগ করায়, আপনি 'পরিবেত্তা' হইয়াছেন; তাই এইরূপ ঘটিতেছে।" রাজা শান্তনু তখন ব্রাহ্মণগণের নিকট সুপরামর্শের প্রার্থী হন। ব্রাহ্মণগণ বলেন,—"জ্যেষ্ঠ দেবাপির পাতিত্য না ঘটিলে, আপনার সুমঙ্গল নাই।" শান্তনুর মন্ত্রী তদনুসারে দেবাপির নিকট কতকগুলি পাষণ্ড-মত-পোষক ব্রাহ্মণকে প্রেরণ করেন। সেই ব্রাহ্মণগণের যুক্তি-জালে মুগ্ধ হইয়া, দেবাপি বেদ-নিন্দা আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহাতেই তাঁহার পাতিত্য ঘটে। শান্তনুর রাজ্যে পুনরায় সুবর্ষণ সুকর্ষণ আরম্ভ হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায়,—'শ্রীমদ্ভাগবত রচনার সম-সময়ে দেবাপি কলাপ-গ্রামে যোগাবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছিলেন। কলিযুগে চন্দ্রবংশের অবসান হইলে, ভবিষ্য সত্যের প্রারম্ভে, তিনিই আবার ঐ বংশের প্রতিষ্ঠা করিবেন।' শান্তনুর তিন পুত্র;—ভীষ্ম, বিচিত্রবীর্য্য ও চিত্রাঙ্গদ। মহাত্মা ভীষ্ম অশেষ-শাস্ত্রবিৎ, বীরশ্রেষ্ঠ ও উদারকীর্ত্তি ছিলেন। মহাভারতে তাঁহার মহান্ চরিত্র চিত্রিত আছে। ভীষ্মের ন্যায় আদর্শ-পুরুষ জগতে ক্বচিৎ জন্মগ্রহণ করেন। ভীষ্ম—পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র হইয়াও রাজ্যলিপ্সা পরিত্যাগে পিতৃভক্তি ও আত্মত্যাগের জীবন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শান্তনুর প্রথমা মহিষী গঙ্গার গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার জন্মগ্রহণের পর, শান্তনু দাশ-রাজের কন্যা সত্যবতীর রূপমোহে মোহিত হইয়া, তাঁহাকে বিবাহ করেন। সেই বিবাহে দাশ-রাজ, শান্তনুকে একটী প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইতে বলেন। সে প্রতিজ্ঞা—সত্যবতীর গর্ভে তাঁহার যদি পুত্র-সন্তান জন্মে, শান্তনু সেই সন্তানকেই

* মহাভারত, সভাপর্ব্ব, সপ্তদশ হইতে চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

রাজ-সিংহাসন প্রদান করিবেন। প্রাণপ্রিয় জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবব্রত (ভীষ্ম) বিদ্যমান থাকিতে রাজা কেমন করিয়া সে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইবেন? কাজেই সত্যবতীকে বিবাহের জন্য মন একান্ত চঞ্চল হইলেও ক্ষুব্ধ মনে তিনি স্বরাজ্যে হস্তিনাপুরে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু রাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলেও, সত্যবতীর চিন্তা তাঁহার মন হইতে বিদূরিত হইল না। অতৃপ্ত-আকাঙ্ক্ষায় রাজা দিন দিন বিমলিন হইতে লাগিলেন। ক্রমশঃ ভীষ্ম পিতার মনঃকষ্টের কারণ বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার জন্য পিতা কষ্ট পাইতেছেন—অনুভব করিয়া, মনে মনে তিনি ব্যথিত হইলেন। পরিশেষে দাশ-রাজের নিকট গমন করিয়া, তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া, ভীষ্ম তাঁহার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন;—'পিতা শান্তনুর সহিত সত্যবতীর বিবাহ দিলে, তিনি রাজ্যৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিবেন।' অতঃপর শান্তনুর সহিত সত্যবতীর পরিণয়-কার্য্য সম্পন্ন হইল। এই বিবাহের পূর্ব্বে, কুমারী-কালে, মহর্ষি পরাশরের ঔরসে, সত্যবতীর এক পুত্র হইয়াছিল। তিনিই কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাস। বিবাহের পর, সত্যবতীর গর্ভে, শান্তনুর ঔরসে, চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য জন্মগ্রহণ করেন। চিত্রাঙ্গদ বাল্যকালে গন্ধর্ব্ব কর্তৃক নিহত হন। সুতরাং কনিষ্ঠ বিচিত্রবীর্য্য রাজ-সিংহাসন লাভ করেন। বিচিত্রবীর্য্য, কাশীরাজের দুই কন্যাকে—অম্বিকা ও অম্বালিকাকে—স্বয়ম্বর-মণ্ডপ হইতে বল-পূর্ব্বক হরণ করিয়া আনিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন। ইহার অল্প দিন পরেই বিচিত্রবীর্য্য যক্ষ্মারোগে কাল-কবলিত হন। তৎকালে কোনও কোনও বংশে ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপত্তির পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। সুতরাং বংশ-রক্ষার জন্য, মাতা সত্যবতীর নিয়োগানুসারে, সত্যবতী-নন্দন বেদব্যাস, বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে, ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর নামক পুত্র-ত্রয় উৎপাদন করেন। বিচিত্রবীর্য্যের পুত্র-ত্রয়ের মধ্যে বিদুর সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ করেন। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন; তিনি রাজ্যলাভে বঞ্চিত হন। সুতরাং পাণ্ডু হস্তিনাপুরের সিংহাসন লাভ করেন। গান্ধারীর গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধন দুঃশাসনাদি শত পুত্র ও দুঃশলা নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। পাণ্ডু শাপ-বশতঃ জনন-শক্তি-হীন হওয়ায়, তাঁহার পত্নী কুন্তীর গর্ভে ধর্ম্ম, বায়ু ও ইন্দ্র কর্তৃক যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন উৎপন্ন হন; এবং তাঁহার অপরা পত্নী মাদ্রীর গর্ভে অশ্বিনীকুমারদ্বয় কর্তৃক নকুল ও সহদেবের উৎপত্তি হয়। ধার্ত্তরাষ্ট্র ও পাণ্ডবগণের বিবরণ লইয়াই মহাভারত গ্রন্থ বিরচিত। আমরা মহাভারত-প্রসঙ্গে তাহার পরিচয় প্রদান করিয়াছি।* কুরু-পাণ্ডবের মহা-সমরে এই দুই বংশের অবসান হয়। সেই সময়ে অর্জ্জুন-পুত্র অভিমন্যুর পত্নী উত্তরা গর্ভবতী ছিলেন। পরিশেষে সেই গর্ভে এক পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করে; তদ্দ্বারা কুরু-বংশ রক্ষা হয়। কুরু-কুল পরিক্ষীণ হইলে সেই পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, তিনি 'পরীক্ষিৎ' নামে অভিহিত হন। ঋষিকুমার শৃঙ্গীর শাপে তক্ষক-দংশনে পরীক্ষিতের মৃত্যু হইয়াছিল। শৃঙ্গীর পিতা মহর্ষি শমীক তপোবনে ধ্যান-মগ্ন ছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ, মৃগয়ায় গমন করিয়া, ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হইয়া, ধ্যান-মগ্ন ঋষির নিকট জল প্রার্থনা করেন। ঋষি মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া ছিলেন। সুতরাং উত্তর দিতে পারেন নাই। পুনঃপুনঃ প্রার্থনায়ও ঋষি নীরব রহিলেন দেখিয়া, রাজা

* এই গ্রন্থের বিংশ পরিচ্ছেদে (২৪১ পৃষ্ঠা) মহাভারত-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

পরীক্ষিতের মনে ক্রোধের সঞ্চার হয়। নিকটে একটী মৃত সর্প পড়িয়া ছিল। রাজা, রোষ-পরবশ হইয়া, শরাসনাগ্রে সেই মৃত সর্প তুলিয়া লইয়া, ঋষির গলদেশে বিলম্বিত করেন। ঋষি-তনয় শৃঙ্গী মুনিবালকগণের সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন। পিতার গলদেশে রাজা পরীক্ষিৎ মালাকারে মৃত সর্প স্থাপন করিয়াছেন শুনিয়া, শৃঙ্গী ক্রোধানলে জ্বলিয়া উঠিলেন। পরীক্ষিৎকে লক্ষ্য করিয়া, জল-স্পর্শ-পূর্ব্বক, তিনি অভিসম্পাত দিলেন,—"সেই ব্রাহ্মণাপমানকারী কুল-পাংশুল রাজার সপ্ত-রাত্রি-মধ্যে তক্ষক-দংশনে মৃত্যু ঘটিবে।" ঋষি-কুমারের শাপ-বাক্য অবিলম্বে পরীক্ষিতের কর্ণগোচর হইল। আয়ুঃ অবসান হইয়াছে বুঝিয়া, ঋষি-মণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া, সেই দিন হইতেই মহারাজ পরীক্ষিৎ গঙ্গাতীরে প্রায়োপ-বেশনে উপবিষ্ট হইলেন। রাজা পরীক্ষিতের তক্ষক-দংশনে মৃত্যু হইবে শুনিয়া, দ্বিজশ্রেষ্ঠ বিদ্বান কাশ্যপ (মতান্তরে ধন্বন্তরি) রাজার চিকিৎসার নিমিত্ত যাত্রা করেন। পথে ব্রাহ্মণ-বেশী তক্ষকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। কথায় কথায়, কে কোথায় গমন করিতেছেন—প্রকাশ হইয়া পড়ে। তখন তক্ষক, কাশ্যপের চিকিৎসা-নৈপুণ্যের পরীক্ষার জন্য, একটী বটবৃক্ষকে দংশন করেন। বৃক্ষ তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ হয়। এদিকে কাশ্যপ, সেই ভস্মরাশি সংগ্রহ করিয়া, তাহাকে সঞ্জীবিত করেন। কাশ্যপ ধনার্থী হইয়া, পরীক্ষিতের চিকিৎসা করিতে যাইতেছিলেন। তক্ষক তাঁহাকে প্রচুর ধন দিয়া বশীভূত করিলেন। কাশ্যপ ধ্যান-দ্বারা বুঝিতে পারিলেন,—পরীক্ষিতের আয়ুঃশেষ হইয়াছে। সুতরাং তক্ষকের নিকট আশানুরূপ ধনপ্রাপ্ত হইয়াই তিনি প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। রাজার চিকিৎসার জন্য কাশ্যপের উদ্যম স্থগিত হইল। সপ্তম দিবসে তক্ষক-দংশনেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিল। মহারাজ পরীক্ষিৎ পুণ্যবান, ন্যায়পর ও প্রজাবৎসল ছিলেন। সংসারে কলির প্রাধান্য বিস্তৃত হইতে না পারে, তজ্জন্য তিনি অশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার কলি-নিগ্রহ-কাহিনী পুরাণেতিহাসে চির-কীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। রাজা পরীক্ষিৎ একদা সরস্বতী-তীরে মৃগয়ায় গমন করেন। সেখানে এক শূদ্র রাজদণ্ড-ধারণ-পূর্ব্বক গো-মিথুনের প্রতি নৃশংস-ভাবে পীড়ন করিতেছিল। পরীক্ষিৎ দেখিলেন,—'তাহার গুরু-প্রহারে সেই মৃণাল-ধবল বৃষটী মলমূত্র পরিত্যাগ করিতেছে, এবং কপিলা গাভীটী মৃতবৎসার ন্যায় আর্ত্তনাদ করিতেছে।' তিনি আরও দেখিলেন,—'বৃষের তিনটী চরণ নষ্ট হইয়াছে; সে এক পদে অবস্থান করিতেছে।' পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন,—'দুরন্ত কলি শূদ্ররাজরূপ পরিগ্রহ করিয়া, বৃষরূপী ধর্ম্মের তিন পদ ভঙ্গ করিয়াছে, এবং অবশিষ্ট পদটীও ভঙ্গ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে।' তিনি আরও বুঝিলেন,—'গাভী সাক্ষাৎ পৃথিবী। ভগবান এত দিন ইঁহার ভার হরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ইঁহাকে পরিত্যাগ করার পর হইতে বিপ্রদ্বেষী ভূপালবেশী শূদ্রগণ ইঁহাকে পীড়ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে।' রাজা পরীক্ষিৎ, বৃষরূপী ধর্ম্মকে এবং গাভীরূপী পৃথিবীকে সান্ত্বনা করিলেন; শাণিত খড়্গ উত্তোলন পূর্ব্বক, রাজবেশী কলির মস্তকচ্ছেদে উদ্যত হইলেন। রাজা পরীক্ষিৎ বধোদ্যত হইয়াছেন দেখিয়া, রাজবেশ পরিহরি-পূর্ব্বক পরীক্ষিতের পদ-প্রান্তে পতিত হইয়া, কলি প্রাণভিক্ষা চাহিলেন। কলিকে শরণাগত দেখিয়া, রাজা কহিলেন,—"আমার রাজ্যে তুমি থাকিতে পারিবে না। তুমি

রাজ্যমধ্যে অবস্থান করিলে, রাজ্যে মিথ্যা, লোভ, চৌর্য্য, স্বধর্ম্ম-ত্যাগ, অলক্ষ্মী, কলহ, কপটতা প্রভৃতি অধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়। আমার রাজ্য—সত্য ও ধর্ম্মের রাজ্য। অতএব তুমি এখান হইতে প্রস্থান কর।" কলি বিনীত-স্বরে কহিল,—"সার্ব্বভৌম সম্রাট্! যদি প্রাণদান করিলেন, তবে আমার অবস্থানের ব্যবস্থাও করিয়া দেন। আপনার রাজ্য কোথায় নাই? আপনি সর্ব্বত্র বিচরণ করেন। সুতরাং আমার স্থান কোথায়?" এইরূপে কলি প্রার্থনা জানাইলে, রাজা পরীক্ষিৎ কহিলেন,—'যে স্থানে দ্যূত-ক্রীড়া, মদ্যপান, কুলটা, প্রাণিহত্যা,—এই চারি অধর্ম্ম বিদ্যমান, তোমার জন্য সেই স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলাম।" কলি আরও কয়েকটী স্থান প্রার্থনা করিলেন। রাজা পরীক্ষিৎ তাহাতে কহিলেন,—'যেখানে মিথ্যা, গর্ব্ব, কাম, হিংসা ও বৈরভাব দেখিতে পাইবে, সেই সকল স্থানেও বসতি করিতে পারিবে।" এইরূপে আপন ধর্ম্ম-রাজ্য হইতে কলিকে বিদূরিত করিয়া, মহারাজ পরীক্ষিৎ বৃষরূপী ধর্ম্মের ভগ্ন-পদত্রয়ের পুনর্যোজনা করিয়া দিলেন, এবং পৃথিবীকে শান্তি প্রদান করিলেন। সত্যযুগে তপস্যা, শৌচ, দয়া ও সত্য—ধর্ম্মের এই চারিটী পদ ছিল। বিস্ময়, বিষয়-সঙ্গ ও গর্ব্ব দ্বারা তাঁহার তিনটী পদ ভঙ্গ হয়। শেষে সত্য মাত্র অবশিষ্ট থাকে। পরীক্ষিৎ আপন কর্ম্ম ও প্রভাব গুণে, দ্বাপরের শেষ ভাগেও, ধর্ম্মের সেই চতুষ্পাদ রক্ষা করিয়াছিলেন; তাঁহার রাজত্ব-কালে কলি প্রাধান্য বিস্তার করিতে পারেন নাই। পরীক্ষিতের পুত্র—জনমেজয়। পিতার সর্প-দংশনে মৃত্যু-বিবরণ অবগত হইয়া, তিনি সর্প-সত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সেই যজ্ঞে বহু সর্প বিনষ্ট হইয়াছিল। জনমেজয় পৃথিবী জয় করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন,—ভাগবতাদিতে তাহার উল্লেখ আছে। জনমেজয়ের পুত্র শতানিক, যাজ্ঞবল্ক্য মুনির নিকট বেদ পাঠ করিয়া ক্রিয়া-জ্ঞান, শৌনক হইতে আত্ম-জ্ঞান এবং ক্রিয়াচার্য্য হইতে অস্ত্র-জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। এই বংশের অধিসীমকৃষ্ণের (অসীমকৃষ্ণের) পুত্র নিচক্ষুর (নেমিচক্রের) রাজত্বকালে গঙ্গা-প্রবাহে হস্তিনাপুর বিনষ্ট হয়। তিনি কৌশাম্বী-নগরে রাজধানী স্থাপন করেন। কলিযুগে ক্ষেমক রাজায় এই বংশের অবসান হয়।

অণু, দ্রুহ্য ও তুর্ব্বসু—যযাতির অপর তিন পুত্র। তাঁহাদের বংশে যে সকল কৃতী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা বিভিন্ন জনপদে আপনাদের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ঐ তিন বংশের নৃপতিগণের যে সকল রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে কতকগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধ। দ্রুহ্যর বংশে গান্ধার জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'গান্ধার' (বর্ত্তমান কান্দাহার) রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। দ্রুহ্য-বংশের প্রচেতার শত পুত্র। তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ম্লেচ্ছগণের অধিপতি হইয়াছিলেন। উত্তর দিক তাঁহাদের অধিকার-ভুক্ত হইয়া ছিল। মরুত্তের অনপত্য-নিবন্ধন তুর্ব্বসু-বংশ লোপপ্রাপ্ত হয়। পুরু-বংশীয় দুষ্মন্ত সেই বংশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। অণু-বংশের শিবি হইতে মদ্র, কেকয় প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। মদ্রদেশ, কেকয়-দেশ তাঁহাদের নামানুসারেই প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বংশে, বলির ক্ষেত্রে দীর্ঘতমা ঋষির ঔরসে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম পুণ্ড্র ও ওড্র নামক পুত্রগণ উৎপন্ন হন। তাঁহাদের নামানুসারেই অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ

দ্রুহ্য, তুর্ব্বসু, অণুর বংশ।

প্রভৃতির নামকরণ হইয়াছিল। অঙ্গের বংশে রোমপাদ-নামে এক রাজা জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার সম্বন্ধে পুরাণে বহু মতান্তর দৃষ্ট হয়। বিষ্ণু-পুরাণে লিখিত আছে,—অঙ্গের বৃদ্ধ-প্রপৌত্র চিত্ররথের দশরথ নামে এক পুত্র ছিলেন। তাঁহার অপর নাম—রোমপাদ। রোমপাদের অপুত্রক-নিবন্ধন সূর্য্য-বংশীয় অজ-পুত্র দশরথ স্বীয় কন্যা শান্তাকে তাঁহার কন্যারূপে প্রদান করিয়াছিলেন। আবার ভাগবতে আছে,—'চিত্ররথের সন্তান হয় নাই; চিত্ররথই রোমপাদ নামে বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার সখা দশরথ তাঁহাকে শান্তা নাম্নী কন্যা দান করেন। হরিণী-তনয় ঋষ্যশৃঙ্গ সেই কন্যার পানিগ্রহণ করিয়াছিলেন।' ভগবতের মতে,—এই রোমপাদ রাজার রাজত্বকালেই অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল; এবং বারবনিতাগণের প্রলোভনে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আগমনে, সে দুর্ভিক্ষ নিবারিত হয়। এই বংশের অধিরথ রাজার পুত্রের নাম—কর্ণ। কর্ণ তাঁহার ঔরসজাত পুত্র নহেন;--পালক-পুত্র। পৃথার (কুন্তীর) অবিবাহিতা অবস্থায় সূর্য্যের ঔরসে কর্ণের উৎপত্তি হইয়াছিল। লোকাপবাদাশঙ্কায়, কাষ্ঠ-পিঞ্জর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া, কুন্তী সেই পুত্রকে পরিত্যাগ করেন। অধিরথ সেই পরিত্যক্ত পুত্র প্রাপ্ত হন, এবং তাহাকে আপনার পুত্র-রূপে পালন করেন। কর্ণ—বীর বলিয়া প্রসিদ্ধ। কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধে তিনি কুরুপক্ষে সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই কর্ণ ই 'দাতাকর্ণ' নামে বিখ্যাত। দুর্য্যোধনের পক্ষ-গ্রহণে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া,বহু সভ্য ও অসভ্য জাতিকে জয় করিয়া, কর্ণ যখন প্রত্যাবৃত্ত হন; তাহার অল্প দিন পরেই দুর্য্যোধন একটি বৈষ্ণব-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞোপলক্ষে কর্ণ প্রতিজ্ঞা করেন,—"যত দিন আমি অর্জ্জুনকে বধ করিতে না পারিব, তত দিন আমার নিকট যে যাহা প্রার্থনা করিবে আমি তাহাই প্রদান করিব।" এই সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়া. কর্ণের দাতৃত্ব-শক্তির পরীক্ষা করিতে আসেন। সে পরীক্ষা—ভীষণ পরীক্ষা! বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, কর্ণের একমাত্র পুত্র বৃষকেতুর মাংস ভক্ষণ করিতে চাহেন। কর্ণের স্ত্রী পদ্মাবতী ও কর্ণ উভয়ে স্বহস্তে পুত্রের মুণ্ড ছেদন করিবেন এবং পদ্মাবতী স্বয়ং সেই মাংস রন্ধন করিয়া দিবেন,—বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কর্ণ ও পদ্মাবতী তাহাতেই সম্মত হন। অতিথি-সৎকারে প্রাণ সমর্পণ করিতে পারিব ভাবিয়া, পুত্র বৃষকেতুও আপনাকে ধন্য বলিয়া মনে করেন। অতঃপর পিতা-মাতা উভয়ে মিলিয়া—পুত্র বৃষকেতুকে ছেদন করিয়া, অতিথি-সেবার জন্য সেই মাংস রন্ধন করিয়া দেন। কর্ণ ও পদ্মাবতী উভয়েই এই বিষম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, ব্রাহ্মণ-বেশী ভগবান, মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা-প্রভাবে তাঁহাদের মৃত-পুত্রের পুনর্জ্জীবন দান করেন। এই অলৌকিক দান-ব্যাপারে কর্ণ 'দাতাকর্ণ' নামে প্রসিদ্ধ হন।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

দৈত্য ও দানবগণ।

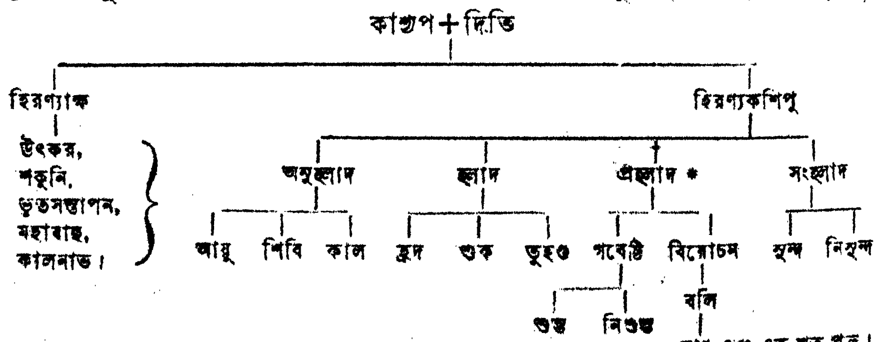
[ব্রহ্মার মানস-পুত্র প্রজাপতিগণ,—কশ্যপ হইতে দেব, দৈত্য, দানব ও মানব বংশের উৎপত্তি;—হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু, প্রহ্লাদ, বলি প্রভৃতি,—বরাহ, নৃসিংহ ও বামন অবতার,—দানব কন্যাগণের সহিত দেবতা ও মানবের বিবাহ-রহস্য;—মধুকৈটভ, মহিষাসুর, শুম্ভ-নিশুম্ভ, দুর্গাসুর, গয়াসুর প্রভৃতির প্রসঙ্গ;—ভিন্ন ভিন্ন মন্বন্তরে ভিন্ন ভিন্ন দৈত্য-দানবগণ;—বৃত্রাসুর ও অন্যান্য দৈত্য-দানবগণ,—রূপকে মতান্তর।]

মন্বন্তর প্রভৃতির—মনু ও মনু-পুত্রগণের—বিষয় আলোচনা করিতে হইলে, আরও অনেক বিষয় আলোচনা করার আবশ্যক হয়। প্রজাপতিগণের বিষয় আলোচনা করিতে হয়,—ব্রহ্মার মানস-পুত্রগণের বিষয় আলোচনা করিতে হয়; তার পর, কোন্ মন্বন্তরে দেব-দানব-দৈত্যের কখন কিরূপ প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়িয়াছিল, সে সকল কথাও মনে পড়ে। প্রজাপতি সৃষ্টিকর্ত্তা-সম্বন্ধেও পুরাণ-সমূহে মতান্তর দেখিতে পাওয়া যায়। প্রধানতঃ দৃষ্ট হয়,—ভৃগু, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরা, মরীচি, দক্ষ, অত্রি প্রভৃতিই প্রজাপতির মধ্যে গণ্য। ইঁহারা আবার ব্রহ্মার মানস-পুত্র বলিয়াও পরিকীর্ত্তিত। এতদ্ভিন্ন, কর্দ্দম, বশিষ্ঠ, নারদ প্রভৃতিও, কোনও কোনও পুরাণের মতে, প্রজাপতি-পর্য্যায়ভুক্ত। অপিচ, ধর্ম্ম, রুদ্র, মনু, সনক, সনাতন, সনৎকুমার, রুচি, শুদ্ধ প্রভৃতি ব্রহ্মার মানসপুত্র মধ্যে পরিগণিত। সূর্য্যবংশের আদিভূত কশ্যপ—মরীচির ঔরসে কর্দ্দম-কন্যা কলার গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করেন। এদিকে আবার, তৈত্তিরীয় সংহিতায়, হিরণ্যবর্ণ ব্রহ্মা হইতে কশ্যপের উৎপত্তি কথা লিখিত আছে। কশ্যপের বহু পত্নী। সেই সকল পত্নীর—কোনও পত্নীর গর্ব্ভে দেবতাদিগের এবং কোনও পত্নীর গর্ব্ভে দৈত্যদিগের উৎপত্তি হয়। দক্ষের কয়েকটী কন্যাকে কশ্যপ বিবাহ করিয়াছিলেন। দক্ষ-কন্যাগণের মধ্যে অদিতির গর্ব্ভে কশ্যপের ঔরসে সূর্য্য ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ জন্মগ্রহণ করেন; এবং সেই দেবাংশে মানবগণ উদ্ভূত হন। অন্যপক্ষে আবার, দক্ষ-কন্যা দিতির গর্ব্ভে দৈত্যগণের জন্ম এবং দনুর গর্ব্ভে দানবগণের উৎপত্তি হয়। ফলতঃ, একই কশ্যপ হইতে দেব, দৈত্য, দানব, মানব, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়াছিল। কশ্যপ হইতে কেবল যে দেব-দানব-মানবের উৎপত্তি-কথাই পুরাণাদি শাস্ত্রে লিখিত আছে, তাহা নহে। পুরাণাদি শাস্ত্রে দেখিতে পাই,—তাঁহার স্ত্রী ইলার গর্ব্ভে বৃক্ষ, প্রভার গর্ব্ভে সর্প, কাষ্ঠার গর্ব্ভে অশ্বাদি, তাম্রার গর্ব্ভে শ্যেন-গৃধ্র, সরসার গর্ব্ভে শ্বাপদ, তিমির গর্ব্ভে জল-জন্তু প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়াছিল। মহর্ষি কশ্যপের পরিচয় শাস্ত্রে ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখ আছে। 'কশ্য' (সোমরস বিশেষ) পান করিতেন বলিয়াই তিনি 'কশ্যপ' নামে অভিহিত হন। তাঁহার কশ্যপ নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে মার্কণ্ডেয় পুরাণে এইরূপ উল্লিখিত আছে। কাত্যায়ন ঋষির বেদানুক্রমণিকায়, ঋক-সংহিতার কতকগুলি সূক্তের ঋষি বলিয়া, কশ্যপ পরিচিত হইয়াছেন। কোথাও কোথাও কশ্যপ প্রজাপতির মধ্যে পরিগণিত। যাহা হউক, কশ্যপ হইতে যে সকল প্রধান প্রধান দৈত্য-দানবের উৎপত্তি হয়, তদ্বিবরণ সংক্ষেপে প্রদত্ত হইতেছে।

কশ্যপ ও তাঁহার বংশ।

দৈত্য ও দানব-গণ।

কশ্যপের দৈত্য-পুত্রগণের মধ্যে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ বিশেষ প্রসিদ্ধ। হিরণ্যকশিপু দৈত্যগণের আদিভূত বলিয়া অভিহিত হন। তিনি বিষ্ণুদ্বেষী এবং লোকপালদিগের উৎপীড়ক ছিলেন। বিষ্ণু নরসিংহ-রূপে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার সংহার-সাধন করিয়াছিলেন। হিরণ্যাক্ষ নামে হিরণ্যকশিপুর এক প্রবল পরাক্রান্ত সহোদর ছিলেন। হিরণ্যকশিপুর সংহার-সাধনের পূর্ব্বে, বরাহ-রূপে অবতীর্ণ হইয়া, ভগবান বিষ্ণু তাঁহাকে নিধন করেন। হিরণ্যকশিপুর পুত্র হরিপরায়ণ প্রহ্লাদ দৈত্য-বংশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। প্রহ্লাদ-চরিত্র হিন্দুমাত্রেই অবগত আছেন। পিতার কঠোর নির্য্যাতনে নিপীড়িত হইয়া কিরূপ ভীষণ পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হন, পুরাণের অনেক স্থলেই তাহা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। নরসিংহ-রূপী ভগবানের হস্তে পিতার মৃত্যু হইলে, প্রহ্লাদ দৈত্য-রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। দৈত্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও, ভগবদ্ভক্তি প্রভাবে, পুণ্যানুষ্ঠানের ফলে, প্রহ্লাদ এতই প্রভাব-সম্পন্ন হইয়াছিলেন যে, তিনি মহাত্মা নামে পরিচিত হন। পুরাণাদি শাস্ত্রেই প্রকাশ,—'মহাত্মা প্রহ্লাদের চরিত্র শ্রবণ করিলে, সমস্ত পাপ সদ্য ধ্বংস হয়। হরি যেমন প্রহ্লাদকে সকল বিপদে রক্ষা করিয়াছিলেন, যিনি প্রহ্লাদের চরিত্র শ্রবণ করেন, ভগবান তাঁহাকেও সেই-রূপ সকল বিপদে রক্ষা করিয়া থাকেন।' সংহ্লাদ প্রভৃতি প্রহ্লাদের কয়েকটী সহোদর ছিল। কিন্তু কর্ম্মগুণে প্রহ্লাদের বংশই প্রতিষ্ঠাপন্ন হয়। প্রহ্লাদের পুত্র—বিরোচন। সেই বিরোচন হইতে বলি জন্মগ্রহণ করেন। দানধর্ম্মাচরণে বলির প্রসিদ্ধি অসাধারণ। ভগবান বিষ্ণু, বামন-রূপ পরিগ্রহ করিয়া, ত্রিপাদ-ভূমি প্রার্থনায়, বলির দান-ধর্ম্মের পরীক্ষা করিয়াছিলেন। প্রপিতামহ হিরণ্যকশিপুর ন্যায় বলিরাজ স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল ত্রিভুবনের অধীশ্বর ছিলেন। বলির এক শত পুত্র। তন্মধ্যে বাণ জ্যেষ্ঠ। বামন-দেবকে রাজৈশ্বর্য্য প্রদান করিয়া, বলিরাজ পাতালে আশ্রয় গ্রহণ করিলে, তাঁহার বংশধরগণ পাতালেই রাজ্য করিতে থাকেন। হিরণ্যকশিপুর ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষেরও কতকগুলি মহাবল-পরাক্রান্ত পুত্র ছিল। বংশলতা এইরূপ,—



কশ্যপের অপরা স্ত্রী দক্ষ-তনয়া দনু যে সকল পুত্র প্রসব করেন, তাহারা 'দানব' নামে পরিচিত হয়। সেই দনু-পুত্রগণের সংখ্যা—এক শত। তন্মধ্যে বিপ্রচিত্তি,

* দৈত্যবংশের বংশলতা সম্বন্ধেও নানা মতান্তর আছে। পুরাণান্তরে হ্রদ ও বিরোচন—প্রহ্লাদের পুত্র বলিয়া এবং হ্রদের পুত্র—আয়ুষ্মান, শিবি ও বাস্কল বলিয়া লিখিত হইয়াছে। আরও, প্রহ্লাদ, হ্লাদ, অনুহ্লাদ প্রভৃতির নাম—প্রহ্রাদ, হ্রাদ, অনুহ্রাদ প্রভৃতি রূপেও উচ্চারিত ও লিখিত রহিয়াছে।

তারক, পুলোমা, স্বর্ভানু, বৃষপর্ব্বা, দ্বিমূর্দ্ধা, শকুনি, গবেষ্ট, সুকেশী, হয়গ্রীব প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। ইহাদের মধ্যে স্বর্ভানুর কন্যা প্রভাকে সূর্য্যবংশের রাজা আয়ু বিবাহ করেন এবং তাঁহার গর্ভেই নহুষের উৎপত্তি হয়। বৃষপর্ব্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠাকে নহুষ-পুত্র যযাতি বিবাহ করেন। যযাতির সহিত শর্ম্মিষ্ঠার বিবাহ—অপূর্ব্ব রহস্যপূর্ণ। দৈত্য-গুরু শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানির সহিত বৃষপর্ব্বা-নন্দিনী শর্ম্মিষ্ঠা ক্রীড়া করিতেছিলেন। সেই সময়ে ক্রীড়াচ্ছলে উভয়ের মধ্যে বিবাদ হয়। তাহাতে ক্রোধ-পরবশ হইয়া, শর্ম্মিষ্ঠা দেবযানিকে কূপ-মধ্যে নিক্ষেপ করেন। সেই সময় রাজা যযাতি মৃগয়ার্থ বনে গমন করিয়াছিলেন। কূপমধ্যে নিপতিতা বিবস্ত্রা দেবযানির প্রতি সহসা তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। রাজা যযাতি স্বীয় উত্তরীয় বস্ত্রের সাহায্যে দেবযানির কর-ধারণ করিয়া তাঁহাকে উত্তোলন করেন। যযাতির অনুকম্পায় জীবন লাভ করিয়া, পিতা শুক্রাচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইয়া, দেবযানি সকল বিবরণ নিবেদন করিলেন। তাহাতে শুক্রাচার্য্য বৃষপর্ব্বার উপর ক্রুদ্ধ হন। শুক্রাচার্য্যের ক্রোধ-শান্তির নিমিত্ত বৃষপর্ব্বা সহস্র সখীসহ আপন কন্যা শর্ম্মিষ্ঠাকে দেবযানির পরিচর্য্যার জন্য দেবযানির হস্তে অর্পণ করেন। ইহার পর, দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য আপন কন্যা দেবযানিকে, শর্ম্মিষ্ঠা প্রভৃতি অনুচারিণীগণের সহিত, রাজা যযাতির হস্তে সম্প্রদান করিয়াছিলেন। অতঃপর দেবযানির সহিত শর্ম্মিষ্ঠাও যযাতির মহিষী মধ্যে গণ্য হন। * সেই শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে যযাতি-পুত্র পুরু প্রভৃতির উৎপত্তি হয়। পুলোমার দুহিতা শচী, দেবরাজ ইন্দ্রের মহিষী হন। তাঁহার গর্ভে জয়ন্ত জন্মগ্রহণ করেন। হয়শিরা-তনয়া উপদানবীর গর্ভে দুষ্মন্তের জন্ম হয়। পুলোমা ও কালকা নাম্নী বৈশ্বানর-তনয়াদ্বয়কে কশ্যপ বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের গর্ভে 'পৌলমেয়' ও 'কালকেয়' নামে অসংখ্য সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। কশ্যপের অন্যান্য পত্নীর গর্ভেও বহু নিঘৃণ্য জাতির উৎপত্তি হয়। ফলতঃ, কশ্যপ হইতে এক দিকে মনুজগণের এবং অন্য দিকে দৈত্য-দানবগণের উৎপত্তি হইয়াছিল।

দৈত্য-দানব-বংশে যে সকল ধর্ম্মদ্বেষী বীর জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে মধু-কৈটভ, মহিষাসুর, শুম্ভ ও নিশুম্ভ, ত্রিপুরাসুর, তারকাসুর, দুর্গাসুর, গয়াসুর প্রভৃতির নাম অনেকেই অবগত আছেন। তাঁহাদের প্রভাবে দেবগণ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন; পৃথিবী পরিকম্পিত হইয়াছিল। স্বয়ং বিষ্ণু, মধু ও কৈটভ দৈত্যদ্বয়কে সংহার করেন। দৈত্যদ্বয় পঞ্চসহস্র বৎসর ধরিয়া মধুসূদনের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কোনও প্রকারেই দৈত্যদ্বয় পরাজিত হন না দেখিয়া, মহামায়া তাঁহাদের প্রতি মায়াজাল বিস্তার করেন। দৈত্যদ্বয় সেই মায়ায় মুগ্ধ হইয়া নারায়ণকে বর দিতে চাহেন। ভগবান তখন তাঁহাদের নিকট বর প্রার্থনা করেন;—'তোমরা উভয়ে অদ্য আমার বধ্য হও।' দানবদ্বয় 'তথাস্তু' বলিয়া বর প্রদান করিলে, বিষ্ণু চক্রদ্বারা তাঁহাদের মস্তক-ছেদন করেন। এক মহিষীর গর্ভ হইতে মহিষাসুর দৈত্যের উৎপত্তি হয়। মহিষাসুর দেবগণকে পরাজিত করিয়া স্বর্গলোক অধিকার করিয়া-

বিবিধ দৈত্যের বিবরণ।

* মৎস্যপুরাণ, ২৭শ হইতে ৩০শ অধ্যায়; মহাভারত, আদি-পর্ব্ব, সপ্ত-সপ্ততিতম অধ্যায় হইতে হ্যশীতিতম অধ্যায় প্রভৃতিতে শর্ম্মিষ্ঠা ও দেবযানির বিবরণ দ্রষ্টব্য।

ছিল। তখন সমস্ত দেবগণের তেজঃ গ্রহণ করিয়া, দেবী ভগবতী আবির্ভূতা হইলেন। তিনিই সিংহ-বাহিনী মহিষমর্দ্দিনী। বহুতর দৈত্যসহ দেবীর সহিত রণে প্রবৃত্ত হইলে, দেবী মহিষাসুরের সংহার-সাধন করেন। শুম্ভ-নিশুম্ভ দৈত্য-ভ্রাতৃদ্বয় মহাবল-পরাক্রান্ত ছিলেন। তাঁহারাও দেবগণের রাজ্য অপহরণ করিয়া দেবগণকে হত-শ্রী করিয়াছিলেন। দেবগণ, নিরুপায় হইয়া হিমালয়ে গিয়া, ভগবতীর শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। তাহাতে দেবী শুম্ভ-নিশুম্ভের সংহার-সাধনে প্রবৃত্ত হন। প্রথমে শুম্ভের সেনাপতি ধূম্রাক্ষ ষষ্টি-সহস্র সৈন্য সহ দেবীর সহিত যুদ্ধ করিতে আসে। দেবী তাহাদিগকে ভস্মসাৎ করেন। তৎপরে দৈত্যরাজ শুম্ভ যথাক্রমে চণ্ড, মুণ্ড ও রক্তবীজকে সেনাপতি-পদে বরণ করিয়া, যুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন। দেবী জগদ্ধাত্রী শূলদ্বারা তাহাদিগকে নিপাতিত করেন। অবশেষে শুম্ভ ও নিশুম্ভ যুদ্ধ-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। তখন দেবী তাঁহাদিগেরও সংহার-সাধন করেন। দেবী-মাহাত্ম্য চণ্ডীতে দেবী কর্তৃক এই সকল অসুরগণের সংহার-বিবরণ বর্ণিত আছে। দুর্গাসুর দৈত্য — হিরণ্যাক্ষের বংশে জন্মগ্রহণ করে। তাহাকে কেহই যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত করিতে পারিত না বলিয়া, সে 'দুর্গমাসুর বা দুর্গাসুর' নামে অভিহিত হয়। বেদই দেবগণের বল;—সুতরাং বেদ বিলুপ্ত করিবার জন্যই তাহার প্রথম আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল। ব্রহ্মার বরে বল-দর্পিত হইয়া, ব্রাহ্মণ-গণকে সে বেদ-মন্ত্র বিস্মরণ করাইয়া দেয়। তার পর, দেবগণকে পরাজিত করিয়া, দুর্গাসুর অমরাবতী নগরী অধিকার করে। তখন যজ্ঞ-কর্ম্মের অভাবে ভূতলে বৃষ্টির অভাব হয়। উপর্য্যুপরি শত বৎসর অনাবৃষ্টি-নিবন্ধন পৃথিবীতে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়ায় প্রাণি-হানি ঘটিতে থাকে। অগত্যা ব্রাহ্মণগণ হিমালয়ে গমন-পূর্ব্বক দেবীর শরণাপন্ন হন। তাহাতে ভগবতী দুর্গা সেই অসুরের সংহার-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। দূত-মুখে দেবীর যুদ্ধায়োজন বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, সহস্র অক্ষৌহিণী সৈন্য সহ দুর্গমাসুর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। সেই যুদ্ধে দেব-দ্বিজগণ প্রথমে সকলেই শঙ্কান্বিত হইয়াছিলেন। কিন্তু দেবী, সকলের শঙ্কা দূর করিয়া, দুর্গমাসুর ও তাহার অনুচরগণকে নিহত করেন। এই দুর্গাসুর সংহার-হেতুই দেবীর 'দুর্গা' নামের প্রসিদ্ধি। তারকাসুর ও ত্রিপুরাসুর দৈত্যদ্বয়ও দেবগণকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল। দেবগণ তাহাতে মহাদেবের শরণাপন্ন হন। মহাদেব স্বয়ং ত্রিপুরা-সুরকে বধ করেন; তাহাতেই তাঁহার 'ত্রিপুরারি' 'ত্রিপুরান্তক' নাম। তারকাসুরকে দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকেয় সংহার করিয়াছিলেন। তারকাসুর সংহারের জন্য কার্ত্তিকেয়ের জন্ম হয়। তারকাসুরকে বধ করিয়াই তিনি 'তারকারি' নামে অভিহিত হন। গয়াসুর—পরম বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া, সকল পদার্থ অপেক্ষা তিনি আপন শরীরের পবিত্রতা লাভ করিয়াছিলেন। তাহাকে স্পর্শ মাত্র প্রাণিগণ চতুর্ভুজ হইয়া বৈকুণ্ঠ লাভ করিত। কিন্তু তাহাতে যমপুরী প্রাণি-শূন্য হয় দেখিয়া, দেবগণ কৌশলে গয়াসুরকে নিশ্চল করেন। পরিশেষে দেবতাগণের বরে গয়াসুর, গয়াক্ষেত্রে শিলারূপে অবস্থিত হয়। যত কাল চন্দ্র-সূর্য্য-পৃথিবী, তত কাল সেই শিলায় সর্ব্বদেবগণ অবস্থিতি করিবেন,—ইহাই স্থির হইয়া যায়। গয়াতীর্থের—গয়ামাহাত্ম্যের ইহাই মূল তত্ত্ব। গয়াসুরের প্রভাবে গয়ার মাহাত্ম্য এতই বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, গয়া-ক্ষেত্র—একণে মুক্তি-ক্ষেত্রে পরিণত। এই

ক্ষেত্রে গমন করিয়া পিণ্ডদান করিলে, পূর্ব্ব-পুরুষগণ উদ্ধার হন। গয়াধামে গমন করিয়া, কি প্রকারে শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি সম্পন্ন করিতে হয়, এবং গয়াধামের কোন্ কোন্ স্থানে কোন্ কোন্ তীর্থ অবস্থিত আছে,—বায়ুপুরাণান্তর্গত গয়া-মাহাত্ম্যে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। *

বিভিন্ন মন্বন্তরে বিভিন্ন দৈত্যগণ।

এক এক মন্বন্তরে আবার এক এক জন অসুরের প্রাধান্যের বিষয়, পুরাণাদি শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে, দৈত্য-প্রবর বাস্কলি দেবতাগণকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। ভগবান বিষ্ণু সুদর্শন চক্র দ্বারা সেই বাস্কলির সংহার-সাধন করেন। দ্বিতীয়—স্বারোচিষ মন্বন্তরে, পুরুকুৎস নামে এক প্রবল-পরাক্রান্ত দৈত্য, ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব অপহরণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল। ভগবান বিষ্ণু হস্তিরূপ ধারণ করিয়া তাহাকে সংহার করেন। তৃতীয়—ঔত্তমি মন্বন্তরে, প্রলম্ব নামে এক দৈত্য ইন্দ্রের শত্রু হইয়াছিল; বিষ্ণু মৎস্য-রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে বিনাশ করিয়াছিলেন। চতুর্থ—তামস মন্বন্তরে, ভীমরথ নামক অসুরের প্রাদুর্ভাব হয়। মধুসূদন কূর্ম্ম-রূপ ধারণ করিয়া তাহার সংহার-সাধন করেন। পঞ্চম—রৈবত মন্বন্তরে, শান্ত নামা দৈত্য ইন্দ্রত্ব অধিকারের চেষ্টা পাইয়াছিল। হংস-রূপী বিষ্ণুর হস্তে তাহার পঞ্চত্ব লাভ হয়। ষষ্ঠ—চাক্ষুষ মন্বন্তরে, মহাশাল দৈত্য দেবগণের শত্রুতা-সাধন করিয়াছিল; অশ্ব-রূপী হরি তাহাকে বিনাশ করিয়াছিলেন। সপ্তম—বৈবস্বত মন্বন্তরে, হিরণ্যাক্ষ দৈত্য প্রাদুর্ভূত হয়। ইন্দ্র-রিপু সেই দৈত্যকে বরাহ-রূপী বিষ্ণু সংহার করেন। অষ্টম—সাবর্ণি মন্বন্তরে, সুতপা, অমৃতাভ, মুখ্য প্রভৃতি অসুরগণের উৎপত্তি হইয়াছিল। ভগবান বিষ্ণু তাহাদিগের সংহার-সাধন করিয়াছিলেন। নবম—দক্ষ-সাবর্ণি মন্বন্তরে, কালকাক্ষ নামক প্রবল-পরাক্রমশালী দৈত্যের আবির্ভাব হইয়াছিল। পদ্মনাভ বিষ্ণুর হস্তে তাহার মৃত্যু হয়। দশম মন্বন্তরে, বলি নামা দৈত্য ইন্দ্রের শত্রুতাচরণ করিয়াছিল। ভগবান শ্রীহরি গদা-ঘাতে তাহার সংহার-সাধন করেন। একাদশ মন্বন্তরে, দশগ্রীব নামে রাক্ষসের প্রাদুর্ভাব হয়। শ্রী-রূপী বিষ্ণুর হস্তে তাহার পঞ্চত্ব-লাভ ঘটে। দ্বাদশ মন্বন্তরে, তারক নামক দৈত্য দেব-শত্রু হইয়াছিল। নপুংসকরূপী হরি তাহার প্রাণ-বিনাশ করেন। ত্রয়োদশ মন্বন্তরে, টিট্টিভ নামক দানব, দেবগণের শত্রুতায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ময়ূর-রূপী মাধব তাহাকে সংহার করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে, মহাদৈত্য নামে এক দৈত্যের প্রাদুর্ভাব হয়। দেবগণ বিব্রত হন। হরি স্বয়ং তাহার প্রাণ-বিনাশ করিয়াছিলেন। † এমন কত মন্বন্তরে কত দৈত্যেরই যে প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারিবে? প্রধান প্রধান কয়েক জনের বিবরণই সংক্ষেপে পুরাণাদিতে বর্ণিত হইয়াছে। নচেৎ, দৈত্য অসংখ্য, দেবতা অসংখ্য, মানব অসংখ্য, প্রাণি-পর্য্যায় অসংখ্য। দৈত্য-দানব সংহারের জন্য ভগবান বিষ্ণু যে কত রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, এবং কত অবতারে এই ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন,—এ সকল বিষয় আলোচনা করিলে, তাহারও সংখ্যা করা যায় না।

* অগ্নিপুরাণ, ১১৪শ ও ১১৫শ অধ্যায়; গরুড়পুরাণ, ৮২শ অধ্যায় হইতে ৮৬শ অধ্যায়; এবং গয়ামাহাত্ম্য প্রভৃতি গ্রন্থে গয়াসুর ও গয়া-তীর্থের মাহাত্ম্য-প্রসঙ্গ বর্ণিত আছে।

† গরুড়পুরাণ, পূর্ব্ব-খণ্ড, ৮৭শ অধ্যায়।

অসুরগণের মধ্যে আর এক প্রধান অসুর—বৃত্রাসুর। অদ্ভুত তাহার জন্ম-বিবরণ! অদ্ভুত তাহার বীরত্ব-বিক্রম! অদ্ভুত তাহার সংহার-কাহিনী। প্রজাপতি ত্বষ্টা, দৈত্য-কন্যা রচনাকে বিবাহ করেন। রচনার গর্ভে তাঁহার বিশ্বরূপ নামে এক পুত্র-সন্তান জন্মে। বিশ্বরূপ আপন প্রতিভা-প্রভাবে দেবগণের পৌরহিত্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। পুরাণে প্রকাশ,—'সেই দেব-পুরোহিত বিশ্বরূপের তিনটী মুণ্ড ছিল। তিনি একটী মুণ্ডে সোম পান করিতেন, একটী মুণ্ডে সুরা পান করিতেন, এবং অপর মুণ্ডে অন্ন ভোজন করিতেন। তিনি যজ্ঞ-কালে দেবগণকে প্রকাশ্যভাবে হবির্ভাগ প্রদান করিতেন বটে; কিন্তু মাতৃস্নেহের অনুবর্ত্তী হইয়া, মাতৃকুল অসুরদিগকেও তিনি গোপনে গোপনে যজ্ঞাংশ হবির্ভাগ দিতেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাহাতে ক্রুদ্ধ হন; বিশ্বরূপ দেবতাগণকে অবজ্ঞা করিতেছেন মনে করিয়া, ইন্দ্র তাঁহার শিরশ্ছেদ করেন। প্রজাপতি ত্বষ্টা তাহাতে ইন্দ্রের উপর রোষান্বিত হইয়া ইন্দ্র-হত্যার কামনায় যজ্ঞাহুতি প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই আহুতির দক্ষিণাগ্নি হইতে একটী ভীষণাকার অসুর উৎপন্ন হয়। তাহারই নাম বৃত্রাসুর।' কোথাও কোথাও আবার দৃষ্ট হয়,—'গয়াসুরের পুত্রের নাম বৃত্রাসুর। মহাদেবের বরে দর্পিত হইয়া, সে দেবগণের শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।' যাহা হউক, আহুতির দক্ষিণাগ্নি হইতে যে অসুরের উৎপত্তি হইয়াছিল, শাস্ত্রাদিতে দৃষ্ট হয়,—'সেই অসুরের বর্ণ তপ্ততাম্রতুল্য; লোচনদ্বয় মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের ন্যায় প্রাখর্য্য-সম্পন্ন; অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক। সেই অসুর, পদভরে ভূমণ্ডল বিকম্পিত করিয়া, ত্রিশিখ শূলদ্বয়ে স্বর্গ-মর্ত্ত্য ত্রাসিত করিয়া, ইন্দ্রবধে ধাবমান হয়।' তখন তাহার প্রভাবে ত্রিলোক আবৃত হইয়াছিল; তজ্জন্যই সে 'বৃত্র' নামে অভিহিত হয়। সেই অসুর, দেব-মানব সকলকেই কম্পমান করিয়া তুলিয়াছিল। ইন্দ্র, বহু চেষ্টা করিয়াও, বহুকাল পর্য্যন্ত তাহাকে হনন করিতে পারেন নাই। অবশেষে ইন্দ্রাদি দেবগণ, ভগবান বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইয়া, সেই অসুর-বধের জন্য প্রার্থনা করেন; বলেন,—"হে কৃষ্ণ! ত্বষ্টৃতনয় বৃত্রাসুর ত্রিভুবন-গ্রাসে উদ্যত। আমাদের অস্ত্র-শস্ত্র এবং তেজ সমস্তই সে গ্রাস করিয়াছে। আপনি তাহার সংহার-সাধন না করিলে, আর উপায়ান্তর নাই।" বিষ্ণু তাঁহাদিগকে উপদেশ দেন,—"ঋষি-শ্রেষ্ঠ দধীচি (দধ্যঙ্) তপস্যা-প্রভাবে দৃঢ়-দেহ লাভ করিয়াছেন। তাঁহার অস্থি যাচ্ঞা কর। সেই অস্থি লইয়া বিশ্বকর্ম্মা যে অস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন; সেই অস্ত্রে বৃত্রের সংহার-সাধন হইবে।"* দেবরাজ ইন্দ্র তখন সেই পরামর্শই শ্রেয়ঃ বলিয়া গ্রহণ করিলেন। তদনুসারে, মহর্ষি দধীচির নিকট গমন করিয়া, দেবগণ তাঁহার দেহ ভিক্ষা চাহিলেন। মহর্ষি দধীচি, দেবগণের প্রার্থনা-মাত্র দেহ-দানে সম্মত হইলেন; কহিলেন,—"আমার দেহ দান করিলে যদি দেবগণের উপকার হয়, দেবগণ নিষ্কণ্টক হন, পৃথিবী অসুরের উপদ্রব হইতে রক্ষা পান, আমি দেহ-দানে ধন্য হইব।" এই বলিয়া, দেবরাজের হস্তে দধীচি আপনার প্রাণ সমর্পণ করিলেন। তখন দধীচির অস্থি

বৃত্রাসুর ও অন্যান্য দৈত্যগণ।

* দেবী-ভাগবতে দৃষ্ট হয়,—ভগবতীর আরাধনায় দেবগণ আপনাদিগের আয়ুধে বল-সঞ্চার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; আর, ব্রহ্মার বরে বৃত্রাসুর ত্রিলোক-বিজয়ী হইয়াছিল।

লইয়া, বিশ্বকর্ম্মার * সাহায্যে, বজ্র প্রস্তুত হইল। আবার বৃত্রাসুরের সহিত দেবগণের তুমুল সংগ্রাম চলিল। সেই যুদ্ধে নমুচি, শম্বর, অনর্ব্বা, দ্বিমূর্দ্ধা, হয়গ্রীব, শঙ্কুশিরা, বিপ্রচিত্ত, অয়োমুখ, পুলোমা, বৃষপর্ব্বা, প্রহেতি প্রভৃতি দৈত্যগণ এবং সুমালী, মালী প্রভৃতি অসুরগণ বৃত্রের সহিত যোগদান করিয়াছিল। কিন্তু সেই যুদ্ধে তাহাদের সকল উদ্যম ব্যর্থ হয়। দধীচি-অস্থি-বিনির্ম্মিত কুলিশ-প্রহারে ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করেন। যুদ্ধের সময় অসুরেন্দ্র বৃত্র রথাদি সহ ইন্দ্রকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু নারায়ণ-কবচ, যোগবল ও মায়াবলের প্রভাবে ইন্দ্র তাহার কুক্ষি বিদীর্ণ করিয়া নির্গত হন এবং গিরিশৃঙ্গ-সদৃশ তাহার মস্তক ছেদন করেন। ক্রমাগত তিন শত ষষ্টি দিন কাল বজ্রের দ্বারা হনন করিয়া, ইন্দ্র বৃত্রাসুরের মস্তকচ্ছেদে সমর্থ হইয়াছিলেন। † বৃত্রাসুর-বধে ইন্দ্র—'বৃত্রঘ্ন' 'বৃত্রহা' প্রভৃতি সংজ্ঞা লাভ করেন, এবং দেব-গন্ধর্ব্ব-সিদ্ধর্ষিগণ তাঁহার মস্তকে পুষ্প-বৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হন। যে স্থানে মহর্ষি দধীচি দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই স্থান তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়। স্বয়ং বলরাম, সেই তীর্থে স্নান-দান-যজ্ঞ করিয়া, তাহার মাহাত্ম্য বহু গুণে বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। বৃত্রাসুর ভিন্ন, আরও বহু অসুরের বিবরণ পুরাণাদি শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়; আর, সেই সকল অসুরের সকল কাহিনীই অপূর্ব্ব রহস্য-পূর্ণ। ইন্দ্র, বহু অসুর ও দৈত্য-দানবের সংহার করিয়াছিলেন; যুগে যুগে অবতারগণ আবির্ভূত হইয়াও বহু দৈত্য-দানব-অসুরের সংহার-সাধন করেন; মনুজ-রাজন্য-বর্গের হস্তেও বহু দৈত্য-দানব-নিপাতের সমাচার অবগত হওয়া যায়। এক শ্রীকৃষ্ণই কত দৈত্য-দানবের সংহার করিয়াছিলেন! পুতনা, বৎসাসুর, বকাসুর, অঘাসুর, তৃণাবর্ত্ত প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হইয়াছিল। শ্রীরামচন্দ্র কৈশোরে তারকা রাক্ষসীকে বধ করিয়াছিলেন। যৌবনে রাবণাদি রাক্ষসগণ তাঁহার হস্তে নিধন-প্রাপ্ত হয়।

রূপকে বৃত্রাসুর প্রভৃতি।

পুরাণাদি শাস্ত্রে দৈত্য-দানব-প্রসঙ্গে বহু রূপকের সৃষ্টি হইয়া আছে। অনেকে অনেক সময় সে রূপক উদ্ঘাটন করিবার প্রয়াস পান। দুই একটী দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছি। দেবী ভগবতী 'দুর্গমাসুর' বা 'দুর্গাসুর' বধ করিয়াছিলেন,—পুরাণে লিখিত আছে। কিন্তু যাঁহারা 'দুর্গমাসুর'-বধ রূপক বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা বলেন,—"বাস্তবপক্ষে 'দুর্গমাসুর' বা 'দুর্গাসুর' বলিয়া কোনও অসুর ছিল না। মানুষের আধি-ব্যাধি-শোক-তাপ প্রভৃতি দুর্গতিকে এখানে অসুর-রূপে কল্পনা করা হইয়াছে। ভগবতী দুর্গার শরণাপন্ন হইলে, তিনি সেই সকল

* প্রজাপতি ত্বষ্টার অপর নাম—'বিশ্বকর্ম্মা।' কোনও কোনও পুরাণে দেখিতে পাই, ইন্দ্র-বধের জন্য বৃত্রাসুরকে সৃষ্টি করিয়াও, তাহার কলুষ-চরিত্রে বিশ্বকর্ম্মা তাহার প্রতি বিরূপ হইয়াছিলেন। তাই শেষে তিনি বৃত্রের সংহার-সাধন জন্য বজ্র-নির্ম্মাণে সহায়তা করিয়াছিলেন।

† দেবীভাগবতের মতে,—ইন্দ্র বঞ্চনা করিয়া বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন। বৃত্র, ব্রহ্মার নিকট বর পাইয়াছিল,—দিবাভাগে কিংবা রাত্রিকালে তাহার মৃত্যু হইবে না এবং শুষ্ক বা আর্দ্র কোনও প্রকার শস্ত্রে তাহার মৃত্যু হইবে না। যুদ্ধের সময় ইন্দ্র সন্ধির ছলে কৌশলে বৃত্রের মরণোপায় জানিয়া লন। দিবা ও রাত্রির সন্ধি-মুহূর্ত্তে, সাগর-জলের পর্ব্বতোপম জলফেন লইয়া, সেই ফেনাবৃত বজ্রের দ্বারা তিনি বৃত্রকে হনন করেন।

দুর্গতি দূর করেন। দেবী সেই জন্যই 'দুর্গা' নামে অভিহিতা।" ইন্দ্র এবং বৃত্রাসুর সম্বন্ধেও এই প্রকার এক রূপক-ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। সে ব্যাখ্যা—বড়ই কৌতুকাবহ। ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলে দ্বাত্রিংশ সূক্তে অঙ্গিরার পুত্র হিরণ্যস্তূপ ঋষি, ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন,—"বজ্রধারী ইন্দ্র প্রথমে যে পরাক্রমের কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন তাঁহার সেই কর্ম্ম-সমূহ বর্ণনা করি। তিনি অহিকে (মেঘকে) হনন করিয়াছিলেন। পর বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলেন, বহনশীল পর্ব্বতীয় নদীসমূহের (পথ) ভেদ করিয়া দিয়াছিলেন। ১। ইন্দ্র পর্ব্বতাশ্রিত অহিকে হনন করিয়াছিলেন; ত্বষ্টা, ইন্দ্রের জন্য সুদূরপাতী বজ্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; (তৎপর) যেরূপ গাভী সবেগে বৎসের দিকে ধায়, ধারাবাহী জল সেইরূপ সবেগে সমুদ্রাভিমুখে গমন করিয়াছিল। ২। ... ... জগতের আবরণকারী বৃত্রকে ইন্দ্র মহাধ্বংসকারী বজ্র দ্বারা ছিন্নবাহু করিয়া বিনাশ করিলেন, কুঠার-ছিন্ন বৃক্ষ-স্কন্ধের ন্যায় অহি পৃথিবী স্পর্শ করিয়া পড়িয়া আছে। ৫। দর্পযুক্ত বৃত্র (আপনার সমতুল) যোদ্ধা নাই (মনে করিয়া) মহাবীর ও বহু-বিনাশী ও শত্রুবিজয়ী ইন্দ্রকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিল। ইন্দ্রের বিনাশ-কার্য্য হইতে রক্ষা পাইল না, ইন্দ্র-শত্রু বৃত্র (নদীতে পতিত হইয়া) নদী-সমুদয় পিষিয়া ফেলিল। ৬। হস্তপদশূন্য বৃত্র ইন্দ্রকে যুদ্ধে আহ্বান করিল, ইন্দ্র তাহার সানু (তুল্য প্রৌঢ় স্কন্ধে) বজ্র আঘাত করিলেন; যেরূপ পুরুষত্বহীন ব্যক্তি পুরুষত্ব-সম্পন্ন ব্যক্তির সাদৃশ্য লাভ করিতে বৃথা যত্ন করে, বৃত্রও সেইরূপ (বৃথা যত্ন করিল), বহু স্থানে ক্ষত হইয়া বৃত্র ভূমিতে পড়িল *। ৭।" এই সূক্তের অন্যান্য শ্লোকেও বৃত্রের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ-কাহিনী এইরূপ-ভাবেই বিবৃত আছে। যাহা হউক, এই সূক্তের ব্যাখ্যায়, সায়ণাচার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া, ম্যাক্সমুলার, উইলসন এবং রমেশ চন্দ্র দত্ত প্রমুখ বেদ-ব্যাখ্যাকারিগণ প্রায় সকলেই বলিয়া গিয়াছেন,—"বৃত্র ও ইন্দ্রের যুদ্ধ-ব্যাপার—রূপক-মাত্র; পুরাণে বজ্র, বৃষ্টি ও মেঘকে এইরূপে রূপকে প্রকাশ করা হইয়াছে।" এই বিষয়ে রমেশচন্দ্রের ঋগ্বেদ-সংহিতার টীকার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি,—"পুরাণে যে বৃত্র নামক অসুরের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ-সম্বন্ধীয় আখ্যান আছে, তাহার উৎপত্তি আমরা এই সূক্তে (প্রথম মণ্ডলের দ্বাত্রিংশ সূক্তে) পাই। মেঘের নাম বৃত্র বা অহি, ইন্দ্র মেঘকে বজ্র দ্বারা আঘাত করিয়া বৃষ্টি বর্ষণ করিতেছেন, এইরূপ উপলব্ধি করিয়া ঋগ্বেদের ঋষিগণ উপমা ও কল্পনা-পূর্ণ কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে পৌরাণিক অসুরের গল্প উৎপন্ন। ... ... একই বস্তুকে (মেঘকে) এখানে একবার বৃত্র এবং একবার অহি বলা হইয়াছে। তাহারা ভিন্ন অসুর নহে। বৃ ধাতু হইতে বৃত্র, আবরণার্থে। হন ধাতু হইতে অহি, হননার্থে। ... ... 'অহিং মেঘং।' সায়ণ।" † মহর্ষি দধীচির নাম ঋগ্বেদে একাধিক বার উল্লেখ আছে। প্রথম মণ্ডলের চতুরশীতিতম সূক্তে দেখিতে পাই, রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি ইন্দ্রের স্তবে বলিতেছেন,—"অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইন্দ্র, দধীচি ঋষির অস্থি

---

* অধ্যাপক উইলসন্ এই স্থানের অর্থ এইরূপ লিখিয়াছেন,—The banks "were broken down by the fall of *Vritra*, i. e. by the inundation occasioned by the descent of the rain".—*Wilson.*

† রমেশচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক অনূদিত 'ঋগ্বেদ-সংহিতা', প্রথম মণ্ডল, দ্বাত্রিংশ সূক্ত, টীকা ও বঙ্গানুবাদ দ্রষ্টব্য

দ্বারা, বৃত্রগণকে নবনবতিবার বধ করিয়াছিলেন।" ঐ মণ্ডলেরই আর এক সূক্তে (ষোড়শাধিক শততম সূক্তে) দীর্ঘতমার পুত্র কক্ষিবান ঋষি, অশ্বিদ্বয়ের প্রার্থনায় বলিতেছেন,—"হে নেতৃদ্বয়! যেমন মেঘ-গর্জ্জন (আসন্ন) বৃষ্টি প্রকটিত করে, আমি ধনলাভার্থ তোমাদের সেই উগ্রকর্ম্ম সেইরূপে প্রকটিত করিতেছি যে অথর্ব্বার পুত্র দধীচি (ঋষি) অশ্বমস্তক ধারণ করিয়া তোমাদিগকে মধুবিদ্যা শিখাইয়াছিলেন।" * কি সায়ণ, কি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ—এ দুই স্থলের টীকায়, কেহই কিন্তু মেঘের সহিত বৃত্রের অভিন্নত্ব প্রতিপন্ন করিতে পারেন নাই। সকলেই বলিয়াছেন,—'এ স্থানের অর্থ উদ্ধার করা দুরূহ।' সায়ণ বলিয়াছেন,—'এই দুই স্থলে কেবল পৌরাণিক প্রসঙ্গই মনে পড়ে।' সকল রূপকের তাৎপর্য্য-গ্রহণ সম্ভবপর নহে, এবং আবশ্যকানুরূপ সকল জিনিষকেই রূপক বলিয়া মনে করাও সমীচীন নহে।

রূপক যে একেবারে নাই, তাহাও বলিতে পারি না। এদিকে আবার দৈত্য, দানব, অসুর, রাক্ষস প্রভৃতি সম্বন্ধে সাধারণ লোকের যাহা ধারণা আছে, পুরাণাদি শাস্ত্র-গ্রন্থ আলোচনা করিলে, সে ধারণাও ঠিক বলিয়া মনে করিতে পারি না। তবে দৈত্য-দানব-অসুর-রাক্ষস বলিতে আমরা প্রকৃত কি অর্থ উপলব্ধি করিতে পারি? আমরা দেখিতে পাই,—দানব-দুহিতা শচী, দেবরাজ ইন্দ্রের মহিষী! আমরা দেখিতে পাই,—সূর্য্যবংশাবতংস যযাতির পত্নী যে শর্ম্মিষ্ঠা, তাঁহা হইতেই পুরু-বংশের উৎপত্তি। তার পর আরও দেখিতে পাই,—একই কশ্যপের ঔরসে, প্রজাপতি দক্ষের ভিন্ন ভিন্ন কন্যার গর্ভে, যখন দেবতা ও দানব-দৈত্যাদির উৎপত্তি হইতেছে; তখনই বা কি মনে হয়? পিতা হিরণ্যকশিপু বিষ্ণুদ্বেষী বলিয়া উপেক্ষিত হইতেছেন; আর তাঁহারই পুত্র হরি-পরায়ণ প্রহ্লাদ দেবতার ন্যায় সম্মান পাইতেছেন! একই বংশের রাবণ, একই বংশের কুম্ভকর্ণ, একই বংশের ইন্দ্রজিৎ, আবার সেই একই বংশের বিভীষণ, লোকনয়নে কিরূপ-ভাবে চিত্রিত হইয়াছেন,—কে না তাহা বুঝিতে পারেন? হইতে পারে, অথবা আমরা বুঝিতে না পারি, কতকগুলি রূপক! কিন্তু তাই বলিয়া সকলগুলিই রূপক হইতে পারে না। ধর্ম্মবৈগুণ্যে, আচার-বৈগুণ্যে, ব্যবহার-বৈগুণ্যে পরিচয়ের বিভিন্নতা ঘটিয়াছে। নচেৎ, দৈত্য-দানব-রাক্ষস প্রভৃতিকেও মনুষ্য ভিন্ন অন্য কিছু কল্পনা করিবার উপায় দেখি না। ফলতঃ, যাহারা দৈত্য, দানব, রাক্ষস বা অসুর নামে অভিহিত, তাহারাও মানুষ;—ধর্ম্মহীন, আচারহীন, মনুষ্য যেরূপ পশুর মধ্যে পরিগণিত, তাহারাও সেইরূপ মানুষ হইয়াও রাক্ষসাদি নামে পরিচিত।

দৈত্যাদির তাৎপর্য্য।

* দধীচি পরার্থে প্রাণ-সমর্পণ করিয়াছিলেন;—প্রধানতঃ ইহাই প্রকাশ। কিন্তু কোনও কোনও পুরাণে আবার ইহাতেও মতান্তর দৃষ্ট হয়। সে মত,—ইন্দ্র, দধীচিকে মধুবিদ্যা (বেদের 'ব্রাহ্মণ' অংশ) এবং প্রগব্য-বিদ্যা (ঋক,সাম,যজু) শিক্ষা দিয়াছিলেন। শিক্ষাদানের সময় সর্ত্ত হইয়াছিল, দধীচি যদি ঐ বিদ্যা অপর কাহাকেও শিক্ষা দেন, ইন্দ্র তাঁহার মস্তক ছেদ করিবেন। অশ্বিদ্বয় (দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমার-দ্বয়) সেই দুই বিদ্যা দধীচির নিকট হইতে শিখিয়া লইয়াছিলেন। বিদ্যা শিক্ষার পর, তাঁহারা দধীচির মস্তক ছেদন করিয়া, সেই মস্তক অন্য স্থানে রাখিয়া আসিয়া, তাঁহার দেহে অশ্ব-মস্তক সংযোজন করাইয়া দেন। সেই সময়, দধীচি সর্ত্ত ভঙ্গ করায়, ইন্দ্র বজ্র দ্বারা তাঁহার মস্তক ছেদন করেন। অশ্বিদ্বয় তাহা জানিতে পারিয়া, যে মুণ্ড পূর্ব্বে তাঁহারা কাটিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা আনয়ন করিয়া দধীচির মস্তকে পুনর্যোজনা করিয়া দেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

বংশ-পর্য্যায় আলোচনা।

[বংশ-পর্য্যায় আলোচনায় ঘোর অসামঞ্জস্য,—রাম, যুধিষ্ঠির, বলরাম, অভিমন্যু, বৃহদ্বল, রেবতী প্রভৃতির পর্য্যায় আলোচনা,—বংশ-পর্য্যায়ে বিসদৃশ ;—বুঝিবার ভ্রান্তি,—টডের হিসাব,—মিশর ও ভারতে তুলনা,—মিশর, চীন ও আসিরীয় রাজ্যের প্রতিষ্ঠা-প্রসঙ্গে ভারতের প্রাচীনত্ব-তত্ত্ব,—'মেনেস'—সম্ভবতঃ মনুর নামান্তর,—ভারতীয় নৃপতিগণের বংশ-পর্য্যায়ে ক্রমভঙ্গ,—সূর্য্যবংশীয় নৃপতিগণ কর্তৃক মিশরে উপনিবেশ স্থাপনের প্রসঙ্গ,—পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতালোচনা ;—সূর্য্যবংশের বংশ-লতায় নাম-পর্য্যায়ে অসামঞ্জস্য,—ইক্ষ্বাকু-কুলোত্তম শ্রীরামচন্দ্র, রঘু, দিলীপ, মান্ধাতা, সগর, ভগীরথ প্রভৃতি ;—মনুর অপরাপর পুত্রের প্রসঙ্গ,—মিথিলার রাজ-বংশ আলোচনায় অসামঞ্জস্য,—চন্দ্রবংশে ইলার প্রসঙ্গ,—সুদ্যুম্নের অলৌকিক উপাখ্যান ;—পুরূরবার পুত্র ও পৌত্রগণের নাম ও বংশ-বিষয়ে অনৈক্য,—চন্দ্রবংশের অন্যান্য প্রধান প্রধান নৃপতিগণ,—নহুষ, যযাতি, যদু, তুর্ব্বসু, দ্রুহ্য, অণু, পুরু, দুষ্মন্ত, ভরত, অজমীঢ়, কুরু, যুধিষ্ঠির, জনমেজয় প্রভৃতি ;—গাধি, বিশ্বামিত্র, পরশুরাম, ধন্বন্তরি, দিবোদাস, অলর্ক ;—কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন, বসুদেব, শ্রীকৃষ্ণ, দেবমীঢ়, উগ্রসেন, কংস, জরাসন্ধ প্রভৃতি ;—বংশ-পর্য্যায় আলোচনায় বিবিধ বক্তব্য।]

বিষম সমস্যা—বংশ-পর্য্যায় আলোচনায় ! অনন্ত অসীম-কাল-পারাবার—অল্পায়ু অল্প-বুদ্ধি মানুষের পরিমাণ-দণ্ডে বুঝি তাহার পরিমাপ করা দুঃসাধ্য ! একই বেদব্যাসের রচিত পুরাণ-সমুদ্র মন্থন করিয়া, আমরা সূর্য্যবংশের ও চন্দ্রবংশের

বিষম সমস্যা।

বংশ-লতা উদ্ধার করিয়াছি। কিন্তু কি আশ্চর্য্য !—একটীর সহিত অপরটীর অনেক স্থলেই ঐক্য নাই। মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণে সূর্য্যবংশের ধুরন্ধর নৃপতিগণের ইতিহাস বর্ণিত আছে ; বেদব্যাসের পুরাণ-রচনার পূর্ব্ববর্ত্তি-কালে বাল্মীকির রামায়ণ রচিত হইয়াছিল ;—এ প্রসঙ্গ আমরা পূর্ব্বেই উত্থাপন করিয়াছি। কিন্তু সেই রামায়ণে সূর্য্যবংশের যে বংশ-লতা প্রকটিত, তাহার সহিত পুরাণোক্ত বংশ-লতার কি অসামঞ্জস্যই রহিয়া গিয়াছে ! বৈবস্বত মনু হইতে রামায়ণের শ্রীরামচন্দ্র দ্বাত্রিংশ পর্য্যায়ে অবস্থিত ; কিন্তু বৈবস্বত মনু হইতে ব্রহ্মপুরাণের রামচন্দ্র অষ্ট-পঞ্চাশৎ পর্য্যায়ে, বিষ্ণুপুরাণের রামচন্দ্র চতুঃষষ্টিতম পর্য্যায়ে, হরিবংশের রামচন্দ্র চতুঃপঞ্চাশৎ পর্য্যায়ে, অগ্নিপুরাণের রামচন্দ্র এক-পঞ্চাশৎ পর্য্যায়ে, শিবপুরাণের রামচন্দ্র পঞ্চাশৎ পর্য্যায়ে, শ্রীমদ্ভাগবতের রামচন্দ্র ত্রিষষ্টিতম পর্য্যায়ে, বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের রামচন্দ্র ষট্‌ত্রিংশৎ পর্য্যায়ে বিদ্যমান। সূর্য্যবংশের গৌরব-চূড়া শ্রীরামচন্দ্র-সম্বন্ধেই এই পার্থক্য ! অন্যান্যের সম্বন্ধে যে অশেষ পার্থক্যের সম্ভাবনা, তাহা সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে। এইরূপ, চন্দ্রবংশের বংশ-লতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও একের সহিত অপরের কচিৎ ঐক্য দেখিতে পাই। যে যুধিষ্ঠিরাদির প্রসঙ্গ চন্দ্রবংশের মেরুদণ্ড-স্থানীয়, মহাভারতে দেখিতে পাই, চন্দ্র-পুত্র বুধ হইতে সেই যুধিষ্ঠিরাদি অষ্টাবিংশ পর্য্যায়ে অবস্থিত। এদিকে আবার সেই বুধ হইতে হরিবংশের যুধিষ্ঠির চতুস্ত্রিংশ পর্য্যায়ে, বিষ্ণুপুরাণের যুধিষ্ঠির সপ্তচত্বারিংশ পর্য্যায়ে, শ্রীমদ্ভাগবতের যুধিষ্ঠির ষড়চত্বারিংশ পর্য্যায়ে, অগ্নিপুরাণের যুধিষ্ঠির ষট্‌ত্রিংশৎ পর্য্যায়ে,

ব্রহ্মপুরাণের যুধিষ্ঠির পঞ্চত্রিংশৎ পর্য্যায়ে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। কেবল কি এই পার্থক্য! কোথাও আবার দেখিতে পাই, সত্য-ত্রেতা যুগে যাঁহারা বিদ্যমান ছিলেন, তাঁহাদের বংশ-পর্য্যায় অপেক্ষা, তাহারই পরবর্ত্তী দ্বাপর বা কলিযুগের কোনও কোনও পুরুষের বংশ-পর্য্যায় কম রহিয়া গিয়াছে। একটী দৃষ্টান্ত প্রদান করিতেছি;—বৈবস্বত মনুর অধস্তন চতুর্থ পর্য্যায়ে, সূর্য্যবংশে, রেবত রাজা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার কন্যার নাম—রেবতী। পুরাণ-সমূহে দৃষ্ট হয়,—যদু-বংশের বলরামের সহিত সেই রেবতীর বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু বলরাম অন্যূন চন্দ্রবংশের ষড়পঞ্চাশৎ পর্য্যায়ে বিদ্যমান। এদিকে আবার দেখিতে পাই,—সূর্য্যবংশের শততম পর্য্যায়ের বৃহদ্বল, চন্দ্র-বংশ-সম্ভূত ত্রিংশ-পর্য্যায়-ভুক্ত অভিমন্যুর হস্তে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে নিহত হন। শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, অভিমন্যু প্রভৃতি, তাহা হইলে, বৃহদ্বলের সম-সাময়িক। একই সূর্য্যবংশের শততম পর্য্যায়ের বৃহদ্বল, সে হিসাবে, সেই একই বংশের পঞ্চম পর্য্যায়-ভুক্ত রেবতীর সম-সাময়িক হইয়া পড়িতেছেন। ইহা বড়ই বিসদৃশ! পুরাণের রূপকে অবশ্য রেবতী ও বলরামের বিবাহ-সম্বন্ধে একটী অলৌকিক উপাখ্যানের অবতারণা হইয়াছে।* কিন্তু সে উপাখ্যান মানিয়া লইতে হইলে, রেবতী লক্ষ লক্ষ বৎসর জীবিত ছিলেন, এবং তাঁহার ষড়নবতিতম অধস্তন পর্য্যায়-ভুক্ত লক্ষ লক্ষ বৎসরের বয়ঃকনিষ্ঠ বলরামকে বিবাহ করিয়াছিলেন,—স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু সাধারণ দৃষ্টিতে তাহাও বিসদৃশ নহে কি?

এই বংশ-পর্য্যায় আলোচনায় শাস্ত্রতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মস্তিষ্ক বিচলিত হইয়া যায়। অপরে এ তত্ত্ব সহজে কিরূপে নির্ণয় করিবে? এই বংশ-তত্ত্ব আলোচনা করিতে গিয়াই, আধুনিক পণ্ডিতগণ প্রধানতঃ ভ্রমে নিপতিত হন; আর, তাহারই ফলে, ভারতের প্রাচীনত্ব এত আধুনিক বলিয়া মনে করেন! বুঝিবার ভুলেই এরূপ ঘটিয়া থাকে। নচেৎ, ইচ্ছা করিয়া যে কেহ ভারতের প্রাচীনত্বে সন্দিহান হন,† তাহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। অপরের কথা বলিব কি? যে কর্ণেল টড্, ভারতের গৌরব-গরিমায় মুগ্ধ হইয়া, রাজস্থানের ইতিবৃত্ত প্রণয়ন করেন; তাঁহার ন্যায় সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত সহৃদয় ব্যক্তিও এই ভ্রমের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান নাই। চন্দ্র-সূর্য্য-বংশের বংশলতার আলোচনায়, ভারতের প্রাচীনত্ব নির্ণয় করিতে গিয়া, তিনি 'রাজস্থানে' লিখিয়াছেন,—"বৈবস্বত মনু হইতে শ্রীরামচন্দ্র পর্য্যন্ত সূর্য্যবংশীয় সপ্তপঞ্চাশৎ জন নৃপতি রাজত্ব করিয়াছিলেন; বেদব্যাসের বিবরণে ইহাই প্রতিপন্ন হয়। এ পর্য্যন্ত আমি যে সকল বংশ-তালিকা দেখিয়াছি ও সংগ্রহ করিয়াছি, তাহার কোনটীতেই ঐ সময়ে অষ্ট-পঞ্চাশৎ জনের অধিক চন্দ্রবংশীয় নৃপতির পরিচয় পাওয়া যায় না।" এই বলিয়া, আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া, কর্ণেল টড্ পুনরায় লিখিয়াছেন,—"মিশর-দেশীয় রাজন্যবর্গের বংশ-পর্য্যায়ের সহিত ইহার কত পার্থক্য! হেরোডোটাস্, মিশর-দেশীয় পুরোহিতগণের গ্রন্থ-পত্র হইতে জানিতে

বুঝিবার ভ্রান্তি!

---

* এই গ্রন্থের ৩৪৮শ পৃষ্ঠায় বলরাম ও রেবতীর বিবাহ-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

† 'টাইমস' আফিস হইতে প্রকাশিত "হিষ্টোরিয়ান্‌স্ হিষ্ট্রি অব দি ওয়ার্ল্‌ড" (Historians' History of the World) প্রভৃতি গ্রন্থে মিশরের সভ্যতাকে ভারতবর্ষের সভ্যতা অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

পারিয়াছেন,—সেই দেশের প্রথম রাজা 'সূর্য্য-পুত্র মেনেস' হইতে তিন শত ত্রিশ জন নৃপতি ভারতবর্ষীয় সূর্য্য-চন্দ্র-বংশ-সমুদ্ভূত নৃপতিগণের সম-সময়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন। * মিশর দেশের প্রাচীন অধিবাসিগণ আপনাদিগকে সূর্য্য-বংশের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিত। কিন্তু সে দেশে সে সময়ে যত নৃপতি রাজত্ব করিয়াছিলেন, এ দেশে সেই সময়ে তত নৃপতির পরিচয় পাওয়া যায় না। ভারতের প্রাচীনত্ব বিষয়ে সংশয়ান্বিত হইবার ইহাই প্রধান কারণ।" এই সংশয়-বশেই, অনেকে মিশর দেশের সভ্যতা, প্রাচীন আসিরীয় দেশের সভ্যতা এবং প্রাচীন চীনের সভ্যতা, ভারতের সভ্যতা অপেক্ষা অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অবশ্য কর্ণেল টড্ স্পষ্ট করিয়া তাহা কিছু বলেন নাই; পরন্তু তিনি বলিয়াছেন,—"বুধ হইতে শ্রীকৃষ্ণ বা যুধিষ্ঠির পর্য্যন্ত গড়ে পঞ্চান্ন জন নৃপতির বিদ্যমানতা স্বীকার করিয়া লইলে, এবং তাঁহাদের প্রত্যেকের রাজত্ব-কাল গড়ে কুড়ি বৎসর করিয়া ধরিলে, সর্ব্বশুদ্ধ তাঁহাদের রাজত্ব-কালের পরিমাণ এগার শত বৎসর হয়। তাহার প্রায় এগার শত বৎসর পরে, রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব-কাল। বিক্রমাদিত্য খৃষ্ট-জন্মের ছাপ্পান্ন বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। তাহা হইলে চন্দ্রবংশের ও সূর্য্যবংশের আদিভূত রাজগণ খৃষ্ট-জন্মের ২২৫৬ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারই সম-সময়ে অথবা কিছু পরে, মিশর, চীন এবং আসিরীয় দেশের রাজন্যবর্গ প্রতিষ্ঠান্বিত হন। মিশরের রাজা 'মিস্রেমের' শাসনকাল—২১৮৮ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে; আসিরীয় দেশের প্রতিষ্ঠা—২০৫৯ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে; এবং চীনদেশের প্রাধান্য—২২০৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে। জলপ্লাবনের প্রায় দেড় শত বৎসর পরে, ঐ সকল দেশ প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়াছিল।" যে বিষয়ে কর্ণেল টড্ সংশয়ান্বিত, তৎসম্বন্ধে দুইটী কথা বলা যাইতে পারে। প্রথম, তিনি যে বলিয়াছেন,—একই সূর্য্যবংশ-সমুদ্ভূত বলিয়া পরিচয় দিয়া, একই নির্দ্দিষ্ট কালে, মিশরেই বা কি করিয়া তিন শতাধিক নৃপতির অভ্যুদয় দেখিতে পাই; আর ভারতবর্ষেই বা কেন সেই সময়ে গড়ে মাত্র পঞ্চ-পঞ্চাশৎ জন নৃপতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়! সে আলোচনায়, পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, ভারতবর্ষের পুরাণেতিহাসে পর-পর সকল নৃপতির নাম উল্লেখ হয় নাই,—কর্ম্মানুসারে যেখানে যাঁহার নাম উল্লেখ করার প্রয়োজন হইয়াছে, শাস্ত্রকারগণ সেখানে তাঁহারই নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন মাত্র; ধারাবাহিক বংশ-পর্য্যায় রক্ষা করিয়া, ভারতবর্ষীয় নৃপতিগণের-সকলের নাম কোথাও উল্লেখ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তার পর, কর্ণেল টড্ বা আধুনিক পণ্ডিতগণ কেবলমাত্র বৈবস্বত মন্বন্তরের কয়েকটী নৃপতির প্রসঙ্গ লইয়া উক্তরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

---

* কর্ণেল টড রাজস্থানে লিখিয়াছেন,—"Vyasa gives but fifty-seven princes of the Solar line from Vaivaswata Manu to Ram; and no list which has come under my observation exhibits more than fifty-eight for the same period, of the Lunar race. How different from the Egyptian priesthood, who according to Herodotus, gave a list up to that period of 330 sovereigns from their first prince, also the *Sun-born Menes*!"—See *Lt, Colonel James Tod, Rajasthan, Ch III.*

[কশ্যপ-পুত্র বিবস্বান সূর্য্য, সূর্য্য-বংশের আদিভূত। এই গ্রন্থের চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদে, ৩৪১ পৃষ্ঠার ৯ম পংক্তিতে, "কশ্যপের পৌত্র বিবস্বান" স্থলে "কশ্যপ-পুত্র বিবস্বান সূর্য্য" ইত্যাদি পাঠ হইবে।]

কিন্তু বৈবস্বত মন্বন্তরের পূর্ব্বে স্বায়ম্ভুব স্বারোচিষাদি মন্বন্তরেও কত কত নৃপতি জন্ম-গ্রহণ করিয়া দিকে দিকে আপনাদিগের প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তবে সে নিদর্শন মিশরের প্রাচীন ইতিহাসে যখন দেখিতে পাই না, তখন বৈবস্বত মন্বন্তরেরই কোনও এক যুগ-বিশেষে মিশর উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল,—স্বীকার করিয়া লইতে হয়। কিন্তু তাহা হইলেই বা দুই দেশের নৃপতিগণের সংখ্যার এত তারতম্য কেন? তদ্বিষয়েও বক্তব্য আছে। পুরাণসমূহ হইতে আমরা যে বংশ-লতা প্রকাশ করিয়াছি, সেই বংশ-লতায় নাম নাই, অথচ পুরাণের অন্যত্র তাঁহাদের বিবরণ পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে,—এমন কত নৃপতিরই পরিচয় পাওয়া যায় না কি? বংশ-লতার কোন্ অংশে তাঁহাদের স্থান আছে, তাহা নির্দ্দেশ করা যায় না বটে; কিন্তু তাঁহাদের অস্তিত্ব ও প্রাধান্যের বিষয় কখনই উপেক্ষিত হইবার নহে। নল-দয়মন্তী, শ্রীবৎস-চিন্তা, সাবিত্রী-সত্যবান প্রভৃতির প্রসঙ্গ হিন্দুমাত্রেই অবগত আছেন।* কিন্তু নল, শ্রীবৎস বা সত্যবান প্রভৃতির নাম বংশ-তালিকায় কোন্ স্থান অধিকার করিয়া আছে, কে তাহা নির্ণয় করিবে? সুরথ, সমাধি, দ্যুমৎসেন, ইন্দ্রদ্যুম্ন, সুদর্শন, ধ্রুবসন্ধি প্রভৃতি—কত নাম করিব—নৃপতিগণের কীর্ত্তি-কাহিনী পুরাণে উল্লেখ আছে। কিন্তু কোন্ পর্য্যায়ের কোথায় তাঁহাদের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইবে, কেহ বলিতে পারেন কি? তবেই বুঝা যায়,—ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসে নৃপতিগণের বংশ-পর্য্যায়ে নিশ্চয়ই ক্রম-ভঙ্গ হইয়া আছে; আর সেই জন্যই মিশর প্রভৃতির সহিত ভারতীয় প্রাচীন নৃপতি-গণের সংখ্যার তারতম্য ঘটিয়াছে। তার পর, আরও এক কথা! যোগবলে, কর্ম্মফলে, মানুষ দীর্ঘ-জীবন লাভ করে। পুরাণাদিতে দৃষ্ট হয়,—কেহ ষষ্টি সহস্র বৎসর, কেহ বহু অযুত বৎসর, কেহ লক্ষ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। স্থূল দৃষ্টিতে অসম্ভব বলিয়া মনে হওয়া আশ্চর্য্য নহে; কিন্তু এ জগতে যে অসম্ভব কিছু ছিল বা হইতে পারে, তাহা কদাচ স্বীকার করিতে প্রবৃত্তি হয় না। দুই দশ বৎসরের মধ্যেই যখন দেখিতে পাই,—আজ যাহা 'অসম্ভব' বলিয়া মনে করিতেছি, কাল তাহা 'সম্ভব' হইয়া যাইতেছে; তখন দূর অতীতের—সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বের—'সম্ভবাসম্ভব' বিচারের কি সাধ্য আছে? তার পর, সূর্য্যপুত্র 'মেনেস'—মনুরই নামান্তর হওয়া সম্ভবপর। স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র রাজা প্রিয়ব্রত যখন আপন পুত্রগণের মধ্যে পৃথিবী ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন; বর্ত্তমান আফ্রিকা মহাদেশ বা তদন্তর্গত প্রাচীন মিশর নামান্তরে প্রিয়ব্রতের এক পুত্রের শাসনাধীনে ছিল। তবে তখনও সে দেশ 'মিশর' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। যদি সূর্য্যপুত্র 'মেনেসের' বংশধরগণই মিশরের প্রতিষ্ঠাতা হন, তাহা হইলে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরাদি অতি-দূর অতীতের সম্বন্ধ-তত্ত্ব নির্ণয়-পক্ষে চেষ্টা না করাই শ্রেয়ঃ। সে হিসাবে বুঝা যায়, বৈবস্বত মন্বন্তরে সগর, মান্ধাতা প্রভৃতি যে সকল নৃপতি পৃথিবী জয় করিয়া আপন পুত্রগণের মধ্যে তাহা বণ্টন করিয়া দিয়াছিলেন; তাঁহারাই কেহ মিশর-রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হইবেন। মিশর-রাজ্য যে হিন্দুগণের উপনিবেশ-রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের জ্ঞান-গবেষণা-প্রভাবেও এখন তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। 'থিওজফিকাল সোসাইটীর' প্রাণভূত

* এই গ্রন্থের অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে 'অন্যান্য নৃপতিগণের বিবরণ'-প্রসঙ্গে তাঁহাদের পরিচয় দ্রষ্টব্য।

কর্ণেল অল্‌কট্‌, মিশরের সহিত ভারতের সম্বন্ধ-তত্ত্ব-নির্ণয়-প্রসঙ্গে, বলিয়াছেন,—"আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি, আট সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষ হইতে ঔপনিবেশিকগণ মিশরে গমন করিয়া সভ্যতা ও শিল্প-কলা বিস্তার করিয়াছিলেন। প্রথিত-যশা প্রত্নতত্ত্ববিৎ 'ব্রুগস্ বে' প্রাচীন মিশরের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই কথাই বলিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান কালে, মিশর-সম্বন্ধে তাঁহার সিদ্ধান্তই অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য। তিনি স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়াছেন,—'ইতিহাসের স্মরণাতীত কালে এক দল ভারতবাসী সুয়েজ যোজক অতিক্রম করিয়া নীল-নদের তীরে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন।' মিশর দেশের পুরাতত্ত্ব আলোচনা করিলে, বেশ বুঝিতে পারা যায়,—মিশরবাসীরা 'পন্থ' নামক যে পবিত্র দেশ হইতে নীল-নদের উপত্যকায় আসিয়া বাস করিয়াছিল, সেই পবিত্র 'পন্থ' দেশ—ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য কোনও দেশ হইতে পারে না। তাঁহাদের সেই 'পন্থ' দেশ, ভারত-মহাসাগরের তীরে অবস্থিত ছিল, এবং সেই দেশ হইতে তাঁহাদের দেবতারাও মিশরে আগমন করিয়াছিলেন,—এখন নানারূপেই তাহা প্রমাণিত হইতেছে।......'দার-এল-বাবরি' সহরে, 'রাণী হাস্‌লিটপের' মন্দিরের প্রাচীর-পাত্রে যে সাঙ্কেতিক চিত্রাক্ষর দৃষ্ট হয়,—তাহাতেও 'পন্থ'কে ভারতবর্ষেরই প্রদেশ-বিশেষ ভিন্ন অন্য কিছু বলা যায় না। প্রাচীন মিশরীয়গণ বহুকাল পর্য্যন্ত আপনাদের আদি-বাসস্থান ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য করিয়াছিল। তাহারা পন্থের যুবরাজগণের যে পরিচয় দিয়া গিয়াছে, এবং সেই দেশের পত্র-পুষ্পের—বিশেষতঃ বৃক্ষাদির—যে নাম-সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছে, তাহাতে ভারতীয় সভ্যতা যে মিশরের প্রাচীন সভ্যতার মূলীভূত, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না।" * প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসু পোকক, এ বিষয়ের ষড়্‌বিধ কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন ;—"ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ এবং হিমালয়ের সন্নিহিত দেশ-সমূহ হইতে আফ্রিকায় যে উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার কয়েকটী প্রধান প্রমাণের বিষয় আমি সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি। প্রথম,—প্রাচীন মিশরের বহু প্রদেশের এবং বহু নদ-নদীর নাম-করণে—ভারতবর্ষের নদ-নদী ও প্রদেশের নাম-করণের সহিত সাদৃশ্য আছে। দ্বিতীয়,—ভারতবর্ষের অথবা ভারতের উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তের নগর ও প্রদেশের নামের সহিত, মিশরের নগরাদির নামের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। তৃতীয়,—মিশরের শাসনকর্ত্তৃগণের 'রামেস' বা 'রামিসীস্' আখ্যা হইতেও (সূর্য্যবংশাবতংস শ্রীরামচন্দ্রের বংশ-সমুদ্ভূত রাজন্য-বর্গ বলিয়াও) সম্বন্ধ-তত্ত্ব বুঝিতে পারি। চতুর্থ,—সমাধি-ক্রিয়ার উপকরণাদিতে সাদৃশ্য বিদ্যমান। পঞ্চম,—স্থাপত্যের শিল্প-নৈপুণ্যে, বৃহদায়তনে এবং জাঁক-জমকে সৌসাদৃশ্য। ষষ্ঠ,—সংস্কৃতের সাহায্যে মিশর-দেশীয় কতিপয় ভাষার অনুবাদের সুবিধা।" † অধিক কি,—যে 'কর্ণেল টড্' মিশরের এবং ভারতের রাজন্যবর্গের বংশ-পর্য্যায় আলোচনায়

* কর্ণেল অল্‌কট এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য প্রকাশ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন ;—"He (Brugsch Bey) insists that they (the Egyptians) migrated from India long before historic memory, and crossed that bridge of nations, the Isthmus of of Suez, to find a new fatherland on the banks of the Nile."

† Mr. Pococke.—*India in Greece.*

উভয় দেশের রাজগণের সংখ্যার তারতম্যে বিস্ময়াবিষ্ট; ভারতবর্ষ হইতে যে আফ্রিকার বহু নগর-গ্রামের নাম সংগৃহীত হইয়াছে, তিনিও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত-স্থলে, তিনি বলিয়াছেন,—"গাম্বীয়া এবং সেনীগাল নদীর মোহানায় যে সকল নগর অবস্থিত, তন্মধ্যে অনেকেরই হিন্দু-নাম দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন,—'তাম্ব-কুণ্ড' (তাম্রকুণ্ড), 'কুণ্ড' ইত্যাদি। 'এসিয়াটিক জর্ণাল' পত্রিকায়, একজন লেখক দেখাইয়াছেন,—'মধ্য আফ্রিকার অধিকাংশ দেশের ও অধিকাংশ স্থানের নাম সংস্কৃত-মূলক।' সেই সকল নামের অধিকাংশেরই মূলে ভারতবর্ষের প্রভাব বিদ্যমান, তাহাতে সংশয় নাই।" * এক মিশর বলিয়া নহে,—পৃথিবীর যে দিকের প্রাচীন চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করি না কেন, সর্ব্বত্রই ভারতবর্ষের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত। †

সূর্য্যবংশের এবং চন্দ্রবংশের নৃপতিগণের বংশ-পর্য্যায় আলোচনা উপলক্ষে প্রাচীন মিশর প্রভৃতির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছি। কতকটা অবান্তর বলিয়া মনে হইলেও তদ্দ্বারা বুঝিতে পারা যায়,—গণনায় সে দেশের নৃপতিগণের পর্য্যায়-সংখ্যা অধিক হইলেও, প্রাচীনত্বে সে দেশ ভারতের সমতুল্য নহে; পরন্তু তুলনায় তত্তদ্দেশের সভ্যতা আধুনিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেও, ভারতীয় নৃপতিগণের বংশ-পর্য্যায়ের ক্রমভঙ্গ হেতু, সাধারণের দৃষ্টি স্বতঃই ভ্রান্তপথে প্রধাবিত হইয়া থাকে। যাহা হউক, আমরা দেখিতে পাই,—বর্ত্তমান বৈবস্বত মন্বন্তরে ইক্ষ্বাকুই সূর্য্য-বংশীয় ক্ষত্রিয়-নৃপতিগণের আদিভূত। তাঁহার সম্বন্ধে কোনই মতান্তর নাই। তিনি অন্য দেশ হইতে এ দেশে আসেন নাই। যাঁহারা মধ্য-এসিয়া বা উত্তর-মেরু হইতে আর্য্য-হিন্দুগণের ভারতাগমন-বার্ত্তা প্রচার করেন, এই ইক্ষ্বাকু এবং তদ্বংশধরগণের বিবরণ পাঠ করিলেও, তাঁহাদের সে ধারণা দূর হইতে পারে। কেন-না, ইক্ষ্বাকু এই ভারতেই জন্মগ্রহণ করিয়া, এই ভারতেই প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়াছিলেন; তাঁহা হইতেই দিকে দিকে সভ্যতা-স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল; তাঁহার এক শত পুত্র ভিন্ন ভিন্ন দেশে রাজ্য-বিস্তার করিয়াছিলেন। ইক্ষ্বাকুর পুত্রগণ যে দেশে দেশে রাজ্য-বিস্তার করিয়াছিলেন,—তৎসম্বন্ধে কোনই মতান্তর নাই বটে; কিন্তু তাঁহার বংশ-লতায় প্রায়ই অনৈক্য দেখিতে পাই। প্রায় সকল পুরাণেই দৃষ্ট হয়,—ইক্ষ্বাকুর জ্যেষ্ঠ পুত্র 'বিকুক্ষি' নামে অভিহিত। কিন্তু রামায়ণে দেখি,—ইক্ষ্বাকুর পুত্রের নাম কুক্ষি; কুক্ষির পুত্র বিকুক্ষি। এদিকে, বিষ্ণুপুরাণে, ব্রহ্মপুরাণে, হরিবংশে, শিবপুরাণে, শ্রীমদ্ভাগবতে, দেবী-ভাগবতে, বিকুক্ষিরই অপর নাম 'শশাদ' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তাহাতে দেখিতে পাই,—বিকুক্ষির পুত্রের নাম—শকুনি ও কুকুৎস্থ। কুকুৎস্থ—অনেক স্থলেই বিকুক্ষির পুত্র বলিয়া পরিচিত। কিন্তু রামায়ণে দেখি, বিকুক্ষির পুত্রের নাম—বাণ। রামায়ণের বংশলতায় এ স্থলে কুকুৎস্থের নামোল্লেখ নাই; কিন্তু পঞ্চবিংশ পর্য্যায়ে, ভগীরথ হইতে কুকুৎস্থ এবং

সূর্য্য-বংশের বংশ-লতায় অসামঞ্জস্য।

* Tod's *Rajasthan*, Vol. II.

† ভারতবর্ষের সভ্যতাই যে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সভ্যতার আদিভূত, পরিচ্ছেদান্তরে তাহার আলোচনা দ্রষ্টব্য।

কুকুৎস্থ হইতে রঘু উৎপন্ন হন,—লিখিত আছে।* আবার শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই, বিকুক্ষির পুত্র কাকুৎস্থ নামে পরিচিত। এখন কোন্ বংশলতা অভ্রান্ত, কে নির্দ্দেশ করিবে? এ সকলের আলোচনায়, এক জনকে অপরের পুত্র না বলিয়া, তাঁহার বংশসম্ভূত বলাই শ্রেয়ঃ নহে কি? কুকুৎস্থের পুত্রের নাম—ব্রহ্মপুরাণে, বিষ্ণুপুরাণে, শ্রীমদ্ভাগবতে, হরিবংশে—'অনেনা'; কিন্তু অগ্নিপুরাণে 'সুযোধন', শিবপুরাণে 'অরিনাভ', দেবীভাগবতে 'কাকুৎস্থ'। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে—ইক্ষ্বাকুর পুত্র শশাদ, এবং শশাদের পুত্র পুরঞ্জয় নামে উল্লিখিত হইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে—কাকুৎস্থ, পুরঞ্জয় বা ইন্দ্রবাহ একই ব্যক্তি বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। ভিন্ন ভিন্ন পুরাণের কথাই বা বলিব কি?—এক বাল্মিকীর রামায়ণ-গ্রন্থের দুই স্থানে সূর্য্যবংশের দুইরূপ বংশ-তালিকা দৃষ্ট হয়। রামায়ণের আদিকাণ্ডে, সপ্ততিতম সর্গে, বৈদেহ-জনকের নিকট মহর্ষি বসিষ্ঠ সূর্য্যবংশ কীর্ত্তন করিতেছেন। আবার সেই বসিষ্ঠ কর্ত্তৃকই অযোধ্যা-কাণ্ডের দশাধিক শততম সর্গে শ্রীরামচন্দ্রের নিকট সেই সূর্য্যবংশের বিষয় বিবৃত হইতেছে। একই বসিষ্ঠের উক্তিতে দুই স্থলে দুই রূপ বংশ-পর্য্যায় উল্লিখিত হইয়াছে। আদি-কাণ্ডে আছে,—"প্রশুশ্রুক হইতে অম্বরীষ, তাঁহার পুত্র নহুষ, নহুষের পুত্র যযাতি, যযাতির পুত্র নাভাগ, নাভাগের পুত্র অজ, অজ হইতে দশরথ উৎপন্ন হন।" কিন্তু অযোধ্যা-কাণ্ডে দেখিতে পাই,—"প্রশুশ্রুবের পুত্র অম্বরীষ, অম্বরীষের পুত্র নহুষ, নহুষের পুত্র নাভাগ, নাভাগের দুই পুত্র—অজ ও সুব্রত।" এক রামায়ণেরই দুই স্থলে দুইরূপ! রামায়ণের সহিত অন্য পুরাণের যে অনেক অসামঞ্জস্য হইবে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায় না কি? রামায়ণে রঘুর পরবর্ত্তী ত্রয়োদশ পর্য্যায়ে শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যমান; তিনি নাভাগের বৃদ্ধ-প্রপৌত্র। কিন্তু ব্রহ্মপুরাণে, দিলীপের বৃদ্ধপ্রপৌত্র—রাম; তিনি রঘুর প্রপৌত্র, অজের পৌত্র এবং দশরথের পুত্র। বিষ্ণুপুরাণে আবার আর এক পুরুষ পরে শ্রীরামচন্দ্রের বিদ্যমানতা দৃষ্ট হয়। সেখানে বিশ্বসহের পুত্র দিলীপ, তৎপুত্র দীর্ঘবাহু, তৎপুত্র রঘু, তৎপুত্র অজ, তৎপুত্র দশরথ, তৎপুত্র রাম, ইত্যাদি। হরিবংশের সহিত ব্রহ্মপুরাণের এই অংশে মিল আছে; কিন্তু অগ্নিপুরাণে আবার দেখি,—রঘুর পুত্র দিলীপ, তৎপরে অজ, তৎপরে দীর্ঘবাহু, তৎপরে অজপাল, তৎপরে দশরথ, তৎপরে রামচন্দ্র। রামায়ণে এস্থলে দিলীপের বা রঘুর কোনই নাম-গন্ধ নাই। রামায়ণে দশরথের ঊর্দ্ধতন ত্রয়োদশ পুরুষে রঘুর এবং ষোড়শ পুরুষে দিলীপের অস্তিত্ব বিদ্যমান। সেখানে দিলীপ, অংশুমানের পুত্র এবং ভগীরথের পিতা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের মতে,—খট্টাঙ্গের পুত্র দীর্ঘবাহু, তৎপুত্র রঘু, তৎপুত্র অজ, তৎপুত্র দশরথ এবং দশরথের পুত্র শ্রীরামচন্দ্র। রামায়ণে দেখিতে পাই,—ব্রহ্মার অধস্তন চত্বারিংশ পুরুষে শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র কুশ বিদ্যমান। ব্রহ্মপুরাণে ষষ্টিতম পুরুষে, বিষ্ণুপুরাণে ঊনসপ্ততিতম পুরুষে, হরিবংশে

* এই গ্রন্থের ২৯২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত বংশলতায় দিলীপের পুত্র ভগীরথ এবং ভগীরথ হইতে কুকুৎস্থ ও কুকুৎস্থ হইতে রঘু হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু যে রামায়ণ হইতে ঐ বংশলতা সঙ্কলিত হয়, তাহাতে ঐ দুইটী নাম পাওয়া যায় নাই। যাহা হউক, বংশলতা পাঠকালে পাঠকগণ দিলীপের পর ভগীরথ, ভগীরথের পর কুকুৎস্থ এবং কুকুৎস্থের পর রঘু পাঠ ঠিক করিয়া লইবেন।

অষ্টপঞ্চাশৎ পুরুষে, অগ্নি-পুরাণে ষট্‌পঞ্চাশৎ পুরুষে, শিব-পুরাণে চতুঃপঞ্চাশৎ পর্য্যায়ে, শ্রীমদ্ভাগবতে অষ্ট-ষষ্টিতম পর্য্যায়ে, বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে একচত্বারিংশ পর্য্যায়ে, শ্রীরাম-পুত্র কুশের নামোল্লেখ আছে। একই বংশের একই ব্যক্তির পর্য্যায়-সম্বন্ধে এত অসামঞ্জস্য ঘটিবার কারণ আর কি হইতে পারে? প্রধান কারণ, আমাদের মনে হয়, গ্রন্থ-বিশেষে আবশ্যকানুসারে, কাহারও কাহারও নামের উল্লেখ হয় নাই; আবার হয় তো কোথাও লিপিকার-প্রমাদে একের নাম—অন্যের স্থান অধিকার করিয়া আছে। রামায়ণের বংশ-লতায় এক জন দিলীপ এবং এক জন রঘুর নাম দৃষ্ট হয়। কিন্তু ব্রহ্ম-পুরাণে, বিষ্ণু-পুরাণে, হরিবংশে, শ্রীমদ্ভাগবতে, দুই জন করিয়া দিলীপ বিদ্যমান রহিয়াছেন; আর, হরিবংশে ও ব্রহ্মপুরাণে দুই জন করিয়া রঘুর নাম দেখিতে পাই। ঐ দিলীপ আবার সকল স্থলে সম-পর্য্যায়ে অবস্থিত নহেন। মান্ধাতা, সগর, ভরত, হরিশ্চন্দ্র, ভগীরথ প্রভৃতি পুণ্যশ্লোক নৃপতিগণের পর্য্যায়-সম্বন্ধেও এই বিশৃঙ্খলা! রামায়ণের মতে,—ব্রহ্মার পরবর্ত্তী পঞ্চদশ পর্য্যায়ে মান্ধাতা, অষ্টাদশে ভরত, বিংশে সগর, চতুর্ব্বিংশে ভগীরথ। এদিকে আবার, ব্রহ্ম-পুরাণের মতে, ব্রহ্মার পরবর্ত্তী ত্রয়োবিংশ পর্য্যায়ে মান্ধাতা বিদ্যমান। তিনি (সূর্য্যবংশীয় কন্যা হৈমবতীর পুত্র) প্রসেনজিতের পৌত্র; তাঁহার পুত্রের নাম—পুরুকুৎস। কিন্তু রামায়ণে, মান্ধাতা—ধুন্ধুমারের (কুবলয়াশ্বের) পৌত্র; এবং তাঁহার পুত্রের নাম—সুসন্ধি। বিষ্ণুপুরাণের মতে, কুশাশ্ব-পুত্র প্রসেনজিতের পৌত্রের নাম—মান্ধাতা। তিনি ব্রহ্মা হইতে অধস্তন চতুর্ব্বিংশ পর্য্যায়ে অবস্থিত। হরিবংশের মতে আবার, সংহতাশ্ব-সুত প্রসেনজিৎ—মান্ধাতার পিতামহ। মান্ধাতার পুত্রের নাম, এতদুভয় পুরাণে,—পুরুকুৎস ও মুচুকুন্দ। হরিবংশের মতে,—মান্ধাতা ব্রহ্মা হইতে একবিংশ পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এইরূপ, অন্যান্য পুরাণেও মান্ধাতার বিষয়ে নানা অসামঞ্জস্য রহিয়াছে। অধিকাংশ পুরাণেই সগরের পিতার নাম—বাহুক, বহু বা বাহু; কিন্তু রামায়ণে সগর-পিতার নাম—অসিত। তাঁহার বংশ-লতায় প্রায় সর্ব্বত্রই অমিল আছে। সগরের পিতামহ—রামায়ণে ভরত নামে পরিচিত। কিন্তু অন্য পুরাণের বংশ-লতায় ভরতের নাম আদৌ নাই; পরন্তু সগরের পিতামহ—বৃক নামে পরিচিত। রাজা হরিশ্চন্দ্রের নাম—রামায়ণের বংশ-লতায় আদৌ দেখিতে পাই না। কিন্তু ব্রহ্মপুরাণে ঊনবিংশ পর্য্যায়ে, বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চত্রিংশ পর্য্যায়ে, হরিবংশে অষ্টাবিংশ পর্য্যায়ে, অগ্নি-পুরাণে একত্রিংশ পর্য্যায়ে, শিবপুরাণে ঊনত্রিংশ পর্য্যায়ে, শ্রীমদ্ভাগবতে ত্রয়স্ত্রিংশ পর্য্যায়ে, দেবী-ভাগবতে ত্রিংশ পর্য্যায়ে তাঁহাকে দেখিতে পাই। প্রায় সকল পুরাণেই তিনি সত্যব্রতের (ত্রিশঙ্কুর) পুত্র বলিয়া অভিহিত; কিন্তু অগ্নি-পুরাণে, তাঁহার পিতার নাম—সত্যরথ; এবং সত্যব্রত তাঁহার পিতামহ। ভগীরথ,—দিলীপের (খট্টাঙ্গের) পুত্র বলিয়াই সর্ব্বত্র পরিচিত। রামায়ণে চতুর্ব্বিংশ পর্য্যায়ে, ব্রহ্মপুরাণে দ্বিচত্বারিংশ পর্য্যায়ে বিষ্ণুপুরাণে সপ্তচত্বারিংশ পর্য্যায়ে, হরিবংশে পঞ্চচত্বারিংশ পর্য্যায়ে, অগ্নিপুরাণে ঊন-চত্বারিংশ পর্য্যায়ে, শিবপুরাণে সপ্তত্রিংশ পর্য্যায়ে, শ্রীমদ্ভাগবতে ষট্‌-চত্বারিংশ পর্য্যায়ে এবং বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে চতুস্ত্রিংশ পর্য্যায়ে তাঁহার বিদ্যমানতা দেখিতে পাই। তাঁহার পুত্রের

নাম, অধিকাংশ পুরাণের মতে, শ্রুত (শ্রুতসেন)। কিন্তু রামায়ণে তাঁহার পুত্রের নাম—কুকুৎস্থ ; এবং অগ্নিপুরাণে তাঁহার পুত্র 'নাভাগ' নামে প্রসিদ্ধ। নাভাগ, অম্বরীষ, নহুষ—এই তিন নৃপতির পর্য্যায়, বংশ-লতায় কত রূপান্তরেই স্থান পাইয়া আছে! রামায়ণে দেখি,—দশরথের পিতামহ নাভাগ, প্রপিতামহ নহুষ, আর বৃদ্ধপ্রপিতামহ অম্বরীষ। ব্রহ্ম-পুরাণে এই নাভাগ ও অম্বরীষের নাম দুই স্থলে দৃষ্ট হয়। দুই স্থলেই নাভাগের পুত্র অম্বরীষ নামে পরিচিত। প্রথমতঃ,—বৈবস্বত মনুর পুত্রের নাম নাভাগ, তৎপুত্র অম্বরীষ। দ্বিতীয়তঃ, ভগীরথের পৌত্র নাভাগ, তৎপুত্র অম্বরীষ। বিষ্ণুপুরাণে আবার, প্রথমে আছে—মনু-পুত্রের নাম নভাগ, তাঁহার পুত্র নাভাগ, তৎপুত্র অম্বরীষ। অপিচ, বিষ্ণু-পুরাণে ভগীরথের পৌত্র ও প্রপৌত্র যথাক্রমে নাভাগ ও অম্বরীষ নামেও অভিহিত। শিবপুরাণ এবং হরিবংশ এ বিষয়ে ব্রহ্মপুরাণেরই অনুসারী। শ্রীমদ্ভাগবতের সহিত বিষ্ণুপুরাণের প্রথম অংশে অভিন্নতা দৃষ্ট হয় বটে; কিন্তু শেষাংশে সম্পূর্ণ অসামঞ্জস্য। সেখানে ভগীরথের পৌত্রের নাম—নাভাগ; তাঁহার পুত্র—সিন্ধুদ্বীপ। অগ্নিপুরাণে আবার বৈবস্বত মনুর পুত্র নাভাগের অম্বরীষ নামক পুত্রের উল্লেখ নাই। সেখানে মনু-পুত্র ধৃষ্টের বংশে অম্বরীষের উৎপত্তি, এবং ভগীরথের পুত্র ও প্রপৌত্র পর্য্যায়ে যথাক্রমে নাভাগ ও অম্বরীষ বিদ্যমান। কোন্ বিষয়টীর উল্লেখ করিব? যে বংশের যে নামটীর বিষয় উল্লেখ করি না কেন, তাহাতেই এক পুরাণের সহিত অন্য পুরাণের অনৈক্য দেখিতে পাই। কয়েক পৃষ্ঠার বংশ-লতা (২৯২ পৃষ্ঠা হইতে ৩০৩ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত) মিলাইয়া দেখিলেই যে কেহ এ অসামঞ্জস্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

মনুর জ্যেষ্ঠ পুত্র ইক্ষ্বাকুর বংশ-লতা সম্বন্ধেই এই অসামঞ্জস্য! তাঁহার অন্যান্য পুত্রগণের বংশ-পর্য্যায় বিষয়ে আরও যে কত অসামঞ্জস্য রহিয়াছে, তাহার নির্ণয় করাই দুঃসাধ্য। রামায়ণে প্রধানতঃ মনু-পুত্র ইক্ষ্বাকুর বংশ-বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু পুরাণ-সমূহে মনুর অপরাপর পুত্রের বিষয়ও প্রসঙ্গতঃ আলোচনা দেখিতে পাই। শ্রীমদ্ভাগবতে মনু-পুত্র দিষ্টের নাম দৃষ্ট হয়।

অন্যান্য মনু-পুত্রের বংশে।

তাহাতে তাঁহার বংশের একটী দীর্ঘ পর্য্যায় প্রকটিত আছে। কিন্তু অন্য কোনও পুরাণে দিষ্টের নাম আদৌ উল্লেখ নাই। তবে, বিষ্ণুপুরাণে নেদিষ্ট-বংশের উল্লেখ আছে, এবং সে বংশের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের দিষ্ট-বংশের বংশ-লতার অনেকটা মিল দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সে দুই বংশ-লতায়ও অনেক অসামঞ্জস্য আছে! এই বংশের মরুত্ত নামক প্রসিদ্ধ নরপতির নাম—বিষ্ণুপুরাণে অষ্টাদশ পর্য্যায়ে এবং শ্রীমদ্ভাগবতে বিংশ পর্য্যায়ে দৃষ্ট হয়। কিন্তু তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষগণের নামে, উভয় পুরাণে, ঘোর পার্থক্য! প্রথমতঃ, দিষ্টের পরবর্ত্তী চতুর্থ পুরুষে, শ্রীমদ্ভাগবতে, বৎসপ্রীতি আছেন; বিষ্ণুপুরাণে—দিষ্টের পরবর্ত্তী চতুর্থ পুরুষে প্রাংশু আছেন; শ্রীমদ্ভাগবতের মতে, বৎসপ্রীতির পুত্র — প্রাংশু। তৎপরেও অনৈক্য! বিষ্ণুপুরাণে, প্রাংশুর পর, যথাক্রমে — প্রজানি, খনিত্র, ক্ষুপ, বিবিংশ, খনিনেত্র, করন্ধম, অবীক্ষি, মরুত্ত, নরিষ্যন্ত, দম প্রভৃতির নাম আছে। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে প্রাংশুর পর যথাক্রমে—প্রমিতি, খনিত্র, চাক্ষুষ, বিবিংশতি, রম্ভ, খনীনেত্র, করন্ধম, অবীক্ষিৎ,

মরুত্ত, দম প্রভৃতির নাম দৃষ্ট হয়। এই দিষ্ট (নেদিষ্ট) বংশের অষ্টাবিংশ (মতান্তরে ঊনবিংশ) পর্য্যায়-ভুক্ত তৃণবিন্দের বিশাল প্রভৃতি পুত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। রামায়ণে আদিকাণ্ডে সপ্তচত্বারিংশ সর্গেও এই বিশাল-বংশের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু এই বংশ-সম্বন্ধেও রামায়ণ, শ্রীমদ্ভাগবত এবং বিষ্ণু-পুরাণ প্রভৃতির পরস্পর অনৈক্য। রামায়ণে, বিশাল-বংশের বংশ-পর্য্যায় যথাক্রমে এইরূপ,—বিশাল, হেমচন্দ্র, সুচন্দ্র, ধূম্রাশ্ব, সৃঞ্জয়, সহদেব, কুশাশ্ব, সোমদত্ত, কাকুৎস্থ, সুমতি। এ হিসাবে, বিশাল হইতে সুমতি দশম পুরুষে অবস্থিত। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে বিশাল হইতে সুমতি সপ্তম পুরুষে বিদ্যমান। বিষ্ণুপুরাণের সহিত পর্য্যায়ে অনৈক্য না থাকিলেও, নামের অনৈক্য সম্পূর্ণরূপ রহিয়া গিয়াছে। মনু-পুত্রগণের নাম-বিষয়েও পুরাণ-সমূহে নানা মতান্তর। কোনও কোনও স্থলে, এক-পুরাণে যিনি পুত্র বলিয়া অভিহিত, অপর পুরাণে তিনিই আবার পৌত্র বা প্রপৌত্র বলিয়া পরিচিত।

মৈথিল-বংশ।

ইক্ষ্বাকু-পুত্র নিমির নাম এবং বংশ-বিবরণ কেবল বিষ্ণুপুরাণে ও শ্রীমদ্ভাগবতে দৃষ্ট হয়। রামায়ণের আদিকাণ্ডে, একসপ্ততিতম অধ্যায়ে, তাঁহার বংশ-পর্য্যায় বিবৃত আছে। নিমি—ইক্ষ্বাকু-পুত্রগণের মধ্যে দ্বাদশ স্থান অধিকার করিয়া আছেন। বিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবতের বংশ-লতার সহিত রামায়ণের বংশ-লতার অনেক স্থলে অনৈক্য দৃষ্ট হয়। বিষ্ণুপুরাণে ও শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে,—নিমির পুত্র জনক, এবং তাঁহারই অন্য নাম—বৈদেহ বা মিথি। কিন্তু রামায়ণে লিখিত আছে,—নিমির পুত্রের নাম মিথি, এবং মিথির পুত্রের নাম জনক। জনকের পুত্রের নাম উদাবসু—শ্রীমদ্ভাগবতে এবং রামায়ণে দৃষ্ট হয়। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে সেস্থলে 'নন্দীবর্দ্ধন' নাম লিখিত আছে। অথচ, রামায়ণে ও শ্রীমদ্ভাগবতে, নন্দীবর্দ্ধন—উদাবসুর পুত্র বলিয়া পরিচিত। তৎপরে, কোনটীর সহিত রামায়ণে এবং বিষ্ণুপুরাণে মিল আছে; আবার কোনটীর সহিত রামায়ণে এবং শ্রীমদ্ভাগবতে মিল রহিয়াছে। রামায়ণোক্ত নিমির বংশলতা নিম্নে প্রদত্ত হইল। শ্রীমদ্ভাগবতের এবং বিষ্ণুপুরাণের বংশলতার (এই গ্রন্থের ২৯৪ এবং ৩০২ পৃষ্ঠার) সহিত মিলাইয়া দেখিলেই পার্থক্য অনুভূত হইবে। রামায়ণে নিমির বংশলতা,—

১। নিমি — মিথি — জনক — উদাবসু — নন্দীবর্দ্ধন — সুকেতু —

দেবরাত — বৃহদ্রথ — মহাবীর — সুধৃতি — ধৃষ্টকেতু — হর্য্যশ্ব —

মরু — প্রতীন্ধক — কীর্ত্তিরথ — দেবমীঢ় — বিবুধ — মহীধ্রক —

কীর্ত্তিরাত — মহারোমা — স্বর্ণরোমা — হ্রস্বরোমা —

সীরধ্বজ — জনক   কুশধ্বজ

পুরাণ-সমূহের মতে, 'সীরধ্বজই' জনক নামে অভিহিত। কিন্তু রামায়ণে দেখা যায়,—দ—জনকের পূর্ব্ব-পুরুষ; তিনি সীতার পিতামহ। রামায়ণে ও হরিবংশে,

সীরধ্বজের ভ্রাতার নাম কুশধ্বজ। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে, সীরধ্বজের পুত্র কুশ নামে অভিহিত; তিনি সীতার কনিষ্ঠ পর্য্যায়ভুক্ত। সর্ব্বত্রই অসামঞ্জস্য। যে দিকেই দেখি, এই অনৈক্য পূর্ণ-মাত্রায় পরিদৃশ্যমান!

চন্দ্রবংশের আদি ইলার অলৌকিকত্ব।

সূর্য্যবংশের বংশ-লতা অপেক্ষা চন্দ্রবংশের বংশ-লতায় অসামঞ্জস্য আবার আরও অধিক। বৈবস্বত মনুর কন্যা ইলার গর্ভে যে পুরুরবা জন্মগ্রহণ করেন, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি বুধের পুত্র—কি চন্দ্রের পুত্র, তদ্বিষয়েই মতান্তর আছে। তবে, পুরাণ-সমুদ্র আলোড়ন করিয়া, আমরা তাঁহাকে চন্দ্রের পৌত্র ও বুধের পুত্র বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছি। যাহা হউক, পুরুরবার জননী ইলার সম্বন্ধে আরও যে অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর। পুরাণে প্রকাশ,—ইলায় পুংস্ত্ব ও স্ত্রীত্ব দুই-ই সংঘটিত হইয়াছিল। সূর্য্য-পুত্র মনু নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁহার সন্তান-লাভার্থ ভগবান বসিষ্ঠ 'মিত্রাবরুণ'-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। মনুর পত্নী শ্রদ্ধা সেই যজ্ঞে মনে মনে কন্যা-লাভের প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এদিকে পুত্র-সন্তান লাভের জন্য মনুর প্রার্থনা ছিল। এইরূপে, হোতার ব্যভিচারে, যজ্ঞের ফলে, ইলা-নাম্নী কন্যা জন্মগ্রহণ করে। মনু তখন ক্ষুব্ধ হইয়া বসিষ্ঠের নিকট কারণ জিজ্ঞাসা করেন। 'হোতার ব্যভিচারে এরূপ ঘটিয়াছে'—বলিয়া, বসিষ্ঠ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলেন,—"আমি স্বীয় তেজে তোমাকে পুত্রবান্ করিব।" ইহার পর, বসিষ্ঠের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া, ভগবান শ্রীহরি তাঁহাকে বর-প্রদান করেন। সেই বরে মনু-কন্যা ইলা, পুরুষ-রূপে পরিবর্ত্তিত হন। সেই পুরুষ—'সুদ্যুম্ন' নামে পরিচিত। বীর সুদ্যুম্ন একদা মৃগয়ার্থ সৈন্ধব (সিন্ধু) দেশীয় অশ্বে আরোহণ করিয়া, মেরুর অধঃস্থিত হরপার্ব্বতীর বিহার-স্থান 'সুকুমার' বনে গমন করিয়াছিলেন। সেই বনে কেহ গমন করিলে, আপনা-আপনিই স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইত। পুরাকালে গিরিশের দর্শন-লালসায় কতিপয় ঋষি ঐ বনে গমন করিয়াছিলেন। সে সময় অম্বিকা বিবসনা ছিলেন। সহসা ঋষিগণের সেই বনে আগমনে, তিনি সঙ্কুচিতা ও লজ্জিতা হইয়া অনুযোগ করেন। সেই হইতে মহাদেব নির্দ্দেশ করিয়া দেন,—'এই বনে যে পুরুষ প্রবেশ করিবে, সেই স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইবে।' সুদ্যুম্ন ও তাঁহার ঘোটক ঐ বনে প্রবেশ করায়, উভয়েই স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে বুধের সহিত তাঁহার মিলন হয়। সেই মিলনেই পুরুরবার উৎপত্তি। ইহার পর, বসিষ্ঠের উপদেশে, মহাদেবের অনুকম্পায়, সুদ্যুম্ন আবার পুংস্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ভগবান শঙ্কর ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন,—'সুদ্যুম্ন এক মাস পুরুষ ও এক মাস স্ত্রী থাকিবেন।' * প্রতিষ্ঠান্ দেশে সুদ্যুম্ন রাজত্ব করিতেন। উৎকল, গয় ও বিমল নামে তাঁহার তিন পুত্র দক্ষিণাপথ দেশের রাজা হইয়াছিলেন। পুরুরবা পৃথিবীপতি হন। রামায়ণে আবার ইলার কাহিনী অন্যরূপে পরিবর্ণিত। রামায়ণে সুদ্যুম্ন নাম নাই। কর্দ্দম প্রজাপতির পুত্র 'ইল' বাহ্লীক (বাল্হিক) দেশের রাজা ছিলেন। মৃগয়ায় গিয়া, মহাদেবের ইচ্ছানুসারে, তিনি স্ত্রীত্ব

* ইলা ও সুদ্যুম্নের এই অলৌকিক বিবরণ,—শ্রীমদ্ভাগবত, নবম স্কন্ধ, প্রথম অধ্যায়; দেবীভাগবত, প্রথম স্কন্ধ, দ্বাদশ অধ্যায়; বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্থাংশ, প্রথম অধ্যায় প্রভৃতিতে দ্রষ্টব্য।

প্রাপ্ত হন। সেই সময় তাঁহার পুত্র পুরুরবার জন্ম হয়। যে ইলা হইতে চন্দ্রবংশের উদ্ভব, সেই ইলার ইতিহাসই এইরূপ অলৌকিক রহস্যপূর্ণ! তাঁহার পরবর্ত্তী বংশধরগণের বিবরণ কিরূপ জটিলতা-সঙ্কুল, ইহাতেই তাহার আভাস পাওয়া যায়। সুদ্যুম্ন (ইলা) বৃদ্ধ হইয়া বনে গমন করিলে, মনু শত বৎসর যমুনা-তীরে তপস্যা করিয়া, পুত্র-লাভের কামনায় যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাহাতেই তাঁহার ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি শত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

চন্দ্র-বংশে ঘোর অনৈক্য।

ইলার পুত্র পুরুরবার সন্তানগণের নাম-সম্বন্ধে সকল পুরাণে সামঞ্জস্য নাই। মহাভারতে, এক আয়ু-বংশের বিবরণ লিখিত হইয়াছে। হরিবংশে এবং বিষ্ণুপুরাণে আয়ু ভিন্ন অমাবসুর বংশেরও পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে অমাবসুর নাম নাই; সেখানে বিজয়ের বংশ বিদ্যমান;—আর সেই বিজয়ের বংশের সহিত, হরিবংশ বা বিষ্ণুপুরাণোক্ত অমাবসুর বংশের অনেক মিল রহিয়া গিয়াছে। অমাবসুর অপর নাম যে বিজয় ছিল, সে পরিচয় কোথায়ও পাওয়া যায় না। অথচ, এক পুরাণে যাহা অমাবসুর বংশ বলিয়া অভিহিত, অন্য পুরাণে তাহা বিজয়ের বংশ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। প্রথমেই এই গণ্ডগোল! পুরুরবার অধস্তন তৃতীয় পুরুষে এ গণ্ডগোল আরও বাড়িয়া গিয়াছে। সকল পুরাণই প্রধানতঃ পুরুরবার পৌত্র নহুষের বংশ লইয়া বিস্তৃত-ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে এবং শ্রীমদ্ভাগবতে নহুষের কনিষ্ঠ ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশ-বিস্তার দেখিতে পাই। অথচ, মহাভারতে ও হরিবংশে, সে ক্ষত্রবৃদ্ধের নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ নাই। কিন্তু মহাভারত এবং হরিবংশে বৃদ্ধশর্ম্মা নামে নহুষের এক ভ্রাতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ও ক্ষত্রবৃদ্ধ এক ব্যক্তি কি না তাহা বুঝিবার উপায় নাই; কারণ, বৃদ্ধশর্ম্মার পরবর্ত্তী বংশের কোনই পরিচয় দেখিতে পাই না। যযাতির পাঁচ পুত্র (যদু, তুর্ব্বসু, দ্রুহ্য, অনু ও পুরু) সম্বন্ধে কোথাও অনৈক্য নাই। কিন্তু পুরুর পুত্র ও তাহার পরবর্ত্তী বংশধরগণ সম্বন্ধে প্রায় সর্ব্বত্রই অসামঞ্জস্য। মহাভারতে, পুরুর পুত্রের নাম—রৌদ্রাশ্ব। হরিবংশে পুরুর অধস্তন অষ্টম পুরুষে, বিষ্ণুপুরাণে অধস্তন নবম পুরুষে, শ্রীমদ্ভাগবতে অধস্তন দশম পুরুষে, ব্রহ্মপুরাণে অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষে, রৌদ্রাশ্ব নাম বিদ্যমান। এদিকে আবার, অগ্নিপুরাণে রৌদ্রাশ্ব নামে পুরুর কোনও বংশধরের পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে পুরুর অধস্তন নবম পুরুষে ভদ্রাশ্ব নাম দৃষ্ট হয়। তিনি এবং রৌদ্রাশ্ব একই ব্যক্তি হওয়া সম্ভবপর; কিন্তু তাঁহাদের পুত্রের নামে বা বংশ-পরিচয়ে সর্ব্বত্র মিল দেখিতে পাই না। মহাভারতে রৌদ্রাশ্বের অধস্তন পাঁচ পুরুষের নাম—অনপভানু, ঋচেয় (অনাধৃষ্টি), মতিনার, তংসু এবং ঈলিন; বিষ্ণুপুরাণে—ঋতেযু, রন্তিনার, তংসু, ঐলিল, দুষ্মন্ত; শ্রীমদ্ভাগবতে—ঋতেযু, রন্তিনার, সুমতি, রেভি, দুষ্মন্ত; ব্রহ্মপুরাণে—ঋচেয়ু, মতিনার, তংসু, ধর্ম্মনেত্র, দুষ্মন্ত; হরিবংশে—ঋচেয়ু, মতিনার, তংসু, সুরোধ, দুষ্মন্ত। কিন্তু অগ্নিপুরাণের ভদ্রাশ্ব-বংশে—মতিনার, তংসুরোধ, দুষ্মন্ত, ভরত, বিতথ। দুষ্মন্ত-পুত্র ভরত, মহাভারতে চতুর্দ্দশ পর্য্যায়ে, হরিবংশে ত্রয়োবিংশ পর্য্যায়ে, বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চবিংশ পর্য্যায়ে, শ্রীমদ্ভাগবতে ষড়বিংশ পর্য্যায়ে, অগ্নিপুরাণে ত্রয়োবিংশ পর্য্যায়ে এবং ব্রহ্মপুরাণে একবিংশ পর্য্যায়ে অবস্থিত। তার পর, ভরতের পুত্র-সম্বন্ধেও ঘোর অনৈক্য! মহাভারতে ভরতের পুত্রের নাম

ভূমন্যু, হরিবংশে বিতথ, বিষ্ণুপুরাণে ভরদ্বাজ, শ্রীমদ্ভাগবতে বিতথ (ভরদ্বাজ), অগ্নিপুরাণে ও ব্রহ্মপুরাণে বিতথ। ভরতের পৌত্র-সম্বন্ধেও মতভেদ। মহাভারতে, হরিবংশে ও অগ্নিপুরাণে তাঁহার পুত্রের নাম—সুহোত্র ; শ্রীমদ্ভাগবতে মন্যু, ব্রহ্মপুরাণে সুহোতা। ব্রহ্মপুরাণে সুহোত্র নামেও ভরতের এক পৌত্র আছেন বটে ; কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী বংশ-পরিচয় কিছুই নাই। মহাভারতে সুহোত্রের পুত্র অজমীঢ় প্রভৃতি। হরিবংশে, অগ্নিপুরাণে, ব্রহ্মপুরাণে এবং বিষ্ণুপুরাণে তাঁহারা পৌত্র বলিয়া পরিচিত বটেন ; কিন্তু তাঁহাদের পিতার নামে মিল নাই। এদিকে আবার, শ্রীমদ্ভাগবতে অজমীঢ় প্রভৃতি মন্যুর প্রপৌত্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। ফলতঃ, অজমীঢ়াদির পিতার নাম—কোথাও সুহোত্র, কোথাও বৃহৎ, কোথাও বা হস্তী। হস্তিনাপুর প্রতিষ্ঠাতা হস্তীর নাম—মহাভারতের এ বংশ-পর্য্যায়ে অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না ; পরন্তু, দ্বাবিংশ-পর্য্যায়ভুক্ত জনমেজয়-পুত্র ধৃতরাষ্ট্রের হস্তী নামক এক পুত্র দেখিতে পাই ; তিনি অপুত্রক বলিয়াই বুঝা যায়। ঋক্ষ—প্রায় সকল পুরাণেই অজমীঢ়ের পুত্র বলিয়া পরিচিত ; কিন্তু ব্রহ্মপুরাণে তিনি অজমীঢ়ের কনিষ্ঠ-পর্য্যায়ভুক্ত। ঋক্ষের পরবর্ত্তী দুই পুরুষ সম্বন্ধে সকল পুরাণই এক মত ; ঋক্ষ-পুত্র সংবরণ এবং সংবরণ-পুত্র কুরু (কুরুক্ষেত্র-প্রতিষ্ঠাতা)—এ বিষয়ে প্রায় কোথাও মতদ্বৈধ নাই। কুরুর পরবর্ত্তী যে বংশ-পর্য্যায়, তাহাতে কিন্তু আবার গণ্ডগোল উপস্থিত। মহাভারতে দেখিতে পাই,—কুরু-পুত্র জনমেজয়ের বংশে, অধস্তন সপ্তবিংশ পর্য্যায়ে, ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু প্রভৃতি বিদ্যমান ; হরিবংশের মতে,—কুরু-পুত্র সুধন্বার বংশে, ষট্‌ত্রিংশ পর্য্যায়ে, ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু প্রভৃতি রহিয়াছেন ; বিষ্ণুপুরাণের মতে,—কুরু-পুত্র জহ্নুর বংশে, পঞ্চাশৎ পর্য্যায়ে, ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু প্রভৃতি অবস্থিত ; শ্রীমদ্ভাগবতের মতে,—কুরু-পুত্র জহ্নুর বংশে, ঊনপঞ্চাশ পর্য্যায়ে এবং ব্রহ্মপুরাণ ও অগ্নিপুরাণের মতে, কুরু-পুত্র পরীক্ষিতের বংশে, যথাক্রমে সপ্তত্রিংশ ও ঊনচত্বারিংশ পর্য্যায়ে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু প্রভৃতি বর্ত্তমান। এদিকে আবার, ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডুর নাম মহাভারতে দুই বার দেখিতে পাওয়া যায় ; প্রথম—দ্বাবিংশ পর্য্যায়ে ; দ্বিতীয়—সপ্তবিংশ পর্য্যায়ে। মহাভারতোক্ত দ্বাবিংশ পর্য্যায়ভুক্ত ধৃতরাষ্ট্রের পৌত্র (তাঁহার কোন্ পুত্রের পুত্র—তাহার উল্লেখ নাই) প্রতীপ হইতে পর্য্যায়ক্রমে শান্তনু, বিচিত্রবীর্য্য ও ধৃতরাষ্ট্রাদির নাম দৃষ্ট হয়। কিন্তু হরিবংশে উপরিচর বসুর কন্যা সত্যবতী হইতে বিচিত্রবীর্য্য প্রভৃতির উৎপত্তি-বিবরণ লিখিত আছে। তবে হরিবংশে কুরুর পরীক্ষিৎ-নামা পুত্রের বংশ-লতা আলোচনা করিলে জানা যায়,—শান্তনু, পরীক্ষিতের চতুর্থ পর্য্যায়ে অবস্থিত ; তিনি জনমেজয়ের প্রপৌত্র ; তাঁহার পিতামহের নাম—ভীমসেন। উপরিচর বসুর কন্যা সত্যবতীকে তিনিই বিবাহ করেন। উপরিচর বসু—কুরু-বংশের কোন্ পর্য্যায়ে অবস্থিত, মহাভারতের বংশ-লতা আলোচনায় তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। মহাভারতের আদিপর্ব্বে, ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়ে, উপরিচর পৌরব-নন্দন বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। তাঁহার অপর নাম—বসু। ব্রহ্মপুরাণের এবং হরিবংশের মতে,—তিনি কুরু-পুত্র সুধন্বার বংশে যথাক্রমে একত্রিংশ এবং ত্রয়োবিংশ পর্য্যায়ে ; বিষ্ণুপুরাণের এবং শ্রীমদ্ভাগবতের মতে, কুরু-পুত্র সুধনুর বংশে, ঊনচত্বারিংশ পর্য্যায়ে বিদ্যমান। অগ্নি-পুরাণে কুরু-বংশের বংশলতায় উপরিচর বসুর নাম সন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। মতান্তরে

দৃষ্ট হয়,—এই উপরিচর বসু হইতেই মহাভারতের আরম্ভ। কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধেই এত বিসদৃশ! উপরিচর বসুর পুত্র-কন্যা-সম্বন্ধে অন্যান্য পুরাণাদির সহিত মহাভারতের অনেক অনৈক্য আছে। উপরিচর বসু—চেদিদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। ক্ষত্রিয়-নৃপতিগণের মধ্যে তাঁহার বলবীর্য্যের প্রসিদ্ধি ছিল। কিন্তু তিনি ক্ষাত্র্য-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, ব্রাহ্মণের ন্যায় উগ্র-তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। সে তপস্যায় তিনি ইন্দ্রত্ব লাভ করিতে পারেন—আশঙ্কা করিয়া, দেবগণ সান্ত্বনা-বাক্য দ্বারা তাঁহাকে তপস্যায় প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলেন। সেই সূত্রে তিনি দেবতাগণের নিকট হইতে দেবভোগ্য আকাশগামী স্ফটিকময় মহৎ বিমান এবং অম্লান-পঙ্কজা বৈজয়ন্তী মালা লাভ করেন। সে মালা ধারণ-পূর্ব্বক যুদ্ধ-স্থলে উপস্থিত হইলে, তাঁহার শরীরে অস্ত্র প্রবেশ করিতে পারিবে না, এবং সেই দেবদত্ত-বিমানে আরোহণ করিয়া, তিনি আকাশে যথেচ্ছভাবে বিচরণ করিতে পারিবেন;—তপস্যার ফলে, বসু রাজা এই বর প্রাপ্ত হন। দেবদত্ত-বিমানে আরোহণ করিয়া, 'উপরে বিচরণ' করিতে পারিতেন বলিয়া, বসু রাজা 'উপরিচর' বসু নামে অভিহিত হন। * তাঁহার কন্যা সত্যবতীর (যাঁহা হইতে বেদব্যাস ও ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির উৎপত্তি) ইতিহাস আবার আরও অলৌকিকত্ব-পূর্ণ। সে ইতিহাস এই,—অদ্রিকা-নাম্নী এক অপ্সরা মৎস্যরূপা হইয়া যমুনা-জলে অবস্থিতি করিতেছিল। তাহারই গর্ভে সত্যবতীর উৎপত্তি। সত্যবতীর অপর নাম—মৎস্যগন্ধা। পরাশরের অনুগ্রহে তিনি 'গন্ধবতী' এবং 'যোজনগন্ধা' আখ্যা প্রাপ্ত হন। ধীবর-রাজ তাঁহাকে পালন করিয়াছিলেন। শান্তনুর সহিত বিবাহের পূর্ব্বে, সত্যবতীর গর্ভে বেদব্যাসের উৎপত্তি হয়। দ্বীপে প্রসূত হওয়ায়, বেদব্যাস—দ্বৈপায়ন নামে; এবং তিনি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন বলিয়া 'কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন' নামে অভিহিত হন। † ধার্ত্তরাষ্ট্র ও পাণ্ডবগণের বংশাবলী বিষয়ে অধিক কিছু বলা বাহুল্য। বংশ-লতা পর্য্যালোচনা করিলে, স্বতঃই সে পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

যদু-বংশের ধারাবাহিক বংশ-লতা মহাভারতে দেখিতে পাই না। হরিবংশে, বিষ্ণুপুরাণে, শ্রীমদ্ভাগবতে, অগ্নিপুরাণে এবং ব্রহ্মপুরাণে কোথাও যদুর চারি পুত্রের, কোথাও বা পাঁচ পুত্রের নাম আছে। কিন্তু প্রধানতঃ তাঁহার দুই পুত্রের পরবর্ত্তী বংশ-পর্য্যায় দৃষ্ট হয়। সে দুই পুত্রের নাম—সহস্রদ (সহস্রজিৎ), ক্রোষ্টা (ক্রোষ্টু)। অগ্নিপুরাণে সহস্রজিতের বংশ নাই; কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে এবং বিষ্ণু-পুরাণে সহস্রজিতের পুত্রের নাম—শতাজিৎ; তৎপুত্র হৈহয়। ঐ দুই পুরাণে শতাজিতের আরও দুই পুত্রের নাম লিখিত আছে বটে; কিন্তু তাঁহাদের নামেও অনৈক্য, এবং বংশেরও কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। হরিবংশে এবং ব্রহ্মপুরাণে হৈহয়—সহস্রদের পুত্র-মধ্যে পরিগণিত। হৈহয়ের পুত্রের নাম—ধর্ম্মনেত্র। এ বিষয়ে হরিবংশ,

অন্যান্য
অনাবপ্রস্ত-তত্ত্ব।

† মহাভারত, আদি-পর্ব্ব, ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়ে, উপরিচর বসুর বিবরণ এবং সত্যবতীর অলৌকিক জন্ম কাহিনী দ্রষ্টব্য।

* ব্রহ্মপুরাণে উপরিচর বসুর অন্যরূপ পরিচয় লিখিত আছে;—'সুধন্বার পুত্র সুহোত্র; তৎপুত্র চ্যবন; চ্যবনের পুত্র কৃতযজ্ঞ। তিনি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিয়া উপরিচর বসু নামে এক আকাশচর পুত্র লাভ করেন। ঐ পুত্র ইন্দ্রের সখা হইয়াছিলেন। মগধাধিপতি বৃহদ্রথ—উপরিচর বসুর পুত্র।'

বিষ্ণুপুরাণ এবং ব্রহ্মপুরাণ এক মত; কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের মতে,—হৈহয়ের পুত্র ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মের পুত্র নেত্র। ব্রহ্মপুরাণে এবং হরিবংশে ধর্ম্মনেত্রের পুত্রের নাম—কার্ত্ত, কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে কুন্তি। শ্রীমদ্ভাগবতে নেত্রের পুত্রও কুন্তি। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন—এই বংশ-পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু তিনি হরিবংশে ও অগ্নিপুরাণে বিংশ পর্য্যায়ে, বিষ্ণুপুরাণে ও শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাবিংশ পর্য্যায়ে এবং ব্রহ্মপুরাণে ঊনবিংশ পর্য্যায়ে বিদ্যমান। এই বংশের বংশ-লতায় আর আর যে অসামঞ্জস্য আছে, বংশ-লতার প্রতি সামান্য দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা উপলব্ধি হইবে। তার পর—যদু-পুত্র ক্রোষ্টু (ক্রোষ্টা)। ক্রোষ্টার বংশ বিশেষ বিখ্যাত। হরিবংশে দেখিতে পাই, ক্রোষ্টার তিন পুত্র;—অনমিত্র, যুধাজিৎ, দেবমীঢ়ুষ। হরিবংশে, প্রসেন ও সত্রাজিৎ,—অনমিত্রের পৌত্র বলিয়া পরিচিত। এদিকে আবার, তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র যুধাজিতের বংশে, পরবর্ত্তী পঞ্চম পুরুষে, যুযুধান ও সাত্যকি বিদ্যমান। অক্রূরের পিতা শ্বফল্ক সম্বন্ধেও এই স্থলে ঘোর গণ্ডগোল। শ্রীমদ্ভাগবতের মতে,—অনমিত্রের বৃষ্ণি নামে এক তনয় ছিলেন; তাঁহার পুত্রের নাম—শ্বফল্ক। বিষ্ণুপুরাণে দেখি,—অনমিত্রের বংশে পৃশ্নি জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহারও পুত্রের নাম শ্বফল্ক। ব্রহ্মপুরাণের মতে,—ক্রোষ্টুর পুত্র বৃষ্ণি, এবং তাঁহা হইতেই শ্বফল্ক জন্মগ্রহণ করেন। হরিবংশে দেখি,—দেবমীঢ়ুষের পুত্রের নাম বসুদেব। আবার অন্যত্র দেখি, বসুদেবের পিতার নাম—শূর; তাঁহার পিতামহ—দেবমীঢ়ুষ। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে, শ্রীকৃষ্ণ-জন্ম-খণ্ডের সপ্তম অধ্যায়ে, লিখিত আছে,—'দেবমীঢ়ুষের মারিষা নাম্নী পত্নীর গর্ভে বসুদেব জন্মগ্রহণ করেন।' হরিবংশেরও সেই মত। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে,—'দেবমীঢ়ুষের পুত্র শূর; শূরের মহিষী মারিষার গর্ভে বসুদেব জন্মগ্রহণ করেন।' ব্রহ্মপুরাণেরও প্রায় ঐ মত। ব্রহ্মপুরাণে আছে,—'দেবমীঢ়ুষের অসিক্নী-নাম্নী মহিষীর গর্ভে শূর জন্মগ্রহণ করেন; এবং শূর হইতে তদীয় মহিষী ভোজ-নন্দিনীর গর্ভ-জাত দশ পুত্রের মধ্যে বসুদেব অন্যতম। তাঁহার অপর নাম—'আনকদুন্দুভি।' তিনি ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র দেব-দুন্দুভি নিনাদিত হইয়াছিল; তাই তিনি পূর্ব্বোক্ত নামে অভিহিত হন। বিষ্ণুপুরাণের মতে,—নন্দ, উপনন্দ ও কৃতক প্রভৃতি তাঁহার মদিরা নাম্নী ভার্য্যার গর্ভ-সম্ভূত। সে হিসাবে, কৃষ্ণ-বলরাম নন্দ-উপনন্দের বৈমাত্র ভ্রাতা হইয়া পড়েন। অন্যত্র আবার দেখা গিয়াছে,—শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেব, নন্দোপনন্দের ভ্রাতৃ-পর্য্যায়ভুক্ত! * চন্দ্র হইতে দশম বা দ্বাদশ পুরুষের মধ্যেই বংশ-লতায় শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের উৎপত্তি দেখিতে পাই। অন্য দিকে, বিষ্ণুপুরাণে বলরাম-শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রবংশে পঞ্চপঞ্চাশৎ পর্য্যায়ে অবস্থিত। সেখানে, দেবমীঢ়ুষ—ক্রোষ্টুর পুত্র নহেন; তিনি ক্রোষ্টুর অধস্তন ত্রিপঞ্চাশৎ পুরুষে কৃতবর্ম্মার পুত্র-রূপে বিরাজমান। কেবল দেবমীঢ়ুষ বলি কেন;—অনমিত্রও, বিষ্ণুপুরাণের মতে, ক্রোষ্টুর পুত্র নহেন। তিনি ঐ বংশের পঞ্চচত্বারিংশ পর্য্যায়ে সুমিত্রের পুত্র-মধ্যে পরিগণিত; প্রসেন ও সত্রাজিৎ তাঁহার পৌত্র। শ্রীমদ্ভাগবতে আবার এ বিষয়েও পার্থক্য দৃষ্ট হয়। সেখানে পঞ্চপঞ্চাশৎ পর্য্যায়-ভুক্ত যুধাজিতের পুত্র অনমিত্র হইতে প্রসেন ও সত্রাজিতের উৎপত্তি দেখিতে

* এই গ্রন্থের ২২৩ পৃষ্ঠায় লিখিত বংশ-লতার সহিত ইহার পার্থক্য দ্রষ্টব্য।

পাই। শ্রীমদ্ভাগবতে দেবমীঢ়ুষ—চিত্ররথের বংশে, হৃদিক-পুত্র-রূপে পরিচিত। † অগ্নি-পুরাণে বসুদেব পঞ্চাশৎ পর্য্যায়ে অবস্থিত; কিন্তু তাঁহার পিতামহ বিদুরথ (দেবমীঢ়ুষ নহেন)। ব্রহ্মপুরাণে দেবমীঢ়ুষ—এক স্থানে ক্রোষ্টুর পুত্ররূপে এবং অপর স্থানে ক্রোষ্টুর পৌত্ররূপে বিদ্যমান। সেই দুই দেবমীঢ়ুষের মধ্যে ক্রোষ্টু-পুত্র দেবমীঢ়ুষের পৌত্র—বসুদেব। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম প্রভৃতি—চন্দ্রবংশের চতুর্দ্দশ পর্য্যায়ে অবস্থিত। এদিকে আবার, উগ্রসেনের (শ্রীকৃষ্ণের মাতামহের) বংশ-পর্য্যায় সন্ধান করিতে গেলে, ব্রহ্মপুরাণে দেখিতে পাই,—তিনি চন্দ্রবংশের একপঞ্চাশৎ পর্য্যায়ে বিদ্যমান। হরিবংশেও এই অসামঞ্জস্য! সেখানেও, বসুদেব চন্দ্রবংশের দ্বাদশ পর্য্যায়ে অবস্থিত রহিলেও, উগ্রসেন পঞ্চপঞ্চাশৎ পর্য্যায়ে বিদ্যমান। অণু, দ্রুহ্যু, তুর্ব্বসু প্রভৃতির বংশ সম্বন্ধেও এইরূপ গণ্ডগোলের অবধি নাই। বিষ্ণুপুরাণে দেখিতে পাই,—চন্দ্রবংশের পঞ্চদশ পর্য্যায়ভুক্ত তুর্ব্বসু-বংশ-সম্ভূত মরুত্ত, দুষ্মন্তকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন; অথচ, ঐ পুরাণের পুরুবংশান্তর্গত দুষ্মন্ত চন্দ্রবংশের চতুর্ব্বিংশ পর্য্যায়ে বিদ্যমান। হরিবংশে আবার মরুত্তের সম্মতা নাম্নী কন্যার পুত্ররূপে দুষ্মন্ত পরিচিত। শ্রীমদ্ভাগবতে, মরুত্ত-পুত্র দুষ্মন্ত সপ্তদশ পর্য্যায়ে অবস্থিত। ব্রহ্মপুরাণে তুর্ব্বসু এবং পুরুর বংশে দুই বার দুষ্মন্তের নাম আছে। পুরুবংশের দুষ্মন্ত, চন্দ্রবংশের বিংশ পর্য্যায়ে আছেন; কিন্তু তিনিই আবার চতুর্দ্দশ পর্য্যায়-ভুক্ত (তুর্ব্বসু-বংশ-সম্ভূত) মরুত্তের পালক-পুত্র। পুরু-বংশে,—দুষ্মন্তের পুত্রের নাম ভরত; আর তুর্ব্বসু-বংশে তাঁহার পুত্রের নাম—করূরোম। নহুষের ভ্রাতা অনেনার বংশ, ব্রহ্মপুরাণে এবং হরিবংশে দৃষ্ট হয়। ধন্বন্তরি, দিবোদাস, অলর্ক প্রভৃতি এই বংশের প্রধান পুরুষ। এতদ্ভিন্ন হরিবংশে পুরুবংশের অধস্তন অষ্টাবিংশ পর্য্যায় হইতে পুনরায় ধন্বন্তরির বংশ দৃষ্ট হয়। তাঁহার সহিত এই অনেনা-বংশ-সম্ভূত ধন্বন্তরির বংশের পার্থক্য নাই বলিলেও চলে। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের মতে, তিনি (নহুষ-ভ্রাতা) ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশ-সমুদ্ভূত! হরিবংশে, নহুষ-ভ্রাতা অনেনার অধস্তন একাদশ পর্য্যায়ে ক্ষত্রবৃদ্ধ অবস্থিত। হরিবংশের মতে,—অলর্কের বংশ আছে। ব্রহ্মপুরাণের মতে,—তাঁহার বংশ নাই। ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে অলর্কের বংশলতায় নামেরও অনেক ইতর-বিশেষ আছে। *

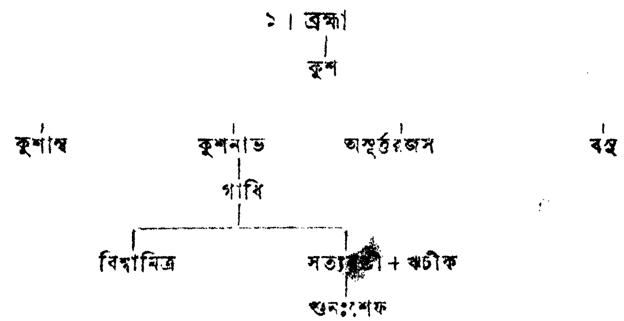
উপসংহারে বিশ্বামিত্র ও পরশুরাম প্রভৃতির বংশলতা আলোচনা করিতেছি। হরিবংশে, দুই স্থলে দুই বংশে, বিশ্বামিত্র ও পরশুরাম বিদ্যমান। প্রথমতঃ আমরা দেখিতে পাই,—আয়ুর ভ্রাতা অমাবসুর বংশে, সপ্তদশ পর্য্যায়ে বিশ্বামিত্র এবং ঊনবিংশ পর্য্যায়ে পরশুরাম বিদ্যমান। তার পর আবার, ঐ হরিবংশের পুরুবংশান্তর্গত রৌদ্রাশ্বের বংশে, দ্বাত্রিংশ পর্য্যায়ে, বিশ্বামিত্রের অস্তিত্ব দেখিতে পাই। † বিষ্ণুপুরাণেও বিশ্বামিত্র অমাবসুর বংশোদ্ভব বটেন, কিন্তু অষ্টাদশ পর্য্যায়ে বিদ্যমান; এবং তাঁহার পিতামহের নাম (হরিবংশের অনুরূপ 'কুশিক' নহে) কুশাম্ব। শ্রীমদ্ভাগবতে, পুরূরবা-পুত্র বিজয়ের বংশে (অমাবসুর বংশে নহে) অষ্টাদশ পর্য্যায়ে বিশ্বামিত্র

বিশ্বামিত্রের প্রসঙ্গ।

* এই গ্রন্থের ৩০৭ এবং ৩২৬ পৃষ্ঠায় অনেনা-বংশ দ্রষ্টব্য।

† এই গ্রন্থের ৩০৭ ও ৩১১ পৃষ্ঠায় হরিবংশের বংশ-লতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই ইহা প্রত্যক্ষীভূত হইবে।

আছেন ; কিন্তু তাঁহার পিতামহের নাম—কুশাম্ব। অগ্নিপুরাণে পুরুবংশান্তর্গত ভদ্রাশ্ব-বংশের ত্রয়স্ত্রিংশ পর্য্যায়ে এবং ব্রহ্মপুরাণে অমাবসু-বংশের সপ্তদশ পর্য্যায়ে,—বিশ্বামিত্র বিদ্যমান। আবার রামায়ণে দেখিতে পাই,—প্রজাপতি হইতে মাত্র অধস্তন চতুর্থ পুরুষে বিশ্বামিত্র অবস্থিত। রামায়ণের আদিকাণ্ডে, দ্বাত্রিংশ এবং চতুস্ত্রিংশ সর্গে, এই বিশ্বামিত্রের যে বিবরণ লিখিত আছে, তাহা স্থূলতঃ এই ;—'কুশ-নামক জনৈক সুপ্রতিষ্ঠিত ব্রহ্ম-তনয় ছিলেন। তিনি সদৃশী কুলীনা-পত্নী বৈদর্ভীতে—কুশাম্ব, কুশনাভ, অসূর্ত্তরজস ও বসু নামক আত্ম-তুল্য মহাবল-সম্পন্ন চারিটী পুত্র উৎপাদন করেন। কুশনাভের গাধি নামে এক পরমধার্ম্মিক পুত্র জন্মিয়াছিল। তিনি বিশ্বামিত্রের জনক। বিশ্বামিত্রের ভগ্নীর নাম—সত্যবতী। তিনি ঋচীকের পত্নী। তাঁহার পুত্রের নাম—শুনঃশেফ।' পুরাণ-সমূহের বংশ-লতার সহিত এ বংশ-লতার কি বিষম পার্থক্যই দৃষ্ট হয়! পুরাণে বিশ্বামিত্র কোথাও ত্রয়স্ত্রিংশ পর্য্যায়ে বিদ্যমান ; কিন্তু রামায়ণে তিনি ব্রহ্মা হইতে চতুর্থ পর্য্যায়ে অবস্থিত। রামায়ণের হিসাবে বিশ্বামিত্রের বংশ-লতা ;—



এই ত ব্যাপার! এ অসামঞ্জস্য দেখিয়াও কেহ কি বলিতে সাহস করেন,—ভারতের প্রাচীন নৃপতিগণের বংশ-পর্য্যায় অক্ষুণ্ণ আছে? ফলতঃ, বংশ-পর্য্যায়ে যে ক্রমভঙ্গ হইয়াছে, একের বংশ অন্যের বংশে গিয়া সংযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে কোনই সংশয় নাই। সুতরাং, ভারতবর্ষের প্রাচীনত্ব-তত্ত্ব আলোচনা করিতে হইলে, গড়ে নৃপতিগণের শাসনকাল ধরিয়া তাহা নির্ণয় করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। যদি কেহ কোনও একটী পুরাণের বংশ-লতা ধরিয়া, প্রাচীনত্ব-নির্ণয়ে চেষ্টান্বিত হন, তিনি নিশ্চয়ই ভ্রমে পতিত হইবেন। মনে করুন,—যদি কেহ রামায়ণ পাঠ করিয়া, বিশ্বামিত্রের বংশ-লতা স্থির করিয়া লন ; তাহা হইলে, ত্রেতাযুগে বিশ্বামিত্রের বিদ্যমানতা সম্ভবপর কি? যদি বলেন—সম্ভবপর, তাহা হইলে পাশ্চাত্য হিসাবে, পৃথিবী সৃষ্টির কয় বৎসর পরে সম্ভবপর? আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, রাজস্থানের ইতিহাসে কর্ণেল টড এক এক রাজার রাজত্বকাল গড়ে কুড়ি বৎসর করিয়া ধরিয়াছেন। সে হিসাবে ধরিতে গেলে,—সৃষ্টির আদিভূত ব্রহ্মা হইতে বিশ্বামিত্রের ব্যবধান আশী বৎসরের অধিক হইতে পারে না। আর তাহা হইলে, ত্রেতাযুগে তখন পৃথিবী সৃষ্টির পর আশী বৎসর মাত্র অতীত হইয়াছিল,—মানিয়া লইতে হয়। কিন্তু তাহাই কি ঠিক? এ হিসাব, অন্ধের হস্তি-দর্শনবৎ একদেশ-দর্শিতার পরিচায়ক নহে কি? ঋগ্বেদ-সংহিতায় বিশ্বামিত্র ঋষি বহু সূক্তের প্রবর্তক।

তৃতীয় মণ্ডলে সূক্ত-প্রবর্ত্তকগণের মধ্যে তাঁহার নাম পুনঃপুনঃ উল্লিখিত। সেই সূক্ত-প্রবর্ত্তকগণের মধ্যে তাঁহার দুই পুত্রের পর্য্যন্ত পরিচয় পাওয়া যায়। সে দুই পুত্রের এক জনের নাম—মধুচ্ছন্দা ঋষি; অপরের নাম—ঋষভ ঋষি। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের প্রথম দশটী সূক্তেই বিশ্বামিত্র-পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষির নাম আছে। এখন, ঋগ্বেদের এই বিশ্বামিত্র এবং রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ-পরম্পরার বিশ্বামিত্র, একই ব্যক্তি কিনা—কে নির্ণয় করিবে?

বংশ-পর্য্যায় আলোচনায় সূর্য্য-বংশের সহিত চন্দ্রবংশের সম্বন্ধ-তত্ত্ব নির্ণয় করিবার প্রয়াস পাইলে, আরও অধিকতর সমস্যার মধ্যে পতিত হইতে হয়। পুরাণ-পাঠক-মাত্রেই

বিবিধ বক্তব্য।

দশরথের সখা রোমপাদের সহিত পরিচিত আছেন। আমরাও একাধিক বার রোমপাদের নাম উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু রোমপাদ এবং দশরথ বংশ-লতার যে যে স্থান অধিকার করিয়া আছেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে কখনই সম-সাময়িক বলিয়া মনে হয় না। রামায়ণের দশরথ অষ্টত্রিংশ পর্য্যায়ে, ব্রহ্মপুরাণের দশরথ অষ্ট-পঞ্চাশৎ পর্য্যায়ে এবং বিষ্ণুপুরাণের দশরথ সপ্তষষ্টিতম পর্য্যায়ে অবস্থিত; কিন্তু অঙ্গ-দেশাধিপতি রোমপাদ, চন্দ্রবংশের বংশ-লতায়, হরিবংশে ষষ্ঠত্রিংশ পর্য্যায়ে, বিষ্ণুপুরাণে অষ্টাবিংশ পর্য্যায়ে, শ্রীমদ্ভাগবতে ষড়বিংশ পর্য্যায়ে, অগ্নিপুরাণে ত্রিংশ পর্য্যায়ে, এবং ব্রহ্মপুরাণে চতুস্ত্রিংশ পর্য্যায়ে বিদ্যমান। এ পার্থক্য যদি মানিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে দশরথ এবং রোমপাদকে সম-সাময়িক বলিয়া স্বীকার করা দুঃসাধ্য! অথচ, সকল পুরাণেই তাঁহাদিগের সম-সাময়িকত্ব উল্লিখিত হইয়াছে। এ ক্ষেত্রে, চন্দ্রবংশের বংশ-লতায়, রোমপাদের পূর্ব্বপুরুষগণের অনেকের নাম যে বাদ পড়িয়া গিয়াছে, তাহা স্বতঃই অনুভূত হয়। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন রাবণকে বন্ধন করিয়াছিলেন; শ্রীরামচন্দ্র রাবণের সংহার-সাধন করেন। এদিকে আবার, পরশুরামের হস্তে কার্ত্তবীর্য্য নিহত হন এবং শ্রীরামচন্দ্রের নিকট পরশুরামের দর্প চূর্ণ হয়। এ হিসাবে, শ্রীরামচন্দ্র, পরশুরাম, রাবণ এবং কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন সকলেই সম-সাময়িক হওয়া সম্ভবপর। কিন্তু অন্যত্র আবার দেখিতে পাই,—শ্রীরামচন্দ্রের বহুতর পূর্ব্ববর্ত্তী পুরুষ সগরের হস্তে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের তালজঙ্ঘ-নামধেয় পুত্রগণ নিহত হইয়াছিল। রামায়ণে, দশাধিক শততম সর্গে, লিখিত আছে,—'সগরের পিতার নাম—অসিত (পুরাণের মতে—বাহু বা বাহুক)। হৈহয়, তালজঙ্ঘ, শূর ও শশবিন্দু প্রভৃতি রাজারা তাঁহার বিপক্ষ হইয়াছিলেন। রাজা অসিত যুদ্ধে সেই নৃপতি-চতুষ্টয়কে প্রথমে নিবারিত করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু পরিশেষে বিপক্ষ-বলের বাহুল্য-বশতঃ নগর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বহুকাল পরে তাঁহার পুত্র সগর জন্মগ্রহণ করিয়া সেই পিতৃশত্রুগণকে পরাভূত করেন।' রামায়ণের এই বর্ণনাক্রমে হৈহয়, শশবিন্দু প্রভৃতি রাজগণ তালজঙ্ঘের সম-সাময়িক। কিন্তু বংশ-তালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে প্রতীত হয়,—তালজঙ্ঘের ঊর্দ্ধতন একাদশ পুরুষে হৈহয় বিদ্যমান! এস্থলে কি মীমাংসা সম্ভবপর,—কেহ নির্ণয় করিতে পারেন কি? এ সকল বিষয় আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়,—একই বংশে একাধিক হৈহয়, তালজঙ্ঘ ও কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; অথবা ঐ সময়ে অন্য বংশেও হৈহয়, তালজঙ্ঘাদির

বিদ্যমানতা অসম্ভব নহে। বংশ-লতার অপূর্ণতা এতদ্দারাও প্রতীত হয় না কি? জনক-দুহিতা জানকী, শ্রীরামচন্দ্রের সহিত পরিণীতা হইয়াছিলেন। কিন্তু নিমি-বংশের সীতার সহিত ইক্ষ্বাকু-বংশের শ্রীরামচন্দ্রের বংশ-পর্য্যায়ে কত পার্থক্য, একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতের বংশ-লতার দৃষ্টান্তেই তাহা বিশদীকৃত! শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীরামচন্দ্র অষ্টষষ্টিতম পর্য্যায়ে এবং শ্রীমদ্ভাগবতের সীতা ত্রিংশ পর্য্যায়ে বিদ্যমান। পর্য্যায়ে কত পার্থক্য;—বুঝিয়া দেখুন। বংশ-লতায় ক্রম-ভঙ্গ ভিন্ন,—ইহা আর কি হইতে পারে? চন্দ্রবংশের ও সূর্য্যবংশের মধ্যে সময় সময় যে বিবাহ-সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাও এতদুপলক্ষে বিশেষ আলোচনার যোগ্য বলিয়া মনে হয়। ব্রহ্মপুরাণে যযাতির মহিষীগণের মধ্যে কুকুৎস্থ-কন্যার উল্লেখ আছে। চন্দ্রবংশের জহ্নু, যুবনাশ্ব-কন্যা কাবেরীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কুকুৎস্থ-কন্যার গর্ভে যযাতির কোনও পুত্র-সন্তান জন্মিয়াছিল কি না, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না বটে; কিন্তু জহ্নুর পুত্র সুনন্দ, ব্রহ্মপুরাণের মতে, কাবেরীর গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। জহ্নু ও কাবেরীর এই বিবাহ-ব্যাপারে বুঝা যায়,—সূর্য্যবংশীয় যুবনাশ্ব এবং চন্দ্রবংশীয় জহ্নু উভয়েই সম-সাময়িক ছিলেন। হরিবংশের সহিত এ বিষয়ে ব্রহ্মপুরাণের এক মত দৃষ্ট হয়। তবে হরিবংশে তাঁহাদের পুত্রের নাম সুসহ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। শেষোক্ত বিবাহে পর্য্যায়-সম্বন্ধে অবশ্য বিশেষ কিছু অসামঞ্জস্য দৃষ্ট হয় না; যেহেতু, যুবনাশ্ব—সূর্য্যবংশের বংশ-লতায় একাদশ হইতে চতুর্দ্দশ পর্য্যায়ের মধ্যে অবস্থিত; এবং জহ্নু চন্দ্রবংশের কোনও বংশ-লতায় দশম বা একাদশ পর্য্যায়ে এবং কোনও বংশ-লতায় অষ্টাবিংশ পর্য্যায়ে বিদ্যমান আছেন। কিন্তু প্রথমোক্ত বিবাহে নহুষ-পুত্র যযাতি বংশ-লতায় পঞ্চম হইতে অষ্টম পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত; আর কুকুৎস্থ, রামায়ণের মতে, ষড়্‌বিংশ পর্য্যায়ে এবং অন্যান্য পুরাণের মতে, অষ্টম বা নবম পর্য্যায়ে অধিষ্ঠিত। সুতরাং, প্রথমোক্ত বিবাহে কিঞ্চিৎ অসামঞ্জস্য ঘটিতেছে না কি? হরিবংশে পুরুকুৎসের কন্যার সহিত কুশিকের বিবাহ-প্রসঙ্গ লিখিত আছে; সেখানে কুশিক, গাধির পিতা বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। পুরুকুৎস, সূর্য্যবংশের বংশ-লতায় মান্ধাতার পুত্ররূপে চতুর্ব্বিংশ বা পঞ্চবিংশ পর্য্যায়ে বিদ্যমান; কিন্তু কুশিক, প্রায়শঃই পঞ্চদশ পর্য্যায়ের মধ্যে; কেবল অগ্নিপুরাণে একত্রিংশ পর্য্যায়ে অবস্থিত। প্রচলিত বংশ-লতার অনুসরণ করিলে এ ক্ষেত্রেই বা কি করিয়া সামঞ্জস্য-সাধন সম্ভবপর! এইরূপ যে দিক দিয়াই দেখি, বংশ-পর্য্যায় যে অক্ষুণ্ণ আছে—কোনক্রমেই মানিয়া লইতে পারি না। বংশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের পিতা বা প্রপিতামহ সম্বন্ধে প্রায়ই অনৈক্য নাই—স্বীকার করি। সেরূপ ব্যক্তিগণের তিন পুরুষের পরিচয়-পর্য্যায়ে প্রায়ই বিশৃঙ্খলা ঘটে নাই,—তাহা মুক্ত-কণ্ঠে বলিতে পারি। কিন্তু সর্ব্ব-সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া বংশ-লতা উদ্ধার করিতে হইলে, বহু সাধনা ও গবেষণার প্রয়োজন; তাহাতে সকল শাস্ত্র-গ্রন্থ মিলাইয়া, সংযোগ-বিয়োগ করিয়া, নূতন বংশ-লতা প্রস্তুত করিতে হয়। আমাদের মতে, সকল বিষয়ে সামঞ্জস্য-সাধন করিতে হইলে, বিশেষ বিশেষ স্থানে, বংশ-লতায় 'অমুকের পুত্র অমুক'—এরূপ পাঠের পরিবর্ত্তে, 'অমুকের বংশ-সম্ভূত অমুক' এইরূপ পাঠই সমীচীন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

অন্যান্য নৃপতিগণ।

[নল-দময়ন্তীর উপাখ্যান,—ভীম, ঋতুপর্ণ, ভঙ্গাস্বর প্রভৃতির প্রসঙ্গ;—সাবিত্রী-সত্যবানের উপাখ্যান,—অশ্বপতি, দ্যুমৎসেন প্রভৃতির আলোচনা,—অযোধ্যার আদি ও শেষ নৃপতিদ্বয়—ঋষভ ও ক্ষুপ,—ইক্ষ্বাকু, মনু পুত্র কিনা,—ক্ষুপ, প্রসন্ধি ও ইক্ষ্বাকুর বিবরণ;—বিদর্ভ-রাজ দণ্ড, শ্বেত এবং সুদেবের কাহিনী;—মরুত্তের যজ্ঞ এবং রাবণের দিগ্বিজয়;—নৃগ এবং ব্রহ্মদত্তের উপাখ্যান;—শ্রীবৎস-চিন্তার উপাখ্যান;—ইন্দ্রদ্যুম্ন এবং পুরুষোত্তম জগন্নাথ,—উৎকলখণ্ডে ও অন্যান্য গ্রন্থে পার্থক্য;—কাশীনরেশগণ,—সুপ্রতীক, দুর্জ্জয়, সুদ্যুম্ন, দিবোদাস, প্রতর্দ্দন, সুদেব প্রভৃতি;—বীতহব্যের ব্রাহ্মণত্ব-প্রাপ্তি,—তদ্বংশীয় গৃৎসমদ, শৌনক প্রভৃতি,—কাশীর পুরাবৃত্ত;—অলর্কের প্রসঙ্গ,—কুবলয়াশ্ব ও মদালসা,—পাতালকেতু দৈত্য এবং অশ্বতর নাগরাজ;—অলর্ক ও শৈব্য,—পদ্ম-পুরাণোক্ত দ্যুমদ, ঋতস্ত, সুরথ, মহীরথ, শ্রীধর, বীরমণি প্রভৃতি রাজন্যবর্গ;—মহাভারতোক্ত শিবি, সুদর্শন, সেহুক, নীল, বৃষদর্ভ, পৌরিক, বীরদ্যুম্ন, শত্রুঞ্জয় প্রভৃতি নৃপতিগণ;—ঋগ্বেদোক্ত বহুতর নৃপতিগণ;—সুদাস, যদু, তুর্ব্বশ, দ্রুহ্য, অণু, পুরু, আয়ু, অতিথিগ্ব, সুশ্রবশ, পুরুকুৎস, চিত্র, জহ্নু, ত্র্যরুণ ও কুৎস প্রভৃতি রাজন্যবর্গ,—ঋজিশ্বা, আসঙ্গ, পৃথুশ্রবা প্রভৃতি রাজর্ষিগণ;—সূর্য্য ও চন্দ্রবংশের নৃপতিগণের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ-তত্ত্ব;—বিবিধ।]

বংশ-পর্য্যায়ে সন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না, অথচ প্রসিদ্ধির অবধি নাই,—এরূপ নৃপতির সংখ্যাও অল্প নহে। নল-দময়ন্তীর উপাখ্যানে রাজা নলের নাম অনেকেই অবগত আছেন; কিন্তু সূর্য্যবংশের বা চন্দ্রবংশের বংশ-লতায় কোথাও তাঁহার অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় না! মহাভারত, রামায়ণ এবং পুরাণ-পরম্পরা আলোড়ন করিলে দেখিতে পাই,—তিনি নিষধ দেশের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম,—বীরসেন। দময়ন্তীর সহিত তাঁহার স্বয়ংবর হয়। দময়ন্তী—বিদর্ভরাজ-নন্দিনী। তাঁহার পিতার নাম—ভীম। বলা বাহুল্য, এই ভীমের নামও কোনও বংশ-লতায় দৃষ্ট হয় না; অথচ, তিনি চন্দ্রবংশীয় বলিয়া পরিচয় পাওয়া যায়। নল-দময়ন্তীর স্বয়ংবর কৌতূহল-প্রদ। তাঁহাদের দাম্পত্য-প্রেম আদর্শস্থানীয়। নল-দময়ন্তী উভয়েই অসামান্য রূপ-লাবণ্য-সম্পন্ন ছিলেন। তাঁহাদের উভয়েরই রূপ-গুণের বিষয় লোক-মুখে প্রচারিত হইয়াছিল। তাঁহারা উভয়েই উভয়কে মনে মনে বরণ করিয়াছিলেন। নল ও দময়ন্তী যখন অন্তরে অন্তরে পরস্পরের প্রতি আসক্ত, সেই সময়ে নল আপন অন্তঃপুর-সমীপস্থ কানন-মধ্যে সুবর্ণ-পক্ষ-বিশিষ্ট কতকগুলি হংসকে বিচরণ করিতে দেখিতে পান। তাহারই একটী হংস নল কর্ত্তৃক ধৃত হয়। সেই হংস আত্ম-প্রাণ রক্ষার জন্য নলের নিকট প্রতিজ্ঞা করে,—"আমি দময়ন্তীর নিকট গমন করিয়া আপনার বিষয় এরূপ বর্ণন করিব যে, তিনি আপনা ভিন্ন অন্য কোনও পুরুষকে পতিরূপে গ্রহণ করিবেন না।" হংসের এই প্রতিজ্ঞায় নল তাহাকে ছাড়িয়া দেন।

নল-দময়ন্তী।

হংস নিষধ দেশ হইতে বিদর্ভ দেশে গমন করে। সেখানে দময়ন্তীর সহিত হংসের সাক্ষাৎ হয়। দময়ন্তী হংসের নিকট নলের রূপ-গুণের পরিচয় বিশেষরূপেই অবগত হন। হংসের দ্বারা নল-দময়ন্তীর মধ্যে বাগ্‌দান সম্পন্ন হইয়া যায়। যথা-সময়ে দময়ন্তীর স্বয়ংবর-বার্ত্তা ঘোষিত হইলে, দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, এবং নানা স্থানের রাজগণ দময়ন্তীর প্রণয়-প্রার্থী হন। দেবতারা নলের নিকট আপন আপন পরিচয় প্রদান করিয়া তাঁহাকে অনুরোধ করেন,—"তুমি দময়ন্তীকে আমাদের আগমন-সংবাদ জ্ঞাত কর এবং আমাদিগের কাহাকেও পতি-রূপে বরণ করিতে উপদেশ দাও।" যথাসময়ে দময়ন্তীর নিকট নল দেবতাদিগের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু দময়ন্তী তাহা শুনিলেন না; তিনি বলিলেন,—"আমি আপনাকেই পতিত্বে বরণ করিব। মনে-প্রাণে আপনাকেই বরণ করিয়া রাখিয়াছি।" এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া, দময়ন্তীর এক-নিষ্ঠা পরীক্ষা করিবার জন্য, দেবগণ এক কৌশল-জাল বিস্তার করিলেন। ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, যম—চারি দেবতা তখন চারিটী নলরূপে অবতীর্ণ হইলেন। সুতরাং পাঁচটী নল-মূর্ত্তির মধ্য হইতে নল রাজাকে চিনিয়া লওয়া দময়ন্তীর পক্ষে বড়ই দুষ্কর হইয়া উঠিল। দময়ন্তী তখন মনে মনে দেবতাদিগের কৃপা-ভিক্ষা চাহিলেন; মনে মনে কহিলেন,—"আমি নল-রাজাকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছি। আমার সত্য-ধর্ম্ম-রক্ষার্থ আপনারা আমার নিকট তাঁহাকে বিদিত করিয়া দেন।" দময়ন্তীর একাগ্রতায় দেবতারা সন্তুষ্ট হইলেন। সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহারা আপন আপন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলে, দময়ন্তী নল-রাজার গলদেশে বর-মাল্য প্রদান করিলেন। দময়ন্তীর পাণি-গ্রহণ জন্য কলির একান্ত আগ্রহ হইয়াছিল। কিন্তু তিনি আসিয়া স্বয়ংবর-সভায় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই, স্বয়ংবর-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া যায়; সুতরাং তিনি নলের উপর ক্রুদ্ধ হন। তখন হইতেই নলের ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি কলির খর-দৃষ্টি পতিত হয়। স্বয়ংবরের পর দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলে, নল-রাজার একটী অনাচারের পরিচয় পাইয়া, কলি তাঁহার দেহে প্রবিষ্ট হন। সেই অবসরে নলের ভ্রাতা পুষ্কর নলকে দ্যূত-ক্রীড়ায় আহ্বান করেন। পুষ্করের সহিত অক্ষ-ক্রীড়ায় নলকে রাজ্যভ্রষ্ট ও বনবাসী হইতে হয়। দময়ন্তী পতির অনুগামিনী হন। ক্রমশঃ কলি-প্রভাবে তাঁহাদের অশেষ দুরবস্থা হয়; এমন কি, তাঁহারা দুই জনে এক বস্ত্র পরিধান করিতে বাধ্য হন। সেই অবস্থায়, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হইয়া, বুদ্ধি-ভ্রংশ-হেতু, নিদ্রিতা সহধর্ম্মিণীকে বনমধ্যে একাকী ফেলিয়া, নল পলায়ন করেন। অর্দ্ধ বস্ত্র দময়ন্তীর পরিধানে রাখিয়া এবং অর্দ্ধ বস্ত্র আপনি কাটিয়া লইয়া, নল-রাজা সেই বন হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন। নিদ্রাভঙ্গে দময়ন্তী, পতিকে দেখিতে না পাইয়া, ইতস্তত। অনুসন্ধান করিতে করিতে, করুণ-ক্রন্দনে বন-ভূমি বিকম্পিত করিয়া তুলেন। পরিশেষে স্বার্থবাহ বণিক্‌গণের সাহায্যে দময়ন্তী চেদিরাজ সুবাহুর আলয়ে উপনীত হন। সেখানে দময়ন্তী আপনাকে সৈরিন্ধ্রী বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু রাজ-মাতা তাঁহাকে আপন দুহিতার ন্যায়ই যত্ন করিতেন। এদিকে কন্যা ও জামাতার রাজ্যচ্যুতির সংবাদ অবগত হইয়া, বিদর্ভ-রাজ ভীম, তাঁহাদের সন্ধানের জন্য চারিদিকে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহাতে চেদি-রাজ্য হইতে দময়ন্তী বিদর্ভ-রাজ্যে পুনরানীত হইয়াছিলেন।

কিন্তু নলের সন্ধান অনেক দিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হয় নাই। দময়ন্তীকে পরিত্যাগের পর, বিপদের উপর বিপদ্ আসিয়া নল-রাজাকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল। সেই সময়ে তাঁহার আকৃতি-প্রকৃতি পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল; এবং তিনি অদৃষ্ট-চক্রের পেষণে নিষ্পেষিত হইতে হইতে ঋতুপর্ণ রাজার আলয়ে অশ্ব-রক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সেখানে তিনি বাহুক নামে পরিচিত হন। এই সময়ে বিদর্ভ-রাজ দময়ন্তীর পুনঃ-স্বয়ংবরের বার্ত্তা ঘোষণা করেন। ঋতুপর্ণ সেই স্বয়ংবর-সভায় উপস্থিত হইবার জন্য আমন্ত্রিত হন। সেই স্বয়ংবর-সভায় ঋতুপর্ণকে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য বাহুক-বেশী নল-রাজ, তাঁহার সারথি-রূপে রথ-পরিচালনা করিয়াছিলেন। অশ্ব-পরিচালনায় বাহুকের অসীম কৃতিত্বের পরিচয় পাইয়া, ঋতুপর্ণ তাঁহার নিকট অশ্ব-বিদ্যা শিক্ষা করিতে চাহেন। নল তাঁহাকে অশ্ব-বিদ্যা শিক্ষা দিলে, ঋতুপর্ণ নলকে অক্ষ-বিদ্যা শিক্ষা দেন, এবং সেই অক্ষ-বিদ্যা শিক্ষার ফলে কলি নলকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। যাহা হউক, স্বয়ংবর-সভার আয়োজন হইলেও, দময়ন্তী নল ভিন্ন অন্য কাহাকেও পতিত্বে বরণ করিতে সম্মত হন না। তিনি মনে মনে নলেরই পুনরাগমন কামনা করিয়া দিবা-নিশি ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইতে থাকেন। নল-রাজা কতকগুলি আশ্চর্য্য বিদ্যা জানিতেন। তিনি জল ও অগ্নি ভিন্ন, জলের ও অগ্নির কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিতেন; পুষ্প-সমূহ তাঁহার করে মর্দ্দিত হইলেও নষ্ট হইত না; প্রত্যুত, সমধিক হৃষ্ট ও সুগন্ধিযুক্ত হইত। দময়ন্তীর বিশ্বাস ছিল, তাঁহার পুনঃ-স্বয়ংবর সংবাদ পাইলে, যে অবস্থায়ই থাকুন, নল-রাজা নিশ্চয়ই স্বয়ংবর-সভায় উপস্থিত হইবেন। সুতরাং দময়ন্তী আপন পরিচারিকাকে স্বয়ংবর উপলক্ষে সমাগত ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ সন্ধান লইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। এবংবিধ অনুসন্ধানের ফলে, দময়ন্তীর নিকট বাহুক-বেশী নলের পরিচয় অজ্ঞাত রহিল না। অবিলম্বেই দময়ন্তীর সহিত নলের মিলন হইল। রাজা ঋতুপর্ণ তখন ছদ্মবেশী নলকে চিনিতে পারিয়া, স্বরাজ্যে প্রস্থান করিলেন। এদিকে নল-রাজও এক মাস কাল বিদর্ভ-রাজ্যে বসতি করিয়া, নিষধ-রাজ্যাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। সেখানে নলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পুষ্কর রাজা হইয়াছিলেন। আবার পুষ্করের সহিত তাঁহার দ্যূত-ক্রীড়া আরম্ভ হইল। ক্রীড়ার জয়লাভ করিয়া নল আপন রাজ্য ফিরিয়া পাইলেন। দিন দিন তাঁহার যশোরশ্মি দিকে দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। এখন কাব্যে, পুরাণে, গাথায়—সর্ব্বত্র তাঁহার কীর্ত্তি বিঘোষিত। এখন 'পুণ্যশ্লোক'-গণের মধ্যে তিনি অন্যতম। "পুণ্যশ্লোকো নলো রাজা পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ। পুণ্যশ্লোকা চ বৈদেহী পুণ্যশ্লোকো জনার্দ্দনঃ॥" মহারাজ নলের এক পুত্র ও এক কন্যা হয়। পুত্রের নাম—ইন্দ্রসেন; কন্যার নাম—ইন্দ্রসেনা। * রাজা ঋতুপর্ণ অযোধ্যার অধিপতি ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম—অযুতাশ্ব বা অযুতাজিৎ। মহাভারতের মতে, ঋতুপর্ণের পিতার নাম—ভঙ্গাসুর। অযুতাশ্ব, অযুতাজিৎ বা ভঙ্গাসুর এক ব্যক্তি কিনা—তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তবে সূর্য্যবংশের

* মহাভারত, বনপর্ব্ব, ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় হইতে একোনাশীতিতম অধ্যায়ে "নলোপাখ্যান"-প্রকরণ দ্রষ্টব্য। শিবপুরাণে এবং ব্রহ্মপুরাণে নল-দময়ন্তীর জন্মান্তর-বৃত্তান্ত লিখিত আছে।

বংশ-লতায় ইক্ষ্বাকুর বংশে ষট্‌চত্বারিংশ পর্য্যায়ে, বিষ্ণুপুরাণে ত্রি-পঞ্চাশ পর্য্যায়ে, হরিবংশে এক-পঞ্চাশ পর্য্যায়ে, শিবপুরাণে ত্রি-চত্বারিংশ পর্য্যায়ে এবং শ্রীমদ্ভাগবতে এক-পঞ্চাশ পর্য্যায়ে, ঋতুপর্ণ নামে অযোধ্যার এক রাজার পরিচয় পাই। নলের সহিত তাঁহার বন্ধুত্বের পরিচয়ও প্রায় প্রতি পুরাণেই দৃষ্ট হয়। ইহাতে বুঝা যায়, রাজা ঋতুপর্ণ (ঋতপর্ণ) যখন অযোধ্যার সিংহাসনে অধিরূঢ়, সেই সময়ে নিষধ-রাজ্যে নল, বিদর্ভ-দেশে ভীম এবং চেদি-দেশে সুবাহু রাজত্ব করিতেন। কিন্তু ইঁহারা কোন্ বংশ-লতার কোন্ স্থান অধিকার করিয়া আছেন—নির্ণয় করা যায় না। ভীম নামে চন্দ্রবংশে একাধিক নৃপতির নাম দৃষ্ট হয় বটে; কিন্তু তাঁহাদের সহিত দময়ন্তীর পিতার কোনই সাদৃশ্য নাই। তাঁহাদের পুত্রের নামে এবং দময়ন্তীর ভ্রাতৃগণের নামে বিশেষ পার্থক্য আছে। তার পর, মহাভারতের মতানুসারে ভঙ্গাসুরকে যদি ঋতুপর্ণের পিতা বলিয়া মানিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে সূর্য্যবংশের বংশ-লতায় সে ঋতুপর্ণের স্থান কোথায়? রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে, চতুর্ব্বিংশ সর্গে, সীতা-দেবী দময়ন্তীর সহিত উপমিত হইয়াছেন। সুতরাং শ্রীরামচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তি-কালে কোনও এক সময়ে নল-দময়ন্তীর বিদ্যমানতা প্রতিপন্ন হয়। তাহাতেও শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতির ঊর্দ্ধতন পুরুষে ঋতুপর্ণ রাজার সম-সময়ে নল-দময়ন্তীর অস্তিত্ব সম্ভবপর। কিন্তু বংশ-লতায় দৃষ্ট হয়,—ঋতুপর্ণ, শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতির বহু পরবর্ত্তী অধস্তন পর্য্যায়ে বিদ্যমান। এদিকে, পুরাণে দুই জন নল বিশেষ বিখ্যাত। এক জন—বীরসেনাত্মজ; অপর জন—ইক্ষ্বাকু-কুলোদ্ভব।* অথচ ইক্ষ্বাকু-বংশে নিষধের পুত্র-রূপে যে নলকে দেখিতে পাই, নিষধাধিপতি বীরসেনের পুত্র নলের সহিত তাঁহার কোনও সম্বন্ধ আছে কিনা—বিবেচনার বিষয়।

তার পর, সাবিত্রী-সত্যবান! রামায়ণে, মহাভারতে, মৎস্যপুরাণে এবং দেবী-ভাগবতে সাবিত্রী-সত্যবানের কাহিনী বিবৃত আছে। মদ্রদেশে অশ্বপতি নামে এক ধর্ম্মনিষ্ঠ নরপতি ছিলেন। সাবিত্রী-মন্ত্রে আহুতি প্রদান করিয়া, সাবিত্রীর প্রীতি-সাধন-পূর্ব্বক, তিনি সাবিত্রী-নাম্নী কন্যা লাভ করেন। সত্যবানের সহিত সাবিত্রীর পরিণয়-কার্য্য সম্পন্ন হয়। শাল্বদেশে দ্যুমৎসেন নামে এক ধর্ম্মাত্মা ক্ষত্রিয় ভূপতি ছিলেন। সত্যবান তাঁহারই একমাত্র পুত্র। দ্যুমৎসেন এবং তাঁহার মহিষী অন্ধ হইয়াছিলেন; তাঁহাদের পুত্র সত্যবান তখন অল্প-বয়স্ক বালক মাত্র। সুতরাং সুবিধা পাইয়া দ্যুমৎসেনের কোনও পূর্ব্ব-শত্রু তাঁহাদিগের রাজ্য কাড়িয়া লন। স্ত্রী-পুত্র সহ অন্ধ দ্যুমৎসেন যখন অরণ্যবাসী, সেই সময়ে সাবিত্রীর সহিত সত্যবানের বিবাহ হয়। সত্যবান সত্যনিষ্ঠ, তেজস্বী ও শৌর্য্য-সম্পন্ন ছিলেন। সাবিত্রী মনে মনে তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করেন। বিবাহের পূর্ব্বে মহর্ষি নারদ, অশ্বপতির নিকট সত্যবানের বিষয় বর্ণন করিয়া বলেন,—"এই বিবাহে একটী প্রধান আপত্তির কারণ আছে। সত্যবান সর্ব্বগুণান্বিত হইলেও তাঁহার আয়ুষ্কাল শেষ-প্রায়। অদ্য হইতে এক বৎসর পূর্ণ হইলেই তিনি দেহ-ত্যাগ করিবেন।" রাজা অশ্বপতি সাবিত্রীর নিকট এই বিষম সমাচার জ্ঞাপন

সাবিত্রী-সত্যবান।

* "নলৌ দ্বাবেব বিখ্যাতৌ পুরাণে ভরতর্ষভ। বীরসেনাত্মজশ্চৈব যশ্চেক্ষ্বাকু-কুলোদ্ভব।"

করিলেও, সাবিত্রী প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না। সুতরাং, সাবিত্রীর সঙ্কল্প অনুসারে সত্যবানের সহিত তাঁহার উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। ক্রমশঃ সত্যবানের মৃত্যু-দিন নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল। পতির মৃত্যু সন্নিকট জানিতে পারিয়া, তিন দিবস পূর্ব্ব হইতে সাবিত্রী দিবানিশি উপবাসী থাকিয়া, 'ত্রিরাত্র' ব্রত অবলম্বন করিলেন। ব্রত-সমাপ্তির দিবসে সত্যবান, জনক-জননীর সেবার জন্য ফল ও কাষ্ঠ সংগ্রহে, দূর বনে গমন করিয়াছিলেন। শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর অনুমতি লইয়া, সাবিত্রীও সেই দিন সত্যবানের অনুসরণ করেন। সেই দিনই বন-মধ্যে সাবিত্রীর ক্রোড়ের উপর মস্তক রাখিয়া সত্যবানের ইহলীলা সাঙ্গ হয়। কিন্তু ব্রত-পরায়ণা, পতিগত-প্রাণা সাবিত্রী কোনক্রমেই সত্যবানকে পরিত্যাগ করিতে সম্মত হন না। যমদেব নিকটে আসিয়া সাবিত্রীকে কত প্রকারে প্রবোধ দেন, কত প্রকারে তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সাবিত্রী কোনও প্রবোধ, কোনও প্রলোভন, মানিতে চাহেন না। তখন তাঁহার ঐকান্তিকতা ও পতিপ্রাণতা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া, যমরাজ তাঁহাকে পাঁচটী বর প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন। সাবিত্রী তাহাতে বলেন,—"আমার শ্বশুর ও শ্বাশুড়ী দৃষ্টিশক্তি সহ রাজ্য-পদ পুনঃপ্রাপ্ত হউন। তাঁহাদের এক শত পুত্র এবং পতির ঔরসে আমারও এক শত পুত্র লাভ হউক। আমার পতি সত্যবান চারি শত বৎসর পরমায়ু লাভ করুন।" যমরাজ সন্তুষ্ট হইয়া সাবিত্রীকে সেই বরই প্রদান করেন। তখন, সুপ্তোত্থিতের ন্যায় সত্যবান জাগিয়া উঠেন। সংক্ষেপতঃ ইহাই সাবিত্রী-সত্যবানের উপাখ্যান। * সাবিত্রী—পতিব্রতাগণের অগ্রগণ্যা। তাঁহাদের প্রণয়—পবিত্র দাম্পত্য-অনুরাগের আদর্শ। রামায়ণের অযোধ্যা-কাণ্ডে ত্রিংশ সর্গে, রামের বন-গমনোপলক্ষে, সীতাদেবী শ্রীরামচন্দ্রকে বলিতেছেন,—

"দ্যুমৎসেন সুতং বীরং সত্যবন্তমনুব্রতাম। সাবিত্রীমিব মাং বিদ্ধি ত্বমাত্মবশবর্ত্তিনীম্॥"

"সাবিত্রী যেরূপ সত্যবানের অনুবর্ত্তিনী হইয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ আপনার অনুবর্ত্তিনী হইব।" যাহা হউক, এই সাবিত্রী-সত্যবানের উপাখ্যানে আমরা দুইটী দেশের যে দুই জন নৃপতির বা যে দুইটী রাজ-বংশের পরিচয় পাই, কোনও বংশ-লতার কোথাও তাঁহাদের অস্তিত্ব নাই। কিন্তু পুরাণাদির বর্ণনায় বুঝিতে পারা যায়,—শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতির রাজত্ব-কালের পূর্ব্বে শাল্বদেশে এবং মদ্রদেশে দ্যুমৎসেন ও অশ্বপতি নৃপতি বিদ্যমান ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে, চন্দ্রবংশে, জরাসন্ধের অধস্তন ষোড়শ পর্য্যায়ে, এক দ্যুমৎসেন নৃপতির নাম দৃষ্ট হয় বটে; কিন্তু তিনি এবং সত্যবানের পিতা দ্যুমৎসেন কখনই এক ব্যক্তি হইতে পারেন না,—হওয়া সম্ভবপরও নহে। অশ্বপতি নামে রামায়ণে এক নৃপতির পরিচয় আছে বটে; কিন্তু তিনি সাবিত্রীর পিতা অশ্বপতি নহেন। রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে চতুঃ-সপ্ততিতম সর্গে এবং উত্তরাকাণ্ডে অষ্টত্রিংশ সর্গে, তিনি কৈকেয়ীর পিতা, ভরতের মাতামহ, কেকয়-রাজ বলিয়া পরিচিত। তাহাতে দেখিতে পাই—শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক পর্য্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন।

---

* মহাভারত, বনপর্ব্ব, দ্বিনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় হইতে সপ্তনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়; দেবী-ভাগবত, নবম স্কন্ধ, ষড়্‌বিংশ হইতে অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়; মৎস্যপুরাণ, অষ্টাধিক দ্বিশততম অধ্যায় হইতে চতুর্দ্দশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

এক অযোধ্যার রাজ-সিংহাসনের ইতিবৃত্ত যদি অনুসন্ধান করি, তাহাতেই বা কি দেখিতে পাই! মহাপ্রস্থানের পূর্ব্বে শ্রীরামচন্দ্র আপন পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণের মধ্যে রাজ্য বণ্টন করিয়া দিয়া যান। বিন্ধ্য-পর্ব্বতের নিকট কুশের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীরামচন্দ্র সেই নগরের 'কুশাবতী' নাম রাখিয়াছিলেন। শ্রাবস্তি-নগরে লবের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কুশ—কোশল-রাজ্যের, এবং লব—উত্তর কোশলের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। শত্রুঘ্নের সুবাহু ও শত্রুঘাতী নামক তনয়দ্বয় যথাক্রমে মথুরা ও বৈদিশ-রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ভরতের পুত্র তক্ষ—তক্ষশীলায়,—এবং পুষ্কল—পুষ্কলাবতের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ-পুত্র অঙ্গদ এবং চন্দ্রকেতু—অঙ্গদীয়া এবং মল্লভূমিতে প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়াছিলেন। এইরূপে কুমারগণকে আপন-আপন রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিয়া, শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতি যখন মহাপ্রস্থান করেন, অযোধ্যা তখন শূন্য হইয়াছিল। পৌরজন সকলেই তাঁহাদের অনুসরণ করিয়াছিলেন। প্রাণি-গণের মধ্যে যাঁহারা সরযূজলে স্নান করিয়া দেহ-ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই নরদেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেবরথে দিব্যলোকে উপনীত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে বহু বৎসর কাল মনোহরা অযোধ্যাপুরী শূন্য পড়িয়া ছিল। অবশেষে, বহু বৎসর পরে, ঋষভ-রাজার রাজত্ব-কালে, অযোধ্যা-নগরী পুনরায় জনপূর্ণ হয়। রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে, চতুর্ব্বিংশত্যধিক শততম সর্গে অযোধ্যার জনশূন্যতা সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে,—

অযোধ্যার আদি ও শেষ।

"অযোধ্যাপি পুরী রম্যা শূন্যা বর্ষগণান্ বহূন্। ঋষভং প্রাপ্য রাজানং নিবাসমুপযাস্যতি॥"

'শ্রীরামচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর মনোহরা অযোধ্যাপুরী বহু বৎসর পর্য্যন্ত শূন্যা থাকিয়া, ঋষভ রাজার রাজত্ব-কালে, পুনরায় জনপূর্ণ হইবে।' সে ভবিষ্যৎ কাল কবে, কত দিন পরে এবং সে ঋষভই বা কোন্ বংশ-সম্ভূত,—কোথাও তাহার নিদর্শন নাই।

উপসংহারে যেমন ঋষভ, আরম্ভে তেমনই ক্ষুপ। রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে এবং মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব্বে ক্ষুপ নামক নৃপতির পরিচয় পাই। রামায়ণের মতে,—তিনিই পৃথিবীর আদি রাজা। সৃষ্টির আদি-কালে সত্যযুগে মনুষ্যদিগের কোনও রাজা ছিল না বলিয়া মনুজগণ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। ব্রহ্মা তখন দেবতাগণকে অংশ দিতে বলিয়া, 'ক্ষুপ' শব্দ করিয়া হাঁচিয়াছিলেন; তাহা হইতেই দেবতাদিগের অংশ লইয়া ক্ষুপ রাজা জন্মগ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য, পুরাণে ইক্ষ্বাকুর যে জন্ম-বিবরণ প্রকাশিত, ক্ষুপের জন্ম-বিবরণও এখানে প্রায় তদনুরূপ। অন্য দিকে, মহাভারতের অশ্বমেধ-পর্ব্বে চতুর্থ অধ্যায়ে যাহা লিখিত আছে, তাহাতে ক্ষুপকে ইক্ষ্বাকুর পূর্ব্ব-পুরুষ বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। সেখানে যুধিষ্ঠির ব্যাসদেবের নিকট রাজর্ষি মরুত্তের বিবরণ শ্রবণ করিতে চাহিতেছেন; আর, ব্যাস তাহাতে বলিতেছেন,—"হে তাত! সত্যযুগে মনু নামে প্রজাপালক দণ্ডধর রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র—প্রসন্ধি নামে বিখ্যাত। প্রসন্ধির পুত্র—ক্ষুপ। ক্ষুপের পুত্র—ইক্ষ্বাকু।" এইবার বুঝিবা সকল বংশ-লতা উল্টাইয়া যায়। প্রায় সকল পুরাণের বংশ-লতায় ইক্ষ্বাকুকেই মনুর পুত্র বলিয়া পরিচয় পাইয়া আসিয়াছি। এখানে ইক্ষ্বাকু হইলেন—মনুর প্রপৌত্র;—মধ্যে

ক্ষুপ—আদি রাজা।

দুই পুরুষ ব্যবধান! বিষ্ণুপুরাণে, নেদিষ্ট-বংশে, অধস্তন একাদশ পর্য্যায়ে, একজন ক্ষুপ আছেন বটে; কিন্তু তিনি যে মনু পুত্র ক্ষুপ নহেন,—তাহা বলাই বাহুল্য।

অন্যান্য রাজগণ।

ইক্ষ্বাকুর এক শত পুত্রের মধ্যে সর্ব্ব-কনিষ্ঠ পুত্র যে 'দণ্ড' (দণ্ডক), তাঁহার বিষয় পুরাণ-সমূহে যদিও বিশেষ কিছু উল্লেখ নাই; কিন্তু রামায়ণে দেখিতে পাই,—সেই সর্ব্ব-কনিষ্ঠ পুত্রকে মূর্খ ও মূঢ় মনে করিয়া, ইক্ষ্বাকু তাঁহাকে 'দণ্ড' নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। মূর্খতার জন্য ভবিষ্যতে তাঁহার দণ্ড হইতে পারে,—এই আশঙ্কায়, ইক্ষ্বাকু তাঁহার ঐরূপ নামকরণ করেন। বিন্ধ্য ও ঋক্ষ (মতান্তরে—শৈবল) পর্ব্বতদ্বয়ের মধ্যভাগে তাঁহার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাঁহার রাজধানীর নাম—'মধুমন্ত'। তিনি উশনা মুনিকে নিজ পৌরহিত্যে বরণ করিয়া রাজ্য পালন করিতেন। বহু বর্ষ কাল নিষ্কণ্টকে রাজ্য শাসন করিয়া, রাজা দণ্ড একদা চৈত্র মাসে শুক্রাচার্য্যের আশ্রমে গিয়া, এক অপকর্ম্ম করিয়া বসেন। তাহাতেই তাঁহার রাজ্য ছারেখারে যায়; তিনি সবংশে নিধন-প্রাপ্ত হন। সে অপকর্ম্ম,—তিনি বল-পূর্ব্বক ভার্গবের জ্যেষ্ঠা কন্যা অরজার কুমারী-ধর্ম্ম নষ্ট করেন। রাজাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য অরজা বিশেষরূপ চেষ্টা পাইয়াছিল; বলিয়াছিল,—"আপনি আমার পিতার নিকট প্রার্থনা করিয়া, ধর্ম্ম-সঙ্গতরূপে আমার পাণি-গ্রহণ করিতে পারেন। নচেৎ, আমার প্রতি বল-প্রয়োগ করিলে আমার পিতার ক্রোধানলে আপনি দগ্ধীভূত হইবেন।" কিন্তু দণ্ড সে কথায় কর্ণপাত করেন নাই। ফলে, শুক্রাচার্য্যের অভিশাপে, তাঁহার রাজ্য সপ্তাহ-মধ্যে ভৃত্য, বল ও বাহন সহ দগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। বিন্ধ্য ও ঋক্ষ পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী যে দণ্ড-রাজ্য ছিল, তদবধি সেই রাজ্য দণ্ডকারণ্যে পরিণত হয়। রামায়ণের সম-সময়ে তপস্বিগণের বসবাসে দণ্ডকারণ্য 'জনস্থান' নামে পরিচিত হইয়াছিল।* এই বনে বিদর্ভরাজ শ্বেত তপস্যা করিয়াছিলেন। তিনি সুদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র। সুরথ নামে তাঁহার এক ভ্রাতা ছিলেন। কিন্তু বংশ-লতায় এই সকল ব্যক্তির স্থান নির্দ্দেশ করা যায় না। বিদর্ভরাজ শ্বেত ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াও ক্ষুধা-তৃষ্ণার হস্ত হইতে অব্যাহতি পান নাই। জীবিত-কালে রাজ্যভোগের সময়, তিনি কাহাকেও কখনও কিছু দান করেন নাই; কেবল নিজের শরীর সুপুষ্ট করিবার জন্য সর্ব্বদা যত্নবান ছিলেন। সুতরাং, তপঃ-প্রভাবে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলেও, তাঁহাকে সেই কর্ম্মের ফল-ভোগ করিতে হইয়াছিল। ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া তিনি যখন ব্রহ্মার নিকট কারণ-জিজ্ঞাসু হন; ব্রহ্মা তাঁহাকে পূর্ব্ব-কর্ম্মের ফল-ভোগ হইতেছে বলিয়া উপদেশ দেন,—"তোমার নিজের শবদেহ ভক্ষণ করিয়া, এক্ষণে তোমাকে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে হইবে। সেই শবদেহ তোমার তপস্যা-ক্ষেত্রে সরোবরে ভাসমান আছে। তুমি অগস্ত্যের অনুকম্পায় মুক্তি লাভ করিবে।" রাজা শ্বেত একদা ব্রহ্মলোক হইতে অবতরণ করিয়া শবদেহ ভক্ষণ করিতেছেন; ইতিমধ্যে মহামুনি অগস্ত্য আসিয়া তথায় উপনীত হন। তখন অগস্ত্যকে সকল কথা জ্ঞাপন করিয়া, রাজা মুক্তি-লাভ করিয়াছিলেন। মুক্তি-লাভের সময় অগস্ত্যকে রাজা বহু ধন-রত্ন উপহার দিয়াছিলেন।

* রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড, দ্বিনবতিতম সর্গ হইতে চতুর্নবতিতম সর্গে দণ্ডের এই দণ্ড-বিবরণ বর্ণিত আছে।

রাক্ষস-রাজ রাবণের পৃথিবী-পরিক্রমণ উপলক্ষে দেখিতে পাই,—তিনি 'উশীরবীজ' নামক স্থানে নরপতি মরুত্তের যজ্ঞ ধ্বংস করিয়াছিলেন। কিন্তু সে মরুত্ত কোন্ বংশের কোন্ পর্য্যায়ে অবস্থিত, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। বৃহস্পতির সহোদর-ভ্রাতা সংবর্ত্ত, দেববর্গ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া, মরুত্তের যজ্ঞ করিতেছিলেন। দিগ্বিজয়ী রাবণ সেই স্থানে উপনীত হইয়া যুদ্ধ-প্রার্থী হন; বলেন,—"হয় যুদ্ধ কর, নয় পরাজয় স্বীকার কর।" মরুত্ত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন; কিন্তু সংবর্ত্ত তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করেন। রাবণের ভয়ে দেবতাগণ এই সময় পক্ষিযোনি মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন; ইন্দ্র ময়ূর হইয়াছিলেন; ধর্ম্মরাজ কাক, কুবের কৃকলাস এবং বরুণ হংস হইয়াছিলেন। যজ্ঞ ভঙ্গ করিয়া রাবণ সেই যজ্ঞ-সমাগত মহর্ষিদিগকে গ্রাস করেন। মরুত্ত রাজাকে পরাজিত দেখিয়া, রাবণের মন্ত্রী শুক রাবণের জয়-ঘোষণা করিয়া বলিয়াছিল,—"এই যজ্ঞে সমাগত মহর্ষিদিগকে ভোজন করিয়া, তাঁহাদের রক্তে আমরা বড়ই পরিতৃপ্ত হইলাম।" যাহা হউক, রাবণ প্রস্থান করিলে, ইন্দ্রাদি দেবগণ আপন আপন স্বরূপ প্রকাশ করেন। তখন, যিনি যে প্রাণি-রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, তিনি সেই প্রাণীর মাহাত্ম্য বাড়াইয়া দেন। পূর্ব্বকালে ময়ূর নীলবর্ণ ছিল। সেই হইতে ইন্দ্রের বরে বিচিত্রতা লাভ করে। যমের বরে কাকের মৃত্যু-ভয় দূর হয়; এবং কৃকলাস স্বর্ণ-বর্ণ লাভ করে। এইরূপে এক এক প্রাণী এক এক গুণে গুণান্বিত হয়। * কিন্তু রাবণ কর্ত্তৃক যাঁহার যজ্ঞ নষ্ট হইল, সে মরুত্ত কে? বিষ্ণুপুরাণের সূর্য্যবংশে অষ্টাদশ পর্য্যায়ে (নেদিষ্টের বংশে) এবং শ্রীমদ্ভাগবতের সূর্য্যবংশে বিংশ পর্য্যায়ে (দিষ্টের বংশে) দুই জন মরুত্তের অস্তিত্ব দেখিতে পাই। কিন্তু তাঁহারাই কি এই মরুত্ত? তাঁহাদেরও পুরোহিতের নাম সংবর্ত্ত দেখিয়াছিলাম বটে; কিন্তু তাহা হইলে তিনি কি প্রকারে লঙ্কাধিপতি রাবণের সম-সাময়িক হইলেন;—তাহা কদাচ উপলব্ধি হয় না। রাবণের প্রসঙ্গে আরও দুই একটী অভিনব ঘটনা মনে পড়ে। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন রাবণকে বন্ধন করিয়াছিলেন এবং পুলস্ত্যের অনুরোধে রাবণকে মুক্তি দান করেন; আবার সেই কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন পরশুরামের হস্তে নিহত হন। অধিকন্তু দেখিতে পাই,—সুরথ, গাধি, গয়, পুরুরবা প্রভৃতি পৃথিবীপালকগণ রাবণের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছিলেন এবং অনরণ্য-সংরক্ষিত অযোধ্যা-নগরী রাবণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল; রাজা অনরণ্য আহত হইয়া রাবণকে অভিসম্পাত দিয়াছিলেন,—"মদ্বংশ-সম্ভূত দশরথ-পুত্র রাম তোমার প্রাণ-বধ করিবেন।" † অনরণ্যের দেহান্তে, রাক্ষস-রাজ রাবণ অযোধ্যাপুরী পরিত্যাগ করেন। বংশ-লতায় পুরুরবা, অনরণ্য, দুষ্মন্ত প্রভৃতির স্থান কোথায়, এবং শ্রীরামচন্দ্রের স্থান কোথায়,—বিবেচনা করিতে গেলে, স্তম্ভিত হইতে হয়। সে ক্ষেত্রে, রাবণের অলৌকিক দীর্ঘ-জীবন স্বীকার ভিন্ন, সামঞ্জস্য সাধন কোনক্রমেই সম্ভবপর নহে। রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী এক সুধন্বার নাম দৃষ্ট হয়। সাঙ্কাশ্য-

মরুত্তের যজ্ঞ ও রাবণের দিগ্বিজয়।

---

*, † রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ সর্গে রাবণ কর্ত্তৃক মরুত্তের যজ্ঞ-ধ্বংস-বিবরণ এবং অযোধ্যা আক্রমণ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

পুরীতে তাঁহার রাজধানী ছিল। হরধনুর্ভঙ্গের পূর্ব্বে জানকীকে লাভ করিবার জন্য, তিনি মিথিলা আক্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইলে, জনকের ভ্রাতা কুশধ্বজ তাঁহার রাজধানী অধিকার করেন। সুধন্বা নামে অনেক নৃপতিরই পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু এ সুধন্বা কোন্ বংশ-সম্ভূত,—তাহা বুঝিতে পারা যায় না। এদিকে আবার, মহাভারতের অশ্বমেধ-পর্ব্বে হংসধ্বজ রাজার পুত্র—এক সুধন্বার পরিচয় পাই! যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ-যজ্ঞের অশ্ব বন্ধন করিয়া রাখায়, পাণ্ডবগণের সহিত হংসধ্বজ রাজার যুদ্ধ উপস্থিত হয়। সেই যুদ্ধে সুধন্বা যথা-সময়ে অস্ত্র ধারণ করেন নাই। তজ্জন্য পিতৃ-আদেশে তাঁহাকে তপ্ত-তৈল-কটাহে নিমজ্জিত করা হয়। সুধন্বা হরি-পরায়ণ ছিলেন। সুতরাং তাহাতে সুধন্বার মৃত্যু হয় না; পরন্তু, সুধন্বা নবজীবন লাভ করিয়া, তপ্ত তৈল-কটাহ হইতে উত্থান করিয়াই পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করেন। সেই যুদ্ধে অর্জ্জুনের হস্তে সুধন্বার মস্তকচ্ছেদ হয়; এবং সেই ছিন্ন-মস্তক কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের চরণে আশ্রয়-গ্রহণ করে। সুধন্বার ভ্রাতা সুরথ এবং রাজা হংসধ্বজ কিছুকাল যুদ্ধ করিয়া শেষে শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন।

নৃগ ও ব্রহ্মদত্ত নামক দুই জন নৃপতির অলৌকিক বিবরণ দৃষ্ট হয়। রামায়ণে নৃগের পুত্রের নাম—বসু বলিয়া উল্লেখ আছে। কিন্তু নৃগ যে কোন্ বংশ-সমুদ্ভূত, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে ইক্ষ্বাকুর ভ্রাতার নাম—নৃগ; কিন্তু বসু তাঁহার প্রপৌত্র। নৃগের সম্বন্ধে এক অলৌকিক উপাখ্যান প্রচলিত আছে। নৃগ পরম ব্রাহ্মণ-ভক্ত ছিলেন। পুষ্কর-তীর্থে যজ্ঞকালে তিনি ব্রাহ্মণ-গণকে কোটী কোটী গাভী দান করিয়াছিলেন। ভ্রমক্রমে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের একটী সবৎসা গাভী সেই সঙ্গে বিতরিত হইয়াছিল। গাভীর সন্ধান পাইয়া, ব্রাহ্মণ নৃগের নিকট অভিযোগ করিতে আসেন। কিন্তু বহু চেষ্টায়ও তিনি রাজপুরীতে প্রবেশ করিয়া রাজার সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হন না। ইহাতে ব্রাহ্মণ রাজাকে অভিশপ্ত করেন; বলেন,—"তুমি যেমন আমায় দর্শন না দিয়া অন্তরালে রহিলে, তেমনি তুমি কৃকলাস হইয়া গর্ত্তমধ্যে বাস কর।" কৃকলাস হইয়া রাজা গর্ত্তে প্রবেশ করিলে, (রামায়ণের মতে) তাঁহার প্রপৌত্র বসু রাজা হইয়াছিলেন। দ্বাপরের শেষ ভাগে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নৃগের শাপ-মুক্তি হয়। * নৃগের কৃকলাসত্ব-প্রাপ্তির ন্যায়, রামায়ণে ব্রহ্মদত্ত নামক এক নৃপতির গৃধ্রত্ব-প্রাপ্তির পরিচয় পাওয়া যায়। গৌতম নামক এক ব্রাহ্মণ রাজ-বাটীতে অতিথি হইয়াছিলেন। সেই অতিথির খাদ্যের সহিত দৈব-ক্রমে মাংস মিশ্রিত হয়। তাহাতে সেই অতিথি ব্রাহ্মণ, "গৃধ্র হও" বলিয়া, রাজাকে অভিসম্পাত করেন। বহু অনুনয় বিনয়ের পর পরিশেষে ব্রাহ্মণ রাজার শাপ-মুক্তির উপায় বলিয়া দেন,—

নৃগ ও ব্রহ্মদত্ত।

* রামায়ণে, উত্তর-কাণ্ডে, চতুঃষষ্টিতম সর্গে, নৃগের উপাখ্যান এইরূপ ভাবেই বর্ণিত আছে। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে, দশম স্কন্ধে, চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়ে, এই উপাখ্যান একটু রূপান্তরে দেখিতে পাই। সেখানে দাতা ও প্রতিহর্ত্তা বলিয়া রাজা নিন্দিত হন; এবং যমরাজের বিচারে তাঁহাকে কৃকলাস হইতে হয়। পাপাবসানে শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শে মুক্তি-লাভের পর রাজা পুণ্য-ফল-ভোগী হইয়াছিলেন।

"ভবিষ্যকালে শ্রীরামচন্দ্রের স্পর্শে তোমার মুক্তি-লাভ হইবে।" রাম-রাজত্বে এক উলুকের সহিত গৃধ্রের বিবাদ হয়। বিবাদ— বাসস্থান লইয়া। রামের নিকট অনুযোগ-ছলে উলুক বলে,—"পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে আমি এই বাসার অধিকারী।" গৃধ্র বলে,—"মনুষ্য-সৃষ্টি হইতে আমি এই বাসায় বাস করিতেছি।" শ্রীরামচন্দ্র মীমাংসা করেন,—'বৃক্ষাদি সৃষ্টির আদিভূত; মনুষ্য তাহার পরবর্ত্তি-কালে সৃষ্ট হইয়াছে।' সুতরাং গৃধ্রকেই তিনি দোষী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, এবং তাহার প্রাণ-বধে উদ্যোগী হন। ইতিমধ্যে গৃধ্রকে স্পর্শ করিয়া শাপ-মুক্ত করিবার জন্য রামের প্রতি দৈববাণী হয়। তখন শ্রীরামচন্দ্রের স্পর্শে গৃধ্র দেব-দেহ লাভ করে। রামায়ণে ব্রহ্মদত্তের এতদ্ভিন্ন অন্য কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে আর এক ব্রহ্মদত্তের উপাখ্যান দেখিতে পাই। শত্রুগণকে বিশ্বাস করা বিধেয় নহে, অথচ বিশ্বাস না করিলে কিরূপে রাজা শত্রু-জয়ে সমর্থ হইবেন,—এই প্রশ্নের উত্তর-ছলে, ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরের নিকট ব্রহ্মদত্ত নৃপতির উপাখ্যান বর্ণন করেন। এই ব্রহ্মদত্ত কাম্পিল্য-দেশের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্র—পুজনী-নাম্নী পক্ষিণীর পুত্রকে বধ করিয়াছিল। পক্ষিণী তাহাতে পুত্র-হন্তা রাজ-পুত্রের নয়ন-যুগল উৎপাটন করে। রাজা তাহাতে পক্ষিণীর প্রতি কোনরূপ বিরক্তির ভাব প্রকাশ করেন না; পরন্তু বলেন,—"আমার পুত্র যে গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছে, তুমি তাহার উচিত শাস্তিই প্রদান করিয়াছ।" এই বলিয়া, রাজা ব্রহ্মদত্ত পক্ষিণীকে আপন আলয়েই পূর্ব্ববৎ বসবাস করিতে বলেন। কিন্তু পক্ষিণী তাহাতে সম্মত হয় না। সে বলে,—"কাহারও অনিষ্ট করিয়া, তাহার আশ্রয়ে কদাচ বাস করিতে নাই।" অতঃপর, পক্ষিণী সে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়।

শ্রীবৎস-চিন্তার উপাখ্যান, কাশীরাম দাসের মহাভারতের সাহায্যে, বাঙ্গালার ঘরে ঘরে প্রচারিত। চিত্ররথ নামে এক পৃথিবীপতি রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম—শ্রীবৎস। চিত্রসেন রাজ-কন্যা চিন্তার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। শ্রীবৎস বিচক্ষণ ধার্ম্মিক নৃপতি ছিলেন। একদা লক্ষ্মী ও শনির মধ্যে পরস্পরের শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়। তাঁহারা শ্রীবৎস রাজাকে মধ্যস্থ মান্য করেন। বহু চিন্তার পর, লক্ষ্মী ও শনির বসিবার জন্য, শ্রীবৎস দুই খানি আসন প্রস্তুত করিয়া রাখেন। আসনের এক খানি স্বর্ণে বিনির্ম্মিত, অপর খানি রৌপ্যে বিরচিত। রাজ-সভায় উপনীত হইয়া, কমলা প্রথমেই স্বর্ণ-সিংহাসনে উপবেশন করেন; শনি রজত-সিংহাসনে উপবেশন করিতে বাধ্য হন। অবশেষে কথায় কথায় তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়। রাজা শ্রীবৎস তাহাতে উত্তর দেন,—"স্বর্ণ-ছত্র-সমন্বিত স্বর্ণ-সিংহাসন এবং রজত-ছত্র-সমন্বিত রজত-সিংহাসন—এতদুভয় আসন-ছত্র হইতেই শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিয়া লউন।' রাজার বিচারে, শনি কোপান্বিত হইয়া প্রস্থান করেন; লক্ষ্মী সন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ জানান। শনি ছল অন্বেষণে রাজাকে বিপদগ্রস্ত করিবার জন্য চেষ্টান্বিত হন। কমলা রাজার বিঘ্ন-বিপত্তি দূরীকরণ পক্ষে প্রয়াস পান। দৈব-ক্রমে এক দিন রাজা শ্রীবৎসের স্নান-জল কুকুরে পান করিল। রন্ধ্রে রন্ধ্রে, সুযোগ পাইয়া, শনিও তাঁহার রাজ্যে প্রবিষ্ট

শ্রীবৎস-চিন্তার উপাখ্যান।

হইলেন। রাজ্যে ভূ-কম্পন, রক্ত-বৃষ্টি, জল-প্লাবন, অকাল-মৃত্যু উপস্থিত হইল। রাজা রাজ্য-ত্যাগে বাধ্য হইয়া বনবাসী হইলেন। বন-গমন-কালে তিনি মহিষী চিন্তাকে পিত্রালয়ে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু সতী ছায়ার ন্যায় পতির অনুগামিনী হইয়াছিলেন। যাহা হউক, সেই সময় কমলা তাঁহাদিগকে বলিয়া গেলেন,—"কিছু কাল গ্রহ-ভোগের পর, তোমরা রাজ্যৈশ্বর্য্য পুনঃ-প্রাপ্ত হইবে। দুঃখ-কষ্টের নিপীড়নে কদাচ ধর্ম্মপথ ভ্রষ্ট হইও না।" রাজা ও রাণীর বনগমন-কালে পথি-মধ্যে শনি মায়া-নদীর সৃষ্টি করেন। রাজ্য-ত্যাগ-কালে রাজা কতকগুলি বহু-মূল্য সামগ্রী সঙ্গে লইয়াছিলেন। নদী পার হইবার সময়, শনির চক্রান্তে, প্রথমেই সেইগুলি তাঁহাদের হস্তচ্যুত হয়; এদিকে মায়া-নদীও শুকাইয়া যায়। ফল-মূলাহারে পঞ্চবর্ষ-কাল বনে বনে পরিভ্রমণের পর, এক কাঠুরিয়ার গৃহে তাঁহারা আশ্রয় প্রাপ্ত হন। কাঠুরিয়াগণের সহিত বনে বনে কাঠ সংগ্রহ করিয়া, তখন কিছুকাল তাঁহাদের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহিত হইয়াছিল। সেখান হইতে বণিকগণ কর্তৃক চিন্তা অপহৃতা হন। চিন্তার অন্বেষণে ঘুরিতে ঘুরিতে শ্রীবৎস, বাহু রাজার রাজ্যে উপনীত হইয়াছিলেন। সেখানে মালিনীর গৃহে অবস্থিতি করিয়া, স্বয়ংবরে তিনি বাহু-রাজ-কন্যা ভদ্রার পাণি-গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে দৈবক্রমে বণিকের নৌকা সেই রাজ্যে উপস্থিত হয়। নৌকায় চিন্তা আবদ্ধ ছিলেন। বাহু-নৃপতির সাহায্যে চিন্তার উদ্ধার-সাধন হয়। শ্রীবৎস এবং চিন্তাকে এতাদৃশ বিপন্ন করিয়াও, শনি তাঁহাদিগকে ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট করিতে পারেন নাই। এক্ষণে, তাঁহাদের পরীক্ষার চরম হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া, শনি তাঁহাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন। পরিশেষে রাজা শ্রীবৎসকে বরদান করিয়া, শনি কহিলেন,—"আপনি দীর্ঘ-জীবন লাভ করিয়া, দশ সহস্র বৎসর অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্য-ভোগ করিবেন। আপনার শত পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করিবে।" ইহার পর, বাহু-রাজ-কন্যা ভদ্রাকে এবং চিন্তাকে লইয়া, শ্রীবৎস স্ব-রাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হন। তাঁহার যশঃ-সৌরভে দিগ্দিগন্ত পরিপূর্ণ হয়। ইহাই শ্রীবৎস রাজার স্থূল উপাখ্যান।* কিন্তু এই প্রসঙ্গোক্ত শ্রীবৎস, বাহু, চিত্ররথ ও চিত্রসেন প্রভৃতি কোন্ বংশের কোন্ পর্য্যায়-ভুক্ত, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

* শ্রীবৎস-রাজার উপাখ্যান-প্রসঙ্গে কাশীরাম দাসের মহাভারতে লিখিত আছে,—

"আরণ্যপর্ব্বের কথা, অতি সুখ-মোক্ষদাতা,
রচিলেন মহামুনি ব্যাস।
রচিল পাঁচালী-ছন্দে, মনের আনন্দানন্দে,
কৃষ্ণদাসানুজ কাশীদাস॥"

অথচ আশ্চর্য্যের বিষয়, ব্যাস-বিরচিত মহাভারতে এই শ্রীবৎস-রাজার উপাখ্যান আদৌ দেখিতে পাই না! অধিক বলিব কি, ব্যাস-বিরচিত পুরাণ-পরম্পরা আলোড়ন করিয়াও আমরা শ্রীবৎসের উপাখ্যান খুঁজিয়া পাইলাম না। তবে কাশীদাস এ কথা কেন লিখিয়া গেলেন? তিনি কথক-দিগের মুখে মহাভারত পাঠ শ্রবণ করিয়া যদি মহাভারত রচনা করিয়া থাকেন, আর তাহা হইতে এই উপাখ্যান-বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা-লাভ হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই উপাখ্যান কি কথকদিগেরই মনঃ-কল্পিত? অথবা, ব্যাস-বিরচিত মহাভারতের অংশ-বিশেষে বা কোনও পুরাণে ঐ উপাখ্যান লিখিত ছিল,—কালক্রমে তাহা লোপ পাইয়াছে? যাহা হউক, ব্যাস-বিরচিত মহাভারত ও পুরাণ-সমূহে এই উপাখ্যান দৃষ্ট না হইলেও, জৈমিনি প্রণীত মহাভারতে (জৈমিনি-ভারতে) শ্রীবৎস-রাজ সবিবরণ বর্ণিত আছে, জানিতে পারা যায় শ্রীবৎস—অযোধ্যার অধিপতি ছিলেন। মতান্তরে, শ্রীবৎস প্রাগ্‌দেশের অধিপতি বলিয়া প্রসিদ্ধ।

পুরুষোত্তম মহাতীর্থের সহিত যাঁহার নাম চির-সংগ্রথিত রহিয়াছে, সেই ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী ইন্দ্রদ্যুম্ন নরপতির পরিচয়ই বা বংশ-লতার কোথায় পাই? সেই সত্যবাদী, সর্ব্ব-শাস্ত্রজ্ঞ, ব্রহ্ম-নিষ্ঠ নৃপতি সত্য-যুগে বিদ্যমান ছিলেন। মালব-দেশে অবন্তী নামে যে ভুবন-বিশ্রুত নগরী ছিল, সেই নগরেই রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহার রাজধানী অবন্তী-নগরী হৃষ্ট-পুষ্ট জনগণে পরিপূর্ণ ছিল। সুদৃঢ় প্রাকার, তোরণ, যন্ত্র, অর্গল, দ্বার ও পরিখা সমূহে নগরী সর্ব্বদা সুশোভিত ও সুরক্ষিত থাকিত। 'সে নগরে নানা দেশীয় বণিক-সম্প্রদায়, রাশি রাশি দ্রব্য-সম্ভার, নানা রথ্যা এবং নানা আপণ বিদ্যমান ছিল। রাজহংসের ন্যায় শুভ্রবর্ণ চিত্র-বিচিত্র ও মনোহর শত শত সহস্র সহস্র প্রাসাদের দ্বারা ঐ নগরী অলঙ্কৃত থাকিত। কত হস্তী, কত অশ্ব, কত রথ, কত পদাতি, কত বর্ণের কতরূপ ধ্বজ-পতাকা, কত দেশের কত যোদ্ধৃপুরুষ এবং কত জনসমূহ যে সেখানে বসতি করিত, তাহার ইয়ত্তা নাই। ঐ নগরী যজ্ঞোৎসবে সর্ব্বদা আমোদিত এবং গীত-বাদিত্র-রবে সর্ব্বদা মুখরিত ছিল।' সর্ব্বগুণাকর রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন পৃথিবী-পালনে নিরত হইবার পর, শ্রীহরির আরাধনার জন্য ব্যাকুল হন। কোন্ ক্ষেত্রে, কোন্ তীর্থে, কোন্ তীরে, কোন্ আশ্রমে, দেবদেব জনার্দ্দনের আরাধনা করা শ্রেয়ঃ, এইরূপ চিন্তাক্রান্ত হইয়া, তিনি মহীস্থ তীর্থক্ষেত্র-সমূহ পর্য্যটন করেন। পরিশেষে মুক্তিপ্রদ পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে উপনীত হইয়া, প্রভূত দক্ষিণা-প্রদান-পূর্ব্বক, যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন। সেই সময়ে তাঁহার মনে শ্রীহরির প্রাসাদ-নির্ম্মাণের চিন্তা সমুদিত হয়। কোন্ মূর্ত্তিতে, কি ভাবে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা করিলে, তাঁহার আবির্ভাব হইতে পারে, আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া, রাজা অনুক্ষণ তাহাই ধ্যান করিতে লাগিলেন। তখন, শ্রীহরি স্বপ্নে দর্শন দিয়া, তাঁহাকে বলিলেন,—"তোমার ভক্তিতে ভগবান প্রীত হইয়াছেন। নিশা-অবসানে, সাগরজলে, তুমি এক মহাবৃক্ষ দেখিতে পাইবে। তাহাতে শঙ্খ-চক্রের চিহ্ন আছে। সেই বৃক্ষে ভগবানের প্রতিমা নির্ম্মাণ করিও। ভগবান সেই প্রতিমায় চির-বিদ্যমান থাকিবেন।" প্রভাতে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বহস্তে কুঠার গ্রহণ-পূর্ব্বক যখন সমুদ্র-তীরে গমন করিলেন, বিষ্ণু এবং বিশ্বকর্ম্মা উভয়ে ব্রাহ্মণ-বেশে তাঁহাকে দর্শন দিলেন। সমুদ্রে মহাবৃক্ষ ভাসমান ছিল। ব্রাহ্মণরূপী বিশ্বকর্ম্মা এবং বিষ্ণুর সাহায্যে ইন্দ্রদ্যুম্ন তদ্দ্বারা প্রতিমা প্রস্তুত করাইলেন। তিনটী মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইল। প্রথম মূর্ত্তি—শুক্লবর্ণ, শরচ্চন্দ্র-সমদ্যুতি, আরক্ত-নেত্র, ফণিফণাকুল মস্তক, নীলাম্বরধর, বল-মদ-গর্ব্বিত, এক-কুণ্ডলধারী, গদামুষলপাণি—বলদেব। দ্বিতীয় মূর্ত্তি—নীলজীমূত-সন্নিভ, পুণ্ডরীক নয়ন, অতসী-পুষ্প-সঙ্কাশ পদ্মপত্রায়ত-নেত্র, পীতবাসা, শ্রীবৎসবক্ষা, সৌম্যবপু, চক্রধারী, সর্ব্বপাপহারী—শ্রীহরি। তৃতীয় মূর্ত্তি—স্বর্ণ-বর্ণাভ, পদ্ম-পলাশ-নেত্র, বিচিত্র-বস্ত্র-পরিহিত, হার-কেয়ূর-ভূষিত, বিচিত্রাভরণযুক্ত, রত্নহার-সমলঙ্কৃত, পীনোন্নতস্তনী, মনোহারিণী—সুভদ্রা। এই তিন মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া, বিশ্বকর্ম্মা দিব্যালঙ্কারে তাঁহাদিগকে ভূষিত করিলেন। মূর্ত্তিত্রয় অবলোকন করিয়া, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন। ব্রাহ্মণ-বেশী বিষ্ণু তখন আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়া কহিলেন,—"আমিই পুরুষোত্তম; আমিই

ইন্দ্রদ্যুম্ন ও জগন্নাথ-ক্ষেত্র।

জগন্নাথ; আমিই সর্ব্বময়। যত দিন চন্দ্র-সূর্য্য-পৃথিবী-সমুদ্র, তত দিন ইহাতে আমি অবস্থিত রহিলাম।" ইহাই পুরুষোত্তম তীর্থের প্রতিষ্ঠা, ইহাই জগন্নাথ-ক্ষেত্রে জগন্নাথের অধিষ্ঠান। বিষ্ণুর বরে দশ সহস্র নব শত বৎসর পর্য্যন্ত ইন্দ্রদ্যুম্ন নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে মহারাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন। পরে তিনি সুরাসুর-দুর্লভ দিব্যধামে গমন করেন। * উৎকল-খণ্ডে এই জগন্নাথ-প্রতিষ্ঠা-কাহিনী একটু রূপান্তরে দৃষ্ট হয়। অবন্তী নগরের বিষ্ণু-মন্দিরে পূজার সময় রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন এক জন বেদবিৎ ব্রাহ্মণকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"এমন পবিত্র স্থান কোথায় আছে, যেখানে যাইলে এই চর্ম্ম-চক্ষে ভগবানের দর্শন পাইতে পারি?" বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ তাহাতে উত্তর দিয়াছিলেন,—"ওড্র-দেশে দক্ষিণ-সমুদ্রতীরে পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র। সেখানে নীলকান্ত-মণি-বিনির্ম্মিত যে নীলমাধব মূর্ত্তি আছে, সেই মূর্ত্তি দর্শন করিলেই, ভগবানের প্রত্যক্ষ-দর্শন লাভ হইবে।" এই বলিয়াই ব্রাহ্মণ অন্তর্দ্ধান হন। ইন্দ্রদ্যুম্ন অবশেষে রাজৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া, পুরুষোত্তমে গমন করেন। একাম্রকানন, কপোতেশ্বর, বিল্বেশ্বর, ভুবনেশ্বর প্রভৃতি দর্শন করিয়া পরিশেষে তিনি পুরুষোত্তমে নীলকণ্ঠ-সমীপে উপনীত হন। কিন্তু সেখানে আসিয়া, ব্রাহ্মণ-কথিত নীলমাধব মূর্ত্তি আর তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয় না। কারণ-জিজ্ঞাসায় নারদ বলেন,—"নীলাচল বালুকায় আবৃত হইয়াছে। ভক্তের অভাবে নীলমাধব পাতালে প্রবেশ করিয়াছেন।" † নারদের বাক্যে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন পরিতাপ করিতে লাগিলেন;—মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন, রাজাকে সান্ত্বনা করিয়া, নারদ কহিলেন,—"আপনার যজ্ঞানুষ্ঠানে গদাধর আবার আবির্ভূত হইবেন।" তদনুসারে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন শত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। যজ্ঞের ষষ্ঠ দিনে স্বপ্নে ভগবান তাঁহাকে মহাসাগরস্থিত মহাবৃক্ষ আনয়নের পরামর্শ দেন। সেই বৃক্ষে শঙ্খ-চক্রের চিহ্ন ছিল। দৈববাণী-ক্রমে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন পঞ্চদশ দিবস সেই বৃক্ষ মন্দির মধ্যে রক্ষা করিয়া, মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখেন। বিশ্বকর্ম্মা সূত্রধর-রূপে আসিয়া তাহাতে প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমার দিনে দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া, রাজা মন্দির মধ্যে আপন স্বপ্ন-দৃষ্ট প্রতিমা-মূর্ত্তি দেখিতে পান। সেই মূর্ত্তিত্রয়—জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের এবং জগন্নাথের ইতিহাস—পুরাণে, প্রত্নতত্ত্বে, কাব্যে, বৈষ্ণব-সাহিত্যে, পরবর্ত্তি-কালে কত রূপান্তরেই পরিবর্ণিত হইয়া আছে! রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন নীলমাধবের বেদীমাত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; পুরুষোত্তম-তীর্থে গমন করিয়া, যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ-পাণ্ডব ইন্দ্রদ্যুম্নেরও বেদীমাত্রের পরিচয় পাইয়াছিলেন। ‡ পরিবর্ত্তনের পর

* ব্রহ্মপুরাণ, চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় হইতে এক-পঞ্চাশ অধ্যায়; নারদপুরাণ, উত্তরখণ্ড, দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় হইতে ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায়; স্কন্দপুরাণ উত্তর খণ্ডে এবং প্রসঙ্গতঃ অন্যান্য পুরাণেও এই জগন্নাথ-তীর্থের মাহাত্ম্য পরিবর্ণিত আছে।

† উৎকলখণ্ডের মতে,—রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা-সপ্তমী-তিথিতে, শুক্রবারে, পুষ্যা নক্ষত্রে, সদলবলে পুরুষোত্তমে যাত্রা করিয়াছিলেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা-দ্বাদশী তিথিতে, 'স্বাতী' নক্ষত্রে, সেখানে নৃসিংহদেবের প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি যজ্ঞারম্ভ করেন।

‡ মহাভারত, বনপর্ব্ব, চতুর্দ্দশাধিক শততমাধ্যায়ে—বৈতরণী নদী প্রভৃতি পার হইয়া, পাণ্ডবেরা এই পুরুষোত্তম তীর্থে উপনীত হন,—আভাস পাওয়া যায়।

পরিবর্ত্তন-প্রবাহ আসিয়া, ইন্দ্রদ্যুম্নের মন্দির কত প্রকারে ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিয়াছিল, অতীত-সাক্ষী ইতিহাস আজিও তাহার কত অস্ফুট পরিচয় বক্ষে ধারণ করিয়া আছে! ফলতঃ, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার কোনই উপায় নাই; অথচ, কোন্ বংশের কোন্ পর্য্যায়ে তিনি অবস্থিত, তাহাও নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন। মহাভারতে বন-পর্ব্বে এক ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রসঙ্গ আছে। পুণ্যক্ষয় হইলে তিনি স্বর্গ-ভ্রষ্ট হন। সেই সময় প্রতিপন্ন হয়, তাঁহার দক্ষিণাদত্ত গো-যূথের চঙ্ক্রমণে একটী সরোবর উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহাতে তিনি জল-দানের ফলভাগী হন। তখন স্বর্গ হইতে পুনরায় দিব্য রথ আসিয়া ইন্দ্রদ্যুম্নকে স্বর্গে লইয়া যায়। মহাভারতোক্ত এই ইন্দ্রদ্যুম্ন এবং জগন্নাথ-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাপন্ন সেই ইন্দ্রদ্যুম্ন—একই ব্যক্তি কি না, কে নির্ণয় করিবে?

যেমন পুরুষোত্তমের ইতিহাসে ইন্দ্রদ্যুম্ন, তেমনই বারাণসীর ইতিহাসে সুপ্রতীক। কোনও বংশ-লতায়ই যেমন ইন্দ্রদ্যুম্নের নাম অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না; বারাণসীর নৃপতিগণের মধ্যেও সেইরূপ সুপ্রতীকের এবং দুর্জ্জয় ও সুদ্যুম্ন নামক তাঁহার পুত্রদ্বয়ের কোনই পরিচয় প্রাপ্ত হই না। পুরাণ-সমূহ পাঠ করিয়া সাধারণতঃ বুঝিতে পারি,—সুহোত্রের (সুহোতার) পুত্র কাশ বা কাশ্য হইতেই কাশীরাজ্যের প্রতিষ্ঠা! ধন্বন্তরি, দিবোদাস, প্রতর্দ্দন প্রভৃতি কাশীরাজগণের নাম, পুরাণ-পাঠক-মাত্রেরই প্রায় পরিচিত। যদিও ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বংশ-লতা দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাঁহাদের কীর্ত্তি-কাহিনী চির-প্রসিদ্ধ। আমরা ভিন্ন ভিন্ন পুরাণ হইতে সংগ্রহ করিয়া কাশীরাজ-বংশের বংশ-পর্য্যায় প্রকাশ করিয়াছি।* কিন্তু সে বংশ-পর্য্যায়ের কোথাও সুপ্রতীকের, সুদ্যুম্নের বা দুর্জ্জয়ের নাম নাই। অথচ, সুপ্রতীক সত্য-যুগে মহাবল-পরাক্রান্ত নৃপতি ছিলেন। বারাণসী-পতি সেই সুপ্রতীকের পুত্র দুর্জ্জয়, সমস্ত ভারতবর্ষ স্ব-বশে আনয়ন করিয়া, ক্রমশঃ কিম্পুরুষ-বর্ষ, হরি-বর্ষ এবং রোমাবত, কুরু, ভদ্রাশ্ব, ইলাবৃত ও মেরুমধ্য প্রভৃতি সমস্ত দেশ অধিকার করেন। সমগ্র জম্বুদ্বীপ জয় করিয়া, শেষে তিনি দেবরাজ ইন্দ্রকে পর্য্যন্ত পরাজিত করিয়াছিলেন। অবশেষে বিষ্ণুর চক্রাস্ত্রে দুর্জ্জয় নিহত হন। গৌরমুখ ঋষির আশ্রম-সমীপে তাঁহার বহু-সংখ্যক দৈত্য-সেনার সহিত দেবগণের যুদ্ধ হইয়াছিল। ঋষির প্রার্থনা-মাত্র 'নারায়ণ চক্রাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া, নিমেষ মধ্যে তাঁহার সকল সৈন্য ভস্মসাৎ করেন।' সেই অরণ্যে দুর্জ্জয় এবং তাঁহার সৈন্যদল 'নিমেষ মধ্যে নিহত' হইয়াছিল বলিয়া, তাহা 'নৈমিষারণ্য' নামে অভিহিত হয়। যাহা হউক, এই দুর্জ্জয় এবং সুপ্রতীকের পূর্ব্বে বা পরে, ঐ বংশের আর কেহ বারাণসী রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন কিনা, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। হয় তো তাঁহাদের বংশ-লতায় ক্রম-ভঙ্গ হইয়া থাকিবে। তবে, কাশ বা কাশ্য হইতে উৎপন্ন যে বংশ কাশীর অধীশ্বর বলিয়া পরিচিত, তাহার মধ্যেও কি অল্প বিশৃঙ্খলা দেখিতে পাই? তাহারও একের সহিত অন্যের মিল নাই। কাশীরাজ দিবোদাস,—

কাশী-নরেশগণ।

* এই গ্রন্থের ৩০৭, ৩১০, ৩১৩, ৩১৮, ৩২৬ এবং ৩২৮ প্রভৃতি পৃষ্ঠায় বংশ-লতায় ধন্বন্তরি দিবোদাসাদির পরিচয় দ্রষ্টব্য।

তাঁহার সম্বন্ধেই কত মতান্তর! আমাদের প্রকাশিত বংশ-লতায় তাঁহার সম্বন্ধে কি অসামঞ্জস্য বিদ্যমান, পূর্ব্বেই আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি। মহাভারতে আবার দেখিতে পাই,—দিবোদাসের পিতামহ হর্য্যশ্ব নামে পরিচিত। দিবোদাস—কাশীরাজ সুদেবের পুত্র। বীতহব্য-বংশীয় শূরগণ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া, বংশনাশ-ভয়ে, মহীপতি দিবোদাস, বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠ পুত্র ভরদ্বাজ ঋষির শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। সেই ঋষির যজ্ঞ-প্রভাবে, প্রতর্দ্দন নামে তাঁহার এক পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করে। সেই পুত্র, জন্মমাত্র সদ্যঃত্রয়োদশবর্ষীয় পুরুষের ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়াছিল এবং অল্প দিনেই সমস্ত বেদ-ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়াছিল। প্রতর্দ্দনের সহিত যুদ্ধে রাজা বীতহব্যের পুত্রগণ পরাজিত হয়। 'তাহারা শত সহস্র ভল্লাস্ত্র দ্বারা ছিন্ন-মস্তক ও রুধিরার্দ্র হইয়া নিকৃত্ত কিংশুকের ন্যায় ধরাতলে পতিত' হইয়াছিল। তনয়গণ নিহত হইলে, বীতহব্য মহর্ষি ভৃগুর শরণাপন্ন হন। প্রতর্দ্দন পশ্চাদনুসরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু নৃপতির প্রাণ-রক্ষার জন্য প্রতর্দ্দনকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া, মহর্ষি ভৃগু বলিয়াছিলেন,—"এখানে কোনও ক্ষত্রিয় নাই। এখানকার সকলেই ব্রাহ্মণ।" আশ্রিত জনের রক্ষার জন্য ভৃগুর বাক্য শ্রবণ করিয়া, প্রতর্দ্দন সন্তুষ্ট হন। আপন প্রভাবে নৃপতি বীতহব্যকে স্বজাতি-ত্যজিত করিতে পারিলেন বলিয়াও প্রতর্দ্দনের আনন্দের অবধি রহিল না। এদিকে, ভৃগুর অনুগ্রহে বীতহব্য ব্রহ্মর্ষিত্ব ও ব্রহ্মবাদিত্ব লাভ করিলেন। জন্মান্তরের পুণ্যফলে ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইল। বীতহব্যের ইন্দ্রের ন্যায় সৌন্দর্য্য-সম্পন্ন গৃৎসমদ নামে এক পুত্র ছিলেন। তাঁহাকে ইন্দ্র-ভ্রমে দৈত্যগণ এক-বার বন্ধন করিয়া লইয়া গিয়াছিল। গৃৎসমদ ব্রহ্মর্ষি হইয়াছিলেন; তাঁহার পুত্র সুতেজাও ব্রাহ্মণ হন। বীতহব্যের বংশ—"শৌনক-ব্রাহ্মণ-বংশ' নামে বিখ্যাত। তাঁহার বংশ-লতা এইরূপ;—

বীতহব্য	বর্চ্চা	সত্য	তম	প্রমতি
গৃৎসমদ	বিহব্য	সন্ত	প্রকাশ	রুরু
সুতেজা	বিতত্য	শ্রবাঋষি	বাগীন্দ্র	শুনক
				শৌনক

চন্দ্রবংশের বংশ-লতার মধ্যে এক গৃৎসমদের নাম দৃষ্ট হয়। তাঁহার বংশেও শৌনক-ব্রাহ্মণগণের উৎপত্তি-বিবরণ দেখিতে পাই। সে গৃৎসমদ—সুহোত্রের (সুনহোত্রের) পুত্র এবং কাশ বা কাশ্যের ভ্রাতা বলিয়া পরিচিত। কিন্তু সে সকল বংশ-লতায় বীতহব্যের নাম কোথাও নাই। প্রতর্দ্দন যে দিবোদাসের পুত্র, তদ্বিষয়ে প্রায় মতান্তর দেখি না। তবে, তাঁহার পর্য্যায় সম্বন্ধে বড়ই অনৈক্য। বিষ্ণুপুরাণে আয়ু-পুত্র ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশে ষোড়শ পর্য্যায়ে প্রতর্দ্দন বিদ্যমান। হরিবংশে প্রতর্দ্দন দুই জন! এক জন—আয়ু-পুত্র অনেনার বংশে; অপর এক জন—পুরুবংশে। এক জনের পর্য্যায়—ষড়বিংশ; অপর জনের পর্য্যায়—দ্বাত্রিংশ। ব্রহ্মপুরাণেও দুই প্রতর্দ্দন! প্রথম—অনেনার বংশে ষড়বিংশ পর্য্যায়ে; দ্বিতীয়—পুরুবংশে ত্রিংশ পর্য্যায়ে! অথচ, আশ্চর্য্যের বিষয়—সকল স্থলেই

প্রতর্দ্দনের পিতার নাম—দিবোদাস; এবং সে দিবোদাস কাশীরাজ্যের অধিপতি বলিয়া পরিচিত। এদিকে আবার, রামায়ণে দেখিতে পাই,—কাশীর রাজা প্রতর্দ্দনের সহিত রামচন্দ্রের মিত্রতা-সম্বন্ধ। রামের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে এবং লঙ্কার মহাসমরে তিনি রামচন্দ্রের সহায়তা করিতেছেন। সেই প্রতর্দ্দন এবং এই প্রতর্দ্দন এক ব্যক্তি কিনা, নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। প্রতর্দ্দন, দিবোদাস এবং তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষগণ সম্বন্ধে বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। ইহাঁদের ঊর্দ্ধতন পুরুষে হর্য্যশ্বের (কেহ কেহ বলেন, কেতুমানের অপর নাম—হর্য্যশ্ব) রাজত্বকালে যদু-বংশীয় হৈহয়-পুত্রগণ অনেকবার কাশী আক্রমণ করিয়াছিলেন। হৈহয়গণের হস্তে হর্য্যশ্ব নিহত হন। হর্য্যশ্বের পুত্র সুদেবও রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া হৈহয়গণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। দিবোদাস এবং প্রতর্দ্দনের সময়েও হৈহয়গণের সহিত তাঁহাদের যুদ্ধ চলিয়াছিল। হৈহয়-বংশীয় ভদ্রশ্রেণ্য নৃপতি, সুদেবের সংহার-সাধন করিয়া, বারাণসী অধিকার করেন। দিবোদাস অশেষ আয়াসে ভদ্রশ্রেণ্যকে বিনাশ করিয়াছিলেন। ভদ্রশ্রেণ্যের পুত্র—দুর্দ্দম, বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া, দিবোদাসকে পরাজয় করেন; কাশী—দুর্দ্দমের অধিকারভুক্ত হয়। প্রতর্দ্দন, সেই দুর্দ্দমকে পরাজিত করিয়া, কাশীর পুনরুদ্ধার-সাধন করিয়াছিলেন। দিবোদাস এবং প্রতর্দ্দন উভয়েই পরম ধার্ম্মিক এবং যাজ্ঞিক বলিয়া প্রসিদ্ধ। দিবোদাস কর্ম্মগুণে দেবতার ন্যায় সম্পূজিত হইয়াছিলেন। দিবোদাসের রাজত্বকালে, ক্ষেমক রাক্ষসের উপদ্রবে, নিকুম্ভের অভিসম্পাতে, কাশী জনশূন্য ও হত-শ্রী হইয়াছিল। দিবোদাস সেই সময়ে গোমতী-তীরে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। দিবোদাস মহীপতির প্রতাপ এবং তাঁহার নির্ব্বাণ-প্রাপ্তির বিষয়, স্কন্দপুরাণান্তর্গত কাশী-খণ্ডে বিশদ-ভাবে বর্ণিত আছে। তিনি কাশীর বহু শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করিয়াছিলেন। * কাশীখণ্ডের মতে, দিবোদাসের অপর নাম—'রিপুঞ্জয়।' বিষ্ণুর আদেশে, গঙ্গার পশ্চিম তটে, তিনি 'দিবোদাসেশ্বর' শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। সে মতে, জ্যেষ্ঠ পুত্র সমঞ্জয়কে (মতান্তরে—সঞ্জয়কে) রাজ্য প্রদান করিয়া, তিনি নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। এই বংশের অলর্ক কাশীর প্রনষ্ট-গৌরব পুনরুদ্ধার করেন। তাঁহার শাসন-কালে বারাণসী নগরী রমণীয় বেশে সুসজ্জিত হইয়াছিল।

অলর্ক-প্রসঙ্গ।

অলর্কের নাম করিতে আবার কত কথাই মনে আসে! অলর্কই কি এক জন! মার্কণ্ডেয়-পুরাণে দেখিতে পাই,—শত্রুজিৎ নামে এক রাজা ছিলেন; তাঁহার পুত্রের নাম—ঋতধ্বজ (ঋতুধ্বজ), আর সেই ঋতধ্বজের পুত্র—অলর্ক মহীপতি। সেই অলর্কের দুই জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন; তাঁহাদের নাম—বিক্রান্ত ও সুবাহু। শত্রু-কুলকে দমন করিয়া, মহীপতি অলর্ক 'অরিমর্দ্দন' নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। কাশী-নরেশ অলর্ক এবং এই ঋতধ্বজ-পুত্র অলর্ক উভয়ে যে স্বতন্ত্র ব্যক্তি ছিলেন, তাহা সহজেই প্রতীত হয়। মার্কণ্ডেয়-পুরাণে লিখিত আছে,—'অলর্কের ভ্রাতা সুবাহু, রাজ্য-লাভের নিমিত্ত অনেক বার কাশীপতির শরণাপন্ন হইয়াছিলেন; আর, সেই

* স্কন্দপুরাণান্তর্গত কাশীখণ্ড, ত্রিচত্বারিংশ ও অষ্টপঞ্চাশৎ অধ্যায় এবং হরিবংশ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

কাশীরাজ, সুবাহুর পক্ষ অবলম্বন করিয়া, এই অলর্কের প্রতিকূলে যুদ্ধ-যাত্রা করিয়াছিলেন। সেই যুদ্ধে অলর্ক নিপীড়িত ও ক্ষীণবল হইয়া পড়েন। তাঁহার নগর অবরুদ্ধ হয়; কোষাগার শূন্য হইয়া যায়। অতঃপর, জননী মদালসার উপদেশ স্মরণান্তর আত্ম-বিবেক লাভ করিয়া, অলর্ক সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন।' অলর্কের জননী মদালসা অলর্ককে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাতে মদালসার জ্ঞান-গবেষণা ও বিদ্যাবত্তার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। উপদেশচ্ছলে মদালসা, পুত্র অলর্ককে এক সময়ে কহিয়াছিলেন,—

"সঙ্গঃ সর্ব্বাত্মনা ত্যাজ্যঃ সচেৎ ত্যক্তুং ন শক্যতে। স সদ্ভিঃ সহ কর্ত্তব্যঃ সতাং সঙ্গো হি ভেষজম্॥
কামঃ সর্ব্বাত্মনা হেয়ো জাতুঞ্চেচ্ছক্যতে ন সঃ। মুমুক্ষাং প্রতি তৎকার্য্যং সৈব তস্যাপি ভেষজম্॥"

'সর্ব্বান্তঃকরণে সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে। যদি সঙ্গ-ত্যাগে সমর্থ না হও, তাহা হইলে সেই সঙ্গ সাধুগণের সহিত করাই কর্ত্তব্য; কারণ, সাধু-সঙ্গই পরম ঔষধ-স্বরূপ। সর্ব্বান্তঃকরণে কাম পরিত্যাগ করা বিধেয়। যদি উহা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ না হও, তাহা হইলে মুক্তি-কামনার প্রতিই কামনা করা উচিত। কেন-না, উহাই তাহার মহৌষধ।' বিদুষী মদালসা এক-খানি শাসন-পত্রে এই কয়েকটী কথা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন; আপৎ-কালে, পবিত্র-চিত্তে, ইহা পড়িয়া দেখিতে পুত্রকে উপদেশ দিয়াছিলেন। জননীর এই উপদেশ-বাণী স্মরণ করিয়া, অলর্ক মহর্ষি দত্তাত্রেয়ের শরণার্থী হন। দত্তাত্রেয় তাঁহাকে যোগ-তত্ত্ব শিক্ষা দেন। দত্তাত্রেয়ের নিকট যোগ-শিক্ষার ফলে, অলর্ক মুক্তির পথে অগ্রসর হন। অলর্কের পিতা ঋতধ্বজ-সম্বন্ধেও নানা বিচিত্র উপাখ্যান প্রচলিত আছে। বজ্রকেতু দানবের পুত্র পাতালকেতু, গালব ঋষির যজ্ঞ-কর্ম্মে বিঘ্ন উৎপাদন করিত। ঋষি সেই দৈত্যের ধ্বংস-কামনায় দেবগণের শরণাপন্ন হন। তাহাতে আকাশ হইতে একটী অশ্ব পতিত হয়! দেববাণীতে গালব-ঋষি জানিতে পারেন,—"সেই অশ্ব জল-স্থল-মরুদ্ব্যোম সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে পারিবে। ভূবলয়ে তাহার অব্যাহত গতি বলিয়া, সে 'কুবল' নামে আখ্যাত হইবে। শত্রুজিৎ রাজার পুত্র ঋতধ্বজকে ঐ অশ্ব প্রদান করিলে, অশ্ব-রত্নে আরোহণ-পূর্ব্বক, তিনি পাতালকেতুর সংহার-সাধনে সমর্থ হইবেন। সেই অশ্বের নামানুসারে ঋতধ্বজ—'কুবলয়াশ্ব' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিবেন।" দৈববাণী-ক্রমে ঋতধ্বজের নিকট উপস্থিত হইয়া, মহর্ষি গালব সেই দেবদত্ত অশ্ব তাঁহাকে প্রদান করেন। সেই অশ্বে আরোহণ করিয়া, পাতালে গমন-পূর্ব্বক, রাজা ঋতধ্বজ বাণাঘাতে পাতালকেতুকে শমন-সদনে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেখানে অনিন্দ্যসুন্দরী গন্ধর্ব্বকন্যা মদালসার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। মদালসা—বিশ্বাবসু নামক গন্ধর্ব্বরাজের কন্যা। এক দিন তিনি উদ্যান-মধ্যে ক্রীড়া করিতে-ছিলেন; এমন সময়, পাতালকেতু তাঁহাকে অপহরণ করিয়া আনে, এবং বিবাহ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখে। ঋতধ্বজ, মদালসার উদ্ধার-সাধন করেন। ঋতধ্বজের সহিত মদালসার পরিণয়-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ইহার পর, পাতালকেতু দানবের অনুজ তালকেতু, ভ্রাতৃ-হত্যার প্রতিশোধ-গ্রহণে উদ্যোগী হইয়াছিল। কিন্তু বাহুবলে কুবলয়াশ্বকে পরাজিত করা সম্ভবপর নহে বুঝিয়া, তালকেতু মায়াজাল বিস্তার করে। সে মুনিরূপ গ্রহণ করিয়া, যমুনা-তটে অবস্থান করিতেছিল;—এমন সময় রাজপুত্র কুবলয়াশ্ব তথায়

উপস্থিত হন। তখন, তালকেতু কুবলয়াশ্বের নিকট ভিক্ষা-প্রার্থী হয়; বলে,—"আমি যজ্ঞ করিব; আমার দক্ষিণা দিবার সামর্থ্য নাই। আপনার মুকুট ও কণ্ঠভূষণ যদি আমায় প্রদান করেন, আমি কৃতকৃতার্থ হই।" ধার্ম্মিক-প্রবর কুবলয়াশ্ব তাহাতেই সম্মত হন। অতঃপর কুবলয়াশ্বকে আপন আশ্রমে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে বলিয়া, তালকেতু বরুণদেবের স্তব করিতে যায়। সে কিন্তু তাহার ছলনা মাত্র। সেই অবসরে, কুবলয়াশ্ব-ভবনে গমন করিয়া, তালকেতু মদালসার সহিত সাক্ষাৎ করে; কুবলয়াশ্বের মুকুটাদি দেখাইয়া বলে,—"কুবলয়াশ্বের মৃত্যু হইয়াছে।" ছদ্মবেশী তালকেতুর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, মদালসা পতিশোকে প্রাণত্যাগ করেন। কুবলয়াশ্ব প্রত্যাগত হইয়া, মদালসার শোকে অভিভূত হন। নাগরাজ অশ্বতরের পুত্রগণের সহিত কুবলয়াশ্বের বন্ধুত্ব ছিল। নাগরাজ দৈব-বিদ্যা অবগত ছিলেন। তিনি সেই দৈব-বিদ্যাবলে মদালসার জীবন-দান করেন। তার পর, মদালসার অলর্কাদি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। এই অলর্কের সহিত কেহ কেহ কাশীরাজ অলর্কের অভিন্নত্ব প্রতিপাদনের প্রয়াস পাইয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে,—'প্রতর্দ্দনের পুত্র বৎস—'ঋতধ্বজ' ও 'কুবলয়াশ্ব' নামে বিখ্যাত ছিলেন। মদালসা সেই বৎসের পত্নী। অলর্ক তাঁহারই গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।' কিন্তু পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলে, এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বড়ই দুঃসাধ্য। * যাহা হউক, ধর্ম্মাত্মা অলর্ক ন্যায়ানুসারে সুত-নির্ব্বিশেষে প্রজা-পালন করিতেন। দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন করিয়া, তিনি বহুবিধ শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। রামায়ণে আর এক অলর্কের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। সত্যরক্ষার্থ, দশরথকে উৎসাহিত করিবার জন্য কৈকেয়ী বলিতেছেন,—"দেখুন, সত্যরক্ষার নিমিত্ত মহীপতি শৈব্য, অঙ্গীকার করিয়া, শ্যেন-পক্ষীকে স্বীয় শরীর প্রদান করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তিনি উত্তম গতি লাভ করেন। আরও দেখুন,—তেজস্বী অলর্ক কোনও বেদজ্ঞ যাচমান ব্রাহ্মণকে স্বীয় নেত্রদ্বয় প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিয়া, অব্যাকুলিত চিত্তে স্বীয় নেত্রদ্বয় উৎপাটন করিয়া, তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন।" † মহিষী কৈকেয়ীর এই উক্তিতে রামায়ণে যে শৈব্যের ও অলর্কের পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁহারাই বা কে? রামায়ণে শৈব্যের নামে যে উপাখ্যান প্রচলিত, মহাভারতে তিন স্থলে তিন প্রকারে সেই প্রসঙ্গ উত্থাপিত। প্রথম,—বনপর্ব্বে নবনবত্যধিক শততম অধ্যায়ে দেখিতে পাই,—উশীনর-পুত্র শিবি, শরণাগতের প্রাণ-রক্ষার্থ এইরূপে আত্ম-ত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছেন। সেই শিবির পুত্রের নাম—কপোতরোমা। দ্বিতীয়,—শান্তিপর্ব্বের দুইটী অধ্যায়ে সেই একই কাহিনী রূপান্তরে পরিবর্ণিত। সেখানে শিবির পরিবর্ত্তে উশীনর (নামান্তরে—বৃষদর্ভ বা শৈব্য) শরণাগতের প্রাণ-রক্ষার জন্য আত্মপ্রাণ সমর্পণ করিতেছেন। সে উপাখ্যান এই,—'রাজা উশীনর পরম ধার্ম্মিক ছিলেন; তিনি যজ্ঞ করিয়া, ইন্দ্রতুল্য প্রভাববান্ হইয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মবল পরীক্ষা করিবার জন্য, ইন্দ্র ও অগ্নি যথাক্রমে শ্যেন ও কপোত-রূপ ধারণ করিয়া, তাঁহার যজ্ঞস্থলে উপনীত হন। কপোত,

* এই অলর্কের বিচিত্র চরিত্র, মার্কণ্ডেয় পুরাণের বিংশ হইতে চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।
† রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, চতুর্দ্দশ সর্গ।

যেন শ্যেন-ভয়ে পীড়িত ও শরণার্থী হইয়া, রাজা উশীনরের উরুদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে; সঙ্গে সঙ্গে শ্যেন-পক্ষী তাহাকে গ্রাস করিবার জন্য তাহার অনুসরণে রাজার নিকট উপস্থিত হয়। ভয়চকিত শরণাগত কপোতকে ক্রোড়ে রক্ষা করিয়া, রাজা শ্যেন-পক্ষীকে বুঝাইয়া প্রতিনিবৃত্ত করিবার প্রয়াস পান। কিন্তু শ্যেন-পক্ষী তাহাতে উত্তর দেয়,—"আমার ভক্ষ্য-সামগ্রী আমি ভক্ষণ করিব, আপনি কেন আপত্তি করিতেছেন? ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া আমাকেও তো প্রাণ বাঁচাইতে হইবে? আমার প্রাণ-রক্ষা করাও কি আপনার ধর্ম্ম নহে?" রাজা কহিলেন,—"শরণাগতকে আমি কোনক্রমেই পরিত্যাগ করিতে পারিব না। এই শরণাগত কপোত ব্যতীত শিবি-বংশের সমৃদ্ধ রাজ্য অথবা যে কোনও বস্তু তোমার অভি-লষিত হয়, তাহা তোমাকে প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি।" পক্ষী তাহাতে উত্তর দিল,—"যদি কপোতের প্রতি আপনার স্নেহ হইয়া থাকে, তবে আপনার দেহ হইতে মাংস কাটিয়া, এই কপোতের সম-পরিমাণ মাংস আমায় প্রদান করুন।" শরণাগতের রক্ষার্থ রাজা তাহাতেই সম্মত হইলেন। আত্ম-মাংস কর্ত্তন করিয়া, তিনি কপোতের সহিত তৌল করিতে লাগিলেন। কিন্তু শরীরের সকল মাংস কর্ত্তন করিয়াও, কপোতের সমান হইল না। তখন অস্থিমাত্র অবশিষ্ট নির্ম্মাংস রুধিরাপ্লুত রাজা বৃষদর্ভ স্বয়ং তুলাদণ্ডে আরোহণ করিলেন। পরীক্ষার চরম হইল! ইন্দ্রাদি দেবগণ রাজার মস্তকে পুষ্প-বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। রাজা শ্যেন-কপোতের প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর দেব-বিমানে আরোহণ করিয়া, রাজা উশীনর শাশ্বত-স্বর্গে গমন করিলেন। * কীর্ত্তি-কাহিনী যেরূপ-ভাবেই পরিবর্ণিত হউক, কিন্তু এ উশীনর বা বৃষদর্ভ কোন্ বংশ-সম্ভূত? মহাভারতে, রাজার উক্তিতে, আভাষ পাওয়া যায়,—উশীনর শিবি-বংশীয়। রামায়ণে 'শৈব্য' নামে অভিহিত হওয়ায়, তাঁহাকে শিবি-বংশজ বলিয়া বুঝিতে পারি। কিন্তু বংশ-লতা অনুসন্ধান করিয়া আমরা তাঁহাকে পাইতেছি কৈ? চন্দ্র-বংশান্তর্গত পুরু-বংশে এক উশীনর রাজার নাম দেখিতে পাই। তিনি হরিবংশে ষড়বিংশ পর্য্যায়ে এবং ব্রহ্মপুরাণে চতুর্ব্বিংশ পর্য্যায়ে অবস্থিত। কিন্তু তাঁহার পিতার নাম—মহামনা; এবং শিবি প্রভৃতি তাঁহার পুত্র বলিয়া পরিচিত। তাঁহার ঊর্দ্ধতন কোনও পুরুষে শিবির নাম-গন্ধ পর্য্যন্ত নাই। সুতরাং, শ্যেন-কপোত-উপাখ্যানের উশীনর এবং হরিবংশ বা ব্রহ্মপুরাণের চন্দ্র-বংশ-সম্ভূত উশীনর যে অভিন্ন নহেন,—তাহা স্বতঃই প্রতীত হয়।

পদ্মপুরাণে শ্রীরামচন্দ্রের সমসাময়িক কতকগুলি রাজ-বংশের পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধ-যজ্ঞের সময়, যজ্ঞীয় অশ্ব নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া, জয়-শ্রী ঘোষণা করিয়াছিল। যে যে রাজ্যে সেই অশ্ব গমন করে এবং যে যে রাজা বশ্যতা স্বীকার করেন, পদ্মপুরাণে তাহার কতকগুলি পরিচয় আছে। তখন অহিচ্ছত্রা-নগরে সুমদ নামে এক রাজা ছিলেন। সেই নগরে 'কামাক্ষা' দেবী বিরাজ করিতেন। রাজা সুমদ কঠোর তপস্যার ফলে, স্ব-রাজ্যে দেবীর

পদ্মপুরাণোক্ত রাজন্যবর্গ।

* মহাভারত বনপর্ব্বে—ত্রিংশদধিক শততম ও একত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়-দ্বয়ে এবং অনুশাসন পর্ব্বের দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ে শ্যেন-কপোত-উপাখ্যানে উশীনর রাজার প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

আধিষ্ঠানে সমর্থ হইয়াছিলেন। অহিচ্ছত্রা-নগরী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বহুতর জাতির আবাস-স্থান ছিল। সেখানে নানা রত্নে বিভূষিত স্ফটিকময় অট্টালিকা-শ্রেণী শোভা পাইত। শ্রীরামচন্দ্রের মন্ত্রী সুমতির সহিত শত্রুঘ্ন যজ্ঞাশ্বের অনুসরণে সেই রাজ্যে গমন করেন। রঘুকুলতিলক রামচন্দ্রের প্রতাপ, রাজা সুমদ সর্ব্বতোভাবে বিদিত ছিলেন। শত্রুঘ্ন প্রভৃতি উপস্থিত হইবামাত্র তিনি উপঢৌকন-সহ তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। এইরূপে সুমদ রাজা বশ্যতা জ্ঞাপন করিলে, শত্রুঘ্ন ভিন্ন-দেশাভিমুখে গমন করেন। এই অহিচ্ছত্রা-নগরীর অনতিদূরে মহর্ষি চ্যবনের আশ্রম ছিল। সুমতির সহিত শত্রুঘ্নের কথাবার্ত্তায় প্রতীত হয়,—যেন চ্যবন ঋষি তখনও বিদ্যমান আছেন। যজ্ঞাশ্ব অতঃপর রত্নাতট নগরে উপনীত হয়। মহারাজ বিমল সেই দেশে রাজত্ব করিতেন। বহু যোদ্ধৃবর্গে পরিবৃত হইয়া, যজ্ঞীয় অশ্ব রত্নাতট-অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে শুনিয়া, রাজা বিমল যথাযোগ্য উপঢৌকন-সহ শত্রুঘ্নের শরণাপন্ন হন। শত্রুঘ্ন মহারাজ বিমলকে মিত্রভাবে আলিঙ্গন করিলে, মহারাজ বিমল পুত্রের উপর রাজ্য-ভার অর্পণ করিয়া, বহু-ধনুর্দ্ধরে পরিবৃত হইয়া, শত্রুঘ্নের সহিত যাত্রা করেন। এই রাজ্য অতিক্রম করিলে নীলগিরি এবং পুরুষোত্তম-তীর্থ তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হয়। পুরুষোত্তম দর্শন করিয়া, তাঁহারা চক্রাঙ্কা-পুরীতে প্রবেশ করেন। সুবীর শত্রুঘ্ন, রাজা লক্ষ্মীনিধি এবং প্রচুর অগ্রগামী সৈন্য সহ রাজা প্রতাপাগ্র অশ্বের রক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন। অশ্বের ললাট-পত্রে লিখিত ছিল,—"দশরথ-পুত্র রামচন্দ্রের ন্যায় ধনুর্দ্ধর বীর জগতে দ্বিতীয় নাই। যাঁহারা আপনা-দিগকে ধনুর্দ্ধারী বীর বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহারা বলপূর্ব্বক এই রত্নমালা-বিভূষিত অশ্ব ধারণ করুন। সর্ব্ব-বীর-শিরোমণি শত্রুঘ্ন তাঁহাদের হস্ত হইতে অশ্ব মোচন করিবেন। যদি কাহারও অভিমান না থাকে, তিনি বশ্যতা স্বীকার করুন।" চক্রাঙ্কাধিপতি সুবাহুর পুত্র দমন, যজ্ঞাশ্বের ললাট-লিপি দর্শন করিয়া, সে অশ্ব বন্ধন করিলেন; উত্তেজিত-কণ্ঠে কহিলেন,—"আমার পিতা বর্ত্তমান থাকিতে পৃথিবীতে রামের এতই গর্ব্ব হইয়াছে? তিনি কি আমাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া মনে করেন না? যাহা হউক, আজ আমি তাঁহাদের দর্প চূর্ণ করিব।" ইহার পর, উভয়-পক্ষে ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। বহু দিন সে যুদ্ধ চলিয়াছিল। যুদ্ধে দমনের হস্তে বহু সৈন্য নিহত হয়। পরিশেষে, ভরত-পুত্র পুষ্কলের নিকট দমন পরাজিত হন। দমনের পরাজয়ের পর, দমনের পিতা সুবাহু এবং দমনের খুল্লতাত চিত্রাঙ্গ অনেক দিন যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন। পরিশেষে, মূর্চ্ছিত হইয়া রাজা সুবাহু স্বপ্নে শ্রীরাম-চন্দ্রকে দর্শন করেন। সেই হইতে তাঁহার মনে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি ভক্তির উদ্রেক হয়। শত্রুঘ্ন-সমীপে প্রণত হইয়া রাজা সুবাহু যজ্ঞাশ্ব প্রত্যর্পণ করেন। অতঃপর, সেই জয়-পত্র-শোভিত অশ্ব, সত্যবান রাজার রাজ্যে—তেজপুরে উপনীত হয়। ভাগীরথী-তীরে অবস্থিত সেই তেজপুর নগর বহুল দেবায়তন এবং যতিগণে-পূর্ণ মঠ-সমূহে সুশোভিত ছিল। চতুর্দ্দিকে বিচিত্র প্রাচীর এবং তদুপরি শ্রেণীবদ্ধ সুবর্ণ-কলস-নিচয় ঐ নগরের শোভা-সম্বর্দ্ধন করিতেছিল। সত্যবান—রামচন্দ্রের অনুগত ছিলেন। সুতরাং যজ্ঞাশ্বের উপস্থিতি-মাত্রে তিনি উপঢৌকনাদি প্রদানে বশ্যতা স্বীকার করিলেন। এই সত্যবানের পিতার নাম—ঋতম্ভর।

বহু যজ্ঞের ফলে, বহু ব্রতানুষ্ঠান-দ্বারা, তিনি এই পুত্র-রত্ন লাভ করেন। তেজপুর পরিত্যাগ করিয়া, অশ্ব আরণ্যক ঋষির আশ্রমে প্রবেশ করে। অতঃপর, নর্ম্মদা-সলিল অতিক্রম করিয়া, অশ্বসহ শত্রুঘ্নাদি বীরগণ দেব-নির্ম্মিত দেবপুরে উপস্থিত হন। 'তথায় মানবগণের গৃহসকল স্ফটিক-মণিময় ভিত্তি-বিন্যাস-হেতু যেন নাগগণ-সেবিত বিমল বিন্ধ্যাচলকেও উপহাস করিতেছিল।' নৃপবর বীরমণি সে রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্র রুক্মাঙ্গদ সেই যজ্ঞাশ্ব বন্ধন করেন। এ নগরেও ঘোরতর যুদ্ধ হয়। রাজা বীরমণি পুষ্কলের নিকট পরাজিত হইলে, রাজ-ভ্রাতা বীরসিংহ প্রবল বিক্রমে সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হন। স্বয়ং মহেশ্বর বীরসিংহের সহায় হইয়াছিলেন। সুতরাং যুদ্ধে শত্রুঘ্নাদির পরাজয় হয়। পরিশেষে শ্রীরামচন্দ্র উপস্থিত হইলে, শিব-রামের অভিন্নত্ব উপলব্ধি করিয়া, বীরমণি দিব্যজ্ঞান লাভ করেন। যজ্ঞাশ্ব প্রত্যর্পিত হয়। রাজা বীরমণি. শ্রীরামচন্দ্রের শরণাগত হইয়া, স্বীয় সৈন্য-সামন্ত-সমভিব্যাহারে শত্রুঘ্নের অনুগমন করেন। ইহার পর, ভারত-প্রান্ত-বর্ত্তী হেমকুট পর্ব্বতে অশ্ব উপনীত হয়। সেই পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া, যজ্ঞাশ্ব একে একে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ দেশের রাজগণ-কর্ত্তৃক সম্মান-প্রাপ্ত হইয়াছিল। অবশেষে, সুরথ-রাজার রাজধানী কুণ্ডল-নগরে অশ্ব উপনীত হইলে, রাজা সেই অশ্ব বন্ধন করেন। রাজার মহাবল-পরাক্রান্ত দশটী পুত্র ছিল। তাঁহাদের নাম—চম্পক, মোহক, রিপুঞ্জক, দুর্ব্বার, প্রতাপি, বলমোদক, হর্য্যক্ষ, সহদেব, ভুরিদেব ও সুতাপন। সেই বীর রাজকুমারগণও পিতার আদেশে যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইলেন। সুরথ-রাজের সহিত ঘোর যুদ্ধ চলিল। সুরথ শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত ছিলেন। কিন্তু মনে মনে তাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষা করিয়াই যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন। যুদ্ধে শত্রুঘ্ন প্রভৃতি পরাজিত হইলে, শ্রীরামচন্দ্রের আগমনে, সুরথ-রাজা ভক্তিভরে যজ্ঞাশ্ব প্রদান করেন। ইহার পর, চম্পককে রাজ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, রাজা সুরথ শত্রুঘ্নের সহিত দেশ-বিজয়ে গমন করিলেন। তখন, তাঁহারা যে যে দেশে গমন করেন, একে একে সকল দেশের নৃপতিই তাঁহাদের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষে বল্মীকির তপোবনে অশ্ব উপনীত হইলে, লব ও কুশ সে অশ্ব বন্ধন করেন। শ্রীরাম-পুত্র সেই দুই বালকের সহিত যুদ্ধে বীরগণ কেহই সমর্থ হন না। স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্রও সেই বালক-যুগলের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হন। সেই যুদ্ধে শ্রীরামচন্দ্রের পক্ষীয় যোদ্ধৃবৃন্দ নিহত হইলে, মহর্ষি বাল্মীকি মৃত-সঞ্জীবনী-মন্ত্রে তাঁহাদিগকে সঞ্জীবিত করেন; যজ্ঞাশ্ব প্রত্যর্পিত হয়। শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠানে, এই সকল নৃপতির পরিচয় পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন, পদ্মপুরাণে, মহীরথ, শ্রীধর, ভদ্রশ্রবা, চিত্রসেন প্রভৃতি আরও কত রাজার কতরূপ কীর্ত্তি-কাহিনীর উল্লেখ দেখিতে পাই। মহীরথ রাজার প্রসঙ্গে পদ্মপুরাণে লিখিত আছে,—'রাজা সর্ব্বদা কাম-ক্রীড়ায় আসক্ত ছিলেন। ধর্ম্মার্থ-বিষয়ে কখনও তাঁহার মন আকৃষ্ট হইত না। মন্ত্রি-হস্তে রাজ্যভার প্রদান করিয়া, তিনি নিয়ত ইন্দ্রিয়-সুখ-সম্ভোগে নিরত ছিলেন। তদীয় পুরোহিত কশ্যপ তাহাতে বড়ই ক্ষুব্ধ হন। অনেক বুঝাইয়া শেষে তিনি রাজাকে বৈশাখ-মাসের অনুষ্ঠেয় স্নান-দানাদি কয়েকটী কার্য্যে অনুরক্ত করেন। পুরোহিতের উপদেশে অতি কষ্টে বৈশাখ মাসে রাজা ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিতেন; আর,

বৎসরের অবশিষ্ট একাদশ মাস কাল তিনি যথেচ্ছ-ক্রীড়ামোদে মত্ত থাকিতেন। কিন্তু বৈশাখী ব্রতের জন্ত, মৃত্যুর পর রাজা বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তখন, নরকের যন্ত্রণা দর্শনে, তাঁহার চিত্ত জীবের হিত-সাধনে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল।' শ্রীধর রাজার প্রসঙ্গে, কোন্ কর্ম্মে কিরূপ পুত্র জন্মে, পদ্মপুরাণে তাহাই উল্লিখিত হইয়াছে। লক্ষ্মীব্রত-প্রসঙ্গে পদ্মপুরাণে ভদ্রশ্রবা রাজার নাম উল্লিখিত। তিনি সৌরাষ্ট্রদেশবাসী এবং বেদ-বেদাঙ্গ-পারদর্শী। দ্বাপর-যুগে তিনি বিদ্যমান ছিলেন। সিদ্ধেশ্বর নৃপতির পুত্র মালাধর কিরূপে লক্ষ্মীকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এই প্রসঙ্গে তাহাও উক্ত হইয়াছে। কোন্ কোন্ পুণ্যে নরগণ গতপাতক হইয়া হরিস্থানে গমন করে, দীননাথ রাজার উপাখ্যানে, এই গ্রন্থে তাহা পরিবর্ণিত। প্রসঙ্গতঃ, এইরূপ আরও কত রাজারই নাম দেখিতে পাই। কিন্তু তাঁহারা কোন্ বংশে, কাহার অংশে, জন্মগ্রহণ করিয়াছেন,—নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

মহাভারতোক্ত অপরাপর রাজন্তবর্গ।

মহাভারতে আরও কত কত নৃপতির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে! যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে বহু দেশের বহু নৃপতি যজ্ঞ-সভার শোভা-সম্বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে—মুঞ্জকেতু, বিবর্দ্ধন, সংগ্রামজিৎ, উগ্রসেন, কক্ষসেন, ক্ষেমক, কম্বোজ-রাজ কমঠ, কম্পন, জটাসুর, মদ্রাধিপতি কুন্তি, কিরাত-রাজ পুলিন্দ, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্রক, পাণ্ড্য, উড্ররাজ, অন্ধ্রক, সুমিত্র, শৈব্য, কিরাতরাজ সুমনা, যবনাধিপতি চানুর, দেবরাত, ভোজ, ভীমরথ, কলিঙ্গ-রাজ শ্রুতায়ুধ, মগধাধিপতি জয়সেন, সুকর্ম্মা, চেকিতান, পুরু, কেতুমান, বসুদান, বৈদেহ, কৃতক্ষণ, সুধর্ম্মা, অনিরুদ্ধ, শ্রুতায়ু, অনুপরাজ, সুদর্শন, ক্রমজিৎ, শিশুপাল, করূষাধিপতি আহুক, বিপ্রথু, গদ, শারণ, অক্রূর, কৃতবর্ম্মা, সত্যক, ভীষ্মক, অকৃতি, দ্যুমৎসেন, কেকয়গণ, সোমক-নন্দন, যজ্ঞসেন, বৃষ্ণি-বংশের কুমারগণ প্রসিদ্ধ। রাজসূয় যজ্ঞের সময় যে সকল নৃপতির নাম দৃষ্ট হয়, কুরুক্ষেত্র-সমরে তদপেক্ষা অধিক-সংখ্যক নৃপতির পরিচয় পাই। তাঁহাদের কেহ পাণ্ডব-পক্ষে, কেহ বা কৌরব-পক্ষে, যোগদান করিয়াছিলেন। উদ্যোগ-পর্ব্বে মহারাজ দ্রুপদ—পাণ্ডব-পক্ষে সহায়তার জন্ম বহু নৃপতির নিকট দূত প্রেরণের উপদেশ দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—"মহারাজ শল্য এবং তাঁহার অনুগত রাজগণের নিকট শীঘ্র চর প্রেরণ কর। অনন্তর পূর্ব্ব-সাগরবাসী মহারাজ ভগদত্ত, হার্দ্দিক্য, আহুক, রোচমান, বৃহন্ত, সেনাবিন্দু, সেনজিৎ (পাপজিৎ), প্রতিবিন্ধ্য, চিত্রবর্ম্মা, সুবাস্তক, বাহ্লিক, মুচুকেশ (মুঞ্জকেশ), চেদিপতি সুপার্শ্ব, সুবাহু, পৌরব, শক-রাজ, পহ্লব-রাজ (পল্লব-রাজ), দরদ-রাজ, কম্বোজ-রাজ, নদীজ (ঋষিক) প্রভৃতি রাজগণের নিকট দূত প্রেরণ করা কর্ত্তব্য। আরও, পশ্চিমস্থ অনুপদেশীয় ভূপাল-বর্গ, পর্ব্বত-বাসী ভূপতি-বর্গ, কারূষ-দেশীয় নৃপতিবৃন্দ, পঞ্চনদ রাজ্যের ভূপতিগণ, সকলকেই সংবাদ দেওয়া হউক। জয়ৎসেন, কাশ্য, দুর্দ্ধর্ষ, সুশর্ম্মা, জানকী, মণিমান, পোতিমৎসক, পাংশু-রাষ্ট্রাধিপতি ধৃষ্টকেতু, ওড্র, বৃহৎসেন, নিষাদ, শ্রেণিমান, বসুমান, বৃহদ্বল, বাহু, সমুদ্রসেন, ক্ষেমক, শ্রুতায়ু, দৃঢ়ায়ু, উদ্ধব, পৌণ্ড্র, দণ্ডধার, একলব্য, আষাঢ়, জনমেজয়, বায়ুবেগ, পূর্ব্ব-পালি, ভূরিতেজা, দেবক, কর্ণবেষ্ট, নীল, বীরধর্ম্মা, সুবারি, কলিঙ্গাধিপতি কুমার, ক্ষেমধূর্ত্তি, বাটধান, সুচক্র, নিচক্র,

তুমুল, ক্রথ, বসুমান প্রভৃতি ভূপালগণের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া অগৌণে তাঁহাদিগকে আনয়ন কর।" কুরুক্ষেত্র-সমর আরম্ভ হইলে, দূরদর্শী সঞ্জয়, ধৃতরাষ্ট্রের নিকট উভয়-পক্ষীয় বীরগণের যুদ্ধ-বার্ত্তা সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছেন। সেখানেও বহু নৃপতির পরিচয় পাওয়া যায়। দুর্য্যোধন তখন দ্রোণাচার্য্যের নিকট উভয় সৈন্য-দলের পরিচয় দিতেছেন,—

"পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূম্। ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা॥
অত্র শূরা মহেষাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি। যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ॥
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীর্য্যবান্। পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ॥
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্। সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্ব এব মহারথাঃ॥
অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্ নিবোধ দ্বিজোত্তম। নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমিতে॥
ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ। অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ॥"

অর্থাৎ,—"হে গুরুদেব! ঐ দেখুন, আপনার শিষ্য সুচতুর দ্রুপদ-নন্দন (ধৃষ্টদ্যুম্ন) পাণ্ডু-পুত্রদিগের জন্য বিশাল সৈন্যব্যূহ রচনা করিয়াছে। সম্মুখবর্ত্তী সৈন্যসমূহের মধ্যে ভীমার্জ্জুন-সম বলশালী মহাধানুকি যুযুধান, বিরাট, মহারথ দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, বীর্য্যবান্ কাশী-রাজ, পুরুজিৎ, কুন্তীভোজ, নরশ্রেষ্ঠ শৈব, মহাপরাক্রমশালী যুধামন্যু, বীর্য্য-সম্পন্ন উত্তমৌজা, সুভদ্রা-তনয় অভিমন্যু এবং দ্রৌপদী-নন্দনগণ,—এই সকল বীরগণ সমবেত হইয়াছেন। হে দ্বিজোত্তম দ্রোণাচার্য্য! আমাদের পক্ষেও যে সকল প্রতিষ্ঠান্বিত বীরগণ নেতৃপদ গ্রহণ করিয়াছেন, আপনার জ্ঞাতার্থ তাঁহাদের নামও উল্লেখ করিতেছি। আপনি স্বয়ং তো আছেনই; অধিকন্তু, পিতামহ ভীষ্ম, কর্ণ, যুদ্ধজয়ী কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্ত-সুত ভূরিশ্রবা এবং জয়দ্রথ,—মৎপক্ষে এই সকল শূর বিদ্যমান রহিয়াছেন।" কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের প্রারম্ভে দুর্য্যোধন উভয়-পক্ষের যে যে বীরের নাম উল্লেখ করিলেন, তাঁহারা এক এক জন ধুরন্ধর দিক্‌পাল-বিশেষ। বীর সাত্যকির অপর নাম—যুযুধান। পারিজাত-হরণ-কালে স্বর্গ-পুরে গমন করিয়া ইনি দেব-শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। কৃষ্ণের সারথি-রূপে সাত্যকির প্রসিদ্ধি ছিল। কুরুক্ষেত্র-সমরে পাণ্ডব-পক্ষ অবলম্বনেও তিনি যশস্বী হইয়াছিলেন। বিরাট—মৎস্য-দেশের অধিপতি ছিলেন। অজ্ঞাত-বাসের সময়, পাণ্ডবগণ ছদ্মবেশে বৎসরেক কাল তাঁহারই ভবনে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বিরাট-রাজের কন্যা উত্তরার সহিত অভিমন্যুর বিবাহ হয়। সে হিসাবে, বিরাট-রাজ—পাণ্ডবগণের বৈবাহিক-স্থানীয়। তিনি অসংখ্য সৈন্য-সহ কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে পাণ্ডবগণের সহায়তা করিয়াছিলেন। দ্রুপদ—পাঞ্চালাধিপতি ছিলেন। তিনি দ্রৌপদী ও ধৃষ্টদ্যুম্নের পিতা; তিনি পাণ্ডবগণের শ্বশুর। ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ এবং শৈব্য প্রভৃতি বীরগণ রাজসূয়-যজ্ঞের সময় পাণ্ডবগণের সহিত মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে পাণ্ডবগণের পক্ষাবলম্বন করিয়া তাঁহারা সেই পূর্ব্ব-মিত্রতারই পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। কুন্তিভোজ—পাণ্ডবদিগের মাতা কুন্তী-দেবীর পালক-পিতা। চেকিতান—চিকিতান রাজার পুত্র। তিনি বীর বলিয়া প্রসিদ্ধ। ধৃষ্টকেতু—দ্রুপদ রাজার পুত্র; দ্রৌপদীর সহোদর। মতান্তরে, তিনি আবার ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র বলিয়াও উক্ত হইয়া থাকেন। যাহা হউক, তাঁহার সমুজ্জ্বল কেতন দর্শনে শত্রুকুল

ভয়-বিচলিত হইত। কথিত হয়, সেই জন্যই তিনি ধৃষ্টকেতু নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। পুরুজিৎ নামে যদু-বংশীয় এক নৃপতির নাম দৃষ্ট হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের মতে,—তিনি রুচকের পুত্র। তবে, এই কুরুক্ষেত্র মহা-সমরে তাঁহার উপস্থিতি সম্ভবপর কি না, বংশ-লতা আলোচনায় তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। পুনঃপুনঃ শত্রু-জয় করিয়া তিনি পুরুজিৎ নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন;—তাঁহার নামানুসারে ইহাই বুঝিতে পারা যায়। উত্তমৌজা এবং যুধামন্যু—পাঞ্চাল-দেশের দুই জন নৃপতি বলিয়া প্রসিদ্ধ। যুদ্ধ-ক্ষেত্রে অপরিমেয় সাহস-সম্পন্ন বলিয়াই উত্তমৌজা নাম;—যুদ্ধে শত্রুর প্রতি ক্রোধান্বিত বলিয়াই যুধামন্যু নাম। অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীর পঞ্চ-পুত্রের বিষয় পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। সপ্তরথী-পরিবেষ্টিত হইয়া, অন্যায় সমরে, অভিমন্যু নিহত হন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের অবসানে, পঞ্চ-পাণ্ডব-ভ্রমে, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রকে, নিদ্রিত অবস্থায়, অশ্বত্থামা নিহত করেন। ভীষ্ম এবং কর্ণের পরিচয় পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। পরশুরামের নিকট অস্ত্র-বিদ্যা শিক্ষা করিয়া কর্ণ অসাধারণ বীর বলিয়া প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছিলেন। কর্ণের দান-শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া, ইন্দ্র তাঁহাকে শত্রু-সংহার-কারিণী শক্তি দান করেন। দুর্য্যোধনের সাহায্যে তিনি অঙ্গ-রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। কর্ণের অপর নাম—বৈকর্ত্তন। দুর্য্যোধন কর্ণকে বীর-কুল-চূড়ামণি বলিয়া বিশ্বাস করিতেন; কিন্তু ভীষ্মের নিকট কর্ণ অৰ্দ্ধরথী-মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। কৃপাচার্য্যের জন্ম-বিবরণ অদ্ভুত রহস্য-পরিপূর্ণ। ধনুর্ব্বিদ্যা-পারদর্শী তপস্বী শরদ্বান্ আপন পুত্র-কন্যাকে বন-মধ্যে ফেলিয়া যান। রাজা শান্তনু, মৃগয়ায় গমন করিয়া, সেই নিঃসহায় অনাথ বালক-বালিকাকে গৃহে আনয়ন করেন। তাঁহার কৃপায় সেই বালক-বালিকা প্রতিপালিত হয়। কৃপায় প্রতিপালিত বলিয়া, বালক-বালিকা কৃপ-কৃপী নামে অভিহিত হইয়াছিল। কিছুকাল পরে শরদ্বান পুত্রকে আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়া, শাস্ত্র ও অস্ত্র-বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। দ্রোণাচার্য্যের সহিত কৃপীর বিবাহ হয়। দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডব ও কৌরবদিগকে অস্ত্র-শস্ত্র শিক্ষা দিতেন। ইনি ভরদ্বাজ ঋষির পুত্র। যেমন শস্ত্র-বিদ্যায়, তেমনি শাস্ত্র-বিদ্যায় ইনি পারদর্শী ছিলেন। পরশুরামের নিকট ইনি অস্ত্র-পরি-চালনা এবং ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন। কথিত হয়, একটী 'দ্রোণ' বা কলসের মধ্যে ইহাঁর জন্ম হইয়াছিল, সেই জন্যই ইনি 'দ্রোণ' নামে পরিচিত। ইহাঁর পত্নী কৃপীর গর্ভে অশ্বত্থামা জন্মগ্রহণ করেন। জন্মকালে অশ্বের ন্যায় ধ্বনি করিয়াছিল বলিয়া, শিশুর নাম অশ্বত্থামা হয়। দ্রোণ—দ্রুপদ-রাজের বাল্য-সহচর ছিলেন। পিতা পৃষতের মৃত্যুর পর, যৌব-রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া, দ্রুপদ দ্রোণের প্রতি অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ করেন। সেই সময়ে তিনি দ্রোণের প্রতি এতই বিরক্ত হইয়াছিলেন যে, দ্রোণের বিনাশ-কামনায় পুত্র-কামী হইয়া, এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন। প্রকাশ,—সেই যজ্ঞীয় হুতাশন হইতে ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং দ্রৌপদী উত্থিত হন। দ্রুপদের বিরূপ ভাব দেখিয়া, দ্রোণ পাঞ্চাল-রাজ্য হইতে হস্তিনা-রাজ্যে চলিয়া আসেন। ভীষ্ম তাঁহাকে রাজ-কুমারগণের আচার্য্য-পদে নিয়োজিত করেন। অর্জ্জুন প্রিয়-শিষ্য হইলেও, দুর্য্যোধনের অনুরোধাতিশয্যে দ্রোণাচার্য্য তাঁহারই পক্ষ অবলম্বন করিয়া সেনাপতির পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধে, পঞ্চাশীতি

বর্ষ বয়সে দ্রোণাচার্য্য নিহত হন। যাহা হউক, কৃপ ও কৃপীর সম্বন্ধে একটু মতান্তর দৃষ্ট হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে তাঁহারা শরদ্বানের পুত্র-কন্যারূপে পরিচিত হইলেও, হরিবংশে এবং অগ্নিপুরাণে তাঁহারা সত্যধৃতির পুত্র-কন্যারূপে পরিকীর্ত্তিত। বিকর্ণ—ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র; দুর্য্যোধনের ভ্রাতা। ভুরিশ্রবা—চন্দ্রবংশীয় সোমদত্ত রাজার পুত্র। ইনি মহাবীর ও মহা-যশা বলিয়া বিখ্যাত। সাত্যকি-হস্তে ইনি নিহত হন। জয়দ্রথ—সিন্ধুদেশের অধিপতি ছিলেন; ইনি ধৃতরাষ্ট্রের জামাতা। দুর্য্যোধনের ভগিনী দুঃশলার (দুঃশীলার) সহিত ইহাঁর বিবাহ হয়। অভিমন্যু-বধে সপ্তরথীর মধ্যে ইনি অগ্রণী ছিলেন। অর্জ্জুন ইহাঁর সংহার-সাধন করেন। কুরুক্ষেত্র মহাসমরে আরও যে কত নৃপতি যোগদান করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা হয় না। রাজা নীল, পাণ্ডব-পক্ষ অবলম্বন করিয়া, কুরুক্ষেত্র-সমরে অশ্বত্থামার হস্তে নিহত হন। তিনি কোন্ বংশের (কোন পর্য্যায়ে) বংশধর ছিলেন, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। মহারথী শিবি রাজা পাণ্ডব-পক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। দ্রোণ-হস্তে তিনি নিহত হন। শিবি-রাজের পরিচয়-সম্বন্ধেও বিষম মতানৈক্য দৃষ্ট হয়। বসাতি রাজা কৌরব-পক্ষে যোগদান করিয়াছিলেন; অভিমন্যু-হস্তে তিনি নিহত হন। রাজা সুদর্শন, দুর্য্যোধনের পক্ষাবলম্বন-পূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সাত্যকি তাঁহার সংহার-সাধন করেন। কুলুতপতি ক্ষেমধূর্ত্তি, ধনুর্দ্ধারণ-পূর্ব্বক, বৃকোদরকে বিদ্ধ করিয়াছিলেন। গদাহত হইয়া ভীমসেনের হস্তে তিনি নিপাতিত হন। কুলুতদিগের যশস্কর সেই নৃপতিকে নিহত দেখিয়া, দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ পলায়নপর হইয়াছিল। কুলিন্দরাজ সসৈন্যে পাণ্ডব-পক্ষ অবলম্বন করিয়া, কুরুপক্ষকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার বিধর্দ্দি-প্রমুখ ভ্রাতৃত্রয় যুদ্ধে নিহত হন। কত নাম করিব? এই যুদ্ধে পারদ, শক, হুন, কম্বোজ, পহ্লব, কিরাত প্রভৃতি নানা দেশের আর্য্য ও অনার্য্য নৃপতিগণ যোগদান করিয়াছিলেন। কিন্তু বংশ-পর্য্যায় অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাদের অনেকেরই নাম পাওয়া যায় না।

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে এবং কুরুক্ষেত্রের মহা-সমরে যেরূপ অসংখ্য নৃপতির পরিচয় পাওয়া যায়; সেইরূপ আবার তাঁহার অশ্বমেধ যজ্ঞে, পাণ্ডব-গণের দিগ্বিজয়ের সময়, বহু রাজা ও বহু নৃপতির উল্লেখ দেখিতে পাই। শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শ অনুসারে যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞে প্রবৃত্ত হন। স্থির হয়,—মহাবাহু অর্জ্জুন অশ্বকে রক্ষা করিবেন; ভীমসেন এবং নকুল রাষ্ট্র-রক্ষায় ব্রতী রহিবেন; মহাযশা সহদেব কুটুম্বগণের অভ্যর্থনায় নিযুক্ত থাকিবেন; নকুল পুর-রক্ষায় নিয়োজিত হইবেন। ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি লইয়া, এইরূপ-ভাবে কার্য্য-বিভাগ হইয়াছিল। যজ্ঞাশ্ব প্রথমে উত্তরদেশে ধাবমান হয়। উত্তর-দিক হইতে পরে সেই অশ্ব পূর্ব্ব-দিকে গমন করিয়াছিল। যজ্ঞাশ্বের অনুসরণে মহাবীর ধনঞ্জয় যখন রাষ্ট্র-সকল বিমর্দ্দিত করিয়া পরিভ্রমণ করেন,—কত কত নৃপতির সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইয়াছিল! বহু শত কিরাত ও যবন, বহুবিধ ম্লেচ্ছ, এবং বহু প্রদেশের বহু আর্য্য-নৃপতি তাঁহাকে বাধা দিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু কেহই তাঁহার যজ্ঞাশ্বের গতিরোধ করিতে সমর্থ হন নাই। উত্তর প্রদেশ জয় করিয়া, যজ্ঞাশ্ব পূর্ব্ব প্রদেশে উপনীত হইলে, প্রথমে ত্রিগর্ত্ত-রাজের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ

অশ্বমেধ যজ্ঞে অনুগত নৃপতি-বৃন্দ।

উপস্থিত হয়। ত্রিগর্ত্ত-রাজ সূর্য্যবর্ম্মা এবং তাঁহার অনুজ তেজস্বী কেতুকর্ম্মা সঙ্কুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। একে একে ভ্রাতৃদ্বয় নিহত হইলে, ধৃতবর্ম্মা অর্জ্জুনের প্রতিদ্বন্দ্বিতাচরণ করেন। কিন্তু ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে তিনি কোনক্রমেই জয়লাভ করিতে পারেন না। পরিশেষে ত্রিগর্ত্তবাসীরা পাণ্ডবগণের বশ্যতা-স্বীকারে বাধ্য হয়। ত্রিগর্ত্ত-দেশ হইতে তুরঙ্গম প্রাগ্-জ্যোতিষ দেশে গমন করিয়াছিল। ভগদত্তাত্মজ মহীপতি বজ্রদত্ত যজ্ঞাশ্ব বন্ধন করেন। বজ্রদত্তের সহিত অর্জ্জুনের ত্রিরাত্র যুদ্ধ চলিয়াছিল। যুদ্ধে বজ্রদত্ত পরাজিত হন। অর্জ্জুন তাঁহার সংহার-সাধন না করিয়া, বজ্রদত্তকে অধীন রাজগণ মধ্যে গণ্য করেন; বলেন,—"তোমার জীবন দান করিলাম। আগামী চৈত্র-পূর্ণিমাতে ধর্ম্মরাজের অশ্বমেধ যজ্ঞ হইবে, তৎকালে তোমরা তথায় উপস্থিত থাকিবে।" নির্জ্জিত বজ্রদত্ত তাহাতেই সম্মত হন; প্রাগ্-জ্যোতিষ দেশ পাণ্ডবগণের প্রাধান্য স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। ইহার পর, সিন্ধু-রাজ-বংশীয়দিগের সহিত কিরীটীর যুদ্ধ হয়। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের নিধন-বার্ত্তা স্মরণ করিয়া, সিন্ধুবাসিগণ অর্জ্জুনকে আক্রমণ করে। কিন্তু পার্থ তাহাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ করিয়া দেন। এই যুদ্ধে অর্জ্জুনের হস্তে সিন্ধুরাজ-কুল নির্ম্মূল হয় দেখিয়া, ধৃতরাষ্ট্র-দুহিতা দুঃশলা, নপ্তা সুরথ-সুতের সহিত রথে আরোহণ করিয়া, ধনঞ্জয়ের নিকট কৃপা-প্রার্থী হন। তাঁহার করুণ ক্রন্দনে ব্যথিত হইয়া, ধনঞ্জয় ধনুঃ-ত্যাগ করেন। ফলে, সিন্ধুদেশ—পাণ্ডবগণের অধীনতা-পাশে আবদ্ধ হয়। সিন্ধুদেশ হইতে ধনঞ্জয় মণিপুরাভিমুখে অগ্রসর হন। বভ্রু-বাহন তখন মণিপুরের অধিপতি ছিলেন। তিনি অর্জ্জুনের পুত্র,—চিত্রাঙ্গদার গর্ভ-সম্ভূত। যজ্ঞাশ্বের রক্ষক-রূপে পিতা অর্জ্জুন আসিয়াছেন—সংবাদ পাইয়া, বহু অর্থ উপহার লইয়া, ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারে, বভ্রুবাহন অর্জ্জুনের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; পাণ্ডবগণের প্রতি আনুগত্য-স্বীকারের অভিপ্রায় জানাইলেন। কিন্তু ক্ষাত্র-ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া, তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া, অর্জ্জুন বরং বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিলেন; কহিলেন,—"এরূপ ভাবে আত্ম-সমর্পণে বশ্যতা-স্বীকার—ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে। আমি অস্ত্র-শস্ত্র-সহ সদলবলে যুদ্ধার্থ সমবেত হইয়াছি। তুমি স্ত্রীলোকের ন্যায় আমায় প্রতিগ্রহ করিতেছ!" বভ্রুবাহনের এই অপমানের সংবাদ শ্রবণ করিয়া, নাগরাজ-নন্দিনী উলূপী, বভ্রুবাহনকে সমর-সজ্জায় সজ্জিত হইতে উৎসাহিত করিলেন। উলূপী—বভ্রুবাহনের বিমাতা; অর্জ্জুনের অপরা পত্নী; কৌরব্য-নামক নাগরাজের কন্যা। দ্বাদশ বৎসর বনবাস-কালে অর্জ্জুন ইহাঁকে বিবাহ করেন। বভ্রুবাহনকে উলূপী এমনই ওজস্বিনী ভাষায় উত্তেজিত করিলেন যে, বভ্রুবাহন তখন পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। পিতা-পুত্রে সঙ্কুল সমর আরম্ভ হইল। সমরে অর্জ্জুন হত-চেতন এবং পিতৃ-হত্যাশঙ্কায় বভ্রুবাহন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন পতি-পুত্রের শোকে অধীরা হইয়া চিত্রাঙ্গদা রোদন করিতে লাগিলেন; উলূপীকে ভর্ৎসনা করিয়া, পতি-পুত্র কিরূপে চেতনা-লাভ করেন,—তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে কহিলেন। উলূপীর অধিকারে সঞ্জীবন-মণি ছিল। উলূপী সেই মণি পুত্রের হস্তে প্রদান করিয়া, অর্জ্জুনের বক্ষদেশে স্থাপন করিতে পরামর্শ দিলেন। অর্জ্জুন পুনর্জ্জীবন লাভ করিলেন; বভ্রুবাহনকে তাঁহার মাতৃদ্বয়-সহ যজ্ঞ-ক্ষেত্রে উপস্থিত

হইতে উপদেশ দিলেন। পরিশেষে সেই যজ্ঞীয় অশ্বের অনুসরণে তিনি অন্য দেশে গমন করিলেন। নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া, অশ্ব—মগধ-দেশে উপনীত হইল। সেখানে সহদেব-তনয় মেঘসন্ধি যজ্ঞাশ্ব বন্ধন করিলেন। সব্যসাচীকে পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল। সে যুদ্ধে অর্জ্জুন জয়লাভ করিলেন। তখন, মগধ-রাজকেও অশ্বমেধ-যজ্ঞে উপস্থিত হইবার জন্য আমন্ত্রণ করা হইল। তৎপরে বীরবর ফাল্গুনী, ক্রমশঃ সমুদ্র-তীর দিয়া, বঙ্গ, পুণ্ড্র, কোশল প্রভৃতি দেশে গমন করিলেন। সেখান হইতে দক্ষিণ-দেশে গমন করতঃ অশ্ব চেদি-দেশে উপনীত হইল। তৎপরে তাঁহারা কাশী, অঙ্গ, কোশল, কিরাত ও তঙ্গন-দেশে উপনীত হইলেন। তাঁহারা দশার্ণ-দেশে উপস্থিত হইলে, তত্রত্য চিত্রাঙ্গদ বাধা-প্রদানের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। চিত্রাঙ্গদ বশীভূত হইলে, অশ্ব নিষাদ-রাজ একলব্যের রাজ্যে উপস্থিত হইল। একলব্য-সুত যজ্ঞাশ্ব বন্ধন করিলে, সেখানে রোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রাম চলিয়াছিল। কিন্তু সেখানেও অর্জ্জুন জয়লাভ করিলেন। ইহার পর, সুরাষ্ট্র, গোকর্ণ-দেশ ও প্রভাস অতিক্রম করিয়া, অশ্ব দ্বারবতী-নগরে উপনীত হইল। বৃষ্ণ্যন্ধক-পতি উগ্রসেন প্রীতি-পূর্ব্বক অর্জ্জুনের অভ্যর্থনা করিলেন। সেখান হইতে সমুদ্রের পশ্চিম-প্রদেশে বিচরণ করিয়া, অশ্ব পঞ্চনদ-প্রদেশে উপনীত হয়। তৎপরে গান্ধার-রাজ্যে শকুনি-পুত্রের সহিত সব্যসাচীর তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল। গান্ধার-রাজ-পুত্র, অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিয়াছিলেন। পরিশেষে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া, অভয় দিয়া, যজ্ঞাশ্ব-সহ ধনঞ্জয় হস্তিনাপুরে প্রত্যাবৃত্ত হন। পাণ্ডবগণের দিগ্বিজয় সম্বন্ধে মহাভারতে যে যে দেশের যে যে নৃপতির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে, জৈমিনি-ভারতে এবং অন্যান্য গ্রন্থে তদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি দেশের ও রাজার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই সকল রাজগণের মধ্যে মাহিষ্মতী-রাজ নীলধ্বজ রাজার কাহিনী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নীলধ্বজের পত্নীর নাম—জনা। পুত্র—প্রবীর। পাণ্ডবগণের যজ্ঞাশ্ব মাহিষ্মতী-পুরীতে উপনীত হইলে, নীল-ধ্বজ পুত্র প্রবীর সেই অশ্ব বন্ধন করেন। অর্জ্জুনের সহিত তাঁহার যুদ্ধ আরম্ভ হয়। নীলধ্বজ রাজা কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিবার তাঁহার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু নীলধ্বজ-পত্নী জনা বিনা যুদ্ধে যজ্ঞীয় অশ্ব প্রত্যর্পণ করা অপমান-জনক মনে করিয়া, পুত্র প্রবীরকে যুদ্ধে উৎসাহিত করিলেন। কুমার প্রবীর, মহাদেবের বরে, অদ্বিতীয় শক্তিশালী হইয়াছিলেন। সুতরাং যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, তিনি অর্জ্জুনকে বিব্রত করিয়া তুলিলেন। পরিশেষে, শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায়, অশেষ কৌশলে, সে যুদ্ধে পাণ্ডব-পক্ষের জয়লাভ হয়; প্রবীর নিহত হন। তখন রাজা নীলধ্বজ, জামাতা (কন্যা স্বাহার পতি) অগ্নিদেবের পরামর্শ-অনুসারে সন্ধি-স্থাপনে অগ্রসর হন। কিন্তু জনা কিছুতেই সন্ধি-স্থাপনে সম্মত হন না; পরন্তু পুত্র-হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে, পুত্র-হন্তার মস্তক ছেদনে, উত্তেজিত হন। নীলধ্বজ যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইলেও, জনা আপনিই রণরঙ্গিণী মূর্ত্তিতে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে গমন করেন। তাঁহার তেজোগর্ব্বে, পাণ্ডব-সৈন্য ভয়-বিহ্বল হয়। পাণ্ডব-পক্ষীয় বহু সৈন্য হতাহত হওয়ার পর, শ্রীকৃষ্ণের কৌশলে পাণ্ডবগণ জয়লাভ করেন। তখন জনা, পুত্র-শোকে মুহ্যমানা হইয়া, জাহ্নবী-সলিলে আত্ম-বিসর্জ্জন দেন। পাণ্ডবগণের

অশ্বমেধ-যজ্ঞের অশ্ব যে যে স্থানে—যে যে রাজ্যে উপনীত বা বাধা-প্রাপ্ত হইয়াছিল, সে সকল রাজ্যের রাজন্যবর্গের কয় জনের পরিচয় বংশ-লতায় দৃষ্ট হয়?

প্রসঙ্গতঃ, কর্ম্মাকর্ম্মের ফলাফলের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, মহাভারতে আরও বহু নৃপতির নামোল্লেখ দেখিতে পাই। খাণ্ডব-দাহন প্রসঙ্গে, বৈশম্পায়ন, জনমেজয়ের নিকট শ্বেতকি রাজার উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন,—"পূর্ব্ব-কালে বল-বিক্রম-সম্পন্ন মহেন্দ্র-সদৃশ শ্বেতকি নামে বিখ্যাত এক ভূপতি ছিলেন। সেই ধীমান্ অবনী-পতি ঋত্বিক-গণের সহিত সুদীর্ঘ-কাল যাগ অনুষ্ঠান করিলে, ঋত্বিকগণ, ধূম-ব্যাকুলিত-লোচন এবং ক্ষিন্ন হইয়া, সেই নরাধিপকে পরিত্যাগ করিলেন। ব্রাহ্মণ অভাবে যজ্ঞ-কার্য্য পণ্ড হয় দেখিয়া, ভূপতি শূলপাণির শরণাপন্ন হন। দ্বাদশ বর্ষ ব্রহ্মচার্য্যাবলম্বনে রুদ্রদেবের প্রীতি-সাধন করিলে, তদংশ-সম্ভূত দুর্ব্বাসা ঋষির দ্বারা শ্বেতকি যজ্ঞ-কার্য্য সম্পন্ন করেন। সেই যজ্ঞে অপরিমিত হব্যপানে হুতাশনের গ্লানি বোধ হয়। খাণ্ডব-বন ভস্মসাৎ করিয়া, তিনি সেই গ্লানি নিবারণ করেন।" যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণ-মাহাত্ম্য শুনিতে চাহিলে, মার্কণ্ডেয় ঋষি অযোধ্যার এক নৃপতি-বংশের নামোল্লেখ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—"অযোধ্যাতে ইক্ষ্বাকু-কুলনন্দন পরীক্ষিৎ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র,—শল, দল ও বল। রাজা পরীক্ষিৎ শল নামক রাজকুমারকে যথা-সময়ে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া, সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করেন।" শলের পুত্রের নাম—সেনজিৎ। পরীক্ষিৎ মৃগয়ায় গমন করিয়া, এক রমণীয় সরোবর-তীরে রূপবতী সুদৃশ্যা কন্যার রূপ-মোহে মুগ্ধ হন। সুন্দরী গান করিতে করিতে পুষ্প-চয়ন করিতেছিল। রাজা তাহার পাণিগ্রহণ করেন। সর্ত্ত হয়—সেই সুন্দরীকে কখনও রাজা সলিল-সন্দর্শন করাইবেন না। কিন্তু সেই রমণীয় উদ্যানে বিহার করিতে করিতে, এক দিন রাজা সহসা তৃষ্ণাতুর হন। তৃষ্ণাতুর হইয়া, সুধাসম স্নিগ্ধ-সলিল-পূর্ণ বাপী-তটে উপস্থিত হইলে, সুন্দরী সেই জলে অদৃশ্যা হইলেন। সরোবরের জল সেচন করিয়া, রাজা সুন্দরীর উদ্ধারের চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হইল। তখন সুন্দরীর পরিবর্ত্তে এক মণ্ডুক মাত্র তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইলে, রাজা মণ্ডুক-বধে উদ্যোগী হইলেন। পরীক্ষিৎ-সমীপে উপনীত হইয়া, মণ্ডুক-রাজ মণ্ডুকগণের প্রাণ ভিক্ষা চাহিল; জানাইল,—সুন্দরী তাহারই কন্যা; নাম—সুশোভনা। এই বলিয়া মণ্ডুক-রাজ, পরীক্ষিতের হস্তে সুশোভনাকে প্রদান করিল। সেই সুশোভনার গর্ভে রাজার পূর্ব্বোক্ত তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। রাজা পরীক্ষিৎ সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিলে, জ্যেষ্ঠ পুত্র শল, এক দিন মৃগয়ায় গমন করেন। কিন্তু কোন-ক্রমেই সে দিন মৃগ গ্রহণ করিতে পারেন না। সারথির নিকট রাজা অবগত হন,—'বামদেবের দুইটী অশ্ব আছে। সেই অশ্বদ্বয়ের নাম—বামী-অশ্ব। সেই অশ্বে রথ সংবাহিত হইলে, মৃগ অনায়াসে করতলগত হইবে।' নৃপতির প্রার্থনা-অনুসারে বামদেব সেই অশ্ব-যুগল রাজাকে প্রদান করেন। মৃগ ধৃত হইলে, রাজা তাঁহাকে অশ্বদ্বয় প্রত্যর্পণ করিতে সম্মত হন। মৃগ ধৃত হইল; রাজা কিন্তু অশ্ব প্রত্যর্পণ করিলেন না। পরন্তু, বামদেব অশ্ব চাহিতে যাইলে, বচসা হইল। রাজা শল, বামদেবকে লক্ষ্য করিয়া শর নিক্ষেপ করিলেন। বামদেব তাহাকে অভিসম্পাত দিলেন,—"সেনজিৎ নামে তোমার দশমবর্ষীয়

প্রসঙ্গোক্ত নৃপতিগণ।

পুত্র আছে ; তুমি এই যে বিষযুক্ত শর আমার প্রতি সন্ধান করিতেছ, এই সায়ক তাহার সংহার-সাধন করিবে।" ব্রাহ্মণের অভিসম্পাত ব্যর্থ হইবার নহে। রাজা শল, বামদেবকে লক্ষ্য করিয়া যে শর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই শর অন্তঃপুরে রাজকুমার সেনজিৎকে বিনাশ করিল। যাহা হউক, এই উপাখ্যানোক্ত পরীক্ষিৎ, শল বা সেনজিৎ—ইক্ষাকু-বংশের বংশ-লতায় কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না ; অথচ, তাঁহারা অযোধ্যার নৃপতি ছিলেন। রাজন্য-বর্গের মহাভাগ্য ও মাহাত্ম্য বর্ণন-প্রসঙ্গে মার্কণ্ডেয় মুনি সেদুক, বৃষদর্ভ ও অষ্টক রাজার উপাখ্যান কীর্ত্তন করেন। এক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ সেদুক, রাজার পরামর্শ-অনুসারে, বৃষদর্ভ রাজার নিকট সহস্র অশ্ব ভিক্ষা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। বৃষদর্ভ ব্রাহ্মণকে কশাঘাত করেন। ব্রাহ্মণ রাজাকে অভিসম্পাত করিতে উদ্যত হন। রাজা ব্রাহ্মণকে বলেন,—'ইহাই কি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ?' ব্রাহ্মণের চৈতন্যোদয় হয়। রাজা তাঁহাকে এক দিনের সমস্ত আয় প্রদান করেন। সহস্র অশ্বের মূল্য অপেক্ষা তাহা অনেক পরিমাণে অধিক। অষ্টক রাজার উপাখ্যানে দৃষ্ট হয়,—তিনি বিশ্বামিত্র ঋষির পুত্র। তিনি যে অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাহাতে "প্রতর্দ্দন, বসুমনা ও উশীনর-সুত শিবি, তাঁহার এই তিন ভ্রাতা" উপস্থিত ছিলেন। বংশ-লতায়, এই চারিজনের বিষয় আলোচনা করিলে, ইঁহাদের কোনও সম্বন্ধ-তত্ত্ব নির্ণয় করা যায় কি ? অভিমন্যুর নিধন-সংবাদে যুধিষ্ঠির শোকসন্তপ্ত হইলে, কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাস তাঁহার নিকট অকম্পন রাজার উপাখ্যান কীর্ত্তন করিয়া বলিয়া-ছিলেন,—"সত্য যুগে অকম্পন নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম হরি। সেই একমাত্র পুত্র রণমধ্যে দুষ্কর কর্ম্ম করিয়া, পরিশেষে শত্রুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও নিহত হইয়া-ছিলেন। সে ঘটনা—অভিমন্যু-বধ সদৃশ।" এতৎপ্রসঙ্গে মৃত্যুর উৎপত্তি ও পরিণাম ফল শ্রবণ করিয়া, রাজা যুধিষ্ঠির সত্যব্রত রাজর্ষিগণের বিবরণ জানিতে চাহেন। মহামুনি ব্যাস তাহাতে শ্বিত্য-রাজার পুত্র সৃঞ্জয় রাজার কাহিনী কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সৃঞ্জয় রাজার পুত্রকে দস্যুগণ অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়া, খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিয়াছিল। তজ্জন্য রাজার শোকের অবধি ছিল না। মৃত্যু-রহস্য বুঝিয়া রাজা সৃঞ্জয় সেই শোক বিস্মৃত হন। সুখ, দুঃখ ও মৃত্যু প্রভৃতির তত্ত্বজ্ঞ নৃপতিগণের মধ্যে মহাপ্রাজ্ঞ নরপতি সেনজিৎ সবিশেষ প্রসিদ্ধ। পাণ্ডবগণের শান্তি উৎপাদনের জন্য এই সেনজিৎ রাজার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছিল। যাহারা প্রিয়দর্শন নহে, তাহারা প্রিয়দর্শনরূপে ; আর যাহারা প্রিয়দর্শন, তাহারা অপ্রিয়দর্শনরূপে প্রতিভাত হয় ;—ইহার কারণ কি ?—এই প্রশ্নের উত্তর-স্বরূপ ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরের নিকট গৃধ্র-গোমায়ু-সংবাদ-সংবলিত একটী প্রাচীন ইতিহাস বর্ণন করেন। সেই উপলক্ষে তিনি বলেন,—'পুরাকালে শ্রীমতী পুরিকা নাম্নী পুরী মধ্যে পরহিংসারত ক্রূর-স্বভাব পুরুষাধম পৌরিক নামে এক নৃপতি ছিল।" 'আশার কারণ ও সামর্থ্য-নির্ণয়' প্রসঙ্গে ভীষ্মদেব বীরদ্যুম্ন নৃপতির পুত্রান্বেষণ-কাহিনী কীর্ত্তন করেন। বীরদ্যুম্ন নৃপতির পুত্র ভূরিদ্যুম্ন অনুদ্দিষ্ট হন। পুত্রের অনুসন্ধানে মহারাজ নরনারায়ণাশ্রমে উপনীত হইয়া, ঋষিগণের নিকট পুত্রের সন্ধান জানিতে চাহেন। ঋষভ ঋষি নৃপতির আশাচ্ছেদের নিমিত্ত নানা উপদেশ দিয়াছিলেন। রাজার জ্ঞান-সঞ্চার হইলে,

তিনি বিদ্যাবলে রাজার অনুদ্দিষ্ট পুত্রকে দর্শন করাইয়াছিলেন। এইরূপে, আর আর যে নৃপতিগণের নাম দেখিতে পাই, তন্মধ্যে সৌবীর দেশের শত্রুঞ্জয় রাজা অর্থ-তত্ত্ব জিজ্ঞাসার জন্য, বিচক্ষু রাজা পশুগণের প্রতি অনুকম্পা-হেতু, ধিগ্‌দত্ত রাজা জিতেন্দ্রিয়তা ও ধর্ম্মপ্রাণতার জন্য, সবিশেষ প্রসিদ্ধ। অথচ, ইহাঁদের অনেকরই বংশ-লতা পূর্ব্বাপর মিলাইয়া পাওয়া যায় না।

ঋগ্বেদোক্ত নৃপতিবর্গ।

ঋগ্বেদে যে সকল নৃপতির নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তাঁহাদের কয়েক জনের পরিচয় পূর্ব্বেই আমরা প্রদান করিয়াছি। * ঋগ্বেদে আসঙ্গ, অন্তক. ঋজিশ্বা, ঋজ্রাশ্ব, শত্রি, দভীতি, পৃথুশ্রবা, তুগ্র প্রভৃতি রাজর্ষিগণের নাম দৃষ্ট হয়; মান্ধাতা, নর্য্য, তুর্ব্বশ (তুর্ব্বসু), যদু, পুরু, নববাস্ত্ব, বৃহদ্রথ, তুর্ব্বীতি, কুৎস, অতিথিগ্ব, আয়ু, নহুষ, পুরুকুৎস, ত্রসদস্যু প্রভৃতি রাজন্য-বর্গের নাম দেখিতে পাই; চিত্র, ত্র্যরুণ, স্বশ্ব, জহ্নু, খেল, পুরুমীঢ়, স্বনয়, মশর্শার, অযবস, জাহুষ, বৃষণশ্চ, কক্ষীবান প্রভৃতি রাজগণের উল্লেখ আছে। সুদাস, দিবোদাস ও সুশ্রবা (সুশ্রবস্) প্রভৃতি রাজন্য-বর্গের কীর্ত্তি-কাহিনী ঋগ্বেদে পুনঃপুনঃই উল্লিখিত হইয়াছে। আমরা ঋগ্বেদের কতকগুলি সূক্তের মর্ম্মানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; তাহাতে ঋগ্বেদোক্ত প্রাচীন নৃপতিগণের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের অষ্টাদশ সূক্তে, কণ্ব ঋষি অগ্নি-দেবতার স্তোত্রে বলিতেছেন,—"দস্যু-দমনকারী অগ্নির সহিত তুর্ব্বশ ও যদু ও উগ্রদেবকে আহ্বান করি; অগ্নি, নববাস্ত্ব ও বৃহদ্রথ ও তুর্ব্বীতিকে এই স্থানে আনয়ন করুন।" এই ঋকোক্ত তুর্ব্বশ, যদু, উগ্রদেব, নববাস্ত্ব, বৃহদ্রথ এবং তুর্ব্বীতিকে সায়ণাচার্য্য 'রাজর্ষি' বলিয়া অভিহিত করেন। পুরাণের বংশ-লতায় যদু ও তুর্ব্বশ (তুর্ব্বসু) — যযাতির পুত্র রূপে পরিচিত আছেন। বৃহদ্রথ নামে বংশ-লতায় একাধিক নৃপতির নাম দৃষ্ট হয়। কিন্তু এই ঋকে কি তাঁহাদিগকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে? ঐ মণ্ডলেরই ত্রি-পঞ্চাশ সূক্তে, অঙ্গিরার পুত্র শব্য ঋষি, ইন্দ্র দেবতার স্তোত্রে বলিতেছেন,—"তুমি অতিথিগ্ব (নামক রাজার) জন্য করঞ্জ ও পর্ণয় (নামক অসুরদ্বয়কে) তেজস্বী বর্ত্তনী দ্বারা বধ করিয়াছ; তৎপর তুমি অনুচর-রহিত হইয়া (অর্থাৎ একাকী) ঋজিশ্বান (নামক রাজার) দ্বারা চারিদিকে বেষ্টিত বঙ্গৃদ (নামক অসুরের) শত নগর ভেদ করিয়াছিলে। ৮॥ সহচর রহিত সুশ্রবা (নামক রাজার) সহিত (যুদ্ধ করিবার জন্য) যে বিংশ নরপতি ও ৬০,০৯৯ অনুচর আসিয়াছিল, হে প্রসিদ্ধ ইন্দ্র! তুমি শত্রুদিগের অলঙ্ঘ্য রথ-চক্র দ্বারা তাহাদিগকে পরাজয় করিয়াছিলে। ৯॥ হে ইন্দ্র! তুমি তোমার রক্ষা সমূহ দ্বারা সুশ্রবা (রাজাকে) রক্ষা করিয়াছিলে, তুর্ব্বযান (রাজাকে) তোমার পরিত্রাণ-সাধন সমূহ দ্বারা রক্ষা করিয়াছিলে; তুমি কুৎস, অতিথিগ্ব এবং আয়ুকে এই মহৎ যুবক রাজার (সুশ্রবার) অধীন করিয়াছিলে। ১০॥" এই সূক্ত-ত্রয়ে আমরা ছয় জন নৃপতির নাম প্রাপ্ত হইলাম; আরও দেখিলাম,—সুশ্রবা রাজার বিরুদ্ধে বিংশতি জন নৃপতি ষষ্টি সহস্র নবনবতি সংখ্যক সহচর লইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এবং

* এই গ্রন্থের চতুর্থ পরিচ্ছেদের ৫৫শ হইতে ৬৭শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

রাজা সুশ্রবা—কুৎস, অতিথিগ্ব ও আয়ুকে বশীভূত করিয়াছিলেন! পুরাণে সুশ্রবা রাজার এই বীরত্ব-কাহিনী শুনিতে পাই না। বায়ুপুরাণে সুশ্রবা নামে এক জন প্রজাপতির উল্লেখ আছে বটে ; কিন্তু তাঁহার সহিত এই ঘটনার কোনই সম্বন্ধ নাই। তবে এ সুশ্রবা কে ? পুরুরবার পুত্রের নাম—আয়ু। এই ঋকোক্ত আয়ু যদি সেই আয়ু হন, তাহা হইলে তাঁহার সম-সময়ে দেবভক্ত সুশ্রবার বিদ্যমানতা স্বীকার করিতে হয় ; তূর্ব্বযান, কুৎস এবং অতিথিগ্ব তাঁহাদিগেরই সম-সাময়িক ছিলেন। সায়ণাচার্য্য—তূর্ব্বযান এবং অতিথিগ্বকে দুই স্থলে দিবোদাস বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু সে অনুমান কতদুর সঙ্গত—বলা যায় না। চন্দ্রবংশের বংশ-লতায় দুই জন দিবোদাসের নাম দৃষ্ট হয়। তূর্ব্বযান এবং অতিথিগ্ব—সেই দুই দিবোদাসের কোনও দিবোদাস হওয়া অসম্ভব ; কারণ, তিনি আয়ুর বহু অধস্তন পর্য্যায়ে অবস্থিত। কিন্তু প্রথম মণ্ডলের এক-পঞ্চাশ সূক্তের ষষ্ঠ ঋকে, দ্বাদশাধিক শততম সূক্তের চতুর্দ্দশ ঋকে এবং ত্রিংশদধিক শততম সূক্তের সপ্তম ঋকে দিবোদাসের বিষয় যেরূপ-ভাবে লিখিত আছে, তাহাতে অতিথিগ্ব—দিবোদাসেরই নামান্তর বলিয়া বুঝা যায়। সেখানে 'অতিথিগ্ব' শব্দের অর্থ—অতিথিবৎসল। তাঁহার পুত্রের নাম—পরুচ্ছেদ। এতদ্দ্বারাও পুরাণোক্ত দিবোদাসের সহিত এই দিবোদাসের স্বাতন্ত্র্য প্রতিপন্ন হয় না কি ? চতুঃপঞ্চাশ সূক্তের ষষ্ঠ ঋকে তুর্ব্বশ ও যদুকে 'নর্য্য' এবং তুর্ব্বীতিকে 'বর্য্য' কুলোদ্ভব বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। 'নর্য্য' ও 'বর্য্য' কুলের অন্য পরিচয় পাওয়া যায় না। সুদাস নৃপতির বিষয় পূর্ব্বেই আমরা উল্লেখ করিয়াছি। প্রথম মণ্ডলের সপ্তচত্বারিংশ সূক্তে সুদাস রাজার নাম প্রথম দেখিতে পাই। সেখানে অশ্বিদ্বয় সুদাসকে অন্ন আনিয়া দিয়াছিলেন—উল্লেখ আছে। তার পর, ত্রিষষ্টিতম সূক্তের সপ্তম ঋকে গোতম-পুত্র নোধা ঋষি ইন্দ্র দেবতার স্তবে বলিতেছেন,—"হে বজ্রিন্! তুমি পুরুকুৎস (নামক ঋষির) সহায় হইয়া যুদ্ধ করতঃ সেই সপ্ত-নগর ধ্বংস করিয়াছ ; এবং তুমি সুদাস (নামক রাজার) নিমিত্ত অংহা নামক অসুরের ধন, যজ্ঞ-কুশের ন্যায় অনায়াসে কর্ত্তন করিয়াছ। পরে হে রাজন্! সেই হব্যদাতা (সুদাসকে) সেই ধন দিয়াছ।" এই সূক্তে কুৎসের নামও উল্লেখ আছে। সূক্তের তৃতীয় ঋকে ঋষি বলিতেছেন,—"সাঙ্ঘাতিক ও তুমুল সংগ্রামে তুমি দীপ্তিমান তরুণ কুৎসের সহায় হইয়া শুষ্ণ নামক অসুরকে বধ করিয়াছিলে।" এই কুৎসের বিষয় সপ্তম মণ্ডলের ঊনবিংশ সূক্তের দ্বিতীয় ঋকে উক্ত আছে,—"হে ইন্দ্র! তুমি যখন অর্জ্জুনীর পুত্র এই কুৎসকে ধন প্রদান করতঃ দাস, শুষ্ণ ও কষবকে বশীভূত করিয়াছিলেন, তখন শরীর দ্বারা শুশ্রূষমান হইয়া যুদ্ধে কুৎসকে রক্ষা করিয়াছিলেন।" প্রথম মণ্ডলের দ্বাদশাধিক শততম সূক্তে কুৎসকে অর্জ্জুনের পুত্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু চতুর্থ মণ্ডলের ষোড়শ সূক্তের দ্বাদশ ঋকের টীকায় সায়ণ কর্ত্তৃক কুৎস 'রুরু-পুত্র' বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। সেই ঋকে দেখিতে পাওয়া যায়, ইন্দ্রের সহিত কুৎস ইন্দ্র-লোকে গমন করিলে, কুৎসের ও ইন্দ্রের সমান রূপ-সৌন্দর্য্য দেখিয়া, ইন্দ্রের স্ত্রী—দুই জনের মধ্যে কে ইন্দ্র, তাহা নির্ণয় করিতে পারেন নাই। সায়ণ বলিয়াছেন, অর্জ্জুন—ইন্দ্রেরই নামান্তর। কিন্তু ঘটনাবলী পর্য্যালোচনা করিলে, কুৎসকে ইন্দ্র-পুত্র বলিয়া মনে হয় কি ?

সুদাস রাজার প্রসঙ্গ ঋগ্বেদের বহুতর সূক্তেই দেখিতে পাই। সপ্তম মণ্ডলের অষ্টাদশ সূক্তে তাঁহার কীর্ত্তি কাহিনী বিশদ-রূপে পরিবর্ণিত আছে। সেই সূক্তের কয়েকটী ঋকের মর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল;—"যজ্ঞ-শীল, দানকারী তুর্ব্বশ নামে রাজা ছিলেন। মৎস্যের ন্যায় নিয়ন্ত্রিত হইলেও ভৃগু ও দ্রুহ্যগণ ধনার্থ (সুদাস) এবং তুর্ব্বশের পরস্পর সাক্ষাৎ করাইয়া দিয়াছিলেন। ব্যাপ্তিশীল এই উভয়ের মধ্যে সখা সখাকে বধ করিয়াছিলেন। ৬॥ (সুদাস) রাজা যশোলাভের জন্য দুইটী জনপদের একবিংশ জন লোককে বিনাশ করিয়াছিলেন। যজ্ঞ-গৃহে যুবা (অধ্বর্য্যু) যেরূপ কুশ-ছেদন করে, সেইরূপ তিনি (শত্রুগণকে) ছেদন করেন।...১১॥ আর বজ্র-বাহু ইন্দ্র, শ্রুত, কবষ, বৃদ্ধ ও দ্রুহ্যকে আনুপূর্ব্ব রূপে জল-মধ্যে নিমগ্ন করিয়াছিলেন। এই সময়ে যাহারা তাঁহাকে কামনা করিয়া তাঁহার স্তুতি করিয়াছিল, (তাহারা) সখ্যের জন্য বরণ করিয়া সখ্য (লাভ) করিয়াছিল। ১২॥ ইন্দ্র নিজ বল দ্বারা উহাদিগের দৃঢ়-পুরী সমস্ত এবং সপ্ত প্রকার (রক্ষার উপায়) তৎক্ষণাৎ বিদীর্ণ করিয়াছিলেন। অনুর পুত্রের গৃহ তৃৎসুকে দান করিয়াছিলেন। ১৩॥ অনুর ও দ্রুহ্যর গবাভিলাষী ষষ্টি শত এবং ষট সহস্র ষড়ধিক ষষ্টি সংখ্যক পুত্রগণ পরিচর্য্যাভিলাষী (সুদাসের) জন্য শায়িত হইয়াছিল। ১৪॥" এই সূক্তে বশিষ্ঠ ঋষি ইন্দ্রের স্তবে আরও বলিতেছেন,—"হে দেবশ্রেষ্ঠ! দেববান রাজার পৌত্র, পিজবনের পুত্র, সুদাসের দুই শত গো এবং দুই খানি রথ আমি ইন্দ্রকে স্তব করিয়া প্রাপ্ত হইয়াছি। হোতা যেমন যজ্ঞ-গৃহে গমন করে, আমি সেইরূপ গমন করিতেছি। ২২॥ দানাঙ্গভূত স্বর্ণালঙ্কার-বিশিষ্ট, দুর্গতিতে ঋজুগামী ও পৃথিবীস্থিত, পিজবন-পুত্র সুদাসের প্রদত্ত চারিটী অশ্ব পুত্রবৎ পালনীয় বসিষ্ঠকে পুত্রের অন্নার্থে বহন করিতেছে। ২৩॥ যে সুদাসের যশ বিস্তীর্ণ দাব্যা পৃথিবীর মধ্যে অবস্থিত, যে দাতাশ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ-ব্যক্তিকে ধনদান করেন, সপ্তলোক তাঁহাকে ইন্দ্রের ন্যায় স্তব করে। নদী সকল যুদ্ধে যুধ্যামধি (নামক শত্রুকে) বিনাশ করিয়াছেন। ২৪॥ হে নেতা মরুদ্গণ! এই সুদাস রাজার পিতা, দিবোদাসের (পিজবনের) ন্যায় তোমরা ইহাকেও সেবা কর। পিজবন-পুত্রের গৃহ রক্ষা করুন। ইহার বল বিনাশরহিত এবং অশিথিল হউক। ২৫॥" এই সকল ঋক আলোচনা করিলে, আমরা বুঝিতে পারি, যিনি পিজবন, তিনিই দিবোদাস—তিনিই অতিথিগ্ব—তিনিই আবার সুদাসের পিতা। পুরাণে সূর্য্য-বংশে এবং চন্দ্র-বংশে দুই তিন জন সুদাসের নাম দৃষ্ট হয়। এক জন—সূর্য্য-বংশের সুদাস—ব্রহ্মপুরাণে ও হরিবংশে আর্ত্তিপর্নির পুত্র এবং শ্রীমদ্ভাগবতে সর্ব্বকামের পুত্র বলিয়া পরিচিত। সে সুদাসের পিতামহের নাম—ঋতুপর্ণ। অপর জন—চন্দ্র-বংশের সুদাস—বিষ্ণুপুরাণে এবং শ্রীমদ্ভাগবতে তিনি দিবোদাসের প্রপৌত্র-পর্য্যায়ভুক্ত। তাঁহার পিতার নাম—চ্যবন। * সুতরাং ঋগ্বেদোক্ত সুদাস এবং পুরাণোক্ত সুদাস অভিন্ন ব্যক্তি কিনা,—নির্ণয় করা দুর্ঘট। বিশেষতঃ, ঋগ্বেদোক্ত অনু ও দ্রুহ্য যদি যযাতি-পুত্র অনু, দ্রুহ্য হন; তাহা হইলেও সেই সুদাসের সহিত পুরাণোক্ত সুদাসের সম-সাময়িকত্ব অসম্ভব। চন্দ্র-বংশের বংশ-লতায় অনু ও দ্রুহ্য প্রধানতঃ দশম পর্য্যায়ে অবস্থিত। কিন্তু সুদাসের পর্য্যায়—

সুদাস ও অনু, দ্রুহ্য, আয়ু প্রভৃতি।

* এই গ্রন্থের ২৯০ম, ২৯১ম ৩১৫ম এবং ৩২১ম পৃষ্ঠায় বংশ-লতা দ্রষ্টব্য।

সূর্য্য-বংশে ত্রিপঞ্চাশ এবং চন্দ্র-বংশে ত্রিচত্বারিংশ। এতদুভয়ের সমসাময়িকত্ব কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? টীকাকারগণ ত্রিষষ্টিতম সূক্তোক্ত পুরুকুৎসকে সূর্য্যবংশজ মান্ধাতার পুত্র বলিয়া অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সে সম্বন্ধে কেহই বিশেষ কোনও প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। প্রথম মণ্ডলের দ্বাদশাধিক শততম সূক্তে জনৈক ক্ষেত্রপতি মান্ধাতার নাম উল্লিখিত হইয়াছে বটে; কিন্তু সেই মান্ধাতাই যে সূর্য্যবংশীয় মান্ধাতা,—তাহা বুঝিবার উপায় নাই। অষ্টম মণ্ডলের উনচত্বারিংশ এবং চত্বারিংশ সূক্তেও মান্ধাতার নাম দৃষ্ট হয়। সেখানে, কণ্ব-গোত্রীয় নাভাক্ ঋষি অগ্নি-দেবতার স্তোত্রে বলিতেছেন,—"তিনি (অগ্নি) তিন-স্থান-বিশিষ্ট মান্ধাতার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দস্যু হনন করিয়াছিলেন।" ইহাতে বুঝা যায়,—যেন অগ্নি-দেবের সাহায্যে মান্ধাতা স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতল ত্রিভুবনের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। পুরাণে মান্ধাতা পৃথিবীপতি বলিয়া পরিচিত আছেন বটে; কিন্তু ঠিক এইরূপ উক্তি সেখানে দেখিতে পাই না। প্রথম মণ্ডলের দ্বাদশাধিক শততম সূক্তে আর এক ঋকে ত্রসদস্যুর নাম দৃষ্ট হয়। টীকাকারগণ তাঁহাকে পুরুকুৎসের পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সূর্য্যবংশের বংশ-লতা আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, মান্ধাতার পুত্র পুরুকুৎস এবং পুরুকুৎসের পুত্র ত্রসদস্যু। ঋগ্বেদের সূক্তে তাঁহাদের সে সম্বন্ধ-পরিচয় দৃষ্ট হয় না বটে; কিন্তু নামের মিল দেখিয়া, টীকাকারগণ তাঁহাদের সম্বন্ধ-তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া লইয়াছেন। ইহার পর, প্রথম মণ্ডলের ষোড়শাধিক-শততম সূক্তে, বিমদ, তুগ্র, ভুজ্যু, খেল, ঋজ্রাশ্ব, জহ্নু, দিবোদাস, জাহুষ, পৃথুশ্রবা প্রভৃতি রাজর্ষিগণের উল্লেখ আছে। দীর্ঘতমার পুত্র কক্ষীবান ঋষি অশ্বিদ্বয়ের স্তবে বলিতেছেন,—"তাঁহারা (অশ্বিদ্বয়) শত্রুসেনা পশ্চাতে ফেলিয়া রথ দ্বারা যুবক বিমদ রাজর্ষির স্ত্রীকে তাঁহার নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন।" এই ঋকোক্ত বিমদ রাজর্ষির পরিচয়ে সায়ণ বলিয়াছেন,—'বিমদ রাজর্ষি স্বয়ংবরে পত্নী লাভ করেন। পথে, স্বয়ংবর-সভায় আগত রাজগণ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া, সেই কন্যা অপহরণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। অশ্বিদ্বয়, রাজর্ষি বিমদের স্ত্রীকে বিপক্ষ রাজগণের আক্রমণ হইতে মুক্ত করেন;—আপনাদের রথে চড়াইয়া বিমদের রাজধানীতে পৌঁছাইয়া দেন।' তুগ্র এবং ভুজ্যু সম্বন্ধে ঋকের মর্ম্ম এই,—"কোনও ম্রিয়মাণ মনুষ্য যেরূপ ধন ত্যাগ করে, সেইরূপ তুগ্র (অতি কষ্টে তাঁহার পুত্র) ভুজ্যুকে সমুদ্রে পাঠাইয়াছিলেন। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা আপনাদিগের নৌকাসমূহ দ্বারা তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিয়াছিলে।" এই ঋকাংশের টীকায় সায়ণাচার্য্য যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম,—"তুগ্র নামে অশ্বিদিগের প্রিয় এক জন রাজর্ষি ছিলেন। তিনি দ্বীপান্তরবর্ত্তী শত্রুদিগের উপদ্রবে ক্লিষ্ট হইয়া, তাহাদিগকে জয় করিবার জন্য আপন পুত্র ভুজ্যুকে সেনার সহিত নৌকায় প্রেরণ করেন। সমুদ্রে অনেক দূর গিয়া সে নৌকা ভাঙ্গিয়া যায়। ভুজ্যু অশ্বিদ্বয়কে স্তুতি করিলেন, তাঁহারা সসৈন্যে ভুজ্যুকে আপনাদিগের পোতে আরোহণ করাইয়া তিন দিন তিন রাত্রিতে তাহাদিগকে তুগ্রের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।" এই সূক্তের পঞ্চদশ ঋকে খেল রাজার সম্বন্ধে লিখিত আছে,—"খেলের (স্ত্রী বিশপলার) একটী পা, পক্ষীর একটী পাখার ন্যায়, যুদ্ধে ছিন্ন হইয়াছিল। হে অশ্বিদ্বয়!

তোমরা রাত্রিযোগে সত্বই বিশপ্‌লার গমনের জন্য এবং, শত্রু) হৃত ধন লাভার্থ লৌহময় জঙ্ঘা পরাইয়া দিয়াছিলে।" এই খেল নৃপতির পরিচয়ে সায়ণ-কৃত টীকার মর্ম্ম,—'খেল নামক এক জন রাজা ছিলেন। তাঁহার পুরোহিত—অগস্ত্য। খেলের স্ত্রী—বিশপ্‌লা; কোনও যুদ্ধে শত্রুদিগের দ্বারা তাঁহার একটী পা ছিন্ন হইয়াছিল। অগস্ত্য অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করাতে অশ্বিদ্বয় রাত্রিতে আসিয়া বিশপ্‌লাকে লৌহের পা করিয়া দিয়াছিলেন।' ঋজ্রাশ্ব রাজার সম্বন্ধে ঋকের মর্ম্ম,—"যে ঋজ্রাশ্ব বৃকীকে শত মেষ খণ্ড করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাকে তাহার পিতা দৃষ্টিহীন করিয়াছিল; হে ভিষজ দস্রনাসত্যদ্বয়! তাহার চক্ষুর্দ্বয় দর্শনে অসমর্থ হইয়াছিল, তোমরা তাহার চক্ষুর্দ্বয় দর্শন-সমর্থ করিয়াছিলে।" সায়ণের টীকার মর্ম্মার্থ,—"বৃষাগিরের পুত্র ঋজ্রাশ্ব নামক একজন রাজর্ষি ছিলেন। অশ্বিদ্বয়ের বাণে গর্দ্দভ তাঁহার নিকট বৃকী (নেকড়ে বাঘিনী) হইয়াছিল। ঋজ্রাশ্ব তাহাকে ১০১ পৌর জনের মেষ খণ্ড খণ্ড করিয়া দিয়াছিলেন। পৌর জনের এইরূপ অপকার করাতে ঋজ্রাশ্বের পিতা তাঁহাকে নেত্রহীন করিলেন। তিনি অশ্বিদ্বয়কে স্তুতি করিলেন, এবং তাঁহারা, নিজের বাহনের জন্য ঋজ্রাশ্বের অন্ধতা হইয়াছে জানিয়া তাঁহাকে পুনরায় চক্ষুদান করিলেন।" পূর্ব্বোল্লিখিত সূক্তোক্ত জহ্নু এবং পৃথুশ্রবার নাম, পুরাণের বংশ-লতায় দৃষ্ট হয়। সায়ণ তাঁহাদিগকে সেই পুরাণোক্ত জহ্নু এবং পৃথুশ্রবা বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। প্রথম মণ্ডলেরই দ্বাবিংশত্যধিক শততম সূক্তের ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ ঋকে, দীর্ঘতমার অপত্য কক্ষীবান ঋষি—ইষ্টাশ্ব, ইষ্টরশ্মি, মশর্শার ও অযবশ রাজার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। স্বনয় এবং কক্ষীবান সম্বন্ধে পঞ্চবিংশত্যধিক শততম সূক্তের প্রথম ঋকের মর্ম্ম,—"(স্বনয় রাজা) প্রাতঃকালে আসিয়া প্রাতঃকালেই রত্ন আনিয়া রাখিলেন। (কক্ষীবান্) চেতনা পাইয়া রত্ন গ্রহণ করিয়া স্থাপন (প্রস্থান ?) করিলেন। সুবীর (দীর্ঘতমা) সেই রত্ন দ্বারা প্রজা ও আয়ু বর্দ্ধন করিয়া ধন-বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন।" এই ঋকের সায়ণাচার্য্য-কৃত টীকার মর্ম্ম,—"কক্ষীবান্ অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া গৃহে গমন কালে পথপার্শ্বে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। স্বনয় রাজা অনুচরবর্গের সহিত তথায় আসিয়া কক্ষীবানের রূপ দেখিয়া তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নিজ গৃহে লইয়া গেলেন এবং আপনার দশ কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়া তাঁহাকে ১০০ নিষ্ক সুবর্ণ, ১০০ অশ্ব, ১০৬০ গাভী ও ১১ রথ প্রদান করিলেন। কক্ষীবান্ গৃহে আসিয়া সেই অর্থ সমুদায় পিতাকে অর্পণ করিলেন।" পরবর্ত্তী সূক্তেও সায়ণোক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থন দৃষ্ট হয়। সে সূক্তের তাৎপর্য্য,—"স্বনয়-কর্ত্তৃক প্রদত্ত শ্যামবর্ণ অশ্বযুক্ত বধূ-সমন্বিত দশখানি রথ আমার নিকট উপস্থিত হইল। এক সহস্র ষষ্টি সংখ্যক গাভী উপস্থিত হইল। কক্ষীবান্ গ্রহণ করিয়া পর দিনই তাহা (আপনার পিতাকে) দান করিলেন।" এই সূক্তের প্রথম ঋকে ভাবয়ব্য রাজার নাম দৃষ্ট হয়। তিনি সিন্ধু-দ্বীপের * অধিপতি ছিলেন। অসুর নামক জনৈক নৃপতিরও দান-মহিমা এই ঋকে পরিকীর্ত্তিত। দানের জন্য সেই (অসুর) "রাজা স্বর্গলোকে শাশ্বতী-কীর্ত্তি বিস্তার করিবেন"—

* উইলসন বলেন,—"Either the river Indus or the sea-shore" অর্থাৎ মূলে যে "সিন্ধাব আধি" আছে, তাহাতে হয় 'সিন্ধুনদ', নয় 'সমুদ্র-তীরবর্ত্তী স্থান' বুঝাইতেছে।

ঋকের ইহাই মর্ম্মার্থ। একপঞ্চাশদধিক শততম সূক্তের দ্বিতীয় ঋকে পুরুমিল শব্দ দৃষ্ট হয়। টীকাকারগণের কেহ তাহার অর্থ করিয়াছেন—'অভীষ্টপ্রদায়ী'; কেহ করিয়াছেন—পুরুমিল রাজা। সায়ণাচার্য্য শেষোক্ত অর্থেরই পোষকতা করেন। জানি না—এই পুরুমিলের সহিত পুরাণোক্ত চন্দ্রবংশোদ্ভব পুরুমীঢ়ের কোনও সাদৃশ্য আছে কি না। ত্রিপঞ্চাশদধিক শততম সূক্তে রাতহব্য রাজার নাম আছে। চতুঃসপ্তত্যধিক শততম সূক্তের দ্বিতীয় ঋকে 'ইন্দ্র দেবতা শারদীপুরী ভেদ করিয়াছিলেন'—উক্ত হইয়াছে। মূলোক্ত 'শারদীপুরঃ' শব্দে টীকাকারগণ শরৎ নামক রাজার পুর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঐ সূক্তের সপ্তম ঋকে অগস্ত্য ঋষি ইন্দ্র-দেবতার স্তবে বলিতেছেন,—"হে ইন্দ্র! তুমি দুর্য্যোণি রাজার জন্য কুযবাচকে হনন করিয়াছ।" তৃতীয় মণ্ডলের ত্রিপঞ্চাশ সূক্তে প্রমগন্ধ রাজার নাম দেখিতে পাই। সূক্তের চতুর্দ্দশ ঋকের মর্ম্ম,—"কীকট-সমূহের মধ্যে গাভী সকল তোমার কি করিবে? উহারা সোমের সহিত মিশ্রিত হইবার যোগ্য দুগ্ধ দান করে না, দুগ্ধ প্রদান দ্বারা পাত্রকেও দীপ্ত করে না। (উহাদিগকে) আমাদিগের নিকট আনয়ন কর। প্রমগন্ধের ধন আনয়ন কর। হে মঘবন্! নীচ-বংশীয়দিগের ধন আমাদিগকে প্রদান কর।" টীকাকারগণ বলেন,—এই ঋকোক্ত কীকট-দেশ—বিহার-প্রদেশ। প্রমগন্ধ—বিহারের নৃপতির নাম। "সায়ণ বলেন,—যে সুদ লইয়া টাকা দেয়, তাহার নাম—'মগন্ধ'; তাহার অপত্য প্রমগন্ধ।" তাঁহার মতে,—'কীকটেষু অনার্য্য-নিবাসেষু জনপদেষু।' * তৃতীয় মণ্ডলের ষষ্টিতম সূক্তে সুধন্বা নাম দৃষ্ট হয়। সুধন্বার পুত্রগণ 'কর্ম্মদ্বারা শত্রুপরাভবোপযুক্ত তেজ-বিশিষ্ট হইয়া যজ্ঞীয় ভাগ প্রাপ্ত' হইয়াছিল। চতুর্থ মণ্ডলের ত্রিংশ সূক্তে, দাস শম্বর, দাস বর্চ্চি প্রভৃতির নাম দৃষ্টে, তাঁহাদিগকে নীচ-বংশীয় রাজা বলিয়া অনেকে মনে করেন। আর্য্য, অর্ণ ও চিত্ররথকে, ইন্দ্র সরযূ-নদীর তীরে বধ করিয়াছিলেন, এবং দভীতি রাজার জন্য ত্রিংশ সহস্র দাসকে হনন করিয়াছিলেন,—ঐ সূক্তে এইরূপ উল্লেখ আছে। টীকাকার বলেন,—"আর্য্যগণ ক্রমে সরযূ-তীর অতিক্রম করিয়া রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। অনার্য্যগণের সহিত যুদ্ধ ভিন্ন আর্য্য রাজগণের পরস্পরের মধ্যেও যুদ্ধ-বিবাদ হইত; এবং সরযূর পূর্ব্বপারস্থ দুই জন আর্য্য রাজা এইরূপ যুদ্ধে হত হয়েন, তাহা এই ঋকে (ত্রিংশ সূক্তের অষ্টাদশ ঋকে) প্রকাশ হইতেছে।" চতুর্থ মণ্ডলের দ্বিচত্বারিংশ সূক্তের অষ্টম ও নবম ঋকের মর্ম্মার্থ,—"দুর্গহের পুত্র বন্দী হইলে পর, সপ্ত ঋষিগণ এই (দেশে) পিতা হইয়াছিলেন। তাঁহারা এই পুরুকুৎসের স্ত্রীর জন্য ত্রসদস্যুকে যজ্ঞ করিয়া লাভ করিয়াছিলেন। ত্রসদস্যু ইন্দ্রের ন্যায় শত্রু-বিনাশক এবং অর্দ্ধদেব। ৮॥ হে ইন্দ্র ও বরুণ! পুরুকুৎস-পত্নী তোমাদিগকে হব্য ও স্তুতি দ্বারা প্রীত করিয়াছিলেন। অনন্তর তোমরা তাঁহাকে শত্রুনাশক অর্দ্ধদেব রাজা ত্রসদস্যুকে দান করিয়াছিলেন। ৯॥" এই দুই ঋকের টীকায় সায়ণাচার্য্য যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম,—"দুর্গহ রাজার পুত্র

* "Kikat is usually indentified with South Bihar"—*Wilson*. "In the Rik Samhita, where the Kikats—the ancient name of the people of Magadha—and their king Pramaganda are mentioned as hostile, we have probably to think of the aborigines of the country."—*Weber's Indian Literature*.

পুরুকুৎস কারারুদ্ধ হইলে পর তাঁহার মহিষী রাজ্য অরাজক দেখিয়া পুত্র-লাভের ইচ্ছায় স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক সমাগত সপ্তর্ষিগণকে পূজা করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রীত হইয়া রাজ্ঞীকে এই কথা বলিলেন যে, ইন্দ্র ও বরুণের বিশেষরূপে যজ্ঞ কর। অনন্তর রাজ্ঞী, ইন্দ্র ও বরুণের যজ্ঞ করিয়া ত্রসদস্যুকে প্রাপ্ত হইলেন।" আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, পুরুকুৎস—মান্ধাতার পুত্র; কিন্তু এখানে দেখি, পুরুকুৎস—দুর্গহের পুত্র। দুর্গহ এবং মান্ধাতা কি তবে একই ব্যক্তি? অথবা, বেদোক্ত ও পুরাণোক্ত পুরুকুৎসের স্বাতন্ত্র্য আছে?

রাজর্ষি ত্র্যরুণ সম্বন্ধে পঞ্চম মণ্ডলের সপ্তবিংশ সূক্তে অত্রি ঋষি অগ্নি-দেবতার স্তবে বলিতেছেন,—"হে মানবগণের অধিনায়ক বৈশ্বানর! সাধুগণের রক্ষক, জ্ঞানবান, অসুর

ঋগ্বেদোক্ত রাজর্ষিগণ।

এবং ধনবান, ত্রিবৃষ্ণের পুত্র ত্র্যরুণ নামক রাজর্ষি আমাকে শকট-সংযুক্ত গো-দ্বয় এবং দশ সহস্র (সুবর্ণ) প্রদান করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।" * এই মণ্ডলের দ্বিতীয় সূক্তে প্রথম ঋকের টীকায় ত্র্যরুণ রাজর্ষির একটু পরিচয় পাওয়া যায়। টীকাকার লিখিয়াছেন,—"শাঠ্যায়ন ব্রাহ্মণে এই ঋকের এইরূপ ইতিহাস আছে; যথা, ইক্ষ্বাকু-বংশীয় ত্র্যরুণ রাজা পুরোহিত বৃশের সহিত এক রথে গমন করিতেছিলেন। রথচক্র সংঘর্ষে একটী ব্রাহ্মণ-কুমারের প্রাণনাশ হওয়ায় সন্দেহ হইল, রথ-চালক পুরোহিত বা রথস্বামী রাজা ইহাদের মধ্যে কে ব্রহ্ম-হত্যার জন্য অপরাধী হইবে। ইক্ষ্বাকু-বৃদ্ধগণ স্থির করিয়াছিলেন যে, পুরোহিতই অপরাধী। পুরোহিত তখন বার্শসাম মন্ত্র দ্বারা বালকটীকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। কিন্তু তিনি ইক্ষ্বাকু-বংশীয়গণকে পক্ষপাতী বলিয়া শাপ দিলেন, যে তোমাদের ঘরে অগ্নি আর থাকিবেন না। অগ্নির অভাবে ইক্ষ্বাকুগণ একান্ত কষ্টে পড়িয়া পুনরায় পুরোহিতকে প্রসন্ন করতঃ আপনাদের শাপ বিমোচন করাইবার চেষ্টা করিলেন। পরে ঋষি দেখিলেন—ব্রহ্মহত্যা পাপ ত্রসদস্যু রাজার ভার্য্যা হইয়া পিশাচ-রূপে অগ্নির হর অপহরণ করিয়া বস্ত্র মধ্যে লুকাইয়া রাখিল। ঋষি হরকে নানা প্রকারে প্রীত করতঃ অগ্নির মধ্যে স্থাপন করিলেন।" † বেদোক্ত এই ত্র্যরুণ নৃপতির নাম পুরাণোক্ত ইক্ষ্বাকু-বংশের বংশ-লতায় কোথাও দৃষ্ট হয় না। ইক্ষ্বাকু-বংশে ত্রয্যারুণ (ত্রয্যারুণি) নামে এক জন নৃপতি আছেন বটে; কিন্তু তিনি, বিষ্ণুপুরাণের মতে, ত্রসদস্যুর অধস্তন অষ্টম পুরুষে অবস্থিত। ব্রহ্মপুরাণের মতে, ত্রয্যারুণি—ত্রসদস্যুর পৌত্র-স্থানীয়। সুতরাং, ত্রয্যারুণ ও ত্র্যরুণ এক ব্যক্তি হওয়া সম্ভবপর কি? তার পর, ত্রয্যারুণের পিতার নাম—পুরাণে ত্রিধন্বা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কিন্তু ঋগ্বেদে তাঁহার পিতার নাম—ত্রিবৃষ্ণ। যদি তাঁহারা একই ব্যক্তি হইবেন, তাহা হইলে এ বৈসাদৃশ্যের কারণ কি? টীকাকারগণ বলেন,—এখানেও রূপক। "প্রথম অর্থে কুমার শব্দে রথচক্রে নিহত ব্রাহ্মণ-কুমার। দ্বিতীয় অর্থে কুমার শব্দে অগ্নি। মাতা অরণি লুক্কায়িত ভাবে অগ্নিকে ধারণ করেন, যজমান-রূপ পিতাকে প্রদান করেন না। লোকে অরণিস্থ

* ত্র্যরুণ নৃপতির দশ সহস্র সুবর্ণ দান উপলক্ষে উইলসন সাহেব স্বর্ণ-মুদ্রা দান অর্থ উপলব্ধি করেন,—"It is not impossilde, however, that pieces of money are intended; for, if we may trust Aryan, the Hindus had coined money before Alexander."—*Wilson*.

† রমেশচন্দ্র দত্তের অনুবাদিত ঋগ্বেদের টীকা দ্রষ্টব্য।

অগ্নি দেখিতে পায় না, কিন্তু অরণির ক্রোড়স্থ অগ্নিকে দেখিতে পায়।...কাষ্ঠই অগ্নির মাতা, সেই কাষ্ঠ নির্জ্জীব অগ্নিকে লুকাইয়া রাখে, যজমান কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিলে সে অগ্নি জীবিত হইয়া দৃষ্ট হয়।" উপাখ্যানের অন্তর্নিহিত রূপক যাহাই হউক, ইক্ষ্বাকু-কুলে ত্র্যরুণ নামক রাজার পরিচয় ঋগ্বেদে যে পাওয়া যাইতেছে, তাহা বলাই বাহুল্য। রাজর্ষি ঋজিশ্বার নাম ঋগ্বেদে একাধিক স্থানে দৃষ্ট হয়। ষষ্ঠ মণ্ডলের বিংশ সূক্তে, ভরদ্বাজ ঋষি ইন্দ্র-দেবতার স্তবে বলিতেছেন,—"হে বদান্য ইন্দ্র! তুমি হব্যরূপ ধন প্রদাতা (রাজর্ষি) ঋজিশ্বাকে অক্ষয় ধন প্রদান করিয়াছ।" রাজর্ষি ঋজিশ্বা এদিকে আবার ভরদ্বাজের অপত্য বলিয়া পরিচিত; দ্বিপঞ্চাশ সূক্তের প্রবর্ত্তক-রূপেও তাঁহার নাম উক্ত হইয়াছে। রাজর্ষি ঋজিশ্বা যজ্ঞ-কার্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ। অতিযাজ ঋষি যজ্ঞ-কর্ম্ম-দ্বারা ঋজিশ্বার সমকক্ষতা লাভ করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। ঋজিশ্বা তজ্জন্য তাঁহাকে অভিসম্পাত দেন। ষষ্ঠ মণ্ডলের দ্বিপঞ্চাশ সূক্তে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ঋজিশ্বা, উশিজের পুত্র,—দশম মণ্ডলের নবনবতিতম সূক্তে এইরূপ উল্লেখ আছে। পঞ্চম মণ্ডলের উনত্রিংশ সূক্তে আবার দেখিতে পাই, বিদথিনের পুত্র—ঋজিশ্বা; অন্ততঃ টীকাকারগণ সেখানে সেই অর্থ ই পরিগ্রহ করিয়াছেন। রাজর্ষি দভীতি, 'সোমাভিষব, হব্যপাক ও ইন্ধন সঞ্চয় করিয়া' ইন্দ্রের পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। ষষ্ঠ মণ্ডলের বিংশ এবং ষড়বিংশ সূক্তে ইন্দ্রদেবের আরাধনায় ভরদ্বাজ ঋষি দভীতির গুণ-কীর্ত্তন করিতেছেন। এই 'দভীতির জন্য দস্যু, চুমুরি ও ধুনিকে ইন্দ্র বজ্র দ্বারা বধ' করেন। সপ্তম মণ্ডলের উনবিংশ সূক্তে তাহার পরিচয় পাই। অসঙ্গ (আসঙ্গ) রাজর্ষির বিবরণ বড়ই কৌতুকাবহ। অষ্টম মণ্ডলের প্রথম সূক্তের ত্রিংশ হইতে ত্রয়স্ত্রিংশ ঋকের প্রবর্ত্তক বলিয়া তাঁহার পরিচয় পাই। সেই ঋক-চতুষ্টয়ের মধ্যে দৃষ্ট হয়,—তিনি যদু-বংশোৎপন্ন, তিনি প্লয়োগ রাজার পুত্র। ঋক্-সমূহের টীকায় টীকাকার লিখিয়া গিয়াছেন,—'অসঙ্গ শাপ-গ্রস্ত হইয়া স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মেধ্যাতিথির অনুগ্রহে তিনি পুরুষত্ব লাভ করেন। শশ্বতী নাম্নী অঙ্গিরা ঋষির কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। তিনি মেধ্যাতিথিকে বহু ধন প্রদান করিয়া প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন।' শান্তনু রাজার জন্য দেবাপি ঋষি নানা দেবতার নিকট বারি-বর্ষণের কামনা করিতেছেন (দশম মণ্ডল, ৯৮ম সূক্ত)। তাহা দেখিয়া, পুরাণোক্ত শান্তনুর কথাই মনে আসে। ষষ্ঠ মণ্ডলের সপ্তবিংশতি সূক্তে সম্রাট্ অভ্যবর্ত্তীর বিবরণে এক নূতন তথ্যের আভাস পাওয়া যায়। সেই সূক্তের কয়েকটী ঋকের মর্ম্ম এই,—"ইন্দ্র চয়মানের পুত্র অভ্যবর্ত্তীর প্রতি অনুকূল হইয়া বরশিখের পুত্রগণকে সংহার করিয়াছেন। তিনি হরিয়ূপীয়ার পূর্ব্ব-ভাগে অবস্থিত (বরশিখের পুত্র) বৃচীবানের বংশধরদিগকে বধ করেন। তখন পশ্চিম ভাগে অবস্থিত (বরশিখের) শ্রেষ্ঠ পুত্র ভয়ে বিদীর্ণ হইয়াছিল। ৫। হে পুরুহুত! তোমার প্রতি হিংসা করণ দ্বারা যশোলিপ্সু হইয়া যজ্ঞ-পাত্র ভঞ্জনকারী যব্যাবতীর নিকট সমবেত ত্রিংশৎ শত বর্ম্মধারী বৃচীবৎ পুত্র এক কালে নিধন-প্রাপ্ত হইয়াছিল। ৬॥ ... বৃচীবৎগণকে দেবরাত-বংশীয় (অভ্যবর্ত্তীর) বশতাপন্ন করিয়াছিলেন। ৭॥ হে অগ্নি! চয়মানের পুত্র, ঐশ্বর্য্যশালী সম্রাট্ অভ্যবর্ত্তী আমাকে রথ ও রমণী-সহকারে বিংশতি গোমিথুন প্রদান করিয়াছেন। পৃথুর বংশধরের এই দান অক্ষয় অর্থাৎ

কেহই ইহার বিলোপ করিতে সমর্থ নহেন। ৮॥" উপরি-উদ্ধৃত সূক্তে আমরা দেখিতে পাই,—পৃথুর বংশে দেবরাতের অধস্তন পর্য্যায়ে চয়মান-পুত্র ঐশ্বর্য্য-শালী সম্রাট্ অভ্যবর্ত্তী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তিনি হরিয়ুপীয়ার যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন। কাহারও কাহারও মতে—হরিয়ুপীয়া বর্ত্তমান ইউরোপের (য়ুরোপের) আদিভূত। তবে এই ঋকে যে পৃথুর নাম দৃষ্ট হয়, তিনি কোন্ পৃথু? স্বায়ম্ভুব মনুর বংশে বেণ-পুত্র এক পৃথু আছেন; সূর্য্যবংশে অনরণ্যের (অনেনার) পুত্র পৃথু বলিয়া পরিচিত; চন্দ্রবংশেও পৃথু নামে একাধিক নৃপতির পরিচয় পাই। কিন্তু ঋগ্বেদোক্ত এই পৃথু—কোন্ পৃথু? ঋগ্বেদে (১০ম মণ্ডলের ১৪৮ সূক্তে) বেণ-পুত্র পৃথুর উল্লেখ আছে বটে; কিন্তু তাঁহার সহিত এই পৃথুর সম্বন্ধ-তত্ত্ব নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। যাহা হউক, সম্রাট্ অভ্যবর্ত্তী যে ইউরোপের পূর্ব্বাংশ ও পশ্চিমাংশ জয় করিয়াছিলেন, ইহাতে তাহা বুঝিতে পারা যায়। পঞ্চম মণ্ডলের ত্রিংশ সূক্তে আমরা দেখিতে পাই,—ঋণঞ্চয় রাজা রুশম-রাজ্যে রাজত্ব করিতেন। সায়ণ বলেন,—"রুশম ইতি কশ্চিজ্জনপদবিশেষঃ অত্র রুশম-শব্দেন তত্রত্যা জনা উচ্যন্তে। রুশমা ঋণঞ্চয়নাম্নঃ রাজ্ঞঃ কিঙ্করাঃ।" অর্থাৎ, রুশম নামক কোনও জনপদের অধিবাসিগণ ঋণঞ্চয় রাজার বশীভূত ছিল। রাজা ঋণঞ্চয় ইন্দ্রাদি দেবগণের উপাসক ছিলেন—সূক্তে তাহা বুঝিতে পারা যায়। এখন, প্রশ্ন উঠিতে পারে—রুশম-রাজ্য কোথায়? রুশম-রাজ্যকে কেহ কেহ বর্ত্তমান রুশ-রাজ্যের আদিভূত বলিয়া মনে করেন। পুরূরবা ও উর্ব্বশীর উক্তি-প্রত্যুক্তি উপলক্ষে ঋগ্বেদে (১০ম মণ্ডলের ৯৫শ সূক্তে) যে আখ্যান দৃষ্ট হয়, টীকাকারগণ তদুক্ত পুরূরবা ও উর্ব্বশীর নানারূপ অর্থ করিয়া থাকেন। সেখানেও রূপকের অবতারণা দেখিতে পাই। টীকাকর বলেন,—বৈদিক উপাখ্যান—'পুরূরবা অপ্সরা উর্ব্বশীর সহিত কিছুকাল সহবাস করিয়াছেন। উর্ব্বশী এক্ষণে পুরূরবাকে ছাড়িয়া যাইতেছেন।' ইহার তাৎপর্য্য,—উর্ব্বশীর আদি অর্থ—'উষা', পুরূরবার আদি অর্থ—'সূর্য্য'। সূর্য্য উদয় হইলে উষা আর থাকে না। 'উর্ব্বশী' শব্দে সায়ণাচার্য্য 'মনুষ্যের বাক্য' অর্থ উপলব্ধি করেন। ম্যাক্সমূলার একস্থলে উর্ব্বশী শব্দকে ইউরোপের আদিরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। * এদিকে আবার তিনি উর্ব্বশীকে উষা এবং পুরূরবাকে সূর্য্য বলিয়াও পরিচয় দিয়াছেন। † পুরূরবা—ইলার পুত্র বলিয়া পুরাণে উক্ত হইয়াছেন। ঋগ্বেদে দশম মণ্ডলের পঞ্চনবতিতম সূক্তের অষ্টাদশ ঋকেও 'ইলা-পুত্র' বলিয়া পুরূরবার পরিচয় পাই। সে ঋকের মর্ম্মার্থ,—"হে ইলা-পুত্র পুরূরবা! এই সকল দেবতা তোমাকে বলিতেছেন যে, তুমি মৃত্যু-জয়ী হইবে, স্বকীয় হোম-দ্রব্য দ্বারা দেবতাদিগের পূজা করিবে, তুমি স্বর্গে যাইয়া আমোদ-আহ্লাদ করিবে।" এই ইলা আবার অন্যত্র অন্য অর্থেও প্রযুক্ত। প্রথম মণ্ডলের ত্রয়োদশ সূক্তের নবম ঋকে 'ইলা (ইড়া)

* "The name which approaches nearest *Urvashi* in Greek might seem to be Europe."—Max Muller, *Selected Essays*.

† "That *Pururavas* is an appropriate name of a solar hero requires hardly any proof... this name (Urvasi) is derived from Uru...thus compare Uru-asi with another frequent epithet of the dawn Uruki."—Ibid.

সরস্বতী ও মহী' অগ্নির দীপ্যমান মূর্ত্তিত্রয়রূপে পরিচিত। ঋগ্বেদে ইলা—দেবী বলিয়াও অভিহিত। তৃতীয় মণ্ডলের প্রথম সূক্তে ইলা—'পৃথিবী' অর্থে ব্যবহৃত। যাহা হউক, রূপকে যে অর্থ ই প্রতীত হউক, পুরুরবার জননী-রূপেও ঋগ্বেদে যে ইলার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা বলাই বাহুল্য। বিবস্বান্-পুত্র মনুর ও নহুষ-পুত্র যযাতির উল্লেখ—ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে (৬৩শ সূক্তের প্রথম ঋকে) এবং মনু-পুত্র শর্য্যাতির বিবরণ প্রথম মণ্ডলে (৫১শ সূক্তের ১২শ ঋকে ও ১১২শ সূক্তের ১৭শ ঋকে) দৃষ্ট হয়। শর্য্যাতি সম্বন্ধে ঋকের মর্ম্ম,—"হে ইন্দ্র! আপনি শার্যাত রাজর্ষির সংস্কৃত সোম পান করিয়া হর্ষযুক্ত হউন।" সরস্বতীর টীকায় দেখিতে পাই,—"সায়ণাচার্য্যের মতানুসারে শার্য্যাত এক জন ভৃগু-বংশীয় রাজর্ষি। ঋগ্বেদে (৩য় ৫১ সূ ৭ ঋকে) দৃষ্ট হয় যে, ইন্দ্র শার্যাতের গৃহে সোম-পান করিতেছেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মতে শার্যাত মনু-বংশীয় রাজা-বিশেষ। শর্যাতি—বৈবস্বত মনুর চতুর্থ পুত্র। চ্যবন ঋষি তাঁহার কন্যার পাণি-গ্রহণ করেন এবং তদুপলক্ষে একটী যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়। সেই যজ্ঞে ইন্দ্র এবং অশ্বিনীকুমারেরা উপস্থিত ছিলেন। অশ্বিদেবদিগের উদ্দেশে অভিপ্রেত হবির্ভাগ চ্যবন ঋষি নিজে রাখিয়াছিলেন; ইহাতে ইন্দ্র অত্যন্ত কুপিত হইলে, চ্যবন ঋষি পুনর্ব্বার নূতন হবি প্রস্তুত করিয়া ইন্দ্রকে প্রীত করেন। কৌশিতকী ব্রাহ্মণ হইতে এই আখ্যান উদ্ধৃত হইয়াছে। পদ্ম ও ভাগবত পুরাণে ইহার সবিশেষ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়।" পরবর্ত্তী ঋকে দৃষ্ট হয়,—'ইন্দ্র কক্ষীবান্ মহারাজকে নব-যৌবনা বৃচয়া-নাম্নী স্ত্রী প্রদান করিয়াছিলেন। ইন্দ্র আপনিই বৃষণশ্চ রাজার মেনা-নাম্নী ভার্য্যা হইয়াছিলেন।' সরস্বতী এস্থলে টীকায় বলিয়াছেন,—"পৌরাণিক মেনা, পিতৃগণের মানসী কন্যা এবং হিমবতের পত্নী। শাট্যায়ন এবং তাণ্ড্য ব্রাহ্মণে মেনার ইতিহাস আছে।" নহুষের নাম, প্রথম মণ্ডলের একত্রিংশ সূক্তেও দেখিতে পাই। ঐ সূক্তের একাদশ ঋকের মর্ম্ম,—"হে অগ্নিদেব! মদীয় পূর্ব্ব-পুরুষ অঙ্গিরো নামক ঋষির পিতার পুত্র-রূপে যখন আপনি জন্মিয়াছিলেন, তখন দেবগণ মনুষ্য-রূপী আপনাকে (নহুষকে) মনুষ্যের হিতার্থ মনুষ্যের রাজা করিয়াছিলেন এবং ইলা-নাম্নী দেবীকে মনুষ্যদিগের উপ-দেশ-দাত্রী করিয়াছিলেন।" সরস্বতীর টীকায় দৃষ্ট হয়,—"প্রথমে মনুষ্য-রূপে জাত অগ্নি নহুষ-রাজার সেনাপতি-রূপে দেবগণ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তৈত্তিরীয়েরা বলেন,—ইলা মানবী এবং যজ্ঞের উপদেশ-দাত্রী।" এই একত্রিংশ সূক্তের প্রবর্ত্তক—অঙ্গির ঋষির পুত্র হিরণ্যস্তূপ ঋষি। এই ঋকে তাঁহাকে (নহুষকে) অগ্নি-বংশজ বলিয়া উপলব্ধি হয়। অথচ, পুরাণে তিনি চন্দ্র-বংশজ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

ঋগ্বেদে আরও বহুতর নৃপতির নাম দৃষ্ট হয়। পঞ্চম মণ্ডলের একষষ্টিতম সূক্তে রথবীতি, শ্যাবাশ্ব, পুরুমীঢ়, বিদদশ্ব প্রভৃতির নাম দেখিতে পাই। "সায়ণাচার্য্য বলেন, একটী আশ্চর্য্য প্রাচীন ইতিবৃত্ত অবলম্বন করিয়া এই স্তোত্রের (পঞ্চম মণ্ডলের একষষ্টিতম সূক্তের) সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি বলেন,—আগম পারদর্শীরা এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন যে, দর্ভের পুত্র রাজা রথবীতি অত্রি-বংশীয় অর্চ্চনানাকে হোতৃ-কার্য্যে বরণ করিয়াছিলেন। অর্চ্চনানা সিন্ধু-সমীপে রাজপুত্রীকে দর্শন

ঋগ্বেদোক্ত অন্যান্য রাজগণ।

করিয়া স্ব-পুত্র শ্যাবাশ্বের সহিত তাঁহার বিবাহ দিবার নিমিত্ত রাজার নিকট প্রার্থনা করিলেন। রাজা তাহাতে সম্মত হইয়া নিজ মহিষীকে জিজ্ঞাসা করায় রাজ-মহিষী এই আপত্তি করিলেন যে, তাঁহাদিগের বংশের সকল কন্যারই ঋষিদিগের সহিত বিবাহ হইয়াছে। অথচ শ্যাবাশ্ব ঋষি নহেন, সুতরাং তাঁহার সহিত কিরূপে বিবাহ হইবে। এই আপত্তি উপস্থিত হওয়ায় রাজা শ্যাবাশ্বের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিতে অসম্মত হইলে, শ্যাবাশ্ব, রাজকুমারী-প্রাপ্তির আশায় কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিয়া ভিক্ষার্থ পর্য্যটন করিতে করিতে রাজা তরন্তের মহিষী শশীয়সীর নিকট উপস্থিত হইলেন। শশীয়সী শ্যাব্যাশ্বকে সঙ্গে লইয়া পতি সমীপে উপস্থিত হইলে, রাজা তাহাকে সমুচিত অতিথি-সৎকার করিতে বলিলেন। অনন্তর শশীয়সী তাঁহাকে গোযুথ ও আভরণ প্রদান করিলে, তরন্ত তাঁহাকে অভিলষিত ধন প্রদান করিয়া নিজ অনুজ পুরুমীঢ়ের নিকট প্রেরণ করিলেন। শ্যাবাশ্ব গমন-কালে পথি-মধ্যে মরুৎগণের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় সভয়-চিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগকে স্তব করিতে লাগিলেন। মরুৎগণ তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ঋষি বলিয়া স্বীকার করিলেন ও তাঁহাদিগেরই প্রসাদে তিনি সূক্তদ্রষ্টা হইলেন। অনন্তর রথবীতি ও তাঁহার মহিষী শ্যাবাশ্বের সহিত রাজ-কুমারীর বিবাহ দিলেন। পুরুমীঢ়, তরন্ত, শশীয়সী, রথবীতি ও মরুৎগণ তুষ্ট হইয়া শ্যাবাশ্বকে যাহা প্রদান করিয়াছিলেন, এই সূক্তে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।" এই সূক্তোক্ত রথবীতি গোমতী-তীরে বাস করিতেন এবং পর্ব্বতের প্রান্ত-ভাগে তাঁহার গৃহ অবস্থিত ছিল। পঞ্চম মণ্ডলের চতুস্ত্রিংশ সূক্তে অগ্নিবেশ এবং তৎপুত্র শত্রি (রাজর্ষির) নাম দৃষ্ট হয়। ঐ মণ্ডলের ষট্‌ত্রিংশ সূক্তে শ্রুতরথ রাজার এবং একচত্বারিংশ সূক্তে উর্জ্জব্য রাজার নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ষষ্ঠ মণ্ডলের বিংশ সূক্তে (অষ্টম ঋকে) দেখিতে পাই,—"অভিলষিত সুখদাতা ইন্দ্র—বেতসু, দশোণি, তুতুজি, তুগ্র এবং ইভকে মাতার নিকট পুত্রের ন্যায় (রাজা) দোতনের নিকট সর্ব্বদা প্রশান্ত-ভাবে গমন করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন।" ইহাতে বুঝা যায়,—বেতসু প্রভৃতি রাজন্যবর্গ দোতনের নিকট বশ্যতা স্বীকার করেন। ঐ মণ্ডলের ষড়্‌বিংশ সূক্তে, বৃষভ, তুজি এবং ক্ষত্রশ্রীর রাজার নাম দৃষ্ট হয়। ক্ষত্রশ্রীঃ—প্রতর্দ্দনের পুত্র বলিয়া পরিচিত। কেহ কেহ চন্দ্রবংশের দিবোদাস-পুত্র প্রতর্দ্দনের সহিত এই প্রতর্দ্দনের সাদৃশ্য অনুভব করেন। এই ষষ্ঠ মণ্ডলের ত্রিষষ্টিতম সূক্তে শাণ্ড রাজার ও সুমীঢ়ের (৯ম ঋকে) নাম দৃষ্ট হয়। সপ্তম মণ্ডলের ত্রয়স্ত্রিংশ সূক্তে বয়তের পুত্র পাশদ্যুম্ন রাজার যজ্ঞের আভাস পাওয়া যায়। ঐ সূক্তের দ্বিতীয় ঋকের টীকায় সায়ণাচার্য্য লিখিয়াছেন,—'পাশদ্যুম্ন রাজা যখন যজ্ঞ করিতেছিলেন, সুদাস রাজাও সেই সময়ে যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বশিষ্ঠ-পুত্রগণ মন্ত্র-বলে তখন ইন্দ্রকে পাশদ্যুম্ন রাজার যজ্ঞস্থল হইতে সুদাস রাজার যজ্ঞস্থলে আনয়ন করিয়াছিলেন।' অষ্টম মণ্ডলের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সূক্তে বিভিন্দু এবং পাকস্থামা রাজার দান-মাহাত্ম্য ও প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। এই পাকস্থামা রাজার পিতার নাম—কুরুযান। কণ্ব-গোত্রোৎপন্ন মেধাতিথি ঋষি সূক্তদ্বয়ে উভয় নৃপতির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। উক্ত অষ্টম মণ্ডলের পঞ্চম এবং ষষ্ঠ ঋকে কণ্ড (কশু) এবং তিরিন্দি প্রভৃতির কীর্ত্তি-কাহিনী বর্ণিত আছে। পঞ্চম সূক্তোক্ত কশু রাজা

চেদি-বংশসম্ভূত বলিয়া পরিচিত এবং ষষ্ঠ সূক্তোক্ত তিরিন্দ রাজা যদুবংশোদ্ভব পরশু-পুত্র বলিয়া অভিহিত। চন্দ্রবংশের বংশ-লতায় যদুবংশের এবং চেদি-বংশের যে পরিচয় আছে, তাহাতে কশু, পরশু বা তিরিন্দের নাম কোথাও দৃষ্ট হয় না। অষ্টম মণ্ডলের একবিংশ সূক্তের সপ্তদশ ও অষ্টাদশ ঋকে চিত্র রাজার দান-মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত। চিত্র রাজা সরস্বতী-তীরে যজ্ঞ করেন। কণ্ব-পুত্র সোভরি ঋষি তাঁহার স্তুতিবাদ করিয়াছিলেন। টীকাকার এইরূপ বলিয়া থাকেন। ঐ মণ্ডলের দ্বাবিংশ সূক্তে ত্রসদস্যুর পুত্র তক্ষির নাম দৃষ্ট হয়, এবং বভ্রু রাজার পরিচয় পাওয়া যায়। চতুর্ব্বিংশ এবং পঞ্চবিংশ সূক্তে বরু রাজার নাম দেখিতে পাই। তিনি তৈক্ষ-গোত্রে জাত এবং সুষামার পুত্র (৮ম, ২৫ সূ, ২২ ঋক) বলিয়া পরিচিত। ষট্‌চত্বারিংশ সূক্তে উচথ্য ও বপু নামক রাজার উল্লেখ আছে। উক্ত অষ্টম মণ্ডলের অষ্টষষ্টিতম সূক্তে ষোড়শ ঋকে অঙ্গিরা-গোত্রোৎপন্ন প্রিয়মেধ ঋষি বলিতেছেন,—"অতিথিগ্বের পুত্রের নিকট হইতে সুরথবিশিষ্ট (অশ্ব-সমূহ) গ্রহণ করিয়াছি। ঋক্ষের পুত্রের নিকট হইতে সুন্দর অতীওবিশিষ্ট (অশ্ব-সমূহ) গ্রহণ করিয়াছি। এবং অশ্বমেধের পুত্রের নিকট হইতে সুরূপ (অশ্ব-সমূহ) গ্রহণ করিয়াছি।" এই ঋকের পূর্ব্ববর্ত্তী ঋকে ইন্দ্রোত এবং পরবর্ত্তী ঋকে শুক্রকর্ম্মা—অতিথিগ্বের পুত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। টীকাকারগণ অনেক স্থলে অতিথিগ্ব ও সুদাসকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু সেখানে সুদাসের এই দুই পুত্রের নাম তাঁহারা একবারও উল্লেখ করেন নাই। আবার ঋক্ষ রাজার পুত্রের নাম—ঋগ্বেদের এই অষ্টম মণ্ডলের চতুঃসপ্ততিতম সূক্তে দেখিতে পাই—শুতর্ব্বা। সেখানে রাজা শুতর্ব্বার দান-মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত। কিন্তু পুরাণে চন্দ্রবংশে যে ঋক্ষ রাজার বংশ-পর্য্যায় দৃষ্ট হয়, সে ঋক্ষের পুত্রের নাম—সংবরণ। সেখানে শুতর্ব্বা নাম কোথাও দৃষ্ট হয় না। নবম মণ্ডলে ধ্বস্র নামক দুই ব্যক্তির এবং পুরুষন্তি নামক দুই ব্যক্তির উল্লেখ আছে। সায়ণ বলেন,—'তাঁহারা দুই জন রাজা ছিলেন। ঐ দুই রাজার প্রত্যেকে এককালে ত্রিশ সহস্র বস্ত্র দান করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধ।' ঋগ্বেদে এইরূপ আর্য্য ও অনার্য্য আরও বহু নৃপতির উল্লেখ আছে। বাহুল্য-ভয়ে তাঁহাদের পরিচয়-দানে বিরত রহিলাম।*

পুরাণের মধ্যে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ, বায়ুপুরাণ, কল্কিপুরাণ, স্কন্দপুরাণ প্রভৃতিতেও অনেক নূতন নূতন রাজার নাম দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে সুরথ রাজার পরিচয়ে দেখিতে পাই,—চিত্রা-নাম্নী নারীর গর্ভে চন্দ্র-পুত্র বুধ এক পুত্র উৎপাদন

বিবিধ।

করেন। সেই পুত্র চৈত্র নামে অভিহিত। ঐ চৈত্র সপ্তদ্বীপাধিপতি এবং পৃথিবী-শাসক হইয়াছিলেন। সেই চৈত্রের তনয়—অধিরথ। অধিরথের পুত্র—মহাজ্ঞানী সম্রাট্ সুরথ। এই সুরথ রাজা এবং সমাধি নামক বৈশ্য, মেধস মুনির আশ্রমে তদীয় উপদেশে ভগবতী দুর্গার উপাসনা করিয়া সফলকাম হইয়াছিলেন।

---

* ঋগ্বেদোক্ত নৃপতিগণের পরিচয়-প্রসঙ্গে যে সকল অনুবাদ ও টীকার মর্ম্ম আমরা পূর্ব্ববর্তী কয়েক পৃষ্ঠায় প্রকাশ করিলাম, তাহার কতকগুলি রমেশচন্দ্র দত্তের অনুবাদিত ঋগ্বেদ হইতে এবং কতকগুলি পণ্ডিত রমানাথ সরস্বতীর অনুবাদিত ঋগ্বেদ হইতে গ্রহণ করিয়াছি।

সমাধির পিতামহ বিরাধ—কলিঙ্গের রাজা ছিলেন। তিনি বৈশ্য। তাঁহার পুত্র - বিষ্ণুভক্ত ক্রমিণ। ক্রমিণ পুষ্কর-তীর্থে দুষ্কর তপস্যা করিয়া বৈষ্ণব-চূড়ামণি সমাধিকে লাভ করিয়াছিলেন। সমাধি প্রত্যহ কোটী সুবর্ণ দান করিয়া জলগ্রহণ করিতেন। অত্যধিক দান-জন্য, তাঁহার স্ত্রী-পুত্র অত্যন্ত বিরক্ত হন। তখন, অতি-দুর্দ্দান্ত স্ত্রী-পুত্র কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া, তিনি সুরথ রাজার সঙ্গী হইয়াছিলেন। সুরথ রাজা, রাজা নন্দী কর্ত্তৃক রাজ্য ভ্রষ্ট হন। নন্দী রাজা—স্বায়ম্ভুব মনুর বংশজাত ধ্রুবের পৌত্র এবং উৎকলের পুত্র। রাজা নন্দী শত অক্ষৌহিণী সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সুরথের রাজধানী কোলা-নগরী আক্রমণ করিয়াছিলেন। এক বৎসর ঘোর যুদ্ধ চলিয়াছিল। নন্দী রাজা পরম বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। সুরথকে তিনি পরাজিত করিলে, সুরথ রজনী-যোগে ঘোর বনে গমন করেন। সেখানে, পুষ্পভদ্রা নদী-তীরে সমাধি বৈশ্যের সহিত তাঁহার মিত্রতা হয়। অতঃপর উভয়ে পুষ্কর-তীর্থে মেধস মুনির আশ্রমে গমন করিয়া ঋষির শরণাপন্ন হন। ভগবতী দুর্গার কৃপায় সুরথ রাজার নষ্ট-রাজ্য পুনরুদ্ধার হইয়াছিল। মার্কণ্ডেয় পুরাণেও দেবী-মহাত্ম্য-প্রসঙ্গে এই বিবরণ সামান্য রূপান্তরে পরিবর্ণিত আছে। তবে মন্বন্তর সম্বন্ধে বড়ই মতান্তর দেখিতে পাই। মার্কণ্ডেয় পুরাণ দৃষ্টে, সুরথ-সমাধির উপাসনা—সাবর্ণি মন্বন্তরের ঘটনা বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণের বর্ণনায়, উহা কোন্ মন্বন্তরের ঘটনা,—তাহা কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণের অন্যত্র আবার দেখিতে পাই,—সূর্য্য-বংশে সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, সুচন্দ্র নামে এক রাজা ছিলেন। দেবীর প্রসাদে দুর্লভ কবচ লাভ করিয়া তিনি সপ্তদ্বীপাধিপতি হইয়াছিলেন। সেই সুচন্দ্রের পুত্রের নাম—পুষ্করাক্ষ। তাঁহারা পিতা-পুত্র উভয়েই পরশুরামের সহিত যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে সুযজ্ঞ নামক আর এক নৃপতির পরিচয় পাওয়া যায়। সুযজ্ঞ রাজা সপ্তদ্বীপেশ্বর বলিয়া অভিহিত হন। ধ্রুব-পুত্র উৎকল, পুষ্কর-তীর্থে রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া যেরূপ যশোভাজন হইয়াছিলেন, সুযজ্ঞ রাজাও ব্রহ্মা কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া সেইরূপ যশস্কর যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। প্রতিদিন যজ্ঞশেষে রাজা সুযজ্ঞ দান-ধ্যানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেন। যজ্ঞের শেষ দিন তিনি ছত্রিশ কোটী ব্রাহ্মণকে সুতৃপ্তরূপে ভোজন করাইয়াছিলেন, এবং ভোজনান্তে সকলকেই রাশি রাশি সুবর্ণ দক্ষিণা দান করিয়াছিলেন। রাজা সুযজ্ঞ সে দিন এতই দান করেন যে, সে দান-ভার ব্রাহ্মণগণ বহন করিতে সমর্থ না হইয়া, কতকাংশ শূদ্রগণকে প্রদান করিয়া, কতকাংশ রাজপথে ছড়াইয়া দিয়া, অবশিষ্ট গৃহে লইয়া গিয়াছিলেন। যাহা হউক, যজ্ঞ-শেষে, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি পরিবেষ্টিত হইয়া, রাজা সুযজ্ঞ যখন রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট, সেই সময় রুক্ষ-মলিন-বেশে এক ব্রাহ্মণ আসিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া ব্রাহ্মণকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করা রাজার কর্ত্তব্য ছিল; কিন্তু রাজা মোহবশে তাহা বিস্মৃত হইলেন। সভাসদ্গণও ব্রাহ্মণের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিলেন না। ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া রাজাকে অভিসম্পাত দিলেন,—"রে নির্ব্বোধ! রাজ্যভ্রষ্ট হত-শ্রী ও কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হও।" সভাস্থ অন্যান্য সকলকেও ব্রাহ্মণ ঐরূপ অভিসম্পাত-প্রদানে

উদ্যত হইলে, সকলেই বিনয়-প্রকাশে ক্ষমা-ভিক্ষা চাহিলেন। সুতরাং তাঁহারা আর অভিশপ্ত হইলেন না। তখন, রাজা সুযজ্ঞ 'কুল-গুরু' বশিষ্ঠের উপদেশে, ব্রাহ্মণের চরণ-তলে আত্ম-সমর্পণ করিলেন। পরিশেষে ব্রাহ্মণের অনুগ্রহে আত্ম-জ্ঞান লাভ করিয়া রাজা সুযজ্ঞ মুক্তির পথে অগ্রসর হন। কল্কিপুরাণে শশিধ্বজ রাজার যুদ্ধ-কাহিনী বর্ণিত আছে। কল্কিদেব, দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া, খশ, কাম্বোজ প্রভৃতি অনার্য্য জাতিকে এবং বহু দৈত্য-দানব-অসুরকে সংহার করিয়া, ভল্লাট-নগরে উপনীত হন। ভল্লাট-রাজ শশিধ্বজ বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। শশিধ্বজ রাজার পুত্রদ্বয় সূর্য্যকেতু এবং তাঁহার কনিষ্ঠ বৃহৎকেতু—কল্কির সহিত ঘোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ধর্ম্মবলে বলীয়ান শশিধ্বজ সেই যুদ্ধে কল্কিকে পরাজিত করিয়াছিলেন। শশিধ্বজ কল্কিকে বন্দী করিয়া আপন গৃহে লইয়া যান। সেই সময় তিনি কল্কিকে ভগবানের অবতার বলিয়া বুঝিতে পারেন। কল্কির হস্তে শশিধ্বজ আপন কন্যাকে সমর্পণ করেন। ইহার পর কল্কি কর্ত্তৃক কাঞ্চনপুরী-নগরীতে মহামতি রাজার অভিষেক হয়। মহাপ্রভু সূর্য্যকেতুকে তিনি মথুরা-রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। কল্কিদেব আর আর যে যে নরপতিকে যে যে দেশে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণও কল্কিপুরাণে দেখিতে পাই। তিনি যথাক্রমে হরি, কবি, প্রাজ্ঞ, এবং সুমন্ত্রকে—পৌণ্ড্র, পৌণ্ড্র, পুলিন্দ, সুরাষ্ট্র ও মগধ দেশ প্রদান করিয়াছিলেন; আপন জ্ঞাতিদিগকে কীকট, মধ্য কর্ণাট, অন্ধ্র, ওড্র, অঙ্গ, বঙ্গ প্রভৃতি দেশ দান করেন; কৃতবর্ম্ম প্রভৃতি পুত্রগণকে দ্বারকার অন্তর্গত চোল, বর্ব্বর ও কর্ব্ব-দেশ দান করিয়াছিলেন; বিশাখযূপকে কঙ্কক দেশে ও কলাপ দেশে প্রতিষ্ঠিত করেন। কল্কি স্বয়ং সম্বল-নগরে অবস্থিতি করিয়া রমা ও পদ্মা মহিষীদ্বয়ের সহিত যুগ-বিবর্ত্তনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। পদ্মার সহিত তাঁহার বিবাহ-ব্যপদেশে আমরা এক বৃহদ্রথ রাজার নাম দেখিতে পাই। তিনি সাগর-বেষ্টিত সিংহল-দেশের অধিপতি ছিলেন। বৃহদ্রথের কন্যার নাম—পদ্মা। পদ্মার স্বয়ংবর-সভায় রুচিরাশ্ব, সুকর্ম্মা, মদিরাক্ষ, দৃঢ়াশুগ, কৃষ্ণসার, পারদ, জীমূত, ক্রূরমর্দ্দন, কাশ, কুশাম্বু, বসুমান, কঙ্ক, ক্রথন, সঞ্জয় ও অক্ষম—এই সকল ভূপালগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। লক্ষ্মী-স্বরূপিণী পদ্মা, কল্কিরূপী বিষ্ণুর কণ্ঠ-দেশে মাল্য-প্রদানের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। পদ্মার শিবারাধনার প্রভাবে এক অলৌকিক ব্যাপার সংঘটিত হয়;—সভাস্থ নৃপতিগণ স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হন। পরিশেষে, কল্কিরূপী ভগবানের সহিত পদ্মার পরিণয়-কার্য্য সম্পন্ন হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে, পুরঞ্জন রাজার এক অলৌকিক কাহিনী পরিবর্ণিত আছে। প্রাচীনবর্হির নিকট নারদ সেই পুরঞ্জন রাজার কাহিনী কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। পুরঞ্জন রাজার পুরী 'ভয়' নামক যবনাধিপতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। প্রমদাকে চিন্তা করিতে করিতে রাজার দেহত্যাগ হইয়াছিল। সেই জন্য তিনি স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইলে, বিদর্ভ-রাজ-গৃহে তাঁহার জন্ম হয়। পাণ্ড্য-দেশীয় অরিন্দম রাজা মলয়ধ্বজ, যুদ্ধস্থলে সমবেত ক্ষত্রিয়গণকে পরাজিত করিয়া, তাঁহার কর-গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভূপতির সপ্ত পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। সেই পুত্রগণ দ্রাবিড়-দেশের অধিপতি হইয়াছিলেন। বিদর্ভ-দুহিতারূপে জন্মগ্রহণের পর

ভগবদ্ভক্তি-প্রভাবে, পুরঞ্জন মুক্তি-লাভ করেন। * অনুসন্ধান করিতে গেলে, ভারতের পুরাবৃত্তে আরও অসংখ্য নৃপতির পরিচয় পাওয়া যায়। যাঁহারা বংশ-লতার কয়েকটী মাত্র নাম দেখিয়া, ভারতের আর্য্য-সভ্যতার আধুনিকত্ব প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পান, তাঁহারা যদি বংশ-লতাতিরিক্ত নৃপতিগণের ইতিহাসের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সকল ভ্রম বিদূরিত হইতে পারে। বিভিন্ন পুরাণেতিহাসের বিভিন্ন নৃপতিগণের আলোচনা করিতে গিয়া, মনে হয় না কি—ভারতীয় সভ্যতা অনাদি-কাল হইতে আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে? কত বংশের কত নৃপতির নাম—কাল-সাগরে ভাসিয়া গিয়াছে; বংশ-লতার কোথায় তাঁহাদের স্থান, এখন তাহা নির্ণয় করাই দুঃসাধ্য।

একোনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

রাজা ও প্রজা।

[ঋগ্বেদে রাজভক্তি,—রাজার অভিষেক-উপলক্ষে ঋষির উক্তি;—রাজার প্রতি প্রজার কর্ত্তব্য,—রাজা—নররূপী দেবতা,—মম্বাদি শাস্ত্রের মত,—রাজ-রক্ষাই প্রজার শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য,—রাজার দুর্ব্যবহারে প্রজার উত্তেজনা অকর্ত্তব্য,—রাজার প্রতি প্রজার পিতৃ-মাতৃবৎ জ্ঞান;—প্রজার প্রতি রাজার কর্ত্তব্য,—পুত্রবৎ প্রজা-পালন,—দৈনন্দিন কার্য্যে প্রজার প্রশংসা-প্রাপ্তির চেষ্টা,—পুরাণাদি শাস্ত্রের গূঢ়-তত্ত্ব।]

ঋগ্বেদে রাজ-ভক্তি।

রাজন্যবর্গের ইতিবৃত্তের সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতি-তত্ত্ব ওতঃপ্রোত বিজড়িত। রাজা কিরূপ-ভাবে প্রজাপালন করিতেন, প্রজা কিরূপ-ভাবে রাজাকে মানিয়া চলিতেন,—ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্বে তাহার প্রস্ফুট চিত্র পরিদৃশ্যমান্। আমরা প্রসঙ্গতঃ পূর্ব্বেও সে আভাস প্রদান করিয়াছি। এখন আবার উপসংহারে স্থূল স্থূল ভাবে তদ্বিষয় আলোচনা করিতেছি। রাজার প্রতি প্রজার কর্ত্তব্য এবং প্রজার প্রতি রাজার কর্ত্তব্য প্রভৃতি বিষয়ে হিন্দু-শাস্ত্র-সমূহে যে উচ্চ আদর্শ দেখিতে পাই, বুঝি পৃথিবীর অন্য কোনও দেশের অন্য কোনও সাহিত্যে তাহা বিরল। ঋগ্বেদের বহুতর সূক্তে রাজা দেবতার ন্যায় পূজিত হইয়াছেন। সেই সকল সূক্ত আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, রাজাও প্রজা-পালনে কি মহানুভবতাই প্রকাশ করিতেছেন! যেমন প্রজার অনুরাগ—তেমনই রাজার স্নেহ! রাজার অভিষেক-উপলক্ষে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ত্রিশদত্যধিক শততম সূক্তে ধ্রুব ঋষি বলিতেছেন,—"হে রাজন্!

* শ্রীমদ্ভাগবত, চতুর্থ স্কন্ধ, পঞ্চবিংশ হইতে ত্রিংশ অধ্যায়-সমূহে পুরঞ্জন-কাহিনী বর্ণিত আছে।

তোমাকে রাজ-পদে অধিরোপিত করিলাম। তুমি এই জনপদের মধ্যে প্রভু হও; অটল, অবিচলিত, স্থির হইয়া থাক। তাবৎ প্রজাগণ তোমাকে বাঞ্ছা করুক। তোমার রাজত্ব যেন নষ্ট না হয়। ১॥ তুমি এই স্থানেই পর্ব্বতের ন্যায় অবিচলিত থাক, রাজ্যচ্যুত হইও না। ইন্দ্রের ন্যায় নিশ্চল হইয়া এই স্থানে রাজ্যকে ধারণ কর। ২।...বরুণ দেব তোমার রাজ্যকে অবিচলিত করুন, দেব বৃহস্পতি অবিচলিত করুন, ইন্দ্র ও অগ্নি অবিচলিতরূপে ধারণ করুন। ৫॥" রাজার স্থায়িত্ব-কামনায় এরূপ উদার উচ্চ আকাঙ্ক্ষা— কোনও দেশের কোনও জাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় কি? হিন্দুর আরাধ্য বেদ;— সেই বৈদিক-সূক্তে রাজার স্থায়িত্ব-কামনায় এই উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত। রাজগণের কর্ত্তব্য-সাধন, প্রজাপালনের এবং দান-ধর্ম্মের বিষয় কত স্থানে কত প্রকারেই উল্লিখিত আছে! * সংহিতা-শাস্ত্রে ও পুরাণ-সমূহে রাজার রাজধর্ম্ম-পালনের এবং প্রজার প্রজাধর্ম্ম-সংরক্ষণের ভূয়োভূয়ঃ পরিচয় পাওয়া যায়। যে শাস্ত্রই আলোড়ন করি না কেন, সর্ব্বত্রই প্রজার প্রতি রাজার স্নেহ-প্রদর্শনের এবং রাজার প্রতি প্রজার ভক্তি-প্রদর্শনের উপদেশ আছে। হিন্দু-শাস্ত্রের কোথাও রাজদ্রোহিতার প্রশ্রয় নাই, রাজ-জিঘাংসায় উৎসাহ দেখিতে পাওয়া যায় না; পরন্তু রাজ-জিঘাংসা বা রাজদ্রোহিতার বিষময় পরিণামের বিষয়ই শাস্ত্রে পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। অধিক বলিব কি, রাজা যদি অত্যাচারী বা উচ্ছৃঙ্খল হন, তাহা হইলেও প্রজা কদাচ উচ্ছৃঙ্খল বা রাজদ্রোহী হইবে না; পরন্তু ভগবানে নির্ভর করিয়া রাজার মঙ্গল-প্রার্থনা করিবে।

রাজার প্রতি প্রজার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্র কি উদার মহান্ আদর্শই হিন্দু-নরনারীর চক্ষের সমক্ষে ধারণ করিয়া আছেন! মন্বাদি সংহিতা-শাস্ত্রে, রামায়ণে, মহাভারতে এবং পুরাণাদি গ্রন্থে—এ আদর্শ কোথায় নাই? মনু বলিয়াছেন,—'বালক

প্রজার কর্ত্তব্য।

হইলেও রাজা সামান্য মনুষ্য নহেন। সামান্য মনুষ্য-জ্ঞানে তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ একান্ত অকর্ত্তব্য। তিনি মহান্ দেবতা; নররূপে অবস্থান করিতেছেন মাত্র।' মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে—সেই একই উক্তি দৃষ্ট হয়। সেখানে যুধিষ্ঠিরকে ভীষ্ম বলিতেছেন,—'ভূপতিকে মনুষ্য জ্ঞান করিয়া কখনই অবমাননা করা উচিত নহে; কারণ, এই মহতী দেবতা নররূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবস্থান করেন।' গরুড়-পুরাণে, নীতিসার-খণ্ডে, উক্ত আছে,—'চূড়ামণি, ইন্দ্রধনু, আকাশ, সমুদ্র, অগ্নি ও রাজা, ইহাঁদিগের মস্তকে স্থিতিই স্বভাব। কদাচ ভ্রম-বশেও পাদদ্বারা স্পর্শ (অবমাননা) করিবে না।'

"বালোঽপি নাবমন্তব্যো মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ। মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি॥"
—মনুসংহিতা, সপ্তম অধ্যায়, ৮ম শ্লোক।

"ন হি জাত্ববমন্তব্যো মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ। মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি॥"
—মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়, ৪০শ শ্লোক।

"চূড়ামণিঃ সমুদ্রোঽগ্নির্ভিলাখণ্ডমম্বরম্। অথবা পৃথিবীপালো মূর্দ্ধ্নি পাদঃ প্রবাদতঃ॥"
—গরুড়পুরাণ, পূর্ব্বখণ্ড, দশাধিক শততম অধ্যায়, ১১শ শ্লোক।

মনু অন্যত্র আবার কহিয়াছেন,—'রাজা প্রসন্ন থাকিলে মহতী শ্রী লাভ হয়, তাঁহার ক্রোধে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। তাঁহার পরাক্রম-প্রভাবে বিজয়-লাভ অবশ্যম্ভাবী। তিনি সর্ব্ব-

* পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচ্ছেদে 'ঋগ্বেদোক্ত নৃপতিগণের' পরিচয়-প্রসঙ্গে সে আভাস অনায়াসেই পাওয়া যাইবে।

তেজোময়।' মহাভারতের শান্তিপর্ব্বেও এই একই উপদেশ—প্রায়ই একই ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে! ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন,—'হে যুধিষ্ঠির! এইরূপে পৃথিবীতে যে মনুষ্যগণ মঙ্গল-কামনা করিবেন, তাঁহারা প্রজাবর্গের অনুগ্রহের নিমিত্ত রাজাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিবেন। শিষ্যগণ যেরূপ গুরুর নিকট প্রণত থাকেন এবং দেবগণ যেরূপ দেবেন্দ্রের নিকট নত হইয়া থাকেন, তদ্রূপ রাজার নিকট প্রজাগণ প্রণত হইয়া থাকিবেন।'

"যস্য প্রসাদে পদ্মা শ্রীর্বিজয়শ্চ পরাক্রমে। মৃত্যুশ্চ বসতি ক্রোধে সর্ব্বতেজোময়ো হি সঃ॥"

—মনুসংহিতা, সপ্তম অধ্যায়, ১১শ শ্লোক।

"এবং যে ভূতিমিচ্ছেয়ুঃ পৃথিব্যাং মানবাঃ কচিৎ। কুর্য্যু রাজানমেবাগ্রে প্রজানুগ্রহকারণাৎ॥ নমস্যেয়ুশ্চ তং ভক্ত্যা শিষ্যা ইব গুরুং সদা। দেবা ইব চ দেবেন্দ্রং তত্র রাজানমন্তিকে॥"

—মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়, ৩৩শ—৩৪শ শ্লোক।

প্রজা মনে-প্রাণে ভ্রমেও কখনও রাজার অনিষ্ট-চিন্তা করিবে না;—শাস্ত্র পুনঃপুনঃ সেই উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। মনু বলিয়াছেন,—'যে ব্যক্তি মোহ বশতঃ রাজার প্রতি দ্বেষ করিয়া থাকে, সে ব্যক্তি নিশ্চয় বিনাশ-প্রাপ্ত হয়।' মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ-ছলে বলিতেছেন,—'যে পুরুষ মনোমধ্যেও রাজার অনিষ্টাশঙ্কা উৎপাদন করিবে, সে নিশ্চয়ই ইহলোকে ক্লেশ ভোগ করিয়া পরিশেষে নরকে পতিত হইবে।'

"তং যস্তু দ্বেষ্টি সম্মোহাৎ স বিনশ্যত্যসংশয়ম্। তস্য হ্যাশু বিনাশায় রাজা প্রকুরুতে মনঃ॥"

—মনুসংহিতা, সপ্তম অধ্যায়, ১২শ শ্লোক।

"যস্তস্য পুরুষঃ পাপং মনসাপ্যনুচিন্তয়েৎ। অসংশয়মিহ ক্লিষ্টঃ প্রেত্যাপি নরকং ব্রজেৎ॥"

—মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়, ২৯শ শ্লোক।

রাজার অহিত-চিন্তা তো নহে-ই; পরন্তু, রাজাকে শ্রেষ্ঠ-জ্ঞান করিয়া তাঁহার রক্ষা-পক্ষে যত্ন করা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ। ভৃগু-নন্দন শুক্র রাম-চরিত কথন-কালে তাই কহিয়াছিলেন,—'প্রজাগণ ভূপতিকেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ-জ্ঞান করিয়া, তাঁহাকে রক্ষা করিবে; তৎপরে ভার্য্যা এবং তদনন্তর ধন-রক্ষায় যত্নবান হইবে; কারণ, নৃপতি না থাকিলে, তাহাদের ভার্য্যাই বা কোথায় এবং ধনই বা কোথায় থাকিবে?' অন্যত্র,আবার দৃষ্ট হয়,—'প্রজাগণের আত্ম-মঙ্গলের নিমিত্তই রাজাকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য, ধন অথবা দারাদির নিমিত্ত নহে।'

"রাজানং প্রথমং বিন্দেত্ততো ভার্য্যাং ততো ধনম্। রাজন্যসতি লোকস্য কুতো ভার্য্যা কুতো ধনম্॥"

—মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়, ৪১শ শ্লোক।

"তস্মাদ্রাজৈব কর্ত্তব্যঃ সততং ভূতিমিচ্ছতা। ন ধনার্থো ন দারার্থস্তেষাং যেষামরাজকম্॥"

—মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়, ১২শ শ্লোক।

বাল্মীকির রামায়ণেও এই উক্তি ভাষান্তরে প্রকটিত। রাবণ-কর্ত্তৃক অবৈধ বিষয়ে আদিষ্ট হইয়া, মারীচ সেখানে নির্ভীক হৃদয়ে বলিতেছেন,—"রাজারাই প্রজাবর্গের ধর্ম্ম ও যশোলাভের মূল; সুতরাং সকল অবস্থাতেই তাঁহাদিগকে রক্ষা করা প্রজাবর্গের একান্ত কর্ত্তব্য।"

"রাজমূলো হি ধর্ম্মশ্চ যশশ্চ জনতাং বর। তস্মাৎ সর্ব্বাস্ববস্থাসু রক্ষিতব্যা নরাধিপাঃ॥"

—রামায়ণ, আরণ্যকাণ্ড, একচত্বারিংশ সর্গ, ১০ম শ্লোক।

রাজা যদি কর্ত্তব্য-পালনে বিমুখ হন, প্রজার তাহাতে কুপিত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। তখন

মনে করিতে হয়,—'মাতা যদি বাল্যকালে প্রতিপালন না করেন, পিতা যদি সাধু-পথ প্রদর্শন না করেন, রাজা যদি ধন-সম্পত্তি অপহরণ করিয়া লন, বিলাপ করিয়া কোনই ফল নাই। মিত্র, আত্মীয় জন ও নৃপতি সুসেবিত হইয়াও যদি ক্রোধ-পরায়ণ হন, গৃহ যদি অগ্নি বা বজ্র দ্বারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, অনুশোচনা করিয়া কি ফল আছে?' যথা,—

"মাতা ন পালয়েদ্ বালো পিতা সাধু ন শিক্ষয়েৎ। রাজা যদি হরেদ্বিত্তং কা তত্র পরিবেদনা॥
সুসেবিতাঃ প্রকুপ্যন্তি মিত্র স্বজন পার্থিবাঃ। গৃহমগ্ন্যশনিহতং কা তত্র পরিবেদনা॥"

—শুক্রনীতি, তৃতীয় অধ্যায়, ৪৭শ—৪৮শ শ্লোক।

ইহার অধিক প্রজার প্রতি আত্ম-সংযমের উপদেশ আর কি হইতে পারে? যে দেশের শাস্ত্রে রাজার প্রতি প্রজার কর্ত্তব্য বিষয়ে এইরূপ সারগর্ভ উপদেশ নিহিত রহিয়াছে, সে দেশে—সে রাজ্যে কখনও রাজদ্রোহ বা রাষ্ট্র-বিপ্লব সম্ভবপর কি? ভারতবর্ষের পুরাবৃত্তে সহস্র সহস্র বৎসরের ইতিহাসের মধ্যেও তাই আমরা রাষ্ট্র-বিপ্লবের বা প্রজা-বিদ্রোহের ছায়া-মাত্র দেখিতে পাই না।*

রাজার কর্ত্তব্য।

যেমন প্রজার কর্ত্তব্য-বিষয়ে শাস্ত্রে উপদেশ আছে; তেমনিই রাজার কর্ত্তব্য-সম্বন্ধেও শাস্ত্র উপদেশ দিয়াছেন। রাজা কিরূপভাবে প্রজা-পালন করিবেন, রাজা কিরূপভাবে ধর্ম্মানুশাসন মানিয়া চলিবেন, রাজা কিরূপভাবে ন্যায়-নীতির অনুবর্ত্তী হইবেন,—সকল শাস্ত্রেই তাহার উল্লেখ আছে। তবে, তিনি যদি কখনও মোহবশে ধর্ম্মভ্রষ্ট ও অত্যাচার-পরায়ণ হন, ধর্ম্মই তাহার বিচার করিবেন; পরন্তু প্রজা কখনও রাজার অত্যাচার-অবিচারের প্রতিকার-কল্পে বদ্ধ-পরিকর হইবে না। ইহাই হিন্দু-শাস্ত্রের উপদেশ। মনু বলেন,—"স্যাচ্চাম্নায় পরো লোকে বর্ত্তেত পিতৃবন্নৃষু।" 'অর্থাৎ, অধীনস্থ সমস্ত প্রজাবর্গের প্রতি রাজা পিতৃবৎ ব্যবহার করিবেন।' মনু 'পিতৃবৎ' ব্যবহার করিতে বলিলেন। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে 'মাতৃবৎ' ব্যবহারের উপদেশ আছে। 'প্রকৃতি-পুঞ্জের সহিত গর্ভধারিণীর ন্যায় রাজার ব্যবহার করা কর্ত্তব্য'—সেখানে উল্লিখিত হইয়াছে। সেখানে ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন,—'প্রকৃতি-পুঞ্জের সহিত গর্ভধারিণীর ন্যায় ব্যবহার করা রাজার কর্ত্তব্য। মহারাজ! যে কারণে এতাদৃশ উপমা-সংলগ্ন হইতেছে, তাহা শ্রবণ কর। যেরূপ গর্ভধারিণী স্বীয় মনোমত ইষ্ট পরিত্যাগ করিয়া, যাহাতে গর্ভস্থ সন্তানের মঙ্গল হয়, তাহার চেষ্টা করেন; তদ্রূপ যাহাতে প্রকৃতি-পুঞ্জের মঙ্গল হয়, এতাদৃশ কার্য্য করাই রাজার কর্ত্তব্য। হে কুরুপুঙ্গব! যে যে কার্য্য করিলে প্রজামণ্ডলীর মঙ্গল হয়, তুমি স্বীয় মনোগত অভিলাষ পরিত্যাগ করিয়াও সর্ব্বদা তাদৃশ ধর্ম্মানুবর্ত্তী হইবে।' অগ্নি-পুরাণেও এই একই উক্তি দৃষ্ট হয়; 'গর্ভিণী সহধর্ম্মিণী যেমন নিজের সুখ ত্যাগ করিয়া গর্ভেরই সুখ আবহন করে, রাজারও তদ্বৎ হওয়া আবশ্যক।'

"ভবিতব্যং সদা রাজ্ঞা গর্ভিণী সহধর্ম্মিনা। কারণং চ মহারাজ শৃণু যেনেদমিষ্যতে।
যথা হি গর্ভিণী হিত্বা স্বং প্রিয়ং মনসোঽনুগম্। গর্ভস্য হিতমাধত্তে তথা রাজ্ঞাপ্যসংশয়ম্।

* বেণ-রাজার হত্যার পর সাধারণ-তন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় দেশের কি দুরবস্থা হইয়াছিল, পুরাণ-পাঠক মাত্রেই তাহা অবগত আছেন।

বর্ত্তিতব্যং কুরুশ্রেষ্ঠ সদা ধর্ম্মানুবর্ত্তিনা। স্বং প্রিয়ং তু পরিত্যজ্য যদ্যল্লোকহিতং ভবেৎ ॥"

—মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, বট্পঞ্চাশ অধ্যায়, ৪৪শ-৪৫শ শ্লোক।

"নিত্যং রাজ্ঞা যথাভাব্যং গর্ভিণী সহধর্ম্মিণী। যথা স্বং সুখমুৎসৃজ্য গর্ভস্য সুখমাহরেৎ ॥"

—অগ্নিপুরাণ, ত্রয়োবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়, ৮ম শ্লোক।

রাজার দৈনন্দিন কার্য্যে প্রজাগণ যাহাতে সন্তোষ প্রকাশ করে, তাঁহার প্রতি কার্য্যে যাহাতে প্রশংসা-বাদ কীর্ত্তিত হয়,—রাজা নিয়ত তৎপক্ষে যত্নবান থাকিবেন। এই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া যে রাজা রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন, সেই নৃপতিই শ্রেয়ঃ-লাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। ভীষ্মদেব উপদেশচ্ছলে যুধিষ্ঠিরকে তাই বলিতেছেন,—'আমার ছিদ্র কি, ব্যসন কি হইতেছে, অবিনিপাতিত কি আছে, কোথা হইতে আমাকে দোষ আশ্রয় করিতেছে,—এই সকল বিষয় রাজা নিয়ত চিন্তা করিবেন। গত দিবসে যে কার্য্য করিয়াছি, প্রজাগণ পুনর্ব্বার তাহার প্রশংসা করিতেছে কিনা, আমার এই কার্য্য প্রজারা যদি জানিয়া থাকে, তবে তাহা পুনরায় প্রশংসা করিতেছে কিনা; জনপদ এবং রাষ্ট্র মধ্যে আমার যশঃ প্রজাদিগের অভিলষিত হইয়াছে কি না;—এই সকল বিষয় অনুসন্ধান করিবার জন্য অনুমত গুপ্তচরকে নিয়ত পৃথিবীতে প্রেরণ করিবে।'

"কিং ছিদ্রং কো নু সঙ্গো মে কিং বাস্ত্যবিনিপাতিতম্। কুতো মামাশ্রয়েদ্দোষ ইতি নিত্যং বিচিন্তয়েৎ ॥
অতীত-দিবসে বৃত্তং প্রশংসন্তি ন বা পুনঃ। গুপ্তৈশ্চারৈরনুমতৈঃ পৃথিবী মনুসারয়েৎ।
জানীয়ুর্যদি মে বৃত্তং প্রশংসন্তি ন বা পুনঃ। কচ্চিদ্রোচেজ্জনপদে কচ্চিদ্রাষ্ট্রে চ মে যশঃ ॥
ধর্ম্মজ্ঞানাং ধৃতিমতাং সংগ্রামেষপলায়িনাম্। রাষ্ট্রে তু যেঽনুজীবন্তি যে তু রাজ্ঞোঽনুজীবিনঃ ॥"

—মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, একোননবতিতম অধ্যায়, ১৪শ-১৭শ শ্লোক।

অল্প কথায় রাজার কর্ত্তব্য ইহাতে কি সুন্দর পরিস্ফুট! বোধ হয়, এই একটী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিলেই রাজ-কার্য্য সুসম্পাদিত হইতে পারে। বিষ্ণুসংহিতায় দৃষ্ট হয়,—'যে রাজা প্রজার দুঃখে দুঃখী হন, তিনি ইহকালে যশোলাভ করিয়া পরকালে স্বর্গলাভ করেন।'

"প্রজাসুখে সুখী রাজা তদ্দুঃখে যশ্চ দুঃখিত। স কীর্ত্তিযুক্তো লোকেঽস্মিন্ প্রেত্য স্বর্গে মহীয়তে ॥"

—বিষ্ণুসংহিতা, তৃতীয় অধ্যায়, ৭০ম শ্লোক।

রাজার অপকর্ম্মের জন্য রাজা আপনি ফলভাগী হন। প্রজার সে জন্য চেষ্টা করার আর আবশ্যক হয় না! শাস্ত্র কোথাও কোনও অবস্থায় রাজার বিরুদ্ধে প্রজাকে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা পান নাই। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—রাজা পিতা, প্রজা পুত্র; শাস্ত্র বলিয়াছেন,—রাজা গর্ভধারিণী মাতৃস্বরূপিণী, প্রজা গর্ভস্থ শিশু-স্থানীয়; শাস্ত্র বলিয়াছেন, রাজার প্রতি প্রজাকে নির্ভর-পরায়ণ হইতে হইবে, কদাচ রাজার বিরুদ্ধাচরণ কর্ত্তব্য নহে। ইহাই শাস্ত্রের মূল তত্ত্ব।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

দেবতা ও ব্রাহ্মণ।

[পরব্রহ্ম, দেবতা, অবতার, ব্রাহ্মণ প্রভৃতির সম্বন্ধ-তত্ত্ব ;—দেবতা অসংখ্য,—দেবতা জগদীশ্বরের অংশ-বিশেষ,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, অগ্নি, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেবতার নাম-রূপের অনন্তত্ব ;—অবতার-তত্ত্ব,—অবতার—জগদীশ্বরের বিভূতি-বিশেষ,—ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে অবতারের পরিচয়-প্রসঙ্গ,—অবতার অসংখ্য ;—ব্রাহ্মণ-প্রসঙ্গ,—বেদে ব্রাহ্মণের মহিমা-কীর্ত্তন,—ব্রাহ্মণের উৎপত্তি-তত্ত্ব,—পুরাণে দ্বিজগণের মাহাত্ম্য কথা,—ব্রাহ্মণোৎপত্তি ও জাতিভেদ বিষয়ে মতান্তর ;— ঋষি-প্রসঙ্গ,—ঋষি ও ব্রাহ্মণাদির সম্বন্ধ-তত্ত্ব।]

দেবতা ও ব্রাহ্মণ ভারতবর্ষের পুরাবৃত্তে প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছেন। ভারত-বর্ষের ইতিহাস আলোচনা করিতে হইলে, দেবতা ও ব্রাহ্মণের প্রসঙ্গ আপনা-আপনিই আসিয়া পড়ে। দেবগণ, ঋষিগণ, ব্রাহ্মণগণ, অবতারগণ,—ইঁহারা কি যেন

সম্বন্ধ-তত্ত্ব।

এক অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত হইয়া আছেন! পরম-পুরুষ পরব্রহ্ম — সেই অদ্বিতীয় ঈশ্বর, যখন বিভিন্ন-রূপে বিকাশমান, তখনই তিনি 'দেবতা' নামে অভিহিত। পরব্রহ্মের সে রূপ—অসংখ্য; সুতরাং দেবতাও অসংখ্য। দেবতা স্বর্গের ;—মর্ত্ত্যের মানুষ সচরাচর তাঁহাদের সাক্ষাৎকার-লাভে সমর্থ নহে। সাধুদিগের পরিত্রাণের নিমিত্ত এবং দুষ্কৃত জনের বিনাশের জন্য সেই পরম-পুরুষ যখন নাম-রূপে সংসারে অবতীর্ণ হন, তখনই তিনি 'অবতার' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। মনুষ্যের মধ্যে যাঁহারা আবার পরব্রহ্মের স্বরূপ-তত্ত্ব বিশেষ ভাবে অবগত, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ। যিনি সাংসারিক-সুখ পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞান-মার্গে গমন করিয়াছেন, তিনিই ঋষি। ব্রাহ্মণ সংসারাশ্রমে বসতি করিয়াও নির্লিপ্ত ভাবের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন ; ঋষিগণ সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম-চিন্তায় নিবিষ্ট থাকেন। স্থূলতঃ, দেবতা, ব্রাহ্মণ, ঋষি, অবতার প্রভৃতির ইহাই তাৎপর্য্য। তাঁহারা এমনই ভাবে ভারতবর্ষের পুরাবৃত্তের সহিত মিশিয়া আছেন যে, তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিলে, ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিবৃত্ত অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়।

মূল—ব্রহ্ম। ঈশ্বর, জগদীশ্বর, পরমেশ্বর, পরব্রহ্ম, পরম-পুরুষ প্রভৃতি—তাঁহার নামের অন্ত নাই। তাঁহা হইতেই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে ; তাঁহাতেই জগৎ অবস্থিত আছে ; আবার, তাঁহাতেই জগৎ লয়প্রাপ্ত হইতেছে। তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর

দেবতা।

নামে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার-কার্য্যের বিধান করেন ; তিনি অসংখ্য দেব-দেবী-রূপে অসংখ্য কার্য্যে ব্রতী আছেন। তিনি আদ্যন্ত-মধ্য-পরিশূন্য। তাঁহার পরিচয় ভাষায় ব্যক্ত হয় না। তিনি ধারণার অতীত, জ্ঞানের অতীত, কল্পনার অতীত। জগৎ তাঁহার অভিব্যক্তি-স্বরূপ। তিনি সর্ব্বভূতে ওতঃপ্রোত বিরাজ-মান। অনন্ত দেব-দেবী ও প্রাণি-পর্য্যায়ে তাঁহার অনন্ত বিভূতির বিকাশ। এই জন্যই তিনি এক ; এই জন্যই তিনি বহু। বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষৎ ও পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে তাঁহাকে সেই ভাবেই বুঝান হইয়াছে। তিনি এক হইয়াও যে বহু,—সর্ব্ব-শাস্ত্রেই তাহার মীমাংসা আছে। ফলতঃ, কি ব্রহ্মা, কি বিষ্ণু, কি রুদ্র,—কি বায়ু, কি বরুণ, কি ইন্দ্র,—

কি অগ্নি, কি পৃথিবী, কি সূর্য্য,—কি সোম, কি মিত্র, কি মরুৎ,—সকলই তিনি, সকলই তাঁহার বিকাশ মাত্র। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় অনুসারে, তিনি কখনও তেত্রিশ, কখনও তেত্রিশ শত; তিনি কখনও তেত্রিশ সহস্র, কখনও তেত্রিশ লক্ষ; তিনি কখনও তেত্রিশ কোটী, কখনও বা অসংখ্য অনন্ত। যে যেরূপ দৃষ্টিতে তাঁহাকে দর্শন করে, অধিকারি-ভেদে, সে সেইরূপ নাম-রূপে তাঁহার পরিচয় পায়। বেদ হইতে পুরাণ পর্য্যন্ত শাস্ত্র-সমূহে, তাই কখনও তাঁহাকে এক, কখনও তাঁহাকে তেত্রিশ এবং কখনও তাঁহাকে অনন্ত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ঋগ্বেদেরই বিভিন্ন স্থানে তাই তাঁহার বিভিন্ন-রূপ সংখ্যার পরিচয় পাই। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের চতুস্ত্রিংশ এবং পঞ্চচত্বারিংশ সূক্তে, তৃতীয় মণ্ডলের ষষ্ঠ ও নবম সূক্তে, অষ্টম মণ্ডলের অষ্টাবিংশ, ত্রিংশ, পঞ্চত্রিংশ, ঊনচত্বারিংশ ও সপ্তপঞ্চাশ সূক্তে, নবম মণ্ডলের নবম সূক্তে এবং দশম মণ্ডলের দ্বি-পঞ্চাশ সূক্তে, দেবগণের সংখ্যার উল্লেখ আছে। কিন্তু তাহাতেও সংখ্যা-সম্বন্ধে দুই মত দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে কোনও কোনও সূক্তে দেখিতে পাই,—দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ জন; আবার কোনও কোনও সূক্তে দেখিতে পাই,—তাঁহাদের সংখ্যা—তিন সহস্র তিন শত ঊনচল্লিশ জন। এদিকে আবার বৈদিক সূক্ত-সমূহ যে সকল দেবতার উদ্দেশে উক্ত হইয়াছে, তাহার সহিত পূর্ব্বোক্ত সংখ্যাদ্বয়ের মিল দৃষ্ট হয় না। আমরা প্রথমে ঋগ্বেদের একটী ঋক, তাহার বঙ্গানুবাদ এবং তৎসংক্রান্ত টীকা উদ্ধৃত করিতেছি। প্রথম মণ্ডলের চতুস্ত্রিংশ সূক্তের একাদশ ঋক,—

'আ নাসত্যা ত্রিভিরেকাদশৈরিহ দেবেভির্যাতং মধুপেয়মশ্বিনা।
প্রায়ুস্তারিষ্টং নীরপাংসি মৃক্ষতং সেধতং দ্বেষো ভবতং সচাভুবা॥'

"হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! আপনারা ত্রয়স্ত্রিংশৎ সংখ্যক দেবগণের সহিত মধুর সোমপান করিতে, এই যজ্ঞস্থানে আগমন করুন, আমাদিগের আয়ু বৃদ্ধি করুন, আমাদিগের পাপ শোধন করুন, এবং দ্বেষকারক রিপুগণের নিবারণ করুন ও আমাদিগের সহিত সহায়-রূপে স্থিতি করুন।" এইরূপ বঙ্গানুবাদের পর, টীকাকার বলেন,—"এস্থলে ত্রিগুণিত একাদশ অর্থাৎ ত্রয়স্ত্রিংশৎ সংখ্যক দেবগণের উল্লেখ রহিয়াছে। সায়ণাচার্য্য বলেন, দ্যুলোকের একাদশ, অন্তরীক্ষ-লোকের একাদশ এবং ভূলোকের একাদশ, এই সমস্ত লইয়া ত্রয়স্ত্রিংশৎ। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে পঞ্চচত্বারিংশ সূক্তের দ্বিতীয় ঋকে এবং তৃতীয় মণ্ডলে ষষ্ঠ সূক্তের নবম ঋকে—'হে অগ্নে! তেত্রিশ সংখ্যক দেবগণকে তৎপত্নীদিগের সহিত আনয়ন কর' দেখিতে পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয় সংহিতার (১।৪।১০।১) মতে,—'যে দেবাসঃ দিবি একাদশস্থ পৃথিব্যামধি একাদশস্থ। অপ্সুক্ষিতো যে একাদশস্থ তে দেব্যাসঃ।' অর্থাৎ, স্বর্গে একাদশ, পৃথিবীতে একাদশ এবং অন্তরীক্ষে একাদশ। শতপথ ব্রাহ্মণে (৪।৫।৭।২) অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, দ্যৌ এবং ভূ এই ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতা। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (২।১৮) মতে—'সোমপা' নামক এক শ্রেণীর দেবতাগণের সংখ্যা তেত্রিশ; এবং দ্বিতীয় শ্রেণী—একাদশ প্রযাজ (বা আপ্রী), একাদশ অনুযাজ এবং একাদশ উপযাজ এই তিনে তেত্রিশ। প্রথম শ্রেণীস্থ দেবগণ সোমরস দ্বারা প্রীত হয়েন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ দেবতাগণ ঘৃতাহুতি দ্বারা পরিতৃপ্ত হয়েন।...বিষ্ণুপুরাণ মতে—একাদশ

রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, আট বসু, এক প্রজাপতি এবং এক বষট্‌কার এই তেত্রিশ।"* এদিকে আবার, তৃতীয় মণ্ডলের নবম সূক্তের নবম ঋকে এবং দশম মণ্ডলের দ্বিপঞ্চাশ সূক্তের ষষ্ঠ ঋকে ৩৩৩৯ জন দেবতার উল্লেখ আছে। সায়ণাচার্য্য বলেন—"দেবতা কেবল তেত্রিশ জন, ৩৩৩৯ সংখ্যা তাঁহাদের মহিমা মাত্র।" অন্যান্য টীকাকারগণও বলেন,—"বেদে তেত্রিশ দেবতার উল্লেখ আছে। পৌরাণিক-কালে এই তেত্রিশ হইতে তেত্রিশ কোটী দেবতা কল্পিত হইয়াছে। আর্য্যাবর্ত্তে যত লোক বাস করিত, পৌরাণিক সময়ে প্রত্যেকেরই এক ভিন্ন উপাস্য দেবতা ছিল। সুতরাং তেত্রিশ কোটী দেবতার আবশ্যক হইয়াছিল। বেদার্থযত্ন বলেন,—'আর্য্যাবর্ত্তাতীল সাংপ্রত প্রজেচী সংখ্যা অজমাসেং বাবীস কোটী আহে।' কল্পনা-শক্তির অনুবলে তেত্রিশ কোটী দেবতার সৃষ্টি।" বিভিন্ন-রূপ চিন্তার ফলে, দেব-তত্ত্ব বিভিন্ন-রূপে পরিবর্ণিত হইয়াছে; অধিকারী অনুসারে, এক এক ভাবে এক এক দেবতা মানস-পটে প্রতিভাত হইয়াছেন। কিন্তু মূল তথ্য অনুসন্ধান করিতে গেলে কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই,—ব্রহ্ম এক; এক হইয়াও তিনি অনন্ত; তাঁহার নাম-রূপের অবধি নাই। এই বিশ্বে কোথায় তাঁহার অস্তিত্ব নাই? "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—যদি এই শাস্ত্র-বচন মানিতে হয়, জল-স্থল-মরুদ্ব্যোম সর্ব্বত্র তিনি ওতঃপ্রোত বিদ্যমান নহেন কি? তাই সংসার আপন জ্ঞান-বুদ্ধি অনুসারে তাঁহার এক এক অবস্থা কল্পনা করিয়া লয়। সে হিসাবে, তিনি এক, তিনি তিন, তিনি তেত্রিশ, তিনি তেত্রিশ কোটী, তিনি অনন্ত; তাঁহাতে সকল সংখ্যা—সকল নাম-রূপই সম্ভবপর। বেদ হইতে পুরাণাদি শাস্ত্র-সমূহে তাই আমরা দেখিতে পাই,—তিনি কখনও অগ্নিদেবতা-রূপে পূজিত হইতেছেন; তিনি কখনও বায়ুদেবতা-রূপে পূজিত হইতেছেন; তিনি কখনও ইন্দ্র-দেবতারূপে পূজিত হইতেছেন। তাই দেখিতে পাই,—দেব-মনুষ্য-পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ-স্থাবর-জঙ্গম-জড়-অজড় সর্ব্ব-রূপেই তাঁহার আরাধনা-পদ্ধতি আবহমান-কাল প্রচলিত আছে। তিনি অগ্নি, তিনি অদিতি, তিনি অশ্বিদ্বয়, তিনি আদিত্য, তিনি ইন্দ্র, তিনি উষা, তিনি গো, তিনি জল, তিনি দ্যাব্যা-পৃথিবী, তিনি দ্যু, তিনি মাধব, তিনি নভঃ, তিনি নারী, তিনি পর্য্যন্য, তিনি পর্ব্বত, তিনি পিতৃগণ, তিনি প্রজাপতি, তিনি বনস্পতি, তিনি বরুণ, তিনি বর্হি, তিনি বাগ্দেবী, তিনি বায়ু, তিনি বিশ্বকর্ম্মা, তিনি বিষ্ণু, তিনি বৃহস্পতি, তিনি ভারতী, তিনি মরুদ্গণ, তিনি মহী, তিনি যম, তিনি রুদ্র, তিনি শুক্র, তিনি সরস্বতী, তিনি সবিতা, তিনি সীতা, তিনি সিন্ধু, তিনি সূর্য্য, তিনি স্বাহা, তিনি স্বস্তি, তিনি সোম, তিনি ক্ষেত্রপতি, তিনি কালী, তিনি দুর্গা, তিনি ব্রহ্মা,—তাঁহার নাম-রূপের সংখ্যা আছে কি? সেই অসংখ্য দেব-দেবীর পরিচয় বেদ হইতে পুরাণ

* একাদশ রুদ্র,—অজ, একপাদ, অহির্বুধ্ন, পিণাকী, অপরাজিত, ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, বৃষাকপি, শম্ভু, হর ও ঈশ্বর—এই একাদশবিধ গণদেবতা-বিশেষ। অন্য মতে—অজৈকপাদ, অহির্ব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, সুরেশ্বর, জয়ন্ত, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বৈবস্বত, সাবিত্রী ও হর। মতান্তরে এ সকল নামেরও আবার বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। দ্বাদশ আদিত্য,—বিবস্বান্, অর্য্যমা, পূষা, ত্বষ্টা, সবিতা, ভগ, ধাতা, বিধাতা, বরুণ, মিত্র, শক্র, অতিতেজা বা উরুক্রম। এ বিষয়েও নানা মতান্তর। ঋগ্বেদে আদিত্য-সংখ্যা ছয়, তৈত্তিরীয়ে আট, শতপথে দ্বাদশ ইত্যাদি। অষ্ট বসু,—ভব (ধরা), ধ্রুব, সোম, বিষ্ণু, অনিল, অনল, প্রভূষ (প্রত্যূষ), প্রভব।

পর্য্যন্ত সকল শাস্ত্রে কোনও-না-কোনও সূত্রে পরিবর্ণিত আছে। যাঁহারা কোনও দেব-দেবীকে অধুনা-কল্পিত এবং কোনও দেব-দেবীকে পুরাকল্পিত বলিয়া মনে করেন, শাস্ত্র-সমূহ আলোচনা করিলে, তাঁহাদিগকে ভ্রান্ত-মতাবলম্বী ভিন্ন অন্য কিছুই বলিতে পারা যায় না। সকল দেব-দেবী—সকলেই অনাদি অনন্ত কাল হইতে বিরাজমান আছেন, অনায়াসেই তাহা প্রতিপন্ন হইতে পারে। *

অবতার-তত্ত্ব।

যেমন দেবতা অসংখ্য, তেমনি অবতার অসংখ্য। প্রধানতঃ দশ অবতারের বিষয় সাধারণ্যে প্রচারিত হইলেও, অবতারের সংখ্যা হয় না। ভগবান গীতায় বলিয়াছেন,—"পরিত্রাণায় সাধুনাম্ বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্ম্মসংস্থাপনায় চ সম্ভবামি যুগে যুগে॥" অর্থাৎ, যখনই সাধুদিগের পরিত্রাণের আবশ্যক হইয়াছে, যখনই দুর্জ্জনের বিনাশ-সাধন প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে, যখনই ধর্ম্ম-সংস্থাপনের আবশ্যক উপলব্ধি করিয়াছেন, ভগবান তখনই অবতার-রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাই যুগে যুগে তাঁহার অসংখ্য অবতারের পরিচয় পাওয়া যায়। ভগবানের যে দশ অবতারের প্রসঙ্গ বাহুল্য ভাবে প্রচারিত, সেই দশ অবতারের নাম,—মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কি। এই দশ অবতার যেখানে মান্য হইয়াছেন, সেখানে দেখিতে পাই,—সত্যযুগে মৎস্য, কূর্ম্ম বরাহ, নরসিংহ; ত্রেতাযুগে—বামন, পরশুরাম, শ্রীরামচন্দ্র; দ্বাপর যুগে—শ্রীকৃষ্ণ (মতান্তরে বলরাম); কলির প্রারম্ভে বুদ্ধ এবং কলির শেষ ভাগে কল্কি অবতার আবির্ভূত হন। † এতদ্ভিন্ন কোনও পুরাণে অবতার-সংখ্যা—চতুর্ব্বিংশ; কোনও পুরাণে দ্বাবিংশ; কোনও পুরাণে অষ্টাদশ। আবার সকল পুরাণের—সকল শাস্ত্রের সামঞ্জস্য সাধন করিতে গেলে, অবতারের সংখ্যা করা যায় না। গরুড়পুরাণে দেখিতে পাই,—'একমাত্র নারায়ণ—দেবতাদিগের ঈশ্বরেশ্বর। তিনি পরমাত্মা পরব্রহ্ম। তাঁহা হইতেই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। সেই বাসুদেব অজর এবং অমর। জগদ্রক্ষার্থ তিনি কুমারাদি নানারূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। তাঁহার প্রথম অবতারের নাম—কুমার অবতার। এই অবতারে তিনি দুশ্চর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় অবতার—বরাহ। রসাতলগতা পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার জন্য, তিনি বরাহ-বপু পরিগ্রহ করেন। দেবর্ষি—তাঁহার তৃতীয় অবতার। এই অবতারে তিনি সাত্বত-তন্ত্র বিস্তার করিয়া নিষ্কাম-কর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। চতুর্থ—নরনারায়ণ অবতার। এই অবতারে তিনি ধর্ম্মরক্ষণার্থ কঠোর তপস্যা করেন। তাহাতে সুরাসুরগণ তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। পঞ্চম—কপিল-অবতার। এই অবতারে ভগবান সাংখ্য-তত্ত্ব উপদেশ দেন। ষষ্ঠ—দত্তাত্রেয়-অবতার। অত্রি ঋষির ঔরসে অনসূয়ার গর্ভে নারায়ণ দত্তাত্রেয়-রূপে জন্মগ্রহণ করেন; এই অবতারে তিনি অলর্ককে আন্বীক্ষিকী

---

* এই বিষয় পরবর্ত্তী খণ্ডে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার চেষ্টা হইয়াছে।

† বরাহ-পুরাণ, চতুর্থ অধ্যায়, দ্বিতীয় শ্লোকে এই দশ অবতারের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। দেবী-পুরাণেও দশ অবতারের সমর্থন। জয়দেবের এবং শঙ্করাচার্য্যের শ্লোকে দশ অবতারের মহিমাই পরিকীর্ত্তিত দেখিতে পাই।

বিদ্যার উপদেশ দিয়াছিলেন। সপ্তম—যজ্ঞ নামক অবতার। আকুতির গর্ভে রুচির ঔরসে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তাঁহার জন্ম হয়। এই অবতারে ভগবান সত্যগণের ও সুরগণের যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাহাতে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর রক্ষা হইয়াছিল। অষ্টম অবতার—উরুক্রম। নাভির ঔরসে মেরুদেবীর গর্ভে ভগবান উরুক্রম নামে জন্মগ্রহণ করেন। সদাচার প্রণালী প্রদর্শন করাই, এই অবতার গ্রহণের উদ্দেশ্য ছিল। নবমে—পৃথু অবতার। এই অবতারে ভগবান মহৌষধি-রূপ দুগ্ধ দ্বারা প্রজাবর্গকে জীবিত করিয়াছিলেন। দশম—মৎস্য অবতার। এই অবতারে, চাক্ষুষ মন্বন্তরে মহাপ্রলয় কালে, বৈবস্বত মনুকে মৃণ্ময়ী নৌকায় আরোপিত করিয়া ভগবান তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। একাদশে—ভগবান কূর্ম্ম অবতারে অবতীর্ণ হন। দেব ও দানবগণ যখন একত্র মিলিত হইয়া সমুদ্র-মন্থন করেন, কূর্ম্মরূপী ভগবান তখন মন্দরাচল ধারণ করিয়া ছিলেন। দ্বাদশে—ধন্বন্তরি অবতার। ত্রয়োদশে—মোহিনী অবতার। ধন্বন্তরি অবতারে তিনি দেবতাদিগকে অমৃত-দানে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন এবং মোহিনী অবতারে মোহিনীরূপ-ধারণে তিনি অসুর-দিগকে মোহিত করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দশে—নরসিংহ অবতার। এই অবতারে তিনি নখদ্বারা দৈত্যেন্দ্র হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়াছিলেন। পঞ্চদশ—বামন-অবতার। ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা-ছলে ত্রিলোক গ্রহণ করিয়া শ্রীহরি এই অবতারে বলিকে দমন করেন এবং দেবতাদিগকে স্ব স্ব অধিকারে পুনঃস্থাপন করেন। ষোড়শে—পরশুরাম। নৃপতিগণ ব্রহ্মদ্রোহী হইয়াছিলেন দেখিয়া, কুপিত হইয়া, তিনি এই অবতারে একবিংশতি-বার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন। সপ্তদশে—ব্যাস অবতার। সত্যবতীর গর্ভে পরাশরের ঔরসে ব্যাস-রূপে অবতীর্ণ হইয়া এই অবতারে অল্পমেধা মনুষ্যগণের মুক্তির জন্য তিনি বেদ-তরুর শাখা-রূপ পুরাণাদি শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ—নরদেব অবতার। এই অবতারে দেবতাদিগের কার্য্য-নির্ব্বাহার্থ তিনি সমুদ্র নিগ্রহাদি কার্য্য করিয়াছিলেন। ঊনবিংশতি ও বিংশতি অবতারে—রাম ও কৃষ্ণ নামে ভগবান বৃষ্ণিবংশে জন্মগ্রহণ করেন। পৃথিবীর ভার-হরণ সেই দুই অবতারের উদ্দেশ্য ছিল। একবিংশতি—বুদ্ধ অবতার। কলিযুগের সন্ধ্যা প্রবৃত্ত হইলে, দেবদ্বেষীদিগের মোহনার্থ কীকট-দেশে জিন-সুত বুদ্ধ নামে আবির্ভূত হন। দ্বাবিংশতি—কল্কি অবতার। কলিযুগে, সন্ধ্যার আগমন-কালে, রাজবর্গ নষ্টপ্রায় হইলে, জগৎপতি কল্কি-নামে বিষ্ণুযশা নামক ব্রাহ্মণের ভবনে অবতীর্ণ হন।* বাস্কলাদি দৈত্য বধের জন্য ভগবান আরও যে কত অবতারে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, গরুড়পুরাণেরই অন্যত্র তাহার পরিচয় আছে।† সেই পুরাণের ভাষাতেই প্রকাশ,—"অবতারাহ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।" শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবানের যে লীলাবতার-তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, তাহাতে দেখিতে পাই,—"সেই জন্ম-রহিত আদি-পুরুষ কল্পে কল্পে আপনিই আপনার দ্বারা আপনাকে আপনাতে সৃজন ও পালন করিতে-ছেন। তিনি বিশুদ্ধ, সত্য ও জ্ঞান-স্বরূপ; সকলের অন্তর্য্যামী, সন্দেহ-রহিত ও নির্গুণ;

* গরুড়পুরাণ, পূর্ব্বখণ্ড, প্রথম অধ্যায়, দ্বাদশ হইতে ত্রয়স্ত্রিংশ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

† এই গ্রন্থের ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদে, ৩৬৯ পৃষ্ঠায়, তত্তদবতারের নাম লিখিত আছে।

তজ্জন্য তাঁহাতে গুণক্ষোভ-জনিত কোনও চাপল্য নাই। তিনি সত্য, পরিপূর্ণ, জন্ম-নাশ-রহিত, নির্গুণ এবং নিত্য অদ্বৈত। মুনিদিগের দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন নির্ম্মল হইলেই তাঁহারা তাঁহাকে ঐ রূপে জানিতে পারেন। কিন্তু কুতর্ক দ্বারা আচ্ছাদিত হইলেই তাঁহার ঐ রূপ তিরোহিত হয়। যে পুরুষ প্রকৃতির প্রবর্ত্তক, তিনিই ভগবানের প্রথম অবতার। তদ্ভিন্ন অদৃষ্ট, স্বভাব, কার্য্য ও কারণ-রূপা প্রকৃতি, মন-মহাভূত, অহঙ্কার-তত্ত্ব, গুণত্রয়, ইন্দ্রিয় সকলের সমষ্টি-ভূত বিরাট্ শরীর, বৈরাজ-পুরুষ, স্থাবর, জঙ্গম, আমি, রুদ্র, বিষ্ণু, প্রজাপতিগণ, অন্যান্য দেবর্ষিগণ, স্বর্লোকপাল, খ-লোকপাল, মনুষ্য-লোকপাল, পাতালাদিপাল, গন্ধর্ব্বপতি, বিদ্যাধরপতি, চারণপতি, যক্ষপতি, উরগপতি, নাগপতি, ঋষিশ্রেষ্ঠ, পিতৃশ্রেষ্ঠ, দৈত্যেন্দ্র, সিদ্ধেশ্বর, দানবেন্দ্র, প্রেতপতি, পিশাচপতি, ভূতনাথ, কুষ্মাণ্ডাধিপতি, যাদোনাথ, মৃগরাজ, পক্ষিরাজ, এবং লোকে যে কিছু ঐশ্বর্য্যশালী, তেজঃশালী, ইন্দ্রিয়-শক্তি-সম্পন্ন, মনঃ-শক্তি-সম্পন্ন, বলবান্, ক্ষমাবান্, শোভাশালী, সম্পত্তি-সম্পন্ন, লজ্জাশালী, বুদ্ধিমান্, অদ্ভুত বর্ণশালী, রূপ-সম্পন্ন ও বিরূপাকৃতি—সে সকলই সেই পরতত্ত্ব অর্থাৎ পরম-পুরুষ ভগবানের বিভূতি বা অবতার।" * ভাগবত এইরূপে একবিধ অবতারের পরিচয় প্রদান করিয়া, পরিশেষে ভগবানের অন্যবিধ অবতার—লীলাবতার—প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছেন। ভাগবতের মতে লীলাবতার অসংখ্য। প্রথম—বরাহ। দ্বিতীয়—সুযজ্ঞ; ত্রিলোকের মহতী পীড়া নষ্ট করিয়া স্বায়ম্ভুব মনু কর্ত্তৃক তিনি হরি-নামে অভিহিত হন। তৃতীয়—দত্ত; অত্রি মুনি পুত্ররূপে ভগবানকে পাইবার প্রার্থনা করায়, "আমি আমাকেই দান করিলাম" বলিয়া, ভগবান তাঁহার গৃহে আবির্ভূত হইয়াছিলেন; তজ্জন্যই 'দত্তাত্রেয়' নাম। যদু ও হৈহয় প্রভৃতি তৎকর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া মুক্তিলাভ করেন। চতুর্থ—সনৎকুমার; পঞ্চম—সনক; ষষ্ঠ—সনন্দ; সপ্তম—সনাতন। লোক সৃষ্টির অভিপ্রায়ে ব্রহ্মা পূর্ব্বে 'সন' অর্থাৎ অখণ্ডিত তপস্যা করিয়াছিলেন। ভগবান তাহাতে সনৎকুমারাদি চারি 'সন'-রূপে উৎপন্ন হন। পূর্ব্ব-কল্পের প্রলয়-কালে যে আত্ম-তত্ত্ব নষ্ট হইয়াছিল, 'সন'-রূপে ভগবান তাহারই উপদেশ দিয়াছিলেন। অষ্টম—নরনারায়ণ। দক্ষ-দুহিতা ও ধর্ম্ম-ভার্য্যা মূর্ত্তির গর্ভে ঐ রূপে শ্রীহরি অবতীর্ণ হন। এই অবতারে কাম-ক্রোধ-শূন্য-ভাবের বিকাশ পাইয়াছিল। নবম—ধ্রুব অবতার। তাঁহার তপস্যা-প্রভাবে ধ্রুবলোকের সৃষ্টি হয়। দশম—পৃথু। উচ্ছৃঙ্খল বেণ-রাজা ব্রহ্ম-শাপ-রূপ বজ্রে দগ্ধীভূত হইলে, ঋষিদিগের প্রার্থনায়, নারায়ণ বেণের পুত্র-রূপে অবতীর্ণ হন। সেই অবতারে পিতার উদ্ধার-সাধন করিয়া, তিনি পুত্র-নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। একাদশ—ঋষভ। অগ্নি-পুত্র নাভির ভার্য্যা সুদেবীর গর্ভে ঋষভ-রূপে অবতীর্ণ হইয়া, শান্তেন্দ্রিয় বিষয়াসক্তি-হীনতা-প্রভাবে তিনি পারমহংস্য-পদ লাভ করিয়াছিলেন। দ্বাদশ—হয়গ্রীব। এই অবতারে ভগবান অশ্ব-মস্তক ধারণ করিয়া, ব্রহ্মার যজ্ঞে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এবং তদ্দ্বারা নিখিল বেদ প্রকাশ পাইয়াছিল। ত্রয়োদশ—মৎস্য অবতার; বৈবস্বত মন্বন্তরের অবসান-কালে, প্রলয় উপস্থিত হইলে, বেদবাণী ভ্রষ্ট হয় দেখিয়া, মৎস্য-রূপী ভগবান সেই বেদবাণী লইয়া সলিল-গর্ভে

* শ্রীমদ্ভাগবত, দ্বিতীয় স্কন্ধ, ষষ্ঠ অধ্যায়, ৩১শ হইতে ৪৪শ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

অবস্থান করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ—কূর্ম্ম-অবতার ; মন্দর পর্ব্বত ধারণ করিয়া, ভগবান সমুদ্র-মন্থনে দেবগণের সহায়তা করিয়াছিলেন। পঞ্চদশ—নৃসিংহ অবতার ; এই অবতারে নখ-দ্বারা হিরণ্যকশিপুকে ভগবান নিমেষ-মধ্যে বধ করিয়াছিলেন। যোড়শ—বামন-অবতারে, ভগবান, দৈত্যরাজ বলিকে পাতালে প্রেরণ করেন। সপ্তদশ—ধন্বন্তরি-অবতারে, ভগবান, ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের রোগ-নাশ করিয়াছিলেন ; এই অবতারেই ভগবান আয়ুর্ব্বেদ অনুশাসন করিয়া যান। অষ্টাদশ—পরশুরাম-অবতার। ঊনবিংশ অবতার—শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতি ভ্রাতৃ-চতুষ্টয়। বিংশ—শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম অবতার। এই অবতারে ভগবান বহু দৈত্য-দানবের সংহার-সাধন করিয়া, পৃথিবীর ভার লাঘব করেন। একবিংশ—বুদ্ধ অবতারে অসুরদিগের বুদ্ধির ভ্রম-সাধন ও লোভ-উৎপাদন জন্য পাষণ্ড-বেশে তাহাদিগকে নানা উপধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছিলেন। দ্বাবিংশ—কল্কি-অবতার। 'কলিযুগের শেষ-ভাগে যখন সাধুদিগের আলয়েও হরি কথা হইবে না ; যখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ নাস্তিক হইয়া উঠিবে ; যখন শূদ্রেরা রাজ্যশাসন করিবে ; এবং যখন স্বাহা, স্বধা ও বষট্‌কারবাণী শুনা যাইবে না ; ভগবান তখন কল্কি-রূপে অবতীর্ণ হইয়া কলির শাসন করিবেন। এই সকল ভিন্ন শ্রীমদ্ভাগবতে কপিলদেবও ভগবানের অবতার বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছেন। মনু-দুহিতা দেবহূতির গর্ভে কর্দ্দম প্রজাপতির ঔরসে তাঁহার জন্ম হয়। বিশেষ-রূপে সাঙ্খ্য-জ্ঞান উপদেশ দিবার জন্য পরব্রহ্ম স্বয়ং-ভগবান কপিলরূপে সত্ত্ব-অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের এই অবতার-তত্ত্ব আলোচনা করিয়া, সৃষ্টি-কর্ত্তার স্বরূপ-তত্ত্ব এবং অবতার-রূপে সংসারে তাঁহার আবির্ভাবের বিষয়, বিশদভাবে উপলব্ধি হইতে পারে। পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিতে গেলে, অবতারের সংখ্যা হয় না ; ভগবানের মহিমারও সীমা পাওয়া যায় না। অনুসন্ধিৎসু দেখিতে পান,—"কার্য্য-কারণ-স্বরূপ সমুদায় বস্তুই সেই কারণ-রূপী নারায়ণ ভিন্ন আর কিছুই নহে।" শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে (তৃতীয় অধ্যায়ে) এই অবতার-তত্ত্ব রূপান্তরে পরিবর্ণিত আছে। সেখানে দেখিতে পাই,—'সেই বিরাট্‌ পুরুষ ভগবান সকল অবতারের অক্ষয় বীজ-স্বরূপ। তাঁহারই অংশ দ্বারা দেবতা, পশু, পক্ষী ও মনুষ্যাদি-রূপ নানাবিধ অবতারের সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি প্রথমে বিরাট্‌ পুরুষ রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। পশ্চাৎ কৌমার নামক সৃষ্টি অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ-রূপে অবতীর্ণ হন। এই অবতারে তিনি জগৎকে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দিয়াছিলেন।' সেখানে ভগবানের একবিংশ অবতারের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। এই অংশে লিখিত আছে—নারদ বৈষ্ণব-তন্ত্র প্রচার করেন ; দত্তাত্রেয়—অলর্ক ও প্রহ্লাদাদির নিকট আত্ম-তত্ত্ব উপদেশ দেন ; রুচির ঔরসে আকুতির গর্ভে যজ্ঞ অবতারে এবং গয়া-প্রদেশে অঞ্জনের পুত্র বুদ্ধ অবতারে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানেও লিখিত আছে,—"অবতারাহ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ। যথাবিদাশিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ॥" অর্থাৎ, 'অবতার অসংখ্য। যেমন কোনও এক অক্ষয় জলাশয় হইতে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলপ্রবাহ নির্গত হইয়া দিকে দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ সত্ত্বনিধি একমাত্র পরমেশ্বর হইতে বিবিধ অবতারের উৎপত্তি হইয়া থাকে। অবতারদিগের মধ্যে কেহ ভগবানে অংশ, কেহ বা বিভূতি।'

ভারতবর্ষের ইতিহাসে ব্রাহ্মণ সর্ব্বোচ্চ পর্য্যায়ে অবস্থিত। যত দিন চন্দ্র-সূর্য্য, যত দিন পৃথিবীর অস্তিত্ব, যত দিন বেদ-বেদাঙ্গ শাস্ত্রগ্রন্থ,—ব্রাহ্মণ সেই অনন্ত কাল হইতেই মনুষ্য-সমাজে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছেন। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে

ব্রাহ্মণ-প্রসঙ্গ। পুরুষ-সূক্তে দৃষ্ট হয়,—ব্রাহ্মণ পরম পুরুষের মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। * পুরাণের সর্ব্বত্রই তাহার সমর্থন। ঋগ্বেদেরও কেবল এক স্থানে নহে,—ঋগ্বেদের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ব্রাহ্মণের পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বিতীয় মণ্ডলের ত্রিচত্বারিংশ সূক্তের দ্বিতীয় ঋকে ব্রহ্ম-পুত্রের উল্লেখ আছে। সেখানে, ব্রহ্মপুত্র—ব্রাহ্মণ অর্থেই প্রযুক্ত বলিয়া বুঝা যায়। প্রথম মণ্ডলের চতুঃষষ্ট্যধিক শততম সূক্তের চতুঃপঞ্চাশ ঋকে ব্রাহ্মণের পরিচয়ে দেখিতে পাই,—'বাক্ চারি প্রকার। মেধাবী ব্রাহ্মণগণের তাহা অধিগত। সাধারণ মনুষ্যগণ কেবল এক প্রকার ভাষা মাত্র অবগত আছেন।' অর্থাৎ, ব্রাহ্মণগণ বেদ-বেদান্ত পারদর্শী; অন্য বর্ণ একমাত্র ভাষাভাষী। ষষ্ঠ মণ্ডলের পঞ্চ-সপ্ততি সূক্তের দশম ঋকে ব্রাহ্মণগণ দেবতারূপে সম্পূজিত হইতেছেন। সেই ঋকে ঋষি প্রার্থনা করিতেছেন,—'হে ব্রাহ্মণগণ! হে পিতৃগণ! হে সৌম্যগণ! আপনারা এবং পাপরহিতা দ্যাব্যা-পৃথিবী আমাদের মঙ্গল করুন।' সপ্তম মণ্ডলের ত্র্যধিক শততম সূক্তের প্রথম ঋকে 'ব্রাহ্মণাঃ' শব্দ দৃষ্ট হয়। বসিষ্ঠ ঋষি সেখানে মণ্ডুক দেবতার স্তোত্রে বলিতেছেন,—'সম্বৎসর ব্রতচারী ব্রাহ্মণদিগের ন্যায়, সম্বৎসর শয়ান থাকিয়া, মণ্ডুকগণ পর্য্যন্যদেবের প্রীতিবাক্য উচ্চারণ করিতেছেন।' দশম মণ্ডলের ষোড়শ সূক্তে ষষ্ঠ ঋকে, এক সপ্ততিতম সূক্তের অষ্টম ঋকে এবং নবতিতম সূক্তের দ্বাদশ ঋকেও এই 'ব্রাহ্মণ' শব্দ দৃষ্ট হয়। সেই তিনটী সূক্তের মর্ম্মার্থ; -(১) "সোম দেবতা ব্রাহ্মণদিগের শরীরে প্রবেশ করেন"—এই কথা বলিয়া ঋষি রোগমুক্তির কামনা জানাইতেছেন। (২) "যখন অনেক ব্রাহ্মণ একত্র হইয়া মনের ভাবসমূহ হৃদয়ে আলোচনা পূর্ব্বক অবধারিত করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন কোনও কোনও ব্যক্তির কিছুই জ্ঞান লাভ হয় না।" অর্থাৎ, ব্রাহ্মণগণের শাস্ত্রালোচনার মর্ম্মার্থ অন্য বর্ণ সকল সময় বুঝিতেও সমর্থ হন না। (৩) "বিরাট্ পুরুষের দেহ হইতে কোন্ বর্ণের কি প্রকারে উৎপত্তি হয়, অর্থাৎ তাঁহার মুখ ব্রাহ্মণ হইল, দুই বাহু রাজন্য হইল, উরু বৈশ্য হইল, দুই চরণ শূদ্র হইল"—এইরূপ লিখিত আছে। বেদাদি শাস্ত্রের আলোচনায় আরও প্রতিপন্ন হয়,—"ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞসম্পাদক, সোমপায়ী ও জাতবিদ্য প্রভৃতি গুণ-সম্পন্ন ছিলেন। ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বত্র মান্য-গণ্য এবং পূজনীয় হইতেন। ধনী ব্যক্তিরা এবং নৃপতিগণ সর্ব্বদা দানাদি দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে পরিতুষ্ট করিতেন। সুদাস, পাকস্থমন্, তুর্ব্বসু, চেদিবংশীয় কশু, পুরুকুৎস, ত্রসদস্যু প্রভৃতি রাজগণ ব্রাহ্মণগণকে ধন-দান করিতেন। ব্রাহ্মণেরা রাজগণের মঙ্গল-সাধনের নিমিত্ত দেবগণের অর্চ্চনা করিতেন। ব্রাহ্মণগণ সর্ব্ব-বিদ্যার আধার ছিলেন। তাঁহারা মনুষ্য ও দেবগণের মধ্যস্থলীয়। দেবগণের প্রীতি-সাধন করিতে হইলে, ব্রাহ্মণগণের আশ্রয় লইতে হইত। ব্রাহ্মণদিগের সাহায্যে দেবগণের অর্চ্চনা হইতে পারিত। সুতরাং ব্রাহ্মণদিগের এত অধিক গৌরব ও সম্মান ছিল।"

* এই গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদ, [illegible] পৃষ্ঠা এবং ঋগ্বেদ দশম মণ্ডলের ৯০ম সূক্তের দ্বাদশ ঋক দ্রষ্টব্য।

ব্রাহ্মণ, সেই পরম পুরুষের মুখ ছিলেন; রাজন্য—বাহু ছিলেন; বৈশ্য—উরু ছিলেন; শূদ্র পুরুষের পদ হইতে জাত হইয়াছিলেন। বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন-রূপে এই শাস্ত্রোক্তির তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। ঋগ্বেদের আলোচনায় ব্যাখ্যাকার বলিয়াছেন,—"ইহার প্রকৃত অর্থ এই যে, ব্রাহ্মণেরা সকলের মান্য এবং পূজ্য ছিলেন। রাজন্যগণ সকলের রক্ষক ছিলেন এবং বৈশ্যগণ বাণিজ্য-ব্যবসাদি দ্বারা সকলের ধারক ছিলেন। ব্রাহ্মণেরা সকলের পূজ্য ছিলেন বলিয়া পুরুষের মুখ-স্বরূপ। রাজন্যেরা সকলের পালক ও রক্ষক ছিলেন বলিয়া, পুরুষের বাহু-স্বরূপ। বৈশ্যেরা ব্যবসায়ী বলিয়া উরু-স্বরূপ ছিলেন। শূদ্রেরা সকলের নিয়ন্থ ছিলেন বলিয়া, পুরুষের পাদ-স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছেন।" * যাহা হউক, যে কারণেই হউক, ব্রাহ্মণের প্রাধান্য বেদে, পুরাণে,—সর্ব্বশাস্ত্রে সমভাবে পরিকীর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে। শিবপুরাণে দেখিতে পাই,—দেবদেব মহাদেব পার্ব্বতীর নিকট ব্রাহ্মণ-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া বলিতেছেন,—"ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বর্গ ব্রাহ্মণগণেই প্রতিষ্ঠিত। ব্রাহ্মণগণই যজ্ঞ, হোম এবং হবিঃ; দেবগণ তদ্দ্বারাই তৃপ্তি লাভ করেন। ব্রাহ্মণ-হিতেই সমগ্র জগৎ প্রতিষ্ঠিত। জন্মই ব্রাহ্মণ-সংজ্ঞার হেতু। সংস্কার (উপনয়ন) — দ্বিজ-সংজ্ঞার কারণ; বিদ্যা — বিপ্র-নামের মূল। সুতরাং ব্রাহ্মণ ত্রিবিধ।......যে ব্রাহ্মণ বেদবেত্তা এবং বহ্নি-হোম-পরায়ণ, তিনিও শ্রেষ্ঠ; পূজিত হইলে তিনিও নিস্তার করিতে সক্ষম। যে ব্যক্তি মাত্র জন্মতঃ ব্রাহ্মণ, তাঁহারও সর্ব্ব-বিষয়ের পূরণে সামর্থ্য আছে; তিনিও লোক-গুরু। তিনিও পূজিত হইলে পুণ্য-দানে সমর্থ। অগ্নিহোত্র, তপস্যা, যোগ, শৌচ, ঋজুতা, সত্য এবং বেদানুশীলনই ব্রাহ্মণগণের কর্ম্ম। ব্রাহ্মণ মিথ্যা কথা বলেন না; ব্রাহ্মণ প্রাণি-হত্যা করেন না; ব্রাহ্মণ পর-সেবা করেন না; ব্রাহ্মণ পাপ করেন না; প্রকৃত ব্রাহ্মণের পুনর্জ্জন্ম হয় না। অতি ক্লিষ্ট ব্রাহ্মণেরাও শুভাশুভ বিতরণে সমর্থ।" ব্রাহ্মণ-মাহাত্ম্যের কথা অধিক আর কি বলিব? শাস্ত্রে আছে,—ভৃগু মুনি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও মহেশ্বরের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, তাহার পরীক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া, ব্রহ্মার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন না করায়, ব্রহ্মা তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া-

---

* যে পুরুষ-সূক্তে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদির এইরূপ উৎপত্তি বিবরণ লিখিত আছে, পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন পণ্ডিতগণ তাহার আধুনিকত্ব প্রমাণের জন্য বিশেষরূপ যত্নবান। রমানাথ সরস্বতী বলেন,—'উক্ত পুরুষ-সূক্ত অপেক্ষাকৃত আধুনিক সূক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ। উহা বৈদিক সময়ের চরম-কালে রচিত হইয়াছিল। বেদ সূক্তের প্রাচীনত্ব এবং নূতনত্ব জানিবার বিশেষ লক্ষণ আছে। যে সকল সূক্ত পাঠ করিলেই ভাব সরল, ভাষা সরল ও রীতি সরল বলিয়া বোধ হয় এবং স্বাভাবিক বাক্য-স্ফুরণ বলিয়া প্রতীত হয়, সেই সকল প্রাচীন সূক্ত। আর যে সকল সূক্ত পাঠ করিয়া চিন্তাশীলতার পরিচয়, যজ্ঞ-বাহুল্যের কথা, ভাবের নবীনত্ব এবং ভাষার নব্যত্ব দেখা যায়; সে সমস্তই অপেক্ষাকৃত নূতন সূক্ত। বিচার্য্যমান পুরুষ সূক্তে ভাষার আধুনিকত্ব, ভাবের নূতনত্ব এবং রীতির নব্যত্ব দৃষ্ট হয়। অতএব ইহা প্রাচীন সূক্ত নহে; শেষ সময়ে রচিত।" রমেশচন্দ্র দত্ত বলেন,—"ঋগ্বেদ রচনাকালের অনেক পর এই অংশ রচিত হইয়া, ঋগ্বেদের ভিতর প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে,—তাহার সন্দেহ নাই। ঋগ্বেদের অন্য কোনও অংশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চারি জাতির উল্লেখ নাই। এই শব্দগুলি কোনও স্থানে শ্রেণী-বিশেষ বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হয় নাই। ব্যাকরণবিৎ পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই ঋকের ভাষাও বৈদিক ভাষা নহে। ভাষা—অপেক্ষাকৃত আধুনিক সংস্কৃত। জাতি-বিভাগ-প্রথা ঋগ্বেদের সময় প্রচলিত ছিল না। ঋগ্বেদে এই কু-প্রথার একটী প্রমাণ সৃষ্টি করিবার জন্য এই অংশ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।" আমরা ঐ সকল কথা স্বীকার করি না। এতৎসম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উক্ত হইয়াছে। (এই গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদ এবং একত্রিংশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।)

ছিলেন। মহাদেবের নিকট গমন করিয়া, তাঁহারও প্রতি বিশেষ-রূপ সম্মান প্রদর্শন না করায়, তিনিও মুনিবরের প্রতি রুষ্ট হন। অবশেষে স্তব-স্তুতিতে তাঁহাদের ক্রোধ-শান্তি করিয়া, ভৃগু-মুনি বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হন। বিষ্ণু তখন নিদ্রিত ছিলেন। মুনি তাঁহার বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিয়া, তাঁহার নিদ্রা-ভঙ্গ করেন। তাহাতে রুষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, বিষ্ণু জাগরিত হইয়া, মুনিবরের চরণ-সেবায় প্রবৃত্ত হন; বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিয়া মুনিবর ব্যথা পাইয়াছেন বলিয়া, বিষ্ণু বড়ই সঙ্কুচিত হন। এইরূপে ব্রাহ্মণ-ভক্তির নিমিত্তই বিষ্ণুর প্রাধান্য কীর্ত্তিত হয়। সেই হইতে ভৃগু-পদ-চিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়া, বিষ্ণু আপনাকে ধন্য বলিয়া মনে করেন। সেই হইতেই বিষ্ণু সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ; সেই হইতেই বিষ্ণু ব্রাহ্মণেরও উপাস্য। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ-মাহাত্ম্য আরও কত স্থলে কত রূপে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা হয় না। ব্রাহ্মণের জন্ম, ব্রাহ্মণের কর্ম্ম, ব্রাহ্মণের সম্মান, ব্রাহ্মণের আসন এবং ব্রাহ্মণের পাণ্ডিত্য-সম্বন্ধে প্রায় সকল শাস্ত্রেই কিছু-না-কিছু উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে,—'ব্রাহ্মণ কর্ম্ম-ফলে ব্রাহ্মণ-কুল-জাত হইয়া স্বধর্ম্ম-পরায়ণতা ও শুদ্ধাচার-সহকারে ব্রহ্ম-চিন্তা করেন বলিয়াই ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হন।' * কল্কিপুরাণে ব্রাহ্মণের লক্ষণ-বর্ণন-প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে,—'যিনি ব্রাহ্মণদিগের বিবরণ শ্রবণ করেন, তাঁহার সকল পাপ ধ্বংস হয়। স্বর্গ ব্রাহ্মণদিগের হস্তেই আছে; কারণ, তাঁহাদের বাক্যে বেদ, হস্তে হব্য, গাত্রে সমুদয় তীর্থ ও ধর্ম্মানুরাগ এবং নাভিতে ত্রিগুণা প্রকৃতি বিদ্যমান। ব্রাহ্মণেরা ভূদেব। ইত্যাদি।' † পদ্মপুরাণ স্বর্গ-খণ্ডেও ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে এবং ব্রাহ্মণের লক্ষণ লিখিত আছে। সে লক্ষণ,—"ক্ষমা, দয়া, বিজ্ঞান (শিল্প-শাস্ত্রাদি জ্ঞান), সত্য, দম (বহিরিন্দ্রিয় নিগ্রহ), সম (অন্তরিন্দ্রিয় নিগ্রহ), আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান, জ্ঞান (ব্রহ্ম-জ্ঞান), —এই সকলই ব্রাহ্মণের লক্ষণ।" ‡ কূর্ম্মপুরাণে ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য-তত্ত্ব বিশদ-ভাবে পরিবর্ণিত। § মহাভারতে মোক্ষ-ধর্ম্ম এবং দান-ধর্ম্ম কথন প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব পরিকীর্ত্তিত। ব্রাহ্মণের গৌরব সম্বন্ধে অধিক উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনিই ব্রাহ্মণ; যাঁহার সাহায্যে ব্রহ্মের সমীপস্থ হওয়া যায়, তিনিই ব্রাহ্মণ। ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া, ব্রাহ্মণ আজি পর্য্যন্ত আপনার প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। ব্রাহ্মণের সে পর্য্যায়-ভঙ্গ কখনও হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

ঋষি-প্রসঙ্গ।

যেমন ব্রাহ্মণগণ, তেমনি ঋষিগণ;—উভয়ের মধ্যে যেন এক অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বিদ্যমান। 'ঋষি'-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ আলোচনা করিলেও নৈকট্য সম্বন্ধ প্রতীত হয়। ঋষি (ঋষ্ গমন করা অথবা দৃশ্ দর্শন করা + ই), অর্থাৎ যিনি সাংসারিক সুখ ত্যাগ করিয়া জ্ঞান-পথে গমন করিয়াছেন; যাঁহা হইতে বিদ্যা, তপঃ ও শ্রুতি এই সকল সম্যক্-রূপ নিরূপিত হয়; যিনি পরমার্থে সম্যক্ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া সর্ব্বতোভাবে পরোপকার করেন;—তিনিই ঋষি-পদ-বাচ্য। প্রথমে ব্রাহ্মণই ঋষি-পদ-বাচ্য ছিলেন; ক্রমশঃ কর্ম্মগুণে কোনও কোনও ক্ষত্রিয়ও ঋষি-সংজ্ঞা লাভ করিয়াছিলেন।

---

* ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, গণেশ-খণ্ড, পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়। † কল্কিপুরাণ, প্রথমাংশ, চতুর্থ অধ্যায়, ১৪শ হইতে ১৬শ শ্লোক। ‡ পদ্মপুরাণ, স্বর্গ-খণ্ড, সপ্তবিংশ অধ্যায়, ২০শ শ্লোক। § কূর্ম্মপুরাণ, চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

ঋষি প্রধানতঃ সপ্তবিধ—শ্রুতর্ষি, কাণ্ডর্ষি, পরমর্ষি, মহর্ষি, রাজর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি। শ্রুতর্ষি; যথা—সুশ্রুতাদি। কাণ্ডর্ষি; যথা—জৈমিনি আদি। পরমর্ষি; যথা—ভেল ইত্যাদি। মহর্ষি; যথা—ব্যাসাদি। রাজর্ষি—ইহাঁরা রাজা হইয়াও ঋষির ন্যায় আচরণ করেন; যেমন—বিশ্বামিত্র, জনক প্রভৃতি। ব্রহ্মর্ষি—ব্রহ্ম-তত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত ঋষিগণ; যেমন—বশিষ্ঠাদি। দেবর্ষি—ইহাঁরা দেবতার ন্যায় মান্য; যেমন—নারদ, তুম্বুরু প্রভৃতি। তবেই বুঝা যায়, ব্রাহ্মণগণও ঋষি-পর্য্যায়ে গণ্য ছিলেন এবং ক্ষত্রিয়গণও কর্ম্ম-ফলে ঋষি-মধ্যে পরিগণিত হইতেন। ঋষিগণের মধ্যে মন্বন্তর অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন সাত জনের 'সপ্তর্ষি' সংজ্ঞা হইত। * ঋষিগণের নামানুসারেই গোত্রের প্রবর্ত্তনা। ক্ষত্রিয় নৃপতিগণের পরিচয়-প্রসঙ্গে তাঁহাদের যেরূপ বংশ-লতা প্রদত্ত হইয়াছে, অনুসন্ধান করিলে ঋষিগণেরও সেইরূপ বংশ-লতা প্রাপ্ত হওয়া যায়। † ক্ষত্রিয় নৃপতিগণের বংশ-লতায় কর্ম্ম গুণে কেহ যেমন ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছেন এবং কর্ম্ম-বৈগুণ্যে কেহ যেমন যবনাদি নীচ জাতিতে পরিণত হইয়াছেন, ঋষি-বংশের বংশ-লতা আলোচনায়ও তাঁহাদের বংশধরগণের তদ্রূপ উন্নতি ও অধোগতির পরিচয় পাওয়া যায়। সেই বংশধরগণের মধ্যেও কেহ বা দেবত্ব-ব্রাহ্মণত্বের অধিকারী হইয়াছেন; কেহ বা, নিম্ন-পর্য্যায়ে অধঃপতিত হইয়াছেন। প্রধানতঃ ভৃগ্বাদি মহর্ষি-সন্তানগণ বিপ্র-পর্য্যায়-ভুক্ত হইয়াছিলেন। মহর্ষি ভৃগুর—ভুবন, ভৌবন, সুজন্য, সুজন, ক্রতু, বসু, মূর্দ্ধা, ত্যাজ্য, বসুদ, প্রভব, অব্যয় এবং দক্ষ—এই দ্বাদশ পুত্র দেবতা বলিয়া পরিচিত। ভৃগু-পুত্র চ্যবন ও আপ্নুবান; আপ্নুবানের পুত্র ঔর্ব্ব, ঔর্ব্বের পুত্র জমদগ্নি; ইহাঁরা বিপ্র-পর্য্যায়ভুক্ত। ঔর্ব্বই ভৃগু-বংশীয়দিগের গোত্র-প্রবর্ত্তক। মহর্ষি অঙ্গিরারও দশটী দেব-পুত্র এবং সাতটী ঋষি-পুত্র। অত্রি-বংশে কর্দ্দমায়ণ ও সারায়ণ দুই শাখা। মরীচির পুত্র—কশ্যপ; কশ্যপ-বংশীয় গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষির সংখ্যাও অনেক। বশিষ্ঠ-বংশজ বিপ্রগণের এবং অগস্ত্য-বংশোৎপন্ন দ্বিজগণের গোত্র এবং বংশ-পর্য্যায়ও অসংখ্য। এই সকল মহর্ষিগণের এবং তাঁহাদের বংশধরগণের গোত্রানুসরণ করিয়াই আজি পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণগণ আপনাদের পরিচয় দিয়া থাকেন। এদিকে আবার, ক্ষত্রিয়াদি বংশেও পূর্ব্বোক্ত ঋষিগণের গোত্রের পরিচয় কোথাও কোথাও পাইয়া থাকি। যাঁহারা স্বভাবতঃ ধর্ম্মপ্রবণ, যাঁহারা স্বভাবতঃ ভগবদ্ভক্ত, যাঁহারা স্বভাবতঃ নিষ্কাম-কর্ম্ম-প্রবণ, তাঁহারাই প্রধানতঃ ঋষি-পদ-বাচ্য ছিলেন। এখন যেমন সন্ন্যাসাশ্রমে ব্রাহ্মণেতর অন্য বর্ণও বিশেষ বিশেষ অবস্থায় অধিকারী, ক্ষত্রিয়াদিও সেইরূপ বিশেষ বিশেষ অবস্থায় পুরাকালে ঋষি-সংজ্ঞা লাভ করিতে সমর্থ হইতেন। সে হিসাবে, ঋষি-সংজ্ঞা—উপাধি-বাচক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জনকাদি রাজগণ—কি জ্ঞানে, কি ত্যাগ-স্বীকারে, কি পুণ্য লাভ করিয়া, রাজর্ষি-পদ-বাচ্য হইয়াছিলেন,—পুরাণেতিহাসে তাহার পরিচয় পাঠ করিলে অনায়াসেই ঋষি-তত্ত্ব উপলব্ধি হইবে। ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি, রাজর্ষি প্রভৃতি ঋষি-সংজ্ঞা কর্ম্ম-গুণে লাভ হইত,—ঋষি-তত্ত্ব আলোচনা করিলে, তদ্বিষয় সহজেই বোধগম্য হইতে পারে।

* এই গ্রন্থের ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে, ৩৪০ পৃষ্ঠায়, সপ্তর্ষি বিবরণ দ্রষ্টব্য।

† মৎস্যপুরাণ, ১৯৫ম অধ্যায় হইতে ২০৩ম অধ্যায়ে ঋষি বংশের বিবরণ বর্ণিত আছে।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বানুস্মৃতি।

[আভাস মাত্র,—অণু ও অনন্তের তুলনা ;—ভারতের ধর্ম্ম,—উদার বিশ্বজনীন ভাব ;—ভারতের সমাজ,—সঙ্কীর্ণ বা একদেশদর্শী নহে ;—পাপ-পুণ্য, ভাল-মন্দ—দুই দৃশ্যই পরিদৃশ্যমান ;—বৈদিক যুগ-প্রসঙ্গ,—"বৈদিক যুগ" অনির্দ্দিষ্ট ;—বৈদিক মন্ত্র,—মন্ত্রের অনাদিত্ব ;—গায়ত্রী ও বিশ্বামিত্র ;—জাতিভেদ-তত্ত্ব,—বিবাহ-প্রসঙ্গ,—সামাজিক আচার-ব্যবহার,—সমরণাদির ;—জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি,—আয়ুর্ব্বেদ ;—সর্ব্ব-বিষয়ে ভারতের উন্নতির পরিচয়,—পৃথিবীর গোলত্ব ও গতি প্রভৃতির প্রসঙ্গ ;—বিবিধ,—প্রাচীন আর্য্যগণের পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশে গতিবিধি,—তাঁহাদের যান-বাহনাদি ;—উপসংহার।]

ক্ষুদ্র ঘটে অনন্ত আকাশের অংশ-মাত্র উপলব্ধি করিয়াই মানুষ আকাশের পরিচয় দিতে প্রয়াস পায়। গোষ্পদে জল-বিন্দু দেখিয়াই মানুষ মহা-সমুদ্রের মহিমা স্মরণ করে।

আভাস-মাত্র।

অনন্তকালের অনন্ত ইতিহাসের আভাস-মাত্র পাইয়াই মানুষ পুরাতত্ত্ব-আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়। অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ ; কর্ম্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ ; অথচ, আলোচ্য-বিষয়—অসীম, অনন্ত। ঘটাকাশে অনন্ত আকাশ কল্পিত হইলে, অথবা গোষ্পদে মহা-সমুদ্রের মহিমা বুঝাইবার চেষ্টা করিলে, তাহাতে যেমন আকাশের বা মহা-সমুদ্রের অনন্তত্ব বোধগম্য হওয়া দুরূহ ; ক্ষুদ্র গ্রন্থের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে ভারতবর্ষের অনন্তকালের অনন্ত ইতিহাসের পরিচয় দেওয়াও তদ্রূপ দুরাকাঙ্ক্ষা মাত্র ;—একরূপ অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কত কালের কত পরিবর্ত্তনে, কত আচার-ব্যবহারও কত রীতি-নীতি, কত প্রকারে উদ্ভূত ও বিলুপ্ত হইয়াছে,—কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? পৃথিবীতে এমন কিছু নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয় নাই বা হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়াও মনে হয় না,—প্রাচীন ভারতে যাহার অভ্যুত্থান ও তিরোধান না হইয়াছে! আমরা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি, এমন কোনও নূতন চিন্তা নূতন ভাব কোনও দেশে কখনও বিকশিত হয় নাই,—ভারতবর্ষের পুরাবৃত্তে যাহার বীজাঙ্কুর দেখিতে না পাই।

ধর্ম্ম—ভারতবর্ষে পূর্ণ প্রস্ফুট হইয়াছিল। ভারতবর্ষের ধর্ম্ম-তরুর যে শাখা-পল্লব-ফল-পুষ্প উদ্গত হয়, তাহাই এখন পৃথিবীর চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। ধর্ম্মের

ভারতের ধর্ম্ম।

কোন্ অঙ্গ ভারতবর্ষে দেখিতে না পাই? অধিকারি-ভেদে ধর্ম্ম-তত্ত্ব কত ভাবেই ভারতবর্ষে বিকশিত! একেশ্বর-বাদ—ভারতবর্ষে ; আবার নিরীশ্বর-বাদ—সেও ভারতবর্ষে। ভারতবর্ষই শিক্ষা দিতেছেন,—জগদীশ্বর সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত ; আবার ভারতবর্ষেই দেখিতে পাই,—এক জন অন্য জনকে স্পর্শ করিতেও সঙ্কুচিত। নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনা—ভারতবর্ষই প্রথম শিক্ষা দেন ; আবার সাকার-মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া ভগবদারাধনার শিক্ষাও ভারতবর্ষেই দেখিতে পাই। যিনি যে চক্ষে যে ভাবে দৃষ্টি করিবেন, তিনি সেই চক্ষে সেই ভাবের চিত্রই দেখিতে পাই-বেন। সর্ব্ব প্রাণী—সর্ব্ব জীব, কর্ম্মানুসারে আপন গতি-মুক্তির পথ প্রাপ্ত হইবে,—ভারতের ধর্ম্ম কেমনি সার্ব্ব-জনীন উদার-ভাবে পরিপুষ্ট। ভারতের কোনও ধর্ম্মের কোনও ভাবের

অভাব নাই ; ভারতের ধর্ম্মে সকলের জন্য সকল পথই প্রদর্শিত হইয়াছে। পণ্ডিত হউন, মূর্খ হউন, সদাচারী হউন, কদাচারী হউন, পাপী হউন, পুণ্যবান হউন,—ভারতের ধর্ম্মে সকলেরই স্থান আছে ; ভারতের ধর্ম্ম, দেব-মানব-যক্ষ-রক্ষ-পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ—সর্ব্বভূত সর্ব্ব-প্রাণীর পথ নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছেন।

ধর্ম্মে যেমন উদার বিশ্বজনীন ভাব—সমাজও সেইরূপ সাম্য-সূত্রে সংগ্রথিত! সমাজে অধিকারি-ভেদে কর্ম্ম-ব্যবস্থা। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র,—সমাজ কি সুন্দর স্তর-পর্য্যায়ে অবস্থিত। অদৃষ্ট, কর্ম্মফল, বা পরলোক,—ভারতবর্ষের সমাজ-ধর্ম্মের সুশৃঙ্খলার মূলীভূত। অদৃষ্ট-বশে ব্রাহ্মণাদি-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয় এবং ইহজন্মের কর্ম্মানুসারে পরজন্মে উচ্চ-নীচ গতি প্রাপ্ত হইতে হয়,—এ শিক্ষা জগতের কোনও দেশে কোনও জাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই শিক্ষার ফলেই অদৃষ্টবাদী হিন্দু অপরের প্রতি ঈর্ষা-পরায়ণ নহে। এই শিক্ষার ফলেই ধীর-স্থির-ভাবে সে আপন কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া যায়। ভাষা-শিক্ষার প্রথম সোপান যেমন বর্ণ-জ্ঞান ; বর্ণ-জ্ঞানের পর প্রথম শিক্ষা দ্বিতীয় শিক্ষা প্রভৃতির অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া, মনুষ্য ক্রমশঃ যেমন গ্রন্থাদি পাঠে সমর্থ হয় ; সেইরূপ, এক এক বর্ণ আপন-আপন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া, উচ্চবর্ণের সামীপ্য-লাভে অধিকারী হইয়া থাকে। তাহাতে এ জন্মে যিনি শূদ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, পরজন্মে হয় তো তিনি ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে পারেন ; আবার ইহজন্মে যিনি ব্রাহ্মণত্ব লাভে সমর্থ হইয়াছেন, কর্ম্মবৈগুণ্যে পরজন্মে তিনিই হয় তো চণ্ডাল হইতে পারেন। যাঁহারা বলেন,—হিন্দুর শাস্ত্র এবং হিন্দুর সমাজ-পদ্ধতি এক-দেশ-দর্শিতা দোষ-দুষ্ট, তাঁহারা নিশ্চয়ই জন্মান্তর-তত্ত্ব উপলব্ধি করেন নাই ; তাঁহারা কেবল সমাজ-বিশেষের বা ব্যক্তি-বিশেষের ভ্রান্ত ক্রিয়া-কলাপ দর্শন করিয়াই মূল-তত্ত্বে দোষারোপ করিয়া থাকেন। যে সমাজের, যে ধর্ম্মের মূল-ভিত্তি—ইহজন্মের মনুষ্য পরজন্মে কৃমি-কীট হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে পারে এবং ইহজন্মের অন্ত্যজ প্রাণিরও পরজন্মে দেবত্ব-লাভ সম্ভবপর ;—সে অদৃষ্ট-ফল-শাসিত সমাজ অপরের প্রতি কি কখনও ঘৃণা বা তাচ্ছিল্য ভাব প্রকাশ করিতে পারে? আজ যিনি দেব-পর্য্যায়ে অবস্থিত ; কর্ম্মফলে কাল তিনি চণ্ডালত্ব লাভ করিতে পারেন ; আবার, আজ যিনি চণ্ডাল আছেন, কর্ম্মগুণে কাল তাঁহার দেব-সম্মান অসম্ভব নহে ;—ইহার অধিক সাম্য-ভাব আর কি হইতে পারে? তবে যে পর্য্যায়-ভেদ দৃষ্ট হয়, সে কেবল কর্ম্মফল-সাপেক্ষ। সে ভেদ চিরকাল আছে, থাকিবে এবং কেহ কখনও একেবারে তাহা দূর করিতে সমর্থ হইবেন না।

ভারতের সমাজ।

পাপ-পুণ্য চিরকাল আছে। সমাজের শৃঙ্খলা-বিশৃঙ্খলাও চিরকাল রহিয়াছে। সুতরাং কোনরূপ একটী বিশৃঙ্খলার দৃষ্টান্তে, 'সমাজ বিশৃঙ্খলাময় ছিল', তাহাও বলিতে পারা যায় না ; আবার কোনও একটী শৃঙ্খলা দৃষ্টে 'সমাজ সম্পূর্ণ-রূপ সুশৃঙ্খল ছিল', তাহাও বলিতে পারি না। শাস্ত্র-তত্ত্ব আলোচনায়ও সে ভাব উপলব্ধি হয় না। পৃথিবী কখনও যে একেবারে পাপশূন্য ছিল, অথবা পৃথিবীতে কোনও সময়ে যে একেবারে পাপীর অস্তিত্ব ছিল না, শাস্ত্র-তত্ত্ব আলোচনা করিয়া,

ভাল-মন্দ—দুইই আছে।

আমরা কচিৎ তাহা বুঝিতে পারি। যুগ-বিবর্ত্তনে পাপ পুণ্যের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়া আসিয়াছে বটে; কিন্তু পৃথিবী কখনও একেবারে পাপ-পরিশূন্যা হইয়াছিলেন—তাহা কদাচ মনে হয় না। কালবশে সকল প্রকার বিবর্ত্তনই সম্ভবপর। অনন্ত কালের অনন্ত ইতিবৃত্তের মধ্যে তাই সুশৃঙ্খলা ও বিশৃঙ্খলা—উভয়বিধ চিত্রই আমরা দেখিতে পাই। সে হিসাবে, বলিতে পারা যায়,—ভারতবর্ষে সকলই ছিল, আবার কিছুই ছিল না। সে হিসাবে বলিতে পারা যায়,—ভারতবর্ষে সমাজ-বন্ধনের দৃঢ়তা ছিল, কখনও আবার তাহাতে শিথিলতাও ঘটিয়াছিল। কলির আবির্ভাব—সবে তো এই একবার নহে! কত কলি আসিয়া কত কলি চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং কত বিশৃঙ্খলার ইতিহাসও স্তরে স্তরে স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে। সাধারণ ভাবে এইটুকু বুঝিলেই প্রাচীন ভারতের ধর্ম্ম-তত্ত্ব ও সমাজ-তত্ত্ব উপলব্ধি হইতে পারে। আর, তাহা হইলে, কাহারও সহিত কাহারও বাগ্-বিতণ্ডার বা মত-পার্থক্যের সম্ভাবনা উপস্থিত হয় না। এই তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিয়াই অনেকে তর্ক উত্থাপন করেন,—"প্রাচীন ভারতে, বৈদিক-যুগে, ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-বিভাগ ছিল না। এ বর্ণ-বিভাগ—অধুনা-কল্পিত।" তাঁহারা আরও বলেন,—"ভারতে জাতি-ভেদ ছিল না; ভারতে অসবর্ণ বিবাহ চলিত; ভারতের ব্রাহ্মণ-শূদ্র স্ত্রী-পুরুষ সকলেই বৈদিক-সূক্ত রচনা করিতেন।" ভারতবর্ষের প্রাচীন সমাজ-সম্বন্ধে এইরূপ কত উপকথারই সৃষ্টি হইয়া আছে। সকলের সকল কথার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা সম্ভবপর নহে; তবে ঐ সকল বিষয়ে আমরা যাহা বুঝিয়াছি, স্থূলভাবে তাহারই আলোচনা করিতেছি।

বৈদিক যুগ-প্রসঙ্গ।

প্রথম,—'বৈদিক-যুগ'। আধুনিক পণ্ডিতগণের অনেকেরই মত,—'ভেদিক-এজ' (Vedic Age) বা বৈদিক-যুগ নামে একটী নির্দ্দিষ্ট সময় ছিল। 'সেই সময়েই বৈদিক-সূক্ত-সমূহ রচিত হয়;—সেই সময়েই সুদাস, যদু, তুর্ব্বসু প্রভৃতি ঋগ্বেদোক্ত নৃপতিগণ বিদ্যমান ছিলেন;—সেই সময়েই আর্য্যগণ মধ্য-এশিয়া বা মেরু-প্রদেশ হইতে আসিয়া, ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন;—সেই সময়েই আর্য্য ও অনার্য্যগণের মধ্যে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিয়াছিল;—সেই সময়েই যজ্ঞ-বিধির সৃষ্টি হয়;—সেই সময় হইতেই বৈদিক-সূক্ত-সমূহ রচিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল।' কিন্তু শাস্ত্র-সমূহ আলোচনা করিয়া দেখিলে এবং বিশেষ রূপে বিচার-বিবেচনা করিলে, 'বৈদিক-যুগ' বলিয়া কোনও সময়ের নির্দ্দেশ করা যায় না। এক মন্বন্তরে কত বেদব্যাস জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; কতবার বেদ-সঙ্কলন বা বেদ-বিভাগ হইয়াছে; কত ইন্দ্র, কত উপেন্দ্র, কত সুদাস, কত যদু, কত তুর্ব্বসু আবির্ভূত ও তিরোহিত হইয়াছেন!—সে তথ্য দুরধিগম্য। সুতরাং স্থূল-ভাবে এখন আমাদিগকে বুঝিতে হয়,—বেদব্যাস বেদ-বিভাগ বা বেদ-সঙ্কলন করিয়াছিলেন, তাহার তাৎপর্য্য—তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বে এক এক সংসারে দেবাদির উপাসনায় যে যে মন্ত্র প্রচলিত ছিল, সেই সেই সংসার হইতে তিনি তাহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। মন্ত্র-দ্রষ্টা (পণ্ডিতগণ যাঁহাদিগকে সূক্ত-রচয়িতা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন) ঋষিগণের এক সময়ে—এমন কি এক যুগে—বিদ্যমানতা সম্ভবপর নহে। ঋক্-সংহিতার ঋষিগণের মধ্যে অগস্ত্য ও অত্রির নাম দেখিতে পাই। আবার, বিশ্বামিত্র,

দিবোদাস প্রভৃতিও বিদ্যমান আছেন। বৈবস্বত মনু, বিবস্বান্ আদিত্য, প্রজাপতি, ভৃগু, সোম প্রভৃতি মন্ত্র-দ্রষ্টা বলিয়া অভিহিত; আবার, প্রতর্দ্দন, পরুচ্ছেদ, শুনঃশেফ, দেবরাত, অষ্টক প্রভৃতিরও সেই পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমোক্ত ঋষিগণের সহিত শেষোক্ত ঋষিগণের কাল-ব্যবধান,—বহু বিস্তৃত। এক সময়ে তাঁহাদের বিদ্যমানতা সম্ভবপর নহে; এমন কি, ঐ সকল ঋষিগণের কেহ কেহ এক মন্বন্তরে বিদ্যমান ছিলেন না বলিয়াও বুঝিতে পারা যায়। সে ক্ষেত্রে, 'বৈদিক-যুগ' অর্থে কি বুঝিতে পারি? বেদব্যাসের পূর্ব্ববর্ত্তী অনন্ত-অতীত কালকে তবে কি 'বৈদিক-যুগ' বলিব? কিন্তু বলা বাহুল্য, সে অর্থে এ পর্য্যন্ত কেহই 'বৈদিক-যুগ' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ পাই নাই।

বৈদিক মন্ত্র।

বৈদিক-মন্ত্র অনাদিকাল হইতে ইহ-সংসারে প্রচারিত। অনেক স্থলে অর্থ-বিকৃতি বা পাঠ-বিকৃতি ঘটিয়াছে,—সন্দেহ নাই; কিন্তু মূল মন্ত্র কোন্ অনন্ত কাল হইতে প্রচলিত,—কেহই তাহা নির্ণয় করিতে পারিবেন না। * জন্মগ্রহণের অব্যবহিত পরেই মানুষ 'মা'-বুলি উচ্চারণ করে। সে বুলি মনুষ্য-কণ্ঠ হইতেই মনুষ্য-কণ্ঠে সঞ্চালিত হয় বটে; তাহাতে আপাতঃ-দৃষ্টিতে আমরা 'মা'-বুলি মনুষ্য-সৃষ্ট বলিয়া মনে করিতে পারি বটে; কিন্তু যদি মূল-তথ্য অনুসন্ধান করি, অতীতের অনন্ত পথে অন্বেষণ করিয়া দেখি, বলিতে পারি কি,—সে বুলি কোথা হইতে আসিল? বৈদিক-মন্ত্র সম্বন্ধেও আমাদের সেই সিদ্ধান্ত। বেদ-মন্ত্রের নিত্যানিত্য পৌরুষেয়াপৌরুষেয়ত্ব লইয়া সংসারে আবহমান কাল বিচার-বিতর্ক চলিয়া আসিতেছে। কেহ বলিতেছেন,—বেদ অপৌরুষেয় ও নিত্য; কেহ বলিতেছেন,—বেদ পৌরুষেয় ও অনিত্য। সাঙ্খ্যকার বলেন,—'বেদ অনাদি, বীজাঙ্কুরবৎ। যেরূপ বীজ হইতে অঙ্কুর, কি অঙ্কুর হইতে বীজ; অঙ্কুর বীজের কারণ, কি বীজ অঙ্কুরের কারণ;—তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব; তদ্রূপ বেদের আদি নির্ণয় করা অসম্ভব।' মীমাংসকেরা শব্দের নিত্যত্ব স্বীকার করিয়া বেদের নিত্যত্ব স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন,—'বেদ প্রমাণ এবং নিত্য।' নৈয়ায়িকগণ তাহাতে আপত্তি করেন। তাঁহারা বলেন,—'শব্দ নিত্য হইতে পারে না।' মীমাংসকগণের সহিত এ বিষয়ে নৈয়ায়িকগণের ঘোর তর্ক-বিতর্ক দেখিতে পাওয়া যায়। দর্শনকারগণের এই মত-পার্থক্য হইতেই সংসারে মত-পার্থক্যের সৃষ্টি। এখনও তাই বেদকে কেহ নিত্য, কেহ অনিত্য, কেহ পৌরুষেয়, কেহ অপৌরুষেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। মন্বাদি স্মৃতি-শাস্ত্র বেদের অনুসারী। স্মৃতি-শাস্ত্রে বেদের নিত্যত্বের অপৌরুষেয়ত্বের বিষয়ই উল্লিখিত হইয়াছে। স্মৃতি-শাসিত সমাজ তদ্বিষয়ে অন্যমত হইতে পারে না।

গায়ত্রী ও বিশ্বামিত্র।

ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলে দ্বিষষ্টিতম সূক্তের দশম ঋকে বিশ্বামিত্র ঋষি গায়ত্রী-মন্ত্র আবৃত্তি করিয়াছেন। তাই বলিয়া বলিতে হইবে কি,—তিনিই গায়ত্রী-মন্ত্রের রচয়িতা? তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। গায়ত্রী-মন্ত্রে—ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব। যদি বিশ্বামিত্র সে মন্ত্রের রচয়িতা হন, তাহা হইলে বিশ্বামিত্রের পূর্ব্বে গায়ত্রী-মন্ত্রের—সুতরাং ব্রাহ্মণের অস্তিত্বাভাব প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু তাহা কি সম্ভব? যাঁহারা বলেন—'বৈদিক-যুগে জাতিভেদ ছিল না; ব্রাহ্মণ জাতির সৃষ্টি হয় নাই;' এই বিশ্বামিত্র-

প্রসঙ্গে তাঁহাদের সে উক্তিও বিসদৃশ বলিয়া মনে হয় না কি ? * বিশ্বামিত্র, ব্রাহ্মণত্ব-লাভের জন্য কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন ;—পাশ্চাত্য-মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ কথায় কথায় সেই দোহাই দিয়া, ব্রাহ্মণেতর বর্ণের ব্রাহ্মণত্ব-লাভের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। যদি বিশ্বামিত্রের পূর্ব্বে জাতিভেদ অর্থাৎ ব্রাহ্মণের প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব না থাকিত, তাহা হইলে বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব-লাভের জন্য আগ্রহান্বিত হইবেন কেন ? আর তাহা না হইলে, বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব-প্রাপ্তির মূল প্রসঙ্গই তো উত্থাপিত হইতে পারে না ! তার পর, কেবল ঋগ্বেদে নহে ;—গায়ত্রী-মন্ত্র সামবেদে এবং যজুর্ব্বেদেও দেখিতে পাওয়া যায়। * আরণ্যকে, উপনিষদে, পুরাণে, সংহিতা-শাস্ত্রে,—সর্ব্বত্র গায়ত্রী-মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত। বিশ্বামিত্রের (গাধি-তনয় বিশ্বামিত্রের) জন্মগ্রহণের বহু পূর্ব্বে গায়ত্রী-মন্ত্র প্রচলিত ছিল, প্রমাণ পাওয়া যায়। যদি বিশ্বামিত্র গায়ত্রী-মন্ত্রের প্রবর্ত্তক হন, তাহা হইলে, তিনি কখনই গাধি-তনয় বিশ্বামিত্র হইতে পারেন না। সে বিশ্বামিত্র—তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও বিশ্বামিত্র হওয়াই সম্ভবপর। ঋগ্বেদেও গাধি-তনয় বলিয়া বিশ্বামিত্রের উল্লেখ দেখিতে পাই না। তাঁহার কোনও বংশ-পরিচয়ও সেখানে প্রদত্ত হয় নাই। যে ব্যক্তি গায়ত্রী গান করেন, তাঁহারই ত্রাণ হয়,—এই জন্যই ঐ মন্ত্রের নাম 'গায়ত্রী'। বিশ্বামিত্র গায়ত্রী-মন্ত্র জপ করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন,—শাস্ত্রাদির আলোচনায়, সায়ণাচার্য্য প্রভৃতির টীকায়, তাহাই উপলব্ধি হয়। শাস্ত্রানুসারে আরও বুঝিতে পারা যায়,—'যুগান্তে, প্রলয়ের পরে, পূর্ব্ববর্ত্তী ইতিহাস ও শাস্ত্র-গ্রন্থ লোপ পাইলে, ঋষিগণ তপঃপ্রভাবে তৎ-সমুদায় লাভ করেন। বিশ্বামিত্রও সেই ভাবে, তপস্যার প্রভাবে, ঐ মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।' ফলতঃ, বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হইয়া গায়ত্রী-মন্ত্র লাভ করেন এবং সেই মন্ত্র-প্রভাবে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন,—এতদ্ভিন্ন অন্য কিছুই মনে করিতে পারি না।

ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন—এক বিশ্বামিত্র নহেন—বিশ্বামিত্রের ন্যায় আরও অনেকের নাম শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। † যে পদ লাভ করিয়া, মানুষ আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করেন, সে পদ যে তাঁহার নিকট শ্রেষ্ঠ পদ,—তদ্বিষয়ে কোনই সংশয় থাকিতে পারে না। চন্দ্র-বংশের এবং সূর্য্য-বংশের নৃপতিগণের মধ্যে আঙ্গিরস, ক্ষত্রোপেত, অগ্নিবেশ্য, অগ্নিবেশ্যায়ন, মৌদগল্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণ-বংশের উৎপত্তি হইয়াছিল। ত্রয্যারুণি, কবি, পুষ্করারুণি এবং গৃৎসমদ প্রভৃতি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। সেই সকল স্থলেই ক্ষত্রিয় হইয়া ব্রাহ্মণত্ব-লাভ গৌরবের বিষয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কর্ম্ম-গুণে ব্রাহ্মণত্ব-লাভ সম্ভবপর ছিল,—

জাতিভেদ-তত্ত্ব।

* সামবেদ ২।৮।১২ এবং যজুর্ব্বেদ ৩।৩৫ দ্রষ্টব্য।

† আশ্চর্য্যের বিষয়,—ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ-কালে রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রায় সকল স্থলেই 'ব্রাহ্মণ' শব্দ পরিহার করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। তাঁহার অনুবাদ পাঠ করিলে প্রায়ই 'ব্রাহ্মণ' শব্দটী পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। মূলে ব্রাহ্মণ আছে,—এ কথা যদিও তিনি স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু অনুবাদ-কালে তিনি ব্রাহ্মণ-শব্দের অর্থ করিয়াছেন—অন্যরূপ। সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ শব্দের পরিবর্ত্তে 'স্তোতা' শব্দ ব্যবহারেই তাঁহার অনুরাগ দেখিতে পাই। কিন্তু দয়ানন্দ সরস্বতী ঋগ্বেদে ব্রাহ্মণ শব্দের উল্লেখ স্বীকার করিয়া, ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে আপন অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

এ সকল প্রসঙ্গে তাহা বুঝিতে পারা যায় বটে; কিন্তু ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদির সম্ভ্রম-গৌরবের যে তারতম্য ছিল, তাহাও স্পষ্টতঃ উপলব্ধি হয়। যাঁহারা বলেন,—'বৈদিক যুগে জাতিভেদ ছিল না'; তাঁহারাই আবার বিশ্বামিত্র, গৃৎসমদ প্রভৃতির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণত্ব-প্রাপ্তির প্রমাণ প্রদর্শন করেন। যদি জাতিভেদই না রহিল, তবে বিশ্বামিত্র, গৃৎসমদ প্রভৃতির ব্রাহ্মণত্ব-লাভের প্রসঙ্গই বা উঠে কেন? তাঁহাদের নাম বেদে উল্লেখ আছে; সুতরাং তাঁহারা 'বৈদিক-কালে' বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে, বৈদিক-কালে জাতিভেদ ছিল,—কি করিয়াই বা অস্বীকার করিতে পারি? আমরা ঋগ্বেদোক্ত রাজন্যবর্গের আলোচনায় দেখিয়াছি,—দর্ভের পুত্র রাজা রথবীতি শ্যাবাশ্বের সহিত আপন কন্যার বিবাহ দিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বংশের কন্যাগণ ঋষি-বংশে সমর্পিত হয়; শ্যাবাশ্ব সে তুলনায় নীচ-বংশজ, সুতরাং তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করা যাইতে পারে না;—তখন এই কথাই উঠিয়াছিল। ইহাতে কি বুঝা যায়? যদি উচ্চ-নীচ জাতি-ভেদ বিদ্যমান না থাকিবে, তাহা হইলে এ আপত্তি উত্থাপিত হইবে কেন? কেহ কেহ বলেন,—কবশ ঐলূষ (কবশ ও লূষ) শূদ্র হইয়াও বৈদিক সূক্ত রচনা করিয়াছিলেন; সুতরাং 'বৈদিক-কালে' জাতি ভেদ ছিল না। কিন্তু কবশ ঐলূষ 'শূদ্র হইয়াও' বৈদিক সূক্ত রচনা করিয়াছিলেন, এতদুক্তিতেই জাতি-ভেদের আভাস পাওয়া যায়। যদি জাতি-ভেদ না থাকিত, 'শূদ্র হইয়াও' বৈদিক সূক্ত রচনা—কখনও স্পর্দ্ধার বিষয় হইত কি? কবশ ঐলূষের বৈদিক সূক্ত রচনা করা, অথবা তিনি শূদ্র ছিলেন কি ব্রাহ্মণ ছিলেন—তাহা নির্ণয় করা,—তাহাই তো বিচার্য্য বিষয়! কিন্তু তাহা মানিয়া লইলেও তাঁহারই প্রসঙ্গে জাতি-ভেদের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে না কি? দেবযানি এবং কচের প্রসঙ্গেও এই ভাব উপলব্ধি হয়। দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র কচ, সঞ্জীবনী-বিদ্যা শিক্ষার জন্য, দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেবাসুরের যুদ্ধে দেবগণ যে সকল দানবকে বিনাশ করিতেন, শুক্রাচার্য্যের মৃত-সঞ্জীবনী-বিদ্যা-প্রভাবে সেই মৃত দানবগণ পুনর্জ্জীবন লাভ করিত। এ দিকে, অসুরগণ সমরে যে সকল সুরগণকে বিনাশ করিত, বৃহস্পতি তাঁহাদিগকে সঞ্জীবিত করিতে পারিতেন না। ইহাতে দেবতারা, অতি-মাত্র চিন্তিত হইয়া, বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠ পুত্র কচের শরণাপন্ন হন। শুক্রাচার্য্যের আশ্রমে গমন করিয়া, সঞ্জীবনী-বিদ্যা শিখিয়া আসিয়া, বৃহস্পতি-সুত কচ দেবগণের হিত-সাধন করিবেন,—ইহাই দেবগণের উদ্দেশ্য ছিল। শুক্রাচার্য্যের আশ্রমে সঞ্জীবনী-বিদ্যা শিক্ষার সময় শুক্রাচার্য্য-তনয়া দেবযানি, কচের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলেন। সঞ্জীবনী-বিদ্যা-শিক্ষা করিয়া, গুরু-সন্নিধানে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক কচ যখন ত্রিদশালয়ে গমন করিতে অভিলাষী হন; দেবযানি তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিতে অভিলাষ প্রকাশ করেন। কিন্তু শুক্রাচার্য্যের অনুমতি না পাইয়া, বিশেষতঃ গুরু-পুত্রী বলিয়া, কচ দেবযানিকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। ইহাতে দেবযানি তাঁহাকে অভি-সম্পাত দেন; বলেন,—"আমার প্রার্থনা তুমি প্রত্যাখ্যান করিলে। সুতরাং আমার অভিসম্পাতে তোমার সঞ্জীবনী-বিদ্যা অসিদ্ধ হইবে।" কচ তাহাতে উত্তর দেন,—"তুমি

কাম-বশবর্ত্তিনী হইয়া আমাকে অভিসম্পাত করিলে; অতএব তোমার কামনা পূর্ণ হইবে না; কোনও ঋষি-পুত্র তোমার পাণিগ্রহণ করিবেন না। আর, তোমার শাপে আমার বিদ্যা-শিক্ষা সফল না হইলেও আমি যাহাকে এ বিদ্যা প্রদান করিব, সে অবশ্যই সাফল্য-লাভ করিবে।" ইহার পর কচ দেবলোকে প্রস্থান করেন; দেবযানির সহিত যযাতির পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এই ঘটনায়ই বা আমরা কি বুঝিতে পারি? বুঝিতে পারি না কি—ঋষি-কন্যা ঋষি-পুত্রে বিবাহিত হইবারই আকাঙ্ক্ষা করিত, এবং সেই বিবাহই শ্রেষ্ঠ-বিবাহ-মধ্যে পরিগণিত ছিল? উচ্চবর্ণের কন্যা নীচ-বর্ণে এবং নীচ-বর্ণের কন্যা যে কখনও উচ্চ-বর্ণে সমর্পিত হইত না,—তেমন কথা আমরা বলি না। তবে উচ্চ-বর্ণের সহিত উচ্চ-বর্ণ সম্বন্ধ-রক্ষায় যে অতিমাত্র ইচ্ছুক ছিলেন,—এই সকল ঘটনায় নিশ্চয় তাহা উপলব্ধি হয়। স্বয়ম্বর-সভায় কোনও রাজ-কন্যা যখন বরমাল্য গ্রহণ করিয়া পতি-মনোনয়ন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেন, তখন ক্ষত্রিয়-সন্তানগণের মধ্য হইতেই প্রধানতঃ তিনি আপন বর মনোনীত করিতেন। সেখানেও বর্ণানুমত বিবাহেরই আভাস পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণের সহিত ব্রাহ্মণ-কন্যার, ক্ষত্রিয়ের সহিত ক্ষত্রিয়-কন্যার বিবাহ-সম্বন্ধ বিহিত হইত;—সে তো নিয়মই ছিল। অধিকন্তু ব্রাহ্মণের মধ্যেও গোত্র-বিশেষের সহিত গোত্র-বিশেষের বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। অতি প্রাচীন ভৃগ্বাদি-বংশেও এই প্রথার পরিচয় পাওয়া যায়। * মনু-সংহিতায় ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি চারি-বর্ণের অস্তিত্বই উল্লিখিত হইয়াছে। ভগবান মনু বলিয়াছেন,—

"ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ। চতুর্থ এক জাতিস্তু শূদ্রাঃ নাস্তিতু পঞ্চমঃ॥"

অর্থাৎ,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন বর্ণ দ্বিজাতি; এবং চতুর্থ জাতি—শূদ্র। এতদ্ভিন্ন পঞ্চম জাতি নাই। এই চারি জাতি হইতেই অন্যান্যের উৎপত্তি,—মনু-বচনে তাহাই বুঝিতে পারা যায়। সময়ে সময়ে কোনও কোনও সমাজে এই জাতি-বন্ধন ছিন্ন করিবার পক্ষে যে চেষ্টা চলে নাই, তাহা নহে। ফলতঃ, পুরাতত্ত্ব আলোচনা করিলে, আমরা জাতি-বর্ণের অনুকূল ও প্রতিকূল—উভয় পক্ষের প্রমাণই দেখিতে পাই। আর, সে প্রমাণ দেখিয়া, প্রাচীন ভারতে জাতিভেদ-প্রথা ছিল না,—এ কথা কোনক্রমেই বলা যায় না।

সামাজিক আচার-ব্যবহার।

সমাজের আচার-ব্যবহার প্রভৃতির বিষয় আলোচনা করিলেও অনন্ত কালের অনন্ত তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। অনেক পদ্ধতি এখনও যেমন প্রচলিত আছে, পূর্ব্বেও সেইরূপ প্রচলিত ছিল,—বুঝিতে পারি। আবার, অনেক পদ্ধতি পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, এখন বিলুপ্ত হইয়াছে,—তাহারও প্রমাণাভাব নাই। সমাজ-বন্ধনের বিষয় পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বিবাহ-পদ্ধতির বিষয়ও পূর্ব্বেই আভাসে প্রকাশ করিয়াছি। কলিযুগের নিষিদ্ধ ধর্ম্ম-কর্ম্মের বিবরণে বুঝিতে পারা যায়,—প্রাচীন কালে কোন্ প্রথা প্রচলিত ছিল, আর কোন্ প্রথা রহিত হইয়া গিয়াছে। † মন্বাদি সংহিতায় লিখিত বিবাহ-পদ্ধতির বিষয় আলোচনা করিলে, কত প্রকার বিবাহ

* মৎস্যপুরাণ, ১৯৫ম, ২০১ম, ২০২ম অধ্যায় এবং স্মার্ত্ত রঘুনন্দন-কৃত 'উদ্বাহ-তত্ত্ব' প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার প্রমাণ আছে।

† কলিযুগের নিষিদ্ধ কর্ম্ম-সমূহের বিষয় এই গ্রন্থের সপ্তদশ পরিচ্ছেদে, ১৮৮ম—১৮৯ম পৃষ্ঠায়, উক্ত হইয়াছে।

কি ভাবে প্রাচীন ভারতে সময় সময় প্রচলিত হইয়াছিল,—অনায়াসেই বোধগম্য হইতে পারে। * পরিশেষে স্মার্ত্ত রঘুনন্দনাদির বিচার-বিতর্কের ফলে যে প্রকার সমাজ-বন্ধন এবং বিবাহ-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে,—তাহাতেও সকল বিষয়ের পূর্ব্বাভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিবাহে আনন্দ, বিবাহে বাদ্য, বিবাহে বর-কন্যার বেশ-বিন্যাস প্রভৃতি পদ্ধতি অনন্ত কাল হইতেই বিদ্যমান আছে। ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলে ষষ্টিতম সূক্তের চতুর্থ ঋকে বরের সুবর্ণময় অলঙ্কার পরিধানের এবং চন্দনাদি অনুলেপনের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কন্যা-বিবাহে পণ-প্রদান, বিবাহে সালঙ্কারা কন্যা দান,—স্মরণাতীত কাল হইতেই বিদ্যমান আছে। ঋগ্বেদের পঞ্চবিংশত্যধিক শততম সূক্তের প্রথম ঋক হইতে বুঝিতে পারি,—স্বনয় রাজা কক্ষীবানের সহিত আপন কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন; এবং সেই বিবাহে জামাতাকে বহু ধন-রত্ন প্রদান করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণ এবং শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই,—ঋচীক-সত্যবতীর বিবাহে, সত্যবতীর পিতার নিকট মহর্ষি ঋচীক বহু ধন-রত্ন পণ-স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অপিচ, অন্যান্য স্থানেও ঋষিগণের সহিত কন্যার বিবাহ-দান-কালে এই পণ-দান-প্রথার বাহুল্য দেখিতে পাই। ইহাতে বুঝা যায়,—কৌলীন্য-মর্য্যাদা পুরাকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। ঋগ্বেদে নবম মণ্ডলের ষট্‌চত্বারিংশ সূক্তে এবং দশম মণ্ডলের ঊনচত্বারিংশ সূক্তে সালঙ্কারা কন্যা-দানের উল্লেখ আছে। প্রথমোক্ত সূক্তের দ্বিতীয় ঋকে দেখিতে পাই,—'পিতৃদত্ত অলঙ্কারে সুশোভিতা হইয়া নববধূ স্বামীর নিকট গমন করেন।' শেষোক্ত সূক্তের চতুর্দ্দশ ঋকে দৃষ্ট হয়,—'জামাতাকে কন্যা-সম্প্রদানের সময় তাহাকে বসন-ভূষণে অলঙ্কৃত করিয়া সম্প্রদান করেন।' পুরাণেও বহু স্থানে এইরূপ ভাবে কন্যা-সম্প্রদানের উল্লেখ আছে। স্ত্রীলোকের অবগুণ্ঠন-প্রথা, স্বামী-স্ত্রীর একত্র যজ্ঞ সম্পাদন প্রভৃতি বিষয়ও পুরাকালে প্রচলিত ছিল। † সহমরণ-পদ্ধতি কত কাল হইতে প্রচলিত ছিল,—নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে অষ্টাদশ সূক্তের অষ্টম ঋকে সংকুসুক ঋষি পতি-বিয়োগ-বিধুরা সহগমনোদ্যতা কোনও নারীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন,—

উদীর্ষ্ব নার্য্যভি জীবলোকমিতাসুমেতমুপশেষ এহি। হস্তাগ্রাভস্য দিধিষোস্তবেদং পত্যুর্জনিত্বমভিসম্বভুবা॥

অর্থাৎ,—"হে নারী! সংসারের দিকে ফিরিয়া চল; গাত্রোত্থান কর। তুমি যাহার নিকট শয়ন করিতে যাইতেছ, সে গতাসু অর্থাৎ মৃত হইয়াছে। চলিয়া আইস। যিনি তোমার পাণিগ্রহণ করিয়া গর্ভাধান করিয়াছিলেন, সেই পতির পত্নী হইয়া যাহা কিছু কর্ত্তব্য ছিল, সকলই তোমার করা হইয়াছে।" ইহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায়,—সতী সহমৃতা হইবার জন্য পতি-পার্শ্বে শয়ানা হইয়াছিলেন; আর, তাঁহাকে প্রবোধ-বাক্যে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা হইতেছিল। সাধারণতঃ টীকাকারগণ এই অর্থই সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই উক্তি কোন্ যুগে কাহার সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছিল,—তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তবে, বিভিন্ন সময়ে ভারতবর্ষে সহমরণ-প্রথা প্রচলিত ছিল,—পুরাণ ও সংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্র-গ্রন্থে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। মনু-সংহিতায় সহমরণের প্রসঙ্গ দেখিতে

* মনুসংহিতার মতে বিবাহ অষ্টবিধ,—ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস এবং পৈশাচ

† ঋগ্বেদ, অষ্টম মণ্ডলের সপ্তদশ, ষড়্‌বিংশ এবং একত্রিংশ সূক্ত দ্রষ্টব্য।

পাই না বটে ; মনু কেবল ব্রহ্মচর্য্যের বিষয়ই আলোচনা করিয়া গিয়াছেন সত্য ; কিন্তু বিষ্ণু-সংহিতায়, পরাশর-সংহিতায়, দক্ষ-সংহিতায়, সহমরণের উল্লেখ বিশেষ-রূপেই দেখিতে পাই। * রামায়ণে বহু সতীর সহমরণের কথা কীর্ত্তিত আছে। দশরথের মৃত্যুর পর কৌশল্যা-দেবী সহমরণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছিলেন। অশোক-বনে শ্রীরামচন্দ্রের মায়ামুণ্ড-দর্শনে সীতাদেবী আক্ষেপ করিয়া অনুগমনের কথা কহিয়াছিলেন। বেদবতীর জননী পতির অনুগমন করিয়াছিলেন,—রামায়ণের উত্তর-কাণ্ডে তাহার পরিচয় পাই। শ্রীকৃষ্ণের আট জন প্রধানা মহিষী সহমৃতা হইয়াছিলেন ; পাণ্ডু রাজার পরলোক-প্রাপ্তিতে মাদ্রী সহগমন করেন ; মহারাজ কংসের পত্নী সহমরণে গমন করিয়াছিলেন। স্বায়ম্ভুব মনুর বংশধর রাজচক্রবর্ত্তী পৃথুর মহিষী সাধ্বী অর্চ্চি সহমৃতা হইয়াছিলেন। পৃথ্বীপতি সগর রাজার জননী সহমৃতা হইবার জন্য চিতানল প্রজ্জ্বলিত করিলে, মহর্ষি ঔর্ব্ব তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছিলেন। তিনি গর্ভবতী ছিলেন বলিয়া, চিতানলে প্রবেশের অব্যবহিত পূর্ব্বে, তাঁহাকে বাধা দেওয়া হইয়াছিল। সহমরণ সম্বন্ধে এইরূপ বহু দৃষ্টান্তই শাস্ত্রে দেখিতে পাই। এদিকে আবার ব্রহ্মচর্য্যের দৃষ্টান্তেরও অবধি নাই। সুতরাং বিধবার পক্ষে সহমরণ এবং ব্রহ্মচর্য্য উভয়ই প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ছিল,—বুঝিতে পারা যায়। পরিশেষে, ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে, এই সহমরণ-প্রথা রহিত হইয়াছে। মৃতের অগ্নি-সৎকার, অস্থি-সঞ্চয়, প্রেতকৃত্য প্রভৃতি সম্বন্ধে এখন যেরূপ পদ্ধতি-পরম্পরা বিদ্যমান, তাহাও প্রাচীন-কালের অনুস্মৃতি মাত্র। ফল কথা, কি সদাচার, কি কদাচার,—যে বিষয়েরই অনুসন্ধান করি না কেন, কোনও বিষয়েরই দৃষ্টান্তাভাব ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্বে দেখিতে পাওয়া যায় না। যিনি যেরূপ দৃষ্টিতে অনুসন্ধান করিবেন, তিনি সেইরূপ সামগ্রীই প্রাপ্ত হইবেন। ভারতের অনন্ত ইতিহাস এতই অভিনব সামগ্রী অঙ্কে ধারণ করিয়া আছে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির পরিচয় ভারতের পুরাতত্ত্বে স্তরে স্তরে সুসজ্জিত। ভারতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কি উন্নতিই না সাধিত হইয়াছিল! মৃতের পুনর্জ্জীবন-লাভ—অভাবনীয় অচিন্ত্য অসম্ভব ব্যাপার—ভারতের পুরাবৃত্তে অনেক স্থলেই দেখিতে পাই। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য মৃত-সঞ্জীবনী বিদ্যা-প্রভাবে রণাহত মৃত দৈত্যগণকে পুনর্জ্জীবিত করিতেন। ইন্দ্র কর্ত্তৃক দধীচি মুনির মস্তক-ছেদের পূর্ব্বে ও পরে, দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁহার নূতন মস্তক সংযোজন করিয়া দিয়াছিলেন। কুশী-লবের সহিত যুদ্ধে সসৈন্য শ্রীরামচন্দ্র নিহত হইলে, মহর্ষি বাল্মীকি সঞ্জীবনী-মন্ত্র প্রভাবে তাঁহাদিগকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলেন। বভ্রুবাহনের সহিত যুদ্ধে অর্জ্জুন প্রাণত্যাগ করিলে, নাগরাজ-তনয়া উলূপী সঞ্জীবনী মণি-স্পর্শে তাঁহার প্রাণদানে সমর্থ হইয়াছিলেন। অনুসন্ধান করিলে এতাদৃশ শত শত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতে পারে। অবিশ্বাসী বিশ্বাস করিতে না পারেন ; কিন্তু যাঁহারা শাস্ত্র-তত্ত্বে আস্থাবান, তাঁহারা নিশ্চয়ই এ সকল বিষয় অবিশ্বাস করিতে পারেন না। অতি-বৃদ্ধ জরাজীর্ণ অস্থি-কঙ্কাল-সার চ্যবন ঋষির নবযৌবন লাভ, ঋজ্রাশ্বের চক্ষু-প্রাপ্তি এবং খেল-পত্নী বিশপলার চলচ্ছক্তি-লাভ—কোন্ স্মরণাতীত

জ্ঞান-বিজ্ঞানোন্নতি।

* স্মৃতি-প্রসঙ্গে এই গ্রন্থের ষোড়শ পরিচ্ছেদে, ১৫৭ম পৃষ্ঠায়, এতদ্বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

কালের ঘটনা ;* কিন্তু কি অলৌকিক বিজ্ঞানোন্নতির পরিচায়ক! চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ভারতের আয়ুর্ব্বেদ কি উচ্চ আসনই অধিকার করিয়া আছে! আয়ুর্ব্বেদ—ঋগ্বেদের উপবেদ বলিয়া অভিহিত। আয়ুর্ব্বেদের সৃষ্টি-সম্বন্ধে পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে,—"প্রথমে প্রজাপতি ব্রহ্মা, ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব নামক চারি বেদ দর্শন করিয়া, পরে তাহার অর্থ সকল পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক আয়ুর্ব্বেদ নামক অপর একখানি বেদের সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর ভগবান ব্রহ্মা উক্ত পঞ্চম বেদ ভাস্কর দেবকে দান করিলে, ভাস্কর দেবও সেই আয়ুর্ব্বেদ হইতে স্বতন্ত্র একখানি সংহিতা প্রস্তুত করিলেন। পরিশেষে ভাস্কর আপন শিষ্যগণকে নিজ-কৃত সংহিতার সহিত উক্ত আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করাইলে, তাঁহারাও সকলে উভয় শাস্ত্র দর্শন করিয়া এক এক খানি সংহিতা প্রস্তুত করিলেন। ধন্বন্তরি, দিবোদাস, কাশীরাজ, অশ্বিনী-কুমারদ্বয়, নকুল, সহদেব, যমরাজ, চ্যবন, জনক, বুধ, জাবাল, জাজলি, পৈল, করথ, অগস্ত্য—এই ষোড়শ জন ভাস্করের শিষ্য।" সুশ্রুত বলেন,—"আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র প্রথমে ব্রহ্মার মুখ হইতে বিনির্গত হইয়াছিল। তৎপরে প্রজাপতি, তৎপরে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, তৎপরে ইন্দ্রদেব, তৎপরে ধন্বন্তরি, পরিশেষে সুশ্রুত এই আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। জীবন (আয়ু) সুখময় করিবার জন্য, রোগাক্রান্ত জনের রোগ-নিবারণ-উদ্দেশ্যে, সুস্থ ব্যক্তির স্বাস্থ্য-রক্ষার কামনায়, আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র সংসারে প্রচারিত হইয়াছিল।" আয়ুর্ব্বেদ আট ভাগে বা তন্ত্রে বিভক্ত। সে আট তন্ত্রের নাম,—শল্য, শালাক্য, কায়চিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, কৌমার-ভৃত্য, অগদ, রসায়ন ও বাজীকরণ। এই অষ্টবিধ চিকিৎসা-তন্ত্রের মধ্যে শারীর-বিজ্ঞান, দেহ-বিজ্ঞান, শস্ত্র-বিজ্ঞান, ধাত্রী-বিজ্ঞান, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, ভেষজ-বিজ্ঞান এবং রোগ-নিদান—সকল বিষয়ই বিবৃত আছে। কেবল মনুষ্যের চিকিৎসা বলিয়া নহে; পশ্বাদির চিকিৎসা-প্রণালীও আয়ুর্ব্বেদে বর্ণিত রহিয়াছে। চরক, সুশ্রুত, ভাবমিশ্র, বাগ্‌ভট্ট প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ-রত্ন অনুশীলন করিলে, সর্ব্ববিধ ব্যাধি-বিপত্তির প্রতিকারোপায় নির্দ্ধারিত হইতে পারে। কালবশে আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসা-পদ্ধতি বহু অংশে বহুল পরিমাণে বিলুপ্ত হইয়াছে। কক্ষীবানের দুহিতা ব্রহ্মবাদিনী ঘোষা কুষ্ঠ-রোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন; রোগাক্রান্ত হওয়ায় তাঁহার বিবাহ হয় নাই। অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁহাকে রোগ-মুক্ত করায়, তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। অশ্বিদ্বয় কণ্ব ঋষির অন্ধতা দূর করিয়াছিলেন। নিষধ-পুত্র বধির হইয়াছিলেন; অশ্বিদ্বয়ের আনুকূল্যে তিনি শ্রবণ-শক্তি প্রাপ্ত হন। † বধ্রিমতীর স্বামী নপুংসক ছিলেন; অশ্বিদ্বয় তাঁহার রোগমুক্ত করেন। ঋগ্বেদেই এইরূপ অসংখ্য প্রকার রোগ-মুক্তির বিবরণ দেখিতে পাই। পুরাণাদিতে আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের উপযোগিতার কত দৃষ্টান্তই বিদ্যমান আছে! শক্তিশেলাহত লক্ষ্মণ ঔষধের ও চিকিৎসার গুণে নূতন জীবন লাভ করিয়াছিলেন। তক্ষক-দংশনে পরীক্ষিতের মৃত্যুর পূর্ব্বে বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণ-বেশী ধন্বন্তরি সর্প-বিষ-নাশের যে অদ্ভুত প্রক্রিয়া প্রদর্শন করিয়াছিলেন,—

* চ্যবণ ঋষির যৌবন প্রাপ্তির বিষয় এই গ্রন্থের ৩৪৮ম পৃষ্ঠা এবং ঋজ্রাশ্বের অন্ধতা নিবারণের বিষয় এবং খেলপত্নী বিশপ্‌লার লৌহের পা নির্ম্মাণের বিষয় এই গ্রন্থের ৪২৬ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

† ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১১৬ম, ১১৭শ, এবং ১১৮ম সূক্ত দ্রষ্টব্য।

সর্পদষ্ট, বিষজর্জ্জরিত, ভস্মীভূত বৃক্ষকে যেরূপে শাখাপল্লবসহ পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলেন,—তাহার তুলনা আছে কি? এইরূপ যতই আলোচনা করা যায়, প্রাচীন ভারতে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্নতার পরিচয় পাইয়া, ততই বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইতে হয়। পরমায়ু বৃদ্ধি বা যোগ-প্রভাবে দীর্ঘজীবন-লাভ—প্রাচীন ভারতেই দেখিতে পাই।

বিবিধ বিষয়ে অভিজ্ঞতা।

কেবল কি এক দিকে? যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই প্রাচীন ভারতের গৌরব-গরিমার নিদর্শন বিদ্যমান। অধুনা অনেকানেক নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া অনেকে যশোভাজন হইতেছেন; পৃথিবীতে তাঁহাদের যশের অবধি থাকিতেছে না। কিন্তু একটু অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাই,—সেই সকল তত্ত্বে ভারতবর্ষ কোন্ অনন্ত কাল হইতেই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন! দৃষ্টান্ত কত উল্লেখ করিব? শরীরের রক্ত-সঞ্চালন-ক্রিয়া পাশ্চাত্য ইউরোপে সে দিন মাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে; কিন্তু ভারতের আয়ুর্ব্বেদ কোন্ দূর অতীত কালে সে তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন! পৃথিবীর গতি ও গোলত্বের বিষয়—পাশ্চাত্য জগতে কয় দিনই বা উপলব্ধি হইয়াছে? কিন্তু প্রাচীন ভারতে কত পূর্ব্বে সে তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছিল,—জ্যোতিষে পুরাণেতিহাসে তাহার সহস্র সহস্র প্রমাণ বিদ্যমান্ রহিয়াছে। সূর্য্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ, সূর্য্য-রশ্মি দ্বারা চন্দ্রের আলোক প্রাপ্তি,—বেদ-পুরাণ সর্ব্বত্রই এ তত্ত্ব বিশদীকৃত! আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে দৃষ্টিতে দেখিবে, দৃষ্টি-শক্তির তারতম্যানুসারে ভারতে সকল দৃশ্যই দেখিতে পাইবে। যদি দেখিতে চাও—ভারতে কিছুই ছিল না, ভারতের সকলই ভ্রান্তিপূর্ণ; দৃষ্টি-শক্তি সেই ভাবেই পরিচালিত হইবে। আবার যদি তত্ত্বানুসন্ধিৎসু হইয়া, সত্য আবিষ্কারের জন্য ব্যাকুল হইয়া, অনুসন্ধান কর; তদনুরূপ দৃশ্যই দেখিতে পাইবে;—তদনুরূপ সুফলই লাভ করিবে। পৃথিবীর গতি ও গোলত্বের একমাত্র দৃষ্টান্তেই আমাদের এ সিদ্ধান্তের সার্থকতা প্রতিপন্ন হইতে পারে। বেদ, পুরাণ, প্রভৃতি শাস্ত্র-গ্রন্থ আলোচনায়, কেহ দেখিয়াছেন—পৃথিবী গোল, কেহ দেখিয়াছেন,—পৃথিবী চতুষ্কোণ, কেহ দেখিয়াছেন—পৃথিবী গতিশীল, কেহ দেখিয়াছেন—সূর্য্যই ঘুরিতেছে। শাস্ত্রের সদ্ব্যাখ্যা বা অপব্যাখ্যা অনুসারে, অথবা অভিজ্ঞ-অনভিজ্ঞ দ্বিবিধ ব্যক্তির বাক্য-পরম্পরায় নির্ভর-পরায়ণ হওয়ায় এরূপ ঘটিয়াছে। ফলতঃ, পৃথিবীর গতি ও গোলত্বের বিষয় আর্য্য-হিন্দুগণের যে অবিদিত ছিল না, তাহা বলাই বাহুল্য। ঋগ্বেদে দেখিতে পাই,—"অত্রাহ গোরমন্বতত্বষ্টুর পীচ্যং। ইত্থা চন্দ্রমসো গৃহে॥" যাস্কের নিরুক্ত-মতানুসারে ইহার অর্থ হয়,—'সূর্য্য-কিরণ চন্দ্রে প্রতিফলিত হইয়াই চন্দ্রের আলোক হয়।' এই রশ্মিপাত হইতেই চন্দ্র-গ্রহণের প্রসঙ্গ আসিতে পারে। 'পৃথিবীর ছায়াপাত দ্বারা সূর্য্য-কিরণের অবরোধকে চন্দ্র-গ্রহণ বলে। গ্রহণে চন্দ্রের উপরে পৃথিবীর যে ছায়া পতিত হয়, তাহা নিয়তই গোলাকার দেখায়। ধরিত্রী গোলাকার না হইলে, তাহার ছায়া নিয়তই গোলাকার দৃষ্ট হইত না।' সূর্য্য যে গতিশীল নহেন, শ্রীমদ্ভাগবতের একটী শ্লোকেও তাহার আভাস পাওয়া যায়। সূর্য্যের 'মার্ত্তণ্ড' নাম সম্বন্ধে সেখানে উক্ত হইয়াছে,—"মৃতেহণ্ড এষ এতস্মিন্ যদভূত ততো মার্ত্তণ্ড

ইতি ব্যপদেশঃ।” এখানে ‘মৃত’ শব্দে অচেতন অর্থাৎ গতিহীনতাই উপলব্ধি হয়। জ্যোতিষ-গ্রন্থে পৃথিবীর গোলত্ব-বিষয়ে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ কি সুন্দর মীমাংসাই করিয়া রাখিয়াছেন! প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ ভাস্করাচার্য্য তাঁহার “সিদ্ধান্ত-শিরোমণি” এবং “গোলাধ্যায়” নামক গ্রন্থ-দ্বয়ে এ বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা করিয়াছেন। তিনি বলেন,—“পৃথিবীর আকার কদম্ব-পুষ্পের ন্যায়। কদম্ব-পুষ্প যেমন কেশর-সমূহে আবৃত, ধরা-মণ্ডল সেইরূপ বন-পর্ব্বত-নগরাদিতে বেষ্টিত।” * তিনি আরও বলেন,—“আতপস্থ ঘট যেরূপ সূর্য্য-কিরণ দ্বারা এক দিকে উজ্জ্বল এবং নিজের ছায়া দ্বারা অপর দিকে সুন্দরী স্ত্রীর কেশ-কলাপের শ্যামল শোভা ধারণ করে, সেইরূপ অমৃত-পিণ্ড চন্দ্রের যে দিক সূর্য্যের অভিমুখে থাকে, সেই দিক চন্দ্রিকার দ্বারা সমুজ্জ্বল এবং তদ্বিপরীত দিক নিজের ছায়ায় মলিন হয়। † পৃথিবী যদি দর্পণোদরের ন্যায় সমতল হইত, তবে তদুপরি বহু উচ্চে ভ্রমণশীল সূর্য্য নিরন্তর মানবগণের দৃষ্টিগোচর হইত। অর্থাৎ, কখনই রাত্রি হইত না; গোল বলিয়াই দিবারাত্রি হইয়া থাকে।” ‡ ‘সূর্য্য-সিদ্ধান্ত’ নামক প্রাচীনতম জ্যোতিষ-গ্রন্থে লিখিত আছে,—“বিপুল অবনী-মণ্ডল সম্বন্ধে মানবগণ অতি ক্ষুদ্র; এই কারণ বশতঃ, বাস্তবিক পৃথিবী গোলাকার হইলেও, তাহারা স্ব স্ব স্থান হইতে ইহাকে চক্রাকার সমতল ক্ষেত্রের ন্যায় দেখিতে পায়।” § বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ আর্য্য-ভট্টের ‘আর্য্য-সিদ্ধান্ত’ গ্রন্থে পৃথিবীর গতি বিষয়ে অতি সুন্দর একটী উপমা দৃষ্ট হয়। সূর্য্য অথবা অচলা রাশিচক্র পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতেছেন,—সাধারণ দৃষ্টিতে প্রতীত হইতে পারে। কিন্তু এরূপ প্রতীতি জন্মিবার কারণ সম্বন্ধে আর্য্যভট্ট বলিয়াছেন,—“অনুলোম গতি (স্রোতের অনুকূলগামী) জলযানস্থ ব্যক্তি যেরূপ নদী-তীর প্রভৃতি অচল পদার্থকে বিলোমগামী দেখিতে পায়, লঙ্কাতে অর্থাৎ বিষুবদ্বৃত্ত প্রদেশে অচল নক্ষত্র সকলকেও সেইরূপ সম-পশ্চিমাভিমুখে গতিশীল বোধ হয়। ¶ তাৎপর্য্যার্থ এই,—পূর্ব্বাভিমুখে পৃথিবীর পরিভ্রমণ নিমিত্ত অচল রাশিচক্র যেন পশ্চিমাভিমুখে যাইতেছে, জনগণ এইরূপ মনে করে। যাঁহারা দ্রুতগামী জলযানে বা স্থলযানে গতিবিধি করিয়াছেন, তাঁহারা এই বিষয়টী অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। লঙ্কা-প্রদেশের উল্লেখ করিবার তাৎপর্য্য এই যে, উক্ত প্রদেশ পৃথিবীর মধ্যস্থল বলিয়া তথা হইতে রাশিচক্র সমান-ভাবে দেখা যায়। লঙ্কা বা বিষুবৎ-প্রদেশের দক্ষিণ-উত্তরে যত দূর অগ্রসর হওয়া যায়, রাশিচক্র ততই তীর্য্যক্-ভাবে অবনত দৃষ্ট হয়।” পৃথিবী যদি গতিশীলা হন, তবে তদন্তর্গত দ্রব্যাদি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয় না কেন?—এবম্বিধ প্রশ্নের উত্তরে ভাস্করাচার্য্য মাধ্যাকর্ষণ

* সর্ব্বতঃ পর্ব্বতারামগ্রামচৈত্যচয়ৈশ্চিতঃ। কদম্বকুসুমগ্রন্থিঃ কেশরপ্রসরৈরিব॥—

† তরণিকিরণসঙ্গাদেষপীযূষ পিণ্ডো দিনকরদিশি চন্দ্রশ্চন্দ্রিকাভিশ্চকাস্তি।
তদিতরদিশি বালাকুন্তলশ্যামলশ্রীর্ঘটইব নিজমূর্ত্তিচ্ছায়য়ৈবাতপস্থঃ॥

‡ যদি সমা মুকুরোদরসন্নিভা ভগবতী ধরণী তরণিঃ ক্ষিতেঃ।
উপরি দূরগতোঽপি পরিভ্রমণ কিমু নরৈরমরৈরিব নেক্ষ্যতে॥

§ অল্পকায়তয়া লোকাঃ স্বস্থানাৎ সর্ব্বতোমুখং। পশ্যন্তি বৃত্তামপ্যেতাং চক্রাকারাং বসুন্ধরাং॥

¶ অনুলোমগতির্নৌস্থঃ পশ্যত্যচলং বিলোমগং যদ্বৎ। অচলানি তানি তদ্বৎ সমপশ্চিমগানি লঙ্কায়াম্॥

শক্তির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,- -'পৃথিবীর আকর্ষণ-শক্তি আছে। সেই শক্তি-বলে শূন্যমার্গে ক্ষিপ্ত গুরু বস্তু ইহার অভিমুখে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। বাস্তবিক তাহাকেই পতনশীল বলিয়া বোধ হয়। পৃথ্বী স্বয়ং চতুঃপার্শ্বেই সমান আকাশের কোথায় পড়িবে? * তাৎপর্য্যার্থ এই যে, বিশাল আকাশের বাস্তবিক উর্দ্ধাধঃ নাই। আমরা যাহাকে উচ্চ-নীচ বলি, তাহা কল্পিত মাত্র। আমরা স্বভাবতঃ দণ্ডায়মান হইলে, যে দিক মস্তক, সেই দিক্‌কে উচ্চ; এবং যে দিকে পাদ, সেই দিক্‌কে নীচ বলিয়া থাকি। গোলাকার পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বসতি আছে। সকল স্থানের মনুষ্যই এইরূপ বলিলে, সর্ব্বত্র সমান আকাশের কোথায়ই বা উচ্চ-নীচ থাকে, আর ধরিত্রীই বা কোথায় পতিত হয়?" † সার আইজাক নিউটন ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া পৃথিবী-পরিচিত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কত পূর্ব্বে ভারতবর্ষ সে তত্ত্ব অবগত ছিলেন,—ইহাতে তাহা প্রতিপন্ন হয় না কি? অনুসন্ধান করিলে, এইরূপ আরও কত তত্ত্বই পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ণ, দিন-পরিমাণ, বৎসর পরিমাণ,—প্রাচীন ভারতবর্ষে, কোন্ বিষয় আর্য্য-হিন্দুগণের অপরিজ্ঞাত ছিল?—কোন্ বিষয়ে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা ছিল না? বেদাদি শাস্ত্র-গ্রন্থ হইতেও এতদ্বিষয়ক প্রমাণ প্রদর্শিত হইতে পারে। কিন্তু সেই দূর অতীতের প্রসঙ্গে উপেক্ষা করিয়া যদি কেহ আধুনিক মত-পরম্পরারও আলোচনা করেন, তাহা হইলেই বা কি মনে হয়? পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের গণনা অনুসারেই নির্দ্দেশ হইয়াছে,—ভাস্করাচার্য্য ১০৩৬ শকে জন্মগ্রহণ করেন। সেই ভাস্করাচার্য্যের গ্রন্থে মাধ্যাকর্ষণের উল্লেখে, সার আইজাক নিউটনের অন্ততঃ ৫৭২ বৎসর পূর্ব্বে মাধ্যাকর্ষণ বিষয়ে ভারতের অভিজ্ঞতা ছিল,—তাহা তো কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না!

সর্ব্বত্র গতিবিধি।

কোন্ বিষয়ে আর্য্য হিন্দুগণ অনভিজ্ঞ ছিলেন? পৃথিবীর কোন্ তথ্য তাঁহাদের অপরিজ্ঞাত ছিল? পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কলম্বস কর্ত্তৃক আমেরিকা আবিষ্কৃত হয়। সেই উপলক্ষে তাঁহার যশঃ-গৌরবের অবধি নাই। কিন্তু ভারতবর্ষ কত পূর্ব্বে সেই আমেরিকার বিষয় অবগত ছিলেন, আর্য্য-হিন্দুগণ কোন্ অনন্তকাল হইতে পৃথিবীর প্রতি দেশ-মহাদেশের সংবাদ রাখিতেন,—তাহা স্মরণ করিলেও বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। প্রাচীন আর্য্য-হিন্দুগণ আমেরিকা মহাদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, সর্ব্বদা তথায় গতিবিধি করিতেন,—পুরাণাদি শাস্ত্র-গ্রন্থে তাহার ভূয়োভূয়ঃ প্রমাণ আছে। অনুসন্ধিৎসু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও অনেকেই তাহা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। ইউরোপীয় জাতিরা যখন আমেরিকায় প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেন, তাঁহারা দেখিয়াছিলেন,—আমেরিকায় তখনও প্রাচীন হিন্দুর আচার-

---

* আকৃষ্টশক্তিশ্চ মহী তয়া যৎ খস্থং গুরু স্বাভিমুখং স্বশক্ত্যা।
আকৃষ্যতে তৎ পততীব ভাতি সমে সমন্তাৎ ক্ব পতত্বিয়ং খে।

† পণ্ডিত গোবিন্দ মোহন বিদ্যাবিনোদ বারিধি মহাশয়ের "মৃন্ময়ী" গ্রন্থে পৃথিবীর আকার, গতি এবং মাধ্যাকর্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে আর্য্য-হিন্দুগণের অভিজ্ঞতায় প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদর্শিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এতৎ-প্রসঙ্গে আমরা তাঁহার বহু মত গ্রহণ করিয়াছি।

ব্যবহার প্রচলিত ছিল। কলম্বস কর্তৃক আমেরিকা আবিষ্কৃত হওয়ার বহু পূর্ব্বে, ভারতের সহিত আমেরিকার সম্বন্ধ বন্ধন ছিন্ন হইয়াছিল বলিয়া, প্রাচীন ভারতের আচার-পদ্ধতি তখন সেখানে বিকৃত হইয়া পড়িয়াছিল বটে; কিন্তু সে পরিচয়-চিহ্ন যে একেবারে লোপ পায় নাই, তাহা নিঃসন্দেহ। জর্ম্মণীর প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও পরিব্রাজক ব্যারণ হাম্বোল্ট বর্ণন করিয়া গিয়াছেন,—"আমেরিকায় এখনও হিন্দুগণের পরিচয়-চিহ্ন বিদ্যমান।" পেরু-দেশের অধিবাসিগণের আচার-ব্যবহারের বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া মিঃ পোকক বলিয়াছেন,—"পেরুবাসীদিগের পিতৃ-পুরুষগণ এক সময়ে ভারতবাসিগণের সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত ছিলেন।" প্রাচীন আমেরিকার স্থাপত্য-কার্য্যে ভারতীয় হিন্দুগণের স্থপতি-বিদ্যার অনুসরণ দৃষ্ট হয়। মিঃ হার্ডি বলেন,—"মধ্য আমেরিকার চিচেনে যে প্রাচীন অট্টালিকা-সমূহ দেখিতে পাই, ভারতবর্ষের মন্দির-চূড়ার সহিত তাহার সাদৃশ্য বিদ্যমান।" মিঃ স্কয়ার বলেন,—"দক্ষিণ-ভারতে এবং ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে যে সকল বৌদ্ধ-মন্দির দৃষ্ট হয়, মধ্য আমেরিকার বহু অট্টালিকা, গঠনে এবং সাজ-সরঞ্জামে, তাহারই অনুকরণে নির্ম্মিত। এসিয়াটিক সোসাইটীর সুবিজ্ঞ সদস্যগণ এবং হিন্দুদিগের ধর্ম্ম ও পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিতগণ এই কথাই বলিয়া গিয়াছেন।" ডাক্তার জারফিউ বলেন,—"প্রাচীন মন্দির-সমূহের প্রতি, প্রাচীন দুর্গাদির প্রতি, প্রাচীন সেতু ও জলাশয়াদির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, আর্য্য-হিন্দুগণের অনুসরণেই তৎ-সমুদায় নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারা যায়।" ভারতীয় দেব-দেবীর অনুকরণে আমেরিকায় দেব-দেবীর মূর্ত্তি প্রস্তুত হইত এবং সেই সকল দেব-দেবীর পূজা-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল,—প্রেস্কট্-প্রণীত "মেক্সিকো-বিজয়" গ্রন্থে এবং হেল্প-প্রণীত "স্পেনীয়গণ কর্তৃক আমেরিকা-অধিকার" গ্রন্থে তাহার ভূরি-ভূরি নিদর্শন দেখিতে পাই। আমেরিকার পৌরাণিক-তত্ত্বানুসন্ধানে উপলব্ধি হয়, তৎ-সমুদায়ে ভারতবর্ষেরই প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত। ভারতবর্ষের ন্যায় ধরিত্রী-মাতা বা পৃথ্বী-মাতার পূজা আমেরিকায় প্রচলিত ছিল। ভারতবর্ষে গোকুলে শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমলে, লঙ্কাদ্বীপে বুদ্ধ-দেবের পদচিহ্নে, গয়াধামে গয়াসুরের পাদ-পদ্মে, পূজা-প্রদানের ব্যবস্থা আছে। মেক্সিকো-দেশে 'কোয়েট্‌জাল কোটল' নামক দেবতার পদ-চিহ্ন পূজিত হইত। জানি না—তিনি কোন্ দেবতা, ভাষান্তরে কি নামে অভিহিত হইয়া আছেন। ভারতবর্ষের ন্যায় মেক্সিকো-দেশে সূর্য্য-গ্রহণের ও চন্দ্র-গ্রহণের সময় উৎসবাদি হইত। এদেশে যেরূপ রাহু-কর্তৃক সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রাসের কিম্বদন্তী আছে, সে দেশে তদ্রূপ 'মাল্য'-কর্তৃক সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রাসের কিংবদন্তী প্রচলিত। মেক্সিকো দেশে হস্তিমুণ্ড-সমন্বিত এক নর-দেবতার পূজা-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। ব্যারণ হাম্বোল্ট বলেন,—"ঐ দেবতার সহিত হিন্দুদিগের গণ-দেবতার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।" * ভারতের 'দশহরা'-উৎসবের ন্যায় মেক্সিকো-দেশে বৎসর বৎসর রাম-সীতার নামে উৎসব হইত। স্যার উইলিয়ম জোন্স বলেন,—"ইহা প্রসিদ্ধ ঘটনা যে, পেরু-দেশের ইনুসেস্‌গণ আপনাদিগকে সূর্য্য-বংশাবতংস

* Baron Humboldt remarks on the Mexican deity:—"It presents some remarkable and apparently *not accidental* resemblance with the Hindu *Gonesh*":—*Hindu Superiority.*

বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করে, এবং তাহাদের প্রধান পর্ব্বোৎসব—রাম-সীতার পর্ব্বোৎসব। ইহা হইতেই বুঝা যায়, যে হিন্দু-জাতি এসিয়ার দূর-দুরান্তরে গমন করিয়া রাম-সীতার ইতিহাস এবং হিন্দুদিগের আচার-পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিয়াছিল, সেই জাতিই দক্ষিণ আমেরিকায় গমন করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল।" * এইরূপ আরও কত সাদৃশ্যই দেখিতে পাওয়া যায়। যুগান্তর ও প্রলয়-কাহিনী, কূর্ম্মাবতার বা কূর্ম্ম-পৃষ্ঠে পৃথিবী ধারণ, মনসা ও নাগ-পূজা প্রভৃতির পুরা-কাহিনীর সহিত ভারতবর্ষ ও আমেরিকায় সাদৃশ্য ছিল, পরিচয় পাওয়া যায়। তত্রত্য অনেক দেব-দেবীর মূর্ত্তিতে কালী, তারা, শিব প্রভৃতির প্রতিচ্ছবি প্রকটিত। পুরাকালে যব-দ্বীপ, বলি-দ্বীপ, বোর্ণিয়ো প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া হিন্দুগণ আমেরিকার পথে গতিবিধি করিতেন,—এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। স্থলপথেও তখন আমেরিকায় গতিবিধি করিবার সুবিধা ছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ভূ-তত্ত্ব আলোচনার ফলে প্রতিপন্ন হইয়াছে,—বর্ত্তমান বেরিং-প্রণালী পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল না। তখন রুষিয়ার উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তস্থিত প্রদেশের সহিত উত্তর আমেরিকার বর্ত্তমান আলাস্কা-প্রদেশের সংযোগ ছিল ; চীন, মঙ্গোলিয়া, সাইবিরিয়া প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া ভারত-বাসিগণ আমেরিকায় গতিবিধি করিতেন। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব-কালে ভারত হইতে বৌদ্ধ-ধর্ম্মযাজকগণ আমেরিকায় গমনাগমন করিয়াছিলেন,—চীন-দেশের ইতিহাসে তাহার পরিচয় আছে। মেক্সিকোর প্রাচীন ইতিহাসে দেখিতে পাই,—সেই দেশে সভ্যতা-স্রোত উত্তর দিক হইতে প্রবাহিত হইয়াছিল। তাহাতেও প্রতীত হয়,—বর্ত্তমান আলাস্কার পথেই হিন্দুগণ এক সময়ে আমেরিকায় যাতায়াত করিয়াছিলেন। প্রাচীন মিশরে অর্থাৎ বর্ত্তমান আফ্রিকায় আর্য্য-হিন্দুগণই যে প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেন,—তাহার আভাস আমরা পূর্ব্বেই প্রদান করিয়াছি। † কতকগুলি আচার-ভ্রষ্ট ক্ষত্রিয় সগর রাজা কর্ত্তৃক সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন। তাঁহারা শক, যবন, পারদ প্রভৃতি নামে অভিহিত হন। ভারতবর্ষ পরিত্যাগে সেই ক্ষত্রিয় নৃপতিগণ, দিগ্দিগন্তে গমন করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন,—সেই জাতি-ভ্রষ্ট ক্ষত্রিয়গণের পারদ কর্ত্তৃক পারস্য-দেশের নামকরণ হইয়াছিল। কেহ কেহ আবার বলেন,—পরশুরামের অনুচরবর্গ পারস্য দেশে প্রবেশ করিয়া সেই দেশ অধিকার করিয়াছিলেন ; আর, পরশুরামের নাম হইতেই পারস্য দেশের নামকরণ হইয়াছিল। শ্রীরামচন্দ্রের কোনও বংশধর কর্ত্তৃক রোম রাজ্য প্রতি-ষ্ঠিত হইয়াছিল ; মগধ-রাজগণের আধিপত্যে গ্রীস-রাজ্যের উৎপত্তি ;—অনেক পাশ্চাত্য-পণ্ডিতের গবেষণায়ই তাহা স্থির হইতেছে। প্রাচীন গ্রীস—যবন-রাজ্য বলিয়া অভিহিত হইত, তাহার বহু নিদর্শন আছে। জর্ম্মণদেশে মনু-বংশধরগণ কর্ত্তৃক উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং তুর্কিস্থান ও উত্তর এসিয়ায় হিন্দুগণ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন,—

---

* Sir William Jones says :—"It is very remarkable that Peruvians, whose Inces boasted of the same (solar) descent, styled their greatest festival Ram Sitva ; whence we may suppose that South America was peopled by the same race who imported into the farthest parts of Asia the rites and the fabulous history of Ram."—*Ibid.*

† এই গ্রন্থের সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ, ৩৭৫ম ও ৩৮৭ম পৃষ্ঠা।

তাহারও নানা প্রমাণ পাওয়া যায়। চীনদেশে ভারতের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য আর আয়াস স্বীকারের আবশ্যক হয় না। চীনের ধর্ম্ম-তত্ত্ব, চীনের জাতি-তত্ত্ব প্রভৃতি অনুসন্ধান করিলে, এ বিষয় অনায়াসেই প্রতিপন্ন হইতে পারে। চীনেরা এখনও হিন্দুদিগের বংশ-সম্ভূত বলিয়াই পরিচয় দিয়া থাকে। সুদূর ইংলণ্ডও এক সময়ে আর্য্য-হিন্দুগণের অধিকারভুক্ত ছিল,—পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অনেকেই এখন তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। তাঁহারা বলেন,—প্রাচীন ব্রিটেনের 'ড্রুইদ' পুরোহিতগণের উৎপত্তির মূলে ব্রাহ্মণগণের বা বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-যাজকগণের প্রাধান্য নিশ্চয়ই বিদ্যমান ছিল। জম্বু, প্লক্ষ, পুষ্কর, ক্রৌঞ্চ, শক, শাল্মলী, কুশ—এই সপ্ত-দ্বীপের প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়া, কর্ণেল উইলফোর্ড প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহাতে সসাগরা পৃথিবী ভারতবর্ষের অধিকার-ভুক্ত ছিল—অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। শক, যবন, কম্বোজ, পারদ, পহ্লব, হূণ প্রভৃতি দেশের তত্ত্ব আলোচনা করিলেও অনেক নূতন নূতন তথ্য অবগত হইতে পারি। গান্ধার বলিতে বর্ত্তমান কান্দাহার; কম্বোজ বলিতে কাম্বোডিয়া; পহ্লব বা পারদ বলিতে পারস্য, যবন বলিতে গ্রীস, দরদ বলিতে চৈন বা চীন, খস্ বলিতে পূর্ব্ব ইউরোপ বুঝাইয়া থাকে। ফলতঃ, কালবশে নাম-পরিবর্ত্তন হইয়াছে মাত্র; আর, সেই নাম পরিবর্ত্তন-হেতু অনেক তথ্য উদ্ঘাটন করিতে আমাদিগকে আয়াস স্বীকার করিতে হয়; নচেৎ, একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে, বুঝিতে কিছুই বাকি থাকে না। পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে—দূর দেশ সমূহে—গতি বিধির জন্য যানাদিরও তখন অসদ্ভাব ছিল না। প্রাচীন কালে যে দ্রুতগামী রথ ও পোত প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে বর্ত্তমানের কালের বাষ্পীয় বা তাড়িত-শক্তি-সঞ্চালিত অর্ণবপোত, বায়ুযান, ব্যোমযান প্রভৃতির অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় না কি? পুরাণেতিহাসে দেখিতে পাই,—কেহ দণ্ডেকের মধ্যে সহস্র যোজন পথ অতিক্রম করিয়া আসিতেছেন, কেহ আকাশ-পথে বিচরণ করিতেছেন, কেহ সমুদ্র-পথে এক দেশ হইতে অন্য দেশে চলিয়াছেন। বেদে ও পুরাণে—সর্ব্বত্রই ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। অধুনা কোনও কোনও পণ্ডিত বৈদিক সূক্ত প্রভৃতির ব্যাখ্যা হইতে পুরাকালে বাষ্পীয় পোত, বাষ্পীয় রথ এবং তাড়িত-সঞ্চালিত যানাদির বিদ্যমানতা প্রমাণ করিতেছেন। * এমন কি, এখনকার ন্যায় তখন লৌহ রেল প্রতিষ্ঠিত ছিল, এবং তাহার উপর দিয়া রেলগাড়ী চলিত,—

* বেদ মন্ত্র হইতে বাষ্পীয় রথ, বাষ্পীয় পোত এবং ব্যোম-যান, বায়ু-যান প্রভৃতির অস্তিত্ব কিরূপ ভাবে উপলব্ধি হইতেছে, তাহার একটী দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছি। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে ৩৭শ সূক্তের প্রথম ঋক,—

"ক্রীলং বঃ শর্দ্ধো মারুতমনর্ব্বাণং রথে শুভং। কণ্বা অভি প্রগায়ত।"

এই ঋকের 'অনর্ব্বাণং' শব্দে কেহ 'শত্রুরহিত,' কেহ বা 'অশ্বরহিত' অর্থ উপলব্ধি করিয়াছেন। 'মারুতং' শব্দে কেহ 'মরুদ্গণের উদ্দেশ্য', এবং কেহ বা 'মরুৎ-দত্ত' অর্থাৎ 'বাষ্পদত্ত বলপ্রভাবে' অর্থ গ্রহণ করিয়া লইয়াছেন। প্রথমোক্ত মতে, ঋকের অর্থ,—"হে কণ্বগোত্রোৎপন্ন মহর্ষিগণ, তোমরা আপনাদিগের নিমিত্ত বিহরণ-শীল, শত্রু-রহিত রথে শোভমান প্রবল মরুদ্গণকে সর্ব্বতোভাবে স্তব কর।" শেষোক্ত মতে,—"হে কণ্বগোত্রোৎপন্ন মহর্ষিগণ। যে প্রকারে বাষ্পবল-প্রভাবে অশ্বরহিত রথ পরিচালিত হইতে পারে, আমাদিগকে তাহা শিক্ষা দিউন।" ইত্যাদি।

এবম্বিধ প্রমাণ-পরম্পরা প্রদর্শন করিতেও তাঁহারা ত্রুটি করিতেছেন না। যাহা হউক, প্রাচীন ভারতে দ্রুতগতি-বিশিষ্ট যানাদির যে অভাব ছিল না, এবং সেই সকল যানের সাহায্যে প্রাচীন আর্য্যগণ যথেচ্ছ-ভাবে স্থল-পথে, জল-পথে ও ব্যোম-পথে বিচরণ করিতেন, তাহাতে কোনই সংশয় নাই।

সকল দিকেই ভারতবর্ষের মৌলিকত্ব! স্থাপত্যে এখন পাশ্চাত্য ইউরোপ গৌরবের উচ্চ চূড়ায় অধিষ্ঠিত। কিন্তু প্রাচীন ভারত স্থপতি-বিদ্যায় পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন,—তাহারও সহস্র নিদর্শন বিদ্যমান। ভারতবর্ষ হইতে মিশরে, গ্রীসে, সে প্রভাব বিস্তৃত হয়। প্রাচীন ভারতের—সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর যুগত্রয়ের—অট্টালিকাদির পরিচয়-চিহ্ন এখন হয় তো অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যাইবে না; কাল-প্রবাহে সে চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়াছে—প্রতীত হইবে। সহস্র দ্বার ও সহস্র স্তম্ভযুক্ত অট্টালিকার, লৌহ-নির্ম্মিত নগরের এবং প্রস্তর-নির্ম্মিত পুরীর বিষয় ঋগ্বেদেই লিখিত আছে। দ্বিতীয় মণ্ডলের একচত্বারিংশ সূক্তের পঞ্চম ঋকে এবং সপ্তম মণ্ডলের অষ্টাশীতিতম সূক্তের পঞ্চম ঋকে সহস্র স্তম্ভ-বিশিষ্ট অট্টালিকার এবং সপ্তম মণ্ডলের তৃতীয় ও পঞ্চনবতিতম সূক্তে লৌহ-নির্ম্মিত নগরের এবং চতুর্থ মণ্ডলের ত্রিংশ সূক্তে প্রস্তর-নির্ম্মিত পুরীর পরিচয় পাওয়া যায়। বৈদিক সূক্ত-সমূহে যে সকল নগর, গ্রাম ও অট্টালিকার পরিচয় পাই, তাহার তথ্যানুসন্ধানে প্রয়াস পাওয়া এখন অবশ্য বিড়ম্বনা মাত্র। কিন্তু তাহা হইলেও আর্য্য-হিন্দুগণ পর্ব্বত-গাত্রে, গিরি-গুহায় যে সকল স্থপতি-বিদ্যার নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন, কোনও কালে তাহা বিলুপ্ত হইবে কি? প্রাচীন-কালের গ্রাম, নগর বা অট্টালিকার নিদর্শন না পাই; কিন্তু যে গুহা-মন্দিরগুলি আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার সহিত তুলনা করিলে পৃথিবীর সকল দেশের স্থাপত্যকে নতমুখ হইতে হয় না কি? দৃষ্টান্ত-স্থলে, ইলোরার গিরি-গুহার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেছি। বোম্বাই দ্বীপের পূর্ব্বাংশে দৌলতাবাদের নিকট ইলোরার এই গুহা-মন্দির অবস্থিত। পাহাড় খুদিয়া এই গিরি-গুহায় যে দেব-মন্দির ও দেব-মূর্ত্তি-সমূহ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা কত কালের—আজি পর্য্যন্ত কেহ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। কেহ বলেন,—'চন্দ্রবংশের আদিভূত বুধ-পত্নী ইলার নামানুসারে ইলোরার নাম-করণ হইয়াছিল। যুবনাশ্ব, ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রভৃতি রাজন্যবর্গ ইলোরায় রাজত্ব করিয়াছিলেন।' কেহ বলেন,—'আট সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ইলু নামক রাজা এই ইলোরার অধিপতি ছিলেন। পাহাড় খুদিয়া তিনিই ইলোরায় প্রথম দেব-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।' কত কাল পূর্ব্বে, কোন্ সময়ে, ইলোরার গিরি-গুহা প্রথম খোদিত হইয়াছিল, প্রকৃত-রূপে তাহার নির্ণয় হয় না। এই গিরি-গুহায় প্রস্তর-খোদিত মন্দির সমূহে হিন্দু দেব-দেবীগণের মূর্ত্তি আছে; বৌদ্ধদিগের এবং জৈনদিগের কীর্ত্তি-চিহ্নও বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং মনে হয়,—প্রাচীন হিন্দুগণের কারুকার্য্যের উপর, বৌদ্ধ ও জৈনগণ আপনাদের শিল্প-চাতুর্য্য প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। ইলোরার গিরি-গুহা অর্দ্ধ-চন্দ্রাকৃতি। ইহার মধ্যস্থলে দেবালয়-সমূহ প্রতিষ্ঠিত; উত্তর ও দক্ষিণ পার্শ্বে বৌদ্ধ ও জৈন-দিগের মন্দির-সমূহ। ইলোরার কৈলাস—ভারতীয় শিল্পিগণের অদ্বিতীয় শিল্প-

বিবিধ।

নৈপুণ্যের পরিচয়। পর্ব্বত-গাত্র-খোদিত এতাদৃশ কারুকার্য্য-সম্পন্ন সুবৃহৎ মন্দির পৃথিবীতে আর কোথাও নাই। ভারতীয় ভাস্কর্য্য ও স্থপতি-বিদ্যার পরিচয়ে যদি একমাত্র ইলোরার নাম আমরা উল্লেখ করি, তাহা হইলে আর কোনও পরিচয় প্রদানের আবশ্যক হয় না। পুরাণাদিতে ইলোরা—গ্রীষ্মেশ্বর নামক শিব-তীর্থ বলিয়া অভিহিত। এইরূপ গিরি-মন্দির ভারতবর্ষের আরও নানাস্থানে দৃষ্ট হয়। পুনার নিকট কারোলির গিরি-গুহা, সালসতি-গুহা, অবন্তার গিরি-গুহা—কত নাম করিব? উদয়-গিরি ও খণ্ড-গিরিতে যে সকল শৈল-মন্দির খোদিত রহিয়াছে, তাহাই কি অল্প শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচায়ক? একাম্রকানন—ভুবনেশ্বরের মন্দির—সেও কত কাল পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত! পুরুষোত্তমে জগন্নাথ-দেবের মন্দিরকেও পুরা-কীর্ত্তি বলিয়া অভিহিত করিতে পারা যায়। অবশ্য এমন কথা আমরা বলিতেছি না যে, পুরুষোত্তমের বর্ত্তমান মন্দিরই রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রতিষ্ঠিত! কিন্তু তাহা না হইলেও ঐ সকল মন্দিরের প্রাচীনত্ব বিষয়ে কোনই সংশয় নাই। যাহা হউক, ভারতবর্ষ যে বহু পূর্ব্বে স্থাপত্যে ও ভাস্কর্য্যে প্রতিষ্ঠাপন্ন ছিল, পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণও তাহা অস্বীকার করেন নাই। ফারগুসান বলিয়াছেন,—"খিলান নির্ম্মাণ-প্রণালী ভারতবাসীরাই প্রথমে অবগত ছিলেন। ভারতবর্ষ হইতেই তাহা অন্য দেশে প্রচারিত হয়।" অধ্যাপক ওয়েবার বলেন,—"পাশ্চাত্য-দেশে ধর্ম্মালয়ের চূড়া-সমূহ, ভারতবর্ষের বৌদ্ধ-মন্দির-সমূহের চূড়া বা টোপের অনুকরণে নির্ম্মিত হওয়া অসম্ভব নহে।" * হাণ্টার বলেন,—"বর্ত্তমান-কালে ইংরেজ শিল্পিগণ যে সকল সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধক শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় দেন, তাহার অধিকাংশই ভারতের আদর্শে নির্ম্মিত হইয়া থাকে।" † সারাসেন-জাতির খিলান-নির্ম্মাণ-পদ্ধতি অনেকে প্রাচীনতম বলিয়া বিশ্বাস করেন। কিন্তু কর্ণেল টড্ প্রতিপন্ন করিয়াছেন,—"সারাসেনগণ প্রাচীন ভারতের নিকট হইতেই সেই খিলান-নির্ম্মাণ-পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছিল।" ‡ প্রাচীন-ভারত শিল্প-বিষয়ে যে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহারও বহু নিদর্শন আছে। সুবর্ণময় অলঙ্কার ও উষ্ণীশ, বিবিধ প্রকার মূল্যবান বস্ত্রাদি এবং মণি-মুক্তা-খচিত ভূষণাদির পরিচয় বেদাদি গ্রন্থেও দেখিতে পাই। যেমন স্থাপত্যে ও শিল্প-বিষয়ে, তেমনি গণিতে, জ্যোতিষে, সাহিত্যে, কাব্যে,—ভারতের মৌলিকত্ব প্রতিপন্ন হয়। গণিতে ভারতবর্ষের মৌলিকত্ব—'লীলাবতী' প্রভৃতি গ্রন্থে, 'সূর্য্য-সিদ্ধান্তে' ত্রিকোনমিতির এবং 'সুলভ-সূত্রে' জ্যামিতির পরিচয় পাওয়া যায়। মণিয়র উইলিয়মস্ § প্রমুখ অধ্যাপকবর্গকে স্বীকার করিতে হইয়াছে,—'বীজ-গণিত ও জ্যামিতির আবিষ্কারে এবং জ্যোতির্ব্বিদ্যায় তাহার প্রয়োগে হিন্দুগণই

* "It is, indeed, not improbable that our Western steeples owe their origin to the imitation of Budhistic topes."—Professor Weber, *Indian Literature.*

† "English decorative art, in our day, has borrowed largely from Indian forms and patterns."—Sir W. W. Hunter, *Imperial Indian Gazetteer.*

‡ "The Saracen arch is of Hindu origin"—Col. Tod, *Rajasthan.*

§ "To the Hindus is due the invention of Algebra and Geometry and their application to Astronomy"—Prof. Monier Williams, *Indian Wisdom.*

আদিভূত।' এই গভীর গণিত-তত্ত্ব আলোচনায় ভারতের মহিলারা পর্য্যন্ত সময় সময় প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়াছিলেন ;— তাহা স্মরণ করিলেও আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। পূর্ব্বে যে 'লীলাবতীর' নাম করিয়াছি, তাহা লীলাবতী নাম্নী বিদুষী রমণীর অপূর্ব্ব বিদ্যাবত্তার নিদর্শন। ভারতের প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ ভাস্করাচার্য্যের কন্যা—সেই লীলাবতী। লীলাবতী—পিতার একমাত্র সন্তান। ভাস্করাচার্য্য সেই কন্যাকে পুত্রবৎ শিক্ষা দান করেন। কথিত হয়,—ভাস্করাচার্য্যের "সিদ্ধান্ত-শিরোমণি" গ্রন্থের পাটীগণিত সংক্রান্ত 'লীলাবতী' অধ্যায়টী লীলাবতী-বিরচিত। কেবল কি লীলাবতী? গর্গ মুনির কন্যা গার্গী, যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত শাস্ত্রালোচনায় যশোভাজন হইয়াছিলেন। দেবহুতি, মদালসা, মৈত্রেয়ী, লোপামুদ্রা প্রভৃতি বিদুষী রমণীগণের বিদ্যাবত্তার পরিচয়—পুরাণে, ইতিহাসে কতরূপে পরিকীর্ত্তিত! স্বধর্ম্ম-পালনে, পরহিত ব্রতে, সৎশিক্ষা-দানে হিন্দু-রমণীগণ আদর্শস্থানীয়া ছিলেন। তাঁহাদের প্রাচীন কাহিনী আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই,—কেহ পতি-সেবার পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন; কেহ সন্তান-পালনের উচ্চ আদর্শ সম্মুখে ধরিয়া রাখিয়াছেন; কেহ ভগবদ্ভক্তিতে মাতোয়ারা হইয়াছেন; কেহ পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছেন। ফলতঃ, স্ত্রী-জাতির প্রকৃত শিক্ষার ব্যবস্থায় প্রাচীন ভারতের প্রসিদ্ধি কখনও বিলুপ্ত হইবার নহে। সে সম্পর্কেও স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি,—ভারতবর্ষই আদিভূত, আদর্শ-স্থানীয়। অধিক বলিব কি, ভাষা-তত্ত্ব আলোচনায়ও অধুনা প্রতিপন্ন হইতেছে,—ভারতীয় আর্য্যগণের ভাষাই—পৃথিবীর আদি ভাষা; পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার উৎপত্তির মূলে—ভারতবর্ষের দেবভাষা। পৃথিবীর সকল ধর্ম্মেরই আদিভূত—ভারতীয় সনাতন ধর্ম্ম; সকল ধর্ম্মই ভারতীয় সনাতন ধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ফলতঃ, সকল বিষয়েই আমরা ভারতবর্ষকে শ্রেষ্ঠ ও আদি বলিয়া গৌরব অনুভব করি।

উপসংহার।

কেনই বা গৌরব অনুভব না করিব? স্বদেশের, স্বজাতির গৌরবময়ী পূর্ব্ব-স্মৃতি স্মরণ করিয়া কাহার না হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়? যাহাদের পিতৃ-পুরুষের পুণ্য স্মৃতি এমন উজ্জ্বল হইয়া আছে,—এমন দিকে দিকে উদ্ভাসিত রহিয়াছে, তাহারা গৌরব অনুভব না করিবে কেন? পিতৃ-পুরুষের পুণ্য-স্মৃতিতি গৌরব অনুভব না করিলে জাতির অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। বিশেষতঃ, আমাদের পিতৃপুরুষগণের যে আদর্শ-চরিত্র চির দেদীপ্যমান, শিক্ষণীয় বিষয় তাহার অধিক আর কি থাকিতে পারে? তাঁহাদিগের উদারতা, সরলতা, সততা, সত্য-প্রিয়তা, সাহসিকতা,—চিরপ্রসিদ্ধ। শিষ্ট-ব্যবহারে ও সদাচারে, দয়া ও পরোপকারে, তাঁহারা চিরস্মরণীয়। এক কথায়, যে গুণে মর্ত্ত্যের মানুষ দেবতার আসন লাভ করিতে পারে, আর্য্য-হিন্দুগণ সেই গুণেই গুণান্বিত ছিলেন। সত্য-পালনের ন্যায় ধর্ম্ম নাই; সেই সত্য-পালনে আর্য্যগণ যে দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন,—কেহ কখনও তাহা বিস্মৃত হইতে পারিবেন কি? প্রাচীন ভারতের প্রাচীনতম ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়াও যদি আমরা অপেক্ষাকৃত আধুনিক ইতিবৃত্তের আলোচনা করি, তাহাতেও সে সম্বন্ধে বড় অল্প প্রতিষ্ঠার পরিচয় পাই না। ভারতবাসীর সত্যবাদিতা সম্বন্ধে দ্বিতীয় শতাব্দীর ঐতিহাসিক এরিয়ান বলিয়া গিয়াছেন,—

"আমি কথনও কোনও ভারতবাসীকে মিথ্যা বলিতে শুনি নাই।" * গ্রীক ঐতিহাসিক ষ্ট্রাবো বলিয়াছেন,—"ভারতবাসীরা এতই সৎপ্রকৃতি যে, তাহাদিগের গৃহ-দ্বারে চাবিবন্ধ করার আবশ্যক হয় না এবং চুক্তিপত্র লিখিয়া কোনও বিষয়ে তাহাদিগকে বাধ্য করার প্রয়োজন দেখি না।" † চীনদেশীয় প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী হুয়েন-সাং বলিয়া গিয়াছেন,—"চরিত্রের সততা ও সরলতার জন্য ভারতবাসীরা চির-প্রসিদ্ধ। তাহারা কখনও কাহারও ধন-সম্পত্তি অন্যায়রূপে অপহরণ করে না। ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য তাহারা কদাচ ত্যাগ-স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত নহে।" ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে চীন-সম্রাট ইয়াংটীর দূতরূপে ফেইটু ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। ভারতবাসী-দিগের সততা ও সত্যবাদিতা সম্বন্ধে তিনি বলিয়া গিয়াছেন,—"ভারতবাসীরা অঙ্গীকারে বিশ্বাসবান অর্থাৎ অঙ্গীকার করিয়া তাহারা কখনও তাহা পালন করিতে কুণ্ঠিত হয় না।" অধিক বলিব কি, ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পরিব্রাজক মার্কোপোলো ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণদিগের সত্যনিষ্ঠা দর্শন করিয়া বলিয়া গিয়াছেন,—"পৃথিবীতে এমন কোনও বস্তুই নাই, যাহার লোভে ব্রাহ্মণেরা মিথ্যা বলিবে।" ‡ সে দিনের আবুল ফজেল এই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া গিয়াছেন; তিনি বলিয়াছেন,—"হিন্দুগণ সত্যের অনুসরণকারী। তাহাদের ব্যবহারে অসীম বিশ্বস্ততার পরিচয় পাওয়া যায়।" বিচারপতি কর্ণেল শ্লিম্যান হিন্দুদিগের সত্যপ্রিয়তা দেখিয়া বলিয়াছিলেন,—"আমি শত শত মকদ্দমার বিচারকালে দেখিয়াছি, একটী মিথ্যা কথা কহিলেই এক ব্যক্তির সম্পত্তি, মুক্তি এবং জীবন লাভ হইতে পারে, কিন্তু সে ব্যক্তি কখনই মিথ্যা বলিতে সম্মত হয় নাই।" শ্লিম্যানের এই উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—"ইংলণ্ডের কোনও ইংরেজ জজ কি এ কথা বলিতে পারেন?" § ভারতের প্রথম গবরণর জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংস পর্য্যন্ত হিন্দুজাতির গুণ-গরিমার বিষয় অস্বীকার করিতে পারেন নাই। পার্লামেণ্ট মহাসভায় সাক্ষ্যদান-কালে তিনি বলিয়াছিলেন,—"হিন্দুগণ বিনয়ী, পরোপ-কারী, কৃতজ্ঞ, বিশ্বাসী এবং স্নেহ-পরায়ণ।" ¶ হিন্দুগণের ধর্ম্মপ্রাণতা সম্বন্ধে অধ্যাপক মনিয়ার উইলিয়ম্‌স্ বলিয়াছেন,—"ইউরোপের কোনও জাতিই ভারতবাসীর ন্যায় ধর্ম্ম-পরায়ণ নহে।" যেমন সত্য-নিষ্ঠায়, তেমনি সাহসিকতায়, তেমনি স্বদেশ-প্রাণতায়! রাম,

* "No Indian was ever known to tell an untruth"—Arrian, as quoted in *Hindu Superiority.*

† "They are so honest as neither to require locks to their doors nor writings to bind their agreements"—*Ibid.*

‡ "They (the Brahmins) would not tell a lie for any thing on earth"—*Ibid.*

§ "I have had before me hundreds of cases in which a man's property, liberty and life has depended upon his telling a lie and he has refused to tell it"—বিচারপতি শ্লিম্যানের এই উক্তির উল্লেখ করিয়া ম্যাক্সমূলার জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—"Could many an English Judge say the same?" Max Muller's *India, What can it teaches us.*

¶ Minutes of evidence before the Committee of both Houses of Parliament, March and April, 1830.

অর্জ্জুন, কর্ণ, ভীষ্ম, কৃষ্ণ, ভীম, অভিমন্যু প্রভৃতির ইতিহাস দূর অতীতের গর্ত্তে নিমজ্জিত হইলেও, সে দিনের রাজস্থানে মিবারের প্রতাপ, মাড়োয়ারের দুর্গাদাস, আজমীঢ়ের পৃথ্বীরাজ, এবং হাম্বীর, রাজসিংহ প্রভৃতি যে সাহসিকতা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা আছে কি? এইরূপ যে কোনও গুণের অনুসন্ধান করি না কেন, ভারতে তাহারই আদর্শ পূর্ণ প্রকটিত। সেই আদর্শের অনুসরণ করিলে শ্রেয়ঃ-লাভ অবশ্যম্ভাবী। পিতৃ-গৌরবই—প্রতিষ্ঠার মূলীভূত। পিতৃ-গৌরব বিস্মৃত হইলে, জাতি যে অধঃপতনের পথে অগ্রসর হয়,—আপন জাতীয় জীবন বিনষ্ট করে,—তাহাতে সন্দেহ আছে কি? হিন্দু আমরা; আমরা তো ইহা প্রাণে-প্রাণেই অনুভব করি। পিতৃপুরুষগণের গৌরব-কাহিনী স্মরণ করিবার পদ্ধতি অস্মদ্দেশে আবহমান কাল হইতেই প্রচলিত আছে। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ—যাঁহারা মনে করেন, পৃথিবী দিন দিন উন্নতির পথে প্রধাবিত হইতেছে, তাঁহারাও—এখন এ কথা অস্বীকার করিতে পারিতেছেন না। এতৎপ্রসঙ্গে ম্যাক্সমূলার যাহা বলিয়াছেন, বোধ হয়, তাহার উপর অধিক কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং তাঁহার ভাষাতেই বলিতেছি,—"A people that can feel no pride in the past, in its history and literature, loses the mainstay of its national charact r. Wh n Germany was in the very depth of its political degradation, it turned to its ancient literature, and drew hope for the future from the study of the past." অর্থাৎ, 'যে জাতি আপন অতীত গৌরবে, পুরাবৃত্তে ও সাহিত্যে গৌরব অনুভব না করে, সে আপন জাতীয় জীবনের প্রধান অবলম্বন হইতে ভ্রষ্ট হয়। জর্ম্মণী যখন রাজনৈতিক অবনতির গভীর গহ্বরে নিমগ্ন হইয়াছিল, সে তখন আপন প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি ফিরিয়া চাহিয়াছিল। আর তাহা হইতেই—অতীত স্মৃতির আলোচনায়—তাহার ভবিষ্য-জীবনের আশা-মকুল অঙ্কুরিত হইয়াছিল।' এই সিদ্ধান্তই সার সিদ্ধান্ত। আপনাকে উন্নত করিতে হইলে, সমাজকে উন্নত করিতে হইলে, পিতৃপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ ভিন্ন গত্যন্তর আর কি আছে?